ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

বর্ষ ১১, সংখ্যা ২৫, জানুয়ারি, ২০২৪

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.111
Vol. 11th Issue 25th, Jan., 2024

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.111
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya,
Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 11th Issue 25th, 29th Jan., 2024, Rs. 850/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
১১ তম বর্ষ ও ২৫ তম সংখ্যা
২৯ জানুয়ারি, ২০২৪

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিষ্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২
সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৮৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,

ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল, ড. প্রবীর প্রামাণিক,

ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)

ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. অনির্বাণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

রচনা রায় (বাংলা বিভাগ, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়)

ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)

শর্মিষ্ঠা সিন্হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)

ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)

ড. আশীষ কুমার সাউ (আর্য মহিলা পি. জি. কলেজ, বারাণসী)

ড. শান্তনু দলাই (এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। ২০০০ - ২৫০০ শব্দ সংখ্যা এবং সঙ্গে ৪০০/৫০০ শব্দের সারাৎসার পাঠাতে হবে।

২. পেজমেকার/ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠানো যাবে। ১৪ ফন্টে লেখা পাঠাতে হবে এবং সঙ্গে পি ডিএফ ও সফট কপি (লেখা নির্বাচিত হলে) পাঠাতে হবে। হাতে লেখা হলে মার্জিনসহ পরিচ্ছন্ন লেখা পাঠাবেন।

৩. অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না। লেখার কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।

৪. পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।

৫. কোনো লেখা ছাপার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে কিনা তা জানতে ৩/৪ মাস সময় লাগতে পারে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২
ফোন : ৯৮০৪৯২৩১৮২

Registered Address
Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102
Ph. No. : 9804923182
E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস
ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন
Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

সেলিনা হোসেনের হাঙর নদী গ্রেনেড : নারীর দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ

মাখন চন্দ্র রায় ১৫

ঔপনিবেশিক বাংলায় পিকনিক : একটি অচর্চিত
সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনুসন্ধান

সুমন মুখার্জী ২৩

বিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে
নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ

শাবানা আজমী ৩২

শ্রীগীতগোবিন্দকাব্যের রচয়িতা ‘কবি জয়দেব’ : একটি
সমীক্ষাত্মক আলোচনা

দেবব্রত বৈদ্য ৪২

উত্তর আধুনিক কবি নির্মলেন্দু গুণের কবিতার গতি প্রকৃতি

আজাহারউদ্দিন মিদ্যা ৫৬

মার্কসীয় মতাদর্শ সংক্রান্ত বাংলা প্রবন্ধের ধারা : বিশশতকের শেষার্ধ

অমিত দে ৬৩

মোহিতলাল মজুমদার ও কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে প্রেম ভাবনা

শেখ কামাল উদ্দীন ৭২

রবীন্দ্র নাটকে ঠাকুরদাদা : নানা সাজে, নানা কাজে

ঈশিতা খাঁ ৭৯

আবশ্যিক সম্ভাবনা রূপে মৃত্যু- একটি হাইডেগেরীয় পর্যালোচনা

সৌভিক ঘোষ ৮৯

ঔপনিবেশিকতার আলোকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান
সম্প্রদায় ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনী

শুভাশীষ ঘোষ ৯৭

ডিরোজিওর নব্যবঙ্গ : সীমাবদ্ধ এক নবজাগরণ

পল্লব বৈরাগ্য ১০৬

সুভা : মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল...
আকাশ বিশ্বাস ১১৩
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের লালসালু উপন্যাস এক নতুন দিগন্ত
সৈয়দ রাফিকা সুলতানা ১২২
বিভেদের মাঝে মিলন মহান : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
'দুরাশা' ও 'মুসলমানীর গল্প'
বিকাশ কালিন্দী ১৩১
বুদ্ধদেব গুহ-র 'ইল্‌মোরাণ্‌দের দেশে' উপন্যাসে মাসাই জনজীবন
গনেশ কর্মকার ১৩৯
ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটে সদানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতীর সৃষ্টিতত্ত্ব
তপন রুইদাস ১৪৭
তামিল গল্পকার ধণ্ডপাণি জয়কান্তনের লেখা সুব্রাহ্মনিয়ন
কৃষ্ণমূর্তির অনূদিত 'দিনের বেলার একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে'
গল্প : পাঠান্তের অনুভব
এ. টি. এম. সাহাদাতুল্লা ১৬২
গণতন্ত্রে মহিলাদের অবস্থান: ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে একটি সম্যক বিশ্লেষণ
স্বপন শর্মা ১৭০
হুগলী জেলায় স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার (১৮১৮-১৯৪৭) : তথ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণ
প্রিয়াঙ্কা ঘোষ ১৭৮
ভারতে প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলন : প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ
সৈকত মিত্র ১৮৭
পশ্চিমবাংলার কৃষি
তুহিন কুমার মৈত্র ১৯৫
একাত্তরের দিনগুলি ও ফাৎসুঙ্ : রাজনৈতিক
পরিচয় ও পরিচয়ের রাজনীতি
সুপর্ণা মণ্ডল ২০০
কাশীনগরের মাইবিবি : শতাব্দী প্রাচীন লৌকিক কিংবদন্তির
এক অন্যতম নিদর্শন
সাইদা খাতুন ২০৬

অমিয়ভূষণ মজুমদারের ছোটগল্পে বৈচিত্রময়তা (নির্বাচিত)
অর্পন রায় ২১০
রমাপদ চৌধুরীর 'হারানো খাতা' : হয়ে ওঠা জীবন ও কতিপয় ভাবনা
মোসাহিদা খাতুন ২১৮
'ফুলকুসুমা': প্রবীণ দম্পতীর পশু-বাৎসল্যের আখ্যান
সুচিস্মিতা কাঞ্জি ২২৭
বিবেকানন্দের Practical বেদান্তের একটি দার্শনিক পর্যালোচনা
আসমিন সেখ ২৩৪
আলপনা : বাংলার অনন্য লোকশিল্প
শ্রী ভট্টাচার্য্য ২৪৩
বঙ্কিমচন্দ্রের অমরনাথ : অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের টানাপোড়েন
সিদ্ধার্থ ঘোষ ২৫০
শৈলী বিজ্ঞানের আলোকে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর
কবিতার শৈলী বিচার
আচিন্ত্য কুমার দাস ২৫৫
'বহুরূপী' নাট্য পত্রিকার সম্পাদক প্রভাতকুমার দাস
মিলন সিংহ ২৬৪
গার্হস্থ্য হিংসা থেকে নারী সুরক্ষার্থে ভারতীয় দণ্ডবিধি : সাম্প্রতিক মূল্যায়ন
শর্মিলা রায়
স্বরাজ বক্সী ২৭৩
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : সহজ ভাষার, সহজ ভাবের কবি
খোকন বর্মন ২৮২
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় 'স্বদেশ ভাবনা'
রসরাজ রায় ২৯২
বনফুলের বুধ্নী : মানব মনস্তত্ত্বের এক নিবিড় পাঠ
প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য ৩০০
ভগীরথ মিশ্রের ছোটগল্প : শোষক-শোষিতের সম্পর্কের অভিনব রূপায়ন
রজত কিশোর দে
হৈমন্তী সরকার ৩০৫

সমকালীন প্রেক্ষাপটে মন্মথ রায়ের পূর্ণাঙ্গ নাটক (নির্বাচিত)
উজ্জ্বল দাস ৩২০
রজনীকান্ত বরদলৈ : অসমের বঙ্কিমচন্দ্র
নির্মল বেরা ৩২৬
উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' : একটি পরাধীন
জাতির বিদ্রোহের মুখপত্র
মৌসুমী পাল ৩৩৩
কমলকুমার মজুমদারের মল্লিকাবাহার : বাংলা ছোটোগল্পে
এক স্বাতন্ত্রের দিশারী
ভগীরথ নন্দী ৩৩৮
ঊনবিংশ শতকে বাংলার বাবু ভদ্র সমাজ : একটি পর্যালোচনা
স্বপন দোলই ৩৪৫
সত্তর দশকের দেশ-এ ভিন্ন যুবমানস : দুটি গল্পের অন্য অনন্য স্বর
বর্ণালী পাল ৩৫৭
কবিতার অস্তিত্বে জীবনের খোঁজ
দীপক কুন্ডু ৩৭১
বিংশ শতকে ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে
টেস্ট টিউব বেবির উদ্ভব ও বিকাশ
কৌশিক কুন্ডু ৩৭৫
কারুবাসনার অন্য নাম : মিলন মুখোপাধ্যায়ের 'মুখ চাই মুখ' উপন্যাস
ব্রজ সৌরভ চট্টোপাধ্যায় ৩৮৩
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার বিস্মৃত মহিলাদের কথা
গুরুশংকর বারিক ৩৮৮
শিশুর সামাজিক প্রতিকূলতার নিরিখে তিনটি নির্বাচিত রবীন্দ্র ছোটগল্প
শ্রেয়া চৌধুরী ৩৯৯
দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার আদিবাসী সংস্কৃতি : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
সায়ন দেবনাথ ৪০৬
নবনীতা দেবসেনের ছোটগল্পে নারী : সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে
সন্দীপা মুখার্জী ৪১৩

ত্রিপুরার লংতরাই তের : ঐতিহ্যে ও সাহিত্যে
জীবনকৃষ্ণ পাত্র ৪২০
বিপ্লবী আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ ও মহান বিপ্লবী নলিনী বাগচি
বিদ্যুৎ সরকার ৪৩০
অনিল ঘড়াইয়ের আদিবাসী নারী : মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও বেঁচে
থাকার লড়াই নির্বাচিত ছোটগল্পের নিরিখে
মন্দিরা মর্ম্মু ৪৩৭
শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের লোকায়ত শিক্ষারীতি - প্রসঙ্গে
ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র
চৈতালী কাঞ্জিলাল ৪৪৫
'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় উল্লিখিত পিঠে-পুলি, মিষ্টান্ন ও ব্যঞ্জন শিল্প – একটি
সমাজতাত্ত্বিক অন্বেষণ
অজয় কুমার দাস ৪৫২
সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' : একটি আদিবাসী গোষ্ঠীর ভাঙনের ইতিকথা
দীপ্তি রায় ৪৬১
নব ধর্মের অভ্যুদয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ
অভিজিত মণ্ডল ৪৬৬
নিম্নবর্গের নারীর পেশাগত ভিন্নতার রূপান্তর : পশ্চিমবঙ্গের
আলোকে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
অসীম বিশ্বাস ৪৭৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে নায়কের নিঃসঙ্গতা
অর্পিতা দেবনাথ ৪৮৩
বাংলার পৌণ্ড্র সমাজ ও পাশ্চাত্য শিক্ষা
সমীর মন্ডল ৪৯২
Yoga and Positive Psychology - a personal experience
Shaona Sengupta ৪৯৬
UNVEILED VOICES OF WOMEN : THE
EVOLUTION OF WOMEN'S RIGHT IN COLONIAL BENGAL
Rudrani Bhattacharya ৫০১

GLOBALIZATION AND THE PREPARATION OF SKILLED,
QUALITY TEACHERS : NEED OF THE HOUR
Shree Chatterjee ৫১৫
Women issues in the 19th century India
Abinash Sengupta ৫২৪
IMPACT OF COVID-19 ON EDUCATION SYSTEM-EVIDENCE
FROM A SURVEY ON UNDERGRADUATE AND
POST GRADUATE STUDENTS IN KOLKATA
Sourav Das ৫৩৩
A JOURNEY TOWARDS FINDING OWN
LANGUAGE OF PROTEST : MICHAEL
MADHUSUDAN DUTT
Prama Bhattacharjee ৫৪৪
Kumārila Bhaṭṭa : A Hindu Philosopher
Sudipta Sau ৫৫৩
PEACE : MEANING AND CONCEPT
Santanu Ger ৫৬৩
Early Childhood Education : The Montessori
Approach and the Reggio Emilia Theory
Subrata Acharyya
Nasiruddin Khan ৫৬৮
Locational Factors of Food Park, case study on
Sankrail Food Park, Howrah
Sumana Das ৫৭৯
CULTURAL ATTRIBUTES OF THE KURMI MAHATOS :
REFLECTIONS FROM KARAM PUJA
Sanchita Bhattacharya ৫৮৬

Raja Ram Mohan Roy : The pioneer of scientific religious reformer to the Indian Society
Somnath Roy ৫৯৪

Migration – an Overview on Terminology and Historical discourse
Sudipta Sardar ৬০৩

Rise And Growth of The Middle Class and Socio – Economic Hegemony in the 19th And 20th Century Cooch Behar
Gour Kishore Dey ৬১২

Development of Electricity in Colonial Darjeeling : 1895-1947
Nimai Mandal ৬২০

Values and Ethics
Paramita Datta ৬২৮

সম্পাদকীয়

হাজার ভিড়ের মাঝে মুহূর্তরা আলোকিত হয়ে থাকে। নিজের নিজত্বে নিজেই শ্রেষ্ঠ। উন্মোচিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। আপন মনে আহ্বান করেন কোন উৎসুক গবেষকের। যিনি সকল বাধ্যবাধকতার মাঝেও আপন দিশা দেখাতে সমর্থ্য। কোন কিছু চাপিয়ে দিয়ে নয়, গবেষণার নিজস্ব নিয়মেই তত্ত্বতালাশ চলতে থাকে। সন্ধানী মানুষ নিবিড় মনেই গড়ে তোলেন এক মস্ত বড় সাম্রাজ্য। আলোকিত হন অন্যরা। এবারের ‘‘এবং প্রান্তিক’’ সেই আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাবে।

সেলিনা হোসেনের হাঙর নদী গ্রেনেড : নারীর দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ

মাখন চন্দ্র রায়
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ: স্বাধীনতার সংগ্রাম বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক মহান অনুষঙ্গ। সুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে এক বড় অর্জন। পৃথিবীর সকল সংগ্রামী জাতির সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও মুক্তিযুদ্ধ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন জীবনযন্ত্রণা ও আত্মত্যাগের চালচিত্র রূপায়ণে ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন দায়বদ্ধ শিল্পীর ভূমিকা পালন করেছেন। *হাঙর নদী গ্রেনেড* তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম উপন্যাস। মুক্তিসংগ্রামে নারীর অনুল্লেখিত সীমাহীন অবদানের কিছু দৃষ্টান্ত নারীর দৃষ্টিকোণ হতে এই উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন লেখক। প্রতিকূল রাষ্ট্রকাঠামোর অভ্যন্তরে অবস্থান করা জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে সদর্থক ও মুখ্য তাৎপর্যে রূপায়ণ করেছেন তিনি। বাঙালির জাতীয় জাগরণের অনন্য অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কথাকার সেলিনা হোসেন এই উপন্যাসে অপূর্ব শিল্পকুশলতায় বিন্যস্ত করেছেন। আবেগময় রক্তাক্ত ইতিহাস রঞ্জিত *হাঙর নদী গ্রেনেড* উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনার স্বরূপ অনুসন্ধানই এই প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।
মূল শব্দ: স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের উপন্যাস, রাষ্ট্রকাঠামো, আত্মত্যাগ।

মূল আলোচনা

বাংলাদেশের সাহিত্যের সাম্প্রতিক ধারায় সেলিনা হোসেন (জন্ম: ১৯৪৭) একজন প্রতিনিধিত্বশীল ও শক্তিমান কথাশিল্পী। চিন্তা-চেতনায় প্রগতিশীল, ইতিহাস-ঐতিহ্য সচেতন এই লেখক মনে করেন লেখালেখি তাঁর জীবনের 'মহত্তর কাজ'; বেঁচে থাকার প্রেরণা- 'ঋণ শোধের মাধ্যম'। বাংলাদেশের ক্রান্তিকাল, রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাত, মূল্যবোধের অবক্ষয়, মধ্যবিত্তের জীবন-সংকট, সংগ্রামী জীবন-চেতনা, ইতিহাস-ঐতিহ্য বোধ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশাবাদ তাঁর কথাসাহিত্যের মৌল প্রতিপাদ্য। একুশ শতকের শুরু থেকে বদলে যাওয়া বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতা, রাষ্ট্রিক-সামাজিক সংকট ও অস্থিতিশীলতা, নৈরাজ্য ও অবক্ষয়ের কবলে পড়া জর্জরিত ব্যক্তি-জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, নারী-পুরুষের সম্পর্কের নানামাত্রিক জটিলতা সেলিনা হোসেনের রচনায় গভীরভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সাহিত্য-জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তিনি ক্রমাগত সমৃদ্ধ করে চলেছেন বাংলার সাহিত্যভাণ্ডারকে। তাঁর গল্পে-উপন্যাসে জীবনের প্রতি, মানুষ-সময় ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। মুক্তিযুদ্ধের

পটভূমিতে রচিত তাঁর বহুল আলোচিত ও নন্দিত উপন্যাস *হাঙর নদী গ্রেনেড* (১৯৭৬)-এ বাংলাদেশের যুদ্ধকালীন বাস্তবতা উপস্থাপিত হয়েছে। বাঙালির জাতিসত্তা ও অস্তিত্ব-অন্বেষার সুগভীর প্রতিফলন পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। সুবিশাল ক্যানভাসে লেখক সমাজ-সংসার, ইতিহাস-রাজনীতি, দ্রোহ-সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা-সবকিছুই তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তুলে ধরেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুস্থির করার প্রত্যয়ে মুক্তিসংগ্রামে বাঙালির যে আত্মত্যাগ তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে, সেই চেতনাই আপামর জনতাকে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। নয় মাসব্যাপী জীবনপণ যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি অর্জন করে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা যুদ্ধোত্তরকালে লেখকদের কাছে বিপুল অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে দেখা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের জীবন্ত কিংবদন্তি ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে রচনা করেছেন তাঁর বহুল আলোচিত উপন্যাস *হাঙর নদী গ্রেনেড*। বিস্তৃত পটভূমিতে লেখা *হাঙর নদী গ্রেনেড* উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনযাত্রা, নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও পরিণতি, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচার-অনাচার, নারী নির্যাতন, রাজাকার বাহিনীর তৎপরতা, মুক্তি সংগ্রামে সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগের বৃত্তান্ত অতি সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। হাঙর নদী গ্রেনেড- পাশাপাশি আপাত মিলহীন তিনটি প্রতীকি শব্দ; কিন্তু এর ব্যাপ্তি অনেক গভীর ও প্রসারিত। কাহিনির সঙ্গে উপন্যাসটির নামকরণও বাস্তবতাকে অভিব্যঞ্জিত করেছে। চিরায়ত বাংলার মানুষ ও প্রকৃতি নদীর মতো। বাঙালি জাতির রয়েছে গভীর মর্মস্পর্শী এক ভাষা, আছে রক্ত দিয়ে লেখা এক গৌরবদীপ্ত ইতিহাস। নদীর মতো বহমান বাঙালির আছে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বহুমুখী শিল্প-সংস্কৃতিজারিত বহমান প্রাণশক্তি। অনন্তকালের শান্ত নির্মল সুন্দর এই ধারাকে নিয়ে যদি কোনো হানাদার হাঙর ধ্বংসের উল্লাসে মেতে ওঠে, তবে তাদের প্রতিহত করতে বাঙালি সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মানবিক চেতনায় উজ্জীবিত জনতার ঐক্যই হয়ে ওঠে মুক্তিকামী মানুষের হাতের বিধ্বংসী গ্রেনেড। এভাবেই শব্দের সঙ্গে শব্দের মেলবন্ধনে ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন গড়ে তুলেছেন বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক এক প্রেক্ষাপট। *হাঙর নদী গ্রেনেড* উপন্যাসে হলদি গ্রামের বুড়ির মতো সাধারণ নারীদের আত্মত্যাগ ও মুক্তির দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে সমস্ত ভূখণ্ডের মুক্তিকামী মানুষের আত্মত্যাগের গল্পই উপস্থাপিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের এক প্রত্যন্ত জনপদের জীবনচিত্র এবং তাদের চেতনার সম্মিলিত জাগরণ *হাঙর নদী গ্রেনেড* উপন্যাসের মূল উপজীব্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন যশোরের কালীগঞ্জ গ্রামের এক মায়ের আত্মত্যাগের সত্য ঘটনা অবলম্বনে

সেলিনা হোসেন এ উপন্যাসটি রচনা করেন। ১৯৭২ সালে সমকালীন একটি পত্রিকায় ঘটনাটি গল্পাকারে ছাপানো হয়। পরে ১৯৭৪ সালে গল্পটিকে উপন্যাসে রূপান্তর করে ১৯৭৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। *হাঙর নদী গ্রেনেড* মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সন্তানহারা মায়ের আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত এক সৃষ্টিকর্ম। এ উপন্যাসে চিরায়ত বাংলার গ্রামীণ পরিবেশ যেমন উঠে এসেছে, তেমনি উঠে এসেছে স্বাধীন দেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য লোকায়ত সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগের চালচিত্র। এই উপন্যাস পড়ে বরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। ঔপন্যাসিককে চিঠি দিয়ে তিনি উপন্যাস অবলম্বনে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করে উঠতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের প্রখ্যাত চলচ্চিত্রনির্মাতা চাষী নজরুল ইসলাম যথাযথ নান্দনিক দর্শনে উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দিয়েছিলেন।

সেলিনা হোসেনের *হাঙর নদী গ্রেনেড* যুদ্ধকালীন গ্রামবাংলার আবেগী চিত্ররূপ। হলদি গ্রামের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসের কালসীমা সাতচল্লিশের দেশভাগ পরবর্তী সময় থেকে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। উপন্যাসটিতে সুবিপুল পরিসরে পটভূমি বিবৃত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ এসেছে। *হাঙর নদী গ্রেনেড*-এর কাহিনি-বিন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে গ্রামীণ জীবনযাত্রা, নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আগ্রাসন, নারী নির্যাতন, রাজাকার বাহিনীর তৎপরতা, গ্রামীণ নর-নারীর আত্মসুখ পরিত্যাগ করে স্বাধীনতা অর্জনের আশায় আত্মত্যাগের কাহিনি। উপন্যাসটির পটভূমি রচিত হয়েছে বাংলাদেশের একটি অখ্যাত গ্রাম হলদি গাঁ-এর প্রতিবেশে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'বুড়ি' এ গ্রামেরই এক স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান। বারো ভাইবোনের মধ্যে বুড়ি সর্বকনিষ্ঠ। শৈশব থেকে অফুরন্ত দুরন্তপনায় বেড়ে ওঠে সে। গতানুগতিক জীবন যাপন করেও সে সবার থেকে আলাদা চিন্তা করে। 'বুড়ি' নামটি তার অপছন্দ, তারপরেও এই নাম নিয়েই তাকে জীবন কাটাতে হয়। লেখকের বর্ণনায়: 'ঘন সবুজ কচুপাতার মতো বুড়ি মন। সে পাতায় জলে দাগ পড়ে ন। হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি ওকে আক্রান্ত করে না, বুড়ি নির্বিবাদে সে বেড়ি পেরিয়ে আসে।'[১] বুড়ির জীবনে অকস্মাৎ ছন্দপতন ঘটে। তার পিতার মৃত্যুতে বড়ো ভাইবোনেরা নানা রকম দায়িত্বে জড়িয়ে পড়ে। বুড়িকে বিয়ে দেয়া হয় তারই চাচাত ভাই বিপত্নীক গফুরের সঙ্গে। গফুরের ছয় এবং চার বছরের দুই ছেলে সলীম ও কলীম বিবাহসূত্রে বুড়ির ছেলের মর্যাদা পায়। সলীম-কলীমের সঙ্গে বুড়ির মাতৃত্বের সম্পর্ক ঘনীভূত হলেও বিয়ের চার বছর পর বুড়ির সন্তানাকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। সে নিজ শরীরে মাতৃত্বের স্বাদ অনুভব করতে চায়। এ জন্য হলদি গাঁ থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে শ্রীনাইল গ্রামের পৌষমেলায় কেশা বাবার কাছে গিয়ে মানত করে। বিয়ের প্রায় আট বছরের মাথায় বুড়ি সন্তানের জন্ম দেয়। বয়স বাড়ার

সাথে সাথে সবাই বুঝতে পারে বুড়ির সন্তান রইস আর দশটা ছেলের মতো স্বাভাবিক নয়; সে শ্রবণ ও বাকপ্রতিবন্ধী। রইসের জন্য বুড়ির দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না, তবুও রইসকে বুকে আঁকড়ে দিল কাটায় বুড়ি। গফুরের মৃত্যুতে আরেক দফা ভেঙে পড়ে সে। সলীমের বিয়ে দেয়। ছেলে-বউ রমিজা ছিল বেশ হাসিখুশি ও প্রাণবন্ত।

১৯৭১ সালের মার্চ মাস। দেশব্যাপী তখন চলছে অসহযোগ ও স্বাধীনতার আন্দোলন। এই আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে হলদি গাঁয়ের শান্ত জনপদেও। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পালাবদল ঘটতে থাকে। বুড়ির সৎ ছেলে সলীমের মুখ দিয়ে দেশে যে কিছু ঘটছে, সেই পরিস্থিতির আভাস দেন লেখক। সারাদিন চারিদিকের ফিসফিসানিতে বুড়ির মনে নতুন উপলব্ধি জাগ্রত হয়। বুড়ি ভাবনাকে লেখক উপস্থাপন করেন এভাবে:

> সূচালো হয়ে ওঠে বুড়ির ভাবনা। খরা বা বন্যার মতো এ ঘটনা নয়। পুড়িয়ে বা ভাসিয়ে দিয়ে যয়ি না প্রকৃতি। এর সঙ্গে মানুষের যোগ আছে। সে জন্যে সলীম কলীম ভাবনায় পড়ে, তৈরি হয়। প্রস্তুতি নেয়। বুড়ির সামনে সমস্যার নতুন দিগন্ত-দুয়ার খুলে যায়। সেটা ওর মগজে ঘুরপাক খায়।... বুড়ি হলদি গাঁয়ে ঘুড়ে বেড়ায়। অনুভব করে হলদি গাঁয়ের চিরকালীন শান্ত সংযত কর্মপ্রবাহে জোয়ার এসেছে। মুখ বুঁজে সয়ে যাওয়া, ঘা খেয়ে মাথা নোয়ানো মানুষগুলোর কণ্ঠে এখন ভিন্ন সুর। চোয়ালে ভিন্ন আদলের ভঙ্গি।[২]

হাঙর নদী গ্রেনেড উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বুড়ির কাছে হলদি গ্রামই দেশ। বুড়ি অনুভব করতে পারে হলদি গাঁয়ের চিরকালীন শান্ত ও সংযত কর্মপ্রবাহে পরিবর্তন এসেছে। বাইশে ফাল্গুনে রেডিওতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা শোনে সে। মাটি, মানুষ, প্রকৃতির কথা শুনতে শুনতে বুড়ির রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। চৈত্র মাসের দশ তারিখে ট্রানজিস্টারে খবর আসে সেনাবাহিনী নেমেছে ঢাকার রাস্তায়। তারা অগণিত মানুষকে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে হত্যা করছে। উদ্বেগ ও উত্তেজনায় বুড়ির ইচ্ছে করে 'জয় বাংলা' বলে হাঁক দিয়ে গ্রামকে মাতিয়ে তোলে। সলীম-কলীম ও গ্রামের অন্যদের মতো সে আমৃত্যু লড়াইয়ের প্রদীপ্ত শপথ করে। বুড়ির বাল্যসাথী জলিল পঁচিশে মার্চের কালরাত্রির নৃশংসতায় সব হারিয়ে ঢাকা থেকে গ্রামে ফেরে। স্ত্রী ও দুই কন্যাকে হারিয়ে নিঃস্ব জলিলের বর্ণনায় যুদ্ধের নির্মমতা সম্পর্কে বুড়ি অবগত হয়:

> বুড়িকে দেখে জলিলের আবেগ কেঁপে ওঠে। স্খলিত কণ্ঠে এলোমেলো কথা বলে।
>
> সব মানুষ যখন ঘুমিয়ে রাতের আঁধারে পাকিস্তানি সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়লো। আগুন। গুলি। দাউদাউ করে জ্বলে চারদিকে। মানুষ চিল্লায়। আমি বাড়ি ছিলাম না। গিয়েছিলাম নারায়ণগঞ্জ। বাবুবাজার বস্তি পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও পুড়ে মড়লো। সব আমারে বলল পাশের ঘরের তাহের। ওরও কেউ বাঁচেনি। ও একলা পালিয়েছে।[৩]

হলদি গাঁয়ের অন্যান্যদের সাথে সলীম ও জলিল মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে সীমান্ত পাড়ি দেয়। বুড়ি পুত্রবধূ, নাতি, কলীম এবং রইসকে নিয়ে গ্রামে থাকে। এক সময় সেনাবাহিনী গ্রামে আসে, শান্তি কমিটির নামে রাজাকার বাহিনী সন্ত্রাস চালিয়ে যায়। কলীম রাজাকার বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে মৃত্যুবরণ করে। ফুলি ধর্ষিত হয়, বুড়ি পুত্রবধূকে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। স্বাধীনতার আকুল আগ্রহে দিন গুণতে থাকে বুড়ি:

> বুড়ি দেখে কলীমের দেহ থেকে রক্তের স্রোতে নেমেছে। গুচ্ছ গুচ্ছ শিমুল ফুলের মতো লাল। ঐ শিমুল থেকে বীজ হবে। বীজ হয়ে ফাটবে। বাতাসে উড়ে বেড়াবে সাদা ধবধবে উজ্জ্বল তুলো। বুড়ির মনে হয় সমগ্র হলদি গাঁটা গুচ্ছ গুচ্ছ শিমুল হয়ে গেছে। ঐ শিমুলের সাঁকো পেরিয়েই হলদি গাঁ একমুঠো উজ্জ্বল তুলো হয়ে যাবে। আচমকা বুড়ির মনে হয় সলীমরা এ কথাই তো বলত। হলদি গাঁয়ের লোকগুলোর চোখেমুখে এ স্বপ্নই তো ভাসত। হ্যা স্পষ্ট মনে পড়ছে, যে শব্দটা ওরা সারাদিন বলাবলি করত, তা ছিল স্বাধীনতা।[৪]

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোর মতো হলদি গ্রামবাসী যুদ্ধাশ্রিত আগুনময় প্রবাহে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। গ্রামে ঢুকে হানাদার বাহিনীকে পথঘাট চিনিয়ে দেয় মনসুরের মতো কুলাঙ্গার রাজাকারেরা। সমান তালে চলে হত্যা-ধর্ষণ-লুটতরাজ। রমিজারা প্রাণপণে পালিয়ে তাদের সম্ভ্রম বাঁচানোর চেষ্টা করে। ‘অস্তিত্ব যখন বিপন্ন, যুদ্ধ নাড়িয়ে দিয়েছে তাদের চিরচেনা পরিবেশ। প্রতিবেশী, এককালের চিরচেনা মানুষের চেহারা বদলে গিয়ে রূপ নিয়েছে অচেনা মানুষের।’[৫] ঔপন্যাসিক নির্মোহভাবে ভয়ঙ্কর সব অমানবিক দৃশ্যের বর্ণনা দেন। কলীমের মৃত্যুর সমান্তরালে হলদি গাঁয়েরই এক নারী শামুর সন্তান হারানোর একটি করুণ ঘটনা উল্লেখ করেছেন লেখক। পাকিস্তানি সৈন্যদের আক্রমণের ভয়ে গ্রামের সব মেয়েরা পাটক্ষেতের একবুক পানি মধ্যে লুকিয়ে ছিল। কোলের ছেলে কেঁদে উঠলে রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কের ঘোরে নিজের সন্তানকে পানির নিচে চেপে ধরে শামু। মায়ের হাতে সন্তানের অপমৃত্যুর এই বর্ণনাও বাদ যায় না উপন্যাসে। অবুঝ শিশুর একটা বেহিসেবি চিৎকার যদি সর্বনাশ ঘটিয়ে দেয়, তখন-

> কোলের ছেলেটা কেঁদে উঠতেই শামুর মা ওকে পানির তলে চেপে ধরে। কোন কিছু ভাববার সময় ছিল না তখন। মিলিটারি চলে গেলে ওরা সবাই উঠে এল। শামুর মা’র বুকে তখন ছেলে মরে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বাড়ি ফেরার অর্ধেক পথ এলে শামুর মা টের পায়। তবে এত তটস্থ ছিল যে বুঝতেই পারেনি। কোল বদল করার সময়ই টের পায় যে ছেলেটা নড়ছে না। ভয়ে শামুর মা চিৎকার করেও কাঁদতে পারেনি। অসাড় হয়ে গিয়েছিল অনুভূতি। বোবার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিল।[৬]

এই দৃশ্যের বর্ণনা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক। অকল্পনীয় এই দৃশ্য ঔপন্যাসিকের পক্ষে কল্পনা করাও দুরূহ। সাধারণ মানুষ সবাই যার যার জায়গায় থেকে *হাঙর নদী গ্রেনেড*-এর জীবন-মিছিলে শামিল। সেই জীবন পরাজয়ে শেষ হলেও, পরাজয়ে লীল

হয় না, উত্থানের ইঙ্গিতই তাতে মুখ্যতা পায়।’[৭] এভাবে সর্বংসহা নারীসত্তার সংগ্রামের মধ্যে বাংলাদেশের সংগ্রামশীল অস্তিত্বের শাশ্বত চেতনাই উদ্ভাসিত হয়। বস্তুত হলদি গাঁয়ের এই চিত্রগুলো সেই সময়ের সমগ্র বাংলাদেশের চিত্র। মুক্তিযুদ্ধকালীন অবরুদ্ধ নয় মাস সমগ্র বাংলাদেশেই এরূপ বিভীষিকাময় পরিস্থিতি বিরাজ করেছিল। যুদ্ধকালীন গ্রামীণ জীবনের আরেকটি বাস্তব চিত্র পাই উপন্যাসে:

> গ্রামের অবস্থা দিনদিনই খারাপ হতে থাকে। ওরা একটা নারকীয় উৎসবে মেতে উঠেছে। সামান্য ছুতো ধরে গুলি করে। ঘরে আগুন দেয়। লাশ টেনে আধাআধি মাটি চাপা দেয়। শকুন ভীড় জমায়। শিয়াল টেনে বের করে সে সব লাশ। গ্রামের লোক ভয়ে সেদিকে যেতে সাহস পায় না। কদিন পর মাথার খুলি গড়ায় মাঠে। হাড্ডি জেগে থাকে মাটির ফাঁকে। কখনো মেশিনগানের ব্রাশফায়ারের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় ওদের। বিছানায় উঠে বসে থাকে। বাকি রাতটুকু কেউ ঘুমাতে পারে না। কখনো কখনো রাতের অন্ধকারে ওদের দু’তিন জন মেয়ে খুঁজতে আসে। ঘর থেকে টেনে বের করে নিয়ে চলে যায়। সেসব মেয়েরা আর ফিরে আসে না।... দিনের বেলায় গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী নিয়ে যায়। জবাই দিয়ে ক্যাম্পে উৎসব হয়।[৮]

যুদ্ধকালীন বাস্তবতা ও পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞের নিখুঁত বাস্তবচিত্র এভাবেই অঙ্কন করেন লেখক। ‘গ্রামীণ জীবন কাঠামো, যুদ্ধের অভিঘাতে তার রূপান্তর, চরিত্রসমূহের বাস্তবানুগ ক্রিয়াশীলতা এবং সর্বোপরি বুড়ির আত্ম-উজ্জীবন এ উপন্যাসের জীবনদর্শনকে করেছে সমগ্রতাস্পর্শী।’[৯] যুদ্ধের ভয়বহ বাস্তবতার নিরিখে হলদি গ্রামই যেন হয়ে ওঠে হানাদার কবলিত দুঃখিনী বাংলার যথার্থ প্রতিভূপীঠ।

স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণতা দিতে বুড়ির সই নমিতা বৈরাগিনীর ‘মনের মানুষ’ অখিল বাউলকে দেশের জন্য গান বাঁধার অপরাধে প্রাণ দিতে হয়। পুড়িয়ে ফেলা হয় তাদের বৈরাগ্য সাধনের আখড়া। হলদি গাঁ শত্রুমুক্ত করার প্রত্যয়ে একবার হাফিজ-কাদেররা শত্রু শিবিরে আক্রমণ চালায়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি মুক্তিবাহিনীর অনুকূল না থাকায় হাফিজ ও কাদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসে। গ্রামের কোথাও আশ্রয়ের নিশ্চয়তা না পেয়ে তারা বুড়ির ঘরে আশ্রয় নেয়। পেছনেই সার্চলাইটসহ শত্রুপক্ষ ধাওয়া করে বুড়ির বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ায়। নিরুপায় বুড়ি হাফিজ ও কাদেরকে বাঁচাতে তার বুকের মানিক, নাড়িছেঁড়া ধন বোবা ছেলে রইসের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে সেনাবাহিনীর সামনে উপস্থিত করে। এতে হানাদারদের উল্লাসের অন্ত থাকে না। তারা সোল্লাসে কলীমের লাগানো জামরুল গাছের তলে রইসকে গুলী করে হত্যা করে। বুড়ি তখন শুধু রইসের মা নয়, হাজারো মুক্তিযোদ্ধার মায়ে পরিণত হয়। সে কাদের-হাফিজ সম্পর্কে নানারকম চিন্তা করে এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হয়:

> আরো দুটো প্রাণ ওর হাতের মুঠোয়। ও ইচ্ছে করলেই এখন সে প্রাণ দুটো উপেক্ষা করতে পারে না। বুড়ির সে অধিকার নেই। ওরা এখন হাজার হাজার

> কলীমের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছে। ওরা হলদি গাঁ-র স্বাধীনতার জন্যে নিজের জীবনকে উপেক্ষা করে লড়ছে। ওরা আচমকা ফেটে যাওয়া শিমুলের ধবধবে তুলো। বুড়ি এখন ইচ্ছে করলেই রইসের মা হতে পারে না। বুড়ি এখন শুধুমাত্র রইসের একলার মা নয়।[১০]

রইসের মৃত্যুতে বুড়ি বিচলিত হয় না। সে ঠিকই অনুভব করে যেন তার কলজেটাকে খাবলে ফেলেছে সেনাবাহিনী। তারপরও সে হলদী গাঁ-র স্বাধীনতার জন্য ব্যক্তি স্বার্থে সীমাবদ্ধ না থেকে সমষ্টির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে। হলদি গাঁর স্বাধীনতা বুড়ির কাছে তার নাড়িছেঁড়া ধনের মতোই। তাই একটি নির্মল ভোরের খোঁজে, কলীমের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে, হলদি গাঁকে শত্রুমুক্ত করার জন্যে বুড়ি তার আরেক নাড়িছেঁড়া সন্তানকে বিসর্জন দিয়েছে।

বুড়ির এ আত্মত্যাগ বাঙালির জাতীয় চৈতন্যের জাগরণকে উন্মোচিত করে। এক সময় হলদি গাঁর শান্তি কমিটির কিছু সমর্থক আর মনসুর মেম্বার ছাড়া সকল শ্রেণির মানুষই শত্রু হননে এগিয়ে আসে। বাংলাদেশ রূপী হলদি গাঁর মানুষ এবং বুড়ি আত্মত্যাগে মহিয়ান হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা অর্জনের প্রত্যয়ে বুড়ির এই আত্মত্যাগ তাকে আত্মবোধনের পথে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য যথার্থই:

> উপন্যাসের নায়ক বুড়ি মুক্তিযুদ্ধে উৎসর্গ করেছে প্রাণ-প্রতিম সন্তানকে এবং এভাবেই সে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে পৌঁছে গেছে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের রক্তিম স্রোতে। হলদী গাঁয়ের নিস্তরঙ্গ জীবনধারায় বেড়ে ওঠা বুড়ি মুক্তিযুদ্ধের রক্তস্রোতে অবগাহন করে হয়ে ওঠে সূর্যপ্রতিম। বুড়ির অপর নাম মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও যে হাজার-লক্ষ সন্তানহারা গর্বিতা মাতৃভূমির শাশ্বত শিল্প-প্রতিমা।[১১]

হাঙর নদী গ্রেনেড উপন্যাসে ঔপন্যাসিক স্বাধীনতার চরম প্রাপ্তির বার্তা পরিবেশন করেননি, তবে তা ইঙ্গিতবাহী রূপে প্রকাশমান। প্রকৃতপক্ষে সেলিনা হোসেন এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের তীক্ষ্ণ আবেগ, যুদ্ধদিনের স্বচ্ছ ছবি এবং ত্যাগের মহিমা একই চরিত্রের অনন্ত সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। মুক্তিযুদ্ধে বুড়ির আত্মত্যাগ মূলত বাঙালির জাতীয় চৈতন্যের জাগরণের প্রতীক। উপন্যাসে চিত্রিত হলদি গ্রামের মানুষের লড়াই, একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াই। উপন্যাসটির সমস্ত অঙ্গে পরিস্ফুট হয়েছে একাত্তরে গ্রামীণ জীবনের আলোড়ন ও অন্তর্ঘাতের চিত্র। বিষয় পরিকল্পনা, চরিত্রায়ন ও আঙ্গিক পরিচর্যার কৃতিত্বে সেলিনা হোসেনের *হাঙর নদী গ্রেনেড* উপন্যাসটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি অনন্য দলিলে পরিণত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির গৌরবদীপ্ত জাতীয় জাগরণের অনন্য অধ্যায়। সেলিনা হোসেন বাঙালি জাতিসত্তার সেই জাগরণের ইতিহাসকে অপূর্ব কুশলতায় মূর্ত করে তুলেছেন *হাঙর নদী গ্রেনেড* উপন্যাসে। প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এই উপন্যাসের কাহিনি হলদি গাঁয়ের মানুষের মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্ততা, মায়েদের আত্মত্যাগ, জনসাধারণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার

তীব্রতায় আবর্তিত হয়েছে। এই উপন্যাসের প্রধান শক্তি বুড়ির মাতৃত্ব- যা দেশপ্রেমের কাছে পরাজিত হয়। মাতৃত্বকে অতিক্রম করে বুড়ি নিজের নাড়িছেঁড়া বোবা সন্তানকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে তুলে দেয় মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচানোর জন্য। আত্মত্যাগের মাহাত্ম্যে বুড়ি হয়ে ওঠে হলদি গাঁয়ের সবার মা; সকল মুক্তিযোদ্ধার শহীদ জননী- স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্য সংগ্রামরত জনতার অবাধ আশ্রয়স্থল। *হাঙর নদী গ্রেনেড* উপন্যাসের বুড়ি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় কত আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতা। হলদি গাঁয়ে বুড়ির পরিবারসহ সাধারণ অধিবাসীদের স্বাধীন দেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য যে প্রত্যয়, তাতে করে গ্রামটিই হয়ে ওঠে স্বাধীনতোন্মুখ অদম্য বাংলাদেশ।

তথ্যসূত্র:

১. সেলিনা হোসেন, *হাঙর নদী গ্রেনেড,* অনন্যা, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৮
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
৫. মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের উপন্যাস,* জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পু. ৬৭
৬. সেলিনা হোসেন, *হাঙর নদী গ্রেনেড,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০
৭. মহীবুল আজিজ, '*হাঙর নদী গ্রেনেড* : যুদ্ধদীর্ণ দিন', *গল্পকথা* বর্ষ ৫ সংখ্যা ৬ (সম্পাদক: চন্দন আনোয়ার), রাজশাহী, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৮৫
৮. সেলিনা হোসেন, *হাঙর নদী গ্রেনেড,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১
৯. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৩১৯
১০. সেলিনা হোসেন, *হাঙর নদী গ্রেনেড,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১
১১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য,* আজকাল, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩৩৬

ঔপনিবেশিক বাংলায় পিকনিক : একটি অচর্চিত সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনুসন্ধান

সুমন মুখার্জী
সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ব্রিটিশ ভারতে ঔপনিবেশিক সমৃদ্ধির ছবি আঁকতে পিকনিকের প্রসঙ্গ অবধারিত। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হিসেবে কলকাতায় ও সারা বাংলায় পিকনিক-সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি। এ শহরের বাবুদের চিনে নেওয়ার অন্যতম লক্ষণ ছিল 'অষ্টাহে বনভোজন'। অবশ্য সেই উদ্যোগের পুরোটাই ছিল বাবুদের লোক-দেখানোর চাল। পিকনিক শব্দটিকে বাংলায় বনভোজন, চড়িভাতি, চড়ুইভাতি, পৌষালি ইত্যাদি নানা নামে ডাকা হয়। তবে বাংলায় প্রতিটি শব্দের ব্যঞ্জনা ভিন্ন ভিন্ন।এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হল-ভারতে পিকনিক সংস্কৃতির সূচনা কীভাবে হয়? বাংলায় পিকনিক কীভাবে চড়ুইভাতি বা বনভোজন এর নামে পরিচিতি লাভ করে? ব্রিটিশ সংস্কৃতি ও বাঙালি সংস্কৃতির মেলবন্ধন কীভাবে পিকনিকের মধ্যে ঘটেছে? বাংলা সাহিত্যে পিকনিক কীভাবে ধরা পড়েছে?-এই সকল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রয়াস থাকবে এই প্রবন্ধে।

সূচক শব্দ: ব্রিটিশ; ঔপনিবেশিক; কলকাতা; পিকনিক; বনভোজন; চড়ুইভাতি; বাবু।

মহারানি ভিক্টোরিয়ার আমল থেকেই পিকনিকের সর্বজনীন চেহারা দেখা গেলেও, ধারণাটা প্রচলিত ছিল বহু দেশে। শুধু ব্রিটিশ গ্রীষ্মের সুন্দর আবহাওয়াতেই পিকনিকের জনপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ রইল না। ভারত-সহ যে দেশেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার হল, সেখানেই ছড়াল পিকনিক সংস্কৃতি। ব্রিটিশ ভারতে ঔপনিবেশিক সমৃদ্ধির ছবি আঁকতে পিকনিকের প্রসঙ্গ অবধারিত। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হিসেবে কলকাতায় ও সারা বাংলায় পিকনিক-সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি। এ শহরের বাবুদের চিনে নেওয়ার অন্যতম লক্ষণ ছিল 'অষ্টাহে বনভোজন'। অবশ্য সেই উদ্যোগের পুরোটাই ছিল বাবুদের লোক-দেখানোর চাল। পিকনিক শব্দটিকে বাংলায় বনভোজন, চড়িভাতি, চড়ুইভাতি, পৌষালি ইত্যাদি নানা নামে ডাকা হয়। তবে বাংলায় প্রতিটি শব্দের ব্যঞ্জনা ভিন্ন ভিন্ন। বনভোজনের আক্ষরিক মানে কিন্তু বনে ভোজন, আবার রবীন্দ্রনাথের 'চড়িভাতি' কবিতায় পাওয়া যায়— "একটি দিনের মুছল স্মৃতি, ঘুচল চড়িভাতি,/ পোড়াকাঠের ছাই পড়ে রয়, নামে আঁধার রাতি।"আমাদের দেশে চড়ুইভাতি কবে শুরু হয়েছে তার কোনও ইতিহাস পাওয়া যায় না। পরম্পরা এবং পুরাণ থেকে কিছু তথ্য

পাওয়া যায়, তবে সে সবের ঐতিহাসিক ভিত্তি বেশ দুর্বল। অনেকে মনে করেন, ইংরেজরা ভারতে আসার পর থেকে যথার্থ অর্থে পিকনিক বা বনভোজন শুরু হয়। নবাব-মহারাজাদের পিকনিক অবশ্য অন্য ধাঁচের ছিল। কলকাতার গার্ডেনরিচ অঞ্চলে জোরদার বনভোজন হত। আবার পিকনিক গার্ডেন কিংবা দমদমের পিকনিকও সুবিদিত। ১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "দমদমের বাগানে চড়িভাতি করিয়া আসা যাক।" গার্ডেনরিচ, আরও নির্দিষ্ট করে বললে মেটিয়াবুরুজে একটা সময় বাঙালিবাবুরা পিকনিক করতে যেতেন। এই অঞ্চল ছিল অভিজাতদের বাগানবাড়িতে পূর্ণ। গভর্নর জেনারেল বা বড় লাটের বাগানবাড়ি থেকে বর্ধমানের ক্ষত্র রাজা মহাতব চাঁদের প্রমোদ উদ্যান ছিল এই অঞ্চলে। পরে অবশ্য সে সবের পরিবর্তন হতে থাকে। যে বছর ওয়াজিদ আলি শাহ ইন্তেকাল করলেন তারপর থেকে এই তল্লাটে ফিস্টের আয়োজন দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। অভিজাত বাঙালিবাবু, গোরা সাহেব আর কিছু নাবিক মিলে সেই সব পিকনিক শেষমেশ মোচ্ছবের আকার ধারণ করত। মদ, মাংস আর মেয়েমানুষ নিয়ে গঙ্গার ধারে বাগানবাড়িতে চলত সারা দিন ধরে হুল্লোড়। কখনও গজ়ল, কখনও বা ইউরোপীয় সঙ্গীত সেই আসরে মূর্চ্ছনা তুলত। সাহেবদের পিকনিক আর বাঙালির সাবেক বনভোজনের মধ্যে আর একটি ফারাক চোখে পড়ে। সাহেবি পিকনিকের মূল আয়োজনটাই 'অফ-সাইট', বাড়ি থেকে রেঁধে নিয়ে যাওয়া। ছোট স্টোভে চা তৈরি, বা শাফিং ডিশ-এর (বুফেতে পরিবেশনের সময় খাবারের নীচে অল্প আগুন জ্বলার পাত্র) সাহায্যে খুব সামান্য কিছু রান্না করা হয় পিকনিকের জায়গায়। রান্নার পরিবর্তে পিকনিকের সময়টা তাঁরা কাটান খেলাধুলায়, সামাজিকতায় বা প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করে। অন্য দিকে বাঙ্গালির পিকনিকের আয়োজনে রান্না করাটাই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে রাখে। এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হল-ভারতে পিকনিক সংস্কৃতির সূচনা কীভাবে হয়? বাংলায় পিকনিক কীভাবে চড়ুইভাতি বা বনভোজন এর নামে পরিচিতি লাভ করে? ব্রিটিশ সংস্কৃতি ও বাঙালি সংস্কৃতির মেলবন্ধন কীভাবে পিকনিকের মধ্যে ঘটেছে? বাংলা সাহিত্যে পিকনিক কীভাবে ধরা পড়েছে?-এই সকল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রয়াস থাকবে এই প্রবন্ধে।

প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে উন্মুক্ত স্থানে পান-ভোজনের আয়োজনও যেন জড়িয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ডে রোম্যান্টিক আন্দোলনের সঙ্গে। এই পথ ধরেই উনিশ শতকে, বিশেষ করে ভিক্টোরিয়ান যুগে ব্রিটিশ সংস্কৃতির একটি বিশেষ চিহ্ন হয়ে উঠল এই খোলা জায়গায় খাওয়াদাওয়ার আয়োজন, যার নাম পিকনিক। মহারানি ভিক্টোরিয়ার আমল থেকেই পিকনিকের এই সর্বজনীন চেহারা দেখা গেলেও, ধারণাটা প্রচলিত ছিল বহু দেশে। তবে তা নির্দিষ্ট আকার নিতে শুরু করে আঠারো-উনিশ শতক থেকেই। ভিক্টোরিয়ান ব্রিটেনে পিকনিক ছিল সামন্ত প্রভুদের এস্টেটের আউটডোরে খাওয়া-দাওয়ার অলস অবসর। পরে মধ্যবিত্তের জীবনে আসে পিকনিক অবকাশ। ইনডোরের বদলে আউটডোরে পিকনিক হয়ে ওঠে জনপ্রিয়।[1]

আমাদের দেশে চড়ুইভাতি কবে শুরু হয়েছে তার কোনও ইতিহাস পাওয়া যায় না। পরম্পরা এবং পুরাণ থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায়, তবে সে সবের ঐতিহাসিক ভিত্তি বেশ দুর্বল। অনেকে মনে করেন, ইংরেজরা ভারতে আসার পর থেকে যথার্থ অর্থে পিকনিক বা বনভোজন শুরু হয়। কেউ কেউ বলেন, পিকনিক আসলে ফরাসিদের আবিষ্কার। টনি উইলিসের বইতে সপ্তদশ শতকে পিকনিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইংরেজি 'পিক' শব্দ এসেছে কথ্য 'পেক' শব্দ থেকে যার অর্থ খুঁটে খাওয়া। আর 'নিক'-এর মানে তুচ্ছ বা মূল্যহীন বস্তু। পিকনিকের বাংলা তাই চড়ুইভাতি। কিন্তু বনভোজন কেন? 'বন' এখানে বাহির। ঘরের খেয়ে বহু লোক যেমন বনের মোষ তাড়ায়, এখানে সেই রকম 'বন' শব্দের ব্যবহার। বাড়ির বাইরে গিয়ে খাওয়াদাওয়া, তবে তা রেস্তোরাঁয় হলে চলবে না। ইউরোপে সাধারণত পিকনিক হয় গ্রীষ্মকালে, প্রচণ্ড ঠান্ডায় পিকনিক হয় না। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে, বাংলায় বললে আরও যথার্থ হয়, বনভোজন বা চড়িভাতি হয় শীতকালে।[2]

শাব্দিক অর্থ বিশ্লেষণ ও রূপান্তর

'পিকনিক' একটি ফ্রেঞ্চ শব্দ। এর অর্থ প্রকৃতির কোলে বসে খাওয়া-দাওয়া আর হৈ হুল্লোড় করা। খাওয়া-দাওয়া বলতে রোজকার সাধারণ খাবারের পরিবর্তে একটু অন্য ধরনের খাওয়ার কথাই এখানে বিবেচ্য। নদী তীর, পার্ক, গ্রামের প্রান্তে একটুকরো ময়দান অথবা সবুজে ঘেরা বনভূমিই চড়ুইভাতি অথবা বনভোজনের আদর্শ জায়গা। 'চড়ুইভাতি'। আমরা অনেকেই এই নামটির সঙ্গে পরিচিত। আবার কেউ কেউ আছেন যারা এ শব্দটি সম্পর্কে জনেনই না। বন বাদাড়ে চড়ুই পাখিদের কিচিরমিচির ডাকের ছন্দে সংগৃহীত খাবার একসঙ্গে খাওয়া থেকে হয়তো চড়ুইভাতি শব্দের উৎপত্তি। শিশুদের সংগ্রহ করা চাল ডালে রাঁধা খাবার খাওয়াই হচ্ছে চড়ুইভাতি। আমাদের দেশে বা এই উপমহাদেশে কবে থেকে বনভোজন বা চড়ুইভাতি শুরু হলো তার ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে এটা ইংরেজরা আসার পরের ঘটনা বলেই অনুমান করা যায়। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার সংগৃহীত অভিধান *'শব্দার্থ প্রকাশিকা'* তে বনভোজন বা চড়ুইভাতি কোনটিরই উল্লেখ নেই। সুবল চন্দ্র মিত্রের *'সরল বাঙ্গালা অভিধান'* (১৯০৬)-এ চড়ুইভাতি এবং বনভোজন দুটি শব্দই আছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (১৯১৭)-এ চড়ুইভাতি শব্দটি আছে। এতে বনভোজন শব্দটি চড়ুইভাতির অর্থ হিসাবে আছে, আলাদা ভুক্তি হিসাবে নেই। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'বঙ্গীয় শব্দকোষ'* (১৯৩২)-এ দুটি শব্দই আছে। তিনটি অভিধানেই Picnic শব্দটি বনভোজনের অর্থ বা প্রতিশব্দ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বনভোজন ও চড়ুইভাতি শব্দ দুটি সংস্কৃত হতে এসেছে এটুকুই বলা হয়েছে, কিন্তু এর কোন ইতিহাস উল্লেখ করা হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে *'শব্দমঞ্জুরী'* নামে একটি অভিধানে শুধু 'অ' আদ্যক্ষরের শব্দ অন্তর্ভুক্ত করেন। এর পাশাপাশি *'শব্দসংগ্রহ'* (প্রকাশকাল উল্লেখ করা হয়নি) নামে একটি গ্রন্থে বাংলা শব্দের একটি তালিকা প্রণয়ন

করেন। এতে 'চড়ুইভাতি' শব্দটি অন্তর্ভুক্ত হলেও বনভোজন শব্দটি নেই। বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ 'চড়িভাতি' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছেন ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে (দমদমের বাগানে চড়িভাতি করিয়া আসা যাক)।এই চড়িভাতি বা চড়ুইভাতি আবার বনভোজন হয়ে যাচ্ছে কবি গোলাম মোস্তফার কবিতায়-

কেউ বা বসে হলদি বাটে কেউ বা রাঁধে ভাত,
কেউ বা বলে ধুত্তোরি ছাই পুড়েই গেল হাত।

বিদ্যাসাগর 'চড়ুইভাতি' ব্যবহার করেন ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে। 'বনভোজন' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে (আজ আমাদের বনভোজন)। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত *'বিশ্বকোষ'* সপ্তদশ ভাগে (১৯০৭) বনভোজনকে দেশান্তরের প্রথা বলে উল্লেখ করেন (ইংরেজিতে Pic-nic)। কিন্তু পাশাপাশি বলেছেন, 'আমাদের দেশেও বনভোজন শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রচলিত। বভোজন---পুণ্যাহ-বচন-প্রয়োগ এবং বনভোজন-বিধি গ্রন্থ পাঠ করিলে উহার বিশেষত্ব জানিতে পারা যায়।' এতে মনে হচ্ছে, বনভোজন একটি ধর্মীয় আচার হিসেবে এ উপমহাদেশে আগে থেকেই প্রচলিত ছিলো। এ প্রসঙ্গে তিনি ওলাবিবির পূজা দিয়ে বনভোজন করার প্রথা প্রচলিত আছে বলেও উল্লেখ করেছেন। ওলাবিবি কে? তিনি মুসলমানের ওলাবিবি হলেও হিন্দুর ওলাইচণ্ডী। ওলাবিবির আগমন ভাল কথা নয়। তিনি জনপদে প্রবেশ করলে কলেরা-ওলাওঠা হবেই। যে কোনও প্রকার মহামারীর জননী তিনি। তাই তাঁকে পুজো দিয়ে দূরে দূরে রাখতে হয়। ওলা বিবি, কোথাও বনবিবিকে খাবারের অগ্রভাগ উৎসর্গ করে গ্রামের লোক খাদ্যগ্রহণ করতেন। আজ থেকে ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে অবধি বাগানে কিংবা পুকুরের ধারে ওলাবিবিকে অর্চনা করে গোটা গ্রামের লোক বনভোজন সারতেন। এক থালা খেয়ে এবং এক থালা বাড়ি নিয়ে এসে সেই উদযাপন শেষ হত। খাবার নয়, তা ছিল প্রসাদ। সাধারণত পৌষমাসে ধান ওঠার পর এই পিকনিক হত।[3]

ভারতবর্ষে পিকনিকের ইতিহাস চর্চা

ভারতে পিকনিকের ইতিহাস বিষয়ে কিছু সামান্য কাজ হয়েছে। মারগারেট ম্যাকমিলান তাঁর *'উইমেন অব দ্য রাজ'* গ্রন্থে ব্রিটিশদের অবসর জীবনের অঙ্গ হিসেবে পিকনিকের ভূমিকার কথা তুলে ধরেছেন[4]। ইতিহাসবিদ মেগান ইলিয়াস তার ২০১৪ সালে লেখা *লাঞ্চ: আ হিস্ট্রি* বইয়ে লেখেন[5], 'ব্রিটিশরা ভারতে উপনিবেশ নিয়ে আসার সাথে তাদের বনভোজনও নিয়ে আসে।' তাদের ঝুড়িতে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় খাবার দুটো ধরণই থাকত: হ্যাম, নান বা পরোটা, স্ত্রিমরোল চিকেন (এ নামে ডাকা হতো কারণ হাড্ডি ছাড়ানো মুরগির মাংসকে আগে চ্যাপটা বানিয়ে তারপর ক্রিম মিশিয়ে ভাজা হতো), আলুর কাটলেট অথবা রিসোলস, সসেজ, মসলাদার গোশত, লেটুস এবং টমেটো। আর ফলের মধ্যে থাকত আলফাঙ্গো আম ও এদেশীয় জুজুবি (খেজুরজাতীয়)।

এই বনভোজনগুলোকে পুরোটা খাবারকেন্দ্রিক এক সাদাসিধে আয়োজন ভাবলে ভুল হবে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় জেনিফার ব্রেনান *কারিস অ্যান্ড বাগলস: আ মেমোয়ার অ্যান্ড কুকবুক অভ দ্য ব্রিটিশ রাজ* বইয়ে।[6] খাবার টেবিলগুলো ঢাকা থাকত ধবধবে সাদা স্নো হোয়াইট টেবলক্লথ দিয়ে, তার উপর সাজানো থাকত সিলভার কাটলারি, ক্রিস্টাল গ্লাস এবং হাত ধোয়ার জন্য ফিঙ্গার বোলস। আর সেই উর্দি-পরা ভৃত্যরা পরিবেশন করত কোল্ড শ্যাম্পেইন (লক্ষ্য ছিল সাহেবদের আভিজাত্য প্রদর্শন)।

স্কচ এগ, মাংসের পাই, ডান্ডি কেক, ভাপা পুডিং—এসব ছিল আদিতে পিকনিকে খাওয়ার পদ। ইংরেজদের উনিশ শতকীয় সিদ্ধীকা কবীর মিসেস বীটন লিখে গেছেন, পিকনিকে মূলত কেক, জ্যাম-পাফ, পটেড মিট, ফল আর মাখনমাখা টোস্ট—এসব চাই। তাঁর ১৮৬১ সালের বই *বুক অব হাউসহোল্ড ম্যানেজমেন্ট-এ তিনি* লিখলেন[7], ৪০ জনের পিকনিকে চাই চারটে মাংসের পাই, চারটে রোস্টেড চিকেন, দুটো হাঁসের রোস্ট, চার ডজন চিজকেক আর একখানা বড়সড় কোল্ড প্লাম পুডিং। লর্ড স্যান্ডউইচের বদৌলতে পাওয়া স্যান্ডউইচ এসে একসময় ঠাঁই নিল ভিক্টোরিয়ান পিকনিকের মেনুতে, প্রায় কাগজের মতো ফিনফিনে পাউরুটিতে শসার পুর বা ডিমের পুর দেওয়া স্যান্ডউইচ। ব্রিটিশরাজের আমলের পিকনিকে ইংরেজরা নিতেন বোতলের জল, মৌসুমের মিষ্টি ফল আর অবশ্যই কোল্ড মিট।

ঔপনিবেশিক বাংলায় পিকনিক

পিকনিক শব্দটিকে বাংলায় বনভোজন, চড়িভাতি, চড়ুইভাতি, পৌষালি ইত্যাদি নানা নামে ডাকা হয়। তবে বাংলায় প্রতিটি শব্দের ব্যঞ্জনা ভিন্ন ভিন্ন। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হিসেবে কলকাতায় ও সারা বাংলায় পিকনিক-সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি। এ শহরের বাবুদের চিনে নেওয়ার অন্যতম লক্ষণ ছিল ‘অষ্টাহে বনভোজন’। অবশ্য সেই উদ্যোগের পুরোটাই ছিল বাবুদের লোক-দেখানোর চাল। নবাব-মহারাজাদের পিকনিক অবশ্য অন্য ধাঁচের ছিল। কলকাতার গার্ডেনরিচ অঞ্চলে জোরদার বনভোজন হত। আবার পিকনিক গার্ডেন কিংবা দমদমের পিকনিকও সুবিদিত। ১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “দমদমের বাগানে চড়িভাতি করিয়া আসা যাক।” গার্ডেনরিচ, আরও নির্দিষ্ট করে বললে মেটিয়াবুরুজে একটা সময় বাঙালিবাবুরা পিকনিক করতে যেতেন। এই অঞ্চল ছিল অভিজাতদের বাগানবাড়িতে পূর্ণ। গভর্নর জেনারেল বা বড় লাটের বাগানবাড়ি থেকে বর্ধমানের ক্ষত্র রাজা মহাতব চাঁদের প্রমোদ উদ্যান ছিল এই অঞ্চলে। পরে অবশ্য সে সবের পরিবর্তন হতে থাকে। যে বছর ওয়াজিদ আলি শাহ ইন্তেকাল করলেন তারপর থেকে এই তল্লাটে ফিস্টের আয়োজন দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। অভিজাত বাঙালিবাবু, গোরা সাহেব আর কিছু নাবিক মিলে সেই সব পিকনিক শেষমেশ মোচ্ছবের আকার ধারণ করত। মদ, মাংস আর মেয়েমানুষ নিয়ে গঙ্গার ধারে বাগানবাড়িতে চলত সারা দিন ধরে হুল্লোড়। কখনও গজ়ল, কখনও বা ইউরোপীয় সঙ্গীত সেই আসরে মূর্চ্ছনা তুলত।[8]

এছাড়া শোভাবাজার রাজবাড়িতেও বসত আসর। তাকে অবশ্য পিকনিক না বলে গ্র্যান্ড ফিস্ট বলাই সঙ্গত। মেটিয়াবুরুজে ওয়াজিদ আলি শাহের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যেমন পিকনিক-উৎসব চালু হল, তার ঠিক একশো বছরেরও বেশি আগে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজের পতন ও তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শোভাবাজারে আরম্ভ হয়েছিল ইংরেজ সাহেব ও ব্রিটিশ রাজভক্ত বাঙালি বাবুদের পিকনিক। মেনু হিসাবে গোরু, শুয়োর, মদ্য সবকিছুই থাকত সেখানে।[9]

বিংশ শতকের মাঝামাঝি পৌঁছে বাঙালির পিকনিক দু'টি সমান্তরাল ধারায় বয়ে চলেছে। এক দিকে পরশুরামের *'কামরূপিণী'* গল্পের পিকনিক, অন্য দিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *'বনভোজনের ব্যাপার'*। পরশুরামের চরিত্ররা সমাজের উঁচুতলার মানুষ, অনুচরসহ বাড়িতে তৈরি কাটলেট ফ্রাই পাই চপ শি-ককাবাব নিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিকনিক করতে আসেন। অন্য দিকে টেনিদারা শ্যামবাজার থেকে মার্টিন রেলে উঠে বাগুইআটি থেকে আরও চারটে স্টেশন ছাড়িয়ে বনভোজনে যায়। মেনু খিচুড়ি, ডিমের ডালনা, পোনা মাছের কালিয়া। সবটাই নিজেদের রান্নার পরিকল্পনা। সঙ্গে রসগোল্লা লেডিকেনিও। চার জনে মোট দশ টাকা ছ'আনা চাঁদা উঠলে এর থেকে বেশি কিছু হয় না যে![10]

এই সমান্তরাল ধারাটা খুব ভাল ধরা পড়ে লীলা মজুমদার ও কমলা চট্টোপাধায়ের *'রান্নার বই'*-তে। সেখানে পিকনিকের একটি মেনু খাঁটি সাহেবি কায়দার, মুরগির রোস্ট, আলু রোস্ট, মটর সেদ্ধ, লাল করে ভাজা সেদ্ধ ডিম আর শসা টমেটো লেটুস স্যালাড-ভরা রোল। সঙ্গে মিষ্টি প্যাটি, অন্য কোনও মিষ্টি। বিকেলে খাবারের জন্য ফ্রুট কেক বা স্কচ শর্টব্রেড নেওয়ার পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে পরোটা নিমকি বা এলোঝেলোর কথা বলা হয়েছে। আর একটি মেনুতে সবই এদেশি খাবার। লুচি বা পরোটা, শুকনো আলুর দম বা আলু-পটল আলু-কপির চচ্চড়ি। সঙ্গে মাছের চপ ও মাংসের বড়া, পরিবর্তে শামি কাবাব। তৃতীয় বিকল্পটিতে বলা হয়েছে খিচুড়ি, বেগুনভাজা, আলুর দম ও টমেটোর চাটনির কথা।[11]

ঔপনিবেশিক কলকাতায় পিকনিক

ঔপনিবেশিক কলকাতার অতীতের পিকনিকের কথা বলি একটু, ক্লাব গুলোতে পিকনিক হতো। বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা দেখা যেত। পটলাক (potluck) পিকনিক ছিল খুবই জনপ্রিয়। ব্রিটিশ কলোনিয়ালিস্টদের (colonialists) জন্য "one of the chief forms of social activity"-অন্যতম প্রধান সামাজিক কার্যকলাপ। "the British took their willful picnicking with them when they colonized india,"- ব্রিটিশরা ভারতে উপনিবেশ গড়ার সময় থেকেই যেন নিজেদের পিকনিক করার হবিটা সাথে নিয়ে এসেছিল, এমনটাই লিখেছেন ইতিহাসবিদ মেগান এলিয়াস (Megan Elias) তার ২০১৪ সালে প্রকাশিত বই- *Lunch: A History* তে। তাদের পিকনিকের ঝুড়িতে বা বাস্কেটে (busket) থাকত ইউরোপীয় এবং ভারতীয় খাবারের

মিশ্রণ: ঠান্ডা হ্যাম (ham) ও টং (tongue), নান বা পরাঠা, স্টিমরোলার চিকেন (Steamroller Chicken) (মুরগির ফিললেটগুলিকে (fillet) টুকরো টুকরো করে ভাজবার আগে চ্যাপ্টা করে নেওয়া হতো), আলুর কাটলেট বা রিসোল (rissoles), সসেজ (sausages), মশলাদার গরুর বা শুয়োরের মাংসের একটা পদ, লেটুস এবং টমেটো দিয়ে স্যালাড, আলফোনসো আম, কখনও সখনও দেশী পদ্ধতিতে তৈরি কুলের টক ঝাল আচার, কিংবা গোটা কুলের মতো ফল খাদ্যতালিকায় থাকত।[12]

এই পিকনিক ছিল রীতিমতো এলিট শ্রেণীর ব্যাপার-স্যাপার। লেখিকা জেনিফার ব্রেনান (Jennifer Brennan) কারি (curry) এবং বাগলস (bugles)-এর মত স্নাক্স (snacks) এর বর্ণনা করেছেন। ব্রিটিশ রাজের সময়কার একটি স্মৃতিকথা এবং রান্নার বই-এর কথা বলেছেন। সেখানে বর্ণনা কিছুটা এরকম- "snow white tablecloths, silver cutlery, crystal glasses and finger bowls"-সাদা টেবিলক্লথ, সিলভার কাটলারি, ক্রিস্টাল গ্লাস এবং আঙুল ধোয়ার বাটি সহ শ্যাম্পেন পরিবেশনকারী পরিচারিকা-পরিচারক এই পিকনিকের সময় উপস্থিত থাকত। যদিও এই পিকনিক সজ্জা সাহেবদের একটা শো অফ মাত্র।[13]

চড়ুইভাতি ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বনভোজন নিয়ে কথার শেষ নেই। অনেকের মতে 'বনভোজনে'র সঙ্গে বাঙালিকে প্রথম পরিচিতি ঘটিয়েছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১১ সালে প্রকাশিত *'অচলায়তন,'* নাটকে কবিগুরু নতুন শব্দ তুলে ধরলেন- বনভোজন। চোখের বালি উপন্যাসে আশালতা আর বিনোদিনীর সেই শান্ত সুন্দর পিকনিকের বেলা হৃদয়ে গেঁথে যায়। রবীন্দ্রনাথের 'চড়িভাতি' কবিতায় পাওয়া যায়—"একটি দিনের মুছল স্মৃতি, ঘুচল চড়িভাতি,/পোড়াকাঠের ছাই পড়ে রয়, নামে আঁধার রাতি।" *'চোখের বালি'* উপন্যাসে বিশুদ্ধ বাঙালি বনভোজনের যে উদাহরণ রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, সেখানে দেখি সেই ছবি। গৃহ-সহায়করা জিনিসপত্র নিয়ে আসতে দেরি করছে, বিহারী কেরোসিন-চুলায় জল গরম করে সবার হাতে গরম চা আর মিষ্টান্ন ধরিয়ে দিল। তার পর বাক্স থেকে বেরোল সব সরঞ্জাম— চাল-ডাল, আনাজ, ছোট ছোট বোতলে পেষা মশলা। বিহারী ও বিনোদিনী রান্না শুরু করল।[14]

পরিশেষে বলা যায় যে, সাহেবদের পিকনিক আর বাঙালির সাবেক বনভোজনের মধ্যে আর একটি ফারাক চোখে পড়ে। সাহেবি পিকনিকের মূল আয়োজনটাই 'অফ-সাইট', বাড়ি থেকে রেঁধে নিয়ে যাওয়া। ছোট স্টোভে চা তৈরি, বা শাফিং ডিশ-এর (বুফেতে পরিবেশনের সময় খাবারের নীচে অল্প আগুন জ্বলার পাত্র) সাহায্যে খুব সামান্য কিছু রান্না করা হয় পিকনিকের জায়গায়। রান্নার পরিবর্তে পিকনিকের সময়টা তাঁরা কাটান খেলাধুলায়, সামাজিকতায় বা প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করে। সাহেবরা এদেশে রাজত্ব করতে এসে তাদের আমোদ-তালিকায় যুক্ত করেছিলেন 'পিকনিক'কে। এই পিকনিক ব্যাপারটিকে তাঁরা নানাভাবে উপভোগ

করতেন। এক, বাস্কেট ভর্তি খাবারদাবার নিয়ে কোনও পাহাড়তলি, জঙ্গলঘেঁষা জায়গায় গিয়ে খাওয়া, জিন-শেরি-শ্যাম্পেন পান, খেলা, শিকার ইত্যাদি তাঁদের তালিকায় থাকত। সঙ্গে গুচ্ছের হুকুমখাটা লোক। দ্বিতীয়টি, বাবুর্চিদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সেখানে নানা সাহেবি পদ রান্না করা। এই পিকনিক-কালচারটি তাঁরা নিজেদের দেশ থেকেই নিয়ে এসেছিলেন। এখানে একটু নব্য শিক্ষায় আলোকিত কেতার মানুষদের মধ্যে প্রথমটি ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। টিফিন কেরিয়ারে খাবার গুছিয়ে নিয়ে তাঁরা নিরিবিলি কোনও জায়গায় বা কারও বাগানবাড়িতে চলে যেতেন। রান্নার হ্যাপা তাঁরা নিতেন না, পরিবেশন করার লোকটিও উপস্থিত থাকতেন। এটি আসলে আউটিং। অন্য দিকে আমাদের পিকনিকের আয়োজনে রান্না করাটাই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে রাখে। বদলেছে বাঙালির খাদ্যাভ্যাস। খাবারে বেড়েছে মার্কিন ও পূর্ব এশীয় প্রভাব, নতুন চেহারায় হাজির হয়েছে মোগলাই নবাবি খানাও। এ কালের পিকনিকে তার খানিকটা প্রভাব তো পড়বেই। কিন্তু কিন্তু আজও নিজেরা রান্না করে খাওয়ার মধ্যেই একেবারে আটপৌরে সাধারণ পিকনিকের নির্মল আনন্দ খুঁজে পান অনেকে।

সূত্র নির্দেশ:

1) ‘The sumptuous tale of picnics’, retrieved from **https://www.innfinity.in/lifestyle/picnic-in-history/**, accessed on 18/02/2023.
2) ‘চড়ুইভাতির উৎসের খোঁজে’, retrieved from https://banglalive.com/the-history-and-myth-surrounding-the-concept-of-picnic/, December 22, 2020.
3) Bonito Sonador, ‘History of Picnics in India’, retrieved from https://www.pixstory.com/story/history-of-picnics-in-india/134083, accessed on 18/02/2023.
4) Margaret MacMillan, *Women of the Raj: The Mothers, Wives, and Daughters of the British Empire in India*, Random House Trade, New York, 2005.
5) Megan Elias, Lunch: A History (The Meals Series), Rowman & Littlefield, London, 2014.
6) Jennifer Brennan, Curries and Bugles: A Memoir and Cook Book of the British Raj, Penguin India, New Delhi, 2000.
7) Isabella Beeton, Mrs. Beeton's Book of Household Management, Empire Books, London, 2011 (Reprint, First Published in 1861)

8) **Kalpana Sunder**, 'Reviving the joy of the great Indian picnic', retrieved from https://lifestyle.livemint.com/news/big-story/reviving-the-joy-of-the-great-indian-picnic-111645462503929.html, accessed on 18/02/2023.
9) Priyadarshini Chatterjee, 'The history and diversity of picnic food in India, from the Mahabharata to the British Raj', retrieved from https://scroll.in/magazine/1031070/the-history-and-diversity-of-picnic-food-in-india-from-the-mahabharata-to-the-british-raj#:~:text=Vatsayana's%20Kamasutra%2C%20composed%20around%203rd,as%20a%20token%20of%20remembrance. 27 Aug, 2022.
10) **অমিতাভ পুরকায়স্থ**, '**দেশে বিদেশে বার বার বদলেছে বনভোজন**', retrieved from https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo/as-time-goes-the-concept-of-picnic-has-been-changed/cid/1396024, ১ জানুয়ারি২০২৩ ,
11) তিয়াসা গুপ্ত, **'মহাভারত থেকে ব্রিটিশ রাজ: ভারতবর্ষে বনভোজনের খাবারের ইতিহাস ও বৈচিত্র্য'**, retrieved from https://www.bongodorshon.com/home/story_detail/mahabharata-to-british-india-changing-tastes-in-picnic-food, ১৩ ডিসেম্বর, ২০২২
12) **Rachel Walker,** 'A History of the Great British Picnic', retrieved from **https://www.bestwestern.co.uk/travel-stories/article/a-history-of-the-great-british-picnic,** accessed on 18/02/2023.
13) Isabella Beeton, Mrs. Beeton's Book of Household Management, Empire Books, London, 2011 (Reprint, First Published in 1861)
14) সাগুফতা শারমীন তানিয়া, **'অলসবেলার চড়ুইভাতি'**, retrieved from https://www.prothomalo.com/onnoalo/treatise/%E0%A6%85%E0%A6%B2%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%9C%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF, December 20, 2019.

বিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ

শাবানা আজমী
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ,
চন্দ্রকেতুগড় শহিদুল্লাহ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

সমকালকে বিধৃত করার অন্যতম মাধ্যম হল সাহিত্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চিত্রের পরিচয় পেতে আমরা ঐ যুগের সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করি। কেননা সাহিত্য সমাজের ক্যানভাস স্বরূপ। সমাজের প্রতি লেখকের একটা সুনিশ্চিত দায়বদ্ধতা থাকে। দেশকালকে উপেক্ষা করে কোন লেখকই তার সৃষ্টিকর্মে ব্রতী হতে পারেন না। উনিশ শতকে নবজাগরণ ও পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোড়নে একে একে সতীদাহ প্রথা, কৌলিন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বিধবাবিবাহ প্রচলন ইত্যাদিতে সমাজের জড়তা কাটিয়ে ওঠার মানসিকতা গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে। মধুকবির পত্রকাব্যে (বীরাঙ্গনা, ১৮৬২) নারী তার ভাষা খুঁজে পেল, নারীর স্বতন্ত্র্য সত্তার জয়গান ঘোষিত হল। পুরুষের একচেটিয়া মনোবৃত্তির উপর আঘাত হানল এই কাব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গ ও বহুবিবাহের সমস্যা থাকলেও বঙ্কিমের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বালবিধবা রোহিণী ও কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সামাজিক সুরক্ষার বলয় রচিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন সেভাবে গড়ে ওঠেনি। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর ধীরে ধীরে শহুরে মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে উঠল, তবে গ্রাম্যজীবন ছিল তা থেকে অনেকটাই দূরে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তথা রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমে তীব্রতর হয়ে ওঠে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে ইংরেজ সরকার বিচলিত হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষও সামিল হয় এই আন্দোলনে। ইংরেজ সরকারের শোষণ-দমনের নীতি চলতেই থাকে। ১৯১৯এ রাওলাট আইন পাশ হয়; বিনা প্ররোচনায় গ্রেফতার, প্রচারকার্যে বাধা, বিনাবিচারে শাস্তি প্রদান, আপিলে নিষেধাজ্ঞা এই আইনের আওতায় পড়ে। ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর, রামমোহন, কেশবচন্দ্র সেন, রামতনু লাহিড়ী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, সরজিনী বসু, ননীবালা দেবী, অবলা বসু, সরলা ঘোষাল, লতিকা ঘোষ, সরলা রায় প্রমুখের প্রচেষ্টায় সমাজ সংস্কার আন্দোলন, বিদ্যালয় ও নারী কল্যাণ সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। বিংশ শতকের সমাজসেবকগণ ও নারী উন্নয়ন প্রয়াসী মহিলাগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন মেয়েরা যাতে শিক্ষার আলো পায় ও রক্ষণশীলতার গণ্ডী অতিক্রম করে বহির্জগতে অগ্রসর হয়। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা ছিল

তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তারা ইতিমধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতে অগ্রসর হয়ে স্বীয় কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছিল বাঙালি সমাজের বুকে। এই সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাসাহিত্যের দুই মহারথী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)ও নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) লেখনীতে উক্ত সময়ের চালচিত্র যেমন উঠে এসেছে তেমনি তাঁদের রচনা উদ্বুদ্ধ করেছে আপামর বাঙালি সমাজকে। বাল্যকাল থেকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধরত নজরুল জীবন সংগ্রামের এই কঠিন লড়াইয়ে সাহিত্য সাধনাকেই তাঁর হাতিয়ার করে তুলেছিলেন। স্কুলের প্রথাগত শিক্ষা তাঁর ললাটে খুব অল্পই ঘটেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন তিনি, ১৯১৭ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন। উক্ত সময়ে তিনি যুদ্ধবিদ্যার সাথে সাথে ফরাসীভাষা শিক্ষা, দেশি-বিদেশি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সঙ্গীতচর্চা এবং সাহিত্যচর্চাও করে গেছেন। এইভাবে স্বপ্রণোদিত শিক্ষা ও জীবনের খোলাপাতা থেকে পাঠ নিয়ে নজরুল বাংলাসাহিত্য জগতে তাঁর স্থানটি পাকা করে নিয়েছেন। তাই বাঙালী পাঠক সমাজে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই সাথে উচ্চারিত হয় নজরুলের নাম।

১৯১৯ সালে প্রকাশিত 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী' দিয়ে নজরুলের সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত, ১৯৪২ সাল পর্যন্ত যার প্রসার। এরপর মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে বিদ্রোহী কবির হাতিয়ার বিচ্ছিন্ন হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণকারী নজরুল ৪৯নং বেঙ্গলি রেজিমেন্টের বাঙালি দলে ছিলেন। তরুণ যুবক নজরুল ইসলামের উন্মাদনা, সৈনিকের জীবনযাপন তাঁর 'ব্যথার দান' (১৯২২)ও 'হেনা' গল্প দুটির মধ্যে এবং 'বাঁধনহারা' উপন্যাসের (১৯২৭) মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। 'ব্যথার দান' গল্পে স্বদেশের প্রতি ভালবাসা ও সৈনিকের যুদ্ধাভিজ্ঞতার বর্ণনা পাওয়া যায়। মায়ের মৃত্যুতে মাতৃস্নেহের কাঙাল পুত্রের হাহাকার ধ্বনিত হয় এভাবে- 'মাকে হারিয়েছি বলেই মাতৃস্নেহের ঐ মস্ত শিকলটা আপনা হতে ছিঁড়ে গিয়েছে বলেই আজ মার চেয়েও মহিয়সী আমার জন্মভূমিকে চিনতে পেরেছি।' ('দারার কথা' –ব্যথার দান)। মা ভালবাসার অমৃতসুধা পান করিয়েছেন, প্রাণে স্নেহের সুরধনী বইয়েছেন বলেই মাতৃরূপী জন্মভূমিকে ভালবাসতে শিখেছেন তিনি। আপামর জনগণের হৃদয়ের মাঝে এভাবেই নজরুল স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করে দিয়েছেন, দেশপ্রেমের অগ্নিশিখা জ্বেলে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে (১৮৯৪) শশিভূষণের ম্যাজিস্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গ্রামীণ আবহে একক প্রচেষ্টা। কিন্তু তাতে শশিভূষণের হার হলেও পাঠকের মধ্যে ইংরেজের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায় এবং স্বদেশের মানুষকে ভালবাসার বার্তা দেয়। ১৯৪১ সালে 'বদনাম' গল্পে সদুর মধ্য দিয়ে সংসারী, সতীসাধ্বী রমণীর ভিতরে ভিতরে স্বদেশী কার্যকলাপ ও দেশপ্রেমিক হয়ে ওঠার কাহিনী পাঠককে চমকিত করে। বিপ্লবী অনিলকে বাঁচাতে সমস্ত বদনামের ভাগী হতেও পিছপা নয় সদু- 'আমরা দেশের মেয়েরা যদি এইসব সুসন্তানদের আপন প্রাণ দিয়ে রক্ষা না করি তবে আমাদের

নারীধর্মকে ধিক্।' সমাজের চোখ রাঙানির আস্ফালন তাকে বিচলিত করেনা, তার দেশপ্রেমের কাছে সংসারধর্ম তুচ্ছ হয়ে যায়।

স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২) ও আইন অমান্য আন্দোলনের (১৯৩০) প্রেক্ষাপটে দেশ তখন উত্তাল। এই প্রেক্ষাপটে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনের নিরিখে নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনা দেশমাতৃকার কাছে তাঁদের আত্মনিবেদন স্বরূপ। তবে সশস্ত্র সংগ্রামের নামে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবকে রবীন্দ্রনাথ কখনই সমর্থন করেননি। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের (১৯১৬) ছদ্ম স্বাদেশিকতার রূপ সন্দীপ চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে (১৯৩৪) চরমপন্থী বিপ্লবের অনুগামী হয়ে মানবতার ধূলিলুণ্ঠন রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেননি। দেশের প্রস্ফুটিত ভবিষ্যৎকে ধ্বংস হতে দেখে তিনি চিন্তিত। মানুষের ধনসম্পদ লুণ্ঠন, হত্যার বিপ্লব রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করে তুলেছিল। 'স্বর্গের কাছাকাছি' প্রবন্ধে মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন, 'সেই সময় বিপ্লবীদের কীর্তিকলাপের গৌরবে সারা দেশ টগবগ করে ফুটছে।...কিন্তু আমি বুঝতাম দেশব্যাপী এই উত্তেজনার মূল্য সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান।' মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেটকে শান্তি সুনীতি নামে দুটি মেয়ের খেলার রিপোর্ট দেখাবার ছলে গুলি করে হত্যায় কবি কষ্ট পেয়েছিলেন, কারণ 'ঐ ম্যাজিস্ট্রেটকে ব্যক্তিগতভাবে উনি চিনতেন এবং একটি সৎ মানুষ বলে জানতেন। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এই নিষ্ঠুর গুপ্তহত্যার অমানবিকতা আর তাই নিয়ে সভ্য মানুষের উল্লাস ওঁকে বিচলিত করেছিল।...'চার অধ্যায়' নিয়ে তাই আমার কোনো মুশকিলে পড়তে হয়নি। এবং টেররিজমকে সমর্থন করায় কি সর্বনাশ এগিয়ে আসে তা চিরদিনের জন্য মনে গেঁথে গেল।'[১] রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন লেখনীতে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের উন্মত্ততাকে বিরোধিতা করেছেন।

অপরদিকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন ও মাওলানা মহম্মদ আলী ও শওকত আলীর নেতৃত্বে পরিচালিত খিলাফত আন্দোলনের প্রতি নজরুল আস্থাশীল ছিলেন না। ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে স্বরাজ গঠন ও স্বাধীনতা আদায়ের দাবিতেই বিশ্বাসী নজরুল। মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্কের মধ্যযুগীয় রক্ষণশীল সালতানাত উচ্ছেদকারী নব্য তুর্কি আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছিল নজরুলের। ১৯২১ সালে তাঁর বিখ্যাত রচনা 'কামাল পাশা' কবিতার মাধ্যমে সমকালীন আন্তর্জাতিক-ইতিহাস চেতনা ও ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনের অসারতার পরিচয় পাওয়া যায়। একবছররই প্রকাশ পায় নজরুলের বৈপ্লবিক চেতনা সমৃদ্ধ 'বিদ্রোহী' ও 'ভাঙার গান' সঙ্গীত, যার জন্য নজরুল বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯২২ সালের ৮সেপ্টেম্বর প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটিতে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হওয়ায় সরকার এটিকে বাজেয়াপ্ত করে এবং তাকে গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জেলে নজরুল অনশন শুরু করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিঠিতে অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন। এ প্রসঙ্গে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কবি

লিখেছেন, 'নজরুল ইসলামকে Presidency Jail এর ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুম। লিখেছিলুম "give up hunger strike, our literature claims you"। জেল থেকে memo এসেছে The addresee not found; অর্থাৎ ওরা আমার message দিতে চায় না। কেননা নজরুল প্রেসিডেন্সি জেলে না থাকলেও ওরা নিশ্চয়ই জানে, সে কোথায় আছে। অতএব নজরুলের ইসলামের আত্মহত্যায় ওরা বাধা দিতে চায় না।' দেশের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী নজরুলের 'আমি সৈনিক' প্রবন্ধে তাঁর বিদ্রোহী চেতনারই প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর কাছে অহিংসার রাজনীতি এখন আর সমর্থনযোগ্য নয়। ইংরেজ বিতারিত করতে হলে সমগ্র শক্তি নিয়ে অগ্রসর হতে হবে, বিপ্লববাদকে জাগিয়ে তুলতে হবে। নজরুলের ভাষায়, 'দেশ চায়, সেই পুরুষ যার ভালোবাসায় আঘাত আছে, বিদ্রোহ আছে। যে দেশকে ভালোবেসে শুধু চোখের জলই ফেলবে না, সে দরকার হলে আঘাতও করবে, প্রতিবাদও বুক পেতে নেবে, বিদ্রোহ করবে।'[২] অর্থ্যাৎ নজরুলের মতে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই স্বাধীন ভারতের সৌধ রচিত হবে। তবে রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদকে কখনই সমর্থন করেননি। 'চার অধ্যায়' বা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। 'দুর্দিনের যাত্রী' (১৯২৬) প্রবন্ধের অন্তর্গত 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল' নিবন্ধে নজরুল তরুণ সমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন দেশের দুর্দিনে এগিয়ে আসার জন্য। তাদের সুতীব্র আঘাতে ইংরেজের মসনদ বিদীর্ন হবে। রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্র' পত্রিকায় আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচানোর কথা যেমন বলেছেন, তেমনি নবীন সবুজ কাঁচাদের জয়গান গেয়েছেন। তাদের আগমনের মধ্য দিয়ে নতুন সমাজ গড়ার কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'মোরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে' এই গানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নজরুল 'মোরা সবাই স্বাধীন; মোরা সবাই রাজা' প্রবন্ধের নামকরণ করেছেন। এই প্রবন্ধে নজরুল স্বাধীনতার বাণী, স্বরাজ লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। ইংরেজের গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে, তখনই মানুষ হবে স্বাধীন, রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে সে। নজরুল তাই বলেছেন, 'জাগো অচেতন জাগো! আত্মাকে চেনো।' ড. সুশীল কুমার গুপ্ত 'দুর্দিনের যাত্রী' প্রবন্ধ সম্পর্কে বলেছেন, 'এই সব প্রবন্ধের বাস্তবনিষ্ঠ রাজনৈতিক চেতনা, স্বভাবসিদ্ধ ভাবাবেগের প্রাবল্য ও গভীর মানবপ্রেম রচনাশৈলীর ত্রুটি ও উদ্দেশ্যপরতন্ত্রতা সত্ত্বেও পাঠকের মনকে দুরন্তভাবে আকর্ষণ করে ও নাড়া দেয়। বস্তুত এই সব রচনা যে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা উদ্দীপনের জন্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা করতে এরা অনেক পরিমাণেই সফল হয়েছিল- একথা মনে রাখলে এগুলির কতকটা সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না।'[৩]

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে এই হত্যাকাণ্ডের রিপোর্টে ডায়ারের দোষত্রুটি ঢাকা পড়ে যায়, মণ্টেগু চেমসফোর্ডের বক্তব্য উপস্থাপনের কৌশলে। মর্মাহত রবীন্দ্রনাথ

এণ্ড্রুজকে চিঠিতে লেখেন- 'এ দেশে যাদের মধ্য থেকে আমাদের শাসনকর্তারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন, তাঁদের আমলারা আমাদের উপর যত দানবীয় অত্যাচার-ই করুক না কেন, তাতে তাঁদের মনে কোনরকম বিক্ষোভের সঞ্চার হয় না।' (২২জুলাই,১৯২০,লণ্ডন)। নজরুল লিখলেন, 'দুশমন ডায়ারকে বাদ দিলে চলবে না। ইহার যে স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করা হইবে তাহার চূড়া হইবে এত উচ্চ যে ভারতের যে কোন প্রান্তর হইতে তা যেন স্পষ্ট মূর্ত হইয়া চোখের সামনে জাগিয়া ওঠে। ও ডায়ারকে ভুলিব না, আমাদের মুমূর্ষ জাতিকে চিরসজাগ রাখিতে এমনই জল্লাদ কসাই এর আবির্ভাব মস্ত বড়ো মঙ্গলের কথা। ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ যেন আমাদিগকে ডায়ারের স্মৃতি ভুলিতে না দেয়। ইহার জন্য আমাদের সর্বাগ্রে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। নতুবা আমরা অকৃতজ্ঞতার বদনামের ভাগী হইব। এই যে আজ আমাদের নূতন করিয়া জাগরণ, এই যে আঘাত দিয়া সুপ্তচেতনা আত্মসম্মানকে জাগাইয়া তোলা, ইহার মূল কে? -ডায়ার।'[৪] জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধস্পৃহা ভারতবাসীর মনে জাগিয়ে তোলার জন্যই নজরুলের এরূপ জ্বালাময়ী লেখনী। অত্যাচারীর অত্যাচারকে স্মৃতির মধ্যে তাজা রাখতে হবে সর্বদা, তবেই প্রতিশোধ ও প্রতিবাদের স্পৃহা প্রজ্জ্বলিত থাকবে মনের প্রতিটি কোণে। ভারতবাসীর প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে বারুদের বিষ জমিয়ে আঘাতের জন্য তৈরী থাকতে হবে, তবেই সঙ্কুচিত হবে ডায়ারের মত নৃশংস অত্যাচারীর দল।

'কালা আদমিকে গুলি মারা' নিবন্ধে ভারতবাসীর কালো চামড়ার মানুষদের ওপর সাদা চামড়ার ইংরেজের প্রতিনিয়ত অত্যাচারের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে বিদ্রোহী কবির। 'বিচারের বাণী কাঁদে নিভৃতে' কালা আদমির জন্য, পক্ষপাতদুষ্ট বিচারব্যবস্থায় সাদা আদমির জন্য অনুকূল ব্যবস্থা আর কালা আদমির উপর চলে বর্বরতা। তাই তিনি বলেন, 'এই একগুঁয়েমির জন্যই তো আজ এমন করিয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত একটা বিপুল কম্পন শুরু হইয়া গিয়াছে। এই ভূমিকম্পকে চাপা দিয়া রাখিবার ক্ষমতা আর স্বেচ্ছাতন্ত্রের নাই! তেত্রিশ কোটি মানুষকে অবহেলা করিয়া ঘৃণা করিয়া তিনশত তাহাদিগকে চাবুক মারিবে এবং তাহারা তাহা সহিয়া থাকিবে, সে দিন আর নাই।' তাই মানুষকে আজ ঘুরে দাঁড়াতেই হবে, অত্যাচারীর সম্মুখে বুক চিতিয়ে লড়াইয়ের মধ্যে অপসৃত হবে দুর্যোগের কালো মেঘ। 'ধর্মঘট' প্রবন্ধে শ্রমজীবি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জয়গান গেয়েছেন সাম্যের কবি। তাঁর মতে, শ্রমিকশ্রেনীর উত্থান ঘটবে সাম্যবাদের মধ্য দিয়ে। তবে নজরুলের সাম্যবাদে কল্পনা ও আবেগের প্রাবল্য বিদ্যমান। ড. সুশীল কুমার গুপ্ত বলেছেন, 'এ দেশে সাম্যবাদী ধারণায় যাঁরা প্রথমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নজরুল অন্যতম। তাঁর সাম্যবাদ মার্কসবাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে জন্মলাভ করেনি। তাঁর সাম্যবাদ যতটা আবেগোচ্ছল ও কল্পনারঞ্জিত ততটা যুক্তি ও বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তবে সাম্যবাদের প্রধান স্তম্ভ স্বরূপ শ্রমশক্তির উপর নজরুল প্রচণ্ডভাবে আস্থাশীল। তিনি অনুভব করেছেন যে

শ্রমজীবিদের জাগরণ রোধ করবার সাধ্য ধনিক সভ্যতার আর নেই।'[৫] কৃষকশ্রেণী-শ্রমিকশ্রেণীর উত্থানের মধ্য দিয়েই প্রকৃত সাম্যবাদ রচিত হবে। মহাজন-বনিকদের পদদলিত হয়ে থাকবে না নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষ। প্রকৃত গণতন্ত্রের জাগরণ সেদিনই হবে যেদিন এই বৈষম্য দূর হবে। যা আজকের প্রেক্ষাপটেও সমান কার্যকরি। নজরুল বলেন, 'চাষী সমস্ত বৎসর ধরিয়া হাড়ভাঙ্গা মেহনত করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও দুবেলা পেট ভরিয়া মাড়ভাত খাইতে পারে না।...ছেলেমেয়ের সাধ-আরমান মিটাইতে পায় না, অথচ তাহারই ধান-চাল লইয়া মহাজনরা পায়ের উপর পা দিয়া বারোমাস তেত্রিশ পার্বন করিয়া নওয়াবি চালে দিন কাটাইয়া দেন।'[৬] বাল্য-কৈশোর ও পরবর্তী জীবনে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে চলা নজরুল হৃদয়ের অন্তঃস্তল থেকে উপলব্ধি করতে পারেন মেহনতি মানুষের দুর্দশার চিত্র। ঘা খেতে খেতে সর্বহারা দলের মাঝেও বিদ্রোহের চেতনা জেগে ওঠে। সঙ্ঘবদ্ধ মেহনতি মানুষের জাগরণে বণিকের আসন কেঁপে ওঠে। তাঁর মতে, 'সবারই অন্তরে একটা বিদ্রোহের ভাব আত্মসম্মানের স্থূল সংস্করণ রূপে নিদ্রিত থাকে, যেটা খোঁজা খাইয়া জর্জরিত না হইলে মরণ কামড় কামড়াইতে আসে না।...এ অভাগাদের বেদনার বোঝা নেহাত অসহ্য হওয়াতেই তাহাদের এ বিদ্রোহের মাথা ঝাঁকানি। উন্নত আমেরিকা ইউরোপেই ইহার প্রথম প্রচলন। সেখানে এখন লোকমতের উপরই শাসন প্রতিষ্ঠিত, এই গণতন্ত্র বা ডেমোক্র্যাসিই সে দেশে সর্বেসর্বা, তাই শ্রমজীবি দলেরও ক্ষমতা সেখানে অসীম।'[৭] তাই আবেদন-নিবেদনের রাজনীতিতে তিনি আর আস্থা রাখতে পারেন না, বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে শ্রমজীবি মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে বিশ্বাসী তিনি। ভারতের দুর্দিনে তাই হিন্দু-মুসলমানকে একত্রিত হয়ে লড়াইয়ের ময়দানে নামতে হবে- 'এ পড়ো-পড়ো ভারতকে রক্ষা করতে এই মুক্ত জাহ্নবী তটে দাঁড়াইয়া আয় ভাই আমরা হিন্দু-মুসলমান কাঁধ দিই। নহিলে এ ভগ্নসৌধ যে আমাদেরই শিরে পড়িবে ভাই। আজ বড় ভাইকে (লোকমান্য তিলক) হারাইয়া এই একই বেদনাকে কেন্দ্র করিয়া, একই লক্ষ্যে দৃষ্টি রাখিয়া যেন আমরা ভাইকে, পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করি।'[৮] ১৯২৬ সালের কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিবাদে নজরুল লেখেন 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'। বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আহ্বান নজরুলের ভাষায় ধ্বনিত হয়েছে এভাবে- 'এসো ভাই হিন্দু! এসো মুসলমান! এসো বৌদ্ধ! এসো ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডী কাটাইয়া সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থচরিতের পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি।'[৯] যা আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক।

ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আদায়ের লড়াইয়ে মানুষ যখন নিপীড়িত বিধ্বস্ত তখন তাদের সংগ্রামের প্রেরণা যোগান রবীন্দ্রনাথ। এই লড়াইয়ে ইংরেজের বিভেদের রাজনীতি ভারতীয়দের দুর্বল করে তুলবে। এখন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ শক্তিই ইংরেজের মসনদ টলিয়ে দিতে পারে। ১৩১৪ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় কবি লিখেছেন- 'আমরা এক দেশে এক সুখদুঃখের মধ্যে একত্রে বাস করি, আমরা মানুষ, যদি এক না

হই তবে সে লজ্জা, সে অধর্ম।' এবছরেই পাবনায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে কবি বলেছেন- 'এদিকে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়্গ দেশের মাথার উপর ঝুলিতেছে। কত শত বৎসর হইয়া গেল, আমরা হিন্দু ও মুসলমান একই দেশমাতার দুই জানুর উপর বসিয়া একই স্নেহ ভোগ করিতেছি। তথাপি আজও আমাদের মিলনে বিঘ্ন ঘটিতেছে।' মানুষের অন্তর্চক্ষু উন্মোচনের জন্যই কবির এই বার্তা, যা আজকের সমাজের পক্ষেও সমান জরুরি। ১৩৩৯সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সমস্যা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই হিন্দু-মুসলমানের কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। সমকক্ষতা তাল-ঠোকা পালওয়ানি ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয়পক্ষের সামাজিক সমকক্ষতা।' তাই বিভেদ ভুলে একে অপরের সহযোগিতার মধ্যেই রয়েছে পরস্পরের উন্নয়নের চাবিকাঠি, সম্প্রীতির বাণী আর নিম্নবিত্তের জাগরণের মধ্য দিয়েই রচিত হবে সমাজের তোরণ। 'ওরা কাজ করে' কবিতায়(১৯৪২) কবি ব্রাত্য নিপীড়িত মানুষের জয়গান গেয়েছেন। শ্রমিক শ্রেণীই সভ্যতার অগ্রগতি, তারাই সমাজের পিলসুজ। শ্রমজীবি মানুষের দল আবহমান কাল ধরে নগরে-প্রান্তরে কাজ করে, মনুষ্যলোকের জীবনতরীর দাঁড় টেনে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কৃষি-শিল্পের অগ্রগতি হয় তাদেরই পরিশ্রমে। এরা মাঠে মাঠে বীজ বোনে, ধান কাটে, নগর নির্মাণ করে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। 'তীর্থঙ্কর'-এ দিলীপ রায়ের সঙ্গে আলোচনায় সাম্যবাদ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন- 'সাম্যবাদের আদর্শকে কে মানবে বল? কিন্তু এই যে দল বেঁধে জোর করে হিংসার পথে মানুষকে প্রেমিক করে তোলা যাবে একথায় মন ভরে ওঠে না। তাই তো মানুষ আজ ভয় করছে মানুষকেই। তাই দল বাঁধায় আমার আস্থা নেই। দল বাঁধতে হলে কোন না কোন ছলে মিথ্যাকে আশ্রয় করতেই হবে। আসবেই দলাদলি। মিথ্যার পথে হয় না সত্যের প্রতিষ্ঠা, শুধু কান পেতে থাকবে অন্তর দেবতার বাণী শুনতে। যা সত্য চিরদিনের সত্য তার দিকে একলা চলো রে। দল না একলা তীর্থযাত্রা।' দেশের দুর্দিনে সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিটি মানুষের একক প্রচেষ্টাই সম্মিলিত শক্তির একত্রিত রূপ নিয়ে প্রকাশ পাবে। তখন সেই সঙ্ঘবদ্ধ রূপে মেদিনী কেঁপে উঠবে, নিপীড়িত মানুষের জাগরণ সূচিত হবে।

'ছুঁৎমার্গ' প্রবন্ধে নজরুলের বক্তব্য, অস্পৃশ্যতার যে কালো ছায়া হিন্দু-মুসলমান সমাজের নিগড়ে বাসা বেঁধে আছে, তাকে সমূলে উৎপাটনের মধ্য দিয়েই সমাজের অগ্রগতি সম্ভব। মানবধর্ম তথা মনুষ্যত্বের জাগরণের মধ্য দিয়েই উভয়ের মিলনগাঁথা রচিত হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে বলেছেন, 'এতদিন গোড়ার দিকে একরকমের মিল ছিল। পরস্পরের তফাৎ মেনেও আমরা পরস্পরের কাছাকাছি ছিলুম।...কিন্তু একসময়ে যে কারণেই হোক ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে শুরু করল। তাই তাঁর মতে, নানা উপলক্ষ্যে ও বিনা উপলক্ষ্যে সর্বদা আমাদের পরস্পরের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ-

আলাপ চাই। যদি আমরা পাশাপাশি চলি, কাছাকাছি আসি, তাহলেই দেখতে পাব, মানুষ বলেই মানুষকে আপন বলে মনে করা সহজ।'[১০] 'চণ্ডালিকা' নাটকে (১৯৩৮) সমাজের চোখে দলিত অচ্ছ্যুত চণ্ডালকন্যাকে মানবাধিকার দান করেন বৌদ্ধভিক্ষু পিপাসার্ত আনন্দকে তৃষ্ণা নিবারণের মধ্য দিয়ে; অসম্মানের অন্ধকার থেকে মুক্তির আলোয় নিয়ে আসেন তাকে।

শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাতে যে ছাত্রদের মেধার যথাযথ বিকাশ ঘটে না, চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির চর্চা না করলে জড়তা গ্রাস করে তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে বলেছেন। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না – বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।' বাল্যকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর কাছে প্রাণহীন ও যান্ত্রিক মনে হত এবং সেই শিক্ষার সঙ্গে যে শিশুর মানসিক সংযোগের অভাব থেকে যায় সেই উপলব্ধিই কবির শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে ধ্বনিত হয়েছে। নজরুলও উপলব্ধি করেছেন শিক্ষাব্যবস্থার দৈনতা। 'জাতীয় শিক্ষা' প্রবন্ধে নজরুল বলেছেন, 'আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি এমন হউক, যাহা আমাদের জীবনীশক্তিকে ক্রমেই সজাগ, জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে শিক্ষা ছেলেদের দেহ-মন দুইকেই পুষ্ট করে, তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা।' শিক্ষা ব্যবস্থার সেই ত্রুটি আজও বিরাজমান। কবিদ্বয়ের দর্শিত পথেই হতে পারে শিক্ষার যথার্থ বিকাশ।

নজরুল অপরিসীম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেই জীবন সংগ্রামে এগিয়ে গেছেন। কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন নিরন্ন মানুষের যন্ত্রনাদীর্ণ জীবনলিপি কাছ থেকে অনুভব করেছেন। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে (১৯৩০) নিম্নবিত্ত পরিবারের জীবনযন্ত্রনার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। চাঁদসড়কের দরিদ্র মুসলমান পরিবারের বিধবা মায়ের পাঁচটি ছেলেমেয়ের মধ্যে তিনটি ছেলেই অকালে মারা যায় স্ত্রী-ছেলেমেয়ে রেখে। ছোটভাই প্যাঁকলে অবিবাহিত, তার উপরেই সংসারের ক্ষুন্নিবৃত্তির দায়িত্ব। অন্নের সংস্থান সবদিন ঠিকমত হয়ে ওঠে না। টাইফয়েডে আক্রান্ত সেজবৌয়ের দু-মাসের সন্তানটি মায়ের দুধ না পেয়ে, নুন্যতম খাদ্যের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় মায়ের সঙ্গে- ' জন্ম অবধি মায়ের দুধ না পেয়ে শুকিয়ে চামচিকের মতো হয়ে গেছে। শুষ্ক ক্ষীণ কণ্ঠে অসহায় শিশু কাঁদে আর একবার করে তার কণ্ঠের চেয়েও শুষ্ক মায়ের বুকে একবিন্দু দুধের আশায় বৃথা কান্না থামায়। আবার কাঁদে। কান্না তো যেন বেঁচে থাকার প্রতিবাদ। যেন ওকে কে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। ওর মা-ই তখন চেঁচিয়ে বলে, আল্লা গো আর দেখতে পারিনে, তুলে নাও বাছাকে তোমার কাছে। ও মরে বাঁচুক।' দারিদ্র্যের যন্ত্রণা আর অনাহারের কষ্টে মায়ের আর্ত হৃদয় সন্তানের মৃত্যু কামনা করে। কতখানি কষ্টে মায়ের মুখ দিয়ে সন্তানের মৃত্যুর প্রার্থনা বেরোয় তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। দারিদ্র্যের দুর্নিবার গতি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে গলার টুঁটি চেপে মৃত্যুর প্রহরের

দিকে এগিয়ে নিয়ে চলার এই চিত্র – নজরুলের পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে দেখা মেলে না। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের এই দারিদ্র্যের চিত্র নেই। তবে 'শাস্তি' গল্পে ফুটে উঠেছে দরিদ্র কুর্মী প্রজার দৈনন্দিন অনাহারের চিত্র, যার ফলে নিত্যদিনের ঝগড়া ও পরিণতিতে খুন-দারিদ্র্যের নগ্ন চিত্র পাঠকমনকে আহত করে।

বিংশ শতকের ক্রান্তিলগ্নে এক বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল তাঁদের হাতিয়ার তুলে নিয়েছিলেন মানবতার মর্যাদা রক্ষায়। শুচিশুভ্র পাতায় তাঁদের মসী নামক অস্ত্রটিকে শানিয়ে তুলেছেন যাতে অত্যাচারীর মুখোশ ছিন্নভিন্ন হয়, মানুষের মাঝে জাগরণ সূচিত হয়। সংকীর্ণতা-ভেদাভেদ-কালিমা মুছে দিয়ে প্রকৃত মানুষ হবার ডাক দিয়েছিলেন তাঁরা, যে আহ্বান আজও আমাদের চলার পথের প্রেরণা। নজরুলগীতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া বাঙালি অচল ও স্তব্ধ। আমাদের হৃদয়ের বীণাতন্ত্রী ঐ মহামানবদ্বয়ের সঙ্গীতের ঝরণা ধারায় চির স্নাত হয়ে চলেছে। যে মহান সৃষ্টি দ্বারা তাঁরা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন ও বিশ্বসভায় আসীন করেছেন সেই সৃষ্টিতরঙ্গের ঢেউ আমাদের প্রতিনিয়ত উদ্দীপনা সঞ্চার করে, নতুন পথের দিশা দেখায়। মানবজীবনের সংকটকালে তাঁদের রচনাবলী আমাদের পাথেয় স্বরূপ। তবে তা বইয়ের পাতায় আবদ্ধ থাকলে চলবে না, জীবনের পাতায় ও কর্মের মধ্যে তার প্রয়োগ ঘটাতে পারলেই সফল হবে তাঁদের স্বপ্ন।

তথ্যসূত্র:

১. স্বর্গের কাছাকাছি – মৈত্রেয়ী দেবী। জানুয়ারি, ২০১৭, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলিকাতা ৭। পৃ-১১৪।

২. আমি সৈনিক –নজরুল রচনাবলী (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) দ্বিতীয় খণ্ড। বাংলা একাডেমী ঢাকা, মে, ২০১১। পৃ-৪১৩।

৩. ড. সুশীলকুমার গুপ্ত- 'নজরুলচরিত মানস', ভারতী লাইব্রেরী, কলকাতা-১২, ১৩৬৭। পৃ-২৭০।

৪. ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ –নজরুল রচনাবলী (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) প্রথম খণ্ড। বাংলা একাডেমী ঢাকা, জুন, ২০১২। পৃ-৩৭৯।

৫. ড. সুশীলকুমার গুপ্ত- 'নজরুলচরিত মানস', ভারতী লাইব্রেরী, কলকাতা-১২। ১৩৬৭। পৃ-২৬৮।

৬. 'ধর্মঘট' প্রবন্ধ, নজরুল রচনাবলী। জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। জুন,২০১২। পৃ-৩৮২

৭. ঐ। পৃ-৩৮৩।

৮. লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে... নজরুল রচনাবলী। জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। জুন,২০১২। পৃ-৩৮৫।

৯. নবযুগ। পৃ-৩৭৩। ঐ।

১০. হিন্দু-মুসলমান, রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১৩, ১৩৬৮, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। শ্রী সরস্বতী প্রেস লিমিটেড। পৃ-৩৬৭ ।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. রবীন্দ্র রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড), ১৩৬৮, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। শ্রী সরস্বতী প্রেস লিমিটেড।

২. নজরুল রচনাবলী (জন্ম শতবর্ষ সংস্করণ) প্রথম খণ্ড। জুন২০১২, বাংলা ঢাকা একাডেমি, ঢাকা ১০০০।

৩. নজরুল রচনাবলী (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) দ্বিতীয় খণ্ড। বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০, মে, ২০১১।

৩. নজরুল রচনাবলী (জন্ম শতবর্ষ সংস্করণ) সপ্তম খণ্ড। ২০১২, বাংলা ঢাকা একাডেমি, ঢাকা ১০০০।

৪. মৈত্রেয়ী দেবী। স্বর্গের কাছাকাছি। জানুয়ারি, ২০১৭, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলিকাতা ৭।

৫. সুশীল কুমার গুপ্ত। নজরুল চরিতমানস। ভারতী লাইব্রেরী, কলকাতা-১২। ভাদ্র, ১৩৬৭।

শ্রীগীতগোবিন্দকাব্যের রচয়িতা ‘কবি জয়দেব’ : একটি সমীক্ষাত্মক আলোচনা

দেবব্রত বৈদ্য
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,
ফকিরচাঁদ কলেজ

সারসংক্ষেপ : প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত কাব্যধারার অনন্য প্রতিভাবান্ কবি ছিলেন জয়দেব। তিনি ভাগবতের অংশবিশেষের বিষয়বস্তুকে প্রধানভাবে আশ্রয় করে গীতগোবিন্দ রচনা করেন। ‘গীতগোবিন্দ’কাব্যটির জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে কাব্যটির রচয়িতা কে, সে নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। কারণ সংস্কৃত সাহিত্যে গীতগোবিন্দকার জয়দেব ছাড়াও আরও কয়েকজন জয়দেবের উল্লেখ পাওয়া যায় ‘ছন্দঃসূত্রকার’ জয়দেব, ‘বৈষ্ণবামৃত’ বা ‘পীযূষলহরী’ নাট্যকার জয়দেব, ‘চন্দ্রালোক’ অলঙ্কারগ্রন্থপ্রণেতা জয়দেব ও ‘প্রসন্নরাঘব’ নাট্যকার জয়দেব। তবে দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালী কবি গীতগোবিন্দকার জয়দেবের জনপ্রিয়তা সবথেকে বেশী। জয়দেব তাঁর কাব্যে শ্রীরাধাকেই নায়িকার স্থানে বসিয়েছেন। বস্তুতঃ শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মান-অভিমান মিশ্রিত প্রেমলীলাই এ-কাব্যের মূল উপজীব্য। কাব্যটি দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত, এতে ২৮৬টি শ্লোক এবং ২৪টি গীতের সমাবেশ আছে।
সূচকশব্দ : গীতগোবিন্দ, খণ্ডকাব্য, জয়দেব, বৈষ্ণবসাহিত্য, সংস্কৃতসাহিত্য, কিংবদন্তী।

মূল আলোচনা :
সংস্কৃত সাহিত্যের শাশ্বত কবিদের নাম গণনাকালে অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস ভর্তৃহরি, ভারবি, ভবভূতি, মাঘ, ক্ষেমেন্দ্র, সোমদেব, বিল্হণ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতিদের সঙ্গে কবি জয়দেবের নাম স্বতঃই চলে আসে। সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী যে সমস্ত সংস্কৃত কবিদের যশ বিস্তৃত, তাঁদের মধ্যে জয়দেবকে অন্তিম কবি বলা চলে। মহাকবি কালিদাসের ন্যায় কবি জয়দেবের প্রভাবও ভারতব্যাপী। তাঁর এই গীতিকাব্যখানি পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যের অনেকখানি জায়গা দখল করে নিয়েছে।

নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্য সৃষ্টির ধারা জয়দেবের পূর্ব থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল বলে মনে করা হয়। খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতকে সেই সাহিত্যের ধারায় কৃষ্ণভক্তিমূলক সাহিত্য ‘গীতগোবিন্দ’ যে সত্যই অভিনব কাব্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সমগ্র বাংলার বৈষ্ণবসাহিত্য, পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্য ও অপরাপর ভারতীয় ভাষার বৈষ্ণবসাহিত্যের চিরস্থায়ী ও অনন্ত প্রেরণার উৎসরূপে গীতগোবিন্দ-কাব্যের প্রতিষ্ঠা তার মহিমাকে যে পরিমাণে বাড়িয়ে তুলেছিল তার তুলনা সত্যই অসম্ভব। তবে যাই হোক দ্বাদশ শতকের ভক্তিমূলক

গীতিকাব্যের নিদর্শনরূপে ‘গীতগোবিন্দ’ যে সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যের মর্যাদা লাভ করেছিল, তার সর্বশ্রেষ্ট প্রমাণ এবং সাক্ষ্য বহন করে সেযুগে এবং পরবর্তী সময়ে এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তাই। ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে এই কাব্যের রচয়িতা, তাঁর জন্মস্থান এবং সময়কাল নিয়েও অন্যান্য সংস্কৃত কবিদের ন্যায় বিতর্কের অন্ত নেই।

(ক) জয়দেবের সনাক্তীকরণ :

দ্বাদশ শতাব্দীর লক্ষ্মণ সেনের মহামাণ্ডলিক বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস কবি জয়দেবের সমসাময়িক একজন পণ্ডিত ছিলেন। সে সময়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের খ্যাতি বিস্তৃত ছিল। তিনি ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে ‘সদুক্তিকর্ণামৃত’ নামে একটি কবিতা গ্রন্থ সংকলিত করেন। এই গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ পণ্ডিত রামাবতার শর্মা ও পণ্ডিত হরদত্ত শর্মার সম্পাদনায় সর্বপ্রথম ১৯৩৩ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক ড. সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কর্তৃক সম্পাদিত ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় থেকে প্রকাশিত সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি নতুন সংস্করণ বর্তমানে আমরা হাতে পাই। এই সদুক্তিকর্ণামৃতে ২৪০০টি সংস্কৃত কবিতা পাওয়া যায়। কবিতাগুলি ৫টি পৃথক্ পর্বে বা প্রবাহে সাজানো হয়েছে এর মধ্যে প্রায় ৫০০টি কবিতার রচয়িতার নাম পাওয়া যায় নি, বাকি কবিতাগুলির রচয়িতারূপে প্রায় ৫০০ কবির নাম আমরা পাই। এদের মধ্যে প্রায় ৩০০-এর বেশী কবি বঙ্গদেশের অর্থাৎ গৌড়বঙ্গের। সংকলনগ্রন্থটি যে ৫টি পর্ব বা প্রবাহে বিভাজিত হয়েছে তা হল –

১) অমরপ্রবাহ (বা দেবপ্রবাহ) অর্থাৎ দেবদেবী বিভাগ,
২) শৃঙ্গারপ্রবাহ অর্থাৎ প্রেমলীলা বিভাগ,
৩) চাটুপ্রবাহ অর্থাৎ স্তুতি বা স্তাবকতা বিভাগ,
৪) অপদেশপ্রবাহ অর্থাৎ ব্যাজ বা ছল বিভাগ, এবং
৫) উচ্চাবচপ্রবাহ অর্থাৎ উত্থান-পতন বিভাগ।

এই সদুক্তিকর্ণামৃতের অনেকগুলি শ্লোকে কেবলমাত্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য নয়, আধুনিক বাংলা কবিতার সম্ভাবনারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও সদুক্তিকর্ণামৃতকে সেকারণে বাংলা কাব্যসাহিত্য চর্চার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে হয়। শ্রীধরদাস তাঁর সদুক্তিকর্ণামৃতের বিভিন্ন প্রবাহে প্রায় ৩১টি শ্লোক “জয়দেবস্য” শিরোনামে বিন্যস্ত করেছেন।[১] এই ৩১টি শ্লোকের মধ্যে ৫টি নিয়েছেন ‘গীতগোবিন্দ’ থেকে[২]। সেহেতু অনুমান করা যায় বাকি শ্লোকগুলি গীতগোবিন্দকার জয়দেবেরই। কারণ ‘ছন্দঃসূত্র’কার জয়দেবের কবি হিসাবে কোনো পরিচিতি ছিল না, আর ‘প্রসন্নরাঘব’ নাটকের রচয়িতা জয়দেব গীতগোবিন্দকার জয়দেবের সমসাময়িক হলেও হতে পারেন, কিন্তু তাঁর নাম-যশ এই গ্রন্থখানি সংকলনের সময়ে বঙ্গদেশে এসে পৌছেছিল কিনা, সেবিষয়ে সন্দেহ আছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, সংস্কৃত সাহিত্যে গীতগোবিন্দকার জয়দেব ছাড়াও আরও কয়েকজন জয়দেবের নাম পাওয়া যায়।

‘ছন্দঃসূত্র’কার জয়দেব, ‘বৈষ্ণবামৃত’ বা ‘পীযূষলহরী’ নাট্যকার জয়দেব, ‘চন্দ্রালোক’ অলংকার গ্রন্থপ্রণেতা ও ‘প্রসন্নরাঘব’ নাট্যকার জয়দেব।

ছন্দঃসূত্রকার জয়দেবের নাম আলংকারিক আনন্দবর্ধনের বিখ্যাত ধ্বনিগ্রন্থ ‘ধন্যালোকে’র বিখ্যাত টীকাকার অভিনবগুপ্ত তাঁর ‘লোচন’ টীকাতে উল্লেখ করেছেন। অভিনবগুপ্তের আবির্ভাবকাল আনুমানিক নবম শতাব্দী, আবার জয়দেবের পূর্ববর্তী হর্ষট নামে এক ব্যক্তি ছন্দঃসূত্রের উপর একটি টীকা রচনা করেছিলেন। এই হর্ষটের সময়কাল আনুমানিক নবম শতাব্দী। এর থেকে অনুমিত হওয়া যায় যে গীতগোবিন্দকার জয়দেব এবং ছন্দঃসূত্রকার জয়দেব দুইজনই আলাদা ব্যক্তি।

‘বৈষ্ণবামৃত’ বা ‘পীযূষলহরী’ হল একাঙ্ক নাটক। এই নাটকটি উড়িষ্যা থেকে আবিষ্কৃত হওয়ার পর গীতগোবিন্দকার জয়দেব ও বৈষ্ণবামৃতকার জয়দেবের মধ্যে অভিন্নত্ব ও তাঁর উৎকলপ্রদেশীত্ব নিয়ে দাবী ওঠে । কারণ আবিষ্কৃত পুঁথিটি ওড়িয়া অক্ষরে লিখিত। এই নাটকটির রচয়িতার নাম আমরা নাটকের মধ্যেই পেয়ে থাকি –

“চিত্রং চঞ্চলচঞ্চলেব চতুরা চেতশ্চমৎকারিণী
পীযূষদ্যুতিমণ্ডলীব মধুরস্বচ্ছপ্রবাহচ্ছটা।
দৃগভঙ্গীব কুরঙ্গভঙ্গুরদৃশামানন্দসন্দায়িনী
গোষ্ঠী শ্রীজয়দেবপণ্ডিতমণেঃ সা বর্ত্ততে নর্তিতুম্।।”[৩]

চঞ্চলা রমণীর ন্যায় চিত্তচমৎকারিণী চতুরা অমৃতদ্যুতিমণ্ডলীর মত স্বচ্ছপ্রবাহ মধুরা, কুরঙ্গনয়না কামিনীর অপাঙ্গভঙ্গীর ন্যায় আনন্দদায়িনী, পণ্ডিতচূড়ামণি শ্রীজয়দেবের এই বিচিত্র নৃত্যসভা।[৪]

নাটকটি প্রধানতঃ রচিত হয়েছিল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে এবং এটি জগন্নাথদেবের মন্দিরেই প্রথম অভিনীত হয়েছিল। তা আমরা বুঝতে পারি নান্দ্যন্তে সূত্রধারের সামাজিক সম্বোধনের মাধ্যমে –

‘অহো ভগবতো ভাগবত-জন-শীতময়ূখস্য নীলাচলমৌলিমণ্ডনমনের্গরুড়ধ্বজস্য প্রাসাদে প্রমোদললিতাঃ সামাজিকাঃ।’[৫] অর্থাৎ অহো ভক্তবৃন্দের নিকট চন্দ্রতুল্য (উপভোগ্য) নীলশিখরের শিরোরত্ন ভগবান্ বিষ্ণুর প্রাসাদে সহৃদয়গণ উৎসবে মত্ত হইয়াছেন।[৬]

উড়িষ্যা থেকে প্রাপ্ত পুঁথিটির লিপি ওড়িয়া ও জগন্নাথ মন্দিরে অভিনয় এবং জয়দেবের নৃত্যসভা প্রভৃতি থেকে সন্দেহ জাগে গীতগোবিন্দকার জয়দেব ও বৈষ্ণবামৃতকার জয়দেব একই কিনা, কিন্তু যেহেতু সদুক্তিকর্ণামৃতগ্রন্থে জয়দেবের নামে সংকলিত প্রায় ৩১টি শ্লোকের মধ্যে ৫টি শ্লোক গীতগোবিন্দকাব্য থেকে নেওয়া এবং বৈষ্ণবামৃত বা পীযূষলহরী নাটক থেকে একটিও শ্লোক নেওয়া হয় নি, যেহেতু মহাপ্রভুর পুরীধামে দীর্ঘ ১৮ বৎসর বাসকালে পুস্তকখানি রায় রামানন্দের মতো সুকবি তথা পণ্ডিতের দৃষ্টির অগোচরে ছিল, সেহেতু অনুমান করা যায় বৈষ্ণবামৃত বা পীযূষলহরীকার জয়দেব একজন পৃথক্ কবি। তাছাড়া এই প্রসঙ্গে বলা যায়

গীতগোবিন্দকার জয়দেবের লেখনী বা কাব্যের ভাষা ললিতমধুর ও প্রাঞ্জল, কিন্তু পীযূষলহরীর ভাষা ললিতমধুর নয়। অনেকে জয়দেবকে যে উৎকলপ্রদেশীয় বলে দাবী করেন সেই উৎকলপ্রদেশীয় জয়দেব আসলে গীতগোবিন্দকার জয়দেব না, পীযূষলহরীকার জয়দেব। গীতগোবিন্দকার জয়দেবের খ্যাতি সুদূর প্রসারিত হওয়ায় একই নাম হওয়ার জন্য উক্ত নাটকের রচয়িতাকে জয়দেব বলে দাবী করা হয়েছে। এই পীযূষলহরী ও পীযূষলহরীকার জয়দেব সম্বন্ধে এর থেকে আর বেশী কিছু জানা যায় না।

উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তমদেবও একটি 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন তার নাম 'অভিনবগীতগোবিন্দ'। কিংবদন্তী আছে এই 'অভিনবগীতগোবিন্দ' কাব্যটি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে জয়দেবের গীতগোবিন্দের পর গীত হত। কিন্তু পরবর্তী কালে রাজা প্রতাপরুদ্রের সময়ে শুধুমাত্র 'গীতগোবিন্দ' গীত হত। কারণ সেই সময় রাজা প্রতাপরুদ্রের আদেশ ছিল যে জগন্নাথ মন্দিরে কেবলমাত্র 'গীতগোবিন্দ' গীত হবে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে সেই সময় জয়দেবের গীতগোবিন্দই একমাত্র গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছিল। যদি তা না হত তাহলে এই রকম আদেশের কোনো সঙ্গতি থাকত না।

'প্রসন্নরাঘব' নাটক ও 'চন্দ্রালোক' নামক অলংকারগ্রন্থপ্রণেতা অপর একজন জয়দেবের উল্লেখ পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ ইনি গীতগোবিন্দকার জয়দেবের সমসাময়িক। 'প্রসন্নরাঘব' নাটকটি রামায়ণ কথা অবলম্বনে রচিত। প্রসন্নরাঘবকার জয়দেবের পিতার নাম মহাদেব ও মাতার নাম সুমিত্রা। ইনি কৌণ্ডিন্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, এনার গুরু ছিলেন হরি মিশ্র, এনার উপাধি ছিল পীযূষবর্ষ। ইনি গীতগোবিন্দকার জয়দেবের কাছাকাছি সময়ে বর্তমান ছিলেন তা জানা যায় ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত কাশ্মীরীয় পণ্ডিত জল্হণকৃত 'সূক্তিমুক্তাবলী' বা 'সুভাষিতমুক্তাবলী' নামক সংগ্রহগ্রন্থে 'প্রসন্নরাঘব' থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করা থেকে। অনেকে অনুমান করেন যে ইনি বিদর্ভের অর্থাৎ উত্তর মহারাষ্ট্রের অধিবাসী ছিলেন। চন্দ্রালোক নামক অলংকারগ্রন্থ থেকে এনার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে –

"পীযূষবর্ষপ্রভবং চন্দ্রালোকমনোহরম্।
সদানিধানমাসাদ্য শ্রদ্ধয়া বিবুধামুদাম্।।
জয়ন্তি যাজক—শ্রীমন্মহাদেবাঙ্গজন্মনঃ।
সূক্তপীযূষবর্ষস্য জয়দেবকবের্গিরঃ।।"[৭]

সুতরাং এর থেকে অনুমিত হয় 'সদুক্তিকর্ণামৃত'গ্রন্থে যাঁর শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে তিনিই গীতগোবিন্দকার জয়দেব এবং তিনি পূর্বোক্ত জয়দেবগণের মধ্যে কেউ নন। কারণ গীতগোবিন্দকার জয়দেব তাঁর গ্রন্থে পরিচয় দিয়েছেন তিনি ভোজদেব ও বামাদেবী মতান্তরে রাধাদেবীর পুত্র —

"শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুতশ্রীজয়দেবকস্য।
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু।।"[৮]

(খ) আবির্ভাবকাল ও বাসভূমি :

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের মাতৃভূমিতে আগত যোগী, ঋষি, সাধু, সন্ত, ভক্ত, কবি, প্রভৃতিদের ন্যায় জয়দেবের ক্ষেত্রেও কালনির্ণয়ে কোনো বিকল্প হয় নি, তবুও আনুমানিকভাবে তাঁকে দ্বাদশ শতাব্দীর কবি হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। তবে তাঁকে দ্বাদশ শতাব্দীর কবি হিসাবে গণ্য করে নেওয়ার পিছনে ঐতিহাসিক পটভূমিকার সঠিক পরিচয় অবগত হওয়া দরকার। গীতগোবিন্দকার জয়দেব বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণসেনের সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন--একথা যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় তাহলে তাঁর কাল নির্ণয়ে কোনো সমস্যা হয় না, কিন্তু অনেকে তা স্বীকার করেন না।

কবি জয়দেবের জীবনবৃত্তান্ত আমরা যা জানতে পারি তার অনেকটাই কিংবদন্তীনির্ভর, এই কিংবদন্তীগুলি ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ নয়। এই কিংবদন্তীর উৎস হিসাবে আমরা 'ভক্তমাল' জাতীয় চরিতগ্রন্থকে ধরি। ভক্তমালের যে সমস্ত সংস্করণ পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হিন্দিভাষায় রচিত গোয়ালিয়রের কবি নাভাজীদাসের ভক্তমাল এবং সংস্কৃতভাষায় রচিত মিথিলার কবি চক্রদত্ত প্রণীত ভক্তমাল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে শ্রীঅদিতি কুমার রায়-এঁর বাংলা ভাষায় ভক্তমালকাহিনীপুঞ্জের সাহিত্য ও ভক্তিরসসিক্ত সুললিত ও সাবলীল গদ্যরূপ পাওয়া যায়। এই ভক্তমাল জাতীয় আরও গ্রন্থ পাওয়া যায়। যেমন – গদাদ্বিবেদী রচিত 'সম্প্রদায়প্রদীপ', মহারাষ্ট্রের কবি মহীপতি রচিত 'ভক্তবিজয়'। এদের মধ্যে 'সম্প্রদায়প্রদীপ'-এর সময়কাল হিসাবে ধরা হয়েছে ১৫৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ,[৯] অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। আর নাভাজীদাসের ভক্তমালের সময়কাল হল আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দী। এই ভক্তমালের উপর আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'ভক্তিরসবোধিনী' নামক বিখ্যাত টীকা রচনা করেন প্রিয়দাসজী। চক্রদত্ত তাঁর গ্রন্থে জয়দেবকে উৎকলীয় বলেছেন –

> "জগন্নাথ পুরী প্রান্তে কেশৈব চোৎকলাভিধে
> কিন্দুবিল্ব ইতিখ্যাতো গ্রামো ব্রাহ্মণসংকুলাঃ।।১।।
> তত্রোৎকলে দ্বিজো জাতো জয়দেব ইতি শ্রুতঃ
> বিদ্যাভ্যাসরতঃ শান্তঃ পুরুষোত্তমপূজকঃ।।২।।"[১০]

কবি জয়দেব সম্পর্কে নাভাজীদাসের মূল ভক্তমালে একটি ছপ্পয় বা ষট্-পদী হিন্দী কবিতা পাওয়া যায় –

> "প্রচুর ভয়ো তিহুঁ লোক গীতগোবিন্দ উজাগর।
> কোককাব্য নবরস সরস শৃংগার কো সাগর।।
> অষ্টাপদী অভ্যাস করৈ তেহি বুদ্ধি বঢ়াবৈ।
> শ্রীরাধারমণ প্রসন্ন সুনন তঁহা নিশ্চৈ আবৈ।।
> সন্ত সরোবহুষ [-খ]ণ্ড কো পদ্মাবতী সুখজনক রবি।
> জৈদেব কবি চক্কবৈ খণ্ডমণ্ডলশ্বের আন কবি।।"[১১]

প্রিয়দাসজী তাঁর ভক্তিরসবোধিনী টীকাতে কিন্দুবিল্ব[১২] ও নীলাচলের রাজার কথা বলেছেন। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের নামোল্লেখ করেন নি।

প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস মূলত রাজরাজড়া ও অভিজাত সমাজের পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাস। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে রুটি ও রুচির কর্তা রাজাই ছিলেন। রাজা বলতে সম্রাট, বাদশাহ, সামন্তপ্রভু, জমিদার, জায়গীরদার ও অমাত্যদের সমাজ। রাজসভার কবিরাও জগতকে দেখতেন রাজকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে। রাজসভায় কবি পোষণ সেযুগে ছিল আভিজাত্যের ব্যাপার। যুদ্ধবিগ্রহে রাজাদের বীরগাথা ও কীর্তিকলাপের কাহিনী রচনার জন্য কবিদের প্রয়োজন হত। রাজপ্রশস্তি, তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতি ব্যাপারে শ্লোকরচনার জন্যও রাজসভার বৃত্তি প্রদান করে কবিদের প্রতিপালন করা হত। এছাড়াও যে সমস্ত রাজারা নিজে কবি ও কাব্যানুরাগী ছিলেন তাঁরা সেযুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের নিয়ে রাজসভাতে কাব্যচর্চা করতেন। গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার সঙ্গে যুক্ত পাঁচজন কবির নাম উল্লেখ আছে –

> "বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
> জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
> শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন
> স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ।।"[১৩]

অর্থাৎ উমাপতিধর বাক্যকে পল্লবিত করেন, জয়দেব শুদ্ধ সন্দর্ভরচনা করতে জানেন, শরণ দ্রুত পদরচনার জন্য শ্লাঘ্য, শৃঙ্গার রসের সৎ ও পরিমিত রচনায় আচার্য্য গোবর্ধনের প্রতিস্পর্ধী কেউ নেই এবং কবিরাজ ধোয়ী শ্রুতিধর। এই পাঁচজন কবি লক্ষ্মণসেনের রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সেনবংশীয় বিদ্যাভিলাষী রাজা কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে এই পাঁচ জন কবির নাম একত্রে উল্লেখ কবিজনোচিত প্রাচীন একটি রীতি। যেমন — ব্যাস-বাল্মীকি, ভাস-কালিদাসের নাম একত্রে উল্লিখিত হয়। এই পাঁচজন কবি সমসাময়িক ছিলেন বলে ধরে নেওয়া হয়। জয়দেব লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন। এই প্রসঙ্গে অনেকে বলেন সনাতন গোস্বামী নবদ্বীপের রাজসভার দ্বারে একটি শ্লোক ক্ষোদিত দেখেছিলেন–

> "গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
> কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ।।"

এখানে ধোয়ীকে কবিরাজ বলা হয়েছে।

জয়দেব যে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীধরদাস সংকলিত সদুক্তিকর্ণামৃত থেকে। সদুক্তিকর্ণামৃতগ্রন্থে শ্রীধরদাস জয়দেবের প্রায় ৩১ টি শ্লোক সংকলন করেছেন। তাঁর মধ্যে গীতগোবিন্দ থেকে ৫টি শ্লোক নিয়েছেন। এই পাঁচটি শ্লোক হল – ৬/১১, ১১/৩৪, ১২/১০, ১২/১২ এবং ১২/১৪।

এগুলি ছাড়া জয়দেবের অন্য যে শ্লোকগুলি সংকলিত করেছেন তার মধ্যে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হচ্ছে –

"লক্ষ্মীকেলিভুজঙ্গ জঙ্গমহরে সংকল্পকল্পদ্রুম
শ্রেয়ঃসাধকসঙ্গ সঙ্গরকলাগাঙ্গেয় বঙ্গপ্রিয়।
গৌড়েন্দ্র প্রতিরাজরাজক সভালংকার কারার্পিত-
প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল পালক সতাং দৃষ্টোহসি তুষ্টা বয়ম্।।"[১৪]

শ্লোকটিতে গৌড়েন্দ্র লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তি করা হয়েছে। লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তিমূলক শ্লোক থাকায় মনে করে হয় জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের রাজসভার সঙ্গে যোগ থাকা থেকে প্রমাণিক হয় জয়দেব দ্বাদশ শতাব্দীতেই বর্তমান ছিলেন।

জয়দেব লক্ষ্মণসেনের রাজসভার কবি ছিলেন একথা প্রমাণিত হলেও তিনি কি বাঙালি ছিলেন? না কি তিনি অন্য কোথাও থেকে গৌড়েন্দ্র লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় এসেছিলেন? গীতগোবিন্দের একটি শ্লোকে কবি তাঁর বাসভূমির উল্লেখ করেছেন –

"বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্ব-সমুদ্রসম্ভব-রোহিণীরমণেন।।"[১৫]

অর্থাৎ কেন্দুবিল্বরূপ সমুদ্র উত্থিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কেন্দুবিল্বগ্রামজাত শ্রীজয়দেব অতি বিনয় সহকারে শ্রীকৃষ্ণের এই বিলাপবাক্য বর্ণনা করিলেন। অর্থাৎ শ্রীজয়দেব কেন্দুবিল্ববাসী ছিলেন। এই কেন্দুবিল্ব বা বর্তমান কেন্দুলি গ্রামটি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় অবস্থিত এবং এই কেন্দুলি গীতগোবিন্দকার জয়দেবের বাসভূমি। এই গীতগোবিন্দকাব্যের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে এই কেন্দুবিল্বের অবস্থান নিয়েও মতবিরোধ দেখা যায়। উড়িষ্যা ও মিথিলার পণ্ডিতরা কেন্দুবিল্বকে তথা শ্রীজয়দেবকেও তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যে অবস্থিত কেন্দুবিল্ব গ্রামবাসী বলে দাবী করেন। "A Descriptive Catalog of Sanskrit Manuscripts of Orissa"–গ্রন্থে ভুবনেশ্বর মিউজিয়াম কিউরেটর শ্রীকেদারনাথ মহাপাত্র শ্রীজয়দেব ও গীতগোবিন্দ প্রসঙ্গে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধে জয়দেবের সমসাময়িক কয়েকজন কবি ও জয়দেবকে বিভিন্ন কারণে উড়িষ্যার বলে দাবী করা হয়েছে। পুরীর বলিপতন থানার অধীন অধুনা কেন্দুলি নামে একটি গ্রামকে জয়দেবের কেন্দুবিল্ব বলে নির্দেশ করা হয়েছে। এছাড়া কিছু মূর্তি থেকে অর্থাৎ ভাস্কর্যগত প্রমাণ থেকে জয়দেবের বিষ্ণু সম্পর্কিত পৌরাণিক ধারণা ওড়িষী––এও বলা হয়েছে। তাছাড়া ওড়িশী সাহিত্যে জয়দেবের বিপুল প্রভাব থেকে জয়দেব ওড়িষ্যার কবি––এই রকম দাবী করে ওড়িষ্যাবাসীরা।

শ্রীকেদারনাথ মহাপাত্র আরও বলেছেন যে, মিথিলায়ও একটি গ্রাম আছে যার নাম 'কেন্দোলি'। মৈথিলী পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে জয়দেবকে তিরহুত বা তিরভুক্তি অর্থাৎ মিথিলার বলে দাবী করেন।

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ কাব্যটি রচিত হওয়ায় পরে পরেই সারা ভারতে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাহিত্য গীতগোবিন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। শুধুমাত্র দীর্ঘকালের জনশ্রুতিতে নয়, জয়দেব যে বাঙালী ছিলেন এবং লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা শ্রীধরদাসের সংকলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত'গ্রন্থ থেকে জানা যায়। সেখানে জয়দেবের নামে সংকলিত ৩১টি শ্লোকের মধ্যে ৫টি গীতগোবিন্দ থেকে সংকলিত এবং বাকী ২৬টির মধ্যে কয়েকটিতে তিনি রাজা লক্ষ্মণসেনের স্তুতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বাঙালী বলে উল্লেখ করেছেন। জয়দেবের নামের সঙ্গে জড়িত পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার অজয়নদের তীরবর্তী কেন্দুলি নামক গ্রামে প্রায় ৮৫০ বছর ধরে এক বাৎসরিক মেলার মাধ্যমে গীতগোবিন্দকার জয়দেবের স্মৃতি রোমন্থন করা হয়ে আসছে। এই কেন্দুলি এখনও পশ্চিমবঙ্গে এক বিশিষ্ট বৈষ্ণবক্ষেত্র। এই মেলা এখন 'জয়দেব-কেঁদুলি' নামে পরিচিত। এই মেলায় বৈষ্ণব সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সঙ্গে বাউল প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভক্তরা ও সাধারণ তীর্থযাত্রীরাও প্রচুর পরিমাণে আসে। এই মেলাকে ধর্মসমাবেশও বলা চলে। বীরভূমের এই কেন্দুবিল্ব বা বর্তমান কেন্দুলি গ্রামটিই কবি জয়দেবের জন্মভূমি--এই মতটি বহুজন সমর্থিত।

(গ) জীবনকথা :

জয়দেব বাঙালীর অতিপ্রিয় কবি হলেও জয়দেবের জীবন সম্পর্কে অতি অল্পই জানা যায় তাঁর গ্রন্থ থেকে। জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব এবং মাতার নাম বামাদেবী বা মতান্তরে রাধাদেবী। তাঁর একজন প্রিয়বন্ধু হলেন পরাশর –

"শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুতশ্রীজয়দেবকস্য।
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু।।"[১৬]

অর্থাৎ বামাদেবীর উদরে এবং শ্রীভোজদেবের ঔরসজাত শ্রীজয়দেবকবির শ্রীগীতগোবিন্দকাব্য পরাশরাদি প্রিয়বন্ধুদের কণ্ঠে বিরাজ করুন। জয়দেবের প্রারম্ভিক জীবন সম্পর্কে বেশী কিছু জানা যায় না। যা কিছু জানা যায় তা তাঁর বংশধর ও টীকাকারদের থেকে। বলা হয় যে তাঁর জন্ম বসন্ত পঞ্চমীতে হয়েছিল। শৈশবকালে তাঁর পিতা-মাতা পরলোক গমন করেন। তাঁর ছোট বেলা অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছিল। তিনি যাযাবররূপে থাকতেন এবং দুরাত্রির বেশী একটি বৃক্ষের নীচে থাকতেন না। কঠোর পরিশ্রম করে তিনি সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য, কাব্যশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, কামশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি নিজেকে জগন্নাথদেবের চরণে অর্পণ করেছিলেন। সেখানে তিনি কীর্ত্তন গান গাইতেন, মৃদঙ্গ বাজাতেন, তারপর তাঁর মনে হয়েছিল যে তিনি অষ্টপদী রচনা করতে সমর্থ হবেন। পরে তিনি মাধুর্য্যভাবসম্পন্ন অষ্টপদী রচনা করতে শুরু করেছিলেন এবং কীর্ত্তনরূপে গান গাইতে আরম্ভ করেছিলেন।

জয়দেবের পত্নীর নাম পদ্মাবতী, তা তিনি তাঁর গ্রন্থের বহু জায়গায় উল্লেখ করেছেন –

'পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী।'[১৭]

'জয়তি পদ্মাবতীরমণজয়দেবকবিভারতীভণিতমতিশাতম্।'[১৮]

'বিহিতপদ্মাবতীসুখসমাজে।'[১৯]

এই সমস্ত উক্তি থেকে জানা যায় পদ্মাবতী ছিলেন জয়দেবের পত্নী। টীকাকারেরা কেউ কেউ অবশ্য 'পদ্মাবতী' অর্থে লক্ষ্মী বা রাধাকে ধরেছেন। তবে গীতগোবিন্দের দশম সর্গের দশম শ্লোকে 'জয়তি পদ্মাবতীরমণ-জয়দেব-কবি' ইত্যাদি পদ্যাংশে পদ্মাবতীকে জয়দেবের পত্নী বলা হয়েছে। 'কেন্দুবিল্ব-সমুদ্রসম্ভব-রোহিণীরমণেন'[২০] – এই বিশেষণটি দেখে কেউ কেউ বলেছেন 'রোহিণী' তাঁর আর এক পত্নী, আবার অনেকে বলেছেন রোহিণী জয়দেবের পরকীয়া।

(ঘ) কিংবদন্তী :

জয়দেব ও পদ্মাবতী সম্বন্ধে গীতগোবিন্দ ছাড়া অন্য যে গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় সেগুলি হল চক্রদত্তের 'ভক্তমাল', নাভাজী দাসের 'ভক্তমাল', বীরভূমের কবি বনমালীদাসের 'জয়দেবচরিত্র' এবং হলায়ুধ মিশ্রের 'সেকশুভোদয়া'। তবে কিংবদন্তীকে আশ্রয় করে এই সমস্ত গ্রন্থে জয়দেবকথা রচিত হয়েছে, যার কোনো প্রামাণিকতা নেই।

জয়দেবের বিবাহ বিবরণ অত্যন্ত অদ্ভুত। দক্ষিণদেশীয় জনৈক নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ দম্পতী সন্তানকামনায় শ্রীধাম পুরুষোত্তমে এসে জগন্নাথের সেবা দ্বারা একটি কন্যা সন্তান লাভ করেন। ব্রাহ্মণ কন্যাটির নাম পদ্মাবতী রেখে যথাবিধি লালন-পালন করছিলেন। পদ্মাবতীকে শিক্ষা, গান, বাজনা প্রভৃতিতে পারদর্শী করিয়েছিলেন। তারপর পদ্মাবতী যখন বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠলেন তখন তাঁকে নিয়ে জগন্নাথের নামে উৎসর্গনিমিত্ত কৃতসংকল্প হয়ে শ্রীধাম পুরুষোত্তমে আসেন। এমন সময় তাঁদের শ্রীজগন্নাথদেব প্রত্যাদেশ দেন যে, জয়দেব নামক আমার একজন সেবক, তিনি এক্ষণে গৃহ পরিত্যাগ করে বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁকে তুমি কন্যা সম্প্রদান কর। তিনিই তোমার কন্যার পতি। ব্রাহ্মণদম্পতী এই আদেশ পেয়ে কন্যা পদ্মাবতীসহ জয়দেবের নিকট গিয়ে জগন্নাথের আদেশ জ্ঞাপন করেন। জয়দেব কোনো প্রকারেই সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হতে সম্মত হন নি। তিনি ব্রাহ্মণকে তাঁর কন্যাকে নিয়ে চলে যেতে বলেন এবং সেই স্থান ত্যাগ করে পলায়নের কথা ভাবতে থাকেন। ব্রাহ্মণ জগন্নাথের আজ্ঞা পালনের কথা পুনরায় ব্যক্ত করেন। জয়দেবও দৃঢ়ভাবে তাঁর অনিচ্ছার কথা বলেন। তারপর ব্রাহ্মণ রেগে গিয়ে জয়দেবের কথা না শুনে পদ্মাবতীকে জয়দেবের নিকট রেখে প্রস্থান করেন এবং পদ্মাবতীকে বলে যান ইনিই তোমার স্বামী। জয়দেব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পদ্মাবতীকে তাঁর অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করাতে পদ্মাবতী উত্তর দেন – পিতা আমাকে আপনার চরণে সমর্পণ করেছেন এবং এটি শ্রীজগন্নাথদেবের আজ্ঞা। অতএব আপনি আমাকে ত্যাগ করলেও আমি আপনাকে ত্যাগ করব না। আমি কায়-মনো-বাক্যে

আপনার চরণ সেবা করব। আপনার সেবা ও তুষ্টি ছাড়া আমার আর কিছু কর্তব্যান্তর নেই –

"পিতা সমর্পিল আর জগন্নাথ আজ্ঞা।
তুমি মোর স্বামী মোর এইত প্রতিজ্ঞা।।
তুমি যদি কর ত্যাগ আমি না ছাড়িব।
কায়মনোবাক্যে তব চরণ সেবিব।।"[২১]

একথা শুনে জয়দেব ভাবতে লাগলেন যে জগন্নাথের আজ্ঞা তো অন্যথা হবার নয়, তাই উপায়ান্তর না দেখে পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করলেন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। স্ত্রী পদ্মাবতীকে রাধামাধবের সেবায় নিয়োজিত করলেন। পদ্মাবতী পরম প্রীতিসহ শ্রীরাধামাধবের সেবা করতে লাগলেন।

এই শ্রীরাধামাধবের অপার করুণায় শ্রীজয়দেব শ্রীরাধা ও মাধবের লীলারসমাধুর্য্যে পরিপূর্ণ ভুবনবিখ্যাত 'শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ' এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থটি রচনার সময় একটি চমৎকার ঘটনা রয়েছে। গ্রন্থটি রচনার সময় শ্রীজয়দেব যখন শ্রীকৃষ্ণখণ্ডিতা নায়িকা শ্রীরাধার মান প্রশমনার্থ তাঁর শ্রীচরণে পতিত হবেন, সেই স্থানে জয়দেব সঙ্কোচ প্রকাশ করতে লাগলেন এবং অনেক চিন্তা করেও "স্মর গরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্"[২২] পর্যন্ত লেখার পর পাপবোধে আর লিখতে পারছিলেন না। তারপর পুঁথি বন্ধ করে স্নানের নিমিত্ত সমুদ্রে গমন করলেন। এমতাবস্থায় জয়দেবরূপী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এসে স্বহস্তে পাদটি পূরণ করে দিয়ে লিখলেন – "দেহি পদপল্লবমুদারম্।"[২৩] শুধু তাই নয় লেখা শেষ হওয়ার পর পদ্মাবতীর বিশ্বাসের জন্য নিত্য অনুষ্ঠিত দেবসেবা প্রভৃতি নিত্যকর্ম সমাপন করে জয়দেবের ন্যায় বিশ্রামের জন্য ঘরে গেলেন। পদ্মাবতীও রোজকার মত স্বামীর পাতে খেতে বসলেন। এমন সময় কবি জয়দেব স্নান সেরে বাড়িতে প্রবেশ করলেন এবং পদ্মাবতীকে খেতে দেখে বিস্মিত হলেন যে, পদ্মাবতী তাঁর খাওয়ার পূর্বে খান না, পদ্মাবতীও বিস্মিত হলেন যে তাঁর স্বামী জয়দেব এই মাত্র খেয়ে বিশ্রামের জন্য ঘরে গেলেন। তাহলে উনি কে? তারপর পদ্মাবতী বিশ্রাম ঘরে গিয়ে দেখলেন কেউ নেই। তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন ভগবান্ স্বয়ং গৃহে এসেছিলেন। পদ্মাবতী পুথি এনে জয়দেবকে দেখালেন সেখানে লেখা আছে – "দেহি পদপল্লবমুদারম্। তারপর কৃষ্ণস্পর্শে ধন্য 'গীতগোবিন্দ'কাব্যটি জয়দেব শেষ করলেন।

জয়দেবের ক্ষমা গুণের সুন্দর একটি ঘটনা আমরা জানতে পারি কিংবদন্তী থেকে। জয়দেব তাঁর পত্নী পদ্মাবতীর সঙ্গে কিছুকাল গৃহে বাস করার পর নিজেদের আরাধ্য দেবতার মূর্তির ধর্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ধনসঞ্চয় করার জন্য আবার পরিভ্রমণে বের হলেন। ফলে কিছু মুদ্রা সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের দোষে তাঁর উদ্দেশ্য তিনি চরিতার্থ করতে পারেন নি। তিনি কেবল বৃন্দাবন ও জয়পুরে গিয়েছিলেন ধনসঞ্চয়ের নিমিত্ত। কিন্তু পরিশেষে দস্যুগণ পথিমধ্যে তাঁকে আক্রমণ করে তাঁর সমস্ত মুদ্রা

হরণপূর্বক তাঁকে আহত করে পালিয়ে গিয়েছিল। তাঁরপর একরাজা পথিমধ্যস্থ আহত জয়দেবকে দেখে নিজের রাজধানীতে এনে শুশ্রুষা করে সুস্থ করে তুলেছিলেন। তার কিছুদিন পর ঐ সমস্ত দস্যুগুলি নিজেদেরকে পরিব্রাজক পরিচয়ে উল্লিখিত রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। জয়দেব পরিব্রাজক বেশধারী স্বধনাপহারক সেই দস্যুগুলিকে চিনতে পেরেছিলেন। সেই সময় তিনি অনায়াসেই সেই দস্যুগুলিকে প্রতিহিংসাবশতঃ ধরিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি। বরং যথোচিত দয়া প্রদর্শনপূর্বক তাদেরকে অর্থ দিয়ে বিদায় করে দিয়েছিলেন। রাজার দুজন অনুচর তাদেরকে রাজাধিকৃত রাজ্যের সীমা পর্যন্ত রেখে আসার জন্য প্রেরিত হয়েছিল। আততায়ীর প্রতি এমন সৌজন্য প্রদর্শন তথা ক্ষমাপরায়ণতা নিতান্ত দুর্লভ।

জয়দেব তাঁর পত্নী পদ্মাবতীকে বাড়ি থেকে পূর্বোক্ত রাজধানীতে এনে বসবাস করতে লাগলেন। এমন সময় পদ্মাবতী অকস্মাৎ আত্মঘাতী হলেন। আত্মঘাতী হবার কারণ জানা নাই। 'ভক্তমাল' গ্রন্থে লিখিত আছে, জয়দেবের মিথ্যা মৃত্যু সমাচার পেয়ে পতিপ্রাণা পদ্মাবতী দেহ পরিত্যাগ করেছিলেন, পরিশেষে জয়দেব তাঁকে 'কৃষ্ণনাম' শ্রবণ করিয়ে পুনরায় জীবিত করেন –

"মিথ্যা করি গোঁসাইর মৃত্যু সমাচার।
রাণী কহে পদ্মা আগে করি লোক দ্বার।।
শুনি মাত্র পরাণ বিয়োগ হইল তার।
রাণী অপরাধী হয়ে করে হাহাকার।।
* * * * * * * * * * * * * * *
ভয়ে কম্পবান্ নৃপে দিলা সমাচার।
রাজা বহু রাণীরে করিলা তিরস্কার।।
গোঁসা এর চরণে পড়িয়া রাজা কহে।
গোঁসাই কহেন রাজা চিন্তা কিবা তাহে।।
মৃত সঞ্জিবনী মন্ত্র কৃষ্ণ নামাক্ষর।
কর্ণে শুনাইলে হবে পরাণ সঞ্চার।।
এতেক কহি সাধু গেল তাহার নিকটে।
কৃষ্ণ কহো বলিতেই চমকিয়া ওঠে।।"[২৪]

এরপর জয়দেব নিজ জন্মভূমি কেন্দুলি গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাকী জীবনটা তিনি সেখানে অতিবাহিত করেন।

একটি কিংবদন্তী আছে যে, জয়দেব প্রতিদিন ভাগীরথীতে স্নান করতে যেতেন। ভাগীরথী কেন্দুবিল্ব থেকে অষ্টাদশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিলেন। ফলে ভাগীরথী দেবী জয়দেবের নিকট প্রস্তাব দিয়েছিলেন--তোমার প্রতিদিন এত কষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই, আমিই তোমার আবাস গ্রামের সমুপবর্তিনী হব। জয়দেব ভাগীরথী

দেবীর এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন এবং সেই অনুসারেই ভাগীরথীর একটি শাখা কেন্দুলি গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়।

জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী নৃত্যগীতে পারদর্শী ছিলেন। সেজন্য তাঁর নাম জয়দেবের সঙ্গে সগৌরবে উল্লিখিত হয়। সঙ্গীতনিপুণা পদ্মাবতীর সঙ্গীত পারদর্শিতা সম্বন্ধে হলায়ুধ মিশ্র বিরচিত 'সেকশুভোদয়া' গ্রন্থ থেকে জানা যায় – কোনো একদিন বুঢ়ণমিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণ গৌড়েন্দ্র লক্ষ্মণসেনের সভায় উপস্থিত হয়ে বললেন – আমি একজন বিদগ্ধ সঙ্গীতশিল্পী এবং বিবিধ শাস্ত্রে পণ্ডিত। আমি উড়িষ্যার সঙ্গীতশিল্পী ও পণ্ডিতদের সাথে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে রাজা কপিলেন্দ্রদেবের কাছ থেকে জয়পত্র নিয়েই আপনার রাজ্যে এসেছি। আমাকে সঙ্গীতশাস্ত্রে পরাস্ত করতে পারবে এমন কেউ যদি আপনার রাজ্যে থাকে তাহলে তাঁকে আহ্বান করুন। সেই সময় রাজসভায় সেক্ জালাল উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন, তিনি বললেন হে ব্রাহ্মণ আপনি একটি সঙ্গীত পরিবেশন করুন, আমরা শুনি। তখন ব্রাহ্মণ বুঢ়ণমিশ্র একটি পাঠমঞ্জরী রাগ আলাপ করলেন এবং সঙ্গীতটি পরিবেশন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিকটস্থ অশ্বত্থগাছের পাতাগুলি ঝড়ে পড়ল, তা দেখে উপস্থিত সভ্যগণ 'সাধু সাধু' বলে বাহবা দিলেন। সকলে বলাবলি করতে লাগল যে, তারা এইরকম ঘটনা এর আগে কখনও দেখেননি এবং শোনেননিও। তারপর নানারকম বাজনা লাগল এবং রাজা লক্ষ্মণসেন ব্রাহ্মণ বুঢ়ণমিশ্রকে জয়পত্র দিতে উদ্যত হলেন। জয়দেব পত্নী পদ্মাবতী গঙ্গা স্নান সেরে ফেরার পথে বাজনার শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি রাজসভাতে উপস্থিত হলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে পদ্মাবতী বললেন, আমি ও আমার স্বামী জয়দেবের জীবিতাবস্থায় এই জয়পত্র নেওয়ার কারও অধিকার নেই এবং তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বললেন যে, যে ব্যক্তি আমাদের দুজনকে সঙ্গীতে বা শাস্ত্রে পরাজিত করতে পারবেন তিনিই এই জয়পত্র নেওয়ার প্রকৃত অধিকারী। আপনারা আমার স্বামী জয়দেবকে ডেকে পাঠান। আমি ও আমার স্বামী ওনার সাথে প্রতিযোগিতা করব। তখন সেক্ বললেন, হে ব্রাহ্মণী, আপনার স্বামীর গুণ বিচার পরে হবে, এখন আপনি একটি রাগ আলাপ করুন। সেকের কথা শুনে পদ্মাবতী গান্ধার রাগ আলাপ করলেন, তখন গঙ্গার তীরে যে সমস্ত চালকবিহীন নৌকা ছিল সেগুলি পদ্মাবতীর নিকটস্থ নদীতীরে এসে ভিড়েছিল। এই দৃশ্য দেখে সকলে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলেন যে, এই ব্রাহ্মণী সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁর এই কেরামতি আমরা আগে কখনও দেখিনি বা শুনিনি। বুঢ়ণমিশ্র যা করলেন তাও প্রশংসনীয়, কিন্তু দুজনার মধ্যে এই ব্রাহ্মণী শ্রেষ্ঠ। কারণ গাছ একটি সজীব বস্তু, মিশ্রের গান শুনে ঝড়ে পড়তেও পারে। কিন্তু নির্জীব নৌকা পদ্মাবতীর গান শুনে উল্টো দিকে চলে আসার দৃশ্য সত্যিই অবিশ্বসনীয়।

তারপর সেক্ বললেন আপনারা দুজনেই সঙ্গীতে অপূর্ব নিদর্শন রেখেছেন। এখন আপনাদের মধ্যে কে জয়ী এবং কে পরাজিত, তা শাস্ত্রবিচারের দ্বারা নির্ধারিত হোক। তখন বুঢ়ণমিশ্র বললেন যে, আমি স্ত্রীলোকের সাথে শাস্ত্রবিচার করতে চাই না। কারণ এরাজ্যে দেখেছি স্ত্রীলোকেরা বহুগুণযুক্তা এবং পুরুষেরা মূর্খ। একথা শুনে

পদ্মাবতী দাসী পাঠিয়ে জয়দেবকে আনার ব্যবস্থা করলেন। সবকিছু শুনে জয়দেব বললেন, বসন্তকালে গাছের পাতা ঝড়ে পড়েছে, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, তখন সেক্ বললেন বসন্তকালে পাতা ঝড়ে এটা স্বাভাবিক, কিন্তু একদিনেই এতগুলি পাতা ঝড়ে পড়া অস্বাভাবিক, প্রতিদিন অল্প অল্প করে ঝড়ে পড়ে। এবার জয়দেব বুঢ়ণমিশ্রকে বললেন, আপনি আবার সঙ্গীত পরিবেশন করুন এবং ঐ পত্রহীন গাছটিতে পুনরায় যাতে নতুন পাতা জন্মায় তার ব্যবস্থা করুন। তখন বুঢ়ণমিশ্র বললেন, এই কাজ তিনি পারবেন না। সেক্ জয়দেবকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি পারবেন? তখন জয়দেব হ্যাঁ পারবো বলে বসন্তরাগ আলাপ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই গাছটিতে নতুন কচি পাতা ভরে গেল। চারদিকে তখন জয়ধ্বনি শোনা গেল এবং বুঢ়ণমিশ্র পরাজয় স্বীকার করে চলে গেলেন।

জয়দেব নিতান্ত করুণ হৃদয় ও পরম ধার্মিক মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের জীবনের অধিকাংশভাগই কেবলমাত্র উপাসনা ও ধর্ম ঘোষণাতেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর ন্যায় পরম ভাগবত নিতান্ত দুর্লভ। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর মত মহানুভব ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত ধারাবাহিকরূপে পাওয়া যায় না, যেটুকু পাওয়া তা কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে, যার কোনো প্রামাণিকতা নেই।

তথ্যসূত্র :

১) সদুক্তিকর্ণামৃত
২) গীতগোবিন্দ - ৬/১১, ১১/৩৪, ১২/১০, ১২/১২, ১২/১৪ - এই ৫টি।
৩) কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, পৃ. ১৬৬
৪) তদেব, পৃ. ১৬৬
৫) তদেব, পৃ. ১৬৬
৬) তদেব, পৃ. ১৬৬
৭) তদেব, পৃ. ৩৯
৮) গীতগোবিন্দ - ১২/২৯
৯) History of Dharmaśāstra, Vol-I, p. 660
১০) গীতগোবিন্দ ও জয়দেবগোষ্ঠী, পৃ. ১১২
১১) তদেব, পৃ. ১১২
১২) কিন্দুবিল্ব গাঁও, ভাসৈঁ ভএ কবিরাজরাজ।
ভরয়ো রসরাজ হিয়ে মন মন চাখিয়ৈ।।
১৩) গীতগোবিন্দ - ১/৪
১৪) সদুক্তিকর্ণামৃত - ৩/১১/৫
১৫) গীতগোবিন্দ - ৩/১০
১৬) তদেব - ১২/২৯

১৭) তদেব - ১/২
১৮) তদেব - ১০/১০
১৯) তদেব - ১১/২১
২০) তদেব - ৩/১০
২১) ভক্তমাল, দ্বাদশমালা
২২) গীতগোবিন্দ - ১০/৮
২৩) তদেব - ১০/৮
২৪) ভক্তমাল, দ্বাদশমালা

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

কৃষ্ণদাস কবিরাজ। *চৈতন্যচরিতামৃত*। সম্পা. রাধাগোবিন্দ নাথ। কলিকাতাঃ সাধনা প্রকাশনী, ১৯৮৩।

গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ। গৌড়ীয় *বৈষ্ণবদর্শন ও সাধনাতত্ত্ব*। কলিকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯।

গঙ্গোপাধ্যায়, সুখেন্দুসুন্দর। *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা*। কলিকাতাঃ সোনার তরী, ১৯৯৭।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *জয়দেব*। নতুন দিল্লীঃ সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৭৩।

জয়দেব। গীতগোবিন্দ। সম্পা, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়,, রুমা বন্দোপাধ্যায়। কলিকাতাঃ সদেশ, ২০০৮।

জয়দেব। *শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্*। সম্পা, কৃষ্ণচরণ গোস্বামী। কলিকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪০০ বঙ্গাব্দ (৩য় সং.)।

জয়দেব। *শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্*। সম্পা, হরিদাস দাস। কলিকাতাঃ সংস্কৃত পুস্কত ভান্ডার, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

দাসগুপ্ত, প্রশান্তকুমার। *গীতগোবিন্দ ও জয়দেবগোষ্ঠী*। কলিকাতাঃ ইন্ডিয়ান পাব্লিকেশনস্, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন। *বড়ুচন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সমগ্র*। কলিকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬৬।

মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ*। কলিকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭।

বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*। কলিকাতাঃ মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রা.লি., ২০০৮।

বন্দোপাধ্যায়, দেবনাথ। *বৈষ্ণব কবি প্রসঙ্গে*। কলিকাতাঃ রত্নাবলী, ১৯৯৫।

শ্রীধরদাস। *সদুক্তিকর্ণামৃত*। সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা: ফার্মা. কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৫। মুদ্রিত।

শ্রীনাভাদাসজী। *ভক্তমাল*। গীতাপ্রেসঃ গোরক্ষপুর, ২০০৭ ।

শ্রীলালদাস বাবাজী। *শ্রীশ্রীভক্তমাল*। সম্পা. শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়। কলকাতাঃ অক্ষয় লাইব্রেরী, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ।

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১।

Kane, P.V. *History of Dharmaśāstra (Vol. I)*. Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1930. Print.

উত্তর আধুনিক কবি নির্মলেন্দু গুণের কবিতার গতি প্রকৃতি

আজাহারউদ্দিন মিদ্যা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সুনীতি এডুকেশনাল ট্রাস্ট বি.এড কলেজ, কল্যাণী, নদীয়া

সারসংক্ষেপ: বাংলা দেশের উত্তর আধুনিক এক শক্তিমান কবি নির্মলেন্দু গুণ। তিনি গত কয়েক দশক ধরে একের পর এক কবিতার সোনালী ফসল আমাদের উপহার দিয়ে আছন্ন করেছেন নিদারুন মানবিকতায়, কখনো কাতর করেছেন দেশাত্মবোধে আবার কখনো প্রেমের মায়ায়। নির্মলেন্দু গুণের কবিতার গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় প্রথম দিকের কবিতায় জনগনের উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং রাজনৈতিক সচেতনতা একটি প্রধানতম বিষয় হয়ে উঠতে চেয়েছিল। কবির বিভিন্ন কবিতায় স্বদেশ চেতনা ও ভাষা আন্দোলন সক্রিয় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাছাড়া পরবর্তীকালে তিনি তাঁর কবিতায় প্রেমের ভালোবাসাহীন প্রায় সবরকম অনুভূতির প্রকাশ দেখিয়েছেন। কবির প্রেমের কবিতায় আছে স্নিগ্ধ আর্তিময় প্রেম, পরস্ত্রী গণিকা সহ প্রায় সব নারীর প্রতি নেবেদিত প্রেম। তিনি নারীর ভিতর দিয়ে প্রকৃতির কাছে এবং প্রকৃতিত ভিতর দিয়ে নারীর কাছে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। কবিতার মধ্যদিয়ে কবি জীবনানন্দের বৃত্তের থেকে বেরিয়ে এসে আত্মকেন্দ্রিক মানব চরিত্রের সুপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।
মূল শব্দ: দেশাত্মবোধ, নিদারুণ, আর্তিময় প্রেম, গণিকা, আত্মকেন্দ্রিক।

মূল আলোচনা:

উত্তর আধুনিক কবিতার প্রাণপুরুষ নির্মলেন্দু গুণ, যিনি কলমের আঁচড়ে অক্ষরের প্রজাপতি উড়িয়েছেন কবিতার খাতার পাতায় পাতায়। গত কয়েক দশক ধরেই একের পর এক কবিতার সোনালি ফসল আমাদের উপহার দিয়েছেন। তিনি আমাদের আচ্ছন্ন করেছেন নিদারুণ মানবিকতায়, কখনো কাতর করেছেন দেশাত্মবোধে, আবার কখনো প্রেমের মায়ায়। নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় প্রথম দিকে জনগনের উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং রাজনৈতিক সচেতনতা একটি প্রধানতম বিষয় হয়ে উঠতে চেয়েছিল। ১৯৪৭ এর দেশভাগ উত্তরকালে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দলোন আমাদের জাতীয় জীবনের একটি মহোত্তম ঘটনা, আর এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নির্মলেন্দু গুণের বহু কবিতা লিখিত হয়েছে। শুধু ভাষা আন্দলোন নয়, ১৯৭৯ এর পর বাংলাদেশের জীবনে এলো আরও একটি কালপর্ব তা হলো মুক্তি সংগ্রামের। এই ঊনসত্তরের গণআন্দোলন অগ্নি উদ্‌গীরণ, প্রচণ্ড উদ্বেলতায় স্পর্শ করলো কবি নির্মলেন্দু গুণের কবি সত্তাকে। তিনি বাংলা কবিতাকে শিল্পনন্দন ও জীবন ঘনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর কবিতায় স্বদেশ চেতনা প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে দেখা দিয়েছে। ১৯৭৫ এ বঙ্গবন্ধু সেখ মুজিবর

রাহমানের নির্মম হত্যা কাণ্ডের পর তিনি তাঁর সেই সব স্মরণীয় কবিতা নিয়ে প্রকাশ্য অবস্থান করেছিলেন। এই সাহস ও দেশপ্রেম তাকে সমগ্র বাঙালির কাছে বিশেষভাবে আদৃত করেছে।

নির্মলেন্দু গুণ এর প্রকৃত নাম নির্মলেন্দুপ্রকাশ গুণ চৌধুরী, জন্ম ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ শে জুন, বাংলাদেশের নেত্র কোনার বারহাট্টা উপজেলার কাশবন গ্রামে। বাবার নাম সুখেন্দুপ্রকাশ গুণ এবং মায়ের নাম বীনাপানি দেবী। শিক্ষাজীবন শুরু বারহাট্টায়। ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগেই খালেকদাদ চৌধুরী সম্পাদিত 'উত্তর আকাশ' নামে নেত্রকোনা থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় নির্মলেন্দু গুণের প্রথম কবিতা 'নতুন কাণ্ডারী' প্রকাশ পায়। এর পর তিনি ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে আনন্দমোহন কলেজ থেকে আই.সি.এস পরীক্ষায় দক্ষতার সাথে প্রথম বিভাগে পাশ করেন। বাবা সুখেন্দুপ্রকাশ চেয়েছিলেন ছেলে ডাক্তার হোক। তার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগে ভর্তির জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। কিন্তু হঠাৎ করে হিন্দু-মুসুলমান দাঙ্গা শুরু হলে ভর্তির লিস্ট থেকে তাঁর নাম লাল কালিতে কেটে দেওয়া হয়। পরে ১৯৬৯ সালে প্রাইভেট কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। কলেজ জীবনের শুরু থেকেই বোহেমিয়ান জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষায় আসক্ত হয়ে পড়েন। একদিকে বৃত্তির টাকা, অন্য দিকে হতাশা এই রকম পরিস্থিতিতে কবির রক্তের ভিতরে লুকিয়ে থাকা আত্মপ্রকাশের উন্মুক্ত নেশাগুলো গুটি বসন্তের মতো ফুটে বেরুতে শুরু করে। এই সময় তিনি নিজেকে নষ্ট করার মাতলামির মধ্যেও এক অন্তহীন উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রকাশ করেন 'আজাদ' ও 'মোহাম্মদী' পত্রিকাতে।

বিশ শতকের ছয় দশকের ভূখণ্ড রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সাতচল্লিশের দেশ ভাগের পর পাকিস্থান রাষ্ট্রের জন্ম পরবর্তী ঘটনা বাঙালিকে এক মোহনায় সংযুক্ত করে। একটি রাষ্ট্র বিভক্ত হয়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্থান ও পশ্চিম পাকিস্থানের চেহারা নেয়। পূর্ব পাকিস্থান নামক ভূখণ্ডে বৈষম্য, দমনপীড়ন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবধান প্রকট হয়ে উঠে। স্বায়ত্ত শাসনের দাবি থেকে মুক্তি সংগ্রামে যুক্ত হয় আপামর জনতা। এখান থেকেই বাংলাদেশে কবিতা আন্দোলনের এক নতুন ধারা সূচিত হয়। বিষয় বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক পরিবর্তন নিয়ে মনোনিবেশ করেন এই সময়ের কবিরা। এই দশকের প্রধান কবি নির্মলেন্দু গুণ বাংলা কবিতাকে শিল্পনন্দন ও জীবন ঘনিষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর কবিতায় স্বদেশ চেতনা, রাজনৈতিক চেতনা, প্রেম চেতনা ও প্রকৃতি চেতনা প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে দেখা দিয়েছে। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রাহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর তিনি তাঁর সেইসব স্মরণীয় কবিতা নিয়ে প্রকাশ্য অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এই সাহস ও দেশপ্রেম তাকে সমগ্র বাঙালির কাছে বিশেষভাবে আদৃত করেছে।

স্কুলের ছাত্রাবস্থায় নির্মলেন্দু গুণ কবিতার মোহনীয় জালে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে নির্মলেন্দু গুণের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' প্রকাশিত হয়।

ছয় দশকের আন্দোলন, মুক্তি ও সংগ্রাম, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই কাব্যগ্রন্থের মূল উপজীব্য। তাঁর কবিতা বিশেষ ভাষা, বক্তব্য, উপমা-চিত্রকল্পের মাধ্যমে সবাইকে সচকিত করেছে। ঊনসত্তরের উন্মাতাল ঘটনা, লড়াই-সংগ্রাম মুখ্য প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে। তিনি বিশ্বাস করেছেন প্রিয়বস্তু ত্যাগ করার পর স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব। তাঁর 'হুলিয়া' কবিতাটির উপস্থাপনার বিশেষত্ব, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা, সাধারণ মানুষের দিনযাপন, আত্মগোপন ও পরবর্তী সময়ের বর্ণনা নির্মলেন্দু গুণ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন:

"আমি যখন বাড়িতে পৌঁছলুম তখন দুপুর,
আমার শরীরের ছায়া ঘুরতে ঘুরতে ছায়াহীন
একটি রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে।
কেউ চিনতে পারেনি আমাকে,
ট্রেনে সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে একজনের কাছ থেকে
আগুন চেয়ে নিয়েছিলুম, একজন মহকুমা স্টেশনে
উঠেই
আমাকে জাপটে ধরতে চেয়েছিল,
একজন পেছন থেকে কাঁধে হাত রেখে চিৎকার করে
উঠেছিল।
আমি সবাইকে মানুষের সমিল চেহিরার কথা স্মরণ
করিয়ে দিয়েছি।"

(হুলিয়া)

শুধু 'হুলিয়া' নয়, 'জনাকীর্ণ মাঠে জিন্দাবাদ', 'স্বদেশের মুখ', 'যুদ্ধ', 'অসমাপ্ত কবিতা', প্রেমাংশুর রক্ত চাই', 'মানুষ' প্রভৃতি কবিতায় পাঠক যেমন দেশপ্রেম ও মানবিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন তেমনি 'চুক্তি', 'অসভ্য শয়ন', 'প্রতিদ্বন্দ্বী' সহ একাধিক কবিতায় প্রেমের বাতাবরণে এসেছে দ্রোহ। 'মানুষ' কবিতায় জীবনানন্দের ছায়া আছে বলে মনে হয়। এই কবিতায় বঞ্চনা এবং ক্ষোভে গুণের কবিকণ্ঠ উচ্চকিত হয়ে ওঠে। উদ্ভিন্ন কবি যেন আর মানুষ থাকেন না। তিনি অন্তর্গত ক্ষত নিয়ে কবিতায় ফেটে পড়েন। যেমন:

"আমি হয়তো মানুষ নই, মানুষগুলো অন্যরকম,
হাঁটতে পারে, বসতে পারে, এ-ঘ্র থেকে ও-
ঘরে যায়,
মানুষগুলো অন্যরকম, সাপে কাটলে দৌড়ে
পালায়।"

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে নির্মলেন্দুর গুণের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'না প্রেমিক না বিপ্লবী' প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের 'আগ্নেয়াস্ত্র', 'রবীন্দ্রনাথের বাঁশি', প্রথম অতিথি', 'আগুন', প্রভৃতি কবিতায় স্বদেশের চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন। এছাড়া 'দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী' (১৯৭৪)

কাব্যগ্রন্থের 'আমার কিছু স্বপ্ন ছিল' কবিতায় স্বাধীনতা প্রত্যাশী কবি স্বদেশের জয়গান করেন। নির্মলেন্দুর আর একটি বিখ্যাত কবিতা 'স্বাধীনতা শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো'। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নিয়ে লেখা ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের এ কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে সহস্র প্রতিকূলতাকে অস্বীকার করে তাঁর দৃপ্ত পায়ে হেঁটে জনতার মঞ্চে এসে দাঁড়ানোর কথা। শোনালেন তিনি:

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারেরে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
সেই থেকে 'স্বাধীনতা' শব্দটি আমাদের।"

শুধু মুজিব নয়, ১৯৬৮ তে 'লুথার কিংকে নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ' কবিতা সংকলন বের করেন। আবার রুশ কবি লুকোনিন এর সূত্রেই তিনি 'সোভিয়েত প্রীতি' ও ' সমাজ বাস্তববাদী মার্কসীয় সাহিত্য দর্শনের প্রতি আস্থা' জ্ঞাপন করেছেন।

কবি নির্বাচিতার ভূমিকা লিখেছিলেন ১৯৮৩ সালের শেষ দিকে। এর আগেই কবি তার কবিজীবনের, কাব্যবস্তু ও প্রকরণের অনেক পালাবদল ঘটে গেছে। প্রথম পর্যায়ের প্রেম, বিষণ্ণতা ও নৌরাশ্য-বোধে আকণ্ঠ নিমর্জ্জিত তিনি। 'দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী' (১৯৭৪), 'চৈত্রের ভালোবাসা' (১৯৭৫), 'বন্ধু আমার' (১৯৭৫), এবং 'আনন্দ কুসুম' (১৯৭৬) কাব্যগ্রন্থে সমাজ সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন এক আত্মমুখী, নির্জন বিরহলোকের অধিবাসী কবি। ফলস্বরূপ কবিতার রূপকল্পে পরিবর্তন দেখা যায়। তার ভাষণ ধর্মিতার পরিবর্তে কবিতা হয়ে উঠেছে চিত্ররূপময়।

নির্মলেন্দু গুণ আত্মরতি কিম্বা দেহজ আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে স্মৃতি ও স্বপ্নের এক বাসনালোক সৃষ্টি করেন। 'বাংলার মাটি বাংলার জল' (১৯৭৮) কাব্যগ্রন্থ থেকেই গুণের সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সামাজিক উপযোগিতার সঙ্গে কবিতার অন্তর্ময় সঙ্গতি শিল্পের ইতিহাসের একটা স্বীকৃত পন্থা। 'সমাজতন্ত্র' (১৯৭৯), 'চাষাভূষার কাব্য' (১৯৮১), 'দূর হ দুঃশাসন' (১৯৮৩) প্রভৃতি কাব্যের কবিতায় তিনি শিল্প অপেক্ষা বক্তব্যের চাহিদাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে কবি যে সচেতনভাবে এই নতুন কাব্যবস্তু গ্রহণ করলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 'রাজদণ্ড', 'তোমার মুক্তির জন্য হে সুন্দর', 'আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি', 'প্রত্যাবর্তন', কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে আলাপ প্রভৃতি কবিতায় গুণের এ পর্যায়ের আত্মস্বরূপ শিল্পিত রূপ লাভ করেছে। রাজনৈতিক বক্তব্যের গণমুখিতা একজন কবিকে কতটা জনপ্রিয়তা দান করে তা কাজী নজরুল ইসলামের দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের জানা। এ জাতীয় কবিতায় নির্মলেন্দু গুণ বাঙালি পাঠকচিত্তের হৃদয় স্পর্শ করতে সমর্থ হয়েছেন।

নির্মলেন্দুর প্রেম-অপ্রেম চির অমীমাংসিত সমস্যা। 'প্রেমের কবিতা' শিরোনামে তাঁর একটি বইও প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রকৃতি ও প্রেমের কবিতা পড়ে বোঝা যায়, নারী ও প্রকৃতি একে অন্যের পরিপূরক। জীবনানন্দ দাশের মতো কবি নির্মলেন্দু গুণও মানুষ ও উদ্ভিদ জগতকে একটি সজীব অনুভূতিতে একাকার করে দেখেছেন। তবে কবির

প্রেম শুধু নারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। কখনো তিনি দেশ, সংগ্রাম, সমাজ, বিশ্বকেও প্রেমের বাঁধনে বেঁধে রাখতে চেয়েছেন। 'আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি' কবিতায় তাই তো তিনি বলেছেন:

> "সমবেত সকলের মতো আমিও গোলাপ ফুল খুব
> ভালবাসি,
> রেসর্কোস পার হয়ে যেতে সেইসব গোলাপের
> একটি গোলাপ
> গতকাল আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ
> মুজিবের কথা বলি।
> আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।"

তবে কখনো তিনি রোমান্টিক হলেও প্রায়শই তিনি দেহবাদী। সম্ভোগতার চিহ্ন পাওয়া যায় 'তুলনামূলক হাত', 'সহবাস', 'হিমাংশুর স্ত্রীকে', 'স্ত্রী' প্রভৃতি কবিতায়। 'হিমাংশুর স্ত্রীকে' কবিতায় মৈথুনের বর্ণনার সাথে সাথে বঙ্গ বিভাজনের আত্মগত ভাষণ কবির কণ্ঠে ফুটে ওঠে: 'কিছু না পাওয়ার অভিমানে একজন জ্বল জ্যান্ত পাপ, খাপহীন তলোয়াল নিয়ে আমরা দু'জন তাই গতকাল সারা রাত ধরে যে যুদ্ধের শরীর দেখেছি সেখানে স্পষ্টতঃ জীবন থেকে যৌবন, স্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্ন, সিদ্ধান্ত থেকে গন্তব্য, গন্তব্য থেকে আলো খন্ডিত বাঙলার মতো যেন চিরকাল মীমাংসিত সত্য আলাদা'।
শুধু এ কবিতা নয়, 'দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনীতে' কবির বেপরোয়া উচ্চারণ কাব্যময় হয়ে ওঠে:

> "আমার করুণা নেই, দয়াধর্ম নেই। আমার যৌবন যাকে চায়
> আমি তাকে এভাবেই তুলে আনি বধ্যভূমিতে
> সে যদি পূজার যোগ্য রাজরানি হয়, আমি তাকে
> দেবতা বলি না, রাজবেশ্যা বলি। বলি যৌবনের স্বপ্নভোগ্যা নারী।
> আম্রপালির মতো সেই নারী তৃপ্ত করে আমার বাসনা।"
>
> (অন্য রকম আমি)

আসলে এই কবিতায় ভাষার চাকচিক্য ও কল্পচিত্র নির্মাণে কবি যে নান্দনিকতা-ইতিহাস চেতনার আশ্রয়ে যে দার্শনিকতা প্রকাশ পেয়েছে পরবর্তীকালে তা বজায় থাকেনি। একমাত্র প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় তিনি সফল এবং ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত 'প্রকৃতি ও প্রেমের কবিতাসমগ্র' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন:

'আমি কিভাবে নারীর ভিতর দিয়ে প্রকৃতির কাছে এবং প্রকৃতির ভিতর দিয়ে নারীর কাছে পৌঁছাতে চেয়েছিলাম; কাব্যোপলব্ধিতে নারী ও প্রকৃতি মিলেমিশে কিভাবে একটি অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছিল, এ বিষয়টিও পাঠকের কাছে স্পষ্ট হবে'।

তবে এই ধরণের মন্তব্য যে কবির সফল হয়েছে এমনটা নয়। আমরা আল মাহমুদের কবিতায় এ ধরণের উচ্চ নান্দনিক কল্পচিত্রের পরিচয় পাই। তবে নির্মলেন্দু

তাঁর নারী ও নারী সম্পর্কিত অমার্জিত স্বেচ্ছাচারিতাকে শাসন করতে পেরেছিলেন সেখানে বরং নারী ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা নির্মাণে তিনি সফল। আবার প্রকৃতি বিষয়ক কয়েকটি কবিতায় তিনি নিজের মেধা ও মণীষাকে কাব্যশিল্পে সুষমা দান করতে সক্ষম। সেরকম একটি কবিতা হলো:

"কি আগুন খেলছে দুপুরে, আমি উবু হয়ে চোখ বুজে
আকাশের দিকে পিঠ রেখে অশোক গাছের নীচে
শুয়ে আছি, আমার সমান দীর্ঘ কাঠের চেয়ারে,
সূর্যময় গাছের ছায়ায়। শরীরে আগুন নিয়ে শুয়ে আছি
দালির জেব্রার মতো প্রজ্জ্বলন্ত শুয়ে আছি, কাছাকাছি
সামান্য বাতাস যেন নেই, কলাপাতা কাঁপছে না,
একটি ফড়িং দিব্যি বাতাসের সাথে বাজি ধরে
ঘোড়ার কেশরে বসে আছে। শিশুর শিশ্নের মতো,
কিছুই বোঝে না যেন, প্রাণহীন, উত্তেজনাহীন
নিস্তেজ বোধে ন্যুব্জমুখ।"

(অশোক গাছের নীচে)

নির্মলেন্দু গুণের অগ্নিময় কবিতাগুলো বাংলাদেশের গৌরবময় ঐতিহ্য। তাঁর তেজোদীপ্ত কবিতা স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় চেতনা, রাজনৈতিক চেতনা, ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক এবং মানবিক বিপর্যয় রোধে কার্যকরী বলে মনে করা হয়। তিনি কখনো বিপ্লবী, কখনো প্রেমিক। গত কয়েক দশক ধরে আমাদের একের পর এক সোনালী ফসল উপহার দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের জীবনের স্বপক্ষে তাঁর কণ্ঠ নিরন্তর উচ্চকিত। বহুদ্যোতনা, বিচিত্র বিষয়ে পূর্ণ তাঁর কবিতাভুবন। বিষয়বৈচিত্র্য, স্বতঃস্ফূর্ততা, আবেগের সাথে মানবিকতার যোগ তাঁর কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই সম্ভবত তাঁর কবিতা বহুল পঠিত, জনপ্রিয়তার শীর্ষে। তাঁর কবিতা শিল্পময়তার অনন্য সম্ভার, যা তাকে বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি হিসাবে অভিহিত করেছে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০২০।
২. চক্রবর্তী, সুমিতা, *আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়,*কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১৬।
৩. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *আধুনিক কবিতার ইতিহাস,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬।
৪. মিশ্র, অশোককুমার, *আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০২০।

৫. জানা, সুস্নাত, *পোস্ট মডার্নিজম ও বাংলা কবিতার উত্তর আধুনিক চেতনা,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮।

৬. মুখোপাধ্যায়, তরুণ, *বাংলা কবিতা অনেক আকাশ,* কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০২২।

৭. রহমান, মিজানুর, ইয়াসিন, তাহা, *প্রেম,* ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১২।

৮. গুণ, নির্মলেন্দু, *রচনাবলি* (১-৩ খন্ড) ঢাকা: রকমারি কালেকশন, ২০১৯।

৯. গুণ, নির্মলেন্দু, *প্রেমের কবিতা,* ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ২০১২।

১০. গুণ, নির্মলেন্দু, *মুজিব লেনিন ইন্দ্রিরা,* ঢাকা: বইবাজার প্রকাশনী, ২০১৭।

মার্কসীয় মতাদর্শ সংক্রান্ত বাংলা প্রবন্ধের ধারা : বিশশতকের শেষার্ধ

অমিত দে
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
কাশীপুর মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপ: বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ধারায় রাজনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ, বাঙালি জীবনে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উন্মেষের এক যথাযথ নিদর্শন। শিক্ষিত এবং বুদ্ধিজীবী বাঙালিরা এই ধরণের প্রবন্ধের মাধ্যমে উনিশ শতকের রেনেসাঁর সময় সমস্ত জাতিকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্য শক্তি যুগিয়েছিলেন। বাংলা ভাষা তথা গদ্যসাহিত্যের শৈশবলগ্ন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত গদ্যভাষার রচনা নিয়ে যতরকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা সেগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা – একথা বলা যেতে পারে। সমকালীন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং প্রবন্ধের ভাষা, এই দুই মিলে সাধারণের মানসে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য যেন এক উদ্দীপক রসায়নের মতো কাজ করেছে। যার ফলস্বরূপ অবিভক্ত ভারতের অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে বর্তমান কালের বিভিন্ন আন্দোলন পর্যন্ত – প্রতিবাদের এক বিস্তৃত পথ তৈরি হয়েছে। এই বিস্তৃত পথের মধ্যে মার্কসীয় মতবাদ অনুসারী পথ অন্যতম।

একথা সত্য, মার্কস-এঙ্গেলস কিংবা লেনিন শিল্প-সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের কোনও সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক স্বতন্ত্র ইতিহাস বা গ্রন্থ রচনা করেননি। কিন্তু এই তিন দার্শনিক বিভিন্ন সময়ে, নানা উপলক্ষে, শিল্প-সাহিত্য তথা মানস-সংস্কৃতি সম্পর্কে যেসব আলোচনা ও মন্তব্য করেছেন তার পরিমাণ বিপুল না হলেও পর্যাপ্ত। আর এই সব পর্যালোচনা একত্র করে এবং এর সারাৎসারের মধ্য দিয়ে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের ধারণায় উপনীত হওয়া যেতে পারে।

সূচক-শব্দ : বাংলা প্রবন্ধ, বিশ শতক, প্রতিবাদের পথ, বাঙালি জীবন, মার্কসীয় সাহিত্য।

সম্পূর্ণ গবেষণাপত্র

ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় যে প্রতিবাদ ছিল বিদেশী শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে, পরবর্তীকালে অর্থাৎ বিশ শতকের শেষার্ধে সেই প্রতিবাদের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠল দেশীয় শাসকবর্গ। একদিকে দেশভাগের ক্ষত, অব্যবস্থা, শাসনতান্ত্রিক অরাজকতা, উদ্বাস্তু সমস্যা, অপরদিকে বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মানুষের মানসিকতার ধীরে ধীরে পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাওয়া – এই সব মিলে বিশ শতকের শেষার্ধের রাজনৈতিক আন্দোলনকে এক বিশেষ মাত্রা দান করেছিল। এই সময় শুধুমাত্র বৈপ্লবিক

আন্দোলনের জোয়ার আসেনি, সঙ্গে এসেছে হঠকারিতা এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। রাজনীতি যে মানুষের জন্য, সে কথা বিস্মৃত হয়ে 'মানুষ' মানুষের বিরুদ্ধে জারি করেছে 'খতম'-এর শমন। ছয় এবং সাতের দশকে পশ্চিমবঙ্গের বুকে উগ্র রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং হাজার হাজার যুবকের অকাল প্রয়াণ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক ভিন্নধর্মী অধ্যায়ের সূচনা করে। বিশ শতকের শেষার্ধে রচিত প্রবন্ধগুলি এই উত্তাল সময়ের সাহিত্যের ফসল।

□রাজনীতি সংক্রান্ত বাংলা প্রবন্ধ : বিশ শতকের শেষার্ধ (১৯৫০-১৯৯৯)

অখণ্ড বঙ্গদেশ থেকে শুধু পশ্চিমবঙ্গ – এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে সাধারণ বাঙালিরা, স্বাধীনতার আস্বাদন লাভ করেছিল। এই সঙ্কোচনের স্বরূপ কী, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে।

'স্বদেশী' যুগে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের শেষ লগ্নে রবীন্দ্রনাথ 'সদুপায়' (১৩১৫) শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, '.....বাঙালির বাংলাটুকুকেও এমনি করিয়া যদি ভাগ করা যায় যাহাতে মুসলমান বাংলা এবং হিন্দু-বাংলাকে মোটামুটি স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে বাংলাদেশের মতো এমন খণ্ডিত দেশ ভারতবর্ষে আর একটিও থাকিবে না।'[১]

কবির অভাবনীয় দূরদৃষ্টিতে যে সহায়হীন অবস্থাটা সেদিন ধরা পড়েছিল, ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভাঙা-বাংলার এ পারের মানুষ কলকাতায় বসে মর্মে মর্মে সে সত্য উপলব্ধি করেছিল। শুধু ভৌগোলিক অর্থেই নয়, চিন্তা বোধবুদ্ধি আদর্শ এবং কর্মের ক্ষেত্রেও বাংলার মতো খণ্ডিত জাতি-সত্তা আর একটিও আছে কী না সন্দেহ।

ভৌগোলিক দিক থেকে অবিভক্ত বঙ্গদেশের আয়তন ছিল ৮৫ হাজার বর্গমাইল, আর মাত্র পৌনে একত্রিশ হাজার বর্গমাইল সীমানা নিয়ে আবির্ভূত হল পশ্চিমবঙ্গ। বাঙালির চৈতন্যপ্রবাহে এক বেদনাদায়ক ছেদ এবং মানবিক মূল্যের অবনয়নের মধ্য দিয়ে অন্য এক বাংলা দেশ অস্তিত্বশীল হয়েছে ; এক ভৌগোলিক সত্তার পরিবর্তে অন্য ভৌগোলিক সত্তা, এক মানুষের পরিবর্তে অন্য এক মানুষ, জীবনের সাবেকী বোধের পরিবর্তে অন্য বোধ আত্মপ্রকাশ করেছে।

রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক, রাষ্ট্রিক, সমস্ত দিক থেকে রিক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ পূর্ব পাকিস্তান থেকে জন্মভূমি পরিত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছে। উদ্বাস্তু নামে পরিচিত এইসব সহায়সম্বলহীন বাঙালিরাই বিগত শতকের পাঁচের দশকে সর্বাধিক জরুরি, জটিল এবং বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

এমনই এক বিভ্রান্তিকর, জটিল এবং জরুরি অবস্থার প্রভাব বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের মধ্যেও লক্ষণীয়। বিশ শতকের শেষার্ধের বাঙালি জীবনের ও মননের যাবতীয় পর্বগুলি বাংলা প্রবন্ধের সাহিত্যিক ধারাকে এক নতুন পরিচয় দান করেছে। সমাজ, অর্থনীতি প্রভৃতির সঙ্গে বাঙালির রাজনৈতিক জীবনের চালচিত্র কিছুটা হলেও রাজনীতি সংক্রান্ত বাংলা প্রবন্ধে বিধৃত হয়েছে। এই অধ্যায়ে এমনই কিছু নির্বাচিত

প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করা হল। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রবন্ধগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন –

ক. রাজনৈতিক মতবাদ সংক্রান্ত প্রবন্ধ

খ. . অনুবাদমূলক রাজনৈতিক প্রবন্ধ

গ. মার্কসীয় মতাদর্শগত প্রবন্ধ

ঘ. সংস্কৃতি, গণতন্ত্র ও বিপ্লব সংক্রান্ত রাজনৈতিক প্রবন্ধ

ঙ. গণমাধ্যম, গণআন্দোলন ও রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ

বর্তমান গবেষণাপত্রে উল্লিখিত মার্কসীয় মতাদর্শগত বাংলা প্রবন্ধের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এক্ষেত্রে নির্বাচিত কিছু প্রবন্ধের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

□নির্বাচিত মার্কসীয় মতাদর্শগত প্রবন্ধ

বিশ শতকের শেষার্ধে বাংলা মার্কসীয় মতবাদ সংক্রান্ত প্রবন্ধের বাহুল্য দেখা যায়। ছয় থেকে নয়ের দশক পর্যন্ত বাংলার রাজনীতিতে যে বামপন্থী মতবাদের প্রভাব দেখা গিয়েছিল। সেই একই প্রভাব বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। তবে এই সমস্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে বেশ কিছু প্রবন্ধ রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের জন্যই রচিত। বাংলা সাহিত্যে সেগুলির বিশেষ কোনও অবদান নেই। কিন্তু গবেষণাপত্রের এই পর্বে মার্কসীয় মতবাদ সংক্রান্ত প্রবন্ধ হিসেবে সেই ধরণের কিছু প্রবন্ধও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কেবলমাত্র এই শ্রেণির প্রবন্ধের ধারাকে দেখানোর জন্যই এই অন্তর্ভুক্তি। এই ধরণের প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল –

১. পার্থ ঘোষ রচিত 'শ্রেণী, শ্রেণী সংগ্রাম, রাষ্ট্র ও বিপ্লব'(১৯৫৩)

মার্কস এবং এঙ্গেলসের মতে শ্রেণিসংগ্রামই ইতিহাসের চালিকাশক্তি। এ কথা বিস্মৃত হওয়ার নয়। প্রাবন্ধিক পার্থ ঘোষ, মার্কস-এঙ্গেলসের এই শিক্ষার গুরুত্ব এবং তাৎপর্যকে তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ 'শ্রেণী, শ্রেণী সংগ্রাম, রাষ্ট্র ও বিপ্লব'-এ বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। মার্কসবাদী মতাবলম্বী প্রাবন্ধিক মার্কসের দর্শন অনুযায়ী শ্রেণি এবং শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন। ফলত তাঁর প্রবন্ধটি নিরপেক্ষ না হয়ে একটি নির্দিষ্ট ভাবধারার ভাষ্য হয়ে উঠেছে।

মার্কস ও এঙ্গেলস প্রদত্ত শিক্ষার তাৎপর্য এবং গুরুত্ব বুঝতে হলে শ্রেণি এবং শ্রেণিসংগ্রাম বলতে কী বোঝায়, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা প্রয়োজন। আমাদের চোখের সামনেই আমরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করছি আর বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সংগ্রামও দেখছি। কিন্তু এই শ্রেণি সম্বন্ধে মূল কথাটা কী তা স্পষ্টভাবে জানা প্রয়োজন। আমরা যে সমাজে বাস করছি সে সমাজে বিভিন্ন পেশার লোক দেখা যায়। এদের মধ্যে রয়েছে কলকারখানার মালিক, জমির মালিক, কলকারখানার মজুর, ক্ষেত মজুর প্রভৃতি। এছাড়া রয়েছে যারা অফিসে কাজ করে সেই সমস্ত কর্মচারী। এরা সবাই বিভিন্ন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত চলছে, সে সংঘাত সংগ্রামের রূপ

গ্রহণ করছে। বিকশিত হয়ে উঠেছে শ্রেণিসংগ্রাম। শ্রেণি, শ্রেণিস্বার্থের দ্বন্দ্ব, শ্রেণিসংগ্রাম – এ সব নিয়েই বিরাজ করছে আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থা।

কিন্তু শ্রেণি বলতে আমরা কী বুঝি ? রুশ যুব কমিউনিস্ট-লীগের তৃতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণে (২ অক্টোবর, ১৯২০) লেনিন এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এইভাবে, 'সাধারণভাবে শ্রেণি বলতে আমরা কী বুঝি ? শ্রেণি অর্থে বোঝায় এমন ব্যবস্থা, যার ফলে সমাজের একটি অংশ আরেকটি অংশের শ্রম আত্মস্যাৎ করতে পারে। যদি সমাজের একটি অংশ সমস্ত জমি আত্মস্যাৎ করে নেয় আমরা পাই জমিদার ও কৃষক শ্রেণিকে। যদি সমাজের একটি অংশ সমস্ত কলকারখানা ও শেয়ার, পুঁজির অধিকারী হয় এবং অন্য অংশ তাদের জন্য খাটে তাহলে আমরা পাই পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণিকে।'[২]

উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে শ্রেণির উৎসের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। বর্তমানে সমাজ বিকাশের ধারায় উৎপাদন যে-স্তরে এসে পৌঁছেচে তাতে উৎপাদন করতে গেলেই প্রয়োজন হয় জমি, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল। এগুলিকে বলা হয়ে থাকে উৎপাদনের উপায়সমূহ। প্রাবন্ধিকের মতে, আরও ব্যাপকভাবে বলা যেতে পারে যে, উৎপাদনের উপায়সমূহ হল, 'জমি, বন, জল, খনিজ সম্পদ, কাঁচামাল, উৎপাদনের যন্ত্র, উৎপাদনের স্থান, চলাচল ও যানবাহনের ব্যবস্থা।'[৩] কিন্তু মানুষের শ্রম ছাড়া, জীবন্ত শ্রমশক্তি ছাড়া উৎপাদনের উপায়সমূহ ফলহীন। উৎপাদনের উপায়সমূহের মধ্যে উৎপাদন যন্ত্র বলে যা আছে তা হল পূর্বেকার শ্রমের ফলে অর্জিত বস্তু, আরও সংক্ষেপে তা হল সঞ্চিত শ্রম। উৎপাদনের উপায়সমূহে যখন শ্রমশক্তি প্রয়োগ করা হয় তখনই শুরু হয় উৎপাদনের প্রক্রিয়া। ধনতন্ত্রী সমাজে পুঁজিপতিদের উৎপাদন শুরু করবার জন্য প্রয়োজন হয় কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, আবার যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি। কিন্তু এ সবই হল উৎপাদনের প্রস্তুতিপর্ব।

পুঁজিপতিদের যখন উৎপাদন শুরু করতে হবে তখন তাদের সংগ্রহ করতে হবে মজুরদের এবং কলকারখানার মজুরদের কাজে লাগাতে হবে – এ না হলে উৎপাদন শুরু হতে পারে না। উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিকানা যাদের হাতে তারা সমাজের একটা শ্রেণি সাধারণ কথায় যাদের বলা হয়ে থাকে উপরতলার শ্রেণি। এরাই হল পুঁজিপতি শ্রেণি যাদের বলা হয় বুর্জোয়া শ্রেণি। আর উৎপাদনের উপায়সমূহের কাজে যাদের নিয়োগ করা হয় তারা হল আর একটা শ্রেণি। সাধারণ কথায় যাদের বলা হয় নীচের তোলার শ্রেণি। এরাই হল শ্রমিক শ্রেণি যাদের বলা হয় প্রলেতারিয়েত শ্রেণি।

আসলে উৎপাদনের উপায়সমূহের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে নির্ধারিত হয় শ্রেণির অবস্থান। উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক কারা ? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে নিহিত রয়েছে সমাজের মূল শ্রেণি বিন্যাস। যেমন সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জমিই হল প্রধান উৎপাদনের উপায়। এই জমির যারা মালিক তারা হল জমিদার শ্রেণি। এই

জমিকে ফলপ্রসূ করার জন্য যাদের কাজে লাগানো হয় তারা হল কৃষক শ্রেণি। জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার দৌলতে জমিদারেরা এই কৃষকদের শোষণ করে। জমিদারেরা হল শোষক শ্রেণি আর কৃষকেরা হল শোষিত শ্রেণি।

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর ধনিকদের, পুঁজিপতিদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত, তাদেরই হাতে উৎপাদনের সমস্ত উপাদান। আর যারা এই উৎপাদনের উপায়সমূহ ফলপ্রসূ করার কাজে নিযুক্ত সেই শ্রমিকেরা নিঃস্ব, তাদের হাতে উৎপাদনের উপায়সমূহের কোন কিছুই নেই। পুঁজিপতিরা এঁদের শোষণ করে। উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা থেকে বঞ্চিত বলেই অনাহারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য শ্রমিকেরা মজুরির বিনিময়ে পুঁজিপতিদের কাছে নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে এবং শোষণের বন্ধন মেনে নিতে বাধ্য হয়। এখানে পুঁজিপতিরা হল শোষক শ্রেণি, আর শ্রমিকেরা হল শোষিত শ্রেণি।

সমাজজীবনের প্রধান ও নির্ধারক বিষয়টি হল বৈষয়িক উৎপাদন। তাই সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় জনসাধারণের এক একটা বিশেষ গ্রুপ কী স্থান অধিকার করে রয়েছে, উৎপাদনের উপায়সমূহের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কী – এরই মধ্যে খুঁজতে হবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত হওয়ার ভিত্তিটা।

লেনিন তাঁর ‘বৃহৎ উদ্যোগ’ (এ গ্রেট বিগিনিং) শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রেণির একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘শ্রেণিগুলি হল এমন কতকগুলি বৃহৎ জনসমষ্টি যাদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা নির্ভর করে ঐতিহাসিক ধারায় নির্ধারিত একটি সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের স্থান অনুযায়ী, উৎপাদনের উপায়সমূহের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অনুযায়ী (অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সম্পর্ক আইনের দ্বারা স্থির ও সূত্রবদ্ধ), শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকা অনুযায়ী এবং এর ফলস্বরূপ সমাজের যে সম্পদ তারা সৃষ্টি করে তার অংশের মাত্রা এবং সেই অংশ অর্জনের পদ্ধতির দ্বারা। শ্রেণিগুলি হল জনসাধারণের কতকগুলি গ্রুপ যার কোন একটি নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের পারস্পরিক অবস্থানের পার্থক্যের দরুন অপর গ্রুপগুলির শ্রম আত্মস্যাৎ করতে পারে।[৪]

কিন্তু শ্রেণির আবির্ভাব ঘটল কখন এবং তার পূর্বে কি ধরনের সমাজ ছিল ?

মার্কস-এঙ্গেলস রচিত ‘কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো’র প্রথম অধ্যায়ের সূচনাতেই রয়েছে, ‘আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস হল শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস।’[৫] এই ইতিহাস বলতে তখন (১৮৪৭-৪৮) সমগ্র লিখিত ইতিহাস বুঝাতো। পরে যখন মর্গানের চূড়ান্ত আবিষ্কারের ফলে আদিম কমিউনিস্ট ধরনের সমাজের অর্থাৎ জমির উপর যৌথ মালিকানা সম্বলিত আদিম উপজাতীয় সমাজের ভিতরকার সংগঠনই বিশিষ্ট রূপটিই উন্মুক্ত হল, তখন দেখা গেল সে সমাজে শ্রেণি বলে কিছু নেই।

মার্কসের মৃত্যুর পর – 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-র ১৮৮৮ সালের ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকার এক জায়গায় এঙ্গেলস লিখলেন, '.....মানব জাতির সমগ্র ইতিহাস (জমির উপর যৌথ মালিকানা সম্বলিত আদিম উপজাতীয় সমাজের অবসানের পর থেকে) হল শ্রেণিসংগ্রামেরই ইতিহাস, শোষক ও শোষিত, শাসক ও নিপীড়িত শ্রেণির সংগ্রামের ইতিহাস।'[৬]

এই আদিম যৌথ সমাজের বিকাশধারায় যখন এর অবসানের অবস্থার উদ্ভব হল তখনই দেখা দিল শ্রেণির আবির্ভাব। রাজনীতির ক্ষেত্রে মার্কসীয় মতবাদ অনুসারে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে শ্রেণি এবং শ্রেণি সংগ্রামের যে তত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে – সেই তত্ত্বের ভিত্তিতেই এই প্রবন্ধ রচিত হয়েছে।

২. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'মার্কসবাদ ও মুক্তমতি' (১৯৬০)

বর্তমান বিশ্বে মার্কসবাদকে অবলম্বন করে সমাজ, রাষ্ট্র বা অর্থনীতি যে-কোনো ধরনের বিষয়কে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। 'মার্কসবাদের শিক্ষার সবচেয়ে কঠোর বৈরী যারা, তাদেরও পণ্ডিত-মুখপত্রেরা নিজেদের বলতে আরম্ভ করছেন Marxiologists –এ যেন শত্রুভাবে ভজনার এক নামান্তর! যাই হোক, শত্রুমিত্র সবাইকে আজ জটিল এই জগৎকে বুঝবার প্রয়াসে মার্কসবাদ এবং তার প্রয়োগপদ্ধতি নিয়ে পর্যালোচনায় নামতে হয়েছে।'[৭]

মানবসমাজের উৎপত্তি, বিকাশ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্রমোন্নতির চর্চায় মার্কসবাদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রাবন্ধিক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মার্কসবাদ ও মুক্তমতি' প্রবন্ধগ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

৩. সঞ্জীব ঘোষ রচিত 'অস্তিবাদ, গণতন্ত্র ও মার্কসবাদ' (১৯৬৩)

এই প্রবন্ধগ্রন্থটি লেখার উদ্দেশ্য, ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত জাঁ পল সার্ত্র-র বহু বিতর্কিত বই 'The Critic of Dialectical Reason'-এর উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু বাংলা ভাষায় পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা। এই বইটির উদ্দেশ্য হল সমসাময়িক দুই দর্শন – অস্তিবাদ ও মার্কসবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায় কিনা তা বিচার করে দেখা। এ ব্যাপারে সার্ত্র-র প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলা ভাষায় সার্ত্র-র বক্তব্যকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপিত করা নিতান্তই শক্ত কাজ। তাছাড়া, অস্তিবাদ ও মার্কসবাদের গূঢ়তত্ত্বকে বাংলাভাষায় সহজবোধ্য করে প্রকাশ করাও সহজসাধ্য নয়। তথাপি প্রাবন্ধিক সঞ্জীব ঘোষ এক্ষেত্রে যথোপযুক্ত চেষ্টা করেছেন।

৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মার্কসীয় বিক্ষায় নারীমুক্তি' (১৯৬৪)

'মার্কসবাদ' ও 'নারীবাদ' আজও দুটি বিপরীত কোটির বিষয়। বুর্জোয়া ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ও সীমাবদ্ধ নারীবাদ-কে বর্জন করতে গিয়ে, 'মার্কসবাদী'রা অনেক ক্ষেত্রেই নারীমুক্তির বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে একদিকে যেমন বাদ দিয়ে গেছেন ; পাশাপাশি, বিশ্বজোড়া নারীমুক্তি আন্দোলনের সামনে কোনও স্পষ্ট দিশা উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। মার্কসবাদ ও নারীবাদ-কে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা ইতিমধ্যে অনেক

'মার্কসবাদী নারীবাদী' বা 'সমাজতন্ত্রী নারীবাদী'রা করেছেন। যদিও এই প্রচেষ্টা খুব সীমাবদ্ধ পরিসরে এবং নারী আন্দোলনের দিশারী রূপে উপস্থাপিত হয়নি। নারীবাদ কথাটির মধ্যেই যে একধরণের বুর্জোয়া ভাব-প্রবণতা ন্যস্ত হয়ে রয়েছে – মার্কসবাদীদের এই সমালোচনা, আবার নারীবাদীদের অনেকের সামনেই একটি ভাববার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধগ্রন্থে প্রাবন্ধিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মার্কসবাদের আলোকে নারীবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

৫. মধুসূদন চক্রবর্তী রচিত 'মার্কসবাদ জানবো' (১৯৬৪)

মানব সমাজের বিকাশের ব্যাখ্যা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে মার্কস ও এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন। তাঁদের সেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন মার্কসবাদ নামে আজ পরিচিত। এই মার্কসবাদের প্রাথমিক বক্তব্যের সরলীকরণ করে প্রাবন্ধিক মধুসূদন চক্রবর্তী তাঁর 'মার্কসবাদ জানবো' নামক প্রবন্ধগ্রন্থে পরিবেশন করেছেন। প্রবন্ধের মূল বিষয় হল মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার তৈরি করা। এই মার্কসবাদের মূল বক্তব্যকে প্রাবন্ধিক দুটি বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত, মানব সমাজের বিকাশ এবং দ্বিতীয়ত, আর্থিক পুঁজির বিকাশ।

৬. সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার রচিত 'মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি' (১৯৬৫)

সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বৈজ্ঞানিক মূল্যবিচারের দ্বারা কী-ভাবে তার নিষ্ক্রিয় অংশকে পরিত্যাগ করে কার্যকরী অংশকে গ্রহণ ও সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করতে হয় সেই পদ্ধতির প্রাথমিক রূপটি প্রাবন্ধিক সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি-র মধ্যে মার্কস ও এঙ্গেলসের মার্কসবাদের উত্তরণের প্রক্রিয়া অধ্যয়নের মাধ্যমে দেখিয়েছেন।

৭. ভানুদেব দত্ত রচিত 'বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান' (১৯৯৯)

স্বাধীনতা-উত্তর কালে ভারতের রাজনীতিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাব এবং পর্যায়ক্রম বিশ্লেষণ করে প্রাবন্ধিক ভানুদেব দত্ত তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ 'বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান'-এ কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক ভাষ্য রচনা করেছেন। রাজনৈতিক ইতিহাসে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও, কমিউনিস্টদের কাছে প্রধান ছিল সামাজিক মুক্তি ও জাতীয় মুক্তির ধারণা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে ঘটল, মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির আংশিক বাস্তবায়ন। বাকি অংশের কাজটা হল সামাজিক মুক্তির জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামই তৈরি করবে সমাজতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে জাতীয় মুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথকে। এটাই হল মার্কসবাদের ঐতিহাসিক বিকাশের দ্বান্দ্বিকতায় পরিস্থিতি বদলের ফলে কর্তব্যকর্মের বদল বা ভিন্নরূপ। কমিউনিস্টরা মনে করে, স্বাধীনতার অর্থ শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও।

লেনিন আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, ‘আসলে, দ্বিতীয়টাই হল প্রধান কথা।’ এটাকে বলা যেতে পারে স্বাধীনতা আন্দোলনের বা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব। ভারতের কমিউনিস্টদের কাছে স্বাধীনতা আন্দোলন সমাজতন্ত্র অর্জন পর্যন্ত এক সুদীর্ঘকালের ধারাবাহিক আন্দোলন। অর্থাৎ কমিউনিস্টরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিষয় দু’টিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অবিভাজ্য ধারা বলে গণ্য করে থাকেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ‘১৫ অগাস্টের পর ভবিষ্যতের কাজের দিকে এগিয়ে যাও’ এই আবেদনে উল্লিখিত কয়েকটি কথা ও কর্তব্যকর্মকে। এগুলি হল –

১. স্বাধীনতা যাত্রাপথের শেষ নয়।
২. জমিদারী প্রথার অবসান চাই ।
৩. মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ করতে হবে ।
৪. শ্রমিকদের জীবনধারণ উপযোগী বেতন দিতে হবে।
৫. সংখ্যালঘুদের ন্যায় বিচার দিতে হবে। ইত্যাদি।

এই সবই ছিল স্বাধীনতা পরবর্তী পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কর্তব্যকর্মের একটি ধারণা।

১৫ অগাস্ট ১৯৪৭-এর ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি সোমনাথ লাহিড়ী লিখেছিলেন, ‘অসংখ্য বীরের রক্তের ঋণ পূর্ণ পরিশোধ করিতে পারিয়াছি কি ? .... যাহা পাইয়াছি তাহা আমরা জানি, সেইজন্যই উৎসব করিতেছি। যাহা পাই নাই, আজ আনন্দ উৎসবের মধ্যেও সেকথা দৃঢ় চিত্তে স্মরণ করি যাহাতে আমরা উপান্তকেই সীমান্ত ভাবিয়া থামিয়া না যাই, আত্মসন্তোষের চেষ্টাহীনতা আমাদের চলার পথে বিরাম না আনে।’[৮]

মার্কসীয় মতবাদে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের ধারণা মার্কসবাদ বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিশ্ববীক্ষা। ভাববাদী দর্শন আর বুর্জোয়া (সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক) মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই মার্কসীয় যুক্তি-বিজ্ঞান বারংবার তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। বিশ্বের বহু মানুষ আজ তাই মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষার সাহায্যে বৈষয়িক জীবন ও জগৎকে যেমন বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারেন তেমনি তার অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর গড়ে ওঠা উপরি কাঠামো (super-structure), অর্থাৎ রাজনীতি, আইন, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদির বিকাশধারাও বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারেন।

একথা সত্য, মার্কস-এঙ্গেলস কিংবা লেনিন শিল্প-সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের কোনও সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক স্বতন্ত্র ইতিহাস বা গ্রন্থ রচনা করেননি। কিন্তু এই তিন দার্শনিক বিভিন্ন সময়ে, নানা উপলক্ষে, শিল্প-সাহিত্য তথা মানস-সংস্কৃতি সম্পর্কে যেসব আলোচনা ও মন্তব্য করেছেন তার পরিমাণ বিপুল না হলেও পর্যাপ্ত। আর এই সব

পর্যালোচনা একত্র করে এবং এর সারাৎসারের মধ্য দিয়ে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের ধারণায় উপনীত হওয়া যেতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "সদুপায়", ১৩১৫, http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org. 30 March 2018.
২. Lenin, V. I. Collected Works, Vol. 18 . Moscow : Progress Peblishers , 1976. pp. 222-23
৩. ঘোষ, পার্থ., শ্রেণি, শ্রেণিসংগ্রাম, রাষ্ট্র ও বিপ্লব, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৫৩, পৃ. ২৮।
8. Lenin, V. I. A Great Beginning, Collected Works, Volume 20. Moscow : Progress Publishers, 1976. pp. 409
৫. Engels, Karl Marx and Friedrich. Manifesto of the Communist Party. Moscow : Progress Publishers, 1969. pp. 98
৬. Ibid. pp. 2
৭. মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ, মার্কসবাদ ও মুক্তমতি, কলকাতা, সমবায় পাবলিশার্স, ১৯৬০, পৃ. ১৫।
৮. লাহিড়ী, সোমনাথ, "সংকল্প", স্বাধীনতা (১৯৪৭), পৃ.২।

মোহিতলাল মজুমদার ও কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে প্রেম ভাবনা

শেখ কামাল উদ্দীন
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: মধ্যযুগীয় ধর্মাশ্রয়ী বাংলা কাব্য শেষে এসে আখ্যানমূলক প্রেমকাব্যের ধারায় প্রবাহিত হয়। আধুনিক যুগে সেই বাংলা কাব্যে প্রেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে। অতি আধুনিক বা উত্তর আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রেম সমস্ত দুর্বোধ্যতা, আড়ষ্টতা অতিক্রম করে স্বকীয়

মেজাজে আত্মপ্রকাশ করে। একালের বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রেম নিয়ে খোলাখুলি কবিতা লিখতে দেখি, তিলোত্তমা মজুমদার, প্রমুখকে। আধুনিক যুগের কবিদের মধ্যে এর সূচনা যদিও তার আগেই হয়েছিল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখরা ছিলেন তাঁদের পূর্বসূরি। তারও আগে আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রেমকে শুধু কাম-গন্ধহীন নয়, দেহসর্বস্বতার মধ্য দিয়ে পাঠকের সামনে উন্মুক্ত করে তুলেছিলেন মোহিতলাল মজুমদার। তাই তাঁর আর এক পরিচয়, তিনি 'দেহাত্ববাদী' কবি। তাঁর সমকালে কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যেও প্রেম বিচিত্র রূপে দেখা দেয়। 'বিদ্রোহী' কবি রূপে পরিচিত হয়েও তিনি রোমান্টিক প্রেম বিষয়ক কাব্য রচনাতেও সুনাম অর্জন করেন।

সূচক/মূল শব্দ : যৌবন, প্রেম, পাপ, কামিনী, উর্বশী, কাম, মানসী, নীলাম্বরী, গোপ-চারিণী।

মূল আলোচনা : (Discussion)

সাহিত্যে সবটুকুই কাব্য হিসেবে পরিগণিত হয় – কখনো তা শ্রব্যকাব্য, কখনো বা দৃশ্যকাব্য হিসেবে। পরবর্তীকালে দৃশ্য কাব্যকে নাটক বলে চিহ্নিত করা হয় আর শ্রব্যকাব্য মূলত কবিতাকেই বোঝায়। বাংলা সাহিত্যের সূচনাই হয় কাব্যের মধ্যে দিয়ে। গদ্য সাহিত্য আসে অনেক পরে, আধুনিক যুগে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমকালে বাংলা কাব্য- সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই রবীন্দ্র-প্রভায় প্রভাবিত হয়ে বাংলা কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর এই প্রভাব শুধু তাঁর সমকালে নয়, উত্তরকালের কবিদের মধ্যেও পড়েছিল। কিন্তু সমকালের সব কবি রবীন্দ্র প্রভাবে অন্তত বাইরের দিক থেকে প্রভাবিত হননি। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব সৃষ্টিকর্মে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রের পরিচয় দিয়ে বাংলা কাব্যে নিজেদের স্থান

সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ধারার কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু'টি নাম– মোহিতলাল মজুমদার ও কাজী নজরুল ইসলাম।

মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যে কাম-গন্ধহীন প্রেমের তুলনায় শরীরী আবেদন অনেক বেশি লক্ষণীয়। অন্যদিকে কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ধাঁচ তরুণ-যুব সমাজকে অনেক বেশি উদ্দীপ্ত করেছিল। এই দু'জন কবির মধ্যে ব্যক্তিগতস্তরেও অম্ল-মধুর সম্পর্ক ছিল। প্রথম দিকে সখ্যতা থাকলেও পরবর্তীকালে সেই সখ্যতা প্রায় শত্রুতায় পরিণত হয়েছিল।

ব্যক্তিগত সম্পর্কের বাইরে গিয়ে উভয়ের কবিতার বৈশিষ্ট্য ও তার তুলনামূলক একটি আলোচনা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এর জন্যে দু'জন কবির কবিতার একাধিক পংক্তি উদ্ধৃত করে তাঁদের কবি প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

মোহিতলাল মজুমদার প্রেমকে পাপের বিপ্রতীপে রেখে দেখেছেন। শোপেনহাওয়ার নারীর প্রেম ও রূপের মধ্যে অমঙ্গল ও সর্বনাশ দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'The lovers are the traitors who seek to penetrate the whole world and drudgery which could otherwise speedily reach and end...'। মোহিতলাল মজুমদার এই ধারণার বিপরীতে গিয়ে কামিনীর মোহিনীরূপে মুগ্ধ হন। তাই তিনি লেখেন—

'সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি মিথ্যা সনাতনী
সত্যেরে চাহি না তবু সুন্দরের করি আরাধনা।'

'কামনার সোমরস' ও 'যজ্ঞের সোমরস'কে শোধন করতে তিনি প্রেমের আশ্রয় নিয়েছেন। তাইতো 'স্বপন-পসারী' কাব্যগ্রন্থের 'পাপ' কবিতার প্রথম এবং শেষ পংক্তিতে যথাক্রমে তিনি বলেছেন—

প্রথম পংক্তি:

'পাপ কথা' নাই– গাহিয়াছে ঋষি, অমৃতের সন্তান—
গেয়েছিল, আলো বায়ু নদীজল তরুলতা— মধুমান্!
প্রেম দিয়ে হেথা শোধন-করা যে কামনার সোমরস,
সে রস বিরস হ'তে পারে কভু ? ত'বে তা'য় অপযশ!'

শেষ পংক্তি:

'পাপ কোথা নাই– গাহিয়াছে ঋষি, অমৃতের সন্তান—
গাহিয়াছে, আলো বায়ু নদীজল তরুলতা মধুমান্!
প্রেম দিয়ে হেথা শোধন-করা যে যজ্ঞের সোমরস!
সে রস বিরস হ'তে পারে কভু— হতে পারে অপযশ!'

এমনিতেই রবীন্দ্র-সমকালে কবিতা লিখেও মোহিতলাল মজুমদার রবীন্দ্রানুসারী কবি ছিলেন না, বরং সমকালের যে দু'তিনজন রবীন্দ্র কবিতার বিপ্রতীপে গিয়ে কবিতা

লিখে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে মোহিতলাল মজুমদার তাঁদের গোত্রে পড়েন। তাই রবীন্দ্র-কবিতায় কবি নারী বলতে যে অর্ধেক মানবী ও অর্ধেক কল্পনাকে মিশিয়ে যাঁকে উপস্থাপনা করেছেন মোহিতলাল মজুমদার তার বিরোধিতা করে সরাসরি কবিতা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের 'উর্বশী' কবিতার অংশবিশেষ—

'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী!
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি,
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।'

এই কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে মোহিতলাল মজুমদার লেখেন–

'নও গৃহিণী, নও ঘরণী— সেইটি যে গো সকল ভুলের ভুল!
সংসার ত' তারেই বলে— নিত্য ঝরা পলকা বোঁটার ফুল।
একটু আছে গন্ধ মধু, তাতেই করে অমর—
পরশ মণির পরশ সে যে— বধূ-বরের অধর।'

কাম-গন্ধ হীন প্রেম নয়, সরাসরি বধূর অধরে বা বরের অধরে অর্থাৎ ওষ্ঠে যে গন্ধ-মধু তা আস্বাদনের মধ্যেই নরনারীর প্রেমের সম্পর্ক বলে কবি মনে করেন। সেই জন্য প্রকৃত সংসার করতে হলে কল্পনার প্রেমের বাঁধনে বাঁধা পড়লে চলবে ন। সেই সম্পর্ক হতে হবে কাম-গন্ধময়। তা কবির মত।

শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেন, মায়াবাদী শঙ্করাচার্য বা বামমার্গী কাপালিককেও কবি মোহিতলাল মজুমদার ধিক্কার জানিয়ে বলেছেন—

'প্রেয়সী নারীর মুখে হেরি' বিভীষিকা
আপনারি বক্ষ-রক্তে পরি জয়টিকা
কি লভিলে, ওহে বীর, বামমার্গী কাপালিক
নাস্তিক তান্ত্রিক?
ধিক্ তোমা ধিক!'

—(মোহমুদগর)

মানবজীবন কবির কাছে কোনো অলীক কল্পনা নয়। রূপসী পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ সবই সম্ভোগের জন্য। তাই তাঁর কাছে যুবতী বধূ কোনো কল্পনার বস্তু নয়। তাই তাঁর বলিষ্ঠ আহ্বান, সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য—

'এসো কবি, এসো বীর, নির্মম সাধক এসো,
এসো হে সন্ন্যাসী,

ছিঁড়ে ফেল অদৃষ্টের ফাঁসী
দেহ ভরি কর পান কবোষ্ণ এ প্রাণের মদিরা
ধূলা মাখি খুঁড়ি লও কামনার কাচ মণি হীরা।'

বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের 'চপল প্রেম, থির জীবন দুরন্ত'কে মনে রেখে মোহিতলাল মজুমদার লেখেন 'স্মর-গরল' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'প্রেম ও জীবন' কবিতা। এই কবিতার ছত্রে-ছত্রে রাধা ও কৃষ্ণের প্রসঙ্গ এসেছে। সরাসরি কৃষ্ণের নাম উল্লেখ না করে একাধিকবার তিনি 'শ্যাম' নাম ব্যবহার করেছেন। যেমন—

'বনে বনে শীর্ণ শাখা শ্যাম-রূপে উঠিছে শিহরি', 'শ্যামরূপ-হ্রদে বুঝি ডুবিয়াছে উন্মাদিনী রাই–', 'শ্যাম-দেহে লীনাঙ্গিনী রাধিকার বরণ-মাধুরী', 'গেছে শ্যাম, ব্রজভূমি পূত তবু সে পদ-পরশে'।

আবার এই কবিতায় তিনি একাধিকবার রাধার উল্লেখও করেছেন। যেমন—

'রাধার ফাগের থারি কোথা গেল, কে লইল হরি?'
'কালিন্দীর কূল ছাড়ি' রাধিকার চলে না চরণ!'

এই কবিতায় বারবার বৈষ্ণব পদাবলীর

রাধা-কৃষ্ণ লীলার অনুষঙ্গগুলি এসেছে। 'রজনী পরেছে শাড়ী নীলাম্বরী জ্যোৎস্না-বারাণসী', নীলাম্বরী অর্থে যে রাধাকেই বোঝানো হয়, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আরও কতকগুলি শব্দ এই কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে, যেগুলিও বৈষ্ণব অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'নয়নে লেগেছে আজ অবনীর বৃন্দাবনী মায়া;' 'শূন্য করি' সারা বৃন্দাবন', 'চিরযুবজীবী করি, বাঙলার বাউল বৈষ্ণব', 'প্রেমের বৈকুণ্ঠপুরে আজও তাই পূর্ণিমা-যাপন', 'বৃন্দাবন চির পরিহরি'। কবিতায় ব্যবহৃত 'নীল জলে জ্বলে রূপ, ভেসে ওঠে সোনার গাগরী!' পড়ে মনে পড়ে, 'গাগরী বারি। ঢারি করি পিছল। চলতহি অঙ্গুলি চাপি।' আবার 'মরণেরে মনে হয় রমণীয়, মদির-মধুর' পড়ে মনে পড়ে বৈষ্ণব পদ 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান'। 'নয়ন না তিরপিত' এই বৈষ্ণবীয় শব্দবন্ধ কবি মোহিতলাল মজুমদার 'প্রেম ও জীবন' কবিতায় সরাসরি ব্যবহার করে লিখেছেন—

'নয়ন না তিরপিত' ঘুচিল না সুচির বিরহ—'। শেষাবধি কবি প্রেমকে ক্ষণস্থায়ী বলে স্বীকার করেন। তাইতো তিনি এই কবিতাটি শেষ করেন এইভাবে—-

'আজি এ রজনীর রূপমধু-পিয়াসে বিহ্বল—
মরণেরে মনে হয় রমনীয়, মদির-মধুর!
শুনি যেন সমীরণে মৃদু শ্বাস স্বনিছে কেবল—
হায়, প্রেম ক্ষণপ্রভা, এ জীবন আঁধার-বিধূর!
জীবনের চেয়ে ভাল সে প্রেমের ক্ষণিক পুলক,
অচেতন হয়ে ডুবি সুপ্তিহীন স্বপ্ন-রসাতলে।
হেনকালে ওই শুন— মর্মভেদী একি পরিহাস!—
বৃক্ষশাখে ডাকিছে তক্ষক!

জীবনের মত প্রেম উবে যায় যাদুমন্ত্র-বলে,
ভাসে শুধু এক সুর— সুখহীন, একান্ত উদাস।'

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে প্রেমভাবনাঃ

কাজী নজরুল ইসলাম আগেও বলেছি, সবাই জানেন, পরিচিত 'বিদ্রোহী' কবিরূপে। তার অর্থ এই নয় যে তিনি শুধুই বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের কবিতা লিখেছেন। উল্টোদিক দিয়ে দেখতে গেলে তিনি প্রেমবিষয়ক একাধিক কবিতাও সৃষ্টি করেছেন। এমনকি যে কবিতা গুলিতে বিদ্রোহ- ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে সেখানেও তিনি প্রেমের কথা বলেছেন। 'আমরা জানি রোমান্টিক কবিতার ক্ষেত্রে নারী ও প্রকৃতির বিশেষ স্থান আছে। কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় সাধারণতঃ নারীর দু-শ্রেণীর রূপায়ণ দেখি, এক জননী অন্য প্রিয়া।'[১] আমরা এখানে মূলতঃ প্রিয়ার প্রসঙ্গই আলোচনা করবো।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে তাঁর সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতার কথা। যেখানে তিনি বলেন, 'আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস', 'আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর/ আমি দুর্বার,/ আমি ভেঙে করি সব চুরমার!', 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন', 'মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ', আমি ধূর্জটি', 'আমি সাইক্লোন', 'আমি ধ্বংস' সেই কবিই সেই একই কবিতায় আবার বলেন—

'আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল-করে- দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন- চুড়ির কনকন।'

আবার সেই কবি একই কবিতায় ষোড়শীর প্রেমে উদ্যাম, ধন্য। তাই তিনি বলেন,

'আমি বন্ধনহারা কুমারীর বেণী,তন্বী-নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম- উদ্যাম, আমি ধন্যি!'

কবি কি প্রথম যৌবনে বাস্তবের কোনো কিশোরী বা নারীর প্রেমে ব্যর্থ হয়েছিলেন বা আঘাত পেয়েছিলেন যা তাঁকে বেদনাতুর করলেও তাঁর সৃষ্টিকে স্তব্ধ হতে দেয়নি, বরং তাঁর হাত থেকে একের পর এক প্রেমের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে? না হলে কবি কেন বলবেন—

'পাইনি বলে আজও তোমায় বাসছি ভাল, রানি!
মধ্যে সাগর, এ-পার ও-পার করছি কানাকানি।
আমি এ-পার, তুমি ও-পার,
মধ্যে কাঁদে বাধার পাথার,
ও-পার হতে ছায়া-তরু দাও তুমি হাতছানি,
আমি মরু, পাইনে তোমার ছায়ার ছোঁয়াখানি।
— গোপন প্রিয়া (সিন্ধু হিন্দোল)।

'দোলন চাঁপা' কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতার মধ্যে 'কবি-রাণী' কবিতায় তিনি তাঁর প্রেমের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন এইভাবে—

'তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি।
আমার এ রূপ-সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি।
আপন জেনে হাত বাড়াল
আকাশ বাতাস প্রভাত-আলো
বিদায়বেলার সন্ধ্যাতারা
পুবের অরুণ রবি, —
তুমি ভালোবাস বলে ভালবাসে সবই।

আমার আমি লুকিয়ে ছিল তোমার ভালোবাসায়,
আমার আশা বাইরে এল তোমার হঠাৎ আসায়।
তুমিই আমার মাঝে আসি
অসিতে মোর বাজাও বাঁশি
আমার পূজার যা আয়োজন
তোমার প্রাণের হবি।
আমার বাণী জয়মাল্য, রানি! তোমার সবি।

তুমি আমায় ভালোবাস তাই-তো আমি কবি
আমার এ রূপ, – সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি।'

কাজী নজরুল ইসলামের প্রেমভাবনা তাঁর 'সিন্ধু- হিন্দোল' কাব্যে 'অ-নামিকা' কবিতায় সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে তিনি তাঁর প্রেমিকাকে রক্তমাংসের মানসী হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এই কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মানসসুন্দরী'র আদলে তাঁর প্রেমিকাকে কখনো 'মানস-রঙ্গিণী' হিসেবে, কখনো 'বাসনা-সঙ্গিনী' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই কবিতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে আমরা কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে প্রেমচেতনা বিষয়টির আলোচনা শেষ করবো—-

'তোমারে বন্দনা করি
স্বপ্ন-সহচরি
লো আমার অনাগত প্রিয়া,
আমার পাওয়ার বুকে না-পাওয়ার তৃষ্ণা- জাগানিয়া!
তোমার বন্দনা করি....
হে আমার মানস-রঙ্গিণী,

অনন্ত-যৌবন বালা, চিরন্তন বাসনা-সঙ্গিনী!
তোমারে বন্দনা করি....
নাম-নাহি-জানা ওগো আজও-নাহি-আসা!
আমার বন্দনা লহো, লহো ভালোবাসা....
গোপন-চারিণী মোর, লো চির-প্রেয়সী!
সৃষ্টি-দিন হতে কাঁদ বাসনার অন্তরালে বসি, —
ধরা নাহি দিলে দেহে।
তোমার কল্যাণ- দীপ জ্বলিল না
দ্বীপ নেভা বেড়া দেওয়া গেহে।'

— অ-নামিকা (সিন্ধু-হিন্দোল)।

তথ্যসূত্র:

১. নজরুল কবিতা: ভাব ও রূপ - আচার্য রামজীবন - প্রজ্ঞা বিকাশ - ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা: ৭০০ ০০৯ - প্রথম প্রজ্ঞা বিকাশ সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০১৬

গ্রন্থপঞ্জি:

ক. আকর গ্রন্থ—

১. 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' - মজুমদার মোহিতলাল - ভারবি - ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা: ৭৩ - পুনর্মুদ্রণ: আষাঢ় ১৪২৫, জুলাই ২০১৮

২. 'সঞ্চিতা' - কাজী নজরুল ইসলাম - ডি. এম. লাইব্রেরী/ ৪২ বিধান সরণী/ কলকাতা- ৭০০০০৬ - চত্বারিংশৎ সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৯৮

খ. সহায়ক গ্রন্থ—

১. 'মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ' - দত্ত ভবতোষ (সম্পাদিত) - ভারবি - ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা: ৭৩ - পুনর্মুদ্রণ: ফাল্গুন ১৪২৫, মার্চ ২০১৯

২. 'নজরুল-চরিতমানস' - গুপ্ত সুশীলকুমার - দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা: ৭০০০৭৩ - চতুর্থ সংস্করণ: এপ্রিল ২০০৭, বৈশাখ ১৪১৪

রবীন্দ্র নাটকে ঠাকুরদাদা : নানা সাজে, নানা কাজে

ঈশিতা খাঁ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কালিনগর মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক ও সাংকেতিক নাটকের ধারার সূচনা ‘শারদোৎসব’ নাটকের মাধ্যমে। এই নাটকেই আমরা প্রথম পাই গীতিময় এক চরিত্র ‘ঠাকুরদাদা’কে। এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে রইল সেই ঠাকুরদাদা চরিত্রটিকে ‘নানাসাজে, নানাকাজে’ অর্থাৎ নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিচিত্র চারিত্রিক স্বরূপ, গান, কর্মগত বিভিন্নতা ও স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্বন্ধসূত্রকে ধরার চেষ্টা।

সূচক শব্দ : রূপক ও সাংকেতিক নাটক, বাউল, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, অম্লরস, সদানন্দময়, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, মহাপঞ্চতক, উপনদ, অহেতুকী, উল্লাস।

ভূমিকা

‘দূরে অশথ তলায়
পুঁতির কণ্ঠিখানি গলায়
বাউল দাঁড়িয়ে কেন আছ?
সামনের আঙিনাতে
তোমার একতারাটি হাতে
তুমি সুর লাগিয়ে নাচো!’

-‘বাউল’; ‘শিশু ভোলানাথ’

ঠাকুরদাদার স্বভাবেও আছে বাউল বৈরাগীর এই একইরকম ‘পথ চলতি জীবনের অভিক্ষেপ’। তার সমস্ত দিন কাটে ‘পথে ঘাটে মাঠে’, তার ‘ঘরেতে নেই তালা’, একতারার ‘গুনগুনানি গানে’ই 'আছে তার নাচের পুঁজি', ‘সেইখানেতেই তার খেপা পায়ের ছুটি’। ঠাকুরদাদা চরিত্রটির উদ্দেশ্যে তাই রবীন্দ্র নাটকের অনুরাগীগণ বলতে পারেন -

‘.........তোমার নাচে
আমার প্রাণ যেন ভাই বাঁচে -
আমার মন যেন পায় ছুটি।

....

আমায় শেখাও সুরে গড়া
তোমার তালাভাঙার পাঠ।

আর কিছু না চাই,
যেন আকাশ খানা পাই,
আর পালিয়ে যাবার মাঠ।
দূরে কেন আছ?
দ্বারের আগল ধরে নাচো,
বাউল আমারই এইখানে।
সমস্ত দিন ধ'রে
যেন মাতন ওঠে ভ'রে,
তোমার ভাঙল-লাগা গানে।'

-'বাউল'; 'শিশু ভোলানাথ'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক ও সাংকেতিক নাটকের ধারার সূচনা 'শারদোৎসব' নাটকের মাধ্যমে। এই নাটকেই আমরা প্রথম পাই গীতিময় এক চরিত্র 'ঠাকুরদাদা'কে। ঠাকুরদাদা চরিত্রটি আসলে আমাদের মনকে শোনায় আগল ভাঙ্গার গান- সমস্ত বন্ধন মুক্তির শেষে উদার-উদাত্ত প্রকৃতির মুখোমুখি করে দেয়।

ঠাকুরদাদা চরিত্রের 'যুগল উৎসভূমি'

বালক রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দুইজন সঙ্গীতপ্রাণ মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন-

একজন শ্রীকণ্ঠ সিংহ, 'তাঁর পিতার ভক্তবন্ধু'-"তাঁহার বামপার্শ্বের নিত্যসঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার এবং কণ্ঠে গানের আর বিশ্রাম ছিল না।....গান সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম। তাঁহার একটি গান ছিল-'ময় ছোড়োঁ ব্রজকি বাসরী'। এই গানটি আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝংকার দিতেন এবং যেখানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক, 'ময় ছোড়োঁ', সেখানটাতে মাতিয়া উঠিয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন এবং মাথা নাড়িয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়য়া যেন সকলকে ঠেলা দিয়া ভাল লাগায় উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন।"

['জীবনস্মৃতি' : 'শ্রীকণ্ঠ সিংহ' অধ্যায়]

অন্যজন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, 'জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু'-"বাংলা যত উদ্ভট গানই তাঁর মুখস্থ ছিল। সে গান সুরে বেসুরে যেমন করিয়া পারেন, একেবারে মরিয়া হইয়া গাহিয়া যাইতেন। সে-সম্বন্ধে শ্রোতারা আপত্তি করিলেও তাঁহার উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকিত। সঙ্গে সঙ্গে তাল বাজাইবার সম্বন্ধেও অন্তরে বাহিরে তাঁহার কোনোপ্রকার বাধা ছিল না। টেবিল হউক, বই হউক, বৈধ-অবৈধ যাহা কিছু হাতের কাছে পাইতেন, তাহাকে অজস্র টপাটপ্ শব্দে ধ্বনিত করিয়া আসর গরম করিয়া তুলিতেন।"

['জীবনস্মৃতি' : 'অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী' অধ্যায়]

- এই দুই চরিত্রে পাঠক গায়কের সঙ্গে সঙ্গে একজন অভিনেতাকেও খুঁজে পায়। আর তাদের গীতিময় - অভিনেতা সত্তাটিই আত্মপ্রকাশ করে আরেক গীতি-ভূয়িষ্ট চরিত্রের মধ্যে, যার নাম 'ঠাকুরদাদা'।

নাম কেন ঠাকুরদাদা ?

'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'শ্রীকণ্ঠসিংহ' নামক অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীকণ্ঠ সিংহের সম্বন্ধে বলেছেন-'বৃদ্ধ একেবারে সুপক্ক বোম্বাই আমটির মতো-অম্লরসের আভাসমাত্র বর্জিত-তাঁহার স্বভাবের কোথাও এতটুকু আঁশ ছিল না।...... এই বৃদ্ধটি যেমন আমার পিতার, তেমনি দাদাদের, তেমনি আমাদেরও বন্ধু ছিলেন। আমাদের সকলের সঙ্গে তাঁহার বয়স মিলিত।'-আমাদের সমাজে পিতামহ অর্থাৎ ঠাকুরদাদার চরিত্রবৈশিষ্ট্য ঠিক এরকমই। তিনি নাতি-নাতনিদের যেমন শ্রদ্ধার পাত্র, তেমনি তাদের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা-পরিহাসের সম্বন্ধও গড়ে ওঠে। তিনি হয়ে ওঠেন তাদের মুশকিল আসান। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এরকমই এক চরিত্রকে তাঁর নাটকে নিয়ে এলেন এবং কোনো ব্যক্তি নামে নয়, সামাজিক সম্বন্ধের নামেই সেই নাট্যচরিত্রটির নামকরণ করলেন- 'ঠাকুরদাদা'। শুধু তাই নয়, এমনভাবে চরিত্রটিকে গড়লেন যে, নাটকের অন্যান্য চরিত্র এবং পাঠকের সঙ্গেও তৈরী হলো তাঁর দাদু-নাতির মতো সহজ-সরল সম্পর্ক।

রবীন্দ্র নাটকে ঠাকুরদাদার উপস্থিতি

১।	শারদোৎসব (১৯০৮)
২।	রাজা (১৯১০)
৩।	ডাকঘর (১৯১২)
৪।	অচলায়তন (১৯১২)
৫।	গুরু (১৯১৮)
৬।	অরূপরতন (১৯২০)
৭।	ঋণশোধ (১৯২০)

একলা মোদের হাজার মানুষ দাদাঠাকুর

বিশ্বভারতী কর্তৃক ঋতুপ্রশস্তি পর্যায়ের পাঁচটি নাটিকার নাম- 'শেষবর্ষণ', 'শারদোৎসব', 'বসন্ত', 'সুন্দর', 'ফাল্গুনী'। বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শারদোৎসব উপলক্ষে ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হওয়ার জন্য রচিত হয় 'শারদোৎসব'। এই নাটকেই প্রথম ঠাকুরদাদা চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আর 'শারদোৎসব' নাটকের তত্ত্বের উপর জোর দিয়েই রবীন্দ্রনাথ শারদোৎসবের নবতম রূপ 'ঋণশোধ' রচনা করেছিলেন। দুইটি নাটকেই ঠাকুরদাদা সরল, রহস্যপ্রিয়, সদানন্দময়। চিরাচরিত পিতামহ রূপেই তিনি বালকদল, উপনন্দ, সন্ন্যাসী, লক্ষেশ্বর, শেখর, ('শারদোৎসবে' অনুপস্থিত) এমনকি পাঠকের কাছেও ধরা দিয়েছেন। তাঁর এই স্বরূপের প্রকাশ আছে সন্ন্যাসীর উক্তিতে- 'তুমি যে জগতে ঠাকুর্দা হয়েই জন্মগ্রহণ করেছ, ঈশ্বর সকলের সঙ্গেই তোমার হাসির সম্বন্ধ পাতিয়ে দিয়ে বসেছেন, সে তো তুমি লুকিয়ে রাখতে পারবে না। ছোটো ছোটো ছেলেগুলির কাছেও

ধরা পড়েছ, আর আমাকেই ফাঁকি দেবে?' -এই উক্তির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ পাঠককে সচকিত করে দিতে চান কেন চরিত্রটির নাম তিনি ঠাকুরদাদা রেখেছেন, সে সম্বন্ধে। ঠাকুরদা চরিত্র পূর্ণ বিকশিত হয়েছে 'রাজা' নাটকের মধ্যে। এখানে তাঁকে নানারূপে আমরা পেয়েছি -

(১) সুদর্শনা বলেছে- '.....তুমি আমার রাজার বন্ধু'। ঠাকুরদাদা নিজেও বলেছেন- 'রাজার দরজায় সমস্ত দিনই তো খাটছি-আজ পর্যন্ত দুটো পয়সা পুরস্কার মিলল না। .....বন্ধুকে কি কেউ কোনোদিন পুরস্কার দেয়?' অর্থাৎ ঠাকুরদাদা রাজাকে বন্ধুভাবে ভজনা করেছে। রাজার সঙ্গে ঠাকুরদাদার সম্পর্ক যে সিদ্ধ হয়েছে তার সাক্ষ্য বহন করছে সুরঙ্গমার উক্তি- 'তোমার নাকি কোনো খবর পেতে বাকি আছে! রাজার কাজে কোন্ পথটাতেই বা তুমি না চলেছ। হঠাৎ নতুন হুকুম এলে আমাদেরই পথ খুঁজে বেড়াতে হয়।' তবে বৈষ্ণব পদাবলীর সখ্যরসের সঙ্গে ঠাকুরদাদার সখ্যভাবের সাধনার মিল নেই। 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে রূপগোস্বামী সখ্য সম্বন্ধে বলেছেন -

'বিমুক্তসংভ্রমা যা স্যদ্বিশ্রম্ভাত্মা রতির্দ্বয়ো'।

আর 'বিশ্রম্ভ' সম্বন্ধে বলেছেন- 'বিশ্রম্ভ গাঢ়বিশ্বাসবিশেষো মন্ত্রনোজ্ঝিতঃ'। ঠাকুরদাদার সঙ্গে রাজার বন্ধুত্ব 'বিমুক্তসংভ্রম'-ও নয়, 'বিশ্রম্ভাত্মক'-ও নয়, ঠাকুরদা রাজার গূঢ় রহস্যময় প্রকৃতি জেনে সম্ভ্রম ও ভক্তিসমন্বিত। ঠাকুরদার বন্ধুরূপের উপস্থাপনার মূলে আছে উপনিষদের 'সে বন্ধুর্জনিতা বিধাতা' এই উক্তির প্রভাব।

(২) রাজার বন্ধু এই ঠাকুরদাদাই আবার বসন্তোৎসবের দিনে হয়েছেন 'কুঞ্জবনের দ্বারী', 'উৎসবের সূত্রধর'।

(৩) সুদর্শনার স্বয়ম্বর সভায় নিজের পরিচয় তিনি দিয়েছেন 'রাজার সেনাপতি' বলে- '........আমাকেই আজ তিনি সেনাপতির বেশ পরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

(৪) নাট্যকার এই নাটকে ঠাকুরদাদাকে পারিবারিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন। এর প্রমাণ আছে ঠাকুরদাদারই উক্তিতে, যেখানে কখনো এসেছে দিদিঠাকরুণের প্রসঙ্গ- 'তোদের ঠাকরুণদিদির আঁচল লম্বা আছে', কখনো বা তাঁর পাঁচ পাঁচটি মৃতছেলের প্রসঙ্গ- 'আমার যে একে একে পাঁচ ছেলে মারা গেল, একটি বাকি রইল না'।

(৫) নাগরিক দলের গানেও ঠাকুরদাদার অনেক রূপের প্রকাশ আছে -

(ক) 'যেখানে রূপের প্রভা নয়নলোভা' সেখানে ঠাকুরদাদা 'ভোলা'।

(খ) 'যেখানে রসিক সভা পরম শোভা' সেখানে ঠাকুরদাদা 'রসের ঝোলা'।

(গ) যেখানে 'ভোলাভুলি খোলাখুলি' সেখানে ঠাকুরদাদা 'খোলা'।

(৬) ঠাকুরদা চরম আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন, তত্ত্বজ্ঞানী, রসিক, আনন্দময়, বৃদ্ধ-শিশু।

'ডাকঘরে'র ঠাকুরদাদা ফকিরবেশধারী। তাঁর এই বেশ ধারণের কারণ হলো- প্রথমে অমল অসুস্থতার জন্য ঘরে বন্ধ থাকলেও যখন জানালার কাছে বসে দূরের পাহাড় দেখতো, কথা বলতো দইওয়ালা, মালিনীর মেয়ে সুধা, প্রহরী, মোড়লের সঙ্গে,

ততোক্ষণ তার প্রয়োজন ছিল না ঠাকুরদাদাকে। কারণ দইওয়ালা, সুধা, প্রহরী, মোড়ল তার গণ্ডীবদ্ধ জীবনে সুদূরকে আহ্বান করে আনছিল। কিন্তু ক্রমে তার কাছে জানালাটাও বন্ধ হয়ে গেলো। ঠিক এই সময়ই ফকিরবেশী ঠাকুরদাদার সরাসরি আবির্ভাব। ফকির হলো ভবঘুরে। ঠাকুরদাদাও যদি সেই ভবঘুরের ছদ্মবেশ না ধরেন তা হলে অসুস্থ অমলকে ঘরে বন্ধ অবস্থাতেই তিনি কেমন করে ঘোরাবেন কল্পনার 'ক্রৌঞ্চদ্বীপে'? আর ঠাকুরদাদার এই রূপ দেখে মাধবদত্ত বলেছেন - 'তুমি যে কী নও তাতো ভেবে পাইনে'।

'অচলায়তন' নাটকে ঠাকুরদাদা নানা রূপে ধরা দিয়েছেন-জ্ঞানমার্গী মহাপঞ্চক, আচার্য, উপাচার্য, উপাধ্যায় ও আয়তনের শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি শাস্ত্রের বিধানস্বরূপ 'গুরু'। এই গুরুই আবার যোদ্ধৃবেশে আবির্ভূত। এছাড়া আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী কর্মমার্গী শোনপাংশুদের কাছে তিনি 'দাদাঠাকুর' এবং ভক্তিমার্গী দর্ভকদের কাছে তিনি 'গোঁসাইঠাকুর'-এই তিন পথের সাধকেরা ভগবানকে যে যেভাবে উপলব্ধি করে ঠাকুরদাদার এই তিনদলের সঙ্গে পরিচয়ের মধ্যেই তা ব্যক্ত।ভগবৎ স্বরূপের ছায়া যেন ঠাকুরদাদা চরিত্রে প্রতিফলিত। আর গুরুবেশী ঠাকুরদাদাকে দেখার পর পঞ্চক যখন ঠিক করতে পারে না দাদাঠাকুর তার কাছে কি? গুরু না দাদাঠাকুর, তখন তিনি নিজেই নিজের স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন- 'যে জানতেও চায় না যে আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু'। - এরপর পঞ্চকের উক্তি – 'তুমি তাহলে আমার দুইই'। আবার শোনপাংশুদের একটি গানে 'হাজার মানুষ', 'খেলার মানুষ', 'মেলার মানুষ', 'সকলক্ষণের মানুষ', 'কোণের মানুষ', 'মনের মানুষ'-রূপী ঠাকুরদাদা ধরা পড়েছেন।

অন্য নামে ঠাকুরদাদা

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা'য় বলেছেন- 'অন্ধ বাউল ঠাকুরদাদা চরিত্রেরই অন্যতর রূপ'। এই অন্ধ বাউলই চন্দ্রহাস ও তার দলকে বুড়োর সন্ধান দেয়, গুহার পথে চালিত করে। 'রাজা', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন', 'শারদোৎসব' নাটকের ঠাকুরদাদার মধ্যে যেমন দিব্যানুভূতি আছে 'ফাল্গুনী'র অন্ধ বাউলও তেমনি দিব্যজ্ঞানের প্রতীক- দেহের স্থূল দৃষ্টি দ্বারা অতীন্দ্রিয় রহস্যকে দেখা যায় না, অন্তরের দৃষ্টি দিয়েই তা প্রত্যক্ষ করা যায়-তাই বাউল অন্ধ, তার কাছে বাইরের দৃষ্টি অর্থহীন। এর প্রমাণ আছে তার সংলাপে- "একদিন আমার দৃষ্টি ছিল। যখন অন্ধ হলুম ভয় হল দৃষ্টি বুঝি হারালুম। কিন্তু চোখওয়ালার দৃষ্টি অস্ত যেতেই অন্ধের দৃষ্টি উদয় হলো। সূর্য যখন গেল তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো। সেই অবধি অন্ধকারকে আমার আর ভয় নাই।" তার প্রতিটি গান যেমন -

(১) 'ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে'

(২) 'সবাই যারে সব দিতেছে'

(৩) 'বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা'

(৪) ‘হবে জয় হবে জয় হবে জয় রে’

(৫) ‘তোমায় নতুন করেই পাব বলে’- এগুলোতেও আছে এই অন্তর্দৃষ্টিরই প্রকাশ, যার দ্বারা জগৎ -জীবনের রহস্য জানা যায়।

‘মুক্তধারা’ নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের উক্তি- “.....সত্যদর্শী, সিদ্ধসাধক, পরমভক্ত, আনন্দময় পুরুষ ‘শারদোৎসব’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘মুক্তধারা’ পর্যন্ত কবির সব নাটকেই কিছু কিছু পরিবর্তিত রূপ দেখিতে পাই, তবে ‘মুক্তধারা’র মধ্যে সেই ‘ঠাকুরদাদা’ চরিত্রের রাজনৈতিক রূপটিই বেশি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে....”। – ‘মুক্তধারা’ নাটকের ধনঞ্জয় অত্যাচারিত জাতির আত্মার প্রতীক। আত্মার শক্তি যে অত্যাচার, অপমানে নিঃশেষিত হবার নয় তা প্রমাণ করেছে ধনঞ্জয়। সে নির্ভীকতা ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি।। রাজশক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসহায়, দরিদ্র মূক প্রজার মুখপাত্র তার কণ্ঠের তেরোটি গান। যেমন -

(১) ‘আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে’

(২) ‘আরো, আরো, প্রভু, আরো, আরো’

(৩) ‘ভুলে যাই থেকে থেকে’

(৪) ‘আমাকে যে বাঁধবে ধরে সেই হবে যার সাধন’

(৫) ‘আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন খ্যাপা সে’

(৬) ‘রইল বলে রাখলে কারে?’

(৭) ‘যা খুশি তাই করতে পার’

(৮) ‘ভাবছ-হবে তুমি যা চাও’

(৯) ‘তোর শিকল আমায় বিকল করবে না’

(১০) ‘আগুন আমার ভাই’

(১১) ‘শুধু কি তার বেঁধেই তোরর কাজ ফুরাবে’

(১২) ‘ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে’

(১৩) ‘বাজে রে বাজে ডমরু বাজে’

- এগুলি তার সংগ্রামের প্রতীক। তার সংগ্রাম স্থূল ও জড়ের সঙ্গে সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় শক্তির, হিংসার সঙ্গে অহিংসার। ধনঞ্জয় অত্যাচারিত হয়েও জড়শক্তির দৈহিক বলের আশ্রয় নেয়নি, নির্ভয়ে সত্যকথা বলেছে, মানুষের অন্তরতম সত্তার কাছে সে ন্যায়নীতিধর্মের দোহাই দিয়েছে। তার অনুচরদের কাছে, রাজার কাছে নীতিব্যাখ্যা করে বলেছে-‘জগৎটা বাণীময় রে। তোরা যেদিকটাতে শোনা বন্ধ করবি সেই দিক থেকেই মৃত্যুবাণ আসবে.... যে দণ্ড আমার পাওয়া সেটা পড়বে ওদেরই মাথার খুলির উপরে......... ভেতর থেকে যিনি ওদের চালাতে পারতেন বাইরে থেকে আমি তাকে রেখেছি ঠেকিয়ে........ যে মানুষ ধরা দিয়ে বসে আছে তাকে ধরবে কি করে।’ কোনো বিশেষ নাটকীয় মূহূর্তে ধনঞ্জয় বৈরাগীর আগমন হয়নি; অভিজিৎ যে পথে চলেছে সেই পথকে মহান রূপ দেবার জন্যই ধনঞ্জয় বৈরাগীর আগমন।

কিন্তু 'দাদাঠাকুরে'র মতো গীতিময়, তত্ত্বময় চরিত্র হলেও তাঁর সঙ্গে 'অন্ধবাউল' ও 'ধনঞ্জয়' চরিত্রদুটির তফাৎ আছে-ঠাকুরদাদা গুরুগম্ভীর চরিত্র নয়, নাটকে তত্ত্বের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই নাটকের চরিত্র এবং পাঠকের সঙ্গে তাঁর হাসিঠাট্টার সম্বন্ধও তৈরী হয়েছে, যা ধনঞ্জয় ও অন্ধ বাউলের সঙ্গে হয়নি। বরং অন্ধবাউল সম্বন্ধে চন্দ্রহাসের দল বলেছে- 'ঐ বাউলটা চুপ করে বসে থাকে, কথা কয় না, ভালো লাগছে না। ও কেমন যেন একটা অলক্ষণ'- ঠাকুরদাদা সম্বন্ধে এমন কথা শোনা যায় না। বরং তার উপস্থিতিতে সকলেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। এর প্রমাণ আছে 'অচলায়তন' নাটকে, যেখানে শোনপাংশুরা এমনকি পঞ্চক-ও তাঁকে শুধু শুধুই 'দাদাঠাকুর' বলে একবার করে ডেকে নিয়েছে প্রাণের আনন্দে।

আর 'মুক্তধারা' নাটকে ধনঞ্জয় শুধু তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। দাদাঠাকুর তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেইসঙ্গে নাটকটিকে ঘিরে প্রাণখোলা আবহের সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য যন্ত্র ও প্রাণের দ্বন্দ্ব 'মুক্তধারা' নাটকের বিষয়। তাই তাতে দাদাঠাকুরের মতো উদার, প্রাণখোলা, সহজ, সরল, তত্ত্বগত চরিত্র অপেক্ষা ধনঞ্জয়ের মতো রাশভারি তত্ত্বপ্রবণ চরিত্রের উপস্থিতিটাই কাম্য।

- তাই ঠাকুরদাদা, ধনঞ্জয় ও অন্ধবাউলকে তাদের কিছু বৈসাদৃশ্যের জন্য 'একই চরিত্র' না বলে 'একই জাতীয় চরিত্র' বা সহোদর চরিত্র বলাই ভালো। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের বসন্ত রায় চরিত্রটির সঙ্গে 'ঠাকুরদাদা' পুরোপুরি মিশে একাকার হয়ে যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ ও ঠাকুরদাদা

'শারদোৎসব', 'রাজা', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন'- এগুলো মূলত তত্ত্বনাটক। আর এই নাটকগুলোর তত্ত্বকে রূপায়িত করার জন্যই মুক্তিতত্ত্ববাহী চরিত্র ঠাকুরদাদার আবির্ভাব। 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধে 'শারদোৎসব' নাটকের 'ভিতরকার ধুয়ো' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন –'বিশেষ বিশেষ ফুলে-ফলে হাওয়ায়-আলোকে আকাশে পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ ঋতুর উৎসব চলিতেছে। সেই উৎসব মানুষ যদি অন্যমনস্ক হইয়া অন্তরের মধ্যে গ্রহণ না করে তবে সে পার্থিব জীবনের একটি বিশুদ্ধ ও মহৎ আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়'। – 'শারদোৎসব' নাটকে ঠাকুরদাদা চরিত্রটি প্রকৃতির আনন্দের সঙ্গে সকলকে যুক্ত করার চেষ্টা করেছে।

'রাজা' নাটকের বিষয় সম্বন্ধে 'অরূপরতনের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন- '.....যে প্রভু কোনো বিশেষ রূপে বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়-এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে' - রাজার এই স্বরূপ নাটকটিতে দাদাঠাকুরের উক্তির মধ্যেই ফুটে উঠেছে।

'ডাকঘর' নাটক সম্বন্ধে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন-" 'ডাকঘর' যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ

জেগে উঠেছিল। ......প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল চল বাইরে, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে হবে - সেখানকার মানুষের সুখ দুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে।" - ঠাকুরদাদাই এই নাটকে ফকিরবেশে সকলকে শুনিয়েছে বাইরে যাবার ডাক।

'অচলায়তন' নাটকের ভিতরকার কথা সম্বন্ধে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-"ধর্মকে প্রকাশ করিবার জন্য, গতি দিবার জন্যই আচারের সৃষ্টি; কিন্তু কালে কালে ধর্ম যখন সেই সমস্ত আচারকে নিয়মসংযমকে অতিক্রম করিয়া বড়ো হইয়া উঠে, ...তখন পূর্বতন নিয়মগুলি অচল হইয়া শুষ্ক নদীপথের মতো পড়িয়া থাকে ....সেই শুষ্ক পথটাকেই সনাতন বলিয়া সম্মান করিয়া নদীর ধারার সন্ধান যদি একেবারে পরিত্যাগ করা যায় তবে মানবাত্মাকে পিপাসিত করিয়া রাখা হয়।" - ঠাকুরদাদা গুরুবেশে এসে সেই নতুন নদীর ধারারই সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর আঘাত নষ্ট করিবার জন্য নহে, বড়ো করিবার জন্যই। তাহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করা নহে, সার্থক করা। - লেখক তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে সব কথা অনায়াসে বলতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ-ও 'রেখাঙ্কিত বৃদ্ধমুখের মধ্যে একটি শৈশবের সৌকুমার্যময়' চরিত্র দাদাঠাকুরকে সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে প্রচ্ছন্নে রেখে কৌশলে অনেক কথা বলে গেছেন। ঠাকুরদাদা চরিত্রটি হয়ে উঠেছে তাঁর Alter Ego.

বিশেষ তথ্য

(১) 'শারদোৎসবে'র ঠাকুরদাদা বালকদলকে ঘুরিয়ে আনতে চেয়েছেন পঞ্চানন তলার মাঠে। আর ছেলের দল যখন বলে ওঠে-'না, গল্প না, বটতলায় বসে আজ ঠাকুরদার পাঁচালি হবে' অথবা 'বটতলায় না ঠাকুরদা, আজ পারুলডাঙায় চলো'-তখন এই পঞ্চাননতলার মাঠ, বটতলা, পাঁচালি, পারুলডাঙা মিলেমিশে বাংলাদেশের এক নিত্যকাঠামো প্রস্তুত হয়ে যায়।

(২) 'রাজা' নাটকে দেখা যায়, ঠাকুরদাদার সঙ্গে রাজার সম্পর্ক সিদ্ধ হয়েছে। ঠাকুরদাদার মুখে তাই বর্ণিত হয়েছে রাজার স্বরূপ ও মহিমা। কিন্তু তাঁর সাধনার মধ্যে কোথাও একটা অপূর্ণতা ছিল। তাই তাঁকেও সুরঙ্গমা, সুদর্শনা ও কাঞ্চীরাজের সঙ্গে পথে বেরোতে হয়েছে।

(২) 'রাজা' নাটকে ঠাকুরদা রাজাকে জানে। সুদর্শনার সঙ্গে রাজার পূর্বপরিচয় নেই। দ্বন্দ্বসংঘাতের বিচিত্র জটিল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে রাজার সঙ্গে তার পরিচয় স্থাপিত হয়েছে। নাটকের আখ্যান বস্তু-ও এটাই। সেজন্য ঠাকুরদা নাট্যকারের মুখপাত্র হলেও নাটকের মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রাধান্য লাভ করেছে সুদর্শনা।

উপসংহার

১৮৯২ খ্রীঃ শিলাইদহে থাকাকালীন একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইন্দিরাদেবীকে লিখেছিলেন- "বেশ শাদাসিদে সহজ সুন্দর উন্মুক্ত দরাজ এবং অশ্রুবিন্দুর মতো উজ্জ্বল কোমল সুগোল করুণ কিছুই খুঁজে পাই নে। কেবল প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের

উপর অ্যানালিসিস - কেবল মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে মুচকে তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে তার থেকে নতুন নতুন থিয়োরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা।” - রবীন্দ্রনাথ তাঁর Idea-সর্বস্ব নাটকে ঠাকুরদাদা চরিত্রটির মাধ্যমে বিশেষ তত্ত্বকে প্রচার করতে চাইলেলও তা হয়ে উঠেছে ‘সহজ সুন্দর উন্মুক্ত দরাজ এবং অশ্রুবিন্দুর মতো উজ্জ্বল কোমল সুগোল করুণ’।

শঙ্খঘোষ তাঁর ‘কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক’ গ্রন্থে চিত্রসহযোগে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের নাটকে কিভাবে চরিত্র বিন্যস্ত হয় –

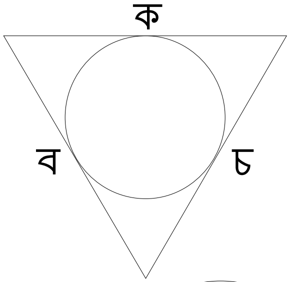

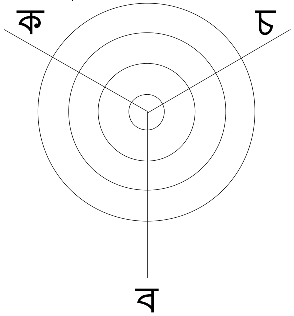

ক, ব, চ যদি কোনো নাট্যকাহিনীর চরিত্র হয়, রবীন্দ্রনাথের নাটকে এরা প্রায়ই প্রথম ছবির ধরণে মূল কাহিনীবৃত্তকে স্পর্শ করে থাকে, পরস্পরকেও স্পর্শ করে, তা যেন বৃত্তের বাইরে। দ্বিতীয় ছবিতে চরিত্রগুলির অংশমাত্র দেখতে পাই বৃত্তের ভিতরে, বাকীটা ধরা পড়ে দূরাভাসে। আর এদের সঞ্চার কেন্দ্রমুখী বলেই চূড়ান্ত মূহূর্তে পৌঁছবার আগেও অনেকবার তারা ঢেউ তুলে দেয় বৃত্তের অন্তশ্চাঞ্চল্যে।

- এর ভিত্তিতে বলা যায়-ঠাকুরদাদা চরিত্রটিও নাটকের কাহিনীবৃত্তকে ছুঁয়েছে, অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে তার পারস্পরিক ক্রিয়া দেখা গেছে এবং নাট্যবৃত্তের বাইরেও ধরা পড়েছে তার চরিত্রের কিছুটা অংশ, যা ঠাকুরদাদার প্রতিটি ‘সাজ’, ‘প্রতিটি কাজ’, প্রতিটি সংলাপ ও গানের মাধ্যমে নিয়ে এসেছে 'ছেলেবেলাকার মায়ামিশ্রিত, মোহাচ্ছন্নতা ও অর্ধচেতনার বিস্মৃত ‘রূপকথার জগৎ’। চরিত্রটির তুলনা শুধুমাত্র অসীমতার সঙ্গে-“অসীমতা এবং এই একটি মানুষ উভয়ে পরস্পরের সমকক্ষ-আপন আপন সিংহাসনে পরস্পর মুখোমুখি বসে থাকবার যোগ্য”। আবার অন্যদিক থেকে

দেখতে গেলে মনে হয় তিনি নিতান্তই 'মাটির সন্তান-যারা নিতান্তই পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে লেগে আছে' সেরকম একজন 'দ্বিধাহীন চিন্তাহীন প্রাণ', প্রবল জীবনানন্দ স্বরূপ, মানুষটি এমন যে সে পাঠকের 'আর সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টা দূর করে দিয়ে একমাত্র নিজের দিকেই সমগ্র মনটি আকর্ষণ করে' নিয়ে যায় শুধুমাত্র 'হাসির সম্পর্ক' স্থাপনের মাধ্যমে।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। *উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা,* পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, আষাঢ় ১৪০৫, *ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি,* কলকাতা

২। *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী,* চতুর্থ খন্ড, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৯৪, *বিশ্বভারতী,* কলকাতা।

৩। *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী,* পঞ্চম খন্ড, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, পৌষ ১৩৯৪, *বিশ্বভারতী,* কলকাতা।

৪। *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী,* ষষ্ঠ খন্ড, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৯৫, *বিশ্বভারতী,* কলকাতা।

৫। *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী,* সপ্তম খন্ড, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৯৫, *বিশ্বভারতী,* কলকাতা।

৬। *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী,* অষ্টম খন্ড, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৯৫, *বিশ্বভারতী,* কলকাতা।

আবশ্যিক সম্ভাবনা রূপে মৃত্যু- একটি হাইডেগেরীয় পর্যালোচনা

সৌভিক ঘোষ
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ,
রানাঘাট কলেজ, রানাঘাট, নদীয়া

সারসংক্ষেপ: অস্তিবাদী ঘরানার মধ্যে থেকেও হাইডেগার নিজেকে কখনও অস্তিবাদী দার্শনিক হিসেবে পরিচয় দেননি। তিনি তাঁর দর্শনে মানব অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মানবসত্তার অস্তিত্বের তিনটি আকারের কথা বলেছেন। তিনটি আকারের মধ্যে প্রথমটি হল অনন্ত সম্ভাবনাময় অস্তিত্ব। এখানে হাইডেগার মানব সত্তার তিন প্রকার সম্ভাবনার কথা বলেছেন। তার মধ্যে চরম বা আবশ্যিক সম্ভাবনা হল মৃত্যু। মৃত্যুকে স্বীকার করে নেওয়াই যথার্থ অস্তিত্বের বড় লক্ষণ বলে হাইডেগার মনে করেন। হাইডেগার বলেছেন মৃত্যু নিশ্চিত কিন্তু মৃত্যু কাল অনিশ্চিত। মৃত্যুর মতো উদ্বেগ মানুষের জীবনে আর কিছু নেই। মৃত্যু এমন এক আবশ্যিক সম্ভাবনা যার মাধ্যমে সকল সম্ভাব্য সম্ভাবনার বিনাশ ঘটে। তিনি বলেছেন মানবসত্তার উচিত মৃত্যুকে স্বীকারের মধ্যে দিয়ে সার্থক অস্তিত্বকে দিকে অগ্রসর হওয়া।

সূচক শব্দ: মানবসত্তা, অনন্ত সম্ভাবনা, মৃত্যু, উদ্বেগ, সার্থক অস্তিত্ব।

মূল আলোচনা:

হাইডেগার সাধারণত একজন অস্তিবাদী দার্শনিক হিসেবে পরিচিত। অস্তিবাদী দর্শনের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হল ব্যক্তি মানুষ। ব্যক্তি মানুষের সক্রিয় মূর্ত অস্তিত্ব অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষের প্রাত্যহিক যাপিত জীবন। অস্তিবাদীদের কাছে দর্শন মানেই ব্যক্তি মানুষের দর্শন। অস্তিবাদী দার্শনিকেরা কখনও নিজেকে অস্তিবাদী সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত বলতে রাজি ছিলেন না কারন তাঁরা বলতেন, 'আমি একজন অস্তিবাদী' বলা মানেই 'আমি অস্তিবাদ নামক এক বিশেষ শ্রেণীর সদস্য' একথা স্বীকার করা। পরিবর্তে অস্তিবাদীরা বলতে চান 'আমি আমিই এবং তোমরা আমাকে যে বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছো তা আমি আদৌ পছন্দ করি না'। সুতরাং অস্তিবাদীরা কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে রাজি নন। সেইরূপ হাইডেগার নিজেকে কখনও অস্তিবাদী দার্শনিক বলেননি, বরং অস্তিত্বের দার্শনিক বলেছেন। তিনি তাঁর মূল বই *Being and Time* এ মানব অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন।

হাইডেগারের *Being and Time* এর মূল আলোচ্য বিষয় হল 'Being' এর অর্থের সমস্যা। সেই প্রাচীন গ্রীক দর্শন থেকে 'Being' কে একটা 'concept' বা 'প্রত্যয়' রূপে দেখা হতো। হাইডেগার বলেছেন এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারনা। কারণ তিনি

বলেছেন সত্তাকে প্রত্যয় রূপে দেখা হলে কখনই মানব সত্তার ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। তাই পরবর্তী কালে তিনি 'Being' এর অর্থের যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ গ্রহন করেছেন। তিনি 'Being' এর অর্থ নিরূপন করেছেন। তাঁর কাছে 'Being' ও 'Existence' একই কথা। কারণ অস্তিত্বকে সত্তা না বলে বিধেয় হিসেবে ব্যবহার করলে সমস্যা হবে। কারণ সত্তার অস্তিত্ব আছে একথা বলা যায় না, বলতে পারি কোন কিছুর সত্তা আছে অর্থাৎ সেটা অস্তিত্বশীল। তিনি এখানে অস্তিত্ব বলতে মূলত মানব অস্তিত্বকেই বুঝিয়েছেন। তিনি তাঁর সমগ্র বই জুড়ে মানব অস্তিত্ব বোঝাতে এক বিশেষ জার্মান শব্দ ব্যাবহার করেছেন, সেটি হল 'Dasein'। সাধারণত এর ইংরেজি আনুবাদ করা হয় 'Being-in-the-World'। অর্থাৎ তিনি 'Being' এর সাথে 'জগত'কেও যুক্ত করেছেন। এটা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে তাঁর দর্শনে মানব অস্তিত্বের ক্ষেত্রে জগতের ভূমিকা রয়েছে। হাইডেগারের কাছে মানবসত্তা বা 'Dasein' কোন জগত থেকে বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়, 'জগত-সম্পৃক্ত সত্তা'।

হাইডেগার 'Dasein' এর অস্তিত্বমূলক কাঠামো বিশ্লেষণ করার জন্য দুই প্রকার অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য করেছেন- i) Ontical existence ও ii) Ontological existence। 'Ontical' হল তাই যা দৈনন্দিন অস্তিত্বকে বোঝায়। অপরদিকে 'Ontological'- 'Dasein' এর সেই বিশেষ দিকটিকে নির্দেশ করে যেখানে 'Dasein' তার সত্তা বা being সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপণ করতে পারে। হাইডেগার বলেছেন একমাত্র 'Dasein' এরই 'Ontological existence' আছে। কারণ একমাত্র মানব সত্তাই নিজের সত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারে। অন্যদিকে মানুষ এবং মানুষ ছাড়া জগতে আর যা কিছু তাদের অস্তিত্ব হল 'Ontical existence'। তাই হাইডেগার বলেছেন, "Dasein is ontically distinctive in that it is ontological."। এ বিষয়ে Solomon তাঁর *From Rationalism to Existentialism* বই এ বলেছেন, "Only Dasein is ontological, although everything that exist is ontic. "Dasein's ontological structure" refers to the particular characteristic of Dasein such that it asks question about Being."[1] ।

'Ontical existence' সম্পর্কে M. King তাঁর *Heidegger's Philosophy* গ্রন্থে বলেছেন, "The adjective "ontic" is the counterpart to "ontological": it characterizes beings, not their being. Anything that in any way "exists" is ontic. The synonym for ontic is "existent," the word to be understood in the traditional sense of real existence, and not in Heidegger's special sense. Approximations to ontic are: real, concrete, empirical, given in experience... Heidegger uses the word *ontic* constantly, applying it to man as well as to things."[2] অর্থাৎ 'ontic' হল 'Ontological' এর বিশেষণ। এবং এই জগতে যা কিছু অস্তিত্বশীল

তাদের সকলের ক্ষেত্রে ‘ontic’ বিশেষণটি প্রযোজ্য। হাইডেগারের পূর্বে ‘ontic’ এর সমার্থক শব্দ হিসেবে প্রয়োগ করা হতো ‘existent’ কে। কিন্তু তিনি ‘existent’ কে ‘ontic’ এর সমার্থক হিসেবে প্রয়োগ করতে আগ্রহী নন। তিনি ‘ontic’ এর সমার্থক শব্দ হিসেবে ‘Existentiell’ কে ব্যবহার করেছেন যা শুধুমাত্র মানবসত্তার ‘ontical’ অস্তিত্বকে সূচিত করে- “*Existentiell* is only approximately parallel to ontic and has a much more restricted meaning, applying only to man.”[3] । সুতরাং হাইডেগার ‘Ontical existence’ কে মানুষ এবং জগতে অন্যান্য সত্তার প্রতি প্রয়োগ করেছেন, যারা কোন না কোন ভাবে অস্তিত্বশীল।

এই দুই প্রকার অস্তিত্ব সম্পর্কে হাইডেগারের মূল কথা হল, মানুষ ছাড়া এই জগতে আর যে সব সত্তা আছে তাদের অস্তিত্ব হল ‘Ontical existence’। মানুষ ছাড়া আর জগতে আর যেসব সত্তা আছে তাদের সকলেরই কেবলমাত্র একটা আকারগত বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যদিকে কেবলমাত্র মানবসত্তারই ‘Ontical existence’ তো আছেই আবার ‘Ontological existence’ ও আছে। একমাত্র মানবসত্তাই নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারে। একমাত্র মানবসত্তাই প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে কিছু হতে চায়। এবং এই মানবসত্তাই একমাত্র নিজের সাথে জগতের আবশ্যিক, প্রয়োগিক সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত হতে পারে। তাই মানবসত্তার ‘Ontical’ এবং ‘Ontological’ দুই প্রকার অস্তিত্বই আছে। তাই M. King বলেছেন, “Heidegger frequently applies the simple terms ontology and ontic to man.”[4]

Being and Time গ্রন্থে হাইডেগার ‘Dasein’ কে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করতে গিয়ে তাকে জাগতিক বস্তুর প্রতি ‘যত্ন সমৃদ্ধ আগ্রহ’ বা ‘Care’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন ‘Dasein’ এর অন্যান্য কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য, যেমন- জগত-সমৃদ্ধ সত্তা, মৃত্যু, স্বাধীনতা ইত্যাদি ‘Care’ থেকে এসেছে। ‘Care’ হিসেবে ‘Dasein’ এর প্রকৃতি হুসার্লের চেতনার বিষয়মুখিনতা (intentionality) তত্ত্বের সাথে তুলনীয়। কারণ হুসার্লের মতো হাইডেগারও মনে করতেন ‘Dasein’ সর্বদাই জগতে কোন না কোন বিষয়ের সম্মুখীন হয়। কিন্তু উভয়ের মতের মধ্যে পার্থক্য আছে। Solomon বলেছেন হাইডেগারের ‘Care’ অনেক বেশি ব্যবহারিক এবং অ-জ্ঞানজ- “Care is intentionality, but with a new emphasis on the more ‘practical’ and ‘non cognitive’ acts which were neglected by Husserl.”[5] সুতরাং হাইডেগারের কাছে ‘Care’ হল ‘Dasein’ এর সমস্ত প্রকার গঠন কাঠামো। তাই Solomon বলেছেন, “In *Being and Time*, Dasein is further defined as *care* (*Sorge*); all other structures of Dasein are introduced as structures of *care*.”[6]। এ বিষয়ে হাইডেগার তাঁর *Being and Time* এ বলেছেন, “Care, as a primordial structural totality, lies ‘before’ [“vor”] every factical ‘attitude’ and ‘situation’ of Dasein, and it does so

existentially *a priori*; this means that it always lies *in* them."[7]। অর্থাৎ 'Care' হল 'Dasein' এর একটি পূর্বতঃসিদ্ধ আকার, যা 'Dasein' এর বাস্তব অবস্থা ও আচরণকে নির্দেশ করে।

হাইডেগার বলেছেন মানুষের 'Care' বা 'যত্ন সমৃদ্ধ আগ্রহ' শুধুমাত্র জগতের অন্যান্য বস্তুর প্রতি সীমাবদ্ধ নয়, মানুষ নিজের সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলে। একমাত্র মানুষেরই নিজের সত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা আছে। যখন মানুষ প্রশ্ন তোলে 'আমি কে?' তখন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রত্যেক মানুষ নিজের মধ্যে থাকা তিনপ্রকার অস্তিত্বমূলক কাঠামোকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। এই তিন প্রকার অস্তিত্বমূলক কাঠামো হল- i) 'Existenz' বা অনন্ত সম্ভাবনাময় অস্তিত্ব, ii) 'Facticity' বা বাস্তবতা বা তথ্যতা এবং iii) 'Fallenness' বা নৈতিক পতন। তিনি এগুলিকে অস্তিত্বের একপ্রকার পূর্বতঃসিদ্ধ কাঠামো বলেছেন। তিনি বলেছেন এগুলিকে কখনই 'categories' বলা যাবে না। কারণ categories বা বৌদ্ধিক প্রকারগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ হলেও সেগুলি কিন্তু এই জগতে 'Dasein' ব্যতীত অন্যান্য সত্তার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। ফলে ওই তিন প্রকার অস্তিত্বমূলক কাঠামোকে 'Categories' বা বৌদ্ধিক প্রকার বলা যায় না। এগুলি হল 'Dasein' এর পূর্বতঃসিদ্ধ কাঠামো। এই তিন প্রকার কাঠামোকে হাইডেগার কখনো কখনো 'Existentialia' বলেছেন আবার কখনো 'Existentials' বলেছেন। এবিষয়ে Solomon বলেছেন, "These three structures are called *existentialia* or sometimes *existentials* as well as "*existential structures.*" They are a priori characteristics of Dasein; they are not to be confused with *categories* which are also a priori characteristics but which apply to objects or entities within the world other than Dasein."[8]। এই তিন প্রকার অস্তিত্বমূলক কাঠামোকে 'Dasein' এর বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা যাবে না। বরং এগুলিকে অস্তিত্বের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ বলা যেতে পারে, যার মাধ্যমে 'Dasein' অস্তিত্বমণ্ডিত হয় বা তার অস্তিত্বকে ধরে রাখে। হাইডেগার বলেছেন 'Dasein' এর এই তিন প্রকার গঠনগত কাঠামোকে বিশ্লেষণের মাধ্যমেই মানব অস্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপকে জানা যাবে।

Solomon বলেছেন, "The concept of *Existenz* refers to that a priori or existential structure of Dasein that is a "projection of possibilities"."[9]। অর্থাৎ 'Existenz' বলতে হাইডেগার 'Dasein' এর কতকগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ আকারকে বোঝেন যা 'Dasein' এর কতকগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ সম্ভাবনাকে অভিক্ষেপণ করে। সুতরাং এই সম্ভাবনাগুলি এবং তাদের অভিক্ষেপণের প্রকৃতি অনুসন্ধানের দ্বারাই আমরা 'Dasein' এর অস্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করতে সক্ষম হব। তাই তিনি বলেছেন, "The essence of Dasein consists of its *Existenz*"[10] অর্থাৎ 'Dasein' এর সারসত্তা নিহিত আছে তার অনন্ত সম্ভাবনাময়

অস্তিত্বের মধ্যে। সুতরাং হাইডেগার 'Existenz' বলতে বুঝিয়েছেন 'Dasein' এর মধ্যে থাকা অনন্ত সম্ভাবনাকে এবং সেই সম্ভাবনাগুলিকে বেছে নেওয়ার ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

তিনি আরও বলেছেন 'Dasein' জগতকে নিছক জানে না, কিংবা অজান্তে সে জগতে ক্রিয়া করে না। সে জগতকে পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করে এবং তা বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হয়। এ বিষয়ে জগতে অন্যান্য সত্তার সাথে 'Dasein' এর পার্থক্য আছে। তিনি বলেছেন 'Dasein' এর মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে সেই সম্ভাবনাগুলির ভিন্নতার জন্যই বিভিন্ন মানুষের প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই বলা হয়েছে, "Dasein is ("in each case," that is, for each person) "its own possibility." This means that we should not expect to find a general set of potentialities or capacities for all human beings."[11] হাইডেগার বলেছেন মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা থাকলেও তাদের মূলত দুটি মৌলিক শ্রেণীর অন্তর্গত করা যেতে পারে- যথার্থ বা সার্থক অস্তিত্বের সম্ভাবনা এবং অযথার্থ বা অসার্থক অস্তিত্বের সম্ভাবনা।

Solomon তাঁর *From Rationalism to Existentialism* বইএ বলেছেন, হাইডেগারের সেই বিখ্যাত উক্তি- "The essence of Dasein consists of its Existenz"- এটি থেকেই সার্ত্রে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি- "Existence precedes essence" এটি নিয়েছেন। অর্থাৎ সার্ত্রের বিখ্যাত উক্তি- "Existence precedes essence" এটি হাইডেগারের থেকে নেওয়া। তবে পরবর্তীকালে হাইডেগার তাঁর *Latter on Humanism* গ্রন্থে সার্ত্রের এই উক্তিটি বর্জন করেছেন, সেখানে তিনি বলেছেন সার্ত্রে তাঁর উক্তিতে 'Existence' শব্দটিকে প্রথাগত অর্থে ব্যবহার করেছেন, যার ফলে 'Existence' শব্দটি যে কোন বস্তু বা বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে। কিন্তু হাইডেগারের কাছে 'Existence' শব্দটির একটি স্পষ্ট ও বিশেষ অর্থ আছে। হাইডেগারের কাছে 'Existence' শব্দটি কেবলমাত্র মানবসত্তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই তিনি বলেছেন, "The Existenz of man is his essence."। অর্থাৎ মানবসত্তার সারসত্তা হল তার অনন্ত সম্ভাবনা বা 'Existenz'। তাই হাইডেগারের দর্শনে মানব সত্তাকে বুঝতে গেলে মানুষের মধ্যে থাকা অনন্ত সম্ভাবনাকে বুঝতে হবে।

এবার মনে হতে পারে এই যে বারবার অনন্ত সম্ভবনার কথা বলা হচ্ছে, এই সম্ভাবনাগুলি কি প্রকারের। এ বিষয়ে হাইডেগার মানুষের মধ্যে থাকা তিন প্রকারের সম্ভাবনার কথা বলেছেন-

১. 'Possible Possibility' বা সম্ভাব্য সম্ভাবনা, ২. 'Impossible Possibility' বা অসম্ভাব্য সম্ভাবনা এবং ৩. 'Necessary Possibility' বা আবশ্যিক সম্ভাবনা।

১. 'Possible Possibility' বা সম্ভাব্য সম্ভাবনাঃ সম্ভাব্য সম্ভাবনা হল মানুষের জীবনে সব সাধারন সম্ভাবনা অর্থাৎ মানুষ সাধারন ভাবে যা হয়ে উঠতে চায়। এই

সম্ভাবনাগুলি অনেক রকম হতে পারে। এই সম্ভাবনাগুলো সবই সম্ভব। যেমন- কেউ কবি হতে চায়, কেউ জ্ঞানী হতে চায়, কেউ শিক্ষক হতে চায় ইত্যাদি। এই সকল সম্ভাবনা মানুষের ক্ষেত্রে হয়ে ওঠা সম্ভব।

২. **'Impossible Possibility' বা অসম্ভাব্য সম্ভাবনাঃ** যে ধরনের সম্ভাবনাগুলি মানুষের ক্ষেত্রে কখনই হয়ে ওঠা সম্ভব নয় তা হল অসম্ভাব্য সম্ভাবনা। যেমন- মানুষ অমরত্ব লাভ করতে চায়, পূর্ণকে জানতে চায়, এগুলো কখনই মানুষের ক্ষেত্রে হওয়া সম্ভব নয়। তাই এগুলি সব অসম্ভাব্য সম্ভাবনা।

৩. **'Necessary Possibility' বা আবশ্যিক সম্ভাবনাঃ** এটা এমন এক ধরনের সম্ভাবনা যা সম্ভাব্য ও নয় আবার অসম্ভাব্য ও নয়, এটা হল আবশ্যিক সম্ভাবনা। এই প্রকার সম্ভাবনা কোন ব্যক্তির চাওয়া বা না চাওয়ার উপর নির্ভর করে না। এই প্রকার সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নেওয়াই মানব জীবনের চরম কর্তব্য। মানব জীবনের এই আবশ্যিক সম্ভাবনাটি হল মৃত্যু। মৃত্যু হল সকলের আবশ্যিক সম্ভাবনা। মৃত্যু সকলের জীবনে আসবেই, কেউ তাকে স্বীকার করুক বা নাকরুক। মৃত্যুকে স্বীকার করে নেওয়াই যথার্থ অস্তিত্বের বড় লক্ষন বলে হাইডেগার মনে করেন। হাইডেগার বলেছেন মৃত্যু নিশ্চিত কিন্তু মৃত্যু কাল অনিশ্চিত। মানুষ সর্বদা এই নিশ্চয়তা ও অনিশ্চয়তার দোলাচলে থাকে। মৃত্যুর মতো উদ্বেগ মানুষের জীবনে আর কিছু নেই। মৃত্যু এমন এক আবশ্যিক সম্ভাবনা যার মাধ্যমে সকল সম্ভাব্য সম্ভাবনার বিনাশ ঘটে। কিন্তু মৃত্যুকে আমরা মেনে নিতে পারিনা। মৃত্যু আমার নিজস্ব একার সম্ভাবনা। মৃত্যু আমাকে সবার থেকে আলাদা করে দেয়, একা করে দেয়।

তিনি মৃত্যুর উদ্বেগের কথা স্বীকার করেছেন। করেছেন। হাইডেগার ভয় বা 'fear' এবং 'শঙ্কা' বা 'আতঙ্ক' বা 'dread' এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর কাছে 'ভয়' এবং 'আতঙ্ক' এক নয়। 'ভয়' হল কোনকিছু থেকে ভয়, এবং এই 'ভয়' এর বিষয় আমাদের বাইরে অবস্থিত। অন্যদিকে 'আতঙ্কের' বিষয় বাইরে থাকে না, এই আতঙ্ক ব্যক্তির ভিতর থেকে সৃষ্টি হয়। এই 'dread' এর ধারণার মধ্যে ব্যক্তির কতকগুলি বিশেষ উদ্বেগের ধারণাও আছে। এই উদ্বেগ হল ব্যক্তির মৃত্যুর উদ্বেগ। এই মৃত্যু হল মানুষের সমস্ত সম্ভাবনার 'শেষ' বা 'end'। হাইডেগার এই 'শেষ' বা 'end' শব্দটিকে তাঁর *Being and Time* গ্রন্থে দুই ভাবে ব্যবহার করেছেন। প্রথম অর্থে 'শেষ' বা 'end' বলতে কালিক শেষকে বোঝানো হয়েছে যেখানে মানুষের দৈহিক মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে 'শেষ' বা 'end' শব্দটিকে হাইডেগার "'goal' of life" বা জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। এটিকে তিনি জীবনের 'goal' বা লক্ষ্য বলেছেন কারণ তিনি মনে করতেন মৃতুকে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে দিয়েই মানুষের সার্থক বা যথার্থ অস্তিত্ব সূচিত হয়। তিনি বলেছেন এই মৃত্যুকে আমরা মেনে নিতে পারিনা। এবং এই মৃত্যুর উদ্বেগের মধ্যে আমরা নিক্ষিপ্ত হই। মৃত্যু হল মানুষের অন্তিম এবং একান্ত নিজের সম্ভাবনা। হাইডেগার বলেছেন এই চরম সম্ভবনা মৃত্যুকে স্বীকারের মাধ্যমে

মানবসত্তা সার্থক অস্তিত্বকে যাপন করতে পারে। সুতরাং আমাদের মৃত্যুকে স্বীকার করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ সুতরাং হাইডেগারের অস্তিত্বের ধারনার সাথে মৃত্যুর ধারণা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। মৃত্যু মানব অস্তিত্বের চরম লক্ষ্য। মানুষকে মৃত্যুকে স্বীকারের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এই মৃত্যু হল মানুষের অন্তিম এবং একান্ত নিজের সম্ভাবনা। তিনি বলেছেন যদি আমরা মৃত্যুর উদ্বেগকে স্বীকার করে নিতে পারি তাহলে সার্থক অস্তিত্বকে যাপন করতে পারবো অন্যথায় অসার্থক অস্তিত্বের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১. Robert C. Solomon, *From Rationalism to Existentialism* (New York: Haspers & Row Publishers, 1972), 199.
২. Magda King, *Heidegger's Philosophy* (New York: The Macmillan Company,1964), 64.
৩. King, *Heidegger's Philosophy,* 71
৪. King, *Heidegger's Philosophy,* 65
৫. Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 207.
৬. Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 206
৭. John Macquarrie & Edward Robinson*, Being and Time*, trans. (New York: Hasper & Row Publishers, 1962), 19.
৮. Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 209
৯. Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 210
১০. Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 210
১১. Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 210

গ্রন্থপঞ্জী:

১. Barrett, Willam. ***Irrational Man.*** London: Heinemann, 1961.
২. Dreyfus, Hubert L. ***Being-in-the-World.*** Cambridge: The MIT Press, 1972.
৩. Grene, Marjorie, ***Introduction to Existentialism.*** Chicago, U.S.A: The University of Chicago, 1948.
৪. Heidegger, Martin. ***Being and Time.*** Trans. John Macquarrie & Edward Robinson. New York: Hasper & Row Publishers, 1962.
৫. King, Magda. ***Heidegger's Philosophy.*** New York: The Macmillan Company, 1964.

৬. Macquarrie, John. *Existentialism.* New York: Penguin Press, 1972.
৭. Solomon, R. C. *From Rationalism to Existentialism.* New York: Haspers & Row Publishers, 1972.
৮. Warnock, Mary. *Existentialism.* New York: Oxford University Press, 1978.
৯. সরকার, স্বপ্না. *অস্তিবাদী দর্শন ও প্রতিভাস বিজ্ঞান.* কলেজস্ট্রীট, কলকাতা ৭৩: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৩.

ঔপনিবেশিকতার আলোকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনী

শুভাশীষ ঘোষ
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা হলো একটি মিশ্র জাতি, যারা পিতার দিক থেকে ইউরোপীয় আর মায়ের দিক থেকে ভারতীয়। পর্তুগিজদের ভারত আগমনের পর থেকেই এই জাতির সূচনা হয়। এই সময় থেকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা ভারতবর্ষে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে, তেমনি সেনাবাহিনীতে যোগদান ছিল তাদের কাছে একটি কর্মক্ষেত্র। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা হলে তাদের সেনাবাহিনীর প্রয়োজন বৃদ্ধি পায় এবং যার সূত্র ধরে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। ব্রিটিশ শাসনের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর পরিষেবাতে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। তাও অনেক সময় এই মিশ্র জাতির সৈনিকদের ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক বঞ্চিত হতে হয়েছে, এমনকি সেনাবাহিনী থেকে তাদের বহিষ্কৃত করে দেওয়া হয়েছে। তার সত্বেও পিতৃ রক্তের টানে তারা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে এবং তাদের প্রয়োজনমতো পরিষেবা দিয়ে এসেছে। এই সম্প্রদায়ের পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক, নার্স, প্রভৃতি পরিষেবা প্রদান করেছে। সুতরাং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা সংখ্যার দিক থেকে একটি ছোট্ট সম্প্রদায় হলেও তারা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে তাদের মূল্যবান পরিষেবা প্রদান করেছে। এই গবেষণাধর্মী প্রবন্ধটিতে সেই দিকটিকেই তুলে ধরা হয়েছে।

সূচকশব্দ: অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, ইউরেশিয়ান, ব্রিটিশ, সেনাবাহিনী, যুদ্ধ।

বণিকের মানদন্ড যখন রাজদণ্ডে পরিণত হয় তখন থেকে শাসনের প্রয়োজনে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা ও মুখ্য রূপে প্রতিভাত হয়। সেই সময় থেকে বাহিনীর প্রয়োজনে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় থেকেও অনেকে এই পরিষেবার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের পূর্বে মিশ্র জাতি রূপে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। লড হার্ডিঞ্জের সরকার **১৯১১** সালের আদমশুমারিতে ইউরোপীয় পিতা ও ভারতীয় মাতার সন্তানদের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বলে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়।[i] এই স্বীকৃতির পূর্বে এই সম্প্রদায় *Half-cast, Eurasian, Indo-Britons, East-Indian* প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল।[ii] প্রকৃতপক্ষে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা মায়ের দিক থেকে হল ভারতীয় আর বাবার দিক থেকে হল ইউরোপিয়ান অর্থাৎ

ইংরেজ, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি প্রভৃতি।[iii] একটি ছোট সম্প্রদায় হলেও ঔপনিবেশিক আমলের কর্মকাণ্ডে তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। যদিও অনেক সময় তাদের কর্মকাণ্ডের সঠিক মূল্যায়ন তৎকালীন শাসক করেনি, তবুও এ কথা বলা যায় যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের উন্মেষের সময় থেকে শেষ পর্যন্ত এই মিশ্র জাতিটি বেসামরিক এর সাথে সাথে সামরিক পরিষেবার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান জাতির সূচনা হয় পর্তুগিজদের আগমনের পর থেকে। ফলস্বরূপ সামরিক ক্ষেত্রে তাদের পরিষেবার সূচনা সেই সময় থেকে শুরু হয়। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের সূচনার পূর্ব থেকেই দেখা যায় যে ইউরোপীয় এবং ইউরেশিয়ান বা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা সামরিক ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনা থেকে দেশীয় বিভিন্ন প্রদেশের সেনাবাহিনীতে তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মুঘল সাম্রাজ্য এবং অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলির সেনাবাহিনী পরিচালনা তথা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ইউরোপিয়ান দের পাশাপাশি ইউরেশিয়ানদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই প্রসঙ্গে গ্রে তার *‘ইউরোপিয়ান অ্যাডভেঞ্চারস ইন নর্দান ইন্ডিয়া’* তে দেখিয়েছেন যে তৎকালীন সময়ে মুঘল সেনাবাহিনীতে বেশকিছু সংখ্যক ইউরোপিয়ান পরিষেবা দিত, যাদের মধ্যে অনেকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় থেকে এসেছিল।[iv] সেই সময় দেখা যায় শাজাহান এবং ঔরঙ্গজেব মুঘলদের সেবার জন্য তাদের বাহিনীতে এই ধরনের ১০০ জন বন্দুক ধারীকে রেখেছিল।[v]

পরবর্তীকালে এই মিশ্র জাতিটি ডাচ, ফরাসি এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কে এই পরিষেবা প্রদান করেছে। ইংরেজরা তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে এই সম্প্রদায়ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে নিজেদের সংযুক্ত করে পরিষেবা প্রদান করেছে। ১৭৪৬ সালে মাদ্রাজের সেন্ট জর্জ এবং ফোর্ট সেন্ট ডেভিস থেকে ইংরেজদের পশ্চাদপসরণ এবং ফরাসিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর ইংরেজরা ভারতীয়দের থেকে সেনাবাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। সেইমতো শুরু হয় ইংরেজদের জন্য ভারতীয় বাহিনী গড়ে তোলার কাজ।[vi] এর পরবর্তীকালে ১৭৪৯ সালে ফোর্ট সেন্ট জর্জ ইংরেজরা যখন পুনরুদ্ধার করে সেই বাহিনীতে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ফলস্বরূপ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের এই গৌরব তাদের ব্রিটিশ বাহিনীতে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। এই সময় ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী সংগঠিত রূপ দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ইংরেজ মেজর জেনারেল স্টিংগার লরেন্স, যাকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জনক বলা হয়। তার সঙ্গে কাজ করে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সেনারা অভিজ্ঞতা অর্জন করে সমৃদ্ধ হয় এবং সেই অভিজ্ঞতার উপর ভর করে সেই সময় বিবাদমান বিভিন্ন বাহিনীর নেতৃত্বদান করার সুযোগ পায়। এই সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর পাশাপাশি দেশীয় বিভিন্ন প্রদেশ গুলির সেনাতেও তারা

পরিষেবা দিতে শুরু করে। কিন্তু সেই সময় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের খুব কম সেনাই কোম্পানির বাহিনীর উচ্চ স্তরের নেতৃত্বে পৌঁছাতে পেরেছিল।[vii]

গ্রিন ১৭৯৮ সালের ১৪ই জুন একটি সাধারণ আদেশ নাম্বার জারি করে উল্লেখ করেন যে সেনা ও ড্রাম বাদকদের মিলিটারি অরফান স্কুল থেকে নেওয়া হবে।[viii] এই ঘোষণার পর থেকে অরফান স্কুল থেকে তেরো বা চৌদ্দ বছরের ইউরেশিয়ান ছেলেরা সেনাবাহিনীতে যোগদান করত। এইভাবে সেনাবাহিনীতে ইউরেশিয়ানদের কর্মসংস্থানের সংরক্ষণের একটি প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়। যার ফলস্বরূপ দেখা যায় যে বেঙ্গল লোয়ার স্কুল থেকে ১৭৮২ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে ৬৯৩ জন কে সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করা হয়েছিল, যা সমস্ত ছাত্রদের তিন চতুর্থাংশ ছিল। তারা সকলেই সামরিক যোদ্ধা এবং ড্রাম বাদক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল।[ix] ট্রুপ সার্জেন্ট মেজর চার্লস থমসনের ১৮২৫ সালে বেউর এ জন্ম হয়, তিনিও একজন ইউরেশিয়ান ছিলেন। তিনি ১৮৩৯ সাল নাগাদ ব্যান্ড কর্পোরাল ছিলেন। ১৮৫৭ সালে তিনি সার্জেন হয়ে কর্মরত ছিলেন, সেই সময় শিয়ালকোর্টে নবম বিদ্রোহের সময় তাকে অপহরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি লাহোরে স্থানান্তরিত হন। দেখা যায় যে রেজিমেন্ট আলাদা হওয়ার সাথে সাথে সেনাবাহিনীর ব্যান্ডবাদকদের নিযুক্তির সম্ভাবনা এবং কাজের ধরনও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। মিলিটারি মিউজিক ছাড়াও এই সকল আর্মিব্যান্ড গুলি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে বিনোদনের জন্যেও ব্যবহার করা হতো।[x]

ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির বাহিনীর স্বার্থে বা প্রয়োজনের সময় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের বাহিনী থেকে খুব কমই বের করে দেওয়া হয়েছে বা অবহেলা করা হয়েছে। কারণ ভারতবর্ষে কোম্পানির সেনাবাহিনীর প্রয়োজন তাদের গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। আবার দেখা যায় কোম্পানি রেজিমেন্টের বাইরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বেশ কিছু সংখ্যক ব্রিটিশ ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা ভারতীয় শাসক বা প্রধানদের অধীনে বেতন নিয়ে চাকরি করত। যখন দ্বিতীয় ইঙ্গো-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হয় তখন ব্রিটিশ এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সৈন্য যারা অন্যদের অধীনে চাকরি করছিল তাদের কোম্পানির বাহিনীর কাছে ফিরে আসার জন্য একটি ঘোষণা জারি করা হয়েছিল। এই ঘোষণাতে আরো বলা হয় যে যারা কোম্পানির বাহিনীতে যোগদান করবে না তাদের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে গণ্য করা হবে।[xi] তবে তারা এতে ভীত না হয়ে তারা তাদের পিতার দিকের রক্তের ডাক শুনেছিল এবং তারা মনে করেছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের থেকে তাদের মৃত্যুবরণ ভালো। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেজর ভিকার্স তার প্রভু হোলকারের হয়ে আইরিস অভিযাত্রী জর্জ থমাসের বিরুদ্ধে পুনার যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিল। তার পরবর্তীকালে তাকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন এবং পুনরায় ব্রিটিশ বাহিনীতে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নেন।[xii] অপরদিকে তার সহকর্মী ডড এবং রায়ান সরকারের হয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে। তখন মহারাজ রাগান্বিত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন

যে যদি তারা রাজার পক্ষ পরিত্যাগ করে তাহলে তাদের মুণ্ডুপাত করা হবে। কিন্তু কোন মৃত্যু ভয় তাদের প্রভাবিত করতে পারেনি। ১৮০৩ থেকে ১৮০৫ সালের প্রচারাভিযানের সময় তাদের মধ্যে অন্যতম জেনারেল জোন্স বম্বে সেনাবাহিনী কে কমান্ড করেছিলেন এবং প্রত্যেক ফন্টে বীরত্বের সাথে তার দায়িত্ব পালন করেছিল।[xiii]

কোম্পানির প্রশাসকেরা তৎকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের আবেকে যুক্ত করে তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। তবে অন্যদিকে দেখলে আবার সেনাবাহিনীতে যোগদান অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের কর্মসংস্থানের সুযোগের দিকটিকে উন্মোচিত করেছিল। ইংরেজ বাহিনীর প্রয়োজনে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা যোগদান করলেও জীবিকার জন্য তাদের নিজস্ব তাগিদ ও তাদের উৎসাহিত করে ছিল। পরবর্তীকালে ইংরেজ বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ ১৮০৮ সাল নাগাদ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রেজিমেন্ট থেকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের অব্যাহতি দেওয়ার আদেশ জারি করে।[xiv] যার ফলে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের একটি বড় অংশ কর্মহীন হয়ে পড়ে। তাও বলা যায় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা তার পিতার রক্তের টানে বিভিন্ন সংকটের মুহূর্তে ব্রিটিশ বাহিনীতে যোগদান করেছে এবং তারা বীরত্বের সাথে পরিষেবা প্রদান করেছে। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং আর্থসামাজিক পরিস্থিতির চাপ এই মিশ্র সম্প্রদায়টির দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনার পরিবর্তন ঘটিয়েছে।[xv] সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে ব্রিটিশ প্রশাসন স্থানীয় শাসকদের সেনাবাহিনী কে তাদের জন্য বিপদজনক বলে বিবেচনা করত। ফলস্বরূপ তারা এই সকল বিপজ্জনক যেকোনো কিছুই নিজেদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালাতো। সে ক্ষেত্রে তারা ব্রিটিশ ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বা ইউরেশিয়ান সেনাদের দ্বারা সেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করত। আবার প্রয়োজনে এই সকল স্থানীয় প্রশাসকের দরবারে তাদের পোষিত সেনাবাহিনীতে বাহিনীতে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের নিয়োগ করা হতো এবং তারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সেই সকল দায়িত্ব পালন করতো। যার দ্বারা ব্রিটিশ বাহিনী নিজেদের সুরক্ষার বিষয়টিকে নিশ্চিত করেছিল।[xvi]

আবার দেখা যায় যে ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের সময়ে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল এবং তাদের সমর্থনে রণাঙ্গনেও অবতীর্ণ হয়েছিল। এই বীরত্বের ফলস্বরূপ ইউরেশিয়ান ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন আলাদাভাবে একটি ইউরেশিয়ান রেজিমেন্ট গঠনের দাবি জানিয়েছিল।[xvii] ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের অবদান কে পৃথকভাবে খুঁজতে গেলে যে প্রধান সমস্যাটি অবতীর্ণ হয় তা হল ইউরোপিয়ানদের থেকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান তথা ইউরেশিয়ানদের আলাদা করা। কারণ অনেক ইউরেশিয়ান তাদের মিশ্র জাতির বিষয়টি গোপন করে ইউরোপিয়ান পরিচয়ে সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ করেছিল। এক্ষেত্রে তারা যে তথ্য পরিবেশন করেছে তাতে তাদের পিতা মাতা উভয়কেই ইউরোপিয়ান দেখানো হয়েছে। ফলে ইউরোপীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী এই সকল ব্যক্তিদের সনাক্ত করা বেশ কঠিন হয়ে

পড়ে। তবে সেনাবাহিনীতে কর্মরত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে একটি বিষয় সত্য যে বেশিরভাগ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ইউরেশিয়ানরা ছিল ইউরোপিয়ান সৈন্যদের বংশধর।[xviii] কারণ ইউরোপীয় সৈন্যরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভারতীয় মহিলাদের বিবাহ করত বা তাদের সংস্পর্শে এসেছিল। ফলে এদিক থেকে বলা যায় যে তাদের সন্তানরা বংশগত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার স্বরূপ এই পেশার সাথে যুক্ত হয়েছে। আবার এই উপমহাদেশের জলবায়ু ইউরোপীয়দের কাছে অনুকূল ছিল না, অপরদিকে ইউরেশিয়ানরা এ দেশে বড় হওয়ায় এই জলবায়ু তাদের কাছে ততটা প্রতিকূল ছিল না। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশে ইউরোপীয়দের তুলনায় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা নিজেদের ভালো মানিয়ে নিতে পারত। এর সুফল বিবেচনা করে ব্রিটিশরাও তাদের সেনাবাহিনীতে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের গুরুত্বকে উপলব্ধি করেছিল।

১৯১৪ সালে আগস্টে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়, সেই সময় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ করার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসে। এই সময় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এম্পায়ার লীগের তরফ থেকে প্রস্তাব দেয়া হয় যে, বিদেশে পরিষেবা দেওয়ার জন্য অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের জন্য আলাদা একটি রেজিমেন্ট তৈরি করা হোক।[xix] ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে। এই তিরস্কারের পরেও উদ্দীপনার সহিত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা সক্রিয় পরিষেবা দিতে এগিয়ে এসেছিল এবং ১৯১৬ সাল নাগাদ এই সম্প্রদায় থেকে প্রায় ৮০০০ জন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটে নিজেদের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিচয় কে গোপন করে ইউরোপিয়ান রূপে যোগদান করেছিল। যার ফলস্বরূপ এই বিপুল সংখ্যক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের পরিচয় সম্প্রদায়টি থেকে বিলুপ্ত হয়ে পড়েছিল।[xx] এই মিশ্র সম্প্রদায়টি প্রথম থেকেই খেলাধুলার প্রতি প্রবল আগ্রহ তাদের শারীরিক এবং মানসিকভাবে সেনাবাহিনীর প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল।[xxi] পরিশেষে ১৯১৬ সালের ১৫ মার্চ সেনা কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ বাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বাহিনী গড়ে তোলার অনুমতি দেয়।[xxii] এরপর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট গুলি গড়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে ঝাঁসির ৭৭তম রয়েল ফিল্ড আর্টিলারির সাথে সংযুক্ত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ব্যাটারি ছিল সব থেকে জনপ্রিয়। এই সময় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ব্যাটারি থেকে অন্যান্য ইউনিট গুলি সামনের সারিতে থেকে বিশ্বযুদ্ধে বীরত্বের সহিত লড়াই করেছিল।[xxiii]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ বিভিন্ন সেনাবাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে লড়াই করেছিল। অনেক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান যারা ইউরোপিয়ান পরিচয় নিয়ে যুদ্ধে অংশ নেয় তাদের সকলকে চিহ্নিত করা অসম্ভব হলেও, তাদের থেকে বেশ কিছু জনকে পৃথক করা যায়। এমনই একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান হলেন বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা পার্সিভাল লাভরি, যিনি একজন বন্দুকধারী সৈনিক হিসাবে যুদ্ধে যোগ দেন। এমনই আরেকজন হলেন লিফ রবিনসন যিনি R.A.F. তে

যোগদান করেছিলেন।[xxiv] বিশিষ্ট ব্রিটিশ প্রশাসক লর্ড লয়েড, হাউজ অফ লর্ডসে বক্তিতাতে বলেছিলেন যে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের হয়ে যারা লড়াই করেছে তাদের মধ্যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের রেকর্ড সব থেকে ভালো।[xxv] এই সময় সেনাবাহিনীর পাশাপাশি এই সম্প্রদায়ের লোকেরা রেলওয়ে, পোস্টাল, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বিভিন্ন পরিষেবাতে তাদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।[xxvi] কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে যুদ্ধ পরবর্তীকালে তাদের একটা বড় অংশ বেকারত্বের শিকার হয়। এই বিষয়টি নিয়ে ব্রিটিশ প্রশাসন ও যথেষ্ট উদাসীন ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের তরফ থেকে সেনাতে যোগদানের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ততা দেখা যায়। এই সময় এই সম্প্রদায় থেকে শত শত অফিসার ভারতীয় সেনাবাহিনী, রয়েল ইন্ডিয়ান নেভি এবং রয়েল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে নেতৃত্ব দিয়েছিল।[xxvii] ব্রিটেনে যুদ্ধের সময় প্রায় তিন হাজার থেকে চার হাজার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান রয়েল এয়ার ফোর্সের সাথে কাজ করেছিল। এই সময় তারা তাদের দক্ষতা সাহস এবং নিষ্ঠার সহিত কর্তব্য পালন ও পরিষেবা প্রদান করেছিল। বিশিষ্ট অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যের পুত্র ড্যানিয়েল ফ্লাইট সার্জেন্ট হিসাবে D.F.M. এবং পাইলট অফিসার হিসেবে D.F.C. পুরস্কার অর্জন করেন। মোরাদাবাদের পাইলট অফিসার পার্কার এবং ফ্লিট এয়ার আর্মের লেফটেন্যান্ট কমান্ডার ডগলাস ছিলেন রয়াল এয়ার ফোর্সের অন্যতম বীর যোদ্ধা। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে বীরত্বের জন্য অনেক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানই M.C., D.C.M. এবং M.M. পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।[xxviii] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখা যায় যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা ইউরোপীয় পরিচয়ে ভারতীয় কমিশনের পরিবর্তে রাজার কমিশনে যোগদান কারীর সংখ্যা ছিল বেশি। কারন রাজার কমিশনে বেতনের পরিমাণ ভারতীয় কমিশনের তুলনায় অনেকাংশে বেশি ছিল। ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনির মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে নিয়োগীকৃত ইউরোপীয় এমার্জেন্সি কমিশন অফিসারদের প্রায় নব্বই শতাংশ প্রকৃতপক্ষে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছিল।[xxix]

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের সংযুক্তির বিষয়টি আলোচনার সময় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের অবদানকে কোনভাবেই অবহেলা করা যায় না। কারন তারাও বিভিন্নভাবে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে সহায়তা প্রদান করেছিল। যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় তখন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এম্পায়ার লীগের তরফ থেকে কমান্ডার চিফ এর কাছে আবেদন করা হয় যে যুদ্ধে আহতদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের নিয়ে নার্সদের একটি ইউনিট গঠন করা হোক।[xxx] যদিও ব্রিটিশ সেনাপতি পক্ষ সে সময় বিষয়টিতে অনুমতি দেয়নি, তবুও পরবর্তীকালে তারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সেই দায়িত্ব পালন করেছিল। এই সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মহিলা সহায়ক সেনাদলের একটা বড় অংশ এই সম্প্রদায় থেকে এসেছিল। তাদের অনেকে আবার সিগন্যাল সার্ভিস ও প্রদান করেছে। এই সময় সেনাবাহিনীর নার্সিং

পরিষেবায় যেসব মহিলারা যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ এসেছিল এই সম্প্রদায় থেকে।[xxxi] মহিলা স্বেচ্ছাসেবী পরিষেবার প্রধান সংগঠক লেডিবার্ড বিভিন্ন প্রদেশে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলা কর্মীদের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন।[xxxii]

এখন যদি সেনাবাহিনীতে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ব্যক্তিত্বের দিকে আলোকপাত করা যায় তাহলে দেখা যাবে প্রথমদিকে কোম্পানি সেনাবাহিনীতে নিজেদেরকে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন এমন দুইজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান হলেন জেনারেল স্যার রিচার্ড জোন্স এবং অন্যজন হলেন জেনারেল রবার্ট স্টিভেনশন। রিচার্জ জোন্স যিনি বোম্বে আর্মিতে ১৮০৮ থেকে ১৮০৯ সাল নাগাদ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আর রবার্টস স্টিভেনশন ছিলেন বেঙ্গল আর্মির মেজর জেনারেল, যিনি ১৮৩৩ সাল নাগাদ কানপুর কমান্ডের দায়িত্বে ছিলেন।[xxxiii] উইলিয়াম গার্ডেনার যিনি অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন এবং কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন। জেমস স্কিনার ছিলেন পিতার দিক থেকে স্কটিস্ট এবং মাতার দিক থেকে রাজপুত। যার নাম অনুসারে স্কিনার হর্স নামে একটি সাঁজোয়া রেজিমেন্টের নামকরণ করা হয়েছিল। ১৮০৩ সাল থেকে তিনি গোয়ালিয়রে ব্রিটিশদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করা শুরু করেন। ১৮২৮ সালের পূর্বে তাকে ব্রিটিশ পদমর্যাদা লেফটেন্যান্ট কর্নেল দেওয়া হয়।[xxxiv] অষ্টাদশ শতাব্দীর গড়ার দিকে কাজ করা হার্সিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইংরেজ পিতা ও জাঠ মাতার সন্তান হায়দার জং হার্সি। পরবর্তীতে তিনি পাঁচ হাজার সেনা নিয়ে একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন এবং ১৯০৩ সালে তিনি তার বাহিনীকে ব্রিটিশদের সহায়তার জন্য প্রস্তাব দেন। তার আত্মীয় মেজর জেনারেল জন হার্সি ১৮৫৭ সালে ব্যারাকপুর অফিসার কমান্ডিং এর দায়িত্বে ছিলেন যখন মঙ্গল পান্ডে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কর্নেল হেনরি ফরস্টার যিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ১৮৩৫ সালে কোম্পানির জন্য 'শেখাবতী ব্রিগেড' গড়ে তোলেন। তার পুত্র উইলিয়াম রবার্ট ফরস্টার ও সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন।[xxxv]

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা বিভিন্ন সেনাবাহিনীতে পরিষেবা প্রদান করেছে। তারা ব্রিটিশ শাসনের সূচনা থেকে পিতৃরক্তের টানে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। দেখা গেছে যে দেশীয় প্রদেশের শাসকদের অধীনে কর্মরত হলেও ব্রিটিশদের প্রয়োজনের ডাকে তারা সাড়া দিয়েছে এবং ব্রিটিশ বাহিনীতে যোগদান করেছে। যদিও তাদের বিভিন্ন সময় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিজেদের প্রয়োজন মত ব্যবহার করেছে আবার বাহিনী থেকে বার করে দিয়েছে। তাও এই সম্প্রদায় তাদের আবেগের সাথে ব্রিটিশদের প্রয়োজনে সর্বদা এগিয়ে এসেছে এবং তাদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত পালন করেছে। শুধুমাত্র পুরুষরাই নয় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলারাও নার্স, স্বেচ্ছাসেবক প্রভৃতি বিভিন্নভাবে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর পাশে থেকে পরিষেবা দিয়েছে। তাদের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে এই সক্রিয়

ভূমিকা পালন করার সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই মিশ্র সম্প্রদায় তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা শুধুমাত্র বঞ্চিত হয়েছে তাই নয়, অনেক সময় তাদের প্রাপ্য মর্যাদা টুকুও দেওয়া হয়নি।

তথ্যসূত্র :

[i]S. Muthiah and Harry MacLure, *The Anglo-Indians A500-year History* (New Delhi: Niyogi books, 2017),1.

[ii] Frank Anthony, *Britain's Betrayal in India: The Study of the Anglo-Indian Community* (Bombay: Allied Publishers, 1969),2 .

[iii]*The Eurasian* (2nd May 1908), 45.

[iv] Sarmistha De, *Marginal Europeans in Colonial India: 1860-1920* (Kolkata: Thema, 2008), 46.

[v]তদেব।

[vi] S. Muthiah and Harry MacLure, *The Anglo-Indians A500-year History* (New Delhi: Niyogi books, 2017),116.

[vii] তদেব।

[viii] Valrie E.R. Anderson, "The Eurasian Problem in Nineteenth Century India" (PhD unpublished thesis, The University of London,2011), 208.

[ix] তদেব, ২০৮-৯ ।

[x] তদেব, ২১১-৩৩ ।

[xi] Herbert Alick Stark, Hostages to India or The Life−Story of the Anglo−Indian Race(The Calcutta Fine Art Cottage, 1926), 84-89.

[xii] তদেব।

[xiii] তদেব।

[xiv] Herbert Alick Stark, Hostages to India or The Life−Story of the Anglo−Indian Race(The Calcutta Fine Art Cottage, 1926), 86-87.

[xv] The Eurasian, 19th December 1908, 75-76.

[xvi] Valrie E.R. Anderson, "The Eurasian Problem in Nineteenth Century India" (PhD unpublished thesis, The University of London,2011), 203-4.

[xvii] তদেব, ২২১ ।

[xviii] তদেব ।

[xix] তদেব, ২২৮ ।

[xx] Frank Anthony, *Britain's Betrayal in India: The Study of the Anglo-Indian Community* (Bombay: Allied Publishers, 1969), 122−24 .

[xxi] Megan S. Mills (2001) A most remarkable community: Anglo-Indian contributions to sport in India, Contemporary South Asia, (Routledge, July 2010), 225.

[xxii]Frank Anthony, *Britain's Betrayal in India: The Study of the Anglo-Indian Community* (Bombay: Allied Publishers, 1969),123.

[xxiii] তদেব ।

[xxiv]তদেব ১২৮।

[xxv]তদেব ১২৯ ।

[xxvi]S. Muthiah and Harry MacLure, *The Anglo-Indians A500-year History* (New Delhi: Niyogi books, 2017),31-34.

[xxvii] Frank Anthony, *Britain's Betrayal in India: The Study of the Anglo-Indian Community* (Bombay: Allied Publishers, 1969),130.

[xxviii] তদেব ১৩১-৩২।

[xxix] তদেব ।

[xxx] তদেব ১২২-২৩।

[xxxi] The Statesman, 25th January 1929.

[xxxii] Frank Anthony, *Britain's Betrayal in India: The Study of the Anglo-Indian Community* (Bombay: Allied Publishers, 1969),142.

[xxxiii] Frank Anthony, *Britain's Betrayal in India: The Study of the Anglo-Indian Community* (Bombay: Allied Publishers, 1969),118.

[xxxiv] তদেব ।

[xxxv] তদেব ১১৮-২৪ ।

ডিরোজিওর নব্যবঙ্গ : সীমাবদ্ধ এক নবজাগরণ

পল্লব বৈরাগ্য
স্নাতকোত্তর প্রথমবর্ষ,
ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : আঠারো শতকে ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে বাংলায় যে নবজাগরণ বা "রেনেসাঁস"এর জন্ম হয়, পরবর্তীকালে সেই ভাবধারা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে শুধু বাংলা না, সারা ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিশাল পরিবর্তন সূচিত হয়, যার অধিকাংশ কৃতিত্ব বাংলার ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, ইউরোপীয় আধুনিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত বাঙালী সন্তানদের প্রাপ্য। তবে কেবল দেশীয় মহাত্মারাই নন, নবযুগের ভিত গড়ে তোলার জন্য এর পাশাপাশি বেশ কিছু বৈদেশিক মহাত্মাও সমানভাবে কৃতিত্বের দাবি রাখেন, যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নব্যবঙ্গ ও তাঁদের অবদান বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায় রূপে বরাবর স্বীকৃত। কিন্তু, তাঁদের সৃষ্ট সেই নবজাগরণে কী কী সীমাবদ্ধতা ছিল, এবং তাঁদেরকে নবজাগরণের ঘটনায় কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন পণ্ডিতমহল, সেই বিষয় নিয়েই বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।
সূচক শব্দ : ডিরোজিও, নব্যবঙ্গ, নবজাগরণ, সমাজ, হিন্দুধর্ম, রেনেসাঁস।

মানবসমাজের ইতিহাসে প্রবীণ-নবীনের দ্বন্দ্ব চিরদিন ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব, জাতিবর্ণগত দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, এসব দ্বন্দ্বের যে একদিন অবসান হবে অন্তত তা কল্পনা করতে বাধা নেই। মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হলে এই সমস্ত দ্বন্দ্বের মূল পর্যন্ত সহজে উপড়ে ফেলা যাবে। কিন্তু যতদিন মানুষ থাকবে, সমাজ থাকবে, এবং মানুষ ও সমাজ উভয়েরই অগ্রগতি ইতিহাসের বিধান অনুযায়ী প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না, ততদিন পুরুষানুক্রমে নবীন-প্রবীণের বিরোধও বর্তমান থাকবে। মানুষ ও প্রকৃতির সংগ্রাম এবং নবীন-প্রবীণের সংঘর্ষ – এই দুটি ক্ষেত্র থেকে সমাজের গতিশক্তি সঞ্চারিত হবে চিরদিন। [১]

উনিশ শতকের বাংলায় পাশ্চাত্য আদর্শ সংঘাতের ফলে সমাজে যে জাগরণের চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল, স্বভাবতই তার প্রতিভূ হয়ে উঠেছিলেন নবীন তরুণের দল। এই তরুণদেরই তখন অনেকে বলতেন, "ইয়ং বেঙ্গল", কেউ কেউ বলতেন "ইয়ং ক্যালকাটা"। রামমোহনের যুগের উপান্তে, উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে এই তরুণদের বিকাশ হয়। এনারা সকলে হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং সেখানেই তাঁরা ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে নবযুগের পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন। শিক্ষকদের মধ্যে

যিনি ছাত্রদের এই নবযুগমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন, বহুযুগের কুসংস্কার আর ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে বদ্ধ, জীর্ণ এই সমাজে ঝড় তুলেছিলেন, জন্মসূত্রে বাঙালী না হলেও বাঙালীদের সঙ্গে মনেপ্রাণে জড়িয়ে ছিলেন তিনি। একাধারে শিক্ষক, কবি, সাংবাদিক এই মানুষটি তাঁর উপলব্ধি আর কর্মোদ্যমে বদলাতে চেয়েছিলেন সমাজটাকে। পরিণামে জুটেছিল অপমান, তাচ্ছিল্ল্য আর দারিদ্র্যতা। বয়সে প্রায় ছাত্রদেরই মতো তরুণ, নাম হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রগোষ্ঠীর দীক্ষাগুরু ডিরোজিওর শিষ্য হওয়ায় তাঁদের ‘ডিরোজিয়ান’ও বলা হত। ‘ইয়ং বেঙ্গল’ নামে বাংলার যে তরুণদল ইতিহাসে সুখ্যাত ও কুখ্যাত হয়ে আছেন, তাঁরাই হলেন এই ডিরোজিয়ান, ডিরোজিওর নব্যবঙ্গ।

এমনিতেই লক্ষ্য করলে দেখা যাবে উনিশ শতক সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাসেই নূতন কোনো চিন্তা করার, নূতন কোনো আবিষ্কারের যুগ হিসেবে চিহ্নিত। এই শতকে ইউরোপে যে উদারনৈতিক চিন্তাধারা জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশ হয়, তার ঢেউ এসে বাংলায় লাগে। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কোলকাতা হওয়াতে বাঙালীরাই প্রথম ইংরেজি শিক্ষার সুযোগলাভ করে। ফলে ইউরোপের আধুনিক চিন্তাধারা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রভৃতির সঙ্গে বাঙালীদেরই প্রথম পরিচয় ঘটে। চিন্তাশীল শিক্ষিত বাঙালীরা এই ভাবধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত হন। প্রচলিত মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা রীতিনীতি বাদ দিয়ে, বাঙালীশিক্ষিত সমাজে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। পরিণতিতে জন্ম হয় নতুন মত, নতুন শিক্ষা, নতুন সাহিত্য, নতুন সামাজিক আদর্শ ও রীতিনীতির। সূত্রপাত হয় নবজাগরণের। বাংলার নবজাগরণের স্রষ্টা রাজা রামমোহন রায়, যাঁর আন্দোলনের ধারা বজায় ছিল প্রথমার্ধ জুড়ে। আর পরবর্তীকালে দৃঢ়ভাবে সেটিকে বাঁচিয়ে রাখেন এই নব্যবঙ্গ, যদিও কিছুটা আলাদা পথে। এই তরুণদের প্রায় সকলেই অসাধারণ প্রতিভাবান ছিলেন। চরিত্রগুণেও তখনকার বাঙালী সমাজে তাঁরা ছিলেন অদ্বিতীয়। সততা নিষ্ঠা সৎ সাহস দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণের এমন আশ্চর্য সমন্বয় হয়েছিল তাঁদের চরিত্রে যা সাধারণ চরিত্রে সর্বযুগেই দুর্লভ। হ্যাঁ সকলের লোকখ্যাতি যে সমান ছিল তেমনটা নয়। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা রামগোপাল ঘোষ যে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পেরেছিলেন, হরচন্দ্র ঘোষ বা রামতনু লাহিড়ী বা অন্যেরা তা ততটা করতে পারেননি।[2] কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকচিত্তে এই তরুণদলের সকলের চারিত্রিক প্রতিষ্ঠা আজও সমানভাবে স্বীকৃত।

ইতিহাসের অধ্যায়ে খুললে বাংলার নবজাগরণে ডিরোজিও এবং তাঁর নব্যবঙ্গের অবদানের কথা পাতার পর পাতা লেখা থাকে। হিন্দুসমাজের জাতিভেদপ্রথা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ মনে রাখার মতো। যদিও, হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁদের কিছু উগ্র আচরণকে সমর্থন করা যায় না। তা সত্ত্বেও বাংলার নবজাগরণের অধ্যায়ে তাঁদের একটা বিশাল অবদান ছিল। কিন্তু বিশেষ কিছু সীমাবদ্ধতাও এখানে

লক্ষ্যণীয়। নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর কলমের জোর ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁরা কোনো সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধেই সংগঠিত প্রচার অভিযান গড়ে তুলতে পারেননি। বেশ কিছু কারণে নবজাগরণে তাঁদের অবদান হয়ে উঠেছে বিতর্কিত ও সীমাবদ্ধ।

নব্যবঙ্গের তরুণদলের প্রায় প্রত্যেকেই হিন্দুসমাজের উচ্চশ্রেণিভুক্ত ছিলেন, তাহলেও যেহেতু তাঁদের আদর্শগত সংগ্রামে কোনোরকম পারিবারিক সমর্থনলাভের আশা ছিল না, সেইকারণে তাঁদের অর্থবল ও লোকবল কোনোটাই ছিল না। একমাত্র সম্বল ছিল ওই 'আদর্শ'। ঐতিহাসিক অনিল শীলের বক্তব্য অনুযায়ী তাঁরা ছিলেন জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন। বাস্তবভিত্তিহীন নিরবয়ব আদর্শও চুপিসাড়ে সমাজে প্রবেশ করে যে কতদূর পর্যন্ত তাকে তোলপাড় করতে পারে, ইতিহাসে সেরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বাংলার সমাজকে কিছুটা হলেও তোলপাড় করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁরা, কেবল আদর্শের জোরেই। কিন্তু সেটাও বিশালাকারে ছিল না। নব্য ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের ১৮৬০ সালের "Young Bengal This is for you" নামক পুস্তিকা অনুযায়ী বলতে গেলে তাঁরা বড় বড় কথা বললেও সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারেননি।[৩] শিক্ষার উন্নতির ব্যাপারে নানা তত্ত্বের অবতারণা করলেও, সেগুলির বাস্তব প্রয়োগ করাতে তাঁরা ব্যর্থ হন। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকাশকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন একথা সত্য, কিন্তু সেখানে ইংরেজি ভাষার উপর জোর ছিল বেশি। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে তাঁরা মাথাই ঘামাননি। আর সেকারণেই নবজাগরণ হয়ে পড়ে আরও বেশি সীমাবদ্ধ। ১৮৩১ সালে "Reformer" পত্রিকায় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই প্রকাশ করার গুরুত্বের কথা অবশ্য তাঁরা স্বীকার করেছিলেন। ১৮৩৩ সালের মার্চ মাসে "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকাতেও একই কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ তাঁরা গ্রহণ করেননি। তাঁরা বুঝতেই পারেননি যে ইংরেজি ভাষার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ তাঁদের ক্রমশ জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য থেকে তাঁরা কোম্পানির অবাধ বাণিজ্যনীতি ও ঔপনিবেশিক শাসন ভারতীয় অর্থনীতিকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল, তা বুঝে উঠতে পারেননি। ব্যতিক্রম যে ছিল না তা বলা যায় না। নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর মধ্যে এব্যাপারে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন উদয়চন্দ্র আঢ্য, যিনি বাংলা ভাষার উন্নতির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ১৮৩৮ সালে তিনি লিখেছিলেন – যে মুহূর্তে এদেশের মানুষ নিজের ভাষা ঠিকমতো শিখতে পারবে, সে মুহূর্তে তাঁরা দাসত্বের শৃঙ্খলমোচন করে নিজেদের দেশের শাসক হবার দক্ষতা অর্জন করবে। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার জাগরণের শরিক অন্যান্য সমসাময়িক বুদ্ধিজীবিরা উদয়চন্দ্র আঢ্যের যুক্তিবাদী বক্তব্যের সুগভীরে তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেননি। ফলত, এটা তাঁদের নবজাগরণকে আরও সীমাবদ্ধ করে দেয়।

১৮৪০এর দশক থেকে নব্যবঙ্গদের মধ্যে প্রচুর পরিবর্তনও ঘটে যায়। নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর তরুণ সদস্যরা সরকারি কাজকর্মের সাথে যুক্ত হয়ে কোম্পানির রাজের প্রতি পূর্ণমাত্রায় অনুগত হয়ে পড়ার সঙ্গেই তাঁদের প্রকৃতিগত পরিবর্তন সম্পূর্ণ হয়েছিল। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আগুন বাংলাদেশে প্রজ্বলিত না হতে দেবার জন্য ইংরেজ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন। সরকারকে নানাভাবে সাহায্য করার পুরস্কার হিসেবে তিনি অযোধ্যার শংকরপুরের তালুকদারি পেয়েছিলেন এবং ১৮৭১ সালে 'রাজা' উপাধিলাভ করেছিলেন।[৪] প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৩৬ সাল থেকেই ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত হন এবং এই গ্রন্থাগারের সম্পাদক ও কিউরেটর হিসেবে কাজ করেন।[৫] রাধানাথ শিকদার জরিপ দপ্তরে কাজ নেন এবং হিমালয়ের উচ্চতা মেপে বিখ্যাত হন।[৬] রামতনু লাহিড়ী একজন স্কুল শিক্ষক হন। রামগোপাল ঘোষ ব্যবসা করতেন। মাধবচন্দ্র, শিবচন্দ্র দেব, গোবিন্দ বসাক ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ফলত স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা ব্রিটিশদের প্রতি আরও অনুগত হয়ে যান। ১৮৪৩ সালের এপ্রিল মাসে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি'র উদ্বোধনী ভাষণে রামগোপাল ঘোষ ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন চিরজীবী হোক, এমনটাই তিনি আন্তরিকভাবে কামনা করেছিলেন। ভারতবর্ষের সাথে ব্রিটিশ জনগণ তথা ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্কে ছিন্ন হোক, এমন কোনো কাজ তিনি সমর্থন করবেন না বলে জানিয়েছিলেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক অবশ্য পুলিশের দুর্নীতি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে কৃষকের দুরবস্থা, কোম্পানি সরকারের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন।[৭] কিন্তু কোম্পানি সরকারের অধীনে তিনি ১৮৩৭ সালে ডেপুটি কালেক্টরের চাকরি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন এবং জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্কে ছিন্ন করেছিলেন।[৮] ১৮৪৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারির বেঙ্গল হরকরা পত্রিকা থেকে জানা যায় যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কোম্পানির শাসনব্যবস্থার সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও এই শাসনকে মুসলমান শাসনের থেকে উৎকৃষ্ট বলে মনে করতেন। মহেশচন্দ্র দেব “Sketch of the Condition of Hindoo women” নামে লেখায় হিন্দুশাস্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করা সত্ত্বেও মন্তব্য করেন, মুসলমান সম্রাটদের স্বেচ্ছাচারিতার পরিপ্রেক্ষিতেই হিন্দু রমণী তাঁদের বিভিন্ন অধিকার হারিয়েছিলেন।[৯] প্যারীচাঁদ মিত্র নীলচাষিদের খাজনা ফাঁকি দেবার প্রবণতাকে এবং জমিদারি-বিরোধী কৃষক প্রতিরোধ সংগ্রামকে নিন্দা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে বাংলার জমিদারেরা যথেষ্ট কৃষকদরদি হয়ে উঠেছেন। এইসকল ব্যাপারগুলি সাধারণ মানুষ এবং ব্রিটিশদের সমালোচনাকারী একদল বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেয়, যার ফলে তাঁদের বক্তব্যগুলি আরও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের মতে, তাঁদের মূল দুর্বলতা ছিল এই যে তাঁরা নিজেদের পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের প্রভাবে অত্যাধুনিক বুর্জোয়া উদারনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একটা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোয় তা যে সম্ভব নয় এই

সত্য তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি। একদিকে তাঁরা বুর্জোয়া উদারপন্থার সমর্থক ছিলেন অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের স্বার্থরক্ষাকারী অবাধ রাজনীতিকে তাঁরা প্রশংসা করেছিলেন। ডিরোজিওর অনুগামী নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর সবথেকে বড় ব্যর্থতা ছিল এখানেই। [১০]

ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষ তাঁর "বিদ্রোহী ডিরোজিও" গ্রন্থে অবশ্য অন্য ধরনের একটি মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, তাঁরা অনেক ভুল করেছিলেন, সামান্য ভুল নয়, বাছা বাছা সেরা ভুল। এক একটি ভুল 'ওজনে' অনেক ভারী। তরুণের ধর্ম হল ভুল করা, ইতিহাসের ধর্ম হল তরুণদের সেই ভুল স্বাভাবিক বলে স্বীকার করা। ভুলের ভগ্নস্তূপের উপর নির্ভুলের ইমারত গড়ে তোলা যায়, বিশেষ করে মানবসমাজের ইতিহাসে অন্যের ভুলের ভিতর থেকে দুচারটে শুদ্ধ সত্য আত্মপ্রকাশ করে। ইয়ং বেঙ্গলের ভুলের ভিতর থেকেই এইরকম কয়েকটি শুদ্ধ সত্য পরবর্তীকালে বাংলার সমাজজীবনে আত্মপ্রকাশ করে। 'ভুল' আর 'মিথ্যা' এক নয়। তরুণদল ভুল করেছিলেন, কিন্তু জীবনে কখনও একদিনের জন্যও মিথ্যার আশ্রয় নেননি, মিথ্যা আচরণ করেননি। সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য যেসমস্ত চলার পথ তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন, তার মধ্যে কোনপথ যে চোরাগলি তা তাঁরা প্রথমে বুঝতে পারেননি। পরে ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই ভুল পথটা ইতিহাসের কাছে ক্ষমার্হ। তাই ভুলের পরাজয়ের কোনো গ্লানি তাঁদের স্পর্শ করতে পারেনি। যেসব সত্য সমাজে ও জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন, সেইসব সত্য সমাজে ও জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন, সেইসব সত্যের জয় ঘোষিত হবে।[১১] প্রবীণ নবীনের বিরোধ আদিকাল থেকে চলে আসছে মানবসমাজে। যুগ থেকে যুগান্তরে যাত্রার সন্ধিক্ষণে এই বিরোধ তীব্র জটিল রূপ ধারণ করেছে বারংবার। সুস্থির সমাজ সচকিত হয়ে উঠেছে সেই সংঘাতে, নবচৈতন্যের কম্পন লেগেছে তার দেহমনে। এইরকম হৃদকম্পের সঞ্চার করেছিলেন ডিরোজীয়ানরা বাংলার সমাজে। লোকচৈতন্যের মূল পর্যন্ত তাঁরা সজোরে নাড়া দিয়েছিলেন নির্ভয়ে। কিন্তু বহুকালের ঘুমপাড়ানিতে এদেশের মগ্নচৈতন্য মানুষ সেই ঝাঁকুনির ফলে কতখানি চৈতন্যলাভ করেছে তা ঠিক বলা যায় না। তবে সমাজতরীর ভরাডুবির আশঙ্কায় স্থিতস্বার্থ প্রাজ্ঞ ও প্রবীণেরা সেদিন যে ত্রাস ও শোরগোলের সৃষ্টি করেছিলেন তা সত্যিই অভাবনীয়। তাঁদের কলরব শুনে মনে হয়েছিল, সমাজে এমন একদল হঠকারী কালাপাহাড়ের আবির্ভাব হয়েছে, যাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন নৈতিক উৎপাতে দেশের ঐতিহ্যবন্ধন একেবারে ছিন্ন হয়ে যাবে এবং নীতিবোধ, ধর্মবোধ, আস্থাভক্তি ইত্যাদির অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকবে না। কিন্তু নবযুগের কালাপাহাড়ের দল প্রবীণদের এই ভয়াবহ ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে সত্যাসত্য নির্ণয়ের সংগ্রামে দৃঢ়পদে অগ্রসর হয়েছিলেন। [১২] শতবর্ষ আগে বাংলার সমাজে কেন, কোনো সমাজেই সামগ্রিক সচলতা ছিল না। স্থিতিগতির বৈপরীত্য তখন ছিল সাদাকালোর মতো সুতীব্র ও সুস্পষ্ট। কুম্ভকর্ণের অচৈতন্য নিদ্রায় অভিভূত ছিল সমাজ। সামান্য মৃদু

আঘাতে তার অসাড় দেহে চৈতন্যোদয় হত না। ক্রমাগত আঘাতের পর আরও জোরে আঘাত করে ডিরোজিয়ানরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন বাংলার সমাজকে সটান ও স্বনির্ভর করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্রবীণ-নবীনদের দ্বন্দ্বও বেশ তীব্র হয়েছিল সেদিন। একদিকে সংরক্ষণের সংশয়-ভয়জড়িত আর্তনাদ, অন্যদিকে ভাঙনের নিঃশঙ্ক কোলাহল, এই দুইয়ের এক বিচিত্র ঐক্যতান রচিত হয়েছিল ইয়ং বেঙ্গলের যুগে। ডিরোজিও ছিলেন এই ঐক্যতানের প্রধান উদ্গাতা। [১৩]

সেদিক দিয়ে বিচার করলে বাংলার নবজাগরণে ডিরোজিওর নব্যবঙ্গের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁদের গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো সীমাবদ্ধতা না থাকলে বিষয়টা কিরকম হত, সেটা নিয়ে ভাবা তো ইতিহাসের কাজ না। ইতিহাসের লক্ষ্যই হল অতীতকে খোঁজা, সঠিকভাবে খুঁজে সেখান থেকে বর্তমানে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যৎ উন্নত করে তোলা। সেক্ষেত্রে নব্যবঙ্গ যথেষ্ট সাহসিকতারই পরিচয় দেয় এবং পরবর্তীকালীন মনীষীদের উদ্বুদ্ধ করে।

তথ্যসূত্র :

- ঘোষ, বিনয়; *বিদ্রোহী ডিরোজিও*, অয়ন, কলকাতা ৭০০০০৯, সেপ্টেম্বর ১৯৫৭, পৃষ্ঠা ১৭
- তদেব পৃষ্ঠা ১৮
- “Keshub Chandra Sen (1838-1884), the Brahmo Samaj, www.thebrahmosamaj.net , last checked 31st December, 2023
- ঘোষ, শ্রীমন্মথনাথ, *রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়*, কলকাতা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১২৩-১২৬
- Islam, Sirajul, “Mitra, Peary Chand,” In Islam, Sirajul, Jamal, Ahmed A. (eds). Bnaglapedia, National Encyclopedia of Bangladesh (second ed.) Asiatic Society of Bangladesh.
- Choudhury, Anjana, Kelkar, R.R.; “Radhanath Sikdar: Through the Haze of Time and Neglect”, Wordpress
- Sengupta, Nitish, *History of the Bengali-Speaking People*, UBS Publishers Distributors Pvt. Ltd., ISBN 978-8174766090, 1st January, 2008, page 229
- গুহ রায়, সিদ্ধার্থ, চট্টোপাধ্যায়, সুরঞ্জন, *আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৭০৭-১৯৬৪*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ISBN 81-8064-11-2, এপ্রিল ২০২১, পৃষ্ঠা ৩৬৩

- তদেব পৃষ্ঠা ৩৬২
- Sarkar, Sumit, A Critique of Colonial India, Papyrus 2 Ganendra Mitra Lane, Calcutta, 700004, 7th July, 1985, page 19
- ঘোষ, বিনয়; *বিদ্রোহী ডিরোজিও*.......... পৃষ্ঠা ১৯
- তদেব পৃষ্ঠা ২০
- তদেব পৃষ্ঠা ২০-২১

সুভা : মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল...

আকাশ বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজ, হুগলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্প তথা সামগ্রিক জীবনদর্শনে প্রকৃতি চিরকালই এক অচ্ছেদ্য অনুসঙ্গ। অন্তত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি পড়লেই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রেরণার ধারাবাহিকতার সূত্রটি বুঝতে পারা যায় খুব সহজে। রুঁশো-র প্রকৃতিবাদী-ভাববাদী দর্শন, সাঁৎ-পিয়্যার-এর 'পল এ ভিরজিনি' উপন্যাসের কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যকৃত অনুবাদ 'পৌল-বর্জিনি' অথবা ইংরেজি নব্য-রোমান্টিক কাব্যধারার ওয়ার্ডসওয়ার্থ-শেলির প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর আশৈশব ! তদুপরি দেশীয় বিহারীলাল, প্রাচীন কালিদাসেরও তিনি চিরকালীন মুগ্ধ পাঠক। তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ি লাগোয়া পুষ্করিণী এবং পার্শ্বস্থ বৃদ্ধ বট আবার দূরের শান্তিনিকেতনের গ্রাম ছাড়া রাঙা মাটির পথ, কোপাই, শালবীথি বা আরও দূরের ডালহৌসি পাহাড় অথবা পরবর্তী জীবনে পদ্মার বুকে দীর্ঘ নৌকাবাস ; শিলাইদহ-সাজাদপুর-পাতিসর, চরধানক্ষেত-বন ঝাউ-উদার আকাশ আর অবিরল স্রোতধারা --- ঘরে-বাইরে প্রকৃতির সঙ্গে নাড়ির বন্ধনে আজীবন জড়িয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃতিই যেন হয়ে উঠেছিল তাঁর দ্বিতীয় সত্তা ! জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই যেন এক আন্তরিক উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন তিনি ! যেন বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন যে, 'প্রকৃতির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই মৃত্যু। সরল আনন্দের স্বর্গ থেকে একবার ভ্রষ্ট হলে আর ফিরে আসবার পথ নেই। যেমন ফিরে আসতে পারেনি আদম আর ইভ'[১] ! অথবা এই একই কারণে হয়তো-বা কাহিনিতে হারিয়ে গেছে তাঁর নিজের হাতে তৈরি অনন্য কিছু চরিত্রও ফটিক,অমল কিম্বা সুভা !

চণ্ডীপুর গ্রামের জনৈক বাণীকণ্ঠের কনিষ্ঠা কন্যার নাম ছিল সুভাষিণী। সংক্ষেপে সুভা। আর তার এই ডাকনামের সৌজন্যেই (রবীন্দ্রনাথ খুব বেশি ক্ষেত্রে না করলেও) এক্ষেত্রে চরিত্রনির্ভর নামকরণের সূত্রমোতাবেক গল্পটির নাম রেখেছিলেন 'সুভা'।

গল্পটা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'সাধনা' পত্রিকার পৌষ ১২৯৯-সংখ্যায়।

এক ভয়ঙ্কর আয়রনির অবতারণার মধ্যে দিয়ে গল্পটি শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : 'মেয়েটির নাম যখন সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবে। তাহার দুটি বড়ো বোনকে সুকেশিনী ও সুহাসিনী নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাই মিলের অনুরোধে তাহার বাপ ছোটো মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে।'[২]

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে 'সুভাষিণী' আজন্ম মূক হলেও 'প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর-- সমস্ত মিশিয়া চারি দিকের

চলাফেরা–আন্দোলন–কম্পনের সহিত এক হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায় বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়– উপকুলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে।’[৩]

আসলে জমিদারি সামলাতে গিয়ে পূর্ববঙ্গের পদ্মাবক্ষে বোটে বসে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির স্বাভাবিক উদারতার মধ্যে জীবনের বৈচিত্রকে যেমন দেখেছিলেন, তেমনি প্রত্যক্ষ সামাজিক সমস্যার অভিঘাতে বারবার কেঁপে উঠেছিল তাঁর ঔপনিষদিক আনন্দবোধের চিরায়ত বিশ্বাস। আর এই জোড়া অভিঘাতেই তাঁর গল্পে আমৃত্যু তাদের জীবনের অচ্ছেদ্য ট্রাজেডিকে অসহায় মেনে নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল সুভার মতো চরিত্ররা । বাণীকণ্ঠর বোবা মেয়েটিকে তার মা দেখেছিল নিজের ত্রুটিস্বরূপ বলে। গল্পে সেদিনের বাংলাদেশের পল্লীগ্রামস্থ এক অশিক্ষিতা রমণীর এই মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : ‘কেননা, মাতা পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে নিজের অংশরূপে দেখেন --- কন্যার কোনো অসম্পূর্ণতা দেখিলে সেটা যেন বিশেষরূপে নিজের লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করেন।’[৪] গল্পকার তদুপরি আরও জানিয়েছিলেন, এদিক দিয়ে ‘বরঞ্চ, কন্যার পিতা বাণীকণ্ঠ সুভাকে তাঁহার অন্য মেয়েদের অপেক্ষা যেন একটু বেশি ভালোবাসিতেন ; কিন্তু মাতা তাহাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি বড়ো বিরক্ত ছিলেন।’[৫] কিন্তু সে যাই-হোক-না-কেন এই সব কিছুর মধ্যেই (কন্যা নামক ‘দায়’ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার আতঙ্কে পীড়িত বাপ-মা-র মতোই) কথা বলতে না পারা মানুষ সুভাও যে অনুভব করতে পারে আর বাকি পাঁচজনের মতোই , এটা ভেবে দেখার ফুরসৎ যেন স্বাভাবিকভাবেই পায়নি কেউ। শারীরিক প্রতিবন্ধকতায় বোবা সুভা যেমন তার জন্মদাতাদের কাছে বোঝা, তেমনই গোটা সংসারটার কাছেও কী নিদারুণ উপেক্ষার পাত্র, তা গল্পের শুরুতেই সুতীব্র বেদনার অভিঘাতে এঁকে দেন রবীন্দ্রনাথ। সুভাও সাধারণের দৃষ্টিপথ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখে আপ্রাণ। তার সমগ্র ইহকালের যেন একমাত্র আশ্রয় হয়ে ওঠে বিরাট ধরিত্রীর একটি নিবিড় – নিভৃত কোন্‌মাত্র। ‘... মধ্যাহ্নে যখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইত, পাখিরা ডাকিত না, খেয়া-নৌকা বন্ধ থাকিত, সজন জগৎ সমস্ত কাজকর্মের মাঝখানে থামিয়া গিয়া ভয়ানক বিজনমূর্তি ধারণ করিত, তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত --- একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে, আর-একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।’[৬]

আর বলতে গেলে এছাড়া কেবল গৃহপালিত দু’টি অবলা গাভী ছিল তার কর্মহীন অবসরের সঙ্গী। সর্বশী ও পাঙ্গুলি-নামের এই দুটি মনুষ্যেতর প্রাণীই যেন কেবল বালিকা সুভার ‘সহিষ্ণুতাপরিপূর্ণ বিষাদশান্ত দৃষ্টিপাত’[৭] থেকে টের পেত তার যাবতীয় অব্যক্ত বেদনার! সুভার গা ঘেসে অল্পে-অল্পে তার বাহুতে শিং ঘষে নির্বাক ব্যাকুলতার সঙ্গে তারাই যেন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করত সুভাকে ! আর এরা ছাড়া সুভার আপনজন বলতে ছিল একটি ছাগল ও একটি বিড়াল শাবক।

আর এইভাবেই প্রকৃতি আর পশু মিলে গড়ে উঠেছিল 'নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন'[৮] সুভার নিজস্ব জগৎ-সংসার।

'সুভা'-গল্পটি পড়লে বোঝা যায় এ আখ্যান একান্তভাবেই একজন কবির লেখা গদ্য। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এই গল্পটি সম্পর্কে বলেছেন, 'এই বর্ণনায় যে সহৃদয়তা, যে করুণা, যে সুগভীর স্নেহের পরিচয় পাই, তা পিতৃহৃদয়ের। সংসারের সমস্ত বঞ্চনার ক্ষতিপূরণ হিসেবে লেখক তাঁর পিতৃহৃদয়ের সকল স্নেহ এই বোবা মেয়েটির উপর উজাড় করে দিয়েছেন।'[৯]

সুভার কেউ নেই। তাই বোধহয় প্রকৃতি আছে ! গল্পে সুভার একমাত্র মনুষ্যসঙ্গী বলতে গোঁসাইদের ছোটো ছেলে অকর্মণ্য প্রতাপ। কিন্তু সত্তার সমগ্রতায়, সঙ্গীবিহীন জীবনের নৈঃশব্দ্যে অন্তত একটা সময় পর্যন্ত সুভার একমাত্র সখ্যতা যেন সর্বাংশে প্রকৃতির সঙ্গেই ! প্রকৃতির ধ্বনিতরঙ্গেই যেন শব্দহীন সুভার হৃদয়ের প্রকাশ ! প্রকৃতির সাহচর্যেই তার একাকিত্বের প্রশান্তি।

কপালকুণ্ডলার মতো সে অরণ্যচারিণী না হলেও সুভা, মৃন্ময়ীর ('সমাপ্তি' গল্প) মতোই একান্তভাবে মৃত্তিকামানবী। মৃন্ময়ীর মতোই সুভাও বহুলাংশে তাদের গ্রামের পাশ দিয়ে এঁকেবেকে চলা ছোট্ট নদীটি আর তার তীরকেই নিজস্ব জগৎ বলে মনে করে। কাজকর্মের ফাঁকে সেখানটাতে বসেই তার যেন একমাত্র শান্তি !

এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ মূক প্রকৃতিমাতার মূক কন্যার বর্ণনার বেলাতেও উপমা গ্রহণ করেছেন প্রকৃতি থেকেই ; ' মুখের ভাব বৈ আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর --- অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি।' [১০]

আবার প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মেই এই সুভাই যেদিন নিজের দেহে অনুভব করেছে প্রথম যৌবনের পুলক,সেদিনের বর্ণনাতেও রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির রূপকল্পেই তা এঁকেছেন অনন্য করে। 'যেন কোনো-একটা পূর্ণিমাতিথিতে কোনো-একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত আসিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে এক নূতন অনির্বচনীয় চেতনাশক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে,প্রশ্ন করিতেছে, এবং বুঝিতে পারিতেছে না।' [১১]

যৌবন আগমনের একাকিত্বে ও অজানা রহস্যের অনুন্মোচিত নিশিডাকে সেদিন অবোলা সুভা পূর্ণিমা রাত্রে শয়নগৃহের দ্বার খুলে চন্দ্রালোক বিধৌত প্রকৃতির মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। যৌবনের রহস্যে, পুলকে, বিষাদের মধ্যে সে নিজেকে খুঁজেছিল। আর গল্পে এর সঙ্গে-সঙ্গেই শুরু হয়েছিল সমাজের নির্দেশে প্রকৃতির কোল থেকে সরিয়ে এনে এই প্রকৃতিকন্যাকে স্বামী নামক জনৈক ব্যক্তির করতলে সম্প্রদানের তোড়জোড়। জীবনে অদ্যাবধি অতিবাহিত এতগুলি দিনে তবু সুভার সর্বশী ও পাঙ্গুলি ছিল, বিড়াল শিশুটি ছিল, এমনকি আরও ছিল বলতে গোঁসাইদের অকর্মণ্য ছোট ছেলে প্রতাপ পর্যন্ত!

সুভার তেঁতুলতলায় বসে থাকার সময় যে প্রায়ই অনতিদূরে ছিপ ফেলে চেয়ে থাকত জলের দিকে।

রবীন্দ্রনাথ এই ক্ষুদ্র আখ্যানটিতে সেই অর্থে গল্পের সঙ্গে লেন-দেন না থাকা প্রতাপকে নিয়ে কিন্তু খুব কম লেখেননি ! এই অকর্মণ্য ছেলেটি সম্পর্কে বলেছেন : ‘প্রতাপের প্রধান শখ --- ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা। ইহাতে অনেকটা সময় সহজে কাটানো যায়। অপরাহ্নে নদীতীরে ইহাকে প্রায় এই কাজে নিযুক্ত দেখা যাইত। এবং এই উপলক্ষে সুভার সহিত তাহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত। যে-কোনো কাজেই নিযুক্ত থাক, একটা সঙ্গী পাইলে প্রতাপ থাকে ভালো। মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ --- এইজন্য প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝিত। এইজন্য সকলেই সুভাকে সুভা বলিত, প্রতাপ আর-একটু অতিরিক্ত আদর সংযোগ করিয়া সুভাকে ‘সু’ বলিয়া ডাকিত।’[১২]

প্রতাপের জন্য একটি করে পান নিজে হাতে সেজে এনে দিত সুভা আবার এই সঙ্গীটিকে আশ্চর্য করে দেবার জন্যই হয়তো-বা বিধাতার কাছে অলৌকিক প্রার্থনাও জানাত অনেক! যদি কোনোভাবে প্রতাপের কোনো একটা কাজে লাগতে পারত সে,যদি জাদুমন্ত্রবলেও এমন একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাতে পারত; যা দেখে প্রতাপ অবাক হয়ে বলতে বাধ্য হত ‘তাই তো, আমাদের সুভির যে এত ক্ষমতা তাহা তো জানিতাম না।’[১৩]

এই ছেলেটির ,এই দ্বিপ্রহর অতিবাহনের সঙ্গীটির জন্যই নিজের অজান্তেই যেন একদিন সুভা শুনতে শুরু করেছিল অতল জলের আহ্বান ! আহা বাণীকণ্ঠর বাণীহীন কন্যা না হয়ে সুভা কী হতে পারত না আস্ত একটি জলকুমারী! অন্তহীন জলের তলায় পাতাল প্রাসাদে রূপার অট্টালিকায় সোনার পালঙ্কে যে রাজকুমারীকে অকস্মাৎ একদিন আবিষ্কার করে বাকরুদ্ধ হয়ে যেত স্বয়ং প্রতাপ !

রবীন্দ্রনাথ গল্পে লিখেছেন, মুহূর্তে স্বপ্নালু তন্দ্রাকে ছিন্নভিন্ন করে বাস্তবের মাটিতে আছড়ে ফেলতে চেয়েই লিখেছেন; এমনটা ‘ তাহা কি হইতে পারিত না। তাহা কি এতই অসম্ভব। আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও সু প্রজাশূন্য পাতালের রাজবংশে না জন্মিয়া বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এবং গোঁসাইদের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য করিতে পারিতেছে না।’ [১৪]

এদিকে আঙ্কিক নিয়মেই বয়স বেড়ে যাচ্ছিল সুভার। কন্যাদায়গ্রস্ত বাবা-মার চিন্তাও স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠছিল উত্তরোত্তর। এবং যথারীতি লোকনিন্দাও শুরু হয়ে গেছিল গ্রামসমাজে। ‘এমন-কি, এক-ঘরে করিবে এমন জনরবও শুনা যায়। বাণীকণ্ঠের সচ্ছল অবস্থা, দুই বেলাই মাছভাত খায়, এজন্য তাহার শত্রু ছিল।

স্ত্রীপুরুষে বিস্তর পরামর্শ হইল। কিছুদিনের মতো বাণী বিদেশে গেল।’ [১৫]

তারপর ফিরেও এলেন একদিন। এবং অনতিবিলম্বেই বিদেশযাত্রার উদ্‌যোগ শুরু হয়ে গেল বাণীকণ্ঠের পরিবারে। নতুন একটা কিছু যে ঘটতে চলেছে সেটা বুঝতে বাকি থাকল না শুভারও! কুয়াশা-ঢাকা প্রভাতের মতো অশ্রুবাষ্পে ভরা একটা হৃদয়

নিয়ে কী জানি কী 'একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কা-বশে সে কিছুদিন হইতে ক্রমাগত নির্বাক্ জন্তুর মতো তাহার বাপ-মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত--- ডাগর চক্ষু মেলিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কী-একটা বুঝিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাঁহারা কিছু বুঝাইয়া বলিতেন না।' [১৬]

আর দ্রুত ধাবমান এইরকমই একটি দিনের অপরাহ্ণে যখন ছিপ ফেলে মাছ ধরায় মশগুল গোঁসাইদের বাড়ির সেই অকর্মণ্য ছেলেটি আর সুভাও অভ্যাসবশত গিয়ে বসেছে তার পাশে, 'প্রতাপ হাসিয়া কহিল, " কী রে সু, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস? দেখিস আমাদের ভুলিস নে।" '[১৭] স্বাভাবিকভাবেই কারোরই আর জানতে বাকি থাকল না যে, বাণীকণ্ঠ তার অবশিষ্ট কন্যাটির জন্য কলকাতায় সম্বন্ধ স্থির করে তবে ফিরেছেন দেশে।

গল্পকার জানাচ্ছেন, হাল্কা চালে এই কথা বলেই সে যাত্রায় মাছ ধরার কাজেই পুনরায় মনোনিবেশ করেছিল প্রতাপ। আর সুভা? ' মর্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নীরবে বলিতে থাকে 'আমি তোমার কাছে কী দোষ করিয়াছিলাম', সুভা তেমনি করিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল' [১৮]; এরপর আর গাছের তলায় বসে থাকতে পারল না সে। বাণীকণ্ঠ দিবানিদ্রান্তে শয়নগৃহে বসে তামাকু সেবন করছিলেন তখন। সুভা সেদিন তার পায়ের কাছে বসে মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদেছিল কেবল আর বাক্যহারা মেয়েটাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বাণীকণ্ঠের শুষ্ক কপোলে গড়িয়ে পড়েছিল সমবেদনার অশ্রুজল। নিজের গ্রাম থেকে চিরবিদায়ের আগের দিনটিতে গোয়ালঘরে গিয়ে তার 'বাল্য-সখীদের'[১৯] অর্থাৎ সর্বসী ও পাঙ্গুলি নামধেয় গাভীদুটির গলা জড়িয়ে ধরে আকুল নয়নে কেবল কেঁদেছিল সুভা আর সেই দিনের শুক্লা দ্বাদশীর রাতে সেই নির্বাক মানবী লুটিয়ে পড়েছিল ' চিরপরিচিত নদীতটে শষ্পশয্যায়' [২০] ! যেন ধরণীকে, এই প্রকাণ্ড মূক মানবমাতাকে দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরে সে শুধু বলতে চেয়েছিল, 'তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না, মা। আমার মতো দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখো।'[২১]

কিন্তু না প্রকৃতি না প্রতাপ কেউই যেহেতু ধরে রাখল না সুভাকে তাই অবশেষে একরকম ছলনার মাধ্যমেই শুভার বিবাহের ব্যবস্থা হল দূর শহর কলকাতায় নিয়ে গিয়ে। যেখানে কেউ জানতেই পারল না সুভা আসলে বাকরুদ্ধ জন্মাবধি। যথারীতি এই অনিবার্যতাকেও 'নীরবে' মেনে নিতে বাধ্য সুভাকে যখন দেখতে এসেছিল বরপক্ষ ; সুভা কেঁদেছিল অঝোরে আর তাতে করে নাকি হবু বরবাবাজীর কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে গিয়েছিল আরও বেশি করে। কেননা কনে দেখতে আসা পাত্রটি 'হিসাব করিয়া দেখিলেন, 'যে হৃদয় আজ বাপ-মায়ের বিচ্ছেদসম্ভাবনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে সেই হৃদয় আজ বাদে কাল আমারই ব্যবহারে লাগিতে পারিবে।'[২২]

স্বাভাবিকভাবেই অত:পর বিবাহ শুসম্পন্ন হল সুভার এবং সপ্তা'খানেকের মধ্যেই শ্বশুরবাড়ির সবাই বুঝতে পারল নববধূটি বোবা। এরপর অত্যন্ত সচেতনভাবে

রীতিমতো চক্ষু-কর্ণ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে তবেই একটি কথা বলা কন্যার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দারগ্রহণের রীতি সম্পন্ন করে তাকে ঘরে আনলেন সুভার স্বামী।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের '...ছোটগল্পে উপস্থাপিত বাইরের পরিবেশ অনেক সময়েই আত্মগত দৃষ্টির আলোয় উদ্ভাসিত।' [২৩]

বুদ্ধদেব বসু-র কথায় এর সঙ্গে যুক্ত হয় "'গল্পগুচ্ছে'র অধিকাংশ উপমার শুধু বাহ্য বস্তুর প্রতিকৃতি নয়, মানসিক অবস্থার প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে, অর্থাৎ ঘটনার তাৎপর্য বিষয়ে লেখক আমাদের এই উপায়েই সচেতন ক'রে তোলেন।"[২৪]

যেমন এই 'সুভা' গল্পে প্রকৃতিকে তিনি করে তোলেন অসহায় মানবসত্তার নিরন্তর আশ্রয়। প্রকৃতি ও মানুষের এখানে এক স্বতঃস্ফূর্ত সখ্যতা। নিবিড় সাহচর্য। তারা যেন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গীবিহীন অবকাশের সাথী। প্রকৃতি ও মানবীর এ এক অদ্ভুত নৈকট্য ; যেখানে পৌঁছে প্রকৃতিকে ছেড়ে যেতে শুধু কষ্টই হয় না ছেড়ে যাওয়ার মধ্যেই নিহিত থাকে চরমতম ট্রাজেডি।

'ছুটি' গল্পের ফটিক অথবা 'ডাকঘর'-এর অমল তবুও চিরমুক্তিতে শান্তি পেয়েছে, চিরতরে ছুটি পেয়েছে । কিন্তু কায়িক মৃত্যুর আকস্মিকতার অভাবে এই গল্পের অপাপবিদ্ধ, অসহায়, ভাগ্যবিড়ম্বিত মেয়েটিকে যেন সারাজীবন ধরে সহ্য করে যেতে হবে নিদারুণ ট্রাজেডি !

বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সুভার যে স্থানটি ছিল, সেখানে সবকিছুর মতোই সেও ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু সেখান থেকে উৎপাটিত হয়ে যখনই তাকে মানুষের সংকীর্ণ সংসারে এসে পড়তে হয়েছে --- তখনই সে মূক বলে অবহেলিত, প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ভবিতব্যের মতো অনিবার্য হয়ে উঠেছে অনন্ত নরক যন্ত্রণা। অসহায় এক মানবীর এই করুণ ট্রাজেডিই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন তাঁর গল্পে। এখানে স্বামী উপেক্ষিতা সুভা যেন অনেকটা প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলার মতো। কিন্তু কালিদাসের নাটকের কাহিনি গড়িয়ে যেতে পারে যতদূর ; নিতান্তই সহজ , সরল একটি ছোটগল্প তো আর পারে না তত পথ পেরোতে। তাই প্রত্যহ ভেসে যাওয়া দু'চারটি অশ্রুজলে গাঁথা রবি ঠাকুরের লেখা এই ছোটগল্পটি এমন জায়গায় থেমে যায় , যেখানে দাঁড়িয়ে পাঠকের হয়তো মনে হতে পারে যে, শেষ হয়েও হোলো না তো শেষ, কিন্তু তা বলে পরবর্তীতে সুভা পুনরায় প্রকৃতির মাঝখানে ফিরে আসতে পারল বা বাধ্য হোলো কি না – তা জানার কোনো উপায় থাকে না।

তবে এটা বুঝতেও নিশ্চিত কোনো ক্লেশ স্বীকার করতে হয় না তাকে যে, পুনরায় সুভা যদি কোনোদিন ফিরেও আসে বা বাধ্য হয় ফিরতে, তবে তখনকার সুভা নিঃসন্দেহে হয়ে উঠবে সাংসারিক নিষ্ঠুরতার এক অসহায় শিকার। যে বোবা মেয়েটি একদা তার যাবতীয় সারল্য আর আন্তরিকতা দিয়ে আপন করে নিয়েছিল তারই মতো মৌন মূক বিশ্বজগতটাকে , একদিন মানুষের নিয়মে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েই সে চিরতরে হয়ে গিয়েছিল বান্ধবহীন এবং আরওতর অসহায়।

'...প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব,এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা,...এ তো অন্যত্র দেখি নাই।'[২৫]--- রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছিলেন কালিদাস প্রসঙ্গে 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে। বস্তুত তাঁর নিজের সম্পর্কেও কথাটি ভীষণ সত্য। সহজ উদাহরণ হিসাবেই বলা যায়, 'সুভা' গল্পটির নাম।

পুনশ্চ : প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয়ে এই গল্পের পাঠকদের নজর টানতে ইচ্ছে করে । গল্পে সে ভাবে ভূমিকা থাক বা না-থাক চরিত্র-সংখ্যা কিন্তু একেবারে নগণ্য নয়। লক্ষ্য করবার বিষয় কোন্ চরিত্রগুলিকে স্বনামপ্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন গল্পকার আর কোন্গুলিকে করেননি !

দুই দিদি অর্থাৎ সুকেশিনী ও সুহাসিনী-র নাম এসেছে সুভা-র সুভাষিণী নাম প্রাপ্তির কার্য-কারণ সম্পর্ক বোঝাতে, স্বাভাবিকভাবেই এই নামগুলি উপেক্ষণীয় কিন্তু এরা ছাড়া আর মাত্র দু'টি চরিত্রের নাম দিয়েছেন লেখক ; সুভার বাবা বাণীকণ্ঠ এবং গোঁসাইদের বাড়ির ছোটো ছেলে অকর্মণ্য প্রতাপ-এর। প্রতাপের নামের আগে একটা লম্বা বিশেষণ জুড়েছেন কিন্তু তার পরেও তাকে একটা দস্তুরমতো নামও দিয়েছেন (অবশ্য সুভা-গল্পের এই প্রতাপের যদিও কোনো প্রতাপ নেই শৈবলিনীর প্রতাপের মতো, যদি-না সংসারের চোখে 'নিতান্ত অকর্মণ্য' হয়েও দিব্যি আপনভোলা সুখে থাকাটাকেও একটা মহত্তম 'প্রতাপ' না মনে করি!), আর বাণীকণ্ঠ-র নামটা নিঃসন্দেহে তার নির্বাক কন্যাটির নামকরণের আয়রণিকেই করে তুলেছে তীব্রতর। মজার কথা মূল চরিত্র সুভা ছাড়া এই দু'টি মাত্র মনুষ্যচরিত্রের ক্ষেত্রেই বস্তুত নামকরণের কষ্ট করেছেন রবীন্দ্রনাথ, অথচ তিনি নাম দিয়েছেন সুভার মনুষ্যেতর 'বাল্য-সখীদের' অর্থাৎ সর্বসী ও পাঙ্গুলি নামধেয় গাভীদুটির পর্যন্ত কিন্তু বাদবাকি কোনো মানব চরিত্রকেই আলাদা নামকরণের যোগ্য মনে করেননি ! প্রশ্ন জাগে, কোথাও লেখকের এই অভিরুচি কি গল্পের নির্মাণ শৈলীর বিশিষ্টতাকে নির্দেশ করে না !

লক্ষ্য করবার বিষয়, সুভার প্রতি আচরণকে কেন্দ্র করে (অন্তত ন্যূনতম) মানবিকতা যে যে চরিত্রগুলি দেখাতে পেরেছে ঘটনাচক্রে হলেও কিন্তু তাদের ছাড়া অন্য চরিত্রগুলিকে পরিচয় নির্দেশক বিশেষ্য-র অতিরিক্ত কোনো স্বনামে চিহ্নিত করার মতো যোগ্য মনে করেননি রবীন্দ্রনাথ। এখন কেউ বিষয়টি নিতান্ত কাকতালীয় বললে অবশ্যি তা নিয়ে বিতর্ক চলে না। বড়োজোর মনে করা চলে যে, 'রক্তকরবী'র মতো নাটকেও কিন্তু প্রায় এইরকম একটি কাজই করেছিলেন তিনি। নাটকে এক অর্থে নায়ক-নায়িকা রঞ্জন-নন্দিনী ছাড়া তিনি স্বতন্ত্রভাবে মনুষ্যনাম দিয়েছিলেন কাদের; যারা কাজ করে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ অথবা যক্ষপুরীর অন্দরে-বাহিরে । যারা এতটাই 'তুচ্ছ' যে যক্ষপুরীর মাতব্বরেরা তাদের নামে নয়, চিনতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে প্রাণহীন সংখ্যা আর অক্ষরে। অথচ বেছে-বেছে তাদের প্রায় প্রত্যেককে নিজস্ব নাম দেন রবীন্দ্রনাথ আর উল্টে সম্মানজনক একটি নিজস্ব নামের মালিকানা থেকে বঞ্চিত করে বড়োজোর পদ বা পেশা নির্দেশক একটি বিশেষ্যের ঘেরাটোপে বন্দি করতে রাখতেই পছন্দ করেন

যক্ষপুরী তথা প্রকৃতপ্রস্তাবে সমাজের মাথা যে মাতব্বরেরা সেই হৃদয়হীন অধ্যাপক, মোড়ল, গোঁসাই বা সর্দারদের। অনেকটা এই গল্পে সুভার মা বা সুভার স্বামীর মতো চরিত্রদের ক্ষেত্রে যে ট্রিটমেন্ট্ লেখকের তার সঙ্গে কোথাও কী একটা মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না 'রক্তকরবী'র এই লক্ষণের ! অবশ্য সাহিত্য তো আর বিজ্ঞান নয় যে একমত হতেই হবে আমাদের সবাইকে।

তথ্যসূত্র :

১) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ছোটগল্পের ধারা' , কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ , বাক্-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ : মাঘ ১৪০৬ (প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭৩), পৃঃ ১৮।

২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সুভা', গল্পগুচ্ছ(চার খণ্ডে একত্রে), বিশ্বভারতী, কলকাতা, সর্বশেষ পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪০১(তিন খণ্ডে প্রথম প্রকাশ ১৩৩৩) , পৃঃ ১২১।

৩) ঐ, পৃঃ ১২২।

৪) ঐ, পৃঃ ১২১।

৫) ঐ।

৬) ঐ, পৃঃ ১২২।

৭) ঐ।

৮) ঐ, পৃঃ ১২১।

৯) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথ', কালের পুত্তলিকা,দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ :কার্তিক ১৪০৬ (প্রথম দে'জ সংস্করণ: আশ্বিন ১৪০২), পৃঃ ৭০।

১০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সুভা', গল্পগুচ্ছ(চার খণ্ডে একত্রে) , বিশ্বভারতী, কলকাতা, সর্বশেষ পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪০১(তিন খণ্ডে প্রথম প্রকাশ ১৩৩৩) ,পৃঃ ১২১।

১১) ঐ , পৃঃ ১২৩।

১২) ঐ ।

১৩) ঐ ।

১৪) ঐ ।

১৫) ঐ , পৃঃ ১২৩-১২৪।

১৬) ঐ , পৃঃ ১২৪।

১৭) ঐ ।

১৮) ঐ ।

১৯) ঐ ।

২০) ঐ ।

২১) ঐ ।

২২) ঐ ।

২৩) গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, ‘পরিবেশের প্রয়োগশিল্প’, রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের প্রকরণ-শিল্প,সাহিত্যলোক,কলকাতা,প্রথম সংস্করণ: অগ্রহায়ণ ১৪০৪ ,পৃঃ ৭৪।

২৪) বুদ্ধদেব বসু, ‘গল্পগুচ্ছে’র রচনারীতি’, রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ : মাঘ ১৩৮৯ (প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৯৫৫) , পৃঃ ৬২।

২৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘শকুন্তলা’, প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড) , বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ , প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৯৩ (পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪০২), পৃঃ ৭২৮।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের লালসালু উপন্যাস এক নতুন দিগন্ত

সৈয়দ রাফিকা সুলতানা
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:
আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের একজন ভিন্নধারার কথাশিল্পী হলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন, ১৫-ই আগস্ট ১৯২২ সালে, অধুনা বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। বাবার চাকুরি সূত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছেন। বিভিন্ন জনজীবন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তার সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে তার সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কথাশিল্পী হলেও তার মনোজগতে পাশ্চাত্য প্রভাব ছিল প্রবলভাবে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'লালসালু' এমন একটি উপন্যাস যেখানে একদিকে দেখানো হয়েছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে গ্রাম বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক অনটন, অশিক্ষা, অসচেতনতা অন্যদিকে ধর্মীয় গোঁড়ামির ওপর ভিত্তি করে মজিদ নামের এক ব্যক্তির সমগ্র এলাকায় অশিক্ষিত মানুষদের অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে তার জীবিকা নির্বাহ করেছেন। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক লাভের দিক থেকেই যে মজিদ এই ধর্মীয় গোঁড়ামির আশ্রয় নিয়েছেন তাই নয়, শারীরিক কামনা, বাসনা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রেও এই ধর্মের গোড়ামীকে হাতিয়ার করেছেন তিনি। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে গ্রাম বাংলার মানুষের যে অর্থনৈতিক অনটন শুরু হয় তার একটা সামগ্রিক চিত্র এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। অশিক্ষিত, অসচেতন মানুষদের ওপরে খুব সহজভাবেই ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসকে চাপিয়ে দিয়ে রাজত্ব চালানো সম্ভব, এই 'লালসালু' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।
সূচক শব্দ: ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, যুদ্ধ বিধ্বস্ত পরিস্থিতি, জৈবিক কামনা-বাসনা, দারিদ্রতা, অশিক্ষা, অসচেতনতা।

মূলবক্তব্য:
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পারিবারিক সূত্রেই প্রগতিশীল। পিতার চাকরী সূত্রেই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁকে বসবাস করতে হয়। ছাত্রাবস্থা থেকেই সমাজকে গভীরভাবে দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রথম জীবনেই পড়াশুনা শেষ করে স্টেটসম্যান পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি চোখের সম্মুখে দেখতে পান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ানক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজকে। অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত গ্রামীণ সমাজ, অশিক্ষার প্রভাব গ্রামগুলিকে কিভাবে তিলে

তিলে নষ্ট করে দিচ্ছে। অপর দিকে অর্থনৈতিক সংকটের কবলে পড়ে গ্রামের মানুষের একটা অংশ যখন বিভিন্ন পথের সন্ধানে চারিদিকে ছোটাছুটি করছে দু'মুঠো অন্নের সন্ধানে। ইতিপূর্বেই শিল্প বিপ্লব ও যন্ত্র সভ্যতার বিকাশের ফলে শহরে কিছু কলকারখানা স্থাপিত হয়, সেখানে গ্রামের মানুষ আসে দু'মুঠো অন্নের সন্ধানে। নবজাগরণের আলো যন্ত্র সভ্যতার গতি শহরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তার বাইরে বাংলার যে অভুক্ত গ্রাম তাতে ছিটে ফোঁটাও পড়েনি। বাংলাদেশের গ্রামই ছিল দু'টি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বাস একটি হিন্দু ও অপরটি মুসলিম। উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রীতির বাতাবরণে ও নিজেদের আবদ্ধ রাখত বাংলার বেশির ভাগ গ্রামই ছিল ধর্মীয় অনুশাসনে শাসিত কিন্তু গ্রামের মানুষের প্রকৃতি ছিল সহজ সরল। বাংলাদেশের বিভিন্ন ঔপন্যাসিক গ্রাম-জীবনকে নিয়ে একাধিক উপন্যাস রচনা করলেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রমী, তাঁর উপন্যাসগুলিতে গ্রামের মানুষের সাধারণ অবয়ব ও তাঁর বাহ্যিক চরিত্রই প্রধান নয় ব্যক্তিমানুষের অন্তর্লোকের অন্তর্চরিত্র বা জটিলতা খুঁজে বের করা ছিল ওয়ালীউল্লাহের কাজ। তাছাড়াও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন সমাজ সচেতন লেখক, ব্যক্তি মানুষের শুধু শারীরিক গঠনের দিকই বিচার করেননি সামাজিক শ্রেণী সংকটের দিকটিও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ওয়ালীউল্লাহ মোট তিনটি উপন্যাস লিখেছিলেন- 'লালসালু' 'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো'। ওয়ালীউল্লাহ তাঁর 'লালসালু' উপন্যাসে যে মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামবাংলার সামাজিক বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরেছেন, তা আমাদের সকলের কাছেই দুঃসাহসিক বলে মনে হয়েছে। যে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে দেশ বিভক্ত হয় এবং দেশের মানুষের মধ্যে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভাজনের উন্মত্ততা প্রতিনিয়ত গ্রাস করেছে, ঠিক সেই সময় একটা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর যে অন্ধধর্মীয় বিশ্বাস তারমূলে আঘাত হানবার সাহস দেখিয়েছেন ওয়ালীউল্লাহ। বাংলা উপন্যাসে ইতিপূর্বেও ধর্মীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, নাট্যকাররা কথা বললেও আমাদের মনে হয় তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা ছিল, তাঁরা একটা সীমার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেননি, ওয়ালীউল্লাহ যাবতীয় সীমারেখাকে অতিক্রম করেই গ্রামীণ সহজ সরল মানুষের জীবনে ধর্ম কিভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে শাসন ও শোষণ করে এবং তার কি ভয়ানক পরিণতি, সে সম্পর্কে ওয়ালীউল্লাহ যথেষ্ট সজাগ দৃষ্টিতে উপন্যাসের অভ্যন্তরে গ্রামবাংলার সামাজিক জনজীবনের চিত্রকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'লালসালু' উপন্যাসের প্রকাশকাল নিয়ে কেউ মনে করেন এটি প্রকাশিত হয় কোলকাতা থেকে আবার কেউ মনে করেন ঢাকার কমরেড পাবলিসার্স থেকে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কোনো রকম ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা যদি বিন্দুমাত্র আচ্ছন্ন থাকতেন, তা হলে মনে হয় তিনি এই কাহিনীকে এত সহজে তুলে ধরতে পারতেন না। যাবতীয় অন্ধ কু-সংস্কার, বিশ্বাসের বেড়াজাল অতিক্রম করেই সম্ভব এই ধরনের সমাজ চিত্রকে তুলে ধরা। ওয়ালীউল্লাহ নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন-

"নাম, যশ, খ্যাতি, অর্থ কোনটির জন্যই আমাকে লিখতে হবে এটা আমি মনে করি না। আমার যা মনে হয়েছে আমি তাই লিখেছি....."[১]

তাঁর এই 'লালসালু' উপন্যাসটিতে এইরকম এক গ্রামীণ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মূলে আঘাত হানার কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। অনেক সমালোচক মনে করেন গঠন কৌশলের দিক থেকে উপন্যাসটি দুর্বল। আবার প্রায় সমস্ত সমালোচক এ কথা মানতে বাধ্য ওয়ালীউল্লাহ যে কাহিনী তুলে ধরেছিলেন তা সত্যিই অনন্য। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হলে তা ঘরের এক কোণে আবর্জনা হিসেবেই পরিত্যক্ত ছিল। তার কিছুদিন পরে 'লালসালু' উপন্যাসটি পৃথিবীর একাধিক ভাষায় মুদ্রিত হওয়ার ফলে বিশ্ববাসীর সম্মুখে বৃহৎ এই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বরূপ ফুটে ওঠে। এর পর পরই বাংলাদেশে এই উপন্যাস জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাছাড়া পরবর্তী লেখকদের বা ঔপন্যাসিকদের সমাজের কঠিন বাস্তব অবস্থাকে তুলে ধরার কাজ করে এই উপন্যাসটি। এই উপন্যাসে ভাগ্যান্বেষী মজিদের প্রত্যাশা, প্রতিষ্ঠা, প্রাপ্তি ও জীবন সংগ্রামের কাহিনী উল্লেখ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক ওয়ালীউল্লাহ পূর্ব বাংলার গ্রামীণ সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। অধুনা বাংলাদেশ পূর্বতন পূর্বপাকিস্থান, সেখানকার সহজ, সরল ধর্মপ্রাণ মুসলমান সমাজ কিভাবে এক এবং বিভিন্ন ধর্মব্যবসায়ীর শিকার হয় তার প্রকৃত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'লালসালু' উপন্যাসে।

উপন্যাসের শুরুতে রয়েছে মজিদের স্বগ্রামের জরাজীর্ণ করুণ চিত্র। অর্থনৈতিক সংকট সমাধান করবার জন্য তার এই ভয়ঙ্কর ও সাংঘাতিক খেলায় নিজেকে নিযুক্ত করবার প্রয়াস, বিভিন্নজন যখন বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হবার বাসনা নিয়ে তাড়িত হয়েছে, তখন মজিদ ভিন্ন পেশায় না নিয়ে গ্রামবাংলার অশিক্ষিত, ধর্মভীরু সাধারণ মানুষকে বেছে নিয়েছে।

> "শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন লুটালুটি, সার স্থানবিশেষ খুনাখুনি করে সর্বপ্রচেষ্টার করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। ভাগাভাগি, শেষ।"[২]

এই রকম এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অশিক্ষিত ধর্মভীরু মানুষের দীর্ঘকাল বসবাস স্থল মহাব্বতনগর গ্রাম। যে মহব্বতনগরে স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়নি নবজীবনের আলো বিন্দুমাত্র প্রবেশ করেনি। শহরকেন্দ্র থেকে বহুদূরে অবস্থিত এই গ্রাম। এই গ্রামের সহজ সরল মানুষদেরকেই তিনি তার জীবিকা করলেন। মজিদ এদের দিয়ে শুধুমাত্র তার অর্থনৈতিক চাহিদাকেই পূরণ করার লক্ষ্যে এই গ্রামে প্রবেশ করেননি। সে তার জৈবিক কামনা বাসনার পরিতৃপ্তির একমাত্র সঠিক স্থান হিসেবেও এই গ্রামকে সে বেছে নিয়েছিল। এরপর তার ধর্মব্যবসা ও অমার্জিত জৈবিক চাহিদা এই দুইই এক সঙ্গে চলতে লাগলো তার। এই মহব্বতনগর গ্রামে মজিদ প্রবেশ করে নাটকীয় ভাবে। উপন্যাসের শুরুটা হয় এইভাবে শ্রাবণ মাসের নিরাকপরা দুপুরে। সেই সময় রাস্তা দিয়ে

প্রবেশ করে মজিদ। এই রাস্তার এক পাশে ধানক্ষেত্রে মাছ ধরছিল তাহের ও কাদের দুই ভাই। এভাবেই মজিদ প্রবেশ করে মহব্বতনগর গ্রামে। 'লালসালু' উপন্যাসে দেখা যায় মজিদ মহব্বতনগরে প্রবেশ করে স্বগ্রামের পরিচয় তুলে ধরেন। সেখানে উল্লেখ করেছে, তিনি যে গ্রামে বাস করতেন শষ্যের কোনো অভাব ছিল না, খাদ্যের কোনো ঘাটতি ছিল না, সর্বোপরি ধর্মের অনুশাসনে গ্রাম পরিচালিত হত-

'শষ্যের চেয়ে টুপি বেশি' বলে গ্রামবাসীরা লিপ্ত হয় কঠোর জীবন সংগ্রামে। গোঁফ উঠতে না উঠতেই অসংখ্য মক্তবে কোরাণ হেফাজ করা শেষ হয়। কিন্তু মজিদের গ্রাম ছাড়ার আসল কারণ হ'ল প্রচন্ড ক্ষুধার তাড়নায় বিভিন্ন জন বিভিন্ন পেশায় প্রবেশ করলেও মজিদ অন্যকোনো পেশায় না গিয়ে ধর্মকে পুঁজি করে ধর্ম ব্যাবসায় নিজেকে নিয়োজিত করে। বাংলাদেশের অজস্র গ্রামে এমন দৃশ্য দেখা যায় কোথাও মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে কোথাও বা হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামে। 'লালসালু' উপন্যাসে লালসালু পরিবৃত মাজার মজিদের মতো ধর্মব্যবসায়ীদের জমজমাট ব্যবসা ভূমি হিসেবে চিহ্নিত হয়। এইরকম মাজার ব্যবসায়ীরা অজস্র গ্রামের সাধারণ মানুষের ধর্ম বিশ্বাস ও সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে। এরকম এক ধর্মব্যবসায়ী মজিদের মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভের ইতিবৃত্তই লালসালু উপন্যাসের প্রথম বিবেচিত বিষয় হয়ে উঠেছে।

১. সামন্তবাদী সমাজের ধ্বংসাবশেষের বৈশিষ্ট্য মহব্বতনগর গ্রামের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা এবং নবজাগরণের কোন আলোই মহব্বতনগরে এসে পড়ে না। মহব্বতনগরের গ্রামীণ জীবনকে দু'টি স্তরে আমরা বিভক্ত করতে পারি। একটিশ্রেণী হ'ল- কৃষিজীবী যারা সরাসরি উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করে, আরেকটি শ্রেণী হ'ল ভূ- সম্পত্তির অধিকারী বা ক্ষমতার অধিকারী। মহব্বতনগর গ্রামের খালেক ব্যাপারী জমিদার শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত, ঐশী শক্তির অধিকারী হলেন পীড় মজিদ। জোত ও জমির অধিকারী হয়েও খালেক ব্যাপারী, গ্রামের আর পাঁচটা সাধারণ মানুষ মজিদকে যেমন সমীহ করে তেমনি খালেক ব্যাপারীকেও করে। এছাড়াও শ্রেণীগত স্বার্থের কারণেও খালেক ব্যাপারী মজিদকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে।

'লালসালু' উপন্যাসে ওয়ালীউল্লাহ বাংলার গ্রামীণ সমাজের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে সমাজ সম্পৃক্ত ধর্মের ব্যাপারটিকেও তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের মধ্যদিয়ে প্রকৃতধর্ম চিন্তাকে ব্যতিরেকে ধর্ম ব্যবসার স্বরূপ উন্মোচন করে দেখিয়েছেন আমাদের। বিবেক মানবিকতা বর্জিত ধর্মের ভন্ডামী গ্রামীণ সহজ সরল মানুষের জীবনকে কতদূর অর্থহীন সারশূন্য করে তোলে তার চিত্র। ওয়ালীউল্লাহ আরো দেখিয়েছেন স্বার্থান্বেষী বিবেকহীন ধর্মব্যবসায়ীরা ধর্মের ধ্বজাধরে সাধারণ মানুষকে কিভাবে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের ছবি তুলে ধরতে গিয়ে ওয়ালীউল্লাহ পার্শ্ববর্তী গ্রামের আওয়ালপুরের পীর সাহেবও মজিদের মধ্যেকার বিরোধকে স্পষ্ট করি দিয়েছেন। এই পার্থক্য অন্য কিছু নয় তা হ'ল গ্রামীণ সাধারণ মানুষকে ধর্মের নাম দিয়ে বশবর্তী করে

রাখবার লড়াই যার পরিণতি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিজেদের শক্তিশালী হওয়ার বাসনা। আবার অন্যভাবে বিশ্লেষণ করে বলতে পারি মহব্বতনগর গ্রামে মজিদ হচ্ছে বহিরাগত এক ব্যক্তি। ধর্মের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষকে কূট কৌশলে শাসন ও শোষণ করার কৌশল। মজিদের এই স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতালোভী শাসক সুলভ আচরণকেও তৎকালীন পাকিস্তানী স্বৈরাচারী ও তাদের সহযোগী শাসক গোষ্ঠীর পূর্ববঙ্গে অনুপ্রবেশ এবং ধর্মের আওয়াজ তুলে শাসন ও শোষণের প্রতীকধর্মীচিত্র হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের সরল সাধারণ মানুষ অন্ধভাবে তাদের মেনে নিয়ে বিভ্রান্ত হলেও প্রচন্ড ঘৃণাভরে ধর্মের নামে অপধর্মের যে অচলায়তন ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার শক্তি দেখিয়েছিল, তা জমিলা চরিত্রের মতোই প্রতীকী হিসেবে উঠেছে।

২. ওয়ালীউল্লাহের 'লালসালু' উপন্যাসটি চরিত্র প্রধান উপন্যাস। উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত চরিত্র ও ঘটনা সন্নিবেশ ঘটেছে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে মজিদকে তুলে ধরা হয়েছে। মজিদ চরিত্র এই উপন্যাসের প্রধান ও কেন্দ্রীয় চরিত্র হ'ল মজিদ। মজিদকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের কাহিনী মূল বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। মজিদ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে গাড়ো পাহাড়ের দুর্গম স্থানে কিছু কাল কাটিয়ে আসার পর মহব্বতনগরে প্রবেশ করে এবং পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য এক কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। 'দুনিয়ায় স্বচ্ছল্লভাবে বাঁচবার জন্য' এক সাংঘাতিক খেলায় নিজেকে লিপ্ত করে এবং এই খেলার যে ভয়ংকর পরিণতি হতে পারে সে সম্পর্কে সে প্রায় নিশ্চিত। তবুও জীবন সমস্যার পটভূমিতে গড়ে ওঠা এই চরিত্রটি জীবিকার প্রয়োজনে ধর্ম ব্যবসার পথ বেছে নেয়। অতীত শতাব্দীর বিশ্বাসে আবদ্ধ কেতাবী শিক্ষাকে সম্বল করে মহব্বতনগর গ্রামের সহজ সরল ধর্মভীরু গ্রামবাসীদের সে প্রতারণা করে। শ্রাবণ মাসের এক পড়ন্ত বিকেলে ঐ গ্রামের তাহের ও কাদের যখন মাছ ধরছিল তখন তারা মজিদকে দূর থেকে লক্ষ্য করে যে মাতগঞ্জের রাস্তার ওপর দিয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে মোনাজাতা অবস্থায়। এরপরে মজিদ মহব্বতনগর গ্রামে ঢুকে অজানা মাজারকে চিহ্নিত করে মোদাচ্ছেরের মাজার বলে। মজিদ এও বলে যে সে স্বপ্না দেশ পেয়ে সে এখানে এসেছে- এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের সহজ সরলতাকে তার শিকারের বস্তু হিসাবে চিহ্নিত করে। মহব্বতনগর গ্রামে শিকারী মজিদের আগমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে মাছ শিকারী তাহের ও কাদের এই নতুন ধরনের শিকারীকে দেখ নিজেদের শিকারের কথা ভুলে যায়। "কাদের আর তাদের অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। মাছকে সর্তক করে দেবার ভয়ে কথা হয় না, কিন্তু পাশেই একবার ধানের শীষ স্পষ্ট ভাবে নড়ে ওঠে, ঈষৎ আওয়াজও হয়- সে দিকে দৃষ্টি নেই।" মহব্বতনগর গ্রামবাসীদের কাছে মজিদ নিজের ভাবমূর্তি সৃষ্টি করার জন্য বলে, গাড়ো পাহাড়ে সে সুখে শান্তিতে ছিল, সেখানে ছিল গোলাভরা ধান পুকুর ভরা মাছ, গরু-ছাগল-ঘর-বাড়ি। কিন্তু স্বপ্নাদেশ

পেয়ে সে একমূহূর্তে মহব্বতনগরে চলে এসেছে। সজ্ঞানে সচেতনে এই মিথ্যা কথা বলার আগে মজিদ এও বুঝেছিল যে-

> "দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে দু'বেলা খেয়ে বাঁচবার জন্য যে খেলা খেলতে যাচ্ছে, সে খেলা সাংঘাতিক।"[৩]

প্রথমে মজিদ গ্রামের জমায়েত লক্ষ্য করেছে, গ্রামের মানুষের মধ্যে ধর্মের প্রতি আসক্তি কতখানি। তারপর গ্রামের মানুষ যতবেশি মাথানত করে তার কথা শুনেছে, মজিদ ততবেশি গ্রামের মানুষকে ধর্মের কথা দিয়ে শাসন করবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। মজিদের অন্তর্ভাবনায় জ্ঞাত হয়েছে সে আমার শিকারের বস্তু গ্রামের এই সহজ-সরল সাধারণ মানুষকে বেছে নেওয়াটাই সঠিক। এর পরেই চলেছে গ্রামের মানুষের সহজ-সরলতার সুযোগ নিয়ে ধর্মীয় অনুশাসন কায়েম করে নিজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তোলা এবং তার পরবর্তী সময়ে অতৃপ্ত বাসনা পরিতৃপ্তির পথ খোঁজা শুরু। খুব অল্পকালের মধ্যেই মজিত মহব্বতনগরের অধিবাসীদের মনে খোদা ভীতির সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। সুচতুর মজিদ খালেক ব্যাপারীকে তার তৃতীয় হাত হিসাবে ব্যবহার করে। কিন্তু সুচতুর মজিদ নিজের অবস্থান সম্পর্কে খালেক ব্যাপারীর কাছেও সর্তক থাকে। অল্পকালের মধ্যেই প্রাচীন কবর মোদাচ্ছেদ পীরের মাজারে পরিণত হল-

> "ঝালরওয়ালা লালসালু দ্বারা আবৃত হল মাছের পিঠের মত সে কবর।"[৪]

আস্তে আস্তে বিভিন্ন গ্রামের মানুষের কাছে তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল এই মাজার। সাথে সাথে বিত্তশালী; প্রভাবশালী হয়ে উঠল মজিদ। আবার সেই হয়ে উঠল সমাজপতি। নিজের হীন অভিসন্ধিকে সফল করার লক্ষ্যে মজিদের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল সতর্ক ও সুবিবেচিত। নির্দেশকে সামান্যতম অবহেলা কিম্বা অমান্যতার প্রতিফলন হয় চরম প্রতিশোধমূলক। আধিপত্য বিস্তারের জন্য মজিদ প্রয়োজনে নির্মম নিষ্ঠুর হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেনি। আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে প্রতিপক্ষ মোকাবিলায় তার পদক্ষেপ ছিল প্রতিশোধাত্মক। মজিদের প্রতি সামান্যতম অবজ্ঞা প্রদর্শনের ফলে মজিদ তাহেরের বাপকে কন্যার কাছে মাফ চাইতে বাধ্য করে। অপমানের জ্বালা সইতে না পেরে সে নিরুদ্দেশ হয়। মজিদকে উপেক্ষা করে আওয়ালপুরের পীর সাহেবের কাছ থেকে পানিপড়া আনার চেষ্টা করায় মজিদ খালেক ব্যাপারীকে দিয়ে তার স্ত্রী নিরপরাধ আমেনা বিবির তালাকের ব্যবস্থা করে। আওয়ালপুরের পীর সাহেব মজিদের ধর্মব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে হাজির হলে তার বিরুদ্ধে যে প্রকাশ্যে বিদ্রোহে সামিল হয় এবং কূট-বুদ্ধির সাহায্যে তার সঙ্গে নিজের গ্রামবাসীদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করে।

মহব্বতনগর গ্রামে নিজের শক্তি প্রতিষ্ঠায় ধূর্ত মজিদ যেসব পদক্ষেপ নেয় সেগুলি যেমন অভিনব তেমনি চমকপ্রদ। তাহেরের বাপকে বিচারের কৌশলে অপদস্ত করে নিজের ক্ষমতার অবস্থানকে মজিদ নিরঙ্কুশ করেছে। গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসাবে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সে প্রকাশ্যে বাজারে আধঘন্টার মধ্যে বাপ-বেটার খতনা সম্পন্ন করেছে। সমাজের অগ্রগতিমূলক ও প্রগতিশীল যেকোনো কাজকে

সে বাধা দিয়েছে প্রাণপণে। আধুনিক প্রয়াসী তরুণ আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে সে কৌশলে বানচাল করেছে। এমনকী পাল্টা মসজিদ বানানোর প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নিয়েছে। এসব পদক্ষেপে মজিদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ও কুটবুদ্ধির পরিচয়, সেই সঙ্গে তার প্রগতিবিরোধী ভূমিকা বোঝা যায়। মজিদ আধ্যাত্মজীবী হলেও রক্ত মাংসের মানুষ। তার চরিত্রের মানবিক সীমাবদ্ধতা তাকে করে তুলেছে জীবন্ত। জমি গৃহস্থালি হলেও শীর্ণ মজিদ একদিন ব্যাপ্ত যৌবনা বিধবা রহিমাকে দেখে জ্বলে উঠেছিল, মজিদ তাকেই বিয়ে করে ঘরে আনে কিন্তু রহিমা মজিদকে পরিতৃপ্ত করতে পারেনা। তার মধ্যে নেশা জাগানো উত্তাপ ছিলনা। কারণ -

> "রহিমার না আছে অভিমান না আছে চপলতা। এমন মানুষ ভালো লাগেনা তার।"[৫]

এই জৈবিক অতৃপ্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে মজিদ হাসুনীর মায়ের দৈহিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়। তার দুঃখ মোচনের অছিলায় তাকে কিনে দেয় বেগুনি রং-এর কালোপেড়ে শাড়ি। পৌষের হাড় কাঁপানো শীতের রাতে রহিমা ও হাসুনীর মা যখন ধান সিদ্ধ করে উঠানে তখন খড়ের গনগনে আগুনের উজ্জ্বল আলোয় সেই বেগুনি রঙের শাড়ি পরা হাসুনীর মার উন্মুক্ত গলা কাঁধ ও বাহুর উজ্জ্বলতা দেখে "মজিদের চোখ অন্ধকারে চকচক করে।" মজিদের জৈব অতৃপ্তির বহিঃপ্রকাশ তার কামনা লিপ্স দৃষ্টিতে তার প্রকাশ ঘটে খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী অমেনা বিবির কালো রঙের পাড়ের তল থেকে বেরিয়ে আসা সুন্দর পা আর হলুদ বুটিদার চাদরের প্রান্ত ছুঁয়ে বের হয়ে আসা অদ্ভুত কোমল সাদা হাতের দিকে তাকিয়ে এখানে একইসঙ্গে মজিদের অন্তর্ভাবনার সূক্ষ্ম দিকগুলোও লেখক আমাদের জানিয়েছেন। মজিদ লুব্ধ দৃষ্টিতে আমেনাবিবির শরীর দেখে মুগ্ধ হলেও তাকে ছাপিয়ে ওঠে তার প্রতিহিংসা পরায়ণতা। তার মনে সাপ ফনা তোলে ছোবল মারার জন্য - "সুন্দর পা দেখে স্নেহ মমতা উঠে না এসে আসে বিষ।" আবার অন্যসময়ে সে পা দ্বিতীয়বার দেখালোনা বলে হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন যেন আফসোসবোধ করে মজিদ। তারপর মনে মনেই হাসে।

> "দুনিয়াটা বড় বিচিত্র যেখানে সাপ জাগে সেখানে আবার কোমলতার আলাদাভাবে ফুল ফোটে।"[৬]

মজিদের মানসলোকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরগ্রাম অঙ্কনে ওয়ালীউল্লাহর দক্ষতা অপরিসীম। বিপুল অর্থবিত্ত এবং নিরঙ্কুশ প্রভাব প্রতিপত্তি সত্ত্বেও তাঁর জীবনে যে ব্যক্তিগত সঙ্কট সৃষ্টি হয় তার জন্য সে নিজেই দায়ী। অতৃপ্ত ও বুভুক্ষু জৈবিক কামনায় পীড়িত মজিদ প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে অনুভব করে জীবনকে সে পরিপূর্ণ উপভোগ করেনি। "জীবন উপভোগ করতে না পারলে কিসের ছাই মান বল সম্পত্তি।" অবদমিত ও অতৃপ্ত কামনা পরিতৃপ্তির নেশায় মজিদ দ্বিতীয় বিয়ে করে কিশোরী জমিলাকে দেখে তার মনে হয় ঠিক যেন বিড়াল ছানা। "পুলকিত মজিত 'ঘন ঘন দাঁড়িতে হাত বুলায়, আর তার আশপাশ আতরের গন্ধেভুরভুর করে" জমিলার 'সোনালী মিহি সুন্দর হাসির ঝংকার

শুনে চমকিত ও মুগ্ধ হয়। কিন্তু রহস্যে ঘেরা মাজারের ভাবগম্ভীর পরিবেশকে সে হাসি যেন অবজ্ঞা করে। তাই সে হাসি সে নির্দ্বিধায় থামিয়ে দেয়। কিন্তু এই একরত্তি মেয়েটির স্বভাব চপলতা প্রাণোচ্ছলতাকে প্রভুক্ত কামিতার খাঁচায় বন্দী করতে গিয়ে মজিদ হয়েছে বিব্রত, বিড়ম্বিত ও বিপর্যস্ত। তার মনকে ঘিরে ধরে বিপন্নতা বোধ। সে অনুভব করে "লতার মত মেয়েটি যেন সংসারে ফাটল ধরিয়ে দিতে এসেছে।" অসহায়ের মত সে একান্ত রহিমার শরণাপন্ন হয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলে- "বিবি কারে বিয়া করলাম? তুমি কি বদদোয়াদিছিলানি?" এই প্রথম মজিদ তার প্রভুত্বের আসন ছেড়ে রহিমার পাশে একই সমতলে দাঁড়িয়েছে। আর রহিমা তার সমগ্র বিবাহিত জীবনে এই প্রথম নতুন মজিদকে আবিষ্কার করে। এই প্রথম মজিদের মনে হয় রহিমা তার অকৃত্রিম আন্তরিক বন্ধুভাবাপন্ন ও পরমাত্মীয়।

প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জমিলাকে বশে আনার জন্য মজিদের চেষ্টা যতই ব্যর্থ হয়, ততই সে নিষ্ঠুর ও প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। শেষ চেষ্টা হিসাবে মজিদ জমিলার অন্তরে খোদা, মাজার ও মজিদের প্রতি ভীতি সঞ্চারের চেষ্টা করে। জমিলাকে সে নামাজ পড়ার আদেশ দেয়। কিন্তু মজিদের আদেশ উপেক্ষা করে নামাজে না গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে জমিলা। ক্ষিপ্ত মজিদ তাকে জোর করে মাজারে নেওয়ার চেষ্টা করলে মজিদের মুখে থুতু নিক্ষেপ করে, ঘটনায় মজিদ যেন বজ্রাহত। কিন্তু তার রাগ চেপে যায়। ঝড় জল ও শিলাবৃষ্টির মধ্যে সে সারারাত মাজারের অন্ধকারে বেঁধে রাখে দুর্বিনীত জমিলাকে, সারারাত সে অপেক্ষা করে জমিলার কাতর আর্তনাদ শোনার জন্য। কিন্তু মজিদের প্রতিহিংসা চরিতার্থতায় এবারেও ব্যর্থ হয়। শিলাবৃষ্টি শেষে সে মাজারে গিয়ে দেখে জমিলার মেহেদি দেওয়া এক দুঃসাহসী পা সালুতে আবৃত কবরের গায়ে লেগে আছে। জমিলাকে শাস্তিদানের জন্য মজিদের ক্রুর কুটিল উদ্যোগ তার প্রতিহিংসা পরায়ণতা, তার উৎকণ্ঠা ও ব্যর্থতা ইত্যাদি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মজিদ চরিত্রটি বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। মজিদের আধ্যাত্মজীবী চরিত্রের মানবিক সীমাবদ্ধতা ফুটিয়ে তোলায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ অত্যন্ত সফল। জমিলাকে মোকাবিলায় মজিদের যে সংকট তার সংবাদ গ্রামবাসীর কাছে অজ্ঞাত থাকলেও মজিদের অন্তর্জগতে তার প্রভাব অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক ও অবর্ণনীয়।

উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি দুর্বিনীত জমিলাকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টায় শেষপর্যন্ত মজিদ ব্যর্থ হয়, শুধু তাই নয় শিলা ঝড় বৃষ্টিতে গ্রামের সমস্ত ক্ষেতের ফসল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলে মজিদের ঐশী ক্ষমতাও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। মজিদের মধ্যেও দেখা দেয় একটা দ্বন্দ্ব সত্যের সীমানায় পৌঁছানোর একটা আর্তি অনুভব করে নিজে, কিন্তু শেষপর্যন্ত সে সামলে নেয় নিজেকে। সে ফিরে দাঁড়ায় কিছুতেই সে হারতে রাজী নয়। গ্রামবাসীর হাহাকারকে সে এক ফুৎকারে থামিয়ে দেয় আমরা বুঝতে পারি, অন্ধতা, কুসংস্কার ও শোষণের শক্তি সহজে পরাজিত হবার নয়। খোদার উপর মজিদের বিশ্বাস অটল ও সীমাহীন এ যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য যে, মজিদ ছদ্ম

ধার্মিক-ধর্মের প্রকৃত ধ্বজাধারী সে নয়, বরং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ভাষায় সে ধর্মের আগাছা সে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস যুগ যুগ ধরে ভূমিহীন সরল গ্রাম্য মানুষকে প্রতারিত করে আসছে মজিদ তারই পতাকাবাহী। একইসঙ্গে মজিদ রক্তমাংসের মানুষ। আর দশ জনের মতই মানুষ। স্বচ্ছলভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টায় লিপ্ত এক সংগ্রামশীল মানুষ যে আপন অসাধুতা সম্পর্কে সচেতন। সে জানে-

> "খোদার বান্দা সে নির্বোধ ও জীবনের জন্য অন্ধ। তাঁর ভুলভ্রান্ত তিনি মাফ করে দেবেন। তাঁর করুণা অপার সীমাহীন।"[৭]

উপন্যাসে মজিদের অন্তর্ভাবনা ও বহির্পদক্ষেপে তার অশান্তি ও অতৃপ্তি তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মপ্রতারণা সবই ওয়ালীউল্লাহ্ ফুটিয়ে তুলেছেন শৈল্পিক কুশলতায় এ চরিত্র যেমন সুনির্মিত তেমনি ব্যতিক্রমী। ছদ্মধার্মিকতা স্বার্থোদ্ধারে চালিত অভিনব কুটকৌশল, পরিস্থিতি মোকাবেলায় সুচিন্তিত ও সতর্ক পদক্ষেপ, অভাবনীয় বাগ্মীতা, নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণতায় পারদর্শী ভাবেই মজিদ চরিত্রকে তুলে ধরতে সফল হয়েছেন ঔপন্যাসিক। তাই তিনি অর্জন করেছেন বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট আসন।

তথ্যসূত্র:

১) লালসালু, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, চিরায়ত প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কল্কাতা-৭০০০৭৩, পৃ- ৫

২) লালসালু, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, চিরায়ত প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কল্কাতা-৭০০০৭৩, পৃ-৯।

৩) লালসালু, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, চিরায়ত প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কল্কাতা-৭০০০৭৩, পৃ-১৭।

৪) লালসালু, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, চিরায়ত প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কল্কাতা-৭০০০৭৩, পৃ- ১৭।

৫) লালসালু, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, চিরায়ত প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কল্কাতা-৭০০০৭৩, পৃ-৯৮।

৬) লালসালু, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, চিরায়ত প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কল্কাতা-৭০০০৭৩, পৃ-১১৮।

৭) লালসালু, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, চিরায়ত প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কল্কাতা-৭০০০৭৩, পৃ-১১৯।

বিভেদের মাঝে মিলন মহান : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুরাশা' ও 'মুসলমানীর গল্প'

বিকাশ কালিন্দী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কথাসাহিত্যের জয়যাত্রায় হিন্দু জাতীয়তাবাদ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অন্তরায় বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। সেই জায়গা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনন ও দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা সুর সংযোজন করেন। তিনি দুই বিবদমান জাতিকে পৃথক ভাবে দেখেননি, দেখেছিলেন মানবতার দৃষ্টি দিয়ে। তিনি ধর্মীয় খোলসের অভ্যন্তরে চিরন্তন মানবিক সত্তাকে আবিষ্কার করেন। আমাদের আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুরাশা' ও 'মুসলমানীর গল্প' গল্পদ্বয়ে যেভাবে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বাঁধনটি আজীবন অটুট রেখেছিলেন তা বিশ্লেষণ করা।
সূচক শব্দ : মানবতা, বিবর্তন, খোলস, আচার, সংস্কার, ভেদাভেদ, মিলন, বিবাদমান।

মূল আলোচনা :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্য ও কৈশোর কেটেছে ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বিভিন্ন অনুশাসনের মধ্যে। পরবর্তী সময়ে জমিদারী তদারকের জন্য বর্তমান বাংলাদেশের সাজাদপুর, শিলাইদহ, পতিসরে দীর্ঘ সময় কাটানোর পর রবীন্দ্র মানসিকতার আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি, মানুষ ও নিসর্গ সৌন্দর্য্য কবির সীমায়িত পরিসরকে বিস্তৃত করে তোলে। বাল্য ও কৈশোর জীবনে কবির ধর্মীয় চেতনা সম্পর্কে যে মানসিকতা ছিল পরবর্তী সময়ে তা বিবর্তন লাভ করে। উনিশ শতকের কথাসাহিত্য ও নাটকের মধ্যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে যেখানে হিন্দু জাগরণের আলোড়ন তৈরি হয়েছিল সেই রেশ রবীন্দ্র সাহিত্যের মধ্যেও কিছু কিছু জায়গায় চোখে পড়ে। উনিশ শতকের শেষদিকের দুই উপন্যাস 'বউ ঠাকুরানীর হাট'(১৮৮৩) ও 'রাজর্ষি'(১৮৮৭) উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে বঙ্কিমী প্রভাব সুস্পষ্ট। পরবর্তি সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিষয়টি উপলব্ধি করে সচেতন ভাবেই উপন্যাস থেকে সরে এসে ছোটগল্প রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর ছোটগল্প রচনার পরিসরকে উৎকৃষ্ট করেছিল পূর্ব বাংলার প্রকৃতি ও মানুষ। তাঁর বেশ কয়েকটি ছোটোগল্পে মুসলিম মানসের প্রসঙ্গটি উঠে আসে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিষয়টি উঠে এসেছে মূল ঘটনার পাশাপাশি বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সকল ধর্মের উপরে বিশ্বাস করতেন মানবধর্মকে। তিনি হিন্দু-মুসলমানকে পৃথকভাবে দেখেননি। ধর্মের আচার-ব্যবহারের দিকটিকে তিনি গুরুত্ব দেননি, গুরুত্ব দিয়েছেন মানবতাকে।

তাই তাঁর ছোটগল্পে হিন্দু নারীও যেমন মুসলমান ব্রতকে(মুসলমানীর গল্প) সহজে মেনে নিয়েছে, তেমনি নবাবপুত্রীও কঠোর সাধনার দ্বারা হিন্দু নারীতে পরিণত হয়েছে (দুরাশা)।

আমরা যদি রবীন্দ্র ছোটগল্পের নিবিড় পাঠ করে থাকি তাহলে সেখানে দেখতে পাব তাঁর বেশ কয়েকটি ছোটগল্পে মুসলিম মানসের বিষয়টি উঠে এসেছে। সেখানে আমরা দেখতে পাব, কয়েকটি ছোটগল্পে মুসলিম মানসের বিষয়টি প্রত্যক্ষ ভাবে এসেছে আবার কয়েকটি ছোটগল্পে এসেছে পরোক্ষ ভাবে। রবীন্দ্র ছোটগল্পে মুসলিম মানসের বিষয়টি প্রত্যক্ষ ভাবে এসেছে সেই সমস্ত ছোটগল্পগুলো হল- 'মুকুট' (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১২৯২), 'দালিয়া' (মাঘ ১২৯৮), 'রীতিমত নভেল' (ভাদ্র আশ্বিন ১২৯৯), 'কাবুলিওয়ালা' (অগ্রহায়ণ ১২৯৯), 'সমস্যাপূরণ' (অগ্রহায়ণ ১৩০০), 'ক্ষুধিত পাষাণ' (শ্রাবণ ১৩০২), 'দুরাশা' (বৈশাখ ১৩০৫), 'মুসলমানীর গল্প' (আষাঢ় ১৩৬২)। মুসলিম মানসের বিষয়টি পরোক্ষ অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে যেসমস্ত ছোটগল্পে উঠে এসেছে সেগুলো হল- 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' (১২৯৮), 'মণিহারা' (অগ্রাহায়ণ ১৩০৫), 'দৃষ্টিদান' (পৌষ ১৩০৫), 'শুভদৃষ্টি' (আশ্বিন ১৩০৭), 'রবিবার' (আশ্বিন ১৩৪৬), 'ল্যাবরেটরি' (আশ্বিন ১৩৪৭) প্রভৃতি। মুসলিম মানসের প্রত্যক্ষ ভাবে উঠে আসা গল্পগুলিতে শুধুমাত্র মুসলিমদের কথাই বলা হয়নি, মুসলিমদের পাশাপাশি হিন্দুদের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুই বিবদমান জাতিকে মিলিয়ে দিয়ে সম্প্রীতির বাঁধনটি শক্ত করেছেন। ধর্ম হিসাবে তিনি শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার সংস্কারের কথা বলেননি, বলেছেন ধর্মীয় খোলসের ঊর্ধ্বে মানবতার কথা। ধর্মীয় ভেদাভেদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সবসময় পীড়া দিয়েছে, তাই তিনি যখনই ভেদাভেদের প্রসঙ্গ দেখেছেন তার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা বলেছেন এইভাবে : "আমি যখন জমিদারি সেরেস্তায় প্রথম প্রবেশ করলেম তখন একদিন দেখি, আমার নায়েব তাঁর বৈঠকখানায় এক জায়গায় জাজিম খানিকটা তুলে রেখে দিয়েছে। যখন জিজ্ঞেস করলেম, 'এ কেন' তখন জবাব পেলেম, যে-সব সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় অধিকার পায় তাদের জন্য ওই ব্যবস্থা। এক তক্তপোশে বসাতে হবে অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা পৃথক। এ প্রথা তো অনেকদিন ধরে চলে এসেছে; অনেকদিন মুসলমান এ মেনে এসেছে, হিন্দুও মেনে এসেছে। জাজিম-তোলা আসনে মুসলমান বসেছে, জাজিম-পাতা আসনে অন্যে বসেছে। তার পর ওদের ডেকে একদিন বলেছি, 'আমরা ভাই, তোমাকেও আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, কারাবাস ও মৃত্যুর পথে চলতে হবে।' তখন হঠাৎ দেখি অপর পক্ষ লাল টকটকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে, আমরা পৃথক। আমরা বিস্মিত হয়ে বলি, রাস্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়। বাধা ওই জাজিম-তোলা আসনে বহুদিনের মস্ত ফাঁকাটার মধ্যে। ওটা ছোট নয়। ওখানে অকূল অতল কালাপানি। বক্তৃতামঞ্চের উপর চেঁচিয়ে ডাক দিলেই পার হওয়া যায় না।"[১] হিন্দু-মুসলমান

সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন সময়ে কবি উত্থাপন করেছেন প্রবন্ধ সাহিত্যে ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। এরপর আমরা 'দুরাশা' ও 'মুসলমানীর গল্প' গল্প দুটি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মূল আলোচনায় প্রবেশ করব।

'দুরাশা' সিপাহী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে ব্যর্থ প্রেমের গল্প। গল্পের কাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে কেশরলাল ও বদ্রাওনের নবাবপুত্রীর অপরিণত ব্যর্থ প্রেম। যে নবাবপুত্রী কেশরলালের প্রতি আকর্ষণে যুদ্ধের পরিবেশে ভাইয়ের পোষাকে ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে যুদ্ধ মুখে পতিত কেশরলালের প্রাণ বাঁচালে কেশরলাল তার পরিচয় জিজ্ঞেস করে। প্রেমাস্পদের কাছে ছদ্মবেশী নবাবপুত্রী নিজের সত্য পরিচয় প্রকাশ করলে ব্রাহ্মণ কেশরলাল তাকে মৃত্যুমুখে যবনের হাতে জল খেয়ে ধর্ম নষ্ট হয়েছে বলে কপোলদেশে আঘাত করে প্রত্যাখ্যান করে। কেশরলাল যেহেতু ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলে, তাই নবাবপুত্রী বহু সাধনার দ্বারা আচার, সংস্কারে, বিশ্বাসে নিজেকে হিন্দু ধর্মের এক সাধিকাতে পরিণত করে। নবাবপুত্রী যখন সাধনায় সিদ্ধ লাভ করে কেশরলালের দর্শন পায় তখন তার সব আশা হতাশায় পরিণত হয়। যে কেশরলাল এতদিন আচার, ব্যবহার, সংস্কারে নিজেকে সাত্ত্বিকব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়েছে সে কিনা শেষে ভুটিয়াপল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী পৌত্রপৌত্রী নিয়ে ম্লানবস্ত্রে মলিন অঙ্গনে ভুট্টা হতে শস্য সংগ্রহ করছে। গল্পের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মীয় প্রেক্ষাপটকে নিয়ে এসেছেন। চির দুই বিবদমান জাতিকে মেলানোর চেষ্টা করেছেন গল্পকার। গল্পটি রবীন্দ্র মানস চেতনার ফসল। গল্পের শুরুতেই গল্পকার বলেছেন : "দার্জিলিং গিয়া, দেখিলাম মেঘে বৃষ্টিতে দশদিক আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না, ঘরের মধ্যে থাকিতে আরো অনিচ্ছা জন্মে।"[২] গল্পকার এখানে রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। এখানে দার্জিলিং একটা অবস্থান বা পরিসর মাত্র, মেঘ বৃষ্টি হিন্দু মুসলমানের রূপক, আর ঘর হচ্ছে সুরক্ষিত জায়গা বা উত্তেজক পরিবেশকে মেনে নেওয়া এবং ঘর থেকে বেরোনোর অর্থ হচ্ছে বিষয়টি নিয়ে ভাবনা চিন্তা। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের একটা আঁচ যেমন ইঙ্গিতে বলেছেন তেমনি তার একটি সমাধানের পথও বাতলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এরপর আসি গল্পের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। গল্পকার দুরাশা গল্প লিখেছেন ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু গল্পের সময়কাল ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের। এখনপ্রশ্ন হচ্ছে গল্পকার সিপাহী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট আনলেন কেন? আমরা জানি সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ, যেখানে ভারতীয় সেনাদের কার্তুজ গরু ও শূকরের চর্বি দিয়ে তৈরি করে ব্রিটিশ সরকার একটা রণদামামার পরিবেশ তৈরি করেছিল। এই কারণে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল। চির বিবদমান দুই জাতি বিদ্রোহে সামিল হওয়ার পিছনে দুদিক থেকেই একটা স্বার্থ ছিল, সেটি হল ধর্মীয় অবনমনের দিকটি। এখানে একটি জাতির সমস্যা হলে অপরজাতি সামিল হত কিনা সে বিষয়ে কিন্তু বড় প্রশ্ন ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই স্বার্থে সামিল হওয়ার বিষয়টিকেই দুই জাতির মিলনের ক্ষেত্রে অন্তরায় মনে করেছেন। 'লোকহিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন : "যে

কারণেই হউক যেদিন স্বদেশী নিমকের প্রতি হঠাৎ আমাদের অত্যন্ত একটা টান হইয়াছিল। সেদিন আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরেই আত্মীয় বলিয়া, ভাই বলিয়া, ডাকাডাকি শুরু করেছিলাম...আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না।”[৩] মিলনের ক্ষেত্রে এই সত্যতার ভীষণ প্রয়োজন। গল্পে নবাবপুত্রী মেহেরউন্নিসাকে সামনে রেখে গল্পকার ধর্মীয় মোড়কটিকে তুলতে চেয়েছেন। সাধারণভাবে ধর্মমানে হচ্ছে, যা ধারণ করে চলি অর্থাৎ মানুষের জন্মের পর যে আচার সংস্কার বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলে। নবাবপুত্রী কেশরলালের প্রতি আকর্ষণে বহু সাধনার দ্বারা নিজেকে হিন্দু রমণীতে পরিণত করেছে। তার এই হিন্দু আদর্শে পরিণত হওয়ার পিছনে সাহস জুগিয়েছে তাদের বংশে পূর্বপুরুষের কোনো একজন এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে জোর করে বিয়ে করে এনেছিল। সেই ব্রাহ্মণকন্যা পরবর্তীসময়ে কোন আদর্শে জীবনযাপন করেছিল সে বিষয়টি গল্পে অনুপস্থিত। তবে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না, যেহেতু জোর করে বিয়ে করেছিল তাই সে যে মুসলমান আদর্শে জীবন যাপন করেছিল এটা বলাই যায়। অর্থাৎ মন না থাকলেও নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল। তাহলে এখানে দুটো বিষয় স্পষ্ট, ধর্মে রূপান্তরের ক্ষেত্রে কঠোর সাধনার প্রসঙ্গযেমন রয়েছে তেমনি অস্তিত্ব সংকটে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টিও প্রযোজ্য। অন্যদিকে কেশরলালের মধ্যে লক্ষ করা যায় ধর্মের প্রচারসর্বস্বতা এবং হৃদয়তার দিক থেকে শূন্যতা। গল্পকার যেখানে দুই বিবদমান জাতিকে মেলানোর প্রচেষ্টায় নেমেছিলেন সেখানে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। গল্পের উপসংহারে তিনি সে বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছেন: “এই সূর্যালোকিত অনাবৃত জগৎদৃশ্যের মধ্যে সেই মেঘাচ্ছন্ন কাহিনীকে আর সত্য বলিয়া মনে হইল না। আমার বিশ্বাস আমি পর্বতের কুয়াশার সহিত আমার সিগারেটের ধূম ভূরিপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া একটি কল্পনাখণ্ড রচনা করিয়াছিলাম- সেই মুসলমান ব্রাহ্মণী, সেই বিপ্রবীর, সেই যমুনাতীরের কেল্লা কিছুই হয়তো সত্য নহে।”[৪] অর্থাৎ সমসময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সূর্যালোকের মতো বাস্তব পরিস্থিতিতে হিন্দু মুসলমানের সুসম্পর্কের বিষয়টি গল্পকারের কাছে মেঘাচ্ছন্নের মতোই মনে হয়েছে। গল্পকার দুই জাতির সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তাঁর কল্পনা তথা মানস চেতনায়। কিন্তু বাস্তবে তিনি দেখেছেন সে বিষয়টি ধোঁয়া ও কুয়াশামিলে ধোঁয়াশায় পরিণত হয়েছে।

‘মুসলমানীর গল্প’ রচনাটি পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্পনয়, গল্পের খসড়া মাত্র এবং রবীন্দ্রনাথের শেষ গল্প রচনার প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ গল্পটি মুখে মুখে বললে প্রতিমা ঠাকুর তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। গল্পগুচ্ছের চতুর্থ খণ্ডে ‘গল্পের খসড়া’ আখ্যা দিয়ে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গল্পটি সমকালের অস্থির পরিস্থিতিতে একটি উৎকৃষ্ট রচনা। চল্লিশের দশকে আন্তর্জাতিক স্তরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা আর জাতীয় স্তরে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, সকলে মিলে দেশবাসী এক অস্থির পরিস্থিতির সম্মুখীন। এর পাশাপাশি ধর্মকে কেন্দ্র করেখুন, দাঙ্গা, রক্তক্ষরণ প্রভৃতি সংঘটিত হয়। ব্রিটিশ সরকার দিনদিন ধর্মীয় বিভেদকে দিয়েছে উস্কে পরবর্তী সময়ে যার ফলপ্রসূ ভারতের দ্বিখণ্ডিত

স্বাধীনতা প্রাপ্তি। ধর্মীয়বিভাজন কবিমনকে ভীষণ ভাবে নাড়া দেয়। তিনি আচারসর্বস্ব ধর্মীয় চেতনার বাহ্যিক দিকটি উপেক্ষা করে ধর্মের অভ্যন্তরীণ বিষয়টি উদঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি গল্পে কমলাকে আচার ব্যবহারে মুসলমান ধর্মে রূপান্তরিত করে বুঝিয়ে দিলেন ধর্মের আচার সর্বস্ব মূলতবাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র। যে ধর্ম মানুষকে আশ্রয় দিতে পারেনি বা মানুষকে সুস্থভাবে বাঁচতেদেয়নি, সেটা আদতে কোন ধর্মই নয়।

পিতৃমাতৃহীন রূপসী কন্যা কমলা তিন মহলার তালুকদার বংশীবদনের ঘরে আশ্রয় নেয়। কন্যাকে কাকা আশ্রয় দেওয়ার চেষ্টা করলেও কাকিমাসে বিষয়ে সায় দেয়নি। বাধ্য হয়ে কাকা বংশীবদন কমলার বিয়ের আয়োজন করে। পাত্র ঠিক হয় মোচাখালির পরমানন্দ শেঠের মেজো ছেলে। পাত্র উড়নচণ্ডী হলেও পিতার অর্থবল ও লোকবল দেখে বংশীবদন ভ্রাতুষ্পুত্রী কমলার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করে। তাদের যেমন আছে টাকার জোর, তেমনি আছে ভোজপুরি পালোয়ান। বাইরের কুদৃষ্টি থেকে সুন্দরী কমলাকে রক্ষা করতেপারবে এ ছিল কাকার বিশ্বাস।

বিয়ের পর স্বামী গৃহে যাবার পথে কমলা মুসলমান ডাকাত সর্দার মধুমোল্লার হাতে পড়ে। ডাকাত দলের আক্রমণে পাত্রসহ ভোজপুরি পালোয়ানরা ছত্রভঙ্গ দেয়। এমন সময়ে বৃদ্ধ হবির খাঁ কমলাকে উদ্ধার করে এবং নিজের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার মনস্থির করে। কমলা মুসলমানের বাড়িতে যেতে প্রথমে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়। হবির খাঁ আশ্বস্ত করে বলে, "বুঝেছি তুমি হিন্দুব্রাহ্মণের মেয়ে, মুসলমানের ঘরে যেতে সংকোচ হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো- যারাযথার্থ মুসলমান, তারা ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও সম্মান করে, আমার ঘরে তুমি হিন্দু বাড়িরমতোই থাকবে।"[৫] হবির খাঁ'র উক্তির মধ্য দিয়ে গল্পকার বুঝিয়ে দিলেন যারা 'যথার্থ' ধর্মনিষ্ঠ মানুষ তারা সকল ধর্মকে সম্মান করে চলে। কিন্তু এই 'যথার্থ' ধর্মপ্রাণ মানুষের সংখ্যা স্বল্প হওয়ায় ধর্ম নিয়ে এত বাকবিতণ্ডা। যাইহোক কমলা হবির খাঁর কথায় আশ্বস্ত হয়ে বাড়ি গেলেও থাকতে চায়নি, সে কাকার কাছে যেতে চায়। আসলে কমলা যথার্থ ধর্মনিষ্ঠ মানুষের সান্নিধ্য পায়নি বলেই এমন দ্বিধাগ্রস্ত। হবির খাঁ কমলার কথা মতোতাকে কাকার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে খিড়কির দ্বারে অপেক্ষা করে। কমলা কাকা বংশীবদনকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করলেও তাকে ঘরে তুলে নেয়নি। কাকার যুক্তি, "উপায় নেই মা! আমাদের যে হিন্দুর ঘর, এখানে তোমাকে কেউ ফিরে নেবে না, মাঝের থেকে আমাদেরও জাত যাবে।"[৬] বংশীবদনের এই উক্তি একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও যে কতটা প্রাসঙ্গিক তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরধর্মীয় রক্ষণশীলদের উদ্দেশে বলেছেন: "মানুষকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা যাহাদের অভ্যাসনহে, পরস্পরের অধিকার যাহারা সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্মভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার কাজেই ব্যাপৃত- যাহারা সামান্য স্খলনেই আপনার লোককে ত্যাগ করিতে জানে, পরকে গ্রহণ করিতে জানেনা- সাধারণ মানুষের প্রতি সামান্য শিষ্টতার নমস্কারেও যাহাদের বাধা আছে- মানুষের সংসর্গেনানা আকারে বাঁচাইয়া চলিতে যাহাদিগকে সর্বদাই সতর্ক হইয়া থাকিতে হয়- মনুষ্যত্ব হিসাবে

তাহাদিগকে দুর্বল হইতেই হইবে। যাহারা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐক্যনীতি অপেক্ষা ভেদবুদ্ধি যাহাদের বেশি, দৈন্য অপমান ও অধীনতার হাত হইতে তাহারা কোনোদিন নিষ্কৃতি পাইবে না।”[৭]হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েছেন গল্পকার।

কমলা শেষপর্যন্ত হবির খাঁ'র বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তার বাড়ির এক মহল রাজপুতানীর মহল, সেখানে হিন্দুধর্মের আচার-নিষ্ঠ পালন করা যায়। হবির খাঁ'ও নাকি রাজপুতানীর পুত্র ছিলেন। মুসলমান সাম্রাজ্যে হিন্দু আচার পালনের বন্দোবস্তের বিষয়টি আমরা ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘রাজসিংহ’ উপন্যাসের মধ্যে পাই। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের যোধপুরি বেগমেরমহলে এরকম বন্দোবস্ত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে গল্পকার এই প্রসঙ্গটির প্রেরণা পেয়েথাকতে পারেন। তারপর আকবরের সময়কাল থেকে রাজপুতদের সাথে মোঘলদের যে বৈবাহিক সম্পর্কছিল তাইতিহাস সম্মত।

কমলা হবির খাঁ'র বাড়িতে বড় হতে লাগল। যৌবনের আবেগ এসে পৌঁছালো তার দেহে। হবির খাঁ'র মেজো ছেলের সঙ্গে তার প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হবির খাঁর স্নেহছায়ায় থেকে তার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। তাই হিন্দু ব্রাহ্মণেরকন্যা হয়েও মুসলমান ছেলেকে ভালবাসতে তার বুক কাঁপলো না। ধর্মের বাহ্যিক আচার-আচরণ মানুষের স্বাধীন মানসিকতার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ধর্মের খোলস ছেড়ে তাই কমলা তারমনের কথা হবির খাঁ'কে জানিয়েছে, “ বাবা, আমার ধর্ম নেই, আমি যাকে ভালোবাসি সে ভাগ্যবানই আমার ধর্ম। যে ধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের সব ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে, অবজ্ঞার আস্তাকুড়ের পাশে আমাকে ফেলে রেখে দিয়েছে, সে ধর্মের মধ্যে আমি তো দেবতার প্রসন্নতা কোনোদিন দেখতে পেলুম না। সেখানকার দেবতা আমাকে প্রতিদিন অপমানিত করেছে সে কথা আজও আমি ভুলতে পারিনে। আমি প্রথম ভালোবাসা পেলুম, বাপজান, তোমার ঘরে। জানতে পারলুম হতভাগিনী মেয়েরও জীবনেরমূল্য আছে। যে দেবতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন সেই ভালোবাসার সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমিপুজো করি। তিনিই আমার দেবতা-তিনি হিন্দুও নন। মুসলমানও নন।”[৮]

পরবর্তী সময়ে কমলা রূপান্তরিত হয়ে ওঠে ‘মেহেরজানে’। অর্থাৎ সে তার আচারে, সংস্কারে, মননে, চিন্তনে পুরোপুরি মুসলমান হয়ে যায়। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘দুরাশা’ গল্পের মেহেরউন্নিসাকে আচারে, সংস্কারে ব্যবহারে ব্রাহ্মণ রমণী করে তুললেও কেশরলালের ঘরণী করতে পারার সাহস দেখাতে পারেননি। সেই জায়গা থেকে আলোচ্য গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দূর আশা যেমন নিকটে এসেছে, তেমনিপ্রবল সাহসও দেখিয়েছেন।

গল্পে আরেকটি বিষয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কমলা চরিত্রটি অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দেবী চৌধুরানী’ উপন্যাসের প্রফুল্লর মতো। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রফুল্লকে দেবী চৌধুরানীতে উত্তরণঘটিয়ে আবার প্রফুল্লতে রূপান্তরিত করেন অর্থাৎ গৃহীসত্তা থেকে

নিষ্কাম ধর্মে আবারসেখান থেকে গৃহীসত্তায় পুনরাবৃত্ত করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কমলা চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত হবির খাঁর ব্রতের অনুসারী হয়। যে হবির খাঁ সমস্ত দুস্থ মানুষদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্ধার করেছে, কমলাকেও একসময় দেখি তার কাকার মেয়েকে ডাকাত দলের হাত থেকে রক্ষা করতে। আলোচ্য রচনাংশটি যদিও পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্প নয়, খসড়া মাত্র তবুও তার মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। পূর্ণাঙ্গ গল্প পেলে হয়তো আরো অনেককিছু পাওয়া যেত।

আলোচনার শেষে বলা যায়, দুটি গল্পের আখ্যান ভাগ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। দুরাশা গল্পটি উনিশ শতকের শেষ দিকে লেখা এবং মুসলমানীর গল্প গল্পটি বিশ শতকের চল্লিশের দশকে। এই দীর্ঘ সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মীয় চেতনার বিবর্তনের দিকটি স্পষ্ট ভাবে লক্ষ করা যায়। প্রাক্ স্বাধীনতা থেকে আজ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান দুই বিবদমান জাতিকে নিয়ে যেভাবে ধর্মীয় ভেদাভেদের বিষবাস্প চতুর্দিক আচ্ছন্ন, সেজায়গায় রবীন্দ্রনাথের সম্প্রীতির বার্তা আমাদের নতুন ভাবে বাঁচার আশা যোগায়।

তথ্যসূত্র :

১. জাহিরুল হাসান, (সংকলিত), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলমান সমগ্র, পূর্বা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা- ১৩৪
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক ১৪২৪, পৃষ্ঠা- ৩১৯
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালান্তর, বিশ্বভারতী, কলকাতা, আষাঢ় ১৪২২, পৃষ্ঠা- ৩৭
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক ১৪২৪, পৃষ্ঠা- ৩২৮
৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৮১২
৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৮১৩
৭. জাহিরুল হাসান, (সংকলিত), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলমান সমগ্র, পূর্বা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৮১
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক ১৪২৪, পৃষ্ঠা- ৮১৩

সহায়ক গ্রন্থ :

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক ১৪২৪ ।
২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালান্তর, বিশ্বভারতী, কলকাতা, আষাঢ় ১৪২২ ।
৩) জাহিরুল হাসান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলমানসমগ্র(সংকলিত), পূর্বা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬।
৪) গোলাম মুরশিদ, রবীন্দ্রমানস ও সৃষ্টিকর্মে পূর্ববঙ্গ, অবসর, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।
৫) কঙ্কর সিংহ, বঙ্গভঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ, র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২।

৬) আমিনুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথের মুসলমান চর্চা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৯।

৭) অমিতাভ চৌধুরী, ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য প্রসঙ্গ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪২৬।

৮) ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার সাধনা হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা ভারতের সংস্কৃতি, তথাগত, কলকাতা, ২০২১।

৯) সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের দ্বন্দ্ববিরোধ, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, জুন ২০২৩।

১০) নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, বৈশাখ ১৪১৬।

১১) প্রভাতকুমারমুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনকথা, আনন্দ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২৩।

১২) আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, চারুলিপি, ঢাকা, ফাল্গুন ১৪১৮।

১৩) বুদ্ধদেব বসু, রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯।

বুদ্ধদেব গুহ-র ‘ইল্‌মোরাণ্‌দের দেশে’ উপন্যাসে মাসাই জনজীবন

গনেশ কর্মকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : আফ্রিকার বিখ্যাত উপজাতিগুলির মধ্যে একটি পশুপালক যাযাবর জনগোষ্ঠী হলমাসাই উপজাতি। কেনিয়া ও তানজানিয়ার বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে এদের বাস। মাসাইরা ‘মা আ’ ভাষায় কথা বলে, আর এই কারণেই এদের নাম মাসাই হয়েছে। প্রকৃতিপ্রেমী, ভ্রমণপিপাসু বুদ্ধদেব গুহ ‘ইল্‌মোরাণ্‌দের দেশে’ উপন্যাসে মাসাই জনজীবনের কথা তুলে ধরেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চাঁদের পাহাড়’ উপন্যাসের এই মাসাইদের কথা জানা যায়। বুদ্ধদেব গুহ’র জন্ম **১৯৩৬** সালের **২৯** শে জুন। পিতা শচীন্দ্রনাথ গুহ ও মাতা ছিলেন মঞ্জুলিকা দেবী। ‘ইল্‌মোরাণ্‌’ হল একজন মাসাই যোদ্ধা। এরাই পৃথিবীর সমস্ত আধুনিক এবং প্রাচীন মানুষদের তারুণ্যের আদর্শ। মাসাইদের ধর্মগুরু ছিলেন ‘বাটি আনি’। ‘বাটি আনি’কে ‘মা আ’ ভাষায় বলা হত লাইবন। শুধু ধর্মমত নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন দিক দিয়ে ওলাইবনের সিদ্ধান্তই ছিল শেষ কথা। মাসাইদের জীবনে গবাদি পশু ছিল বড় সম্পদ। যার যত বেশি গবাদি পশু সে তত ধনী মাসাই সমাজে। মাসাইদের রূপকথাতে আছে ‘এন গাই’ হল মাসাইদের দেবতা। ‘এনগাই’ এর তিন ছেলে ছিল। তৃতীয়ছেলের নাম ছিল ‘নাটোরোকপ’। নাটোরোকপ হচ্ছে মাসাইদের প্রথম পূর্বপুরুষ।এন গাই তার তৃতীয় ছেলেকে একটি চারণ লাঠি দিয়ে ছিল যাতে সে চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

সূচক শব্দ : ইল্‌মোরাণ্‌, মাসাই, আফ্রিকা, এনগাই, তানজেনিয়া, কেনিয়া, ধর্মগুরু, গবাদিপশু।

মূল আলোচনা:

আফ্রিকার বিখ্যাত উপজাতি গুলির মধ্যে একটি পশুপালক যাযাবর জনগোষ্ঠী হল মাসাই উপজাতি। প্রচলিত প্রযুক্তিগত সভ্যতার সন্ধান পেয়েও আফ্রিকার মাসাইগোষ্ঠী আঁকড়ে ধরে রেখেছে তাঁদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি। কেনিয়া ও তানজেনিয়ার বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে এদের বাস। মাসাইরা প্রাথমিক ভাবে বাস করত দক্ষিণ সুদানে তারা বরাবরি যাযাবর জীবন যাপন করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে উর্বর জমির খোঁজে তারা ঘুরতে ঘুরতে বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থানে পৌঁছায়। মাসাইরা যে ভাষায় কথা বলে সেটি হল ‘মা আ’। এই কারণে মাসাইদের নাম মাসাই হয়েছে। জনসংখ্যার দিক থেকে

বর্তমানে মাসাই জনজাতির সংখ্যা প্রায় বারো লক্ষ। ইউরোপিয়ানদের মধ্যে নর্ম্যান লের্স প্রথম মাসাইদের দেশে গিয়ে পৌঁছোন। ১৯২৫ সালে তিনি 'কেনীয়া' শীর্ষক একটি বই লিখেছিলেন। তাতে লেখেন- "শারীরিক দিক দিয়ে মাসাইরা মানবজাতির মধ্যে সুন্দরতম জাত। তাঁদের ছিপছিপে গড়ন, তাদের ছিপছিপে হাড়। সুঠাম মেদহীন পশ্চাৎদেশ এবং কাঁধ সুগোল, সুডোল মাংসপেশী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনো তুলনাই চলে না।" বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসেও মাসাইদের কথা জানা যায়। প্রকৃতি প্রেমিক, ভ্রমণপিপাসু বুদ্ধদেব গুহও 'ইল্‌মোরাণ্‌দের দেশে' উপন্যাসে মাসাই জনজীবনের কথা তুলেধরলেন। কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশনের শিশুমঙ্গল নামে যে সেবা প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে সেখানে বুদ্ধদেব গুহ-র জন্ম। সময়টি ছিল ১৯৩৬ সালের ২৯ জুন শনিবারের এক বর্ষার রাত। মা ছিলেন মঞ্জুলিকা দেবী ও বাবা শচীন্দ্রনাথ গুহ।

মাসাই উপজাতির উৎপত্তি নিয়ে এবং তাদের পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাস ধোঁয়াশাতেই আছে। এখনও নিশ্চিত সত্য জানা যায়নি। অনেক বিজ্ঞানীর ধারনা যে মাসাইরা মূলত 'নিলোটস্' এবং 'হামিটস্'দের বর্ণসঙ্কর উপজাতি। ১৮৪০ খ্রী: লন্ডনের চার্চ মিশনারী সোসাইটির দুজন জার্মান সদস্য এসে পৌঁছোন মাসাইদের দেশে। তাঁদের দুজনের নাম হলো ডঃ লুড্‌উইগ্ ক্র্যাপফ এবং রেভারেন্ড জন রেব্‌ম্যান। 'ট্রাভেলস্ রিসার্চেস অ্যান্ড মিশনারী লেবারস্' নামে একটি বই লেখেন ডঃ ক্র্যাপফ। এই বইয়ে মাসাইদের সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে সম্ভবত সেটিই হলো মাসাইদের প্রথম লিপিবদ্ধ বর্ণনা। ডঃ ক্র্যাপফ লিখেছেন-"মাসাইরা দুধ, মাখন, মধু খায়। কালোগরুর, ছাগলের এবং ভেড়ার মাংস খায়। তাঁদের সবরকম কৃষিকর্মের প্রতিই গভীর অসূয়া আছে। তারা বিশ্বাস করে যে, প্রাণ ধারণের জন্য খাদ্য শস্যের উপর নির্ভর করলে মানুষ দুর্বল হয়ে যায়। ঐরকম খাদ্যের অভ্যাস শুধুমাত্র পাহাড়ী উপজাতিদের পক্ষেই সম্ভব।"

ডঃ ক্র্যাপফ্ অথবা রেভারেন্ড জন রেব্ ম্যানও কিন্তু মাসাই রাজ্যের বিশেষ অভ্যন্তরে ঢুকতে পারেন নি। তবে ব্রিটিশ রয়্যাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির সদস্য যোশেফ থম্‌সন্ তিনিই প্রথম মাসাইদের দেশের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত যেতে পারেন। তিনি একটি বই লেখেন আঠারশো পঁচাশিতে বইটির নাম 'থ্রু মাসাই ল্যান্ড'। থম্‌সন্ সাহেব তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন মাসাইরা সাংঘাতিক ভয়াবহ এক উপজাতি। তাঁর নিজের পৈত্রিক প্রাণটিও একটুর জন্য যে চলে যেতে বসেছিল মাসাইদের কল্যাণে সেটিও তাঁর বইতে উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে মাসাইদের প্রতি শ্রদ্ধাও প্রকাশ করেছেন থম্‌সন্ সাহেব। তিনি লিখেছেন- "আম্বোসেলি ছিল মাসাইদের দেশ। বীর যোদ্ধাদের দেশ। অভিজাতদের দেশ। তারা পশুরক্ত এবং দুগ্ধপায়ী। তাদের হাতে থাকে লম্বা লম্বা বল্লম। গভীর শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে আমি চেয়ে থাকতাম এই মরুভূমির সন্তানদের দিকে যখন স্বাভাবিক স্বচ্ছতোয়া ভাষায় এবং ভঙ্গীমাতে তারা কথা

বলত ঋজু-শরীরে আমার সামনে সটান দাঁড়িয়ে। তাদের আচরণে একধরনের গাম্ভীর্য মর্যাদা এবং সম্ভ্রান্ততাও মাখা হয়ে থাকত; যা অত্যন্তই প্রশংসার্হ।”

বুদ্ধদেব গুহ তাঁর ‘ইল্‌মোরাণ্‌দের দেশে’ উপন্যাসে যে মাসাই জনজীবনের কথা তুলে ধরেন সেটিই হল এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ‘ইল্‌মোরাণ্‌’ হল মাসাই যোদ্ধা। ইল্‌মোরাণ্‌রাই পৃথিবীর সমস্ত আধুনিক এবং প্রাচীন মানুষদের তারুন্যের আদর্শ। আমাদের দেশের বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন কুলপুরোহিতদের নাম পাওয়া যায় যেমন ওঁরাও উপজাতির কুলপুরোহিতদের নাম ‘পাহান’, সুন্দরবনের জেলে, মৌলে, বাউলদের যেমন দোয়ালী, ঠিক তেমনই মাসাইদের ধর্মীয় কুলপুরোহিত ‘বাটিআনি’। ‘বাটিআনি’ ছিলেন একচক্ষু তিনি জন্মে ছিলেন একটি মাত্র চোখ নিয়ে। সাধারণত মাসাইদের কুলপুরোহিতদের ‘মা আ’ ভাষায় বলা হতো ‘লাইবন’। মাসাই সমাজে ধর্মগুরু লাইবনের প্রভাব ছিল সুদুর প্রসারী। শুধু ধর্মমত নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন দিক দিয়েও লাইবনের সিদ্ধান্তই ছিল শেষ কথা। মাসাইদের ধর্মগুরু ‘বাটি আনির’ দুটি স্ত্রী ছিল। সেই দুই স্ত্রীরই একটি করে ছেলে ছিল। বড় ছেলের নাম ছিল সেনেটু এবং ছোটো ছেলের নাম ছিল লেনেনা। ‘বাটি আনির’ মৃত্যুর পর দুই ছেলের মধ্যে মতান্তর ঘটে। এতে মাসাইরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় নিজেদের মধ্যে রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধে মেতে উঠে। এই যুদ্ধের সুযোগ নেই ব্রিটিশরা তারা ‘লেনেনার’ প্রতি দরদের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তার পক্ষ নেই। তাদের সর্বাত্মক নীতি ছিল ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’। আসলে ব্রিটিশরা মাসাইদের কোনো হিত তারা চাইনি। তারা চেয়েছিল মাসাইদের চারণ-ভূমির দখল করে মাসাইদের পদানত করে রাখা। পরে যখন মাসাইরা বুঝতে পারলো তখন তারা দেরিতে হলেও দুই পক্ষ একত্রিত হয়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করলো। কিন্তু সেই যুদ্ধে অসংখ্য মাসাই প্রাণ হারালো।

‘ইল্‌মোরাণ্‌দের দেশে’ উপন্যাসে, মাসাই জনজাতির পুরুষদের তিনটি প্রধান ভাগ দেখা যায়। প্রথমটি শৈশবাবস্থা, দ্বিতীয়টি যোদ্ধাবস্থা; তৃতীয়টি হল বৃদ্ধাবস্থা। আমাদের দেশে মায়েরা শিশুকালে ছেলেকে ঘুম পাড়ানোর জন্য কিছু লোকগান গাইতেন ‘ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে’ এবং বিভিন্ন জুজুবুড়ির, ভূতের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াত আমাদের। শিশুকাল থেকেই নানা রকম কাল্পনিক চরিত্রের কথা আমাদের অবচেতনে শিশুকাল থেকেই শিকড় গেড়ে যেতো। কিন্তু মাসাই মায়েরা তাদের শিশুদের কখনই ভয় না দেখিয়ে পরম বীরের মতো করে বড়ো করে তোলে। বীরত্ব আর অসীম সাহসের গল্প বলে। মায়েরা গায়-

“এনগোনীয়াকোনীয়া
ইয়াআ ইন্‌গিক্‌ আড়্‌লো
টাবানা কোসেরেক্‌
টাবানা ওল্‌ডোওনিও ওইবর্‌,

টানাপা মিনীই এন্‌গুটুনি।"[১]

গানটির মানে হল-

শিশু আমার!
বড় হয়ে ওঠো।
বড় হয়ে ওঠো, আমার সোনা।
পর্বতের মতো বেড়ে ওঠো তুমি,
মাউন্ট মেরুর মতো, মাউন্ট কেনীয়ার মতো বড়ো হও।
বড় হও মাউন্ট কিলিম্যান্‌জারোর মতো।
বড় হয়ে মা-বাবাকে সাহায্য করো, বল-ভরসা, হও তাদের।

সেই শিশুরা হাটতে শিখলেই মাসাই মায়েরা তাদের 'ক্রাল'- এর সামনে শিশুর হাত নিজের দুহাতে আদরে উপরে তুলে তাদের হাতে হাত ধরে হাঁটা শেখায়, গান গায়-

"টাডেটু ডোটু এন গীনিয়াই আয়া আই
টাডেটু ডোটু এন গীনিয়াই আয়াইনি আয়াইনি
মাপীপো টেটেআই মাপীপে টেটে আই"[২]

এই গানের মানে হল-

হাঁটোতো! হাঁটো! হাঁটো!
আমার ছোট্ট খোকন হাঁটো। চলো,
হাঁটি আমরা। আস্তে, আস্তে হাঁটি, আস্তে আস্তে।

আজকালকার বাব মায়েরা যেমন তারা তাদের নিজেদের উপর ছেলে মেয়েদের মানুষ করার দায়িত্ব নেই, তবে মাসাই ছেলে মেয়েদের মানুষ করার দায়িত্ব তাদের সমাজের উপর। শিশুরা তাদের বাবার বয়সী সকলকেই বাবা বলে ডাকে আর মায়ের বয়সীদের কেও মাই্‌ বলে। মাসাই ছেলে মেয়েদের ছোটোবেলা থেকেই ছাগল-ভেড়া চরানো দিয়ে শিক্ষানবিশী শুরু হয়। একটু বড়ো হলেই ছেলেরা চারণ লাঠি নিয়ে গরু চরাতে যায় বড়োদের সঙ্গে, সাত-আট বছর বয়স হলেই তাদের সকলের ডান কানের লতিতে মস্ত বড় একটা ফুটো করে দেওয়া হয়। কানের লতির ফুটো যার যত বড়ো হয় সে মাসাই সমাজে তত সুন্দর বলে বিবেচিত হয়। মাসাই মেয়েরা ঋতুমতী হলেই অন্য মেয়েদের বা ঐ বয়সী ছেলেদের সঙ্গে না মিশে তখন তারা তরুন যোদ্ধাদের মনোহরণ করতে সচেষ্ট হয়। তবে মাসাই সমাজে তরুন যোদ্ধারা যতদিন প্রাথমিক স্তরে থাকে ততদিন তাদের বিয়ে করা মানা। কিন্তু বাধা বন্ধনহীন যৌন জীবনে অধিকার থাকে তাদের প্রত্যেকের। ছেলে বা মেয়ে উভয়েরই সঙ্গমে মানা নেই। আসলে সঙ্গম ব্যাপারটার মধ্যে কোনো অন্যায় বা পাপবোধ নেই মাসাই সমাজে। ছুন্নৎ অনুষ্ঠান মাসাই ছেলে ও মেয়েদের জীবনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। ছুন্নৎ এর 'মা আ' প্রতি শব্দ হচ্ছে 'এমোরাটা'। মাসাই ছেলেদের যোদ্ধাবস্থাতে যাওয়ার আগেই প্রত্যেক ছেলেকে ছুন্নৎ করতে হয়। মেয়েদের ছুন্নৎ করা হয় বিয়ের আগে। এই ছুন্নৎ নিয়ে মাসাই ছেলেরা

নানা রসিকতাকরে। যার ছুন্নৎ হবে তার বন্ধুরা আগের দিন রাতে তাকে রাগায়, খেপায়। যাতে সে কোনো ক্রমেই পরদিন যন্ত্রনায় কাতর হয়ে না পড়ে। তারা বলে-

> "ওরে ভীরু তোর জন্য থাকবে ধূসর রঙহীন সব পাখিরা।
> আর যে সাহসী তার জন্য থাকবে লাল ডানা ট্যুরাকো পাখি
> আর সবুজ লাল বার্ডস্‌রা।"[৩]

পূর্ব-আফ্রিকার ঠিক যে অঞ্চলে মাসাইদের বাস সেখানে দুটি ঋতু দেখা যায়। এই দুটি ঋতুর নাম হল 'আলারি' ও 'আলিমেই'। 'আলারি' হল বর্ষা, আর 'আলিমেই' হল শুখা বা খরা। বর্ষাকালটা শুরু হয় নভেম্বর মাস নাগাদ আর শেষ হয় মে মাসে। মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আবহাওয়া শুকনোই থাকে। তবে গোচারণে জীবিকা নির্বাহী এই মাসাই উপজাতি, তাদের জীবনে বর্ষার ভূমিকা কৃষিজীবীদের মতো। বর্ষাতে যখন প্রান্তরে প্রান্তরে পাহাড়ে গায়ে, দোলাতে লাল এবং খয়েরী ভারী আকরিক মাটি ঢেকে যায় চাপ চাপ গাঢ় সবুজ ঘাসে। তখন মাসাইরা খুশিতে ডগমগ হয়। তাদের গবাদি পশুর নাক সুড় সুড় করে ওঠে অনাগত ঘাসের গন্ধে, জিভে জল আসে। বর্ষাতে কিলিম্যানজারো মাউন্ট কেনীয়া এবং মাউন্ট মেরুর পটভূমিকে মেঘের ছায়ার পড়া তৃণভূমির চেহারাটাকে অন্যরকম দেখায়। এই সময় সমগ্র হ্রদে হ্রদে বক, সারস, ফ্লেমিংগোদের মেলা বসে যায়। হাজার হাজার মিশ্র বন্য পশুর মাথার উপর শকুন অড়ে মৃত এবং মৃত প্রায় দুর্বলদের খোঁজে। মাসাইরা বাতাসের গন্ধ নিয়ে বুঝতে পারে যে এবার তাদের পবিত্র গবাদি পশুদের নিয়ে নতুন ঘাসের রাজ্যে বেরিয়ে পড়ার সময় এসেছে। তবে তারা এই বর্ষার সুখ বেশিদিন উপভোগ করতে পারেনা। সুখাদিন আবার ফিরে আসে পা পা করে।

মাসাইদের জীবনে গবাদি পশুই হল তাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যার যত গবাদি পশু সে তত ধনী। যার পঞ্চাশটির কম পশু সে মাসাই সমাজে গরীব বলে বিবেচিত হয়। গবাদি পশু সম্পর্কে একজন মাসাই সুন্দরী তার যুবক, সুপুরুষ, সুন্দর মুখের দীঘাঙ্গ যোদ্ধা- প্রেমিককে উদ্দেশ্য করে গান গাই। গানটি হল-

> "মী ওসিংগোলিও কিসিয়াজে নেমী এঙ্গোপিরে নাট্রি এল্‌পাটি্‌ট, কিসিয়াজে ইল্যুইটং ওসেরু লাআলারাম্‌ ওনারি ইরেপেটা।"[৪]

যার মানে হল, "নাগর হে! তোমার নাচ দেখেও ভুলিনি, তোমার ঝাঁকড়া কালো চুলে গোঁজা উটপাখির কালো পালকের উড়ান্‌-নাড়ান্‌ দেখেও নয়; ভুলেছিলাম, তোমার গবাদি-পশুর বিরাট দলটি দেখেই, যে- দল বন বাদাড় ভেঙ্গে দুর্বা মাড়িয়ে দুর্বার গতিতে পথ চলে, যারা অরন্য গভীরের বন-পথকে পরিচ্ছন্ন করে রাখে। আমার আসলে প্রশংসা তাদেরই জন্যে।"

মাসাই পুরুষদের জীবনে প্রধান উৎসব বা অনুষ্ঠান হল চারটি। প্রথমটি হচ্ছে 'আলামাল লেঙ্গিপাআটা' এটি ছুন্নৎ করার কিছু দিন আগে এই অনুষ্ঠানটি হয়। দ্বিতীয়টি

‘এমোরাটা’ এটি হল আসল ছুন্নৎ অনুষ্ঠান যা মাসাই পুরুষ যোদ্ধা জীবনে অভিষিক্ত করে। তৃতীয়টি হল ‘ ইলমোরাণ্’ এই সময় মাসাই পুরুষরা তরুণ যোদ্ধাতে পরিণত হয়। মাসাইদের জীবনে ‘ইলমোরাণ্’রা এক আশ্চর্য আসন দখল করে। চতুর্থটি হল ‘ইউনাটো’ এই সময় তরুণ যোদ্ধার জীবনের পর শুরু হয় বয়স্ক যোদ্ধার জীবন। এটি হল মাসাইদের সমাজে পুরোপুরি বৃদ্ধ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার উৎসব।

মাসাইদের প্রধান জীবিকা হল পশুচারণ। মাসাইদের রূপকথাতে আছে যে এনগাই হল মাসাইদের দেবতা। এই এনগাই এর তিন ছেলে ছিল। সেই তিন ছেলেকে এনগাই তিনটি উপহার দিয়ে ছিলেন। প্রথম ছেলে পেয়েছিল তীর ধনুক যাতে সে শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। দ্বিতীয় ছেলেকে এনগাই দিয়ে ছিলেন একটি শাবল। যাতে সে চাষাবাদ করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। আর তৃতীয় জনকে তিনি দিয়েছিলেন একটি চারণ লাঠি যাতে সে পশুচারণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। এনগাই এর তৃতীয় ছেলেটির নাম ছিল ‘নাটোরো কপ্’ এই নাটোরোকপ্ই হচ্ছে মাসাইদের প্রথম পূর্ব পুরুষ। সেই থেকেই মাসাইরা তাঁদের পশুচারণ বৃত্তি নিয়ে এক আশ্চর্য স্বাধীন, প্রায় যাযাবর গঠিত জীবন যাপন করে আসছে। অন্যান্য অনেক আদিবাসীদের কাছে অরণ্য যেমন মা ঠিক তেমনই মাসাইরা বিশ্বাস করে যে মাটি হল তাদের মা। তায় তারা মাটির উপর কোদাল বা শাবল দিয়ে আঘাত করে না। তারা পশুচারণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। মাসাই যোদ্ধাদের মধ্যে একটি গান অনেক সময় শোন যায়-

> “ঈশ্বর! তুমি আমার সঙ্গে চলো। আমি যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছি। ওহে শিকারী পাখি; মাংসাশী; তুমিও সঙ্গে চলো। এইজন্যেই তোমাকে সঙ্গে যেতে বলছি কারণ আমি যুদ্ধে মরলে তুমি আমাকে খেতে পারবে। আর আমি যদি বেঁচে যাই তবেও যার সঙ্গে আমার যুদ্ধ সে তো মরবেই। একজন না একজন মরবেই। আমাদের মধ্যে একজন তো তোমার খাদ্য হবেই। চলো, শিকারী পাখি, ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে, তুমিও সঙ্গে চলো আমার।”[৫]

সব বিয়ের মতোই মাসাইদের বিয়েতেও নানা বর্নাঢ্য অনুষ্ঠান হয়। মাসাইদের সম্পত্তি বলতে গবাদি পশু। পণ বলতে তাই-ই। তবে পণটা সামাজিক রীতি। সাধারণত মাসাইদের বিয়ের সময় পণ হিসাবে পাঁচটা পশু দিতে হয় ছেলেদের ও মেয়ের বাড়ি থেকে। তার সঙ্গে দিতে হয় দুটো গাভীন না হওয়া গাই, একটা অল্প বয়সীও বলদ, একটা পুরুষ ভেড়া, একটি মেয়ে ভেড়া, তামাক, মধু আর দুটো ভেড়ার চামড়া। মাসাইদের মেয়েরা বিয়ের সময় খুব ঘটা করে সাজে। সেই সাজাকে বলে ‘ইসেন্দকেনেক ওলকিটেঙ্গ’। আসলে বিয়ে ব্যাপারটা অবশ্য অতি সরল সাদা। বিয়ের সময় কনের মাথাটি ন্যাড়া করে তাতে জম্পেস করে ভেড়ার চর্বি মাখানো হয়। তারপর মাথায় নানারকম রঙিন পাথরে মালা পরনো হয়। সমাজে কাউকে থুতু মারা অপমান

জনক হলেও কেনিয়ার মাসাই উপজাতি থুতু দিয়ে অতিথি বরণ করে। বিয়ের দিন পিতা তার মেয়ের কপালে থুতু ছিটইয়ে দেয়। মাসাই সমাজে একাধিক বিয়ে করার প্রথা আছে, তারা মনে করে যে একজন মাসাই তার যদি খাওয়াবার ক্ষমতা থাকে সে যতজন খুশি স্ত্রী রাখতে পারে। তবে এই স্বাধীনতা শুধু এক তরফের নয় বরং স্ত্রীদেরই বেশি। প্রথম বিয়ের পর বউকে বরের 'ক্রাল'-এর ডানদিকের জায়গায় বাড়ি করে দেওয়া হয়। আর পরের বউ এলে তাকে বাঁদিকে বাড়ি করে দেওয়া হয়। কারণ মাসাই সমাজে সুয়োরানী-দুয়োরানী প্রথা আছে। মাসাই সমাজে স্বামীর মতো হুবহু দেখতে সন্তান থাকাটা খুবই গর্বের ব্যাপার। মাসাইসের কাছে ডিভোর্স ব্যাপারটা প্রায় অজানা। তারা বিয়ের বন্ধনকে খুব সম্মান করে এবং এই স্বাধীনতা দুই পক্ষের। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দু-পক্ষের মধ্যে যে দোষী হয় তাঁকে 'ক্রাল'- এর বড়োরা শাসন করে। স্ত্রী যদি দোষী হয় তাকে বকুনি অথবা মার দেওয়া হয় আর স্বামী যদি দোষী হয় তাহলে তাকে সাবধান করে দেওয়া হয়। আর এতেও যদি সমস্যা না মেটে তাহলে স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর স্বামী বিয়ে করার সময় মেয়ে পক্ষকে যে পণ দিয়েছিল তা ফেরত দিতে হয় স্বামীকে। তবে স্বামীর ঔরসে যদি ঐ স্ত্রীর গর্ভে ছেলে মেয়ে হয়ে থাকে তাহলে আর সেই পণ ফেরত দিতে হয় না। কিন্তু ছেলে মেয়েরা স্বামীর সম্পত্তি হয়ে যায়। মাসাই সমাজে গবাদি-পশুর মতো সন্তানও অত্যন্ত মূল্যবান সম্পত্তি।

মাসাইদের মেয়েরা সব দেশের মেয়েদের মতো ছেলেদের চেয়ে বেশি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। এর কারণ হল মাসাই সমাজে ছেলেমেয়ে খুব দামী, তাই সন্তানহীনা রমণীদের দুঃখ খুব বেশি। একজন বন্ধ্যা রমনীর প্রার্থনা-

> "আমি আদিগন্ত সাভান্নাহ্ তৃণভূমির মধ্যে একা একা ঘুরে বেড়াই সঙ্গীহীন। সিংহ আমাকে দেখে গর্জন করতে ওঠে। কালো-কেশরের সিংহ গর্জন করে। কেশর-হীন সিংহও গর্জন করে ওঠে। কালো-কেশরের সিংহ গর্জন করে। আমি সেই বহুবর্ণার কাছে প্রার্থনা করি, হে ঈশ্বর! আমাকে একটি সন্তান দাও তাহলে অন্যদের মতো আমিও ঘরে থাকতে পারি নারীর মতো নারী হয়ে তাহলে আমাকে আর এমন করে একা একা আদিগন্ত তৃণ-ভূমির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে হয় না।"[৬]

সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মাসাইদের ভবিষ্যৎ অতি সঙ্কটে। টেপিটিট্ ওলে সাইটোটি তিনি একজন ফরাসী মহিলার সঙ্গে মিলে মাসাইদের উপর একটি বই লিখেছেন বইটির নাম 'মাসাই'। সাইটোটির মতে পৃথিবী বদলে যাচ্ছে অবিরত যেখানে আধুনিক সভ্যতা, শিক্ষা, চিকিৎসাশাস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, মোবাইল, কম্প্যুটার মানব জীবনের এক অন্যমাত্রা এনে দিয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মাসাইরা 'এনগাই' এর দয়াতে

বল্লম দিয়ে সিংহ শিকার করে নিজেদেরকে বীর বলে বিবেচিত হওয়াটা মুর্খামি ছাড়া আর কিছু নয়। যেখানে কৃষিজগতে বিপ্লব এসেছে। এসেছে পশুপালনেও। তাই এই সময়ে পুরোনো বিশ্বাস, রীতিনীতি এবং ঐ অন্ধকার জীবন আঁকড়ে থাকেলে মাসাই উপজাতি একদিন পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পূর্ব আফ্রিকার ব্রিটিশরা মাসাইদের সন্দেহ ও বিরূপতার চোখে দেখে এসেছে। ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকার উপনিবেশের গভর্নর স্যার চার্লস এলিয়ট লিখে গিয়েছিলেন যে 'মাসাইদের আমি পুব আফ্রিকায় সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং প্রধান উপজাতি বলে মনে করি। এবং এদের বাগে রাখবার জন্যেই আমাদের যথেষ্ঠ শক্তিশালী একটি সেনাবাহিনী রাখতে হবে। সে অঞ্চলে যেখানে তাদের বাস সেই অঞ্চলে।' চার্লস এলিয়ট মাসাইদের সবচেয়ে উর্বর চারণভূমি থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পূর্ব আফ্রিকা থেকেও ব্রিটিশরা চলে যাবার পরও মাসাইদের সঙ্গে স্বাধীন কেনিয়ান সরকার আদৌ ভালো ব্যাবহার করেনি। সেখানকার তানজেনীয়ান সরকারও নয়।

তথ্যসূত্র:-

১. 'ইল্‌মোরাণ্‌দের দেশে', বুদ্ধদেব গুহ, প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৮৮, প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা.২২

২. তদেব, পৃষ্ঠা.২৪

৩. তদেব, পৃষ্ঠা.২৬

৪. তদেব, পৃষ্ঠা.৩৬

৫. তদেব, পৃষ্ঠা.৫৬

৬. তদেব, পৃষ্ঠা.৬৪

ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটে সদানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতীর সৃষ্টিতত্ত্ব

তপন রুইদাস
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ,
ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান

সারসংক্ষেপ : আমার এই গবেষণা মূলক আর্টিকেলে আলোচ্য মূল বিষয় হল ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটে সদানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতী কীভাবে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যার প্রতি আলোকপাত করেছেন তা বিচারপূর্বক বিশ্লেষণ করা এবং সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় কর্তা কে? তা জড় না চেতন? জাগতিক কি কি মৌলিক উপাদানের উৎপত্তি হয়েছে তা প্রতিপাদন করাই হল মূল উদ্দেশ্য। সদানন্দ যোগীন্দ্র মতে, সৃষ্টির মূল কারণ অবিদ্যা বা মায়া। যার কারণে প্রকৃতপক্ষে, সৃষ্টি মিথ্যা। কারণ এই সৃষ্টিকারী মায়াশক্তি পারমার্থিক দৃষ্টিতে নিজে অনির্বচনীয় মিথ্যা। তবে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সৃষ্টি সত্য। তাই তিনি বলেছেন, ব্রহ্ম মায়া উপাধি যুক্ত হলে সমষ্টি অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য থেকে সৃষ্টি শুরু হয়। এই সমষ্টি অজ্ঞান উপহিত চৈতন্যকেই ঈশ্বর বলা হয়। সুতরাং ঈশ্বর হলেন সৃষ্টি কর্তা। ঠিক এই কারণে তাঁকে নিমিত্ত কারণ বলা হয়। তবে যেহেতু অজ্ঞান ঈশ্বরের শরীর, সেই শরীর দিয়েই জগত প্রপঞ্চ সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু ঈশ্বরকে উপাদান কারণও বলা হয়। আর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় জাগতিক মৌলিক উপাদান হিসাবে উৎপত্তি শুরু হয় সূক্ষ্ম ভূতের। পর্যায়ক্রমে উৎপত্তি হয় সূক্ষ্মশরীর, স্থূল ভূত, পঞ্চকোশ ও স্থূল শরীরের।

সূচক শব্দ : চৈতন্য, অজ্ঞান, অসৎ, প্রস্থান, অখিলাধারম্, কোশ, অদ্বৈত, অবয়ব, প্রাণ, সমষ্টি, ব্যষ্টি, সৎ, অখণ্ড।

ভূমিকা :

সদানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতী হলেন একজন অদ্বৈত বৈদান্তিক। তিনি অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের দার্শনিক ভাবধারার প্রতি যত্নবান ছিলেন। প্রচলিত মতে, আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁর আবির্ভাব হয়ে ছিল। 'বেদান্তসিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ' 'বেদান্তসার' ও 'শঙ্করবিজয়' নামে প্রভৃতি খ্যাতিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তবে উল্লেখিত গ্রন্থের মধ্যে 'বেদান্তসার' গ্রন্থটি পণ্ডিত মহলে অতি সমাদর পেয়েছিল। যা অদ্বৈত বেদান্তদর্শনের একটি উৎকৃষ্ট প্রকরণ গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে তিনি মূল বিষয় সম্পর্কে বলেছেন- "জীব ব্রহ্মৈক্যং শুদ্ধ চৈতন্যং"[১] অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ শুদ্ধ চৈতন্যই বেদান্তের তাৎপর্য। সুতরাং তিনি অদ্বৈতভাবকেই প্রকাশ করেছেন। আমি মূলত এই অদ্বৈতবাদী সদানন্দ যোগীন্দ্রকে অনুসরণ করেই জগত সৃষ্টির আদি রহস্য বা

সৃষ্টিতত্ত্বকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি প্রদত্ত গবেষণা মূলক আর্টিকেলে। কীভাবে সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে? কি কি জাগতিক উপাদানের উৎপত্তি হয়েছে? সৃষ্টিকর্তা কে? তা জড় না চেতন? প্রভৃতি জিজ্ঞাসুর মধ্য দিয়ে আমি প্রদত্ত বিষয়টি উপস্থাপনা করেছি।

সাধারণত, প্রচলিত মত অনুযায়ী ভারতীয় দর্শনের আঙিনায় সৃষ্টির আদি রহস্য বা সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে কম বেশি আলোচনা হয়ে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। বিশেষ করে, চার্বাক, সাংখ্য ও বেদান্ত প্রভৃতি মত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চার্বাক সম্প্রদায় মতে, ক্ষিতি, অপাদি প্রভৃতি চারটি জড়ভূত থেকে জগতের উদ্ভব। যেমন ঋষি বৃহস্পতি ঋকবেদের দশম মণ্ডলে (৭২ সূক্ত) বলেছিলেন- “অসতঃ সদজায়ত”[২] অর্থাৎ অসৎ বা অচেতন হতে চেতনের উৎপত্তি। এছাড়া নাগোজি ভট্ট বলেছেন- “অসৎ জড়বর্গঃ সৎ চৈতন্যবর্গঃ।”[৩] সুতরাং জড়স্বভাবই সৃষ্টির মূলকারণ। সাংখ্য দর্শনে মহর্ষি কপিল যেমন দেখিয়েছেন প্রকৃতিই প্রধান। সত্ত্ব, রজ ও তম তিনটি গুণের ক্রিয়ায় অব্যক্ত প্রকৃতিই ব্যক্ত রূপে অর্থাৎ জগতরূপে বিকশিত হয়েছে। জড় অচেতন প্রকৃতিই জগতের মূলকারণ। অন্যদিকে, বেদ ও উপনিষদের ভিত্তি স্বরূপ বেদান্ত দর্শনের ভাবধারা ভিন্ন স্রোত বহন করে চলেছে। কারণ তাঁরা জড় অপেক্ষা চৈতন্যকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ফল স্বরূপত চৈতন্য জগত কারণ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আসলে এই ধারণা পোষণ করার বড় ভূমিকা রয়েছে বেদান্তের প্রস্থানত্রয়ের। শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায় প্রস্থানে চৈতন্যকেই মূল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শ্রুতি প্রস্থান অর্থাৎ তৈত্তিরীয় উপনিষদে(৩/১/১) উল্লেখিত হয়েছে- “যতো বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জিবন্তি, যৎ প্রয়ন্তি অভিবিশন্তি”[৪] অর্থাৎ এই সমস্ত ভূত যার থেকে সৃষ্টি হয়, যাতে স্থিত হয় এবং যাতে সম্যক রূপে লয়প্রাপ্ত হয় তিনি হলেন ব্রহ্ম। স্মৃতি প্রস্থান শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলা হয়েছে- “অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে”[৫](১০/৮), বীজং মাং সর্বভূতানাং”[৬](৭/১০) অর্থাৎ আমি(ঈশ্বর) সকল সৃষ্টির কারণ, আমাকে (ঈশ্বর) সমস্ত ভূতের বীজ বলে জানবে। ন্যায় প্রস্থান ব্রহ্মসূত্রে উল্লেখিত আছে “জন্মাদ্যস্য যতঃ”[৭] অর্থাৎ ব্রহ্মই হল জগতের সৃষ্টিকর্তা, স্থিতিকর্তা ও লয়কর্তা। এছাড়া অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্কর “ঈক্ষতের্নাশব্দম্”[৮] এই ব্রহ্মসূত্রটির দ্বারা তাঁর ‘শঙ্করভাষ্যে’ বলেছিলেন- জগত সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম- মায়া উপাধি যুক্ত সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান হয়ে ঈক্ষণ করেছিলেন। এখানে ‘ঈক্ষণ’ শব্দের অর্থ চিন্তন বা সংকল্প। অদ্বৈত বৈদান্তিক সদানন্দ যোগীন্দ্রও শঙ্করাচার্যকে অনুসরণ করে মায়া উপাধি যুক্ত চৈতন্যকে জগত সৃষ্টির কারণ বলেছেন। এই মায়া বিশিষ্ট চৈতন্যই ঈশ্বর রূপে গৃহীত হয়েছেন। তিনি বলেছেন- “অখিলাধারম্”[৯] এই উক্ত বাক্য দ্বারা স্বভাবতই চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকেই সৃষ্টির কারণ রূপে প্রতিপাদিত করেছেন। এছাড়া তিনি যখন ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে লক্ষণ দিয়েছেন, সেই লক্ষণে উল্লেখ আছে যে, “ইয়ং সমষ্টিঃ উৎকৃষ্টোপাধিতয়া

বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা। এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্বজ্ঞত্ব- সর্বেশ্বরত্ব সর্বনিয়ন্তৃত্বাদি গুণকম্ অব্যক্তম্ অন্তর্যামী জগৎকারণম্ ঈশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে, সকলাজ্ঞানাবভাসকত্বাৎ।"[১০] উক্ত লক্ষণে 'জগৎকারণম্' পদের দ্বারা ঈশ্বরকেই জগতের কারণ রূপে স্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয়, সৃষ্টির কারণ হিসাবে মায়া বিশিষ্ট চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর উপাদান ও নিমিত্ত কারণ রূপেও গৃহীত হয়েছে। তবে আমাদের স্মরণে রাখতে হবে সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দম ব্রহ্মই হল একমাত্র অস্তিত্বশীল, যা ত্রিকাল অবাধিত। এই কারণে ব্রহ্মই হল প্রকৃত একমাত্র বস্তু।। জগত বা সৃষ্টি ভ্রমের ন্যায় মিথ্যা। যেহেতু তা অজ্ঞানের কার্য। ফলে সৃষ্টি হল অবিদ্যা বা মায়ার ফল। মায়া বলতে জগত সৃষ্টিকারী চৈতন্যের শক্তি। যা সৎ নয়, অসৎ নয়, সৎ ও অসৎ উভয়ই নয়, সদাসদবিলক্ষণ অনির্বচনীয় মিথ্যা। অজ্ঞান সাধারণত দুই প্রকার- সমষ্টি অজ্ঞান ও ব্যষ্টি অজ্ঞান। সমষ্টি অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য হল ঈশ্বর ও ব্যষ্টি অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য হল জীব বা প্রাজ্ঞ। সমষ্টি অজ্ঞান ঈশ্বরের উপাধি হওয়ায় তা বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান, ব্যষ্টি অজ্ঞান প্রাজ্ঞের উপাধি হওয়ায় তা মলিন সত্ত্ব প্রধান। এছাড়া অজ্ঞান সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ বিশিষ্ট। এবং অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামে দুটি শক্তি বর্তমান। এই কারণে ব্রহ্ম ভিন্ন সকল কিছু অবস্তু। তবে এই মিথ্যাত্বতা পারমার্থিক দিক থেকে, ব্যবহারিক দিক থেকে নয়। ব্যবহারিক দিক থেকে সৃষ্টি সত্য। সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতে, তমঃ প্রধান বিক্ষেপ শক্তি যুক্ত সমষ্টি অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য থেকে অর্থাৎ ঈশ্বর থেকে জগতের সৃষ্টি শুরু হয় সূক্ষ্ম পঞ্চভূত রূপে। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, যা অপঞ্চীকৃত। পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মশরীর ও স্থূলভূতের সৃষ্টি হয়। সূক্ষ্ম শরীর হল পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। স্থূলভূত হল ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। যা, পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা উৎপত্তি হয়। আর এই পঞ্চীকৃত স্থূলভূত থেকে বিভিন্ন লোক ও স্থূলশরীরের উৎপত্তি হয়। ছাড়াও সৃষ্টিতত্ত্বে পঞ্চকোশের কথা উল্লেখ করেছেন। নীচে সৃষ্টি প্রক্রিয়া সুবিস্তরভাবে আলোচনা করা হল।

সৃষ্টিতত্ত্ব :

অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূত বা পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তিঃ- সদানন্দ যোগীন্দ্র জগত সৃষ্টির বর্ণনা প্রসঙ্গে 'বেদান্তসার' গ্রন্থে অবতারণা করেছেন- তমঃ প্রধান বিক্ষেপ শক্তিযুক্ত অজ্ঞান দ্বারা উপহিত চৈতন্য বা ঈশ্বর থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে তেজঃ, তেজঃ থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী উৎপন্ন বা সৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ তৈত্তিরীয় উপনিষদের উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ হল- "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভুতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।"[১১]

সদানন্দ যোগীন্দ্র অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য থেকে প্রথম উৎপন্ন আকাশাদি পঞ্চভূতকে সূক্ষ্মভূত বলেছেন। এই ভূতগুলিকে অপঞ্চীকৃতও বলা হয়। আবার তন্মাত্রও

বলা হয়ে থাকে। এই অবস্থায় আকাশ শুদ্ধ, বায়ু শুদ্ধ ইত্যাদি। 'শুদ্ধ' বলার কারণ হল, প্রথম উৎপন্ন আকাশাদিতে অন্য কোন ভূতের মিশ্রণ থাকে না। ফলে আকাশ শুধুমাত্র শব্দাত্মক, বায়ু শুধুমাত্র স্পর্শাত্মক, তেজ শুধুমাত্র রূপাত্মক, জল শুধুমাত্র রসাত্মক ও পৃথিবী শুধুমাত্র গন্ধাত্মক হয়। আর এই সূক্ষ্মভূত থেকেই সূক্ষ্মশরীর ও স্থূলভূতের উৎপত্তি হয়।

সূক্ষ্মশরীরের উৎপত্তিঃ- সদানন্দ যোগীন্দ্র স্থূলভূত ও সূক্ষ্মশরীরের উৎপত্তি প্রসঙ্গে 'বেদান্তসার' এ বলেছেন- এই আকাশ প্রভৃতি সূক্ষ্মভূত থেকে সূক্ষ্মশরীর ও স্থূলভূত গুলি উৎপন্ন হয়। স্থূলভূত বলতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মুরুৎ ও ব্যোম প্রভৃতিকে বোঝায়। আর সূক্ষ্মশরীর হল সতেরটি অবয়ব বিশিষ্ট লিঙ্গশরীর। সতেরটি অবয়ব হল- পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি প্রাণ, মন ও বুদ্ধি। এই সতেরটি অবয়ব বিষয়ে স্বামী বিদ্যারণ্য 'পঞ্চদশী' তে বলেছেন-

"বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয় প্রাণপঞ্চকৈমর্নসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে।।"[১২]

অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি- এই সপ্তদশটি অবয়ব দ্বারা সূক্ষ্মশরীর গঠিত হয়। একে লিঙ্গ শরীরও বলা হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসু হচ্ছে, কি ভাবে সূক্ষ্মশরীরের উৎপত্তি হয়েছে? তারা কিরূপ কর্ম সাধন করে? তা আলোচিত হয়েছে।

জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপত্তিঃ- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক – পাঁচটি হল জ্ঞানেন্দ্রিয়। আর অজ্ঞানের তিনটি গুণ হল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সাত্ত্বিক অংশ আকাশ (শব্দত্ব) থেকে শ্রোত্র উৎপন্ন হয়। সাত্ত্বিক অংশ বায়ু থেকে স্পর্শেন্দ্রিয় বা ত্বগিন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সাত্ত্বিক অংশ তেজ থেকে চক্ষু উৎপন্ন হয়। সাত্ত্বিক অংশ জল থেকে জিহ্বা উৎপন্ন হয়। সাত্ত্বিক অংশ পৃথিবী থেকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।

কর্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তিঃ- বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ -এই গুলিকে কর্মেন্দ্রিয় বলে। রজঃ প্রধান আকাশ অংশ থেকে বাক ইন্দ্রিয়, রজঃ প্রধান বায়ু অংশ থেকে পাণি, রজঃ প্রধান তেজ অংশ থেকে পাদ, রজঃ প্রধান জল অংশ থেকে পায়ু, রজঃ প্রধান পৃথিবী অংশ থেকে উপস্থ উৎপন্ন হয়। বাক হল যার দ্বারা মানুষ কথা বলে অর্থাৎ বাক হল শব্দোচারণ সাধন। এই সাধন স্থূল শরীরের জিহ্বায় অবস্থান করে। পাণি হল যার দ্বারা মানুষ আদান প্রদান করে অর্থাৎ স্তুতি। এই পাণির অবস্থান স্থূল শরীরের হস্ত অঙ্গে। পাদ হল যার দ্বারা মানুষ গতিমান হয় তাই হল পাদ। পাদ স্থূল শরীরের চরণে অবস্থান করে। পায়ু হল যার দ্বারা মানুষ মলত্যাগ করে নিজের শরীরকে রক্ষা করে তাই হল পায়ু। পায়ু স্থূল শরীরের মলনির্গমমার্গে অবস্থান করে। উপস্থ হল যার দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরকে তৃপ্ত করে তাই হল উপস্থ। উপস্থ স্ত্রী পুরুষের স্থূল শরীরের অঙ্গ যোনি ও লিঙ্গে অবস্থান করে।

পঞ্চবায়ুর উৎপত্তিঃ- প্রাণ, অপান,ব্যান, উদান ও সমান – এই গুলি হল পঞ্চবায়ু। যা আমাদের মানবদেহে চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়। প্রাণ হল নাসিকার অগ্রদেশে অবস্থিত যে বায়ু সামনের দিকে গমন করে তাই হল প্রাণ। অপান হল পায়ু প্রভৃতি স্থানবর্তী যে বায়ু নীচের দিকে গমন করে তাই হল অপান। ব্যান হল সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত যে বায়ু সর্বদিকে গমন করে তাই হল ব্যান। উদান হল কণ্ঠদেশে স্থিত যে বায়ু ঊর্দ্ধদিকে গমন করে তাই হল উদান। আর সমান হল শরীরের মধ্যে খাদ্য ও পানীয় বস্তুর পরিপাক বা সমীকরনকারী বায়ুই হল সমান। এই পঞ্চপ্রাণ বা বায়ু পাঁচটি আকাশাদি পঞ্চভূতের মিলিত রজঃ অংশ থেকে উৎপন্ন হয়।

বুদ্ধির পরিচয়:- অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিই হল বুদ্ধি।

মনের পরিচয়:- সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তিকে মন বলে।

এই মন ও বুদ্ধির মধ্যে চিত্ত ও অহংকার অবস্থিত। চিত্ত হল স্মরণাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি। আর অহংকার হল সর্বাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি বা 'আমি' এই রূপ অভিমানাকার অন্তঃকরণ বৃত্তি। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার এই চারটি প্রকাশাত্মক। কারণ আকাশাদি মিলিত সত্ত্বাংশ থেকে উৎপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে সবই অন্তঃকরণে এক। আসলে একজন মানুষ যেমন বই পড়লে তাকে পাঠক বলা হয়, আবার একজন মানুষ রান্না করলে তাকে রাঁধুনি বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে তো মানুষ রূপে তারা সবাই এক। তেমনি অন্তঃকরণ এক হলেও নিশ্চয়, সংশয়, স্মরণ ও অহংকার রূপ বিষয় বা বৃত্তি ভেদে বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অহংকার রূপে ভেদ স্বীকার করা হয়। অন্তঃকরণের চার প্রকার বিভাগ ধর্মরাজ স্বীকার করেছেন। তিনি 'বেদান্তপরিভাষা' গ্রন্থে বলেছেন-

"মনো বুদ্ধিরহং কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্।
সংশয়ো নিশ্চয়ো চেতি গর্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে।।"[১৩]

তবে সদানন্দ যোগীন্দ্র এই চার প্রকার ভেদ স্বীকার করেননি। তিনি চিত্তকে বুদ্ধিতে ও অহংকারকে মনে অন্তর্ভুক্ত করে বুদ্ধি ও মন এই দুটি ভেদ স্বীকার করেছেন। এছাড়া স্বামী বিদ্যারণ্য অন্তঃকরণের এই দুটি ভেদ স্বীকার করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে পঞ্চদশীতে বলেছেন-

"তৈরন্তঃকরণং সর্বৈবৃত্তিভেদেন তদ্দ্বিধা।
মনো বিমর্শরূপং স্যাদ্বুদ্ধিঃ স্যান্নিশ্চয়াত্মিকা।।"[১৪]

অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূতের সত্ত্বাংশের সমষ্টি থেকে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। বৃত্তি ভেদে এই অন্তঃকরণ দুই প্রকার মন ও বুদ্ধি।

এই সূক্ষ্মশরীর সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভেদে দু প্রকার- গ্রন্থকারের মতে, যেমনভাবে বৃক্ষগুলিকে সমষ্টিরূপে বন বলা হয় বা বিভিন্ন জলবিন্দুর সমষ্টিকে জলাশয় বলা হয় অনুরূপভাবে সমস্ত বা সকল প্রাণীর ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীরগুলিকে হিরণ্যগর্ভের এক বুদ্ধির বিষয়রূপে সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর বলা হয়। আবার যেমন কোন বনে বৃক্ষগুলিকে আলাদা

আলাদাভাবে বৃক্ষ বলা হয়, অনুরূপভাবে প্রতিটি জীবের নিজের নিজের সূক্ষ্মশরীরকে নিজের নিজের আলাদা বুদ্ধির বিষয়রূপে অনেক বুদ্ধির বিষয় হওয়ায় প্রতিটি প্রাণীর সূক্ষ্মশরীরকে ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীর বলা হয়।

হিরণ্যগর্ভ:- সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর উপহিত চৈতন্যকে সূত্রাত্মা বলে। এই রূপ চৈতন্যকে সুত্রাত্মা বলা হয় কারণ এই সুত্রাত্মা সমস্ত ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীরে অনুস্যূত। এই সুত্রাত্মাই হল হিরণ্যগর্ভ। এই হিরণ্যগর্ভের তিনটি উপাধি আছে। এই তিনটি উপাধি হল তিনটি কোশ বিজ্ঞানময়, প্রাণময় ও মনোময় কোশ। আর এই তিনটি কোশ হল তাঁর সূক্ষ্মশরীর। যেহেতু স্থূল প্রপঞ্চ অপেক্ষা সূক্ষ্ম তাই একে সূক্ষ্মশরীর বলা হয়। সুতরাং হিরণ্যগর্ভ সূক্ষ্মস্বরূপ। এবং এই হিরণ্যগর্ভই বিরাটরূপে স্থূল প্রপঞ্চের অনুভব করেন। সেই অনুভব জনিত বাসনা হিরণ্যগর্ভের আছে বলে তিনি স্বপ্নত্ব। আর যেহেতু তিনি স্বপ্নস্বরূপ ও সূক্ষ্মস্বরূপ সেই জন্য তিনিই স্থূল প্রপঞ্চের লয় স্থান।

তৈজসঃ- অপরদিকে, ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীর উপহিত চৈতন্যকে তৈজস বলা হয়। তেজোময় অন্তঃকরণ দ্বারা উপহিত এই কারণে তিনি তৈজস। অন্তঃকরণটি তেজোময় এর অর্থ স্বচ্ছ। কারণ সূক্ষ্ম ভূতের মিলিত সত্ত্বাংশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই তৈজসের সূক্ষ্মশরীর হল তিনটি কোশ যথা- বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময়। সূক্ষ্ম কারণ তা স্থূল শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম। তৈজস স্থূল শরীরের অনুভূত বিষয়ের বাসনাময় বলে তা স্বপ্ন। অতএব তৈজস হল স্থূল শরীরের লয়স্থান।

এই সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর উপহিত চৈতন্য সুত্রাত্মা এবং ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীর উপহিত চৈতন্য তৈজস উভয়েই নিজ নিজ স্বপ্নকালে মনের বৃত্তির দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয়ের অনুভব করে থাকে। সুত্রাত্মার স্বপ্ন হল প্রলয় ও সৃষ্টির মধ্যবর্তী অবস্থা এবং তৈজসের স্বপ্ন হল সুষুপ্তি ও জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থা। তবে সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেছেন ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে আলাদা হলেও আসলে সুত্রাত্মা ও তৈজস অভিন্ন। তাঁর মতে, যেমনভাবে বন অবচ্ছিন্ন আকাশ ও বৃক্ষ অবচ্ছিন্ন আকাশ অভিন্ন হয়, তেমনি সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর উপহিত চৈতন্য সুত্রাত্মা ও ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীর উপহিত চৈতন্য তৈজসও অভিন্ন হয়। এবার আমরা স্থূলভূতের কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে সেই দিকে একটু আলোকপাত করব।

পঞ্চীকৃত স্থূল ভূতের উৎপত্তিঃ- সদানন্দ যোগীন্দ্র স্বামী বিদ্যারণ্যকে অনুসরণ করে স্থূল ভূতের উৎপত্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। স্বামী বিদ্যারণ্য তাঁর 'পঞ্চদশী' গ্রন্থে উদ্ধৃতি দিয়েছেন-

"দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে।।"[১৫]

অর্থাৎ প্রতিটি মহাভূতকে দুই অর্ধে ভাগ করে, প্রত্যেকের প্রথমার্ধ গুলিকে আবার চার ভাগে ভাগ করে, এক একটি ভূতের প্রথম অর্ধের চারিভাগের এক একটি ভাগের সাথে

অবশিষ্ট চার ভূতের দ্বিতীয় অর্ধের এক একটির সংমিশ্রণে আকাশাদি মহাভূত পঞ্চীকৃত পঞ্চস্থূলভূত হয়।

সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেছেন- "স্থূলভুতানি তু পঞ্চীকৃতানি"[১৬] অর্থাৎ পাঁচটি স্থূলভূত গুলি পঞ্চীকৃত অর্থাৎ পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়া মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। এই পাঁচটি স্থূলভূত হল- ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। প্রশ্ন হচ্ছে, পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়া কি?- সাধারণভাবে, পঞ্চভূতের বিশেষ সংমিশ্রণকে পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়া বলা হয়। এবার একটু স্পষ্টভাবে আলোচনা করা যাক।

আকাশাদি প্রভৃতি পাঁচটি ভূতের এক একটিকে সমান দুইভাগে ভাগ করা করে, সেই ভাগকে নিজ নিজ দ্বিতীয় অর্ধভাগ ব্যতিরেকে অন্যান্য ভাগগুলিতে সংমিশ্রণ করা হয়। এই রূপ যে প্রক্রিয়া তাকেই পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়া বলা হয়। বোঝার সুবিধার জন্য একটি ছকের সাহায্যে তুলে ধরা হল-

পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়া

আকাশ	বায়ু	অগ্নি	জল	পৃথিবী	উৎপন্ন পঞ্চীকৃত স্থূল ভূত
১/২	১/৮	১/৮	১/৮	১/৮	ব্যোম
১/৮	১/২	১/৮	১/৮	১/৮	মরুৎ
১/৮	১/৮	১/২	১/৮	১/৮	তেজ
১/৮	১/৮	১/৮	১/২	১/৮	অপ
১/৮	১/৮	১/৮	১/৮	১/২	ক্ষিতি

সদানন্দ যোগীন্দ্র এই পঞ্চীকৃত স্থূলভূতের বৈশিষ্ট্য ও গুণের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, অনেকে প্রশ্ন তুলতেই পারেন যে- পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ায় পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের সংমিশ্রণ হয়ে থাকে। তবে উৎপন্ন প্রতিটি স্থূলভূতেই বাকী চারিটি ভূতের গুণের অভিব্যক্তি হওয়া উচিত, কিন্তু তা তো হয় না। এই মত অবস্থায় গ্রন্থকার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। যখন সূক্ষ্মভূতের সংমিশ্রণের ফলে পঞ্চস্থূলভূতের উৎপন্ন হয়। তখন এ মত অবস্থায় সংমিশ্রণে যে সূক্ষ্মভূতের পরিমাণ বা অংশ অন্যান্য ভূতের তুলনায় বেশি থাকে বা প্রাধান্য পায়, উৎপন্ন স্থূলভূতটি সেই ভূতের নামেই প্রকাশিত হয়। যেমন- যদি সংমিশ্রণে সূক্ষ্ম আকাশ ভূতের পরিমাণ বা অংশ অন্যান্য ভূতের তুলনায় বেশি থাকে বা প্রাধান্য পায় তাহলে উৎপন্ন স্থূলভূত আকাশ নামে প্রকাশিত হয়। অপর ভূতের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যই প্রযোজ্য। এবং তিনি পঞ্চীকৃত স্থূলভূতের গুণ সম্পর্কে বলেছেন যে, অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূতের অব্যক্ত গুণ গুলি পঞ্চীকৃত স্থূলভূতে অভিব্যক্ত হয় বা প্রকাশিত হয়। যেমন- সূক্ষ্মভূত আকাশের গুণ হল শব্দ, যা এই অবস্থায় অব্যক্ত। আকাশের এই অব্যক্ত(শব্দ) গুণ স্থূলভূত আকাশে অভিব্যক্ত হয় বা প্রকাশিত হয়। স্থূলবায়ুতে আকাশের গুণ শব্দ এবং বায়ুর নিজস্ব গুণ স্পর্শ এই দুটি গুণ প্রকাশিত হয়। আবার স্থূল অগ্নিতে পূর্ব ভূতের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও অগ্নির নিজস্ব গুণ রূপ এই তিনটি গুণ

প্রকাশিত হয়। আর স্থূল জলে পূর্ব ভূতের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও জলের নিজস্ব গুণ রস এই চারটি গুণ প্রকাশিত হয়। এছাড়া স্থূল পৃথিবীতে পূর্ব ভূতের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও পৃথিবীর নিজস্ব গুণ গন্ধ এই পাঁচটি গুণ প্রকাশিত হয়।

এছাড়া কেউ কেউ পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সংশয় বা আশঙ্কা করতে পারেন এই কারণে পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ার প্রামাণ্য সম্পর্কে গ্রন্থকার ত্রিবৃৎকরণ শ্রুতি কথার উল্লেখ করেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে- "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণী"[১৭] অর্থাৎ তেজ, অপ, ও অন্ন এই তিনটি ভূতের ত্রিবৃতকরণের কথা বলা হয়েছে। আর এই ত্রিবৃৎকরণ হল তিনটি ভূতকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে, প্রত্যেকের দ্বিতীয় ভাগকে সমান দুভাগে ভাগ করে নিজ নিজ প্রথমাংশ বাদ দিয়ে অপর ভূতের প্রথম অর্ধাংশের সাথে সংমিশ্রণ। যেমন-

ত্রিবৃৎকরণ প্রক্রিয়া

১/২ তেজ + ১/৪ অপ + ১/৪ অন্ন = স্থূল তেজ

১/২ অপ + ১/৪ তেজ + ১/৪ অন্ন = স্থূল অপ

১/২ অন্ন + ১/৪ তেজ + ১/৪ অপ = স্থূল অন্ন

এবার সূক্ষ্ম শরীরের অবয়ব বিশিষ্ট কোশ সমূহে নিয়ে আলোচনা করব।

পঞ্চকোশঃ- সাধারণভাবে 'কোশ' বলতে খাপকে বোঝায়। সদানন্দ যোগীন্দ্রের কাছে 'কোশ' হল চৈতন্যের আচ্ছাদক বা আবরণকে বুঝতে হবে। সদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁর 'বেদান্তসার' গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্বে পঞ্চকোশের কথা বলেছেন। এই পঞ্চকোশ হল- অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। এই পঞ্চকোশ গুলি শুদ্ধ চৈতন্যকে আচ্ছাদন বা আবৃত করে রাখে। জীবকে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে দেয় না। ফলে প্রকৃত আত্মা প্রকাশিত হতে পারে না। উপনিষদে এই পঞ্চকোশকে আত্মার 'ঘর' বলা হয়েছে। এই পঞ্চকোশ সম্পর্কে স্বামী বিদ্যারণ্য বলেছেন-

"দেহদভ্যন্তরঃ প্রানঃ প্রানাদভ্যন্তরং মনঃ।
ততঃ কর্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা।।"[১৮]

অর্থাৎ অন্নময় কোশে অভ্যন্তরে প্রাণময়কোশ, প্রাণময় কোশের অভ্যন্তরে মনোময় কোশ, মনোময় কোশের অভ্যন্তরে কর্তা অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোশ, বিজ্ঞানময় কোশের অভ্যন্তরে আনন্দময় কোশ থাকে। এখানে 'গুহা' বলতে কোশ পরম্পরাকে বোঝানো হয়েছে।

অন্নময় কোশঃ- পঞ্চীকৃত স্থূলভূত থেকে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত চার প্রকার স্থূলশরীরের সৃষ্টি হয়। এই চার প্রকার স্থূলশরীর হল- জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। এই স্থূলশরীরকে অন্নময় কোশ বলা হয়। কারণ এই স্থূলশরীরের উৎপত্তিতে অন্ন বা খাদ্যবস্তুর প্রাধান্য থাকে বা বলা যায় অন্ন থেকেই এই শরীর উৎপন্ন হয়। আর এই স্থূলশরীরেই 'অহং' বোধ থাকে এই কারণে শুদ্ধ চৈতন্য প্রকাশিত হতে পারে না। যেমন

অস্ত্র যেমন খাপের মধ্যে থাকলে দেখা যায় না, তেমনি চৈতন্যও স্থূলশরীরে লুকিয়ে থাকে। তাই এই স্থূলশরীরের অন্নময়তা ও কোশরূপতার জন্য একে অন্নময় কোশ বলা হয়। এই অন্নময় কোশ প্রসঙ্গে 'পঞ্চদশী' গ্রন্থে বলা হয়েছে-

"পিতৃভুক্তান্নজাদ্বীর্যাজ্জাতোহন্নেনৈব বর্ধতে।
দেহঃ সোহন্নময়ো নাত্মা প্রাক্ চোর্ধ্বং তদভাবতঃ।।"[১৯]

অর্থাৎ পিতামাতা কর্তৃক ভুক্ত- অন্ন পরিণাম যে বীর্য অর্থাৎ শুক্র ও শোনিত, তা থেকে উৎপন্ন এই স্থূল দেহ অন্নের দ্বারাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই দেহকে অন্নময় কোশ বলা হয়। তবে তা কিন্তু আত্মা নয়। কারণ জন্মের পূর্বে ও মরণের পরে তার অভাব দেখা যায়।

প্রাণময় কোশঃ- পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের আলাদা আলাদা রজঃ অংশ থেকে কর্মেন্দ্রিয় গুলি আলাদা আলাদা ভাবে উৎপন্ন হয়। আর অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের আলাদা আলাদা রজঃ অংশ থেকে পঞ্চপ্রাণ গুলি আলাদা আলাদা ভাবে উৎপন্ন হয়। সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেছেন- "প্রাণাদিপঞ্চকং কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতং সৎ প্রাণময়কোশঃ ভবতি।"[২০] অর্থাৎ এই পঞ্চপ্রাণ কর্মেন্দ্রিয়গুলির সাথে মিলিত হলে তাকে প্রাণময় কোশ বলা হয়। এই কোশে প্রাণের প্রাধান্য থাকে এই কারণে তা প্রাণময়। আর কোশ বলতে আচ্ছাদন, এখানে কোশের ঘটক প্রাণ প্রভৃতি তাতে জীবের আত্মবুদ্ধি হয়। ফলে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জীবের কাছে ঢাকা পড়ে যায়। আর রজঃ অংশের থেকে উৎপন্ন হয় বলে অর্থাৎ কার্য বলে ক্রিয়াত্মক। 'পঞ্চদশী' গ্রন্থে বলা হয়েছে-

"পূর্ণো দেহে বলং যচ্ছন্নক্ষণাং যঃ প্রবর্তকঃ।
বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্যবর্জনাৎ।।"[২১]

অর্থাৎ যে পঞ্চবায়ু সমস্ত দেহ ব্যাপ্ত, দেহে বল সঞ্চার করে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রেরক রূপে অবস্থান করে তাই হল প্রাণময় কোশ। এই প্রাণময় কোশ চৈতন্য রহিত বা জড় ফলে তা আত্মা নয়।

মনোময় কোশঃ- মননয় কোশ সম্পর্কে সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেছেন- "মনস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতং সৎ মনোময়কোশঃ ভবতি।"[২২] পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাথে মন মিলিত হলে তাকে মনোময় কোশ বলা হয়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন হল মনোময় কোশের অবয়ব। মন রজঃ গুণ দ্বারা চালিত হয় এই কারণে এই ইন্দ্রিয় চঞ্চল জড়। আর এই কোশের দ্বারা আচ্ছাদিত চৈতন্য জীবকে অহংকার বা অভিমান করতে শেখায়। ফলে মনের মধ্যে চাঞ্চল্যাধিক্য দেখা যায়। মনোময় কোশ প্রসঙ্গে 'পঞ্চদশী' গ্রন্থে বলা হয়েছে-

"অহন্তাং মমতাং দেহে গেহাদৌ চ করোতি যঃ।
কামাদ্যবস্থয়া ভ্রান্তো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ।।"[২৩]

অর্থাৎ যা অন্নময়াদি কোশরূপ শরীরে 'আমি' এই রূপ অভিমান করে ও গৃহাদিতে 'আমার' বুদ্ধি করে তাকে মনোময় কোশ বলে।

বিজ্ঞানময় কোশঃ- পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সাথে বুদ্ধির মিলিত হলে তাকে বিজ্ঞানময় কোশ বলে। সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেছেন- "ইয়ং বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতা সতী বিজ্ঞানময়কোশো ভবতি।"[২৪] বুদ্ধি সাত্ত্বিক ফলে যখন বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সান্নিধ্যে আসে তখনই তার সাত্ত্বিক অংশ প্রকাশিত হয়, এই কারণে তা বিজ্ঞানময়। আর এই কোশের অবয়ব গুলি জীবের আত্মজ্ঞানকে আচ্ছাদন করা রাখে ফলে জীব ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারে না। বলা হয়েছে আত্মচৈতন্য যখন বিজ্ঞানময় কোশ দ্বারা উপহিত হয় তখন তাকে ব্যবহারিক জীব বলা হয়। আর এই কোশ দ্বারা উপহিত জীবই সাংসারিক সুখ দুঃখের ভাগী হয়ে থাকে। তাই একে ইহলোক ও পরলোক গামী ব্যবহারিক জীব বলে। পঞ্চদশী গ্রন্থে বলা হয়েছে-

"লীনা সুপ্তৌ বপুর্বোধে ব্যাপ্নুয়াদানখাগ্রগা।
চিচ্ছায়োপেতধীর্নাত্মা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্।।"[২৫]

যে বুদ্ধি সুষুপ্তি অবস্থায় লীন হয়, জাগ্রত অবস্থায় নখের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিদ্যমান থেকে সমস্ত শরীর ব্যাপি অবস্থান করে তাকে বিজ্ঞানময় কোশ বলা হয়।

আনন্দময় কোশঃ- প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। অবিদ্যা বশত ব্যষ্টি অজ্ঞান উপহিত জীব চৈতন্য আনন্দ অনুভব করে । এবং তা কোশের মত আচ্ছাদন করে তাই তাকে আনন্দময় কোশ বলা হয়। এই আনন্দ কিন্তু শুদ্ধ আত্মার আনন্দের ছায়া মাত্র। কারণ এই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, দীর্ঘস্থায়ী নয়।

উল্লেখযোগ্য যে, সদানন্দ যোগীন্দের জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তি বশত: পঞ্চকোশের অন্তর্গত তিনটি কোশকে যথা- বিজ্ঞানময় কোশকে জ্ঞানশক্তিমান, মনোময় কোশকে ইচ্ছাশক্তিমান ও প্রাণময় কোশকে ক্রিয়াশক্তিমান বলে উল্লেখ করেছেন। আর জ্ঞানরূপ যোগ্যতার জন্য বিজ্ঞানময় কোশকে কর্তা রূপে স্বীকার করা হয়েছে। কারণ জ্ঞান ছাড়া কোন জীব নিজের কর্তৃত্ব সম্পন্ন করতে পারে না, অর্থাৎ জীব জ্ঞানের দ্বারাই কর্তৃত্ব সম্পন্ন করে। তাই তাকে কর্তা বলা হয়েছে। এছাড়া ইচ্ছা রূপ যোগ্যতার জন্য মনোময় কোশকে করণ রূপে স্বীকার করা হয়েছে। কারণ মনোময় কোশে মনই মুখ্য। মনের সান্নিধ্যে না পেলে শ্রোত্রাদি নিজেদের ক্রিয়া সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় না। এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণও আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে- "অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শম্, অন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌমিতি মনসা হ্যেব পশ্যতি, মনসা শৃণোতি"[২৬] অর্থাৎ লোকে অনেক সময় বলে আমি আনমনা ছিলাম সেই জন্য দেখিনি, আনমনা হয়েছিলাম সেই জন্য শুনিনি। সুতরাং মনের সান্নিধ্যে দর্শন, শ্রবণ হয়। এই কারণে তাকে করণ বলা হয়েছে। আর ক্রিয়ারূপ যোগ্যতার জন্য প্রাণময় কোশকে ক্রিয়াস্বরূপ রূপে স্বীকার করা হয়েছে। কারণ এই কোশে পঞ্চপ্রাণ ও কর্মেন্দ্রিয়ের অবস্থান হলেও প্রাণই মুখ্য ঘটক, প্রাণ সক্রিয় হলেই অন্যান্য ঘটক গুলি ক্রিয়াশীল হয়। এই কারণে তাকে ক্রিয়াস্বরূপ বলা হয়েছে। এই তিনটি কোশকেই অর্থাৎ বিজ্ঞানময়, মনোময় ও

প্রাণময় কোশকে লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর বলা হয়। এছাড়া অপর দুইটি কোশ যথা- অন্নময় কোশকে স্থূলশরীর ও আনন্দময় কোশকে কারণশরীর বলা হয়। এবার সর্বশেষে আমরা আলোকপাত করছি, স্থূল শরীরের উপর।

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত স্থূল শরীরের উৎপত্তিঃ- সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতে, এই পঞ্চীকৃত স্থল ভূত থেকে বিভিন্ন লোকের এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত চার স্থূলশরীর ও অন্ন- পানাদির সৃষ্টি হয়। লোক বলতে এখানে ব্রহ্মাণ্ডের ১৪ টি লোকের কথা বলা হয়েছে। এই ১৪ টি লোকের মধ্যে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই সাতটি লোক ঊর্দ্ধ অংশে অবস্থিত ও অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল এই সাতটি লোক নিম্ন অংশে অবস্থিত। ঊর্ধ্ব অংশে অবস্থিত সাতটি লোক একে অপরের উপর অবস্থান করে। যেমন- ভূঃ এর উপরে ভুবঃ, ভুবঃ এর উপরে স্বঃ, স্বঃ এর উপরে মহঃ ইত্যাদি। আর নিম্ন অংশে অবস্থিত সাতটি লোক একে অপরের নিচে অবস্থান করে। যেমন- অতলের নিচে বিতল, বিতলের নিচে সুতল, সুতলের নীচে রসাতল, রসাতলের নীচে তলাতল ইত্যাদি। পুণ্য কর্মের ফলে মানুষ কর্মফল ভোগের জন্য ঊর্ধ্ব অংশ লোক প্রাপ্ত হয়। আর পাপ কর্মের ফলে মানুষ নিম্ন অংশ লোক প্রাপ্ত হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, পঞ্চীকৃত স্থূলভূত থেকে স্থূলশরীরের সৃষ্টি হয়। তিনি “বেদান্তসার” এ বলেছেন- “চতুর্বিধ স্থূলশরীরাণি জরায়ুজ- অণ্ডজ- স্বদেজ- উদ্ভিজ্জ- আখ্যানি।”[২৭] এই সূক্ষ্মশরীর চার প্রকার যথা- জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বদেজ ও উদ্ভিজ্জ। জরায়ুজ হল জরায়ু থেকে জাত বা জন্ম যে শরীর যেমন- মানুষ, পশু প্রভৃতি। অণ্ডজ হল ডিম্ব থেকে জাত শরীর যেমন পাখি, সাপ প্রভৃতি। স্বদেজ হল ঘাম বা স্যাত্‌-স্যাতে জলীয় অবস্থা থেকে জাত শরীর যেমন- উকুন, মশা প্রভৃতি। আর উদ্ভিজ্জ হল যা ভূমি ভেদ করে উৎপন্ন হয় যেমন বৃক্ষ, লতা, তৃণ প্রভৃতি।

এই স্থূলশরীর ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে দুই প্রকার। গ্রন্থকার পূর্বে উক্ত বন বা জলাশয়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেছেন- সমষ্টি স্থূলশরীরের দ্বারা উপহিত চৈতন্যকে বৈশ্বানর বলা হয়। এই বৈশ্বানর চৈতন্য সকল জীব শরীরে ‘অহং’ অর্থাৎ ‘এই আমি’ অভিমান করে। আর এই বৈশ্বানরকেই বিরাট বলা হয়। কারণ জীব তার নিজের একটি শরীরকেই ‘এই আমি’ এই রূপ অভিমান করে। আর বিরাট পুরুষ সকল জীবের শরীরকে ‘এই আমি’ রূপে নিজের সাথে এক বা অভিন্ন মনে করে, ফলে প্রতিটি জীবের শরীরে নানা ভাবে তিনি প্রকাশিত হন এই কারণের বৈশ্বানরকে বিরাট বলা হয়।

অপরদিকে, ব্যষ্টি স্থূলশরীরের দ্বারা উপহিত চৈতন্যকে বিশ্ব বলা হয়। এখানে ‘বিশ্ব’ শব্দের অর্থ হল ‘সর্ব’। সূক্ষ্ম ও স্থূলশরীরে সংকুচিত হয়ে ‘সর্ব’ অর্থটি প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে ব্যষ্টি স্থূলশরীরের দ্বারা উপহিত চৈতন্য ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীরের

আত্ম অভিমান ত্যাগ না করেই স্থূলশরীরে আত্ম অভিমান করে বলেই তাকে বিশ্ব বলা হয়।

গ্রন্থকারের মতে, জাগ্রত কালে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ চারটি তারা স্বাধীনভাবে কার্য করতে সক্ষম নয়। তাই প্রতিটি ইন্দ্রিয় অধিপতি দেবতার মাধ্যমে নিজ নিজ কার্য সম্পন্ন করেন। এই বিষয়টি দেখান হল-

ইন্দ্রিয়	দেবতা	কর্ম
শ্রোত্র	দিক	শ্রবণ
ত্বক	বায়ু	স্পর্শন
চক্ষু	আদিত্য	দর্শন
জিহ্বা	বরুণ	রসাস্বাদন
নাসিকা	অশ্বিদ্বয়	ঘ্রাণ
বাক	অগ্নি	বচন
পাণি	ইন্দ্র	আদান
পাদ	উপেন্দ্র	গমন
পায়ু	যম	বির্সগ
উপস্থ	প্রজাপতি	আনন্দ
মন	চন্দ্র	সঙ্কল্প-বিকল্প
বুদ্ধি	বিরাট্	নিশ্চয়
অহংকার	শঙ্কর	গর্ব; আমি আমি করা
চিত্ত	অচ্যুত্ত	অনুসন্ধান

উপসংহার:-

পরিশেষে বলা যায় যে, সদানন্দ যোগীন্দ্র যেমন শ্রুতিকে অনুসরণ করে আমাদের এই বৈচিত্র্যময় জগতের মৌলিক উপাদান পৃথিবী, আকাশ, অগ্নি, বায়ু, জল, ও চেতনা প্রভৃতির সৃষ্টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তেমনি মানুষের শরীরের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চকোশের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে তিনি সৃষ্টিকে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সত্য বললে পারমার্থিক দৃষ্টিতে ভ্রমের মত মিথ্যা বলেছেন। বলেছেন জগত সৃষ্টি মায়ার কার্য বা ফল। তাই তিনি অজ্ঞান উপহিত চৈতন্যকে ঈশ্বররূপে স্বীকার করে তাকে জগত কারণ বলে অভিহিত করেছেন। তবে এই আলোচনার মধ্যে একটি বিতর্কের অধিকরণ লক্ষ্য করা যায়। সদানন্দ যোগীন্দ্র ঈশ্বরকে জগত সৃষ্টির কারণ বলেছেন। কিন্তু ভারতীয় ন্যায় দর্শনের পরমাণুকে জগত সৃষ্টির কারণ বলা হয়েছে। এছাড়া সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলা হয়েছে। এইখানে আমরা সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতের সাথে অপর দুটি মতের বিরোধ দেখতে পাচ্ছি। কারণ সদানন্দ যোগীন্দ্র মতে, জগতের কারণ চৈতন্যস্বরূপ। আর অপরদিকে প্রকৃতি ও পরমাণু জড়

স্বরূপ। সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে- কোন মতটি অধিক গ্রহণ যোগ্য জগতের কারণ জড় নাকি চেতন?- আসলে ন্যায় ও সাংখ্যদের মত যৌক্তিক ভিত্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অপরদিকে, আমরা জানি যে, ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তি হল বেদ ও উপনিষদ। এছাড়া শ্রীমদ্ভগবদগীতাকেও স্বীকার করা যেতে পারে। শ্রুতিতে বলা হয়েছে- "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জিবন্তি, যৎ প্রয়ন্তি অভিবিশন্তি" অর্থাৎ যার থেকে এই ভূতবর্গের উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হয়ে যাতে স্থিত হয় ও এই ভূতবর্গ সম্যকরূপে যাতে লীন হয় তিনি হলেন ব্রহ্ম। এছাড়া গীতায় বলা হয়েছে- বীজং মাং সর্বভূতানাং"- অর্থাৎ আমাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে সমস্ত ভূতের বীজ বলে জানবে। এছাড়া ব্রহ্মসূত্রে "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য ঈশ্বরকে জগত সৃষ্টির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শ্রুতি, ন্যায় ও স্মৃতি এই তিন প্রস্থানে চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলা হয়েছে। এছাড়া বেদান্তে স্বীকার করা হয় যে, জড়ের কার্য করার ক্ষমতা নেই, সেই ক্ষমতা একমাত্র চেতনেরই আছে। আর যেহেতু শাস্ত্রে বলা হয়েছে- যখন শ্রুতির সাথে যুক্তির বিরোধ দেখা যায়, তখন শ্রুতিই অধিক বলবান হয়। কারণ শাস্ত্র প্রমাণ হল শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আর যেহেতু শাস্ত্রের সাথে সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতের একবাক্যতা রয়েছে। সুতরাং সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতটি গ্রহণ করা অধিক শ্রেয়।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, লোকনাথ. 'সদানন্দযোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসারঃ'(অনুবাদ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, ২০১১, পৃ. ৭৬।

২. শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন. 'চার্বাক দর্শন', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৩, পৃ. ৯৮।

৩. শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন. 'চার্বাক দর্শন', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৩, পৃ. ৯৮।

৪. স্বামী, বিশ্বরূপানন্দ (অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা). স্বামী, চিদঘনানন্দ পুরি. ঝা, বেদান্তবাগীশ শ্রীআনন্দ. এবং ন্যায়াচার্য্য (সংশোধক ও সম্পাদক). 'বেদান্তদর্শনম্', প্রথম অধ্যায়, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যলয়, ২০১৯, পৃ. ৯৮।

৫. স্বামী, বাসুদেবানন্দ. 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'(ব্যাখ্যা ও অনুবাদ), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৯ পৃ. ৬৯৭।

৬. স্বামী, বাসুদেবানন্দ. 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'(ব্যাখ্যা ও অনুবাদ), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৯ পৃ. ৫৫৫।

৭. স্বামী, বীরেশ্বারানন্দ. 'ব্রহ্মসূত্র' (ব্যাখ্যা ও নির্দেশিকা), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যলয়, ২০১৮, পৃ. ৫৬।

৮. স্বামী, বীরেশ্বারানন্দ. 'ব্রহ্মসূত্র' (ব্যাখ্যা ও নির্দেশিকা), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যলয়, ২০১৮, পৃ. ৬৪।
৯. ব্রহ্মচারী, মেধাচৈতন্য. 'বেদান্তসারের তিনটি টীকার বিশদ বঙ্গানুবাদ', কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ, ১৪১৬, পৃ. ১৬।
১০. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ. 'বেদান্তসার'(অনূদিত), কলকাতা, বাসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ১৩৩৯, পৃ. ২৮।
১১. 'বেদান্তগ্রন্থমালা উপনিষৎ' (বাংলা অনুবাদ, ঊনবিংশ খণ্ড), গোলপার্ক, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সিটিউট অব কালচার, ২০১৫, পৃ. ১১০।
১২. স্বামী, বাণেশানন্দ(অনুবাদক). 'বিদ্যারণ্য স্বামিকৃত পঞ্চদশী', কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৯, পৃ. ০৯।
১৩. সেনগুপ্তা, আচার্য্য জ্যোতি. 'বেদান্তসারঃ'(অনুবাদ), কলকাতা, সংকৃত বুক ডিপো, ২০১৫, পৃ. ৯৬
১৪. স্বামী বাণেশানন্দ. 'বিদ্যারণ্য স্বামিকৃত পঞ্চদশী', কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৯, পৃ. ০৮।
১৫. স্বামী বাণেশানন্দ. 'বিদ্যারণ্য স্বামিকৃত পঞ্চদশী', কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৯, পৃ. ১১।
১৬. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ. 'বেদান্তসার'(অনুবাদ), বাসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলকাতা ১৩৩৯, পৃ. ৬১।
১৭. চক্রবর্তী, লোকনাথ. ''সদানন্দযোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসার', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৫৩।
১৮. স্বামী, বাণেশানন্দ. 'বিদ্যারণ্য স্বামিকৃত পঞ্চদশী', কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৯, পৃ.৬৭।
১৯. স্বামী, বাণেশানন্দ. 'বিদ্যারণ্য স্বামিকৃত পঞ্চদশী', কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৯, পৃ. ৬৮।
২০. পাল, বিপদভঞ্জন. 'বেদান্তসার'(অনুবাদ), কলকাতা, সংকৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৭, পৃ. ১৩২।
২১. স্বামী, বাণেশানন্দ. 'বিদ্যারণ্য স্বামিকৃত পঞ্চদশী', কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৯, পৃ. ৬৮।
২২. চক্রবর্তী, লোকনাথ. ''সদানন্দযোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসার', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, ২০১১, পৃষ্ঠা নং ১৩৮।
২৩. স্বামী, বাণেশানন্দ. 'বিদ্যারণ্য স্বামিকৃত পঞ্চদশী', কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা নং ৬৯।

২৪. পাল, বিপদভঞ্জন. 'বেদান্তসার'(অনুবাদ), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৭, পৃ. ১২৮।
২৫. স্বামী, বাণেশানন্দ. 'বিদ্যারণ্য স্বামিকৃত পঞ্চদশী', কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৯, পৃ.৬৯।
২৬. 'বেদান্ত গ্রন্থমালা উপনিষৎ' (বাংলা অনুবাদ, ঊনবিংশ খণ্ড), গোলপার্ক, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সিটিউট অব কালচার, ২০১৫, পৃ. ৩৫৪।
২৭. চক্রবর্তী, লোকনাথ. ''সদানন্দযোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসার', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, ২০১১, পৃ. ১৫৬।

তামিল গল্পকার ধণ্ডপাণি জয়কান্তনের লেখা সুব্রাহ্মনিয়ন কৃষ্ণমূর্তির অনূদিত ‘দিনের বেলার একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে’ গল্প : পাঠান্তের অনুভব

এ. টি. এম. সাহাদাতুল্লা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র ইভিনিং কলেজ, নৈহাটি

সারসংক্ষেপ: প্রতিবেশী সাহিত্যপাঠ যেকোনো সাহিত্য পাঠকের সাহিত্য রসাস্বাদন সুযোগ বাড়িয়ে দেয় অনেকাংশে। তেমনই আগ্রহ নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য পাঠ করার সূচনা। পরবর্তীতে এই ক্ষেত্রে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা সর্বাংশে। এই ক্ষেত্রে বাংলায় অনূদিত সাহিত্যই একমাত্র আশ্রয়। তামিল গল্পকার ধণ্ডপাণি **জয়কান্তনের** লেখা সুব্রাহ্মনিয়ন কৃষ্ণমূর্তির অনূদিত **‘দিনের বেলার একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে’** গল্পটি পাঠ পূর্বক অনুভূতি ব্যক্ত করার চেষ্টা হবে এই আলোচনায়।

বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষের জীবন নির্দিষ্ট নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। যেখানেই নিয়মের বিচ্যুতি সেখানেই সহ্য করতে হয় নিষ্ঠুর পরিণাম। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আম্মাশির ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছে। প্রথম যৌবনে সাধারণ সামাজিক জীবন অপেক্ষা সৈনিক জীবনকে সে আপন করে নিয়েছিল। ফলস্বরূপ শেষ বয়সে সে নিতান্ত একা হয়ে যায়। একাকিত্বের সেই জীবন থেকে আম্মাশি মুক্তি পায় চিরায়ত পরিবার জীবনের পথে। আম্মাশির জীবনের এই পরিণতির কথা আলোচ্য ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পাবে।

সামাজিক ক্ষেত্রে শ্রেণিবৈষম্য মানুষের জীবনকে চরম প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়। আলোচ্য গল্পটি এমনই এক প্রসঙ্গে আলোড়িত হয়েছে। যুদ্ধফেরত আম্মাশি সামাজিক জীবনে জায়গা না পেয়ে অনির্দিষ্ট পথে পা বাড়ায়। ট্রেনে তার সঙ্গে দেখা হয় এক অসহায় মহিলা ও তার শিশু কন্যার সঙ্গে। ব্যক্তিজীবনে এই মহিলা শ্রেণিবৈষম্যের শিকার হয়েছে চরম আকারে। এখন সে বিধবা ও যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। আম্মাশি এই মহিলা ও তার মেয়েকে দুধ কিনে খাওয়ায়, তাদের জন্য ট্রেনের টিকিট কিনে দেয়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে এই মহিলা সামাজিক বিধিনিষেধের উর্ধ্বে উঠে তার কন্যাকে সঁপে দেয় আম্মাশির হাতে। আম্মাশিও পরম স্নেহে তাকে নিজের জীবনে বরণ করে। ব্রাহ্মণ শিশুর সঙ্গে নিচু জাতের আম্মাশির মিলনের মধ্যে দিয়ে গল্পকার শ্রেণিবৈষম্যের হাত থেকে মানব সভ্যতার মুক্তির পথানুসন্ধান করেন। আমাদের আলোচনায় গল্পের এই বিষয়টি বিশেষভাবে মূল্য পাবে।

মূল শব্দ

- জীবনের পথে সময়ের গুরুত্ব।
- সামাজিক স্তরে বর্ণবিদ্বেষের প্রভাব ও তার থেকে উত্তরণের পথান্বেষণ।

মূল আলোচনা

বাঙালি হিসেবে বাংলাসাহিত্য পাঠের পাশাপাশি প্রতিবেশী সাহিত্য পাঠের নেশা ঠিক কখন শুরু হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে শুরু যেখানেই হোক সহজে এর থেকে মুক্ত হতে পারব বলে মনে হয় না। সত্যি বলতে কি মুক্ত হওয়ার একান্ত ইচ্ছাও নেই। তামিল গল্পকার ধণ্ডপাণি জয়কান্তনের লেখা সুব্রাহ্মনিয়ন কৃষ্ণমূর্তির অনূদিত 'দিনের বেলার একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে' গল্পটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি অনুরাগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। গল্পটির বিষয় অতি সাধারণ। প্লটের জটিলতা একেবারেই নেই। ছোটগল্পের সাধারণ সূত্র অনুযায়ী এখানেও একটি মাত্র ঘটনা দ্রুত গতিতে পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছে। অতি সাদামাঠা গঠনের এই গল্পটি পাঠ করার পর একে নিয়ে ভাবতে হয় অনেক বেশি। বর্তমান আলোচনায় তেমনি কিছু ভাবনার কথা প্রকাশ করার চেষ্টা করা হবে।

'দিনের বেলার একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে'র গল্পটির কেন্দ্রীয় বিষয় আম্মাশি নামক এক বাতিল সৈনিকের জীবনের কথা। লেখক এই সৈনিকের জীবনেতিহাস বর্ণনার মধ্যে দিয়ে মানবসভ্যতার ও মানবজীবনের নানা জটিলতম দিক পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

মানুষ প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী তার প্রত্যেক উপাদানকে সঠিকভাবে নির্মাণ করেছে। প্রকৃতির উপাদান হিসেবে মানুষেরও নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। কারণ বিশ্বপ্রকৃতি নিয়মের কঠিন বেড়াজালে আবদ্ধ। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতায় উদ্যাম জীবনযাপনের জন্য মানুষ এক হিসাবে প্রকৃতিকে আক্রমণ করে প্রতি মুহূর্তে। যার পাল্টা প্রতিক্রিয়া মানুষকেই সহ্য করতে হয় সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রূপে। বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল সমস্যা প্রাকৃতিক দূষণ। প্রশ্ন ওঠে প্রাকৃতিক দূষণের মূল দায়ী কে? উত্তরে মানুষের বিবেকহীন আচরণের কথাই সবার প্রথমে বলতে হয়। সৃষ্টিকে এবং জীবনকে বেশি করে ভোগ করতে গিয়ে বর্তমান মানুষ এতটাই হিংস্র হয়ে উঠেছে যে, গভীর প্রশ্নের সামনে দাড়িয়েছে মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ। সভ্যতা যেভাবে প্রকৃতির সঙ্গে আচরণ করবে প্রকৃতিও ঠিক সেই ভাবেই সভ্যতা ও সমাজকে তা ফেরত দেবে। বর্তমানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সারা পৃথিবী যেভাবে আতঙ্কিত হচ্ছে তা সর্বাংশে মানুষের সৃষ্টি। দেনাপাওনার এই সাধারণ সূত্র শুধুমাত্র প্রকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। মানুষের জীবনেও দেনাপাওনার এই কঠোর হিসেব সমানভাবে ক্রিয়াশীল। মানুষ তার জীবনকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে, জীবনও সেই ভাবেই তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সৃষ্টির প্রত্যেকটা জীব প্রকৃতির কোলে লালিত। ফলে প্রকৃতির সুবিধা

নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি বেশ কিছু দায়িত্ব প্রত্যেক জীবকে বহন করতে হয়। প্রকৃতির সদস্য হিসেবে মানুষেরও এমনই কিছু দায়িত্ব আছে। প্রত্যেক মানুষের উচিত সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা ও প্রকৃতিকে তার নির্দিষ্ট গতিতে বয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। যেখানেই এই প্রচেষ্টা ও দায়িত্ববোধের অভাব তৈরি হয় সেখানেই সংশ্লিষ্টকে ভোগ করতে হয় শাস্তি। আমাদের গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আম্মাশি প্রকৃতির এই দায়িত্ববোধ যথাযথভাবে পালন করেনি। প্রথম যৌবনের উদ্দীপনায় আম্মাশি বুঝতে পারেনি জীবনের পথে সময়ের গুরুত্ব ঠিক কতটা। জীবনের কোন্ পর্বে ঠিক কোন্ কোন্ কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। যখন তার শরীরের ঘরে যৌবনের উদ্দীপনা ছিল তখন সে সময় অনুযায়ী কাজ করেনি। এর ফলও তাকে ভোগ করতে হয়েছে কঠোরভাবে।

পরিবারজীবন, সংসার, সমাজ এইসব অতি সাধারণ সত্য অনেক সময় অনেক মানুষের কাছে নিতান্তই বিলাসিতা বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতির সুস্থ গতির জন্য প্রত্যেক মানুষকে এই সাধারণ জীবন চক্রের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত। এই বন্ধন যে অস্বীকার করবে পরবর্তীতে তাকে ভোগ করতে হবে অনিবার্য ফলাফল। যৌবনের দুর্নিবার উদ্দীপনায় আম্মাশি জীবন যাপনের বিকল্প পথকে বেছে নিয়েছিল। সৃষ্টির মূল সত্যকে মেনে নিয়ে কোনো নারীকে ভালোবেসে সৃষ্টির গতিকে বহমান রাখার পরিবর্তে, সে নিজের জীবনকে ভোগ করতে চেয়েছিল একটু অন্য পথে- “এটা আশ্চর্য নয় যে সে বিভিন্ন দেশে নানারকমের মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো আর বিশাল বিশ্বের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার জন্য জীবনকে ভালোবেসেছিল।” এইভাবে জীবনকে উপভোগের জন্য সংসার অপেক্ষা বেশি পরিমাণে ভালোবেসেছিল যুদ্ধক্ষেত্রকে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আম্মাশির অনুভূতি লেখক বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে–“ও যুদ্ধকেই বিয়ে করেছে, ব্যারাক ছিল ওর শশুরবাড়ি।” সাধারণ সামাজিকের সঙ্গে আম্মাশির জীবনদর্শনের পার্থক্য ঠিক কতটা লেখকের এই উক্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। অদ্ভুত এই জীবনদর্শনের পরিণাম স্বরূপ আম্মাশিকে ভোগ করতে হয়েছে প্রকৃতির অনিবার্য আঘাত। শরীরের শক্তি ও মনের জোর কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। একটা সময় পর মানুষ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়। প্রকৃতির নিয়মে তখন মনের ও শরীরের দুর্বলতাকে ঢেকে দিতে পারে একমাত্র পরিবার জীবন। এই সত্যকে আম্মাশি স্বীকার করেনি। তাই আরো কিছু সাধারণ সামাজিকের জীবন অপেক্ষা উদ্যাম সৈনিক জীবন তার কাছে বেশি করে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। এক সময় শরীরের ঘর থেকে শক্তি নিঃশেষ হতে শুরু করে। যে যুদ্ধক্ষেত্রকে নিজের পরম প্রিয় বলে সে গণ্য করত, সেই যুদ্ধক্ষেত্রই তাকে চূড়ান্তভাবে আহত করে– “যুদ্ধভূমিতে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরা মেশিনগান হাতে লড়তে লড়তে সে গুলিবিদ্ধ হল। মাস কয়েক হাসপাতালে রইল। তারপর ডাক্তারেরা বলল যে সে আর চাকরি করতে পারবে না, কারণ সে আর সোজা হয়ে ‘অ্যাটেনশনে’ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।” এখন সে আর সৈনিকের উপযোগী নয়। তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়

পূর্বের জীবনে। এখন আম্মাশির কাছে নতুন কিছু পাওয়ার নেই, এমনকি দেওয়ার মতোও কিছু নেই। শরীর ও মনের দিক দিয়ে ছিবড়ে হয়ে যাওয়া আম্মাশি নিজের পুরানো জীবনে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। তারপর উপলব্ধি করে বিশ্বসংসারে এই মুহূর্তে তার আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। নেই তার জন্য অপেক্ষা করে থাকা কোনো আয়ত চোখ বা কিছু মানুষের বুভুক্ষু হৃদয়। বৃহত্তর মানব সভ্যতার সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আম্মাশি আজ নিতান্তই একা–"ওর আসার অপেক্ষা করার বা ওকে নিয়ে আনন্দ করার কেউ নেই।" দিনের বেলার কোনো এক প্যাসেঞ্জার ট্রেন তাকে তার পুরানো জীবনে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেও সে আজ নিতান্ত উদভ্রান্ত পথিক মাত্র—"এরপর সে তার ক্যাম্বিস ব্যাগ ঘাড়ে করে গাঁয়ে ঢুকে রাস্তায় রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ালো সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনো জায়গায় ঘোরার মতো।" সাধারণ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া আম্মাশিকে তার বস্তির লোকজন চিনতেও পারেনা। পরিশেষে মাসতুতো বোনের স্বামীর নাম করে তাকে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়—"তখনই আম্মাশির মনে পড়ল তার মাসতুতো বোন কাশাম্বুর কথা। কাশাম্বুর বর চডয়ান্ডির নাম উল্লেখ করে বলল, সে বাইরে থেকে এসেছে ওদের খোঁজে।" নিজের গ্রামে যখন কাউকে অন্যের পরিচয়ে পরিচিত হতে হয় তখন বোঝা যায় সেই মানুষের পার্থিব মূল্য ঠিক কতটা। আম্মাশির ক্ষেত্রে তার বিকল্প পরিচয়ও সঠিক পথ দেখাতে পারে না। জানতে পারে তার মাসতুতো বোন থাকে শহরে। তার কাছে গিয়ে সাময়িক স্বস্তি পাওয়ার উপায়ও নেই।

যৌবনের উদ্দীপনা জীবনের রুক্ষ তৃণভূমিতে শুকনো হওয়ার পর একটা সময় আম্মাশি নিজের কৃতকর্মের পরিণতি বুঝতে পারে। পুরানো জায়গায় ফেরত আসার পরও যখন দেখে তার জন্য কেউ অপেক্ষা করে নেই তখন উপলব্ধি করে জীবনের স্বর্ণালী দিনগুলো কতটা অবহেলায় সে নষ্ট করেছে। নিজের পুরনো বস্তিতে ফেরার পর আম্মাশি ভুলের পরিণতি নিজের চোখে উপলব্ধি করেছে। এই নিতান্ত একা জীবন অপেক্ষা আজ মৃত্যুও তার কাছে বেশি আপন মনে হচ্ছে—"সে এখন ভাবে, সে যুদ্ধে মরে গেলে কত ভালো হত। এখন কে আছে তার জন্য? কার খাতিরে সে বেঁচে থাকবে? তার পকেটে কয়কশো টাকা আছে। তা নিয়ে সে কী করবে?" একজন উদ্দীপ্ত সৈনিকের এই পরিণতি আমাদের অনেক প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়। কেন এমন হলো? এর উত্তরও আম্মাশি নিজেই উপলব্ধি করেছে।

আলোচনার প্রথমদিকে আমরা বলেছিলাম এই বিশ্বপ্রকৃতি নির্দিষ্ট নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। নিয়মকে অগ্রাহ্য করলে পরিণাম ভোগ করতেই হবে। আম্মাশির ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে। যে সময় তার উচিত ছিল জীবনকে ভালোবেসে, জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা; সেই সময় আম্মাশি ভুল পথে যাত্রা করেছে। আজ সেই ভুলের পরিণামস্বরূপ বিশ্বসংসারে সে একা। এই নিঃসীম একাকিত্ব কারো সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার উপায় তার নেই। সুস্থ মানবাত্মার কাছে আজ সে চরম ব্যঙ্গের পাত্র। ট্রেন থেকে নেমে নিজের বস্তির বাইরে নিতান্ত একা

উদভ্রান্ত আম্মাশি অপেক্ষা করছিল একটি পরিচিত মুখের। কিন্তু তেমন স্বস্তিদায়ক কোনো মুখের সন্ধান সে পায়নি। এরই মাঝে বস্তির দিক থেকে বেরিয়ে আসা এক গরুর গাড়ির ভেতর থেকে উদ্দাম উন্মত্ত যুবতীর হাস্যচ্ছল বাক্যালাপ আম্মাশিকে জীবনের অনেক হারিয়ে যাওয়া অনুভূতিকে মনে করিয়ে দেয়। যৌবনের মধুর দিনগুলিতে সে নিতান্ত অবহেলায় সেই অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। তখন সে বোঝেনি শরীরের ঘরে যৌবনের উদ্দীপনা চিরস্থায়ী নয়। যৌবনের সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর জীবনকে কখনোই আর পুরানো আলোয় আলোকিত করা সম্ভব নয়। এখন পড়ন্ত বেলায় পৌঁছে আম্মাশি নিজের কৃতকর্মের অনুভূতি রক্তাক্ত ভাবে অনুভব করে—“হুঁ, আমি তাকে অগ্রাহ্য করে দৌড়চ্ছিলাম....তার দাম তখন বুঝিনি...যদিও জাতের নামে, সম্প্রদায়ের নামে মানুষজন আমাদের দূরে সরিয়ে রেখেছে কিন্তু ঈশ্বর সবাইকে সমান ভাবে যৌবন দান করেছেন। সেটাকে আমি লাথি মেরে ছুটে পালাচ্ছিলাম। তখন বুঝিনি যৌবনও আমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।” জীবনের পথে সময়ের গুরুত্ব কতটা আম্মাশির পরিণতিকে সামনে রেখে গল্পকার পাঠককে মনে করিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃতি ও মানুষের আত্মিক ও বাহ্যিক যে সম্পর্ক তার সুস্থতা অনেকটাই শর্ত সাপেক্ষ। যেখানেই শর্তের বিচ্যুতি সেখানেই পরিণতি মর্মান্তিক। আম্মাশির জীবন এক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের কাছে উদাহরণস্বরূপ হতে পারে।

‘দিনের বেলার একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে’ গল্পের আর একটি দিক বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সামাজিক স্তরে বর্ণবিদ্বেষ মানুষের জীবনকে কতটা রক্তাক্ত করে তোলে তার নির্মম ছবি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন গল্পকার। আম্মাশি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে গল্পকার শুরু করেছিলেন তার বক্তব্য বিষয়, পরবর্তীতে তাকেই অবলম্বন করে তিনি দেখিয়েছেন মানব সভ্যতার চরম লজ্জাজনক ইতিহাসের ছবি। মানুষের প্রথম পরিচয় অবশ্যই মানুষ। মায়ের গর্ভ থেকে শিশু যখন পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয় তখন তার শরীরে লেখা থাকে না সে হিন্দু, না মুসলমান, না খ্রিস্টান, না জৈন, না বৌদ্ধ বা আরো আরো কিছু। লেখা থাকে না সে কতটা ধনী বা কতটা দরিদ্র। লেখা থাকে না তার বিশেষ কোনো পদবির কথা। কিন্তু পরবর্তীতে ধর্ম, শ্রেণি, অর্থ ইত্যাদি নানা মাত্রায় মানুষ বিভাজিত হয়ে যায়। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের এর চেয়ে বড় লজ্জা বোধহয় আর কিছু নেই। যুগে যুগে বহু মনীষী, কবি-সাহিত্যিক সভ্যতাকে সাম্যের শিক্ষা দিয়েছেন। সবার উপরে মানুষ সত্য। মানুষকে অবহেলা করে কোনো সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। অথচ মানবসমাজ এই শিক্ষা জীবনের ক্ষেত্রে সর্বাংশে গ্রহণ করতে পারেনি।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আজ আমরা পৌঁছেছি একবিংশ শতাব্দীতে। বিজ্ঞানের অসামান্য উন্নতিসহ মানুষের জীবন বর্তমানে প্রযুক্তির বেড়াজালে, প্রযুক্তির সার্বিক আবহাওয়ায় আবদ্ধ। অথচ এরপরও মানুষের শেষ পরিচয় মানুষ নয়, পরিবর্তে বলা যায় মানুষ অপেক্ষা মানুষের বিকল্প পরিচয়ই শেষ কথা। অর্থগত বৈষম্য, জাতিগত

বৈষম্য, সর্বোপরি শ্রেণিগত বৈষম্যে আজও মানবসমাজ হাজারো স্তরে বিভাজিত। মানুষে মানুষে এইরকম শ্রেণি বিভাজন ও তার রক্তাক্ত পরিণামের চরম নিদর্শন আমাদের আলোচ্য গল্পটি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে চূড়ান্তভাবে আহত হওয়ার পর আম্মাশি গ্রামে ফিরেছিল সুস্থতার লক্ষ্যে, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সুস্থতা সে পায়নি। শরীর ও মনের দিক দিয়ে বিধ্বস্ত আম্মাশি যখন গ্রাম থেকে আবারও অনির্দিষ্ট পথে পা মেলায় তখন সেই একই প্যাসেঞ্জার ট্রেনে পরিচিত হয় এক রুগ্ন অসহায় মহিলার সঙ্গে, কোলে এক শিশু কন্যা। রোগ ও ক্ষুধার যন্ত্রণায় মহিলা তখন মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। গল্পকার মহিলাটির বর্ণনা দিচ্ছেন এইভাবে—"আম্মাশি তাকে খুঁটিয়ে দেখল। চেহারা দেখে মনে হল একজন ব্রাহ্মণঘরের যুবতী বিধবা। অনেককাল ক্ষয়রোগে ভুগে তার দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। মনে হল যেন একটা মানুষের কঙ্কালই প্রাণ নিয়ে ধুঁকছে। বোঝা যাচ্ছে প্রাণটা গলার গহ্বর থেকে বেরোবার জন্য ছটফট করছে।" এই হতদরিদ্র অসহায় মহিলাকে দেখে আম্মাশির মনে করুণার উদ্রেক হয়। বোঝার চেষ্টা করে এমন পরিণতির কারণ কী।

পরিচয়ের প্রথম পর্বে আম্মাশি মহিলাটির এই পরিণামের সঠিক কারণ অনুধাবন করতে পারেনি। একটা সময় ট্রেনে টিকিট কালেক্টর আসে এবং সেই মহিলার কাছে টিকিট দাবি করে। কিন্তু তার কাছে যথাযথ টিকিট ছিল না। ফলে টিকিট কালেক্টর জানিয়ে দেয় তার সিদ্ধান্ত। মহিলাকে নেমে যেতে হবে পরের স্টেশনেই। এবার আম্মাশি জীবনের প্রশ্নে আর দ্বিতীয় ভুল করে না। টিকিট কালেক্টরকে প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দিয়ে ওই মহিলার জন্য টিকিট সংগ্রহ করে সে। তারপর স্টেশন থেকে দুধ কিনে সেই মহিলা ও তার শিশুকে দুধ খাওয়ায়। পরম স্নেহে অসহায় বাচ্চাটির জন্য কিনে আনে খেলনা। খেলনা পেয়ে এই নিতান্ত অবহেলিত বাচ্চা আম্মাশির সঙ্গে খেলতে শুরু করে—"খিদে মেটার আনন্দে এবং খেলনা মেলার খুশিতে বাচ্চাটি অচেনা মানুষের কোলে কখনো মাথা গোঁজে, কখনো চিবুক ধরে খেলায় টানে। দেখে মা মুচকি হাসে।" দুধ ও রুটি খেয়ে কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর এই মহিলার সঙ্গে আম্মাশির কথাবার্তা শুরু হয়। জানতে পারে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের এই মহিলা সুস্থভাবে কখনোই তার সমাজে বাঁচতে পারেনি। বয়স্ক স্বামী মারা যাওয়ার পর তার দায়িত্বভার কেউ গ্রহণ করেনি, অথচ সমাজের অনিবার্য নিয়ম শ্রেণিভেদের কঠোর রীতি পালন করতে গিয়ে মহিলাটি দিনে দিনে শেষ হয়েছে। তার উক্তি থেকে বোঝা যায় সামাজিক জীবনে বেড়াজালের দৃঢ়তা কত মারাত্মক ছিল--"আপনি কে আমি জানি না। আপনি আমাকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় দেখে দয়া করে দুধ এনে দিলেন, আমিও তা খেলাম। এটা কি আমি সমাজের লোকেদের সামনে করতে পারতাম বা করতাম? বলতাম "সরে যাও, সরে যাও"! শুচিবই থাকতাম। এর কারণটা কী? কারণটা হল, চারজনে কী বলবে, এই ভয়। এই ভয়টা সকলের আছে।" সামাজিক ক্ষেত্রে এই হল ভারতবর্ষের আসল সংকট। মানুষ ও ধর্মের পারস্পরিক টানাপোড়েনে আমরা মানুষকে মূল্য দিতে পারিনি।

ফলত ধর্মের কঠোর নিয়মের বাঁধনে মানবাত্মা লাঞ্ছিত হয়েছে যুগে যুগে। সভ্যতার এই চরম উন্নতির যুগে পৌঁছেও আমরা বেরিয়ে আসতে পারিনি সেই অন্ধকার থেকে। গল্পকার সভ্যতার এই চরম লজ্জার ছবিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর গল্পে।

এখন প্রশ্ন হল এই অন্ধকারময় লজ্জার ইতিহাস থেকে উত্তরণের পথ কী? সে উত্তরও গল্পকার দিয়েছেন তাঁর গল্প কাহিনিতে। মানুষই সব ক্ষেত্রে সব সমস্যার শেষ কথা বলে। সামাজিক সংকট মোচনে রুখে দাঁড়াতে হয় মানুষকেই। নিম্ন মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের জীবনকে সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়াজালে বেঁধে রাখা হয়েছে বহুকালাবধি। এখান থেকে প্রতিবাদী অবস্থান নিতে হবে মানুষকেই। গল্পকার তাঁর বিপ্লবী নায়িকাকেও দাঁড় করিয়েছেন সামাজিক বিধিনিষেধের বিরুদ্ধ ভূমিতে। এখন সে সমাজকে গ্রাহ্য করেনা, নিয়মকে গ্রাহ্য করে না, কোনো বন্ধনও স্বীকার করে না। -- বলেছে, "আপনি বলতে পারেন, এত কথা বলছ কিন্তু তুমি এই সব আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিজে কিছু করেছ? হ্যাঁ, আমি করিনি, তা করার মতো আমাকে মানুষ করা হয়নি।...কিন্তু তেমন কিছু এখন করব...হ্যাঁ, তা করব যাতে আমি যা ভোগ করেছি সেটা যেন আমার মেয়ে না ভোগে।" যক্ষারোগে আক্রান্ত এই মহিলা এরপর আর বেশিক্ষণ বেঁচে থাকেনি। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সে তার চরম সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে গিয়েছে। নিজে ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে হয়েও আম্মাশির জাত পরিচয় জানার অপেক্ষা না করে একমাত্র সন্তানকে আম্মাশির হাতে তুলে দিয়েছে। নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে এই অসহায় মা কোনোরকম সামাজিক শ্রেণিবিভাজনের তোয়াক্কা করেনি। সে ধর্ম ও সমাজ অপেক্ষা জীবনকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে সর্বাগ্রে। বলেছে—"আপনার অন্যান্য সন্তানের মতো একেও মানুষ করবেন...তা হলে তার জীবন ভালোই হবে বলে আমার বিশ্বাস...করবেন তো আইয়া?" কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই মহিলাটি মারা যায়, তবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে জানিয়ে যায় জাতি, অর্থ, ধর্মসহ যা কিছু সামাজিক শ্রেণিভেদ তার কোনোটাই মানুষের জন্য উপকারে আসে না। মানুষের বেঁচে থাকা উচিত মানুষ হিসাবেই। জাতিগত শ্রেণিবিভাজন সভ্যতাকে কখনোই সঠিক পথ দেখাতে পারে না।

জাতিবিদ্বেষের এই হেন পরিণতি আম্মাশিও তার জীবনে দেখেছে কৈশোরের দিনগুলোতে। স্বজাতের অত্যাচার ও উঁচু জাতের অবহেলার শিকার সেও হয়েছে। সংসার জীবন অপেক্ষা সৈনিকের জীবনকে সে বেছে নিয়েছিল সামাজিক অবহেলার কারণেই—"পচে যাওয়া ভারতীয় সমাজের দ্বারা ধিক্কৃত তার জাতের জীবনের দৈন্যকে ঘৃণা করেই সে তার আঠারো বছর বয়সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবিভাগে যোগ দিয়ে সাগরপারে যাত্রা করার সুযোগ লাভ করেছিল।" তবে এই পর্বে আম্মাশি জীবনের প্রশ্নে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেনি, বরং হেরে যাওয়া সৈনিকের মত মুখ লুকিয়ে আশ্রয় খুঁজে ছিল অন্য কোথাও—"ঐ জীবনে তার জাতের জন্য অপমানিত হওয়ার বিপদ ছিল না।" জীবনের পড়ন্ত বেলায় পৌঁছে আম্মাশি প্রথম যৌবনের ভুলটি

দ্বিতীয়বার আর করে না। অসহায় মহিলার জীবনের চরম দুঃখের কথা নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করার পর সেও প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। অন্য জাতের শিশু সন্তানকে নিজের কোলে আঁকড়ে ধরতে আজ আর তার কোনো বাধা নেই। সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন চিত্তে বরণ করে নিয়েছে অসহায় সেই মানব শিশুকে।

সুস্থ সমাজ কখনই হিংসা, বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতে পারে না। সমাজ গঠনের মূলমন্ত্র অবশ্যই প্রেম ও পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ ব্যবহার। সভ্যতার এত উন্নত অবস্থায় পৌঁছেও এই সাধারণ শিক্ষাটা অর্জন করতে পারেনি বর্তমান সমাজ। ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে রক্তের খোঁজ করার সময় বা রক্ত নেওয়ার সময় রক্তদাতার জাতের খোঁজ কেউ করেনা, অথচ ভিড়ের মধ্যে পাশে দাঁড়ানো মানুষকে মানুষ বলে বিবেচনা করতে সকলে প্রস্তুত নয়। এই হিংস্র মনোভাব থেকে সমাজকে মুক্ত করা দরকার। এক্ষেত্রে পাথেয় হতে পারে 'দিনের বেলা একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে' গল্পটির সার্বিক পটভূমি। ব্রাহ্মণ ঘরের অসহায় মাতৃহারা সন্তান এখানে আশ্রয় পেয়েছে নিম্ন জাতের আম্মাশির কাছে। উভয়ের মিলন মধুর ছবি বড়ই স্বস্তিদায়ক। নিম্ন জাতের আম্মাশি উচ্চ জাতের শিশুকে কোলে তুলতে দ্বিধা করেনি। আবার আম্মাশির কোলে ব্রাহ্মণ শিশুর নিরাপত্তা নিয়েও কোনো দ্বিধা তৈরি হয়নি শিশুটির মা বা পাঠকের মনে। গল্পকার যেন দেখাতে চাইছেন মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য সামাজিক শ্রেণিভেদ একান্ত প্রয়োজনীয় কোনো বিষয় নয়। আম্মাশির সঙ্গে ব্রাহ্মণ শিশুর এই মিলন দৃশ্য পরবর্তী সমাজকে, সভ্যতাকে মানুষকে মানুষ বলে বিবেচনা করার শিক্ষাই পৌঁছে দেয়। বর্তমান ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণসহ অন্যান্য উচ্চ জাতের মানুষের সঙ্গে নিম্ন জাতের মানুষের আত্মিক মিলনের ছবি প্রায় দুষ্প্রাপ্য। যদিও তেমনই হওয়া উচিত আমাদের সামাজিক শিক্ষা। বিখ্যাত বাঙালি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তার 'সহমরণ' কবিতায় অসামান্য এক শ্রেণিমিলনের ছবি এঁকেছেন। সেখানে ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা মহিলাকে বিয়ে করেছে এক দরিদ্র মুসলমান জেলে। তাদের পরবর্তী জীবনও ভরে উঠেছে আশা আনন্দের অনেক কোলাহলে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'সহমরণ' কবিতা বা ধণ্ডপানি জয়কান্তন এর 'দিনের বেলার একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে' ছোটগল্প এই শিক্ষাই পরবর্তী সমাজকে পৌঁছে দেয় যে, দুইজন মানুষের প্রকৃত কোনো ভেদাভেদ নেই। যেখানে গণ্ডি চরম শক্ত সেখানেই মানব আত্মা চূড়ান্ত লাঞ্ছিত। তাই শক্ত গণ্ডিকে শিথিল করাই সুস্থ মানবাত্মার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

- উদ্ধৃত গল্পাংশগুলি মুখোপাধ্যায় রামকুমার, ভারতজোড়া গল্পকথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০২২ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

গণতন্ত্রে মহিলাদের অবস্থান: ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে একটি সম্যক বিশ্লেষণ

স্বপন শর্মা
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ: রাজনীতির আঙিনায় নারীর প্রবেশ বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই। ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে নারীর প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ফলে মনে করা হয় যে, ভারতীয় সংবিধান একটি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বৈষম্যহীন সমাজ গড়তে উদ্যোগী। স্বাধীন ভারতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নারী- পুরুষ সমান শর্তে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার অর্জন করে। এতদসত্ত্বেও বলা প্রয়োজন যে, গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণের মাত্রা খুবই কম। ১৯৫১-৫২সাল থেকে শুরু করে ২০০৪ সাল পর্যন্ত লোকসভা নির্বাচনে নারীদের প্রতিনিধিত্বের হার ছিল ১০ শতাংশের কম। বস্তুত ২০০৯ সালের নির্বাচনে লোকসভায় নারীদের প্রতিনিধিত্বের হার বেড়ে ১১.৯ শতাংশে পৌঁচেছে। বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভার দিকে তাকালেও দেখা যায় যে, সেখানেও নারী প্রতিনিধিত্বের হার খুবই কম। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রিসভাগুলিতেও একই চিত্র পাওয়া যায়।

আবার প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পৌর নির্বাচন গুলিতেও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে গ্রামীণ ও পৌর নির্বাচনে তপশিলি জাতি ও উপজাতির মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের কথা বলা হলেও সেটি যথাযথভাবে কার্যকর হয়নি। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মহিলাদের এই রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সহজে মেনে নিতে পারেননি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন রাজ্যের পঞ্চায়েত বা পৌরসভায়, বিধানসভা ও লোকসভায় মহিলাদের এই ক্ষমতায়নকে ভালোভাবে মেনে নেওয়া হয়নি। তাই এজন্য প্রয়োজন পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন।

সূচক শব্দ: গণতন্ত্র (democracy), মহিলা (women), রাজনীতি (politics), প্রতিনিধিত্ব (participation), পিতৃতান্ত্রিক (patriarchal)।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম দিকচিহ্ন হল রাজনীতিতে আপামর জনগণের অংশগ্রহণ। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি সর্বদা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তবে ভারতীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে পুরুষ ভারতীয়গণের অংশগ্রহণের হার’টি সর্বদায় গুরুত্বপূর্ণ স্তরে থাকলেও ভারতীয়

নারীদের অংশগ্রহণের হার'টি কিন্তু মোটেই সেই স্তরে কখনই ছিল না। প্রাক্ স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ একেবারেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের মাত্রা বা হার'টি কিন্তু উল্লেখযোগ্য হারেই বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও তা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নয়। বস্তুত ভারতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ এখনও সীমাবদ্ধই থেকে গেছে। রাজনীতি শাস্ত্রের প্রথম ও শেষ কথা হল ক্ষমতা। সামাজিক বিন্যাসের প্রতিটি স্তরেই ক্ষমতার দেখা মিললেও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি হল ক্ষমতার শীর্ষ বিন্দু। সামাজিক স্তরবিন্যাস জনিত ক্ষমতার প্রতিফলন রাজনৈতিক কাঠামোতে থাকতে পারে কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি হল ক্ষমতা তার যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাত্রা অতিক্রম করে তবেই রাজনৈতিক স্তরকে নির্মাণ করে। সামাজিক ক্ষমতায়ন তখনই বৈধতা লাভ করে যখন সে রাজনীতির স্পর্শ পায়। এক কথায় বলা চলে সামাজিক প্রেক্ষিত অতিক্রম করে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ক্ষমতা তার সার্বিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈধতা প্রাপ্ত হয়। ওই বৈধ ক্ষমতার রূপ দেশ ও কাল বিশেষে ভিন্ন। কিন্তু একবার ক্ষমতা বৈধতা প্রাপ্ত হলে তা হয় চরম ও অবিভাজ্য।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় প্রান্তিকতার উপাদান গুলির মধ্যে সর্বাধিক অবহেলিত হল লিঙ্গগত অবস্থান। এর প্রধান কারণ গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠ চেতনাগত অবয়বকে লিঙ্গগত অবস্থান কখনও ব্যবহার করতে পারে না। আর পারেনা বলেই তা প্রচলিত রাজনৈতিক প্রত্যয়ে কেন্দ্রীয় স্থানাধিকারী নয়। অথচ 'সমাজ জীবনের' প্রতিটি পর্বে লিঙ্গ চিহ্নিত। প্রতিটি মানবিক আচরণকেই দ্বিমেরুকৃত লিঙ্গ নির্ভরতায় বিশ্লিষ্ট করা হয়। পুরুষের বিশ্ব আর নারীর ভুবন যেন পৃথক দুটি গোলার্ধ। পুরুষ শক্তিময়তা বা ক্ষমতাশীলতায় পারঙ্গম এবং প্রধান নীতিনির্ধারক বা শাস্তি প্রদানকারী সত্তা হিসেবে সামাজিক জীবনে স্বীকৃত। অপরপক্ষে নারী নম্রতা, সহনশীলতা, অন্তর্মুখীনতার আদর্শ হিসেবে আখ্যায়িত। পুরুষ শৌর্য-বীর্য, গতিময়তায় নির্দিষ্ট।নারী সৌন্দর্য, স্থিতিশীলতা, কর্তব্য-কর্মে চিহ্নিত। উভয়ের সম্পর্ক বিপরীতমুখী। সামাজিক অবস্থানও একে অপরের প্রতিস্পর্ধী। যা পুরুষের কাজ তা কখনোই নারীর কাজ হতে পারে না। আবার নারীর গর্ভধারণ পুরুষের চোখে তার নারীত্বের নির্ণায়ক হলেও নারীর কর্মপদ্ধতি পুরুষের অবনমন। পুরুষ যুক্তিশীলতায় আর নারী যুক্তিহীনতার দ্বারা চিহ্নিত। তাই পুরুষ হল আলো, নারী অন্ধকার। পুরুষ মূলস্রোত এবং নারী প্রান্তিক। সামাজিক এই অবস্থানটি প্রাচীন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তা সমধিক উপস্থিতির দাবিদার। অ্যারিস্টোটল মনে করতেন যে, নারীর মধ্যে 'যুক্তিশীল' বা 'নৈতিক সত্তা' কখনই খুঁজে পাওয়া যায় না।"rational soul is not present at all in a slave, in a female it is inoperative, [and] in a child undeveloped"।[১]অ্যারিস্টোটল যুক্তিশীলতাকে নৈতিক গুণ ও আত্মসংযমের সাথে সংযুক্ত করেছিলেন। আবার আমরা সেন্ট অগাস্টিনের রচনা মধ্যেও একই সূত্র খুঁজে পাই। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, "ঈশ্বরের দৃষ্টিতে রয়েছে শুধু পুরুষ তাই পুরুষের নিরিখে নারী অধস্তন"।[২]

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হল সাধারণ নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ। এ বিষয়ে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী মতামত শোনা যায়। S.D.Muni কর্তৃক প্রণীত 'Women in the Electoral Process'শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে, "সাধারণ নির্বাচনে ভারতীয় মহিলাদের অংশগ্রহণের হার কম"।[৩] L.W.Milbrath এবংM.L.Goel প্রণীত 'Political Participation'নামক গ্রন্থে একই ধরনের বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে।[৪]নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার কম হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, প্রকৃতিগতভাবে ভারতীয় মহিলারা রক্ষণশীল এবং ঐতিহ্যবাহী। অর্থাৎ কোথাও যেন ভারতীয় মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা কাজ করে চলেছে, যা মহিলাদের প্রতিনিয়ত ঊর্ধ্বমুখী পদার্পণের পরিবর্তে তাদের নিম্নমুখী করে তুলছে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাজনীতিতে তথা নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীজাতির অংশগ্রহণ করার অধিকারটি হল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার।নারীজাতি কিন্তু আগা গোড়াই এই বিশেষ অধিকারটি লাভ করতে পারেননি। এমনকি তারা প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোটদানের অধিকার থেকেও দীর্ঘকাল বঞ্চিত ছিলেন। নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার অধিকারও তাদের কাছে অধরা ও অজানায় ছিল। কারণ পুরুষতান্ত্রিকসমাজ নারীদের নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়টি সহজে মেনে নিতে পারেননি। তবে নারীজাতির ভোটাধিকার ও নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সর্বপ্রথম মধ্য এশিয়ার নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করেন। মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নারীদের ভোটাধিকারে বিশ্বাস করতেন, তাই ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের শেষ দিকে রাশিয়ার নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয় এবং ওই সময় রাশিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত মধ্য এশীয় দেশগুলিতেও নারীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত হয়। এর পরবর্তী কুড়ি বছরের মধ্যে মধ্য এশিয়ার যেসব দেশের সাথে রাশিয়ার সম্পর্ক ছিল না, সেই দেশগুলোতেও নারীদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার এশিয়ার বৃহত্তম ও সবচেয়ে জনবহুল রাষ্ট্র চীনেও ১৯৩৬ সালে নতুন চীন প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে নারীদের ভোটাধিকার থাকলেও ১৯৩৭ সালে জাপানের চীন আক্রমণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সাম্যবাদী বিপ্লব ইত্যাদির কারণে চীনা নারীদেরকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভোটাধিকারের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। জাপানেও ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। যদিও ১৯২৮ সালে যুক্তরাজ্যে নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করেন,[৫]তথাপি এশিয়াতে যুক্তরাজ্যের বৃহত্তম উপনিবেশ ভারতীয় উপমহাদেশে খুবই সীমিত সংখ্যায় পুরুষ ও নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৫০ সালে ভারতে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের অংশ হিসেবে নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয় এবং এর সাথে সাথে নারীরা নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় গণতান্ত্রিক উপায়ে।[৬] সুতরাং নারীজাতি নানা সংগ্রাম ও

আন্দোলনের পথ ধরে ভোটাধিকার ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার অধিকার অর্জন করে এবং তারা তাই নির্বাচনী রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসে।

কিন্তু প্রশ্ন হল ভোটাধিকার তথা নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীজাতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করা কি বাঞ্ছনীয়?রাজনীতিতে নারীজাতির ভূমিকা কি আদৌ প্রয়োজন?এইসব প্রশ্নকে কেন্দ্র করে রাজনীতিতে নারীজাতির অংশগ্রহণের বিষয়ে তুমুল বিতর্ক দেখা দিয়েছে। ফলে নারীজাতির রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিপক্ষে নানা অভিমত গড়ে উঠেছে। একদল মানুষ, বিশেষ করে নারী জাতির রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে বিরোধী বক্তব্য পেশ করেছেন। তাদের মত অনুযায়ী- (ক) নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে উপযুক্ত এবং সেখানে তারা সুপ্রতিষ্ঠিত। গৃহ কাজই হলো তাদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র, রাজনীতি বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা নয়। (খ) গৃহ কাজে নিপুনা নারীগণের গুণগত যোগ্যতার অভাব রয়েছে। তাই তারা স্বাভাবিকভাবেই গুণগত যোগ্যতার কাজে পুরুষদের দ্বারায় পরিচালিত হয়ে থাকে। (গ) গৃহের অভ্যন্তরে সুখ প্রতিষ্ঠাতা নারীগণ রাজনীতির জটিল আবর্তে জড়িয়ে পড়লে তাদের নারী সুলভ নমনীয়তা বিপন্ন হবে এবং সে ক্ষেত্রে তারা পুরুষদের দ্বারা অহেতুক ভাবে পরিচালিত হবে। (ঘ) নারীগণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে তাদের পারিবারিক জীবন বিপন্ন হবে। বস্তুত নারীগণ তাদের গৃহকর্মকে সুচারুভাবে সম্পাদন করে থাকে বলে পরিবার ও সংসার সুস্থ ও সুন্দর হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই গৃহকর্ম ছেড়ে দিয়ে অথবা সেই গৃহকর্মকে অবহেলা করে নারীগণ যদি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন তাহলে তাদের সুখী সংসার ও সুস্থ পরিবার ভেঙে যাবে এবং তা অশান্তি, অসন্তোষ ও সমস্যায় জর্জরিত হয়ে উঠবে। (ঙ) রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার জন্য যে শারীরিক ও মানসিক শক্তির একান্ত প্রয়োজন সাধারণভাবে নারীগণের মধ্যে তা পরিলক্ষিত হয় না। অধিক পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তা তাদের মানসিক ভারসাম্যকে অস্থির করে তোলে। (চ) সংসারে পুরুষের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করলে সংসারে অশান্তি অনিবার্য। আর সংসারে শান্তির স্বার্থে নারীকে যদি পুরুষের মতকেই মেনে চলতে হয়, তাহলে মহিলাগনের জন্য আইন সভায় বা অন্যত্র বিশেষ প্রতিনিধিত্ব প্রদানের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ সে ক্ষেত্রেও তো তারা পুরুষ সহকর্মীগণের দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হবেন। (ছ) পুরুষজাতির তুলনায় প্রকৃতগত ভাবে নারীজাতি হল আবেগপ্রবণ। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে আবেগপ্রবণতার কোন স্থান না থাকায় নারীগণকে রাজনৈতিক বৃত্তের বাইরে রাখায় আবশ্যক। (জ) স্ত্রী জাতির স্বাভাবিক চারিত্রিক আবেগপ্রবণতা তাদের সহজে ধর্মীয় অনুশাসনের বশবর্তী করে তোলে। তাই তাদের ওপর সহজেই ধর্মীয় প্রভাব কায়েম করা যায়। সেই কারণে ক্যাথলিক চার্চ হলো স্ত্রী জাতির রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিরোধী।[৭] (ঝ) বিভিন্ন পরিশ্রম ও বিপদ সংকুল কাজে নারীজাতি সহজে অংশগ্রহণ করেন না। যেমন সামরিক বিভাগ, কূটনৈতিক দৈত্যকর্ম, বিমান চালনা,

ডুবুরি প্রভৃতি কাজ। সেই কারণে তাদের রাজনীতিতে প্রবেশের পথ বন্ধ করে দেওয়ায় বাঞ্ছনীয়। কারণ রাজনীতি হলো পরিশ্রম সাপেক্ষ ও ঝুঁকি বহুল কাজ। (ঞ) শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা মায়ের স্নেহেই সুসম্পাদিত হয়। অন্যদিকে রাজনীতিতে মহিলারা অংশগ্রহণ করলে শিশুরা তাদের মাতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত হবে এবং তার ফলস্বরূপ শিশুদের মধ্যে কাঠিন্য, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি অসৎ গুণ বৃদ্ধি পাবে, যা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের পক্ষে সার্বিক অমঙ্গলের চিহ্ন বহন করে আনবে।

মহিলাদের বিরুদ্ধে বিরোধীদের এই সমস্ত বক্তব্য সত্ত্বেও বর্তমান সমাজ, রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদের দমিয়ে রাখা যায়নি। তারা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম পরিচালিত করেছে গণতান্ত্রিক উপায়ে, যাতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তারা যথাযথভাবে সম্মান পান, অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান আর তাদের সংরক্ষণের দিকে যাতে নজর দেওয়া হয় এই বিষয়গুলিতে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে মহিলাদের অবদান আজ সর্বজন স্বীকৃত। পরাধীন ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা যে সফল ভূমিকা পালন করেছিলেন, স্বাধীনোত্তর কালেও তারা যথাযথ রাজনৈতিক ভূমিকা রূপায়নে তাদের সমান দক্ষতা প্রমাণ করে চলেছেন।

১৯৫৭ সালে পাশ হয় পঞ্চায়েত আইন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার কার্যকারিতা স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। ভারতীয় জনসংখ্যার যে অধিকাংশ নারী, তাদের এবং আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে দুর্বল অনগ্রসর দলিতদের অংশগ্রহণ ব্যতীত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রহসন মাত্র। এমতাবস্থায় পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরা যে স্বাভাবিক কারণে নিম্নস্তরের ক্ষমতার আসনে স্থান পাবেন না, এই প্রত্যয় থেকে ১৯৫৯ সালে ত্রিস্তরভিত্তিক শাসনব্যবস্থায় মহিলা ও শিশুদের উন্নতিকল্পে অত্যন্ত দুজন মহিলাকে প্রতিনিধিত্ব করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এর পাশাপাশি তফশিলি জাতি/তফসিলি উপজাতির মহিলাদের জন্য আলাদাভাবে প্রতিনিধিত্ব করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পঞ্চায়েত আইন অনুসারে। কিন্তু শক্তিশালী গোষ্ঠীর সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা আদায়ের ক্ষেত্রে মহিলারা প্রতিনিধিত্ব লাভ করলেও ক্ষমতা লাভ করতে পারেনি। আর এই প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে আবার মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্য এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা না মানায় আবার ১৯৯২ সালে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধন করে মহিলাদের জন্য পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরে মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়। আর সেই নিয়ম অনুযায়ী পঞ্চায়েত প্রধানের সংরক্ষিত আসনে মহিলারা নির্বাচিত হয়ে আসতে থাকেন। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি পুরুষ সদস্যদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ফলে পুরুষরা নবনির্বাচিত মহিলা সদস্যদের সহজে মেনে নিতে পারেননি। এ কথা সত্য যে, নির্বাচিত মহিলাদের ৮০ শতাংশেরই কোন রাজনৈতিক ক্ষমতার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। কোন

রাজনৈতিক দলের পুরুষ সদস্যদের স্ত্রী, বোন অথবা মা হওয়াই ছিল তাদের একমাত্র যোগ্যতা। এ বিষয়ে Institute of Social Science এর অধিকর্তা জর্জম্যথু লিখেছেন, "During the election campaigning, these women were always projected as someone's wife, mother, sister or widow........... they attributed their victory in the elections to the political party or its leaders or the status of the male member in the family"[৮]যে দেশে শত শত বছরের সামাজিক ঐতিহ্য অনুসারে পরিবারের কোনো পুরুষের সূত্রেই নারীর পরিচয় হয়, সেখানে নারীর নিজস্ব কোন ব্যক্তিগত স্বাধীন সত্তা থাকতে দেওয়া হয়নি। স্থানীয় রাজনীতির ক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে এরকম হওয়াটা কিছু আশ্চর্যজনক নয়; বরং খুবই স্বাভাবিক। নির্বাচিত হওয়ার পরেও প্রথমদিকে শুধু মিটিং এর উপলক্ষ ছাড়া অধিকাংশ মহিলা পঞ্চায়েত অফিসে যেতেন না। আর মিটিং এর মধ্যেও তাদের বক্তব্য পেশ করতে ব্যর্থ হয়ে পঞ্চায়েত প্রধান অথবা সহ-প্রধানের নিকট নিজেদের বক্তব্য পেশ করতেন। কিন্তু খুব দ্রুত এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং মহিলাদের মধ্যে জাগরিত হয়েছে রাজনৈতিক তথা সামাজিক সচেতনতাবোধ।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে মহিলাদের এই অগ্রগতির পাশাপাশি বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনেও এই সাফল্যের ছবি প্রতিফলিত। বিগত দুই দশকে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ১৯৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে মহিলা বিধায়ক নির্বাচিত হন কুড়িজন যার মধ্যে ৯ জন সেই বারই প্রথম বিধায়ক নির্বাচিত হয়। ২০০১ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৮ জন যার মধ্যে ১৫ জন ছিলেন নবনির্বাচিত। ২০০৬ সালে ২৮ থেকে এই সংখ্যা হয় ৩৭ জন, যার মধ্যে ১৯ জন নতুন মুখ। এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো মহিলা বিধায়কদের তালিকায় সিংহভাগই বামফ্রন্টের প্রার্থী ছিলেন। ১৯৯৬ সালে ১৬ জন, ২০০১ সালে ১৯ জন এবং ২০০৬ সালে ২৯ জন মহিলা বামফ্রন্টের বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে ২০১১, ২০১৬ এবং ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে মহিলা বিধায়কদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৮, ৪৫ এবং ৪৮ জন। অর্থাৎ মহিলা বিধায়কদের শতাংশ হল এই তিনটি নির্বাচনে যথাক্রমে ৯.৭১, ১০.২ এবং ১১.৩৪ (source : TCPD-SPINPER Indian legislators dataset)।আবার বিগত লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছেন মহিলা সংসদরা। এই মহিলা সাংসদদের সংখ্যা ১২ শতাংশের মতো।

এই সামগ্রিক বিশ্লেষণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, রাজ্য রাজনীতিতে মহিলাদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ইতিপূর্বে মন্ত্রিসভায় আমরা রাষ্ট্রমন্ত্রী ও পূর্ণমন্ত্রী রূপে স্বল্প সংখ্যক মহিলাদের পেয়েছি। তবু কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় বিগত দুই দশক যাবত অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও এখনো পড়ে আছে মহিলা সংরক্ষণ বিলটি। সংসদ ও বিধানসভায় ৩৩ শতাংশ মহিলাদের সংরক্ষণ বিষয়ে এই

বিলটি নিয়ে আন্দোলনের শুরু সেই ১৯৯৫ সাল থেকে। বিস্তারিত আলোচনার পর বিলটি সংসদের সিলেক্ট কমিটি অনুমোদন করেছিল। কিন্তু বিলটি এখনো আইনে পরিণত হতে পারেনি। সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি এবং আরো বেশ কিছু মহিলা সংগঠন দীর্ঘদিন ধরেই বিলটি অনুমোদনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইউপিএ এবং এনডিএ সরকার কেউই এই বিলটি পাস করানোর জন্য উদ্যোগ নেয়নি। তাই যতবারই বিলটি লোকসভায় উত্থাপিত হয়েছে ততবারই কোন না কোন অছিলায় তাকে কার্যকর করা হয়নি। মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে এই দীর্ঘ টালবাহানায় যে শুধু মহিলাদের ক্ষতি হচ্ছে তা কিন্তু নয়, সংসদীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পক্ষে এই অনীহা অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং সার্বিকভাবে মহিলাদের ক্ষেত্রে অপমানজনক।

মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে এই যে দোটানা তা কিন্তু পরোক্ষে লিঙ্গ বৈষম্যকে সূচিত করে। আবার এটাও আমাদের ভেবে দেখা দরকার যে, আমাদের দেশের শাসন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রকেরা অনেকেই পুরুষতান্ত্রিক ধাঁচে শাসন ব্যবস্থাকে পরিচালিত করতে আগ্রহী। তাই নানা অছিলায় বারবার ফেরত পাঠানো হচ্ছে মহিলা সংরক্ষণ বিলটি। অথচ স্বাধীনতার ছয়দশক অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও আমাদের দেশে মহিলাদের সামাজিক অবস্থান এবং তাকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এখনো যথেষ্ট ভাবে বর্তমান। বিশ্বায়নের আগ্রগতি হওয়ায় এইসব সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপেয়েই চলেছে। ভোগবাদী উদার অর্থনীতির খোলা হওয়ায় এবং অবশ্যই গণমাধ্যমের দাপটে মেয়েরা আজ পণ্য। আমরা যেমন পণপ্রথা, বধূ নির্যাতন, কন্যা ভ্রূণ হত্যা, অনার কিলিং (সম্মান রক্ষার্থে হত্যা) এইসবের বিরুদ্ধে সেখানে বার বার সরব হই, সেখানে দূরদর্শনের সিরিয়াল বা জনপ্রিয় হিন্দি ও বাংলা চলচ্চিত্রে দিনের পর দিন এগুলোকেই পরোক্ষে আশ্রয় দেওয়া হয়। চটকদারি বাজারি অর্থনীতির এমনই টান তার জায়গায় আজ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যুবসমাজ। মেয়েরা কেমন ভাবে অবলীলায় এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শিকার হয়ে যাচ্ছে তার থেকে উপযুক্ত শিক্ষায় পারে তাকে বাঁচাতে। আর এই কাজে প্রয়োজন দক্ষ নেতৃত্বের। মেয়েরা মেয়েদের কথা বলতে পারে বা বুঝতে পারে এমন প্রবাদ বাক্যকে যদি আমরা মনে করি তাহলে এখনই তো সেই উপযুক্ত সময় যখন রাজনীতির আঙিনায় আরো বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত মহিলাদের। সংসদ বা বিধানসভায় যত বেশি মহিলারা নির্বাচিত হবেন ততই তারা তুলে ধরতে পারবেন মেয়েদের বঞ্চনার কথা। ত্রিস্তরভিত্তিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মহিলা প্রতিনিধিরা মা ও শিশুর পুষ্টি, স্বাস্থ্য সচেতনতা, সমবায় আন্দোলন, সাক্ষরতার ক্ষেত্রে যে নজির সৃষ্টি করেছেন, সারা ভারতেও তো তার প্রতিফলন দেখতে পারি আমরা, যদি আর একটু সচেতন হয়ে দেশের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাদেরকে কার্যকরী করে তোলার দিকে যত্নবান হই।

আসলে আমরা যতই নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির কথা বলি না কেন; কার্যত রাজনীতির অঙ্গন যতদিন অবধি সংঘর্ষ প্রবণ থাকবে ততদিন লিঙ্গ বৈষম্য মূল প্রত্যয়ে

স্থান পাবে না। পুরুষতান্ত্রিকতা যে হিংসা, বলপ্রয়োগ বা আধিপত্যকে চিহ্নিত করে, তা থেকে মহিলাদের বেরিয়ে আসা অনেকটাই দুরূহ ব্যাপার। আর এখানেই প্রশ্ন তোলা প্রয়োজন যে রাজনীতির পুরুষতান্ত্রিকতা বা রাষ্ট্রের কাঠামোগত হিংসাকে অপসারণ না করে শুধুমাত্র সংখ্যাগত পরিবর্তন কি আদৌ গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করবে? সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই। কিন্তু পাশাপাশি যুদ্ধ, হিংসা, পারস্পরিক বিদ্বেষ নির্ভর রাজনীতির বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রয়াস চালানো জরুরী। সেই প্রয়াসে নেতৃত্ব দেবেন নারী-পুরুষ উভয়েই; সমসংখ্যকভাবে। ১৯৯৪ সালে সুইডেনের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি একটি নীতি প্রণয়ন করেছিল সেটি হল, 'every second on the list a woman'[৯] অর্থাৎ পার্টি নেতৃত্বের বা প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে প্রথম নামটি পুরুষের হলে অবশ্যই দ্বিতীয় নামটি হবে কোন মহিলার।তাই নারী সমাজকে আরো রাজনৈতিক সচেতন হতে হবে, আরো ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজে অংশ নিতে হবে। সুতরাং দেশের এই সংকটকালে বিশেষ করে করোনা মহামারী, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, দুর্নীতি ও দুর্বিতায়ন যখন ভারতীয় রাজনীতিকে গ্রাস করে ফেলেছে, তখন তার থেকে মুক্তির অন্যতম উপায়হিসাবে শক্তিরূপী নারীকে আরো ব্যাপকভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং তার ফলেই বাসযোগ্য হবে দেশ দুনিয়া তথা পৃথিবী।

তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী, বাসবী, (২০১১), (সম্পা:), নারী পৃথিবী: বহুস্বর, উর্বী প্রকাশন, পৃ. ৩০০-৩০৫।

২. ঐ, পৃ. ৩০০-৩০৫।

৩. চক্রবর্তী, কুমারেশ, (২০১৭), ভারতের সংবিধান ও রাজনীতি, প্রগতিশীল প্রকাশন, পৃ.৪৮০-৪৮৬।

৪. মহাপাত্র, অনাদিকুমার, (২০১২), ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলেজ স্কোয়ার (পশ্চিম),পৃ.১০২৭-১০৫২।

৫. ঘোষ, হিমাংশু, (২০১০), ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, মিত্রম, পৃ.৫৫৭-৫৭৬।

৬. কুমারসরকার, কল্যাণ, (১৪২৫),নারীবাদ, লিঙ্গ রাজনীতি ও নারীর ক্ষমতায়ন এভেনেল প্রেস, পৃ.১০৮-১১৩।

৭. ঐ, পৃ.৮০-৮৬।

৮. ঐ, পৃ.১১৪-১১৯।

৯. ঐ, পৃ.৮৩।

১০. চক্রবর্তী, কুমারেশ, (২০১৭), ভারতের সংবিধান ও রাজনীতি, প্রগতিশীল প্রকাশক, পৃ. ৪৭৫-৫০৮।

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, (২০১২), নারীরা আজ যেখানে দাঁড়িয়ে: অন্ধকারে আলোর দিশা,মিত্রম প্রকাশন,পৃ.১২৫-১৪৪।

১২. চক্রবর্তী, বাসবী, (২০১১),(সম্পা:), নারী পৃথিবী: বহুস্বর, উর্বী প্রকাশন, পৃ.৩০০-৩০৫।

হুগলী জেলায় স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার (১৮১৮-১৯৪৭) : তথ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণ

প্রিয়াঙ্কা ঘোষ
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ঔপনিবেশিক আমলে ভারতে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের গৌরব মিশনারীদেরই প্রাপ্য। লন্ডন মিশনারী সোসাইটির যাজক রবার্ট মে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলী জেলার চুঁচুড়াতে প্রথম ১৪ জন ছাত্রী নিয়ে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন; এটি বাংলার প্রথম মহিলা বিদ্যালয়। অনেক সাধারন মানুষ তাঁদের জমির দান করেছিলেন মহিলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য, অনেক সম্মানিত ব্যক্তি ও নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য অর্থ প্রদান করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৭ সালের নভেম্বরের থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাসের মধ্যে হুগলী জেলাতে ২১টি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। নবজাগরণের প্রভাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আগ্রহ সঞ্চার হলেও বয়স্কা মহিলাদের পর্দার বাইরে আসা নিষিদ্ধ ছিল; কাজেই পর্দাপ্রথাকে মেনে নিয়ে বিশেষ এক শিক্ষার কথা ভাবা হয়েছিল তার নাম অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা বা জেনানা এডুকেশন। এই ধরণের শিক্ষার ক্ষেত্রে হুগলী জেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল উত্তরপাড়া হিতকারী সভা। স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে মিশনারীদের অবদান, বিদ্যাসাগর মহাশয় সহ অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষের প্রচেষ্টা, উত্তরপাড়া হিতকারী সভার অবদান, এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ সরকারের ক্রিয়াকলাপ বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে উক্ত নিবন্ধে ।

সূচক শব্দ : হুগলী, শিক্ষা, মিশনারী, হিতকারী সভা, জেনানা এডুকেশন, বিদ্যাসাগর।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে এসে এদেশে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম পর্বে তাঁরা প্রশাসনিক দিকটি ভালোভাবে লক্ষ্য রাখলেও শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন নজর দেননি। এমতাবস্থায় শিক্ষার শোচনীয় অবস্থার কথা ভেবে ১৮১৩ চার্টার অ্যাক্টের ৪৩নং ধারায় শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবছর এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার কথা ঘোষণা করা হয়। সেই সঙ্গে এদেশে মিশনারীদের ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে অনেকটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ভারতের স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের গৌরব মিশনারীদেরই প্রাপ্য। লন্ডন মিশনারী সোসাইটির যাজক রবার্ট মে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলী জেলার চুঁচুড়া শহরে প্রথম ১৪টি ছাত্রী নিয়ে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটি বাংলা তথা এদেশের প্রথম স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয় বলে মনে করেন স্যার উইলিয়াম অ্যাডাম। অবশ্য ১৮১৮

সালের ১২ ই আগস্ট মে'র মৃত্যুর পর তৎকালীন কোম্পানির সরকার বিদ্যালয়টি শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

বামাবোধিনী পত্রিকার একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায় ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরের বেবি হানা মার্শম্যান একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ ১৮১৬-১৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের একটি ছেলেদের স্কুলের মাঝে বেড়া দিয়ে পৃথক করে ক্লাসে কয়েকটি বালিকাকে পড়াবার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু স্বতন্ত্র কোন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেননি। ১৮২৩ সালে শ্রীরামপুরে মিশনারীদের দ্বারা দুটি নেটিভ মহিলা স্কুল শুরু হয়েছিল। একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, অপরটি খ্রিষ্টান গ্রামীণ বিদ্যালয়। বিদ্যালয় দুটি ১৮৩৫-৩৮ সাল নাগাদ চালু ছিল। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়টিতে ১৮৮ জন ছাত্রী এবং খ্রিস্টান গ্রামীণ বিদ্যালয়টিতে ১৪ জন ছাত্রী ছিল। পড়তে সক্ষম শিক্ষার্থীদের তাল পাতার ওপর লিখন অভ্যাস এবং শিশুদের প্রথম বই, মা এবং মেয়ের কথোপকথন, বাইবেলের ইতিহাস, বাংলায় ঈশপের উপকথা ইত্যাদি শেখানো হয়। পরবর্তীতে তাদের কপি বইয়ে লিখতে শেখানো হয়, বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট, ওল্ড টেস্টামেন্ট, ইন্ডিয়ান ইউথ ম্যাগাজিন এবং পিয়ারসন-এর ভূগোল পড়তে শেখানো হয়, এমনকি বাংলাতে পাটিগণিতের শিখনও তাদের দেওয়া হয়। অল্প বয়সী খ্রিস্টান বিধবারা, যাঁরা নিজেরা মিশনারী স্কুলের শিক্ষিত ছিলেন তাঁদের এই স্কুলগুলিতে শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

মিশনারীগণ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিস্থাপনের পাশাপাশি ছাত্রীদের শিল্প-শিক্ষা দেয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও বয়স্কা কোনো মহিলা শিক্ষায় অনুরাগ দেখালে তাদের বিনামূল্যে শিক্ষিত করবার আপ্রাণ চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন। মিশনারী প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় গুলিতে প্রতিবছর পরীক্ষার ব্যবস্থা হতো, এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ছাত্রীদের দুই আনা, চার আনা করে পুরস্কার দেওয়া হতো। ১৮২৪ সালে ৫ই এপ্রিল গোপাল মল্লিক এর বাড়িতে একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় যেখানে বেবি মার্শম্যান স্বয়ং ছাত্রীদের বস্ত্র, পয়সা, শিকি ইত্যাদি উপহার প্রদান করেছিলেন। এই সময় বালিকারা তাদের নিজের হাতে তৈরি রুমাল, মোজা, ও ব্যাগ ইত্যাদি শিল্পকর্ম প্রদর্শন করেছিল, যা দেখে সভায় উপস্থিত সকলে অনেক সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তবে মিশনারীদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই দেশীয় মানুষের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস থাকায় তাঁদের প্রচেষ্টা তেমনভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় গুলিতে নিম্ন বর্ণের ছাড়া কোন শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, উচ্চ পরিবারের মেয়েরা যোগদান করেনি।

খ্রিস্টান মিশনারীগণ স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা করলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার তখনও এই শিক্ষার প্রতি উদাসীন ছিলেন। নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন তিনি বিশ্বাস করতেন যে নারীরা শিক্ষিত না হলে ভারতীয় সমাজ কখনো উন্নত হতে পারবে না। তাই তিনি জেলাগুলিতে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারের জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন। ১৮৫৭

সালের প্রথমদিকে ছোটলাট হিসাবে হ্যালিডে সাহেব বাংলায় আসেন, তিনি স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরের সহযোগিতায় স্থির করেন যে, যে গ্রামের মানুষ বিদ্যালয় তৈরির জন্য জমি দান করবে, সেই গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। সেই সময় দক্ষিণবঙ্গের স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টর প্রাট সাহেব গ্রাম গুলির কাছ থেকে তিনখানি পত্র পান। এর মধ্যে দুটি পত্র ছিল হুগলী জেলার হরিপাল থানার অন্তর্গত দারহাটা গ্রাম থেকে এবং সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত গোপালনগর গ্রাম থেকে। তৃতীয় পত্রটি পেয়েছিলেন বর্ধমান জেলা নারোগ্রাম থেকে।[৬] আবেদনপত্র তিনটি প্রাট সাহেব ছোট লাটের কাছে পাঠান, এবং ছোট লাট সাহেব দরখাস্ত তিনটিই মঞ্জুর করেন। প্রত্যেক স্থানে গ্রামবাসীগণ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জমি প্রদান করেছিলেন। ১৮৫৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাস - এই সাত মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় হ্যালিডে সাহেবের সহযোগিতায় হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং নদিয়া জেলায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসিক খরচ হতো ৮৪৫ টাকা। এখানে হুগলী জেলার বালিকা বিদ্যালয়ের একটি তালিকা ৫ আগস্ট ১৮৫৮ সালের এডুকেশন কনসালটেশন এর রিপোর্ট থেকে প্রদত্ত হল।[৭]

সারণী - ১

গ্রামের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	মাসিক খরচ
পোলবা	২৪ শে নভেম্বর, ১৮৫৭	২৯ টাকা
দাসপুর	২৬শে নভেম্বর, ১৮৫৭	২০ টাকা
বৈঁচি	১লা ডিসেম্বর, ১৮৫৭	৩২ টাকা
দিগশুই	৭ই ডিসেম্বর, ১৮৫৭	৩২ টাকা
তালাণ্ডু	৭ই ডিসেম্বর, ১৮৫৭	২০ টাকা
হাতিনা	১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৫৭	২০ টাকা
হায়রা	১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৫৭	২০ টাকা
ন'পাড়া	৩০শেজানুয়ারি, ১৮৫৮	১৬ টাকা
উদয়রাজপুর	২রা মার্চ, ১৮৫৮	২৫ টাকা
রামজীবনপুর	১৬ই মার্চ, ১৮৫৮	২৫ টাকা
আকবরপুর	২৮ শে মার্চ, ১৮৫৮	৩৫ টাকা
শিয়াখালা	১লা এপ্রিল, ১৮৫৮	২০ টাকা
মাহেশ	১লা এপ্রিল, ১৮৫৮	২৫ টাকা
বীর সিংহ	১লা এপ্রিল, ১৮৫৮	২০ টাকা
গোয়ালসাড়া	৪ঠা এপ্রিল, ১৮৫৮	২৫ টাকা
দন্ডিপুর	৫ ই এপ্রিল, ১৮৫৮	২৫ টাকা
দেপুর	১লা মে, ১৮৫৮	২৫ টাকা

রাউজারপুর	১লা মে, ১৮৫৮	২৫ টাকা
বদনগঞ্জ	১০ই মে, ১৮৫৮	৩১ টাকা
মলয়পুর	১২ই মে, ১৮৫৮	২৫ টাকা
বিষ্ণুদাসপুর	১৫ই মে, ১৮৫৮	২০ টাকা

তথ্য সূত্র: ৫ই আগস্ট আর ১৮৫৮ সালের এডুকেশন কনসালটেশন থেকে প্রদত্ত রিপোর্ট।

ওপরের সারণীটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় হ্যালিডে সাহেবের সহযোগিতায় হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলায় যে ৩৫ টি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে হুগলী জেলাতেই ২৪ শে নভেম্বর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫ মে, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মোট ২১ টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার থেকে বিদ্যালয় গুলির খরচার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের পর আর্থিক অনটনের কারণে সরকার সাহায্য দিতে অস্বীকার করেন। এর ফলে বিদ্যাসাগর মহাশয় “নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান” নামক একটি ভান্ডার তৈরি করেন এবং পাইকপাড়া রাজা প্রতাপচন্দ্র, সিংহ বাহাদুর প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আর্থিক সাহায্য করায় স্ত্রী শিক্ষা সেই সময় অনেকটা প্রসার লাভ করেছিল।

নবজাগরণের প্রভাবে স্ত্রী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সঞ্চার হলেও বয়স্কা মহিলাদের পর্দার বাইরে আসা নিষিদ্ধ ছিল। কাজেই পর্দা প্রথাকে মেনে নিয়ে বিশেষ এক শিক্ষার ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছিল তার নাম অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা বা জেনানা এডুকেশন। এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রথম হদিশ মেলে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ট কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় লিখিত ভারতীয় স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধে। হুগলী জেলাতে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে বাবু হরিহর চ্যাটার্জি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উত্তরপাড়া হিতকারী সভার অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক কর্মদ্যোগ বিশেষ প্রশংসনীয়। দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত করা, অসহায়, সহায় সম্বলহীন অসুস্থদের বস্ত্র ও ওষুধ বিতরণ করা, এবং দরিদ্র বিধবা মহিলাদের সহায়তা করা, পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে স্ত্রী শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান করা ছিল এই সভার অন্যতম লক্ষ্য। হিতকারী সভা পূর্ব প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয় ও বাংলা স্কুল (যেটি জয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে) দুটি প্রতিষ্ঠানেরই দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সুপরিচালনার গুনে উত্তরপাড়ার স্ত্রী শিক্ষার প্রসার কিরূপ সাফল্যমন্ডিত হয়েছিল তা জানা যায় বঙ্গের শিক্ষাধিকারিকের ১৮৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষের বিবরণী থেকে। চন্দননগরে যখন ছাত্রীসংখ্যা ২০, বালিতে ৪২, কোন্নগরে ৩২ এমনকি কলকাতার বেথুন স্কুলে ১০৩ জন সেখানে উত্তর পাড়ায় ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১০৬। স্ত্রী শিক্ষায় উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য হুগলী ও হাওড়া জেলায় পরীক্ষা নেওয়ার শুরু করে ১৮৬৫ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠান।

সারণী - ২

বছর	প্রথম পরীক্ষা (জুনিয়র এক্সাম) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	দ্বিতীয় পরীক্ষা (সিনিয়র এক্সাম) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	তৃতীয় পরীক্ষা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা
১৮৬৫	২৬জন	×	×
১৮৬৬	২৬ জন	১৩ জন	×
১৮৬৭	১১ জন	১৯ জন	৭ জন

তথ্য সূত্র: দ্য সিক্সথ অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্য উত্তরপাড়া হিতকারী সভা, ১৮৬৮-১৮৬৯ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য।

১৮৬৫ সালে সভা কর্তৃক বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ এর প্রথম বছরে আটটি বালিকা বিদ্যালয় এর মোট ২৬ জন বালিকা প্রথম পরীক্ষায়, দ্বিতীয় বছরের ৩৯ জনের মধ্যে ২৬ জন জুনিয়ার এক্সাম বা প্রথম পরীক্ষায়, ১৩ জন সিনিয়র এক্সামে বা দ্বিতীয় পরীক্ষায় বসেছিলেন। তৃতীয় বছরের প্রথম, দ্বিতীয় এবং শেষ পরীক্ষা দিলেন যথাক্রমে ১১ জন ১৯ জন এবং ৭ জন পরীক্ষার্থী। সভার কার্যক্রম শুধু বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বয়স্কা নারীদের শিক্ষার জন্য অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষারও আয়োজন করেছিল এই হিতকারী সভা।[১৩] তৃতীয়বার অর্থাৎ শেষ পরীক্ষায় যে বালিকারা বৃত্তি পেতেন তাঁরা যাতে আরো পড়াশোনা করেন সেই কারণে সভা ঠিক করে বালিকারা এক বছর অন্তঃপুরে থেকে অন্তঃপুরিকার পাঠক্রম অনুশীলন করলে তবে পরবর্তী পরীক্ষায় অর্থাৎ চতুর্থ পরীক্ষার বৃত্তি লাভ করতে পারবেন।[১৪]

তবে অন্তঃপুরীকার পরীক্ষার ক্ষেত্রে হিতকারী সভা আশানুরূপ ফল পায়নি। এর কারণ ছিল বালকদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের আগ্রহ থাকলেও বালিকাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের কোন উৎসাহ ছিল না। ১৮৭০-৭১ এর বার্ষিক বিবরণীতে স্ত্রী শিক্ষা প্রসঙ্গে এই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন হিতকারী সভা।[১৫] বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া, বাংলার এই জেলা গুলির স্ত্রী শিক্ষা অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল, এর কারণ ছিল উত্তরপাড়া হিতকারী সভার সহযোগিতা।[১৬] তাই স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার হিতকারী সভার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে মিশনারীদের উদ্যোগে এবং দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে সরকারি সহযোগিতায় মহিলাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলেও সরকার স্ত্রী শিক্ষার প্রতি তখনও কোন আশানুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তবুও সমস্ত বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে নারীরা শিক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, এর অন্যতম কারণ হলো সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি। ১৮৭১-৭২ এর উইলিয়াম হান্টারের রিপোর্ট অনুযায়ী, হুগলী জেলায় ২২ টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল। রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৭২ সালে ৩১ শে মার্চ বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬৩৪ জন। জেলার সেরা মেয়েদের

স্কুল ছিল উত্তরপাড়া, বালি এবং কোননগর। এর পরবর্তীতে ছিল হুগলী শহরের শ্রীরামপুর এবং ঘুটিয়া বাজারের স্কুল। উত্তরপাড়া এবং ঘুটিয়া বাজারে স্কুল দুটি ছিল জেলার দুটি বৃহত্তম বিদ্যালয়। এই স্কুল দুটিতে ১৮৭১-৭২ সালের শেষের দিকে যথাক্রমে ৪৯ জন ও ৫৩ জন ছাত্রী ছিল।

১৯০৮-০৯ সাল নাগাদ হুগলী জেলাতে মোট ১৫৯ টি মহিলা স্কুল ছিল যেখানে ৩৫৭৩ জন ছাত্রী পড়াশোনা করতো। এছাড়াও ৯৫৯ জন ছাত্রী পড়াশোনা করতো কোয়েট স্কুলে এবং ২০জন পড়তো মক্তবে। অর্থাৎ সবমিলিয়ে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪৮৮২ জন। এই স্কুল গুলির মধ্যে ১৪ টি ছিল অনুদান বিহীন এবং ১৪৫টি ছিল সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত। বালিকা বিদ্যালয়গুলি বেশিরভাগই পুরুষ শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হতো। মিশনারীদের ১৮টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল যার মধ্যে ১৩ টি ছিল অনুদানবিহীন এবং পাঁচটি ছিল সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়।

সারণী - ৩

বছর	স্কুল সংখ্যা	ছাত্রীর সংখ্যা
১৮৭১-৭২	২২ টি	৬৩৪জন
১৯০৮-০৯	১৫৯টি	৩৫৭৩জন

তথ্য সূত্র: ১৮৭১-৭২ এর ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার রিপোর্ট এবং হুগলি ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার প্রদত্ত তথ্য।

অর্থাৎ ১৮৭১-৭২ সালের উইলিয়াম হান্টারের রিপোর্ট অনুযায়ী, হুগলী জেলায় মোট বালিকা বিদ্যালয় ছিল ২২ টি এবং তার ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৬৩৪ জন। ১৯০৮-০৯ সালে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫৯টি এবং ৩৬ সংখ্যা হয় ৩৫৭৩ অর্থাৎ মাত্র ৩৭ বছরের ব্যবধানে বিদ্যালয় সংখ্যা ৭২২.৭ শতাংশ এবং ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৫৬৩.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ১৯০১, ১৯১১ ও ১৯২১ সালের গেজেটিয়ার রিপোর্ট লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি ছিল যথেষ্টই কম।

সারণী - ৪

বছর	ধর্ম	মোট শিক্ষিত জনসংখ্যা	মোট শিক্ষিত পুরুষ	মোট শিক্ষিত মহিলা
১৯০১	হিন্দু	৯৭,৩৩১	৯০,৭০৪	৬,৬২৭
	মুসলিম	১৩,৭০৪	১৩,১৯৮	৫০৬
১৯১১	হিন্দু	১০৫,৬৯৬	৯৫,৭৩২	৯,৯৬৪
	মুসলিম	১৫,৬৮৮	১৪,৯৬৭	৭২১
১৯২১	হিন্দু	১,২২,১৯৮	১,০৮,০০৫	১৪,১৯৩
	মুসলিম	১৭,৩২৩	১৭,২০১	৭২৭

তথ্য সূত্র: ১৯০১, ১৯১১ ও ১৯২১ সালের ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার প্রদত্ত রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষিত হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের পরিসংখ্যান।

১৯০১ সালে গেজেটিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী হুগলী জেলার মোট শিক্ষিত হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৯৭,৩৩১ জন এবং মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১৩,৭০৪ জন। হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষিত পুরুষ সংখ্যা ছিলেন ৯০,৭০৪ জন এবং স্ত্রীর সংখ্যা ছিলেন ৬৬২৭ জন। মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষিত পুরুষ ছিলেন ১৩,১৯৮ জন এবং শিক্ষিত মহিলা ছিলেন মাত্র ৫০৬ জন।[১৯] অর্থাৎ পরিসংখ্যান থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারছি যে, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল যথেষ্টই কম। বিশেষ করে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার আলো সেইভাবে পৌঁছাতে পারেনি। এর একমাত্র কারণ হলো সামাজিক সচেতনতার অভাব। ১৯১১ সালের রিপোর্ট অনুসারে হুগলী জেলার মোট শিক্ষিত জনসংখ্যার ১ লক্ষ ৫ হাজার ৬৯৬ জন ছিলেন হিন্দু এবং ১৫ হাজার ৬৮৮ জন ছিলেন মুসলিম। মোট শিক্ষিত জনসংখ্যার ৯৯৬৪ জন ছিলেন হিন্দু মহিলা এবং মোট মুসলিম শিক্ষিত জনসংখ্যার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ছিল মাত্র ৭২১ জন।[২০] ১৯২১ সালে রিপোর্ট অনুযায়ী মোট শিক্ষিত জনসংখ্যার ১ লক্ষ ২২ হাজার ১৯৮ জন ছিলেন হিন্দু, এবং মাত্র ১৭ হাজার ৩২৩ জন ছিলেন মুসলিম। হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষিত মহিলার সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার ১৯৩ জন এবং মুসলিমদের মধ্যে ছিল ৭২৭ জন। মোট জনসংখ্যার ৩.৩ শতাংশ ছিলেন শিক্ষিত হিন্দু মহিলা, এবং মাত্র দশমিক আট শতাংশ ছিলেন শিক্ষিত মুসলিম মহিলা।[২১] সুতরাং পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলেও সেই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল অত্যন্ত ধীর গতিসম্পন্ন।

সারণী - ৫

বছর	মোট শিক্ষিত পুরুষ	মোট শিক্ষিত মহিলা	শিক্ষিত পুরুষের হার	শিক্ষিত মহিলার হার
১৯৩১	১,৩৪,৮৬১	২০,১৪৯	২২.৭৮ শতাংশ	৪.০০ শতাংশ
১৯৪১	২,৪৭,১৪৯	৭২,৬৩৯	৩৩.৪৬ শতাংশ	১১.৩৬ শতাংশ

তথ্য সূত্র: ১৯৩১ ও ১৯৪১ এর সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী প্রদত্ত তথ্য।

মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেতে থাকে ১৯৩১ এর পর বছর গুলি থেকে। ১৯৩১ সালে পরিসংখ্যান অনুযায়ী শিক্ষিত পুরুষ সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮৬১ জন এবং শিক্ষিত মহিলার সংখ্যা ছিল ২০ হাজার ৮৭৪ জন। অর্থাৎ ২২.৭৮ শতাংশ ছিলেন শিক্ষিত পুরুষ এবং চার শতাংশ ছিলেন শিক্ষিত মহিলা। ১৯৪১ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ১৫৯ জন এবং শিক্ষিত মহিলার সংখ্যা ছিল ৭২ হাজার ৬৩৯ জন। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৩৩.৪৬ শতাংশ ছিলেন শিক্ষিত পুরুষ এবং ১১.৩৬ শতাংশ ছিলেন শিক্ষিত মহিলা।[২২] মাত্র

চার শতাংশ থেকে ১১.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের একটি উজ্জ্বলতম দিক। অর্থাৎ ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে মহিলাদের শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এর কারণ ছিল সরকারি সহযোগিতা, বিশেষত স্থানীয় প্রশাসন এবং সমাজের মানুষের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ব্রিটিশ সরকার স্ত্রী শিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ সঞ্চার করেছিলেন, ফলে ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধেও স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার লাভ করে মিশনারীদের হাত ধরে। তাই স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে তাঁদের গুরুত্বকেও কখনো অস্বীকার করা যায় না। শুধু মিশনারীরা নয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং স্থানীয় জমিদার ও সাধারণ মানুষও স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। সমাজের সম্মানীয় ব্যক্তিরা এটা বুঝতে সক্ষম হন যে নারী শিক্ষার প্রসার ছাড়া সমাজের সকল স্তরের উন্নতি সম্ভব নয়। পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যায় যে, সমাজ যত এগিয়েছে স্ত্রী শিক্ষা ও ততো প্রসার লাভ করেছে। জেলার ১৯৩১ এর পরিসংখ্যান এবং ১৯৪১ এর পরিসংখ্যান তুলনামূলকভাবে যাচাই করলে দেখা যাবে যে ১০ বছরে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের হার চার শতাংশ থেকে ১১.৩৬ শতাংশতে পৌঁছেছে। নারী শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে দেখা যায় যে নারীরা ভালো-মন্দ, ঠিক-ভুল বিচার করতে শেখেন, তাঁরা আর ঘরকুনো হয়ে বসে থাকেন না। রাজনীতিতে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। বহু শিক্ষিত নারী সামনে এসে আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন - এটাই নারী শিক্ষার সার্থকতা।

তথ্যসূত্র:

১. William Adam, Reports on the state of education in Bengal (1835-1838), edited by Anath Nath Basu, Calcutta University Press, 1941, p.67

২. বামাবোধিনী পত্রিকা, ১৩০৬, আধুনিক স্ত্রী শিক্ষার ইতিবৃত্ত, পৃ:১৬৫

৩. Reports on the state of education in Bengal (1835-1838), op.cit., p.68

৪. সুধীর কুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ, খণ্ড-১, মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬২, পৃ:৩৬৯

৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যে বঙ্গমহিলা, Bethune College and School Centenary Volume 1849-1949, Sree Saraswati Press Limited, 1951, p.195

৬. সুধীর কুমার মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ:৩৭১

৭. Education Consultation Report, 1858, p.95
৮. সুধীর কুমার মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ:৩৭৩
৯. ভারতবর্ষ,একাদশ বর্ষ, প্রথম খন্ড, বাংলাদেশের বালিকা ও অন্তঃপুরিকাদের মধ্যশিক্ষা, মনীন্দ্রনাথ রায়, আষাঢ়, ১৩৩০, পৃ:৮২
১০. Bethune College and School Centenary Volume 1849-1949, op.cit., Social and Educational Movement for Women and by Women 1820-1950, Latika Ghosh, p:129
১১. S.S. O'Malley, Monmohan Chakravarti, Bengal District Gazetteers: Hooghly, The Bengal Secretariat Book Depot, 1912, p.238
১২. বসন্তকুমার সামন্ত, হিতকারী সভা : স্ত্রী শিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, সাহিত্যলোক কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ:৩৪
১৩. যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার নব্য সংস্কৃতি, বিশ্বভারতী, ১৯৫৮, পৃ:৭৬-৭৭
১৪. The Annual Report)75th ,76th ,77th ,78th(of the UttarparaHitakari Sabha, 41-1938, p.70
১৫. The Eight Annual Report of the OotterparaHitakari Sabha for the year, 1870-1871, p.13
১৬. বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৮৮, বঙ্গদেশে শিক্ষাবিবরণ ও স্ত্রী শিক্ষা, ১৮৮০-৮১, পৃ:৩৪৪
১৭. W.W Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol.lll, First published, Trubner& co., London, 1876, First reprinted, D.K publishing house, Delhi, 1973, p.405
১৮. S.S. O'Malley, op.cit., p.237
১৯. Bengal District Gazetteer, Hooghly district statistics 1901-1902, vol. A, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1902, p.23-24
২০. Bengal District Gazetteer, Hooghly district statistics 1901-1902 to 1911-1912, vol. B, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1913, p.26
২১. Bengal District Gazetteer, Hooghly district statistics, 1911-1912 to 1920-21, vol. B, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1923, p.26
২২. Statistical Abstract West Bengal, 1958, Superintendent Government Printing, West Bengal Government Press, Alipore, 1960, p.109

ভারতে প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলন : প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ

সৈকত মিত্র
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ,
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার : ভারতবর্ষের প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলনের সূচনা কালটি বিতর্কিত। একথা ঠিক যে মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিবন্ধীদের অধিকার গুলির আইনি বা সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী নিয়ে এদেশে আন্দোলন শুরু হয় ১৯৮০ –র দশকে; কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই, প্রায় স্বাধীনতার সময় থেকেই বিক্ষিপ্ত ভাবে হোলেও এদেশে প্রতিবন্ধীদের আন্দোলন চলেছিল। ভারতবর্ষের প্রতিবন্ধী আন্দোলনের ধারাকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হোল – ১) স্বাধীনতা পরবর্তী দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের আন্দোলন (১৯৪৭ - ১৯৮৬); ২) সর্ব-প্রতিবন্ধকতা (cross-disability) যুক্ত সংগঠন গুলির আন্দোলন (১৯৮৬ - ১৯৯৫); ও ৩) ১৯৯৫ সালের ‘প্রতিবন্ধী আইন’ পরবর্তী আন্দোলন (১৯৯৫ - ২০১৬)। আলোচ্য প্রবন্ধে ভারতের প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলনের সূচনা ও তার বিভিন্ন ধারা; পশ্চিমবঙ্গে তার কি প্রভাব পড়েছিল এবং এক্ষেত্রে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর’ যে বিশেষ ভূমিকা তা তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, অনেকেই ‘প্রতিবন্ধী’ শব্দের পরিবর্তে ‘প্রতিস্পর্ধী’ শব্দটি ব্যবহারের পক্ষে মত দেন; কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে ‘প্রতিবন্ধী’ শব্দটি সমাজে অবস্থিত প্রতিবন্ধকতাকে (social barrier) বোঝাতে ব্যবহিত হয়েছে, এক্ষেত্রে ব্যক্তির শারীরিক সক্ষমতা কিংবা অক্ষমতার বিষয়টি বিবেচ্য নয়।

মূলশব্দ : প্রতিবন্ধকতা, নাগরিক ও মানবাধিকার আন্দোলন, প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী, প্রতিবন্ধী অধিকার আইন।

ভারতে প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলনের সূচনা মূলত দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের আন্দোলনের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে ব্যারিস্টার সাধন চন্দ্র গুপ্ত ও কলকাতার ‘ব্লাইণ্ড পারসন্‌স অ্যাসোসিয়েশান’ –র কার্যকলাপ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। কলকাতায় ‘ব্লাইণ্ড পারসন্‌স অ্যাসোসিয়েশান’ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। ‘ব্লাইণ্ড পারসন্‌স অ্যাসোসিয়েশান’ –এর প্রাণপুরুষ ছিলেন ব্যারিস্টার সাধন চন্দ্র গুপ্ত। দীর্ঘদিন তিনি এই সংস্থার সভাপতি ছিলেন। একজন দৃষ্টিহীনব্যক্তি হিসাবে স্বয়ং সাধন চন্দ্র গুপ্ত এমন সাফল্য অর্জন করেছিলেন যা একজন তথাকথিত সাধারণ ব্যক্তির পক্ষেও ছিল প্রায় অসম্ভব। তিনি ‘কলকাতা ব্লাইন্ড স্কুল’ – এ পড়াশোনা করেন এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার করেছিলেন। স্কুল জীবন শেষে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং স্নাতক হন। এরপর তিনি লন্ডন থেকে বার-অ্যাট-ল পাস

করেন এবং ব্যারিস্টার হন। তিনি ছিলেন কলকাতার একজন প্রখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ। শ্রী গুপ্ত ব্যারিস্টার হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে তিনি দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে সাংসদ হিসাবে লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব করেন এবং পরবর্তীতে দক্ষিন কলকাতার কালীঘাট কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হন। ব্যারিস্টার গুপ্ত কলকাতা হাইকোর্টে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীকালে অ্যাডভোকেট গুপ্ত ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী’ -র সহ-সভাপতি হিসাবে ১৯৯০-র দশকে প্রতিবন্ধী আইনের খসড়া তৈরির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।[১]

ভারতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে ১৯৭০-র দশকের দিল্লীর দৃষ্টিহীনদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত প্রতিবন্ধীদের নিজেস্ব, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অধিকার আন্দোলন (self-advocacy movement) এর আদলে ১৯৭০ সালে দিল্লীর বিশিষ্ট দুই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শ্রী অখিল কুমার মিত্তল ও শ্রী জওহরলাল কৌল্ দিল্লীতে গড়ে তোলেন 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ্ ব্লাইন্ড'। ফেডারেশন ১৯৭০ সাল থেকেই তাদের কার্যকলাপ শুরু করলেও তাদের প্রথম উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী ছিল ১৯৭৭ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের ‘অফিস স্বারকলিপিকে’ (office memorandum) কেন্দ্র করে।১৯৭৭ সালে ভারত সরকার দেশের প্রতিবন্ধী নাগরিকদের উন্নতিকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরিতে ৩ শতাংশ সংরক্ষণের প্রস্তাব করে একটি প্রস্তাব পাশ করে। এই প্রস্তাবে ১ শতাংশ করে অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী; দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং বাক ও শ্রবণ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী দের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রুপ – সি ও ডি পদের চাকরিতে সংরক্ষণের প্রস্তব করা হয়। এই সংরক্ষণের প্রস্তাব বাস্তবে ছিল অপরিকল্পিত ও লোক দেখানো, কারণ প্রতিবন্ধীদের জন্য এই প্রকারের সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছিল সংবিধান বিরোধী, কারণ একামত্র তফশিলি জাতি ও উপজাতি ছাড়া আন্য কোন শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা সংবিধান স্বীকৃত ছিল না।প্রকৃত পক্ষে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের সংরক্ষণের বিষয়টি ১৯৯৫ সালের প্রতিবন্ধী আইন পাশের মাধ্যমে ফলপ্রসূ হয়, অর্থাৎ ১৯৭০ –এর দশকের আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয় প্রায় ২৫ বছর পরে।[২]

ইতিমধ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৮১ সালকে 'আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বছর' (International Year of Disabled Persons) ঘোষণা করে। ১৯৭৭ সালের অফিস মেমোরান্ডামের সরকারী চাকরীর সংরক্ষণের আন্দোলনের ব্যর্থতা ১৯৮১ সালের আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বৎসরের আন্দোলনকে তীব্রতর করে তোলে। 'আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বছর' –এর কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার দেশের প্রতিবন্ধী নাগরিকদের উন্নতিকল্পে একটি ‘ন্যাশনাল অ্যাকশান প্লান’ –এর ঘোষণা করে। এই ঘোষণায় প্রতিবন্ধীদের সংরক্ষণের বিষয়টি ছিল এবং এর সাথে ছিল দেশে প্রতিবন্ধী

নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় একটি পূর্ণাঙ্গ ও শক্তিশালী আইন প্রণয়নের বিষয়টি। অ্যাকশান প্লানের প্রস্তাব গুলির দ্রুত প্রণয়নের দাবীতে দেশের প্রতিবন্ধীরা ঝাপিয়ে পড়ে এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকে দিল্লীর 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ্ ব্লাইন্ড' ও সারা ভারত জুড়ে তাদের শাখা সংগঠন গুলি। ১৯৮৭ সালে এই আন্দোলন কিছুটা সাফল্যলাভ করে; ২৩৯ দৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে ভারত সরকার চাকরিতে নিয়োগ দেয়। এই ঘটনা ফেডারেশন নেতৃত্বের মনোবল এবং শক্তি বৃদ্ধি করে।[৩]

১৯৮৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বাহারুল ইসলামের অধীনে একটি কমিটি গঠন করে দেশের প্রতিবন্ধী নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য একটি খসড়া আইন (draft law) তৈরির জন্য। ‘জাস্টিস বাহারুল ইসলাম কমিটি’ ১৯৮৮ সালের প্রথম দিকে তার রিপোর্ট পেশ করে, তাতে সমস্ত ধরনের প্রতিবন্ধীদের জন্য ৪ শতাংশ সংরক্ষণের প্রস্তাব করা হয় এবং এই সংরক্ষণ শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরীর গ্রুপ – সি ও ডি পদেই নয়, সমস্ত পদকেই এই সংরক্ষনের আওতায় আনার প্রস্তাব দেওয়া হয়; এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরীর পদ ছাড়াও রাজ্য সরকারী ও সরকার অধিনস্ত (government undertaking) প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী সংস্থার জন্যেও এই পরিকল্পনা করা হয়।শুধুমাত্র চাকরিতে সংরক্ষণই নয়, এই রিপোর্টে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি ব্যপক ও সর্বাঙ্গীণ আইনের (comprehensive disability legislation)সুপারিশও করা হয়।[৪]

‘জাস্টিস বাহারুল ইসলাম কমিটি’-র প্রস্তাবের পরেই ফেডারেশনের আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে। ফেডারেশনের বরিষ্ঠ নেতা সন্তোষ কুমার রুংতা ১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পুনঃনির্বাচিত হন এবং রুংতা স্পষ্ট করেন যে এখন থেকে প্রতিবন্ধী আইন প্রণয়নের আন্দোলনই তাদের মুখ্য কর্মসূচী হতে চলেছে। রুংতার নেতৃত্বে ফেডারেশনের সদস্যরা ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরের শুরুতে সারা ভারত ব্যাপী একটি বিক্ষোভ আন্দোলনের আয়োজন করেন। ফেডারেশনের সাথে যুক্ত হয় ‘অল ইন্ডিয়া কনফেডারেশন অফ ব্লাইন্ড’ও ‘ন্যাশনাল ব্লাইন্ড ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশান’ ও তাদের দেশ ব্যাপী শাখা সংগঠন গুলি। দীর্ঘ আন্দোলনের পর তারা ১৯৮৯ সালে রাজীব গান্ধী সরকারের সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী রাজেন্দ্র কুমারী বাজপেয়ীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন।ইতিমধ্যে রাজীব গান্ধী সরকারের পতন ঘটে। কেন্দ্রে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতিবন্ধী আইন পাশের দাবী নতুন ভাবে করা হয়। ভি. পি. সিংহ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী রাম বিলাশ পাসোয়ানের সাথে দেখা করে ফেডারেশনের প্রতিনিধিরা ‘প্রতিবন্ধী বিল’ পাশ করার জন্য বারংবার তদবির করেন। ১৯৯০ – র ডিসেম্বরের শেষে আরেকটি বিশাল সমাবেশের পর তারা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরেও একটি স্মারকলিপি দেন। পরবর্তীতে ফেডারেশন ১৯৯৩ সালের মে মাসের মাঝামাঝি প্রতিবন্ধী আইন পাশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে পুনরায় তদবির শুরু করেন এবং দিল্লীতে একটি

প্রতিবাদ সভাও আয়োজন করা হয়। ১৯৯৪ সালের আগস্টের শেষের দিকে আবারও ফেডারেশন দিল্লীতে আরেকটি বড় বিক্ষোভের আয়োজন করে। সরকার এই প্রতিবাদে সাড়া দিয়ে অবিলম্বে 'জাস্টিস বাহারুল ইসলাম কমিটি' –এর প্রস্তাব মেনে প্রতিবন্ধী আইন পাশ না করলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। দীর্ঘ প্রচার, বহু দফা আলোচনা, অবস্থান বিক্ষভ, প্রতিবাদ মিছিল, সাংবাদিক বৈঠক এবং কঠোর আন্দোলনের পর, ভারতীয় সংসদের উভয় কক্ষ কোন রকম আলোচনা ছাড়াই একই দিনে অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি আইন পাস করে।[৫]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান যে ভারতে প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলন প্রাথমিক ভাবে শুরু হয়েছিলো দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের দ্বারা। অর্থাৎ ভারতের প্রতিবন্ধীদের আন্দোলনের প্রথম পর্যায় ছিল একটি 'নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতা যুক্ত আন্দোলন' (impairment specific movement)যা ১৯৮৮ সালে 'জাস্টিস বাহারুল ইসলাম কমিটি' –এর রিপোর্ট পেশের পর পরই একটি 'সর্ব প্রতিবন্ধকতা যুক্ত আন্দোলনে' (cross-disability movement) পরিণত হয়। ভারতের 'সর্ব প্রতিবন্ধকতা' আন্দোলনের আলোচনার ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে ভারতবর্ষে প্রথম 'সর্ব প্রতিবন্ধকতা' যুক্ত সংগঠন যারা সকল প্রকার প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিয়ে কাজ শুরু করেছিল তারা হোল ১৯৮৬ সালে কলকাতাতে প্রতিষ্ঠিত 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী'।[৬]আবার ১৯৯৫ সালের প্রতিবন্ধী আইন পাশের ক্ষেত্রে দিল্লীর 'সর্ব প্রতিবন্ধকতা' (cross-disability) সংগঠন 'ডিসাবিলিটি রাইট্স গ্রুপ' –এর বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৯৯৪ সালে দিল্লীতে 'ডিসাবিলিটি রাইট্স গ্রুপ' প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর জাভেদ আবিদি এবং বিখ্যাত মার্কিন প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ জুডি হিউম্যান এবং জাস্টিন ডার্টের সহায়তায় এবং উৎসাহে দিল্লীতে ডিসাবিলিটি রাইট্স গ্রুপ গঠিত হয়।[৭]

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী' –এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো ১৯৮৬ সালে; কিন্তু তার আগে ১৯৮৪ সালে এই সংস্থা 'দক্ষিণ শহরতলি প্রতিবন্ধী সম্মিলনী' নামে দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর সংলগ্ন এলাকার প্রতিবন্ধীদের কল্যানার্থে একটি ক্ষুদ্র সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। 'দক্ষিণ শহরতলি প্রতিবন্ধী সম্মিলনী' –এর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল প্রতিবন্ধীদের জন্যে নির্দিষ্ট 'প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র' লাভের জটিল সরকারী পদ্ধতির বিরুদ্ধে আন্দোলন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কান্তি গাঙ্গুলি যাদবপুর এলাকার প্রতিবন্ধীদের সাথে কাজের সুবাদে বুঝতে পেরেছিলেন প্রতিবন্ধীদের জন্য সেসময়ে যেটুকু যা সরকারী সুযোগ সুবিধা আছে তা লাভের একমাত্র উপায় হোল সরকারী 'প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র'; আর এই শংসাপত্র পাবার পদ্ধতিটি ছিল বেজায় জটিল ও সময় সাপেক্ষ; এমনকি শংসাপত্র লাভের জন্য প্রতিবন্ধীদের উৎকোচ দিতেও বাধ্য করা হতো। 'প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র'

দেওয়ার পূর্বে যে ডাক্তারি পরিক্ষা নিরীক্ষা হয়, দক্ষিন কলকাতার ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব ছিল টালিগঞ্জের বাঙ্গুর হাসপাতালের ওপর। সংগঠনের প্রথম সক্রিয় আন্দোলন ছিল ১৯৮৪ সালে এই বাঙ্গুর হাসপাতাল অভিযান। কান্তি গাঙ্গুলির নেতৃত্বে সম্মিলনীর সদশ্যরা তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে; ধর্না, অবস্থান বিক্ষোভ, স্লোগান চলতে থাকে। শেষে আন্দোলন সহিংস রূপ ধারন করে যখন পুলিশ ও হাসপাতাল কতৃপক্ষ বলপ্রয়োগ করে আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করে; প্রতিবন্ধীদের উপর পুলিশ লাঠি চার্জ করে। উক্ত ঘটনা ছিল পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে সমস্ত প্রকারের প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের প্রথম সংগঠিত আন্দোলন, যার একটা সুদূর প্রসারী প্রভাব ছিল। এই আন্দোলনের ঘটনা পরের দিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবন্ধী ও তাদের আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে এক চাঞ্চল্য তৈরি হয়; তারা সম্মিলনীর কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে; সাথে সাথেই অনুভুত হয় সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী একটি বৃহৎ সংগঠনের। দীর্ঘ আলাপ আলোচনা ও সম্মিলনীর নেতৃত্ব বর্গের পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র জেলা ব্যাপী অসংখ্য সমাবেশের পরে ১৯৮৬ সালে কলকাতার মৌলালী যুবকেন্দ্রে এক সমাবেশে ‘দক্ষিণ শহরতলি প্রতিবন্ধী সম্মিলনী’ আত্মপ্রকাশ করে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী’ হিসাবে।[৮]

প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর প্রথম দিকের কার্যকলাপের বেশিরভাগই ছিল পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক স্তরে ও রাজ্য সরকারী মহলে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে যে বিরূপ মনভাব রয়েছে তার নিরসন ঘটানো।এক্ষেত্রে ১৯৮৯ সালের ৬ মার্চ, কলকাতার পূর্ব এস্‌প্লানেড ময়দানে সম্মিলনী কর্তৃক আয়োজিত প্রতিবন্ধীদের বিশেষ সম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত সম্মেলনে সারা রাজ্য থেকে প্রায় ১০ হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যোগদান করেন। সম্মেলনের মুখ্য বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। কান্তি গাঙ্গুলির কাছে জানতে পেরে, যে প্রতিবন্ধীদের সার্টিফিকেট পেতে সরকারী কতৃপক্ষকে ঘুষ দিতে হয়, বসু বিস্মিত হন এবং সরকারী স্তরে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।[৯]

ইতিমধ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৮৩ থেকে ১৯৯২ সাল, এই এক দশক বিশ্বের প্রতিবন্ধী নাগরিকদের আর্থসামাজিক উন্নতির জন্য ‘প্রতিবন্ধীদের দশক’ (Decade of Disabled Persons) হিসাবে ঘোষণা করে। এই প্রকল্পের শেষ লগ্নে, অর্থাৎ ১৯৯২ সালের ১ ডিসেম্বর সকল প্রতিনিধি দেশ চীনের বেজিং শহরে আয়োজিত সম্মেলনে মিলিত হয়ে ‘বেজিং ঘোষণাপত্র’ (Beijing Declaration) সাক্ষর করে। প্রতিনিধি হিসাবে ভারত এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করার পরে বাধ্য হয় ঘোষণা পত্রের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে একটি প্রতিবন্ধী অধিকার আইন পাশ করতে। ১৯৯২ সালের উক্ত অনুষ্ঠানে ‘বেসরকারি সংগঠনের সম্মেলনে’ (N.G.O. summit) ভারতের থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী’ –এর সহ-সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রী আব্দুল বারী।[১০]

উপরিউক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই ভারত সরকার ১৯৯৫ সালে 'The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act' নামে একটি প্রতিবন্ধী আইন পাশ করে। তড়িঘড়ি করে একটি আইন পাশ করতে গিয়ে আইনটি পরিনত হয় একটি ক্রুটিপূর্ণ, দুর্বল ও অকার্যকরী আইনে; এমনকি এই আইনে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে অন্তর্ভুক্তও করা হয়নি। আইনটির আরও একটি বড় ক্রতি ছিল প্রতিবন্ধকতার মাপকাঠি ও সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই আইনে প্রতিবন্ধকতার 'মেডিকেল মডেল' –কে অনুসরণ করা।[১১]এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ১৯৯৫ সালে আইন পাশের অনেক আগেই ১৯৯০ সালে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী' প্রতিবন্ধকতার 'সামাজিক মডেল' - কে নির্ভর করে একাটি খসড়া আইনের প্রস্তাবের উদ্দেশ্যে কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে একটি 'ন্যাশনাল কনভেনশন্' আয়োজন করে। উক্ত কনভেনশনে প্রতিবন্ধী সম্মিলনী তথা বাংলা থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তি, যেমন কান্তি গাঙ্গুলি, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার সাধন চন্দ্র গুপ্ত, অ্যাডভোকেট মঞ্জরী গুপ্ত, আব্দুল বারী প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। উপরিউক্ত সম্মেলনে দিল্লীর 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ্ ব্লাইন্ড' –এর সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ কুমার রুংতা এবং অন্য রাজ্যের সংগঠনের নেতৃত্ববর্গ, যেমন এ. কে. সিনহা, আর. রঙ্গস্বামী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে বিশেষ উপস্থিতি ছিল কেন্দ্রীয় ভি. পি. সিংহ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শ্রী রাম বিলাশ পাসোয়ানের। এই সম্মেলনে প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর সহ-সভাপতি ও কলকাতা হাই কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার সাধন চন্দ্র গুপ্ত প্রতিবন্ধকতার 'সামাজিক মডেল' – কে ভিত্তি করে একটি প্রতিবন্ধী অধিকার আইন রচনা করেন। এই খসড়া আইনটি সম্মেলনে গৃহীত হয় এবং কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শ্রী রাম বিলাশ পাসোয়ানের হাতে তা তুলে দিয়ে সম্মিলনীর তরফ থেকে এই খসড়া আইনের অনুকরনে একটি আইন তৈরির অনুরোধ করা হয়।[১২]

ইতিমধ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ২০০৬ সালে বিশ্বের প্রতিবন্ধী জনগণের কল্যান ও মানবধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে 'প্রতিবন্ধী অধিকার কনভেনশান' (United Nations' Convention on Rights of Persons with Disability বা UNCRPD)। ২০০৭ সালে এই কনভেনশানের যে সনদ পাশ হয়, তাতে সনদের মূলনীতি গুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ গুলি বাধ্য থাকে নতুন আইন প্রনয়ন করার জন্য। এদিকে ভারতেও নতুন আইনের দাবীতে আন্দোলন দানা বাধতে থাকে। ২০০৭ সালে ভারত সরকার 'প্রতিবন্ধী অধিকার কনভেনশান' –এর সনদ স্বাক্ষর করে কিন্তু কনভেনশানের মূল নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন আইন আনতে ভারত সরকার গড়িমসি করছিল। সরকারের মতে কনভেনশানের মূল নীতিতে এমন কিছু ধারা ছিল যা দেশের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ণ করে। ইতিমধ্যে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী', সম্মিলনীর সাংগঠনিক ধাচে সারা ভারত ব্যাপী জাতীয় স্তরে একাটি প্রতিবন্ধী অধিকার

আন্দোলনকারী সংস্থা তৈরির প্রচেষ্টা শুরু করে। ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী’ –এর উদ্যোগে কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে ২০১০ সালের ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারী একটি সম্মেলনে ‘ন্যাশনাল প্লাটফর্ম ফর রাইট্স অফ্ দ্যা ডিসাবেল্ড্’ বা এন.পি.আর.ডি. এর প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সম্মেলনে দেশের প্রায় ১৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি যোগ দেন। এই সংগঠনের প্রথম ভারত ব্যাপী আন্দোলন ছিল ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে ‘সংসদ অভিযান’ কর্মসূচী। সারাভারত থেকে সংগঠনের লক্ষ লক্ষ প্রতিবন্ধী সদস্যরা দিল্লীতে এসে জড় হয়; তাদের দাবী ছিল অতি স্বত্তর নতুন আইন পাশ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সম্মিলনীর ৩ হাজার প্রতিনিধি কান্তি গাঙ্গুলির নেতৃত্বে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচ করে গোটা একটি ট্রেন ভাঁড়া করে হাওড়া ষ্টেশন থেকে দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। এপ্রিল মাসের উত্তর ভারতের প্রখর গরমে তারা আধ-মরা হয়ে দিল্লী পৌছয় এবং নতুন উদ্যমে দিল্লীর যন্তরমন্তরে আন্দোলন কর্মসূচীতে যোগ দেয়। কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী কান্তি গাঙ্গুলি, সভাপতি ভি. মুরলি ধরন, শ্রী বিজয়ন ও নাগরাজ প্রমুখ।[১৩]

আন্দোলনের চাপে পড়ে কেন্দ্রের মনমোহন সিং সরকার ৩০ এপ্রিল, ২০১০ সালে কলকাতার ‘ইন্ডিয়ান ইন্সিটিউট অফ সেরিব্রাল পাল্সি’ –এর ডিরেক্টর ডক্টর সুধা কল্ -কে চেয়ারম্যান করে একটি নতুন খসড়া আইন তৈরির জন্য কমিটি গঠন করে। এই কমিটিতে সরকারের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। এই কমিটি আন্তর্জাতিক মান মেনেই নতুন আইনের প্রস্তাব দেয়; এবং ২০১২ সালে ইউ. পি. এ. সরকারের ক্যাবিনেটে প্রস্তাবিত খসড়া আইনটি বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়। এরপর ২০১৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যখন আইনটি বিল হিসাবে প্রকাশ করে, আশ্চর্যজনক ভাবে তাতে খসড়া আইনের বহু প্রস্তাব বাদ পড়ে যায়। এটা পরিষ্কার হয় সরকার আবার ১৯৯৫ সালের মত একটি নখ-দন্তহীন দুর্বল আইন আনতে চায়। ইতিমধ্যে এই ঘটনার প্রতিবাদে এন.পি.আর.ডি. নতুন করে আন্দোলন ও সারাদেশ ব্যাপী জনমত গঠনে নেমে পড়ে। ২০১৪ সালে সরকার বিলটি রাজ্যসভাতে পেশ করলে বিরোধী দল, বিশেষ করে বাম দলের প্রতিনিধিরা বিলটি বিনা আলোচনায় পাশ করার বিরোধিতা করতে থাকেন এবং অবশেষে বিলটি সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পাঠানো হয়। ইতিমধ্যে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ. পি. এ. সরকারের পতন ঘটে।[১৪]

২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ইউ. পি. এ. সরকারের পতনের পর নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে এন.ডি.এ. জোট সরকার ক্ষমতায় আসে। ২০১৫ সালের ৩ ডিসেম্বর ‘বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস’ –এর প্রাক্কালে এন.পি.আর.ডি. ২০১০ সালের মত দিল্লীতে আবার একটি আন্দোলন কর্মসূচী নেয়। এবারো প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যায়ে একাটি গোটা ট্রেন ভাঁড়া করে হাওড়া থেকে প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর প্রায় ৩ হাজার প্রতিনিধি দিল্লী পৌছয়। ডিসেম্বরে দিল্লীর প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়,

এন.পি.আর.ডি. এর দিল্লী, তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও অনান্য প্রদেশ থেকে কয়েক হাজার প্রতিনিধি কর্মসূচীতে যোগ দেয়।কর্মসূচী শেষে এন.পি.আর.ডি. এর এক প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় বিচার ও খমতায়ন মন্ত্রী শ্রী থাওয়ারচাঁদ গেহ্লটের সাথে সাক্ষাত করে তাদের দাবিপত্র পেশ করে। অবশেষে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এন.ডি.এ. সরকার নতুন করে 'Rights of Persons with Disability Act' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবন্ধী আইন পাশ করে। উক্ত আইনটি ডক্টর সুধা কল্ কমিটির অনেক প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 'প্রতিবন্ধী অধিকার কনভেনশান'- এর ২০০৭ সালের সনদের মূল নীতি গুলির অনেকটাই মেনে নেয়; এর সাথে সাথেই শেষ হয় লড়াই – আন্দোলনের বিরাট এক অধ্যায়ের।[১৫]

তথ্যসূত্র:

১. গাঙ্গুলি, কা. (সম্পাদিত) (২০২২)।*রক্ত পলাশের আকাঙ্ক্ষায় – প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের সংগঠন ও তাদের এগিয়ে চলা* । পত্রলেখা. কলকাতা. পৃ.২২৭– ২৪১.

২. Chander, J. (2011). *Movement of the Organized Blind in India: Passive Recipients to Active Advocates of their Rights.* (পি.ডি.এফ.)

৩. প্রাগুক্ত।

৪. Bhambhani, M. (2004).*From Charity to Self-advocacy : The Emergence of Disability Rights Movement in India.* (পি.ডি.এফ.)

৫. Chander, J. (2011). উদ্ধৃত।

৬. গাঙ্গুলি, কা. (সম্পাদিত) (২০২২). উদ্ধৃত।

৭. Bhambhani, M. (2004). উদ্ধৃত।

৮. গাঙ্গুলি, কা. (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩)

৯. প্রাগুক্ত।

১০. প্রাগুক্ত।

১১. *The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.* (1995). ভাগ – ২, অধ্যায়– ১,'Extra Ordinary Gazette of India', আইন, ন্যায় ও কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার।

১২. গাঙ্গুলি, কা. (সম্পাদিত) (২০২২). উদ্ধৃত।

১৩. প্রাগুক্ত।

১৪. গাঙ্গুলি, কা. (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩)

১৫. প্রাগুক্ত।

পশ্চিমবাংলার কৃষি

তুহিন কুমার মৈত্র
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ফর উইমেন

সারসংক্ষেপ : বাংলার কৃষি ক্ষেত্র যুগে যুগে বাংলাকে আকড়ে থাকা সবাইকে করেছে সমৃদ্ধশালী। এমন কি বাংলাকে দীর্ন করা সকল গোষ্ঠীও সমৃদ্ধ হয়েছে এই বাংলার কৃষি ক্ষেত্র থেকে। তবু দেশভাগের হাত ধরে বাংলা ভাগের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট পশ্চিমবাংলার কৃষি ও তাকে কেন্দ্র করে যে মানুষগুলি বেঁচেছিল তারাই পড়েছিল এক অজানা সংকটে। সেই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য তৎকালীন সরকার, জনগোষ্ঠী সকলে মিলে পাড়ি জমিয়েছিল এতকালের কৃষি ক্ষেত্রের চেনা পথ থেকে বেশ কিছুটা ভিন্ন পথে। যে পথে চলতে গিয়ে, আশু সমাধানকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে, যথাযথ পর্যালোচনার অভাব নিয়ে, ভবিষ্যতের অনেক সংকটকে সঙ্গী করে ফেলে আমাদের পশ্চিমবাংলা।
শব্দ সূচক : কৃষি ক্ষেত্র, বাংলা ভাগ, খাদ্য সংকট, সেচ, অনাকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যত।

মূল আলোচনা:
বাংলার অন্যতম সম্পদের ক্ষেত্র হল তার কৃষি ভান্ডার। এই কৃষি ক্ষেত্র যুগে যুগে বাংলাকে তথা বাংলার সমস্ত শাসক বর্গকে করেছে শক্তিশালী। একথা ব্রিটিশ পূর্ব শাসকদের ক্ষেত্রে যতটা সত্য, ততটাই সত্য ছিল ব্রিটিশদের ক্ষেত্রে। অবিভক্ত বাংলার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ব্রিটিশরা তথা তৎকালীন জমিদার, জোতদাররা বাংলার কৃষি ভান্ডার থেকে অপরিমেয় সম্পদ আহরণ করেছে প্রতিনিয়ত। পরবর্তীকালে সেই সম্পদ তারা ব্যবহার করেছে তাদের আরো সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে শাসক ব্রিটিশরা যেমন এখান থেকে আহরিত সম্পদ কাজে লাগিয়ে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে তেমনি জমিদার ও জোতদার শ্রেণী তাদের সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেছে। যার ফলে এই সব পক্ষেরই এক নিবিড় স্বার্থ যুক্ত ছিল এই বাংলার কৃষি ক্ষেত্র ও কৃষকদের সঙ্গে। আবার ঘনবসতিপূর্ণ বাংলার প্রেক্ষাপটে সাধারণ কৃষক ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও অন্যান্য স্বল্প আয়ের মানুষদের এই বাংলার ভূমি ও তার শিকড়ের সঙ্গে ছিল এক নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ। কিন্তু ১৯৪৭ এর ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ তথা বাংলা ভাগ এই সমস্ত সম্পর্ককে বিভিন্নভাবে প্রশ্নবিদ্ধ তথা সম্পর্কের বহু জটিলতা সৃষ্টি করল। যে জটিলতা থেকে মুক্ত হতে পারল না আমাদের পশ্চিমবাংলাও। যদিও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্র বসু বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে খুব সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং তার নেতৃত্বে কংগ্রেসের একাংশ এই বিভাগকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়।.. ১৯৪৭ সালের ২০ শে মে তারিখে শরৎচন্দ্র বসুর বাসভবনে মুসলিম

লীগের নেতা আবুল হাসিমের সঙ্গে শরৎচন্দ্র বসুর একটি চুক্তি হয়। যে চুক্তির একটি উদ্দেশ্য ছিল "বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র ভারতবর্ষের অপরাপর অংশের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করবে।.."[১] যাহোক শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র বোস ও আবুল হাসিমদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। যথারীতি, বাংলা অবিভক্ত না থেকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। বৃহৎ বাংলার মোট ভূমির ৩৬.২০ শতাংশ ভূমি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি হয়। অবিভক্ত বাংলার ৬ কোটি ৩২ লক্ষ্য বাঙালির মধ্যে দুই কোটি ১৩ লক্ষ বাঙালি নিয়ে সৃষ্ট পশ্চিমবাংলায় শতকরা ২৫ ভাগই ছিলেন মুসলমান। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলায় শতকরা ২৯ ভাগই রইলেন অমুসলমান।[২] আমরা দেখলাম সংখ্যালঘু বিনিময়ের কোন যথার্থ পদক্ষেপ ছাড়াই এই বাংলা ভাগের মধ্য দিয়ে দুই বাংলাতেই এক বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু হিসাবে পড়ে রইল।

নিবিড় কৃষি সম্পর্কের ভিত্তিতে বেড়ে ওঠা তথা গড়ে ওঠা বাংলার মানুষের এতদিনের সম্পর্ক ধর্মীয়ভাবে ভাগ হলেও কৃষি অর্থনৈতিক সম্পর্কের সাজুজ্জতা এই ভাগাভাগির মধ্য দিয়ে যেভাবে নষ্ট হলো তার জন্য কোনরকম প্রস্তুতি ছিল না দুই বাংলারই কৃষি ক্ষেত্রে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় - তৎকালীন বাংলার সবথেকে শক্তিশালী শিল্প পাট শিল্প, যার প্রায় সমুদয়'ই গড়ে উঠেছিল হুগলি নদী'কে কেন্দ্র করে। দেশভাগের ফলে এই সমস্ত শিল্প কেন্দ্রগুলি স্বভাবতই পড়ে পশ্চিমবাংলার মধ্যে। পক্ষান্তরে এই পাটকলগুলির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অর্থাৎ কাঁচা পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলি পড়ে পাকিস্তানের ভাগে। কাঁচা পাটের অভাবে পাটকলগুলি দেশভাগ পরবর্তীকালে স্বাভাবিকভাবেই ভুগতে শুরু করে।[৩] অপরদিকে, অবিভক্ত বাংলার খাদ্য ভান্ডার, বিপুল উর্বর - কৃষি ক্ষেত্রের বহুলাংশ পূর্ব পাকিস্তান ভুক্ত হওয়ার ফলে এতদিনের কলকাতার কৃষি পণ্যের বিপুল প্রয়োজন ও যোগানের সম্পর্ক বিঘ্ন হয়। এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় ১৯৪৮ এর ১৫ মার্চ তৎকালীন খাদ্য সচিব প্রফুল্ল চন্দ্র সেন এর একটি বক্তব্যে - '.. বাজেটের দফাওয়ারী আলোচনা কালে শ্রীযুক্ত সেন বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের লোক সংখ্যা ২ কোটির মতো; তার মধ্যে ৬৫ লক্ষ লোককেই রেশনিং মারফত খাওয়াতে হয়। ইতিপূর্বে অখন্ড বাংলার মোট জনসংখ্যা ৬ কোটি, বিভিন্ন এলাকার রেশনিং বাবদ ৭৫ লক্ষ লোককে রেশন দিতে হতো। কিন্তু বাংলা বিভাগের পর খুলনার ন্যায় উদ্বৃত্ত জেলা পশ্চিমবঙ্গ হতে চলে যায়। দিনাজপুরের মতো বাড়তি জেলার অর্ধেক বেরিয়ে যায়। ফলে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের আয় হ্রাস পায়। অথচ রেশন খাওয়াবার দায়, পশ্চিমবঙ্গের অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। যার প্রধান কারণ কলিকাতা পূর্ব ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর শিল্প কেন্দ্র এবং বহু সংখ্যক লোককে জীবনধারণের জন্য কলিকাতা পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল এলাকাতে বসবাস করতে হয়। সুতরাং রেশনিং মারফত পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টকে অনেক বেশি লোককে খাওয়াতে হয়।'[৪] এই সমস্ত জটিলতার ফলে একদিকে শিল্পক্ষেত্রে পাটকল গুলির মালিক ও কর্মচারীরা যেমন

ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল ঠিক তেমনিভাবে পাটকলের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত অন্যান্য পেশাজীবিরাও ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। আপরদিকে নিত্যদিনের কৃষি পণ্য বিশেষত চাল, সবজি, মাছ ইত্যাদি পণ্যের বিপুল সরবরাহ যথাযথ না হওয়ার জন্য কলকাতাবাসি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল ঠিক তেমনি এই ধরনের সরবরাহ কাজে যুক্ত অন্যান্য পেশাজীবীরাও হচ্ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। এই সমস্ত জটিল সমস্যাকে অতিক্রম করার জন্যই তখন পশ্চিমবাংলাকে নিতে হয় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত, যা তার কৃষি অর্থনৈতিক সম্পর্ককে নতুন ভাবে আবর্তিত করে। প্রায় বন্ধ হয়ে আসা পাটকলগুলি চালু রাখতে পাটের যোগান যেহেতু অব্যাহত রাখা দরকার ছিল তাই পাট উৎপাদনের জন্য প্রচুর জমি ছাড়তে হয় পশ্চিমবাংলাকে। ১৯৪৯ সালের বঙ্গীয় পাঠ নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী চললে পাটের জন্য প্রয়োজনীয় জমির ভাগ খাদ্যশস্যভুক্ত জমি থেকে টেনে আনা কঠিন ছিল । তাই এই পরিস্থিতিতে যেন আমন ধানের জমিতে পাট চাষ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় পাঠ নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে।[৫] ভারত সরকার পাট উৎপাদনে স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে পাট চাষীদের বাধাহীনভাবে পাট চাষ করতে উৎসাহ দেয়। এজন্য কৃষি আধিকারিকদের উপযুক্ত পরিমাণ পাট, বীজ চাষীদের মধ্যে সরবরাহ করতে সরকার নির্দেশ দেয়। পাট চাষীদের ধানের জমিতে পাট চাষ নিয়ে যেন সরকারি আধিকারিকরা হয়রানি না করেন তাও প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়। সরকার পাটের জন্য উপযুক্ত দাম দেবে এবং ঘাটতি খাদ্য পূরণ করবে। এজন্য চাষীদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই।[৬] পাট উৎপাদনের জন্য জমি ছেড়ে দেওয়ায় জমির ভাণ্ডারে সংকট দেখা দেয়। খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য জমিতে টান পড়ে। একদিকে পাটকল গুলি বাঁচানো, অন্যদিকে নিত্য দিনের খাদ্যশস্যের যোগান/ সরবরাহ ঠিক রাখা, এই দুটি ক্ষেত্রেই ভারসাম্য বজায় রাখা তৎকালীন অবস্থায় পশ্চিমবাংলার পক্ষে খুব কঠিন হয়ে পড়ে। এই সব কিছুর সঙ্গেই দেশভাগ উদ্ভূত উদ্বাস্তু সমস্যার এক দায় ভাগ এসে পড়ে পশ্চিমবাংলার মাথায়। আগত উদ্বাস্তুদের অভিবাসনের জন্য প্রয়োজন পড়ে নতুন জমির। এছাড়া কলকাতাকে কেন্দ্র করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত শ্রমিকদের চাপ আগে থেকেই ছিল।

পশ্চিমবাংলার তুলনায় বাকি ভারতের অবস্থা যে খুব বিশেষ ভালো ছিল সে কথা বলা যায় না, তবে পশ্চিমবাংলা যেহেতু এই বহুবিধ সমস্যা নিয়ে জর্জরিত ছিল তাই তাকে কৃষি - অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন পথ অনুসন্ধানে বিশেষ জোর দিতে হয়। খাদ্যশস্যের ঘাটতি মেটানোর জন্য নতুন নতুন জমি চাষভুক্ত করা জরুরি হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বহু পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনার চেষ্টা করা শুরু হয়। নতুন জমি চাষের আওতায় আনতে বহু সরকারি অনাবাদি জমিতে হাত দিতে হয়। আবার পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য ছোট জমিদার ও তালুকদার যারা বড় আকারে নিজেও যৌথ ব্যবস্থা বজায় রাখতো তারা জমিদারের ক্ষমতা রাশ ও জমিদারির পতনের ফলে অসচেতনভাবে কৃষক শ্রেণী থেকে উদ্ভূত জোতদার এর কাছাকাছি চলে এসেছিল।

১৯৪৭ এর পরে পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি লোপ আইনের পরে জোতদাররা সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী প্রধান গোষ্ঠী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল।[৭] - বহুক্ষেত্রে ক্রমশ সেই সব প্রভাবশালী জোতদারদের পড়ে থাকা জমিকেও চাষভুক্ত করতে হয়। এছাড়া পর্যায়ক্রমে জোতের আকারের পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়।

বহু পতিত জমিকে কৃষির আওতায় আনার সাথে সাথে কৃষি ক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব বাড়তে থাকে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গভর্নমেন্ট জলসেচের উপর গুরুত্ব আরোপ করে কিছু পদক্ষেপ নেয়। তৎকালীন সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র সেন বলেন যে, সেচ দপ্তর জলসেচের উপর বাড়তি গুরুত্ব দেয়। তার বক্তব্য থেকে জানা যায় সরকার ১৯৪৯ থেকে ৫০ সালে ২৭২ টি জলসেচ প্রকল্প গ্রহণ করে। এর মধ্যে ২৮টি প্রকল্প ওই সময় সম্পূর্ণ হয় এবং ১০০টির কাজ বেশ খানিকটা সম্পূর্ণ হয়। ১৯৫০ থেকে ৫১ সালে ওই জাতীয় আরো ৫০০টি প্রকল্প গ্রহণ করার পরিকল্পনা হয় এবং ওই পরিকল্পনা বাবদ ২৫ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়। ওই প্রকল্প থেকে ৩ লক্ষ একর জমির সেচভুক্ত এবং বাড়তি ৭৭ হাজার টন শস্য উৎপাদন করা যাবে বলে আশা করা হয়। সেচ ও জল দপ্তর যে ১০৫ টি প্রকল্প সম্পূর্ণ করে তার দ্বারা ৪৪ হাজার টন ধান এবং ৩১ হাজার টন রবি শস্য উৎপাদন করা হবে বলে আশা করা হয়। পরের বছর 'পাওয়ার পাম্প' এবং 'পার্শিয়ান হুইল' বিতরণ করার কথাও বলা হয়।[৮] এই বক্তব্য অনুসারে আমরা একটি বিষয় দেখতে পেলাম তৎকালীন সময়েই সেচ প্রকল্পে পাওয়ার পাম্পের প্রবেশ শুরু হচ্ছে। পরবর্তীকালে যা সেচ প্রকল্পে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে। এই পাওয়ার পাম্পের দ্বারা উত্তোলিত জলের জন্য মাটির নিচের জলের যে সংকটের সম্ভাবনা আছে সে কথা উপেক্ষিত থেকে যায়। যার ফল ভোগ করতে হয় আগামী দিনে অর্থাৎ বর্তমানে ও ভবিষ্যতে। তাৎক্ষণিক ও নিকট ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে শুরু হওয়া বিভিন্ন ধরনের সেচ প্রকল্প গ্রহণ ও বিদেশী প্রযুক্তি ও সার বিষের প্রয়োগের দিকে সমগ্র ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকে। বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সেচ প্রকল্প আদৌ কতটা যৌক্তিক সেগুলি উপেক্ষিত থেকে যায়। আবার, নির্বিচারে বিষের প্রয়োগ জমির ক্ষতি করবে কিনা সে ভাবনা ও উপেক্ষিত থাকে। আসলে তৎকালীন সংকটময় মুহূর্ত অতিক্রম করাই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। আমরা পরবর্তীকালে দেখতে পাই, ওই সমস্ত বহু প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের আর্থ- সামাজিক -সাংস্কৃতিক -তথা ভূ-পরিবেশকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করে। বহু ক্ষেত্রে এই প্রভাব নেতিবাচক হিসেবে দেখা দেয়।

আমরা ওই যাত্রার ধারাবাহিকতা থেকেই আজকের পশ্চিমবঙ্গকে দেখতে পাই। যেখানে অধিক পরিমাণ কৃত্রিম সার, বীজ, বিষ ব্যবহার হতে হতে জমি ক্রমশ বন্ধ্যা হয়ে চলেছে। প্রয়োজন পড়ছে নিত্যনতুন বীজ, বিষ, রাসায়নিক ইত্যাদির। যার সাথে তাল রেখে চলতে পারছে না আমাদের প্রকৃতি প্রদত্ত এই শরীর, হাওয়া, মাটি তথা পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি। এক রকম অনাকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের দিকেই আমাদের যাত্রা

পথকে দিনে দিনে ত্বরান্বিত করছে। যা থেকে আপাতত বেরোনোর আশু পথ খোঁজার প্রয়াসও প্রায় অন্ধকারে! টেকসই পথ খোজা তো দুরস্ত!

তথ্য সূত্রঃ

১। উমর, বদরুদ্দিন; ‘ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন’; চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯০; পৃষ্ঠা ১২৫ - ১২৬।

২। ভট্টাচার্য, রত্নেশ্বর; ‘সংখ্যালঘু বিতাড়ন : বাংলাদেশ’; কালধ্বনি:২/১এ আশুতোষ শীল লেন কলকাতা ৭০০০০৯; পৃষ্ঠা ২৮।

৩। দত্ত, ভবতোষ; ‘ভারতের আর্থিক উন্নয়ন’; আনন্দ পাবলিশার প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৭; পৃষ্ঠা- ১৭।

৪। 'আনন্দবাজার পত্রিকা; ১৬ /৩/ ১৯৪৮; ‘পশ্চিমবঙ্গে ধান চাউলের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ রাখা হইবে - পরিষদে অসামরিক সরবরাহ সচিবের ঘোষণা' স্টাফ রিপোর্টার।

৫। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮/ ৩/১৯৪৮

৬। The Statesman; 18/2/1950; 'Jute Regulation Act to be repeated.

৭। রায়, রজতকান্ত; ‘বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন’; ‘জোতদারদের পশ্চাদপসারণ’, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯৬, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৭১।

৮। The Statesman; 17.03.1950; 'Emphasis on Irrigation' Staff Reporter.

একাত্তরের দিনগুলি ও ফাৎসুঙ্ : রাজনৈতিক পরিচয় ও পরিচয়ের রাজনীতি

সুপর্ণা মণ্ডল
গবেষক, তুলনামূলক সাহিত্য কেন্দ্র,
বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ (Abstract) : যে কোন জাতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বাধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের জটিল সামাজিক পরিসরে রাজনৈতিক সমীকরণগুলিও একরৈখিক ভাবে অগ্রসর হয়নি কোন দিন। ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পরেও তাই উপমহাদেশের বিবিধ জাতিপরিচয়, বিবিধ ভাষাভাষী মানুষেরা নিজেদের মতো করে নিজেদের পরিচিতি নির্মাণ করতে চেয়েছেন, বুঝে নিতে চেয়েছেন নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দিনলিপি, জাহানারা ইমামের *একাত্তরের দিনগুলি* এবং গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত ছুদেন কাবিমোর উপন্যাস *ফাৎসুঙ্*-কে সমান্তরাল ভাবে পাঠ করার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। ভারতীয় উপমহাদেশের দুটি পৃথক প্রেক্ষাপটের রচিত হলেও দুটি গ্রন্থের মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধিকারের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হতে দেখা যায় জনতাকে। তবে সেই আন্দোলনগুলিরও নিজস্ব কিছু রাজনীতি ছিল। অধিকার অর্জনের আন্দোলন কখনও কখনও হয়ে উঠেছে মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ। বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য গ্রন্থদুটির সাপেক্ষে রাজনৈতিক পরিচয় অর্জনের সংগ্রাম কীভাবে পরিচয়ের রাজনীতির সূক্ষ্মতর দিকগুলির সন্ধান দেয় তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।
সূচক শব্দ (Keywords): বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন, পরিচয়ের রাজনীতি, উপমহাদেশের সাহিত্য।

মূল আলোচনা (Discussion)

দেশকাল নির্বিশেষে মানুষের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার ভিত্তিতে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে একত্ব বোধ করে। ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য’ আমাদের অতিপরিচিত একটি শব্দবন্ধ। কিন্তু একজন তুলনামূলক সাহিত্য-চর্চাকারীর কাছে যেন তেন প্রকারেণ কোন একটা ঐক্যে পৌঁছোনো কখনোই কাম্য নয়। ঐক্যের পাশাপাশি বৈচিত্র্যও রয়েছে, সেটা ভুললে চলে না। বর্তমান প্রবন্ধের জন্য তাই আমরা বেছে নিয়েছি সম্পূর্ণ পৃথক দুটি কালপর্ব ও পৃথক দুটি ভাষা তথা ভৌগোলিক অঞ্চলের সাহিত্যকে। একটি হল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রত্যক্ষ দলিল, শহীদজননী জাহানারা ইমামের দিনলিপি *একাত্তরের দিনগুলি* (১৯৮৬)। আরেকটি হল গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন নিয়ে ছুদেন

কাবিমোর নেপালি ভাষায় লেখা উপন্যাস *ফাৎসুঙ্* (২০১৯)। উল্লেখ্য এই উপন্যাসটি পাঠের জন্য শমীক চক্রবর্তীর বাংলা অনুবাদের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। অনুবাদে সাহিত্য পাঠের নিজস্ব কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েই যায়, সেই সমস্ত সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেই আলোচনায় প্রবেশ করা হচ্ছে। প্রথমেই প্রশ্ন আসতে পারে, এই তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তি কি? জানিয়ে রাখি, দুটি রচনাতেই ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক স্বাধিকারের প্রশ্নে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে দেখি তথাকথিত ‘স্বাধীন’ জনতাকে। নিজস্ব দাবী আদায়ের জন্য অসংগঠিত জনতা কিভাবে সংগঠিত হয়ে ওঠে তার স্বরূপও ফুটে উঠেছে দুটি রচনায়। এই সংগ্রাম সর্বক্ষেত্রে সফল না হলেও দুটি প্রেক্ষাপটেই এই সংগ্রামগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়।

মূলত ধর্মীয় কারণে ১৯৪৭-এ ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হলেও শুধুমাত্র ধর্মীয় ঐক্যই যে যথেষ্ট নয়, তা বুঝতে বাঙালি মুসলমানের দেরী হয়নি। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি অবমাননাসূচক মন্তব্য করেছে। কখনও তাদের ‘আধা-মুসলিম’, কখনও ‘বেঁটে ও কুচ্ছিত’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেই থেমে থাকেনি- বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের উপর শাসকের নিজস্ব ভাষা উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে গেছে। কিন্তু ভাষার উপর আঘাত আসার পর বাঙালি আর নীরব দর্শক হয়ে থাকেনি। ১৯৫২ সালে সংঘটিত হয় এক বিপুল গণ-অভ্যুত্থান, যার ফলে বাংলা ভাষার দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয় শাসক গোষ্ঠি। তবে ভাষাই একমাত্র সমস্যা ছিল না। রাজনৈতিক ভাবেও চরম বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল বাঙালিদের যার জন্য ১৯৭১-এ এসে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন-শোষণকে অগ্রাহ্য করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছিল আপামর বাঙালি জনগণ। *একাত্তরের দিনগুলি* এই অগ্নিগর্ভ সময়েরই দিনলিপি। অন্য দিকে, ছুদেন কাবিমোর *ফাৎসুঙ্* উপন্যাসের প্রেক্ষাপট যদি বিচার করা হয়, তাহলে দেখা যাবে উপন্যাসটি মূলত পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় নেপালী ও অন্যান্য জনজাতির পৃথক রাজ্যের দাবীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে নিয়ে রচিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, ‘গোর্খা’ শব্দের উৎপত্তি মূলত ব্রিটিশদের মাধ্যমে। ব্রিটিশরা তাদের সেনাবাহিনীতে নেপালের গোর্খা জেলার বেশ কিছু মানুষকে নিযুক্ত করে এবং জেলার নাম অনুসারে সেই সেনাবাহিনীর নাম হয় ‘গোর্খা রেজিমেন্ট’। পরবর্তীকালে এই ‘গোর্খা’ শব্দটিই ভারতে বসবাসকারী নেপালী ভাষাভাষী মানুষদের পরিচয়বোধক শব্দ হয়ে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ আমলে ১৯০৭ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কারে প্রথম গোর্খাল্যান্ডের দাবী করা হয়। ১৯৫২ সালে ‘অল ইন্ডিয়া গোর্খা লিগ’ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর কাছে পৃথক রাজ্যের দাবীতে একটি স্মারক জমা দেয়। ১৯৭৭-৮১-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দার্জিলিং ও সংলগ্ন অঞ্চলগুলি নিয়ে একটি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু এরপরেও পৃথক রাজ্যের দাবীকে দমিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। আশি থেকে নব্বইয়ের দশকের মধ্যে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ নেয়। সুবাস ঘিসিং-এর নেতৃত্বে

গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। সুবাস ঘিসিং ঘোষণা করেন যে গোর্খাল্যান্ড না আনতে পারলে তিনি নিজের গলা কেটে ফেলবেন। স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের ঘোষণায় জনতা আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ১৯৮৬-৮৮-এর মধ্যে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায় এই আন্দোলনে। মূলত এই সময়পর্বের ঘটনাবলী নিয়েই রচিত হয়েছে *ফাৎসুঙ্* উপন্যাসটি। দুটি রচনার প্রেক্ষাপট অনেকটা পৃথক হলেও জাতিসত্তার প্রশ্নটি দুটি ক্ষেত্রেই একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়া দুটি ক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক শাসকদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পরেও যে কাঙ্ক্ষিত স্বাধিকারের প্রশ্নে গলদ থেকে গেছে, তাও লক্ষণীয়।

যে কোন গণ-আন্দোলনের পিছনেই রাজনৈতিক চেতনা কাজ করে। জাহানারা ইমামের *একাত্তরের দিনগুলি* এবং ছুদেন কাবিমোর *ফাৎসুঙ্* দুটি রচনাতেই পারিপার্শ্বিকে ঘটমান বিষয়সমূহের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট চরিত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ লক্ষ করা যায়। বিশেষত শৈশব বা কৈশোরে পদার্পণ করা চরিত্রগুলির মধ্যে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান যেন এক অনাস্বাদিতপূর্ব অ্যাডভেঞ্চারের হাতছানি নিয়ে আসে। *একাত্তরের দিনগুলি*-তে লেখিকার দুই সন্তান রুমি ও জামিকে প্রথম থেকেই আসন্ন গণঅভ্যুত্থানের বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহিত দেখা যায়। বিশেষ করে বড় ছেলে রুমি প্রথম থেকেই এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল। দেশের জরুরি পরিস্থিতিতে খেলা দেখা বা প্রিয় খাবার আস্বাদনের কথাও মাথায় থাকে না তার। তবে রুমির রাজনৈতিক চেতনা আগে থেকেই কিছুটা বিকশিত ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক বইপত্র পাঠের মধ্য দিয়ে যার বাস্তবায়নের সুযোগ সে পেয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। কিন্তু *ফাৎসুঙ্*-এর মূল চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে এমন কোন রাজনৈতিক পূর্বজ্ঞানের সুযোগ ছিল না। নোর্দেন ও নাসিম দুজনেই ছিল নেহাত স্কুলপড়ুয়া শিশু। ফলে তাদের পক্ষে আন্দোলনের সূক্ষ্ম বিষয়গুলি বোঝা সম্ভব ছিল না। রাজুস্যার ও আন্দোলনের সাথে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে তারা তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল সিপিএমকেই তাদের প্রতিপক্ষ বলে ধরে নিয়েছিল। শিশুসুলভ মারপিট ছেড়ে একটা বড়সড় লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তারা-

> নোর্দেন নাসিমের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, "আর ছেলেদের সাথে মারপিট করিস না। সিপিএমের সাথে কর। না-পারলে বন্দুকও ওঠাতে হবে। স্যার এ ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন, বুঝেছিস?"

স্কুলপড়ুয়া শিশুদের কাছে সত্যিকারের বন্দুক চালাতে পারার স্বপ্ন কম রোমাঞ্চকর ছিল না। কিন্তু রোমাঞ্চের বাইরে যখন ঠান্ডা মাথায় ভেবে তারা আন্দোলনের কারণ সম্বন্ধে জানতে চায়, তখন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ তাদের জিজ্ঞাসাকে গুরুত্ব না দিয়ে তাদের কাছে প্রশ্নহীন আনুগত্যই দাবী করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে আন্দোলনে গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব শুরু হওয়ার পর নেতাদের সুবিধাবাদী রাজনীতির বিষয়গুলি ভালো ভাবেই বুঝতে সক্ষম হয়েছে

তারা। ফলে বলা যায়, রাজনৈতিক চেতনা তাদের মধ্যে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই এসেছে।

একাত্তরের দিনগুলি এবং *ফাৎসুঙ্* দুটি প্রেক্ষাপটেই গেরিলা যুদ্ধ একটি অন্যতম সংগ্রাম-পদ্ধতি হিসাবে কাজ করেছে। শুরুতে হরতাল, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে আন্দোলন শুরু হলেও সরকারি দমননীতির কারণে এভাবে আন্দোলন চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয় আন্দোলনকারীরা। *একাত্তরের দিনগুলি* অনুসারে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত-ঘেঁষা এলাকাগুলিতে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা ট্রেনিং দেওয়ার ক্যাম্প শুরু করে। ট্রেনিং শেষে ঢাকা-সহ দেশের অন্যান্য জায়গাতে ছোট ছোট দলকে বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হত। সেই অনুযায়ী কখনও গ্রেনেড হামলা, কখনও পশ্চিম পাকিস্তানের পুলিশদের হত্যার মতো দুঃসাহসিক ঘটনাও ঘটিয়ে ফেলেছে মুক্তি বাহিনীর গেরিলা যোদ্ধারা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এক অসম প্রতিপক্ষের সঙ্গে যথাসাধ্য লড়াই দিয়ে গেছে। *ফাৎসুঙ্*-এর ক্ষেত্রে জিভিসির ক্যাম্প থেকেই গেরিলা তৎপরতা শুরু হয়। কখনও কখনও সিপিএম কর্মীদের হামলার নিশানা করা হয়, আবার কখনও সিআরপিএফ বাহিনীর সঙ্গে খন্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। আন্দোলনকারীরা হামলা চালানোর জন্য নিজেরাই অস্ত্রশস্ত্র বানায় কিন্তু শেষ অব্দি সরকারি বাহিনীর আধুনিক অস্ত্রের সঙ্গে পেরে ওঠে না। অন্য দিকে, আন্দোলনকারীদের নিজেদের মধ্যেও শুরু হয় গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব, যার ফলে আন্দোলন শেষ অব্দি সাফল্যের মুখ দেখতে পারে না।

আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রসঙ্গে যদি আসি, তাহলে *একাত্তরের দিনগুলি*-তে সে রকম সর্বাত্মক কোন নেতৃত্ব আমাদের চোখে পড়ে না। রাজনৈতিক ভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জ্বালাময়ী বক্তৃতা মুক্তিযোদ্ধাদের ইন্ধন যোগালেও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সেভাবে নেতৃত্ব দিতে পারেননি তিনি। ফলে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নেতৃত্বের অধীনে মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়। কিন্তু নেতৃত্ব আলাদা হলেও সবার লক্ষ্য কিন্তু একটাই ছিল। আর সেই লক্ষ্যে শেষ অব্দি অবিচল থেকেছে যোদ্ধারা। শুধু গেরিলা যোদ্ধারাই নয়, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ নিজেদের পেশা অনুযায়ী যে যেভাবে পেরেছে, মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে থাকার চেষ্টা করে গেছে। অবশ্য, পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে রাজাকার, আল-বদর গোষ্ঠি পাক সরকারের হয়ে কাজ করেছিল। কিন্তু মুক্তিকামী সংঘবদ্ধ মানুষের সংখ্যাও কম ছিল না। *ফাৎসুঙ্*-এর ক্ষেত্রে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের যে পর্যায়ের চিত্র আমরা দেখি তাতে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের লক্ষ করা যায়। কিন্তু উচ্চস্তরের সঙ্গে নিম্নস্তরের যোগাযোগ সব সময় খুব নিয়মিত ছিল না। ফলে উপরিস্তরের নেতারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেটে পড়লেও নিম্নস্তরের আন্দোলনকারীরা তাদের সাধ্যমত সংগ্রাম চালিয়ে যায়। কিন্তু বাধ সাধে নিজেদের দলের লোকেরাই। পারস্পরিক গোষ্ঠিদ্বন্দ্বের জেরে নিজেদের মধ্যেই খুনোখুনি শুরু হয়। অন্যদিকে আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে কেউ কাঠ পাচার, কেউ অন্য কোন ভাবে ফায়দা লোটার চেষ্টা করতে থাকে। সব

মিলিয়ে আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে যেতে থাকে মানুষ। তাছাড়া বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে যেমন কমবেশি একটাই প্রতিপক্ষ ছিল, যার ফলে লক্ষ্যে অবিচল থেকে প্রতিপক্ষের উপর আঘাত হেনে গেছে মুক্তিযোদ্ধারা, গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের পরিস্থিতি তেমন ছিল না। গোষ্ঠিদ্বন্দ্বের ফলে তাদের ঘরের শত্রুই বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। ফলে আন্দোলনের ভিতটাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এক নেতা অন্য নেতার কার্যকলাপ সম্বন্ধে, লড়াইয়ের পদ্ধতি সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকে-

> চিফ সব সময় বলতেন, "এন বি তো হল আসলে কাঠ-চোর। আন্দোলন তো শুধুই ওর বাহানা। নিজের লোকদেরই ঘর জ্বালিয়ে দেয়। সরকারি সম্পত্তি জ্বালায়। এ ভাবে হয় নাকি আন্দোলন? আচ্ছা, না-হয় গোর্খাল্যান্ড হল, ধর। তখন কি জ্যোতি বসু এসে এখানকার পঞ্চায়েত অফিসটা নিয়ে চলে যাবে নাকি? বিডিও অফিস ভেঙে নিয়ে যাবে? তাহলে কেন এ সব ভাঙাভাঙি? কেনই বা এ সব জ্বালানো-পোড়ানো?"

এই সমস্ত মতের অমিল থেকেই আন্দোলন গতিহীন হয়ে পড়ে। দ্বিমুখী আক্রমণ থেকে আন্দোলনকারীদের নিজেদের জীবন রক্ষাই কঠিন হয়ে পড়ে।

পৃথিবীতে ইতিহাস রচনার ইতিহাস প্রায় সব সময়ই একমাত্রিক হয়ে এসেছে। ইতিহাসকে বলা হয়ে থাকে 'victor's perspective' অর্থাৎ যারা বিজয়ী তারাই মূলত নিজেদের বয়ানে ইতিহাস রচনা করে থাকে। ফলে আবশ্যিক ভাবেই সেই সমস্ত ইতিহাসে থেকে যায় পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা। কিন্তু *একাত্তরের দিনগুলি* এবং *ফাৎসুঙ্* এই চিরাচরিত ইতিহাস রচনার প্রকল্পের বাইরে এক বিকল্প ইতিহাসের সন্ধান দেয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পাক বাহিনীর দ্বারা অমানবিক অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন মহিলারা। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল তার নিদর্শন খুব বেশি পাওয়া যায় না। সে দিক দিয়ে জাহানারা ইমামের এই স্মৃতিকথা এক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সরকারি নথি ও আন্দোলনের শীর্ষ নেতৃত্বদের জবানবন্দী ছাড়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ইতিহাস খুব একটা চোখে পড়ে না। ফলে উপন্যাস আকারে রচিত হলেও ছুদেন কাবিমোর *ফাৎসুঙ্*-এ একদম তৃণমূল স্তর থেকে আন্দোলনের যে ইতিহাস আমরা দেখতে পাই, তা নিঃসন্দেহে খুব গুরুত্বপূর্ণ। মূলধারার ইতিহাসে আন্দোলনের এই বহুমুখী প্রতিগ্রহণ সাধারণত চোখে পড়ে না। নেতাদের দেখানো গোর্খাল্যান্ডের স্বপ্ন সাধারণ মানুষের মধ্যে কিভাবে আরো অনেক ছোট ছোট গোর্খাল্যান্ডের বীজ বপন করেছিল, তার জীবন্ত ভাষ্য রচনা করেছেন ঔপন্যাসিক ছুদেন কাবিমো। কল্পনা এখানে এতটাই বাস্তব যে কল্পনা ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব এখানে খাটে না।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্যের নেশন-স্টেটের ধারণা ঔপনিবেশিক শাসকদের হাত ধরেই এসেছিল। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার বৈচিত্র্যময় পরিসরে এক জাতি-এক রাষ্ট্রের ধারণার যে ব্যবহারিক অসুবিধা রয়েছে তা ঔপনিবেশিক শাসকদের বোধগম্য হয়নি। এর ফলে একটা জোড়াতালির বন্দোবস্তে আপোস করতে বাধ্য হয়েছে সাধারণ মানুষ। কিন্তু আপোসের এই ব্যবস্থা যে সর্বক্ষেত্রে সফল হয়নি, তার নিদর্শনই আমরা দেখতে পাই পূর্ব পাকিস্তান বা দার্জিলিং-এর এই আন্দোলনগুলির মধ্য দিয়ে। *একাত্তরের দিনগুলি* ও *ফাৎসুঙ্* সেই কারণে সামগ্রিক ভাবে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণকে নির্দেশ করে। জাতিগত ঐক্যের ধারণাকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য কখন কিভাবে কাটাছেঁড়া করা হয়, তাও এই দুটি রচনার প্রেক্ষাপটে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৪৭-এর আগে পূর্ব পাকিস্তানীরা ছিল মুসলিম, আর স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিম পাকিস্তানীদের চোখে তারা হয়ে গেল 'আধা-মুসলিম' কিংবা বাঙালি। অন্যদিকে, *ফাৎসুঙ্* উপন্যাসের মধ্যেও পার্বত্য জনসমাজে পারস্পরিক জাতিবিদ্বেষ লক্ষ করা যায়। ফলে জাতিগত বা রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা বা একতাকে সরলরৈখিক কোন সমাধানে পৌঁছে দেওয়া কার্যত অসম্ভব হয়ে ওঠে। দুটি রচনাতেই সংশ্লিষ্ট লেখক তথা লেখিকা অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে তাঁদের সেই যাপিত অভিজ্ঞতাকে ভাষারূপ দান করেছেন।

সহায়ক গ্রন্থ (Reference)

ইমাম, জাহানারা। *একাত্তরের দিনগুলি*। সন্ধানী প্রকাশনী, ফাল্গুন ১৪০৯।

কাবিমো, ছুদেন। *ফাৎসুঙ্*। অনুবাদ শমীক চক্রবর্তী। মনফকিরা, ২০১৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, আলাপন, সম্পাদিত। *প্রসঙ্গ গোর্খাল্যান্ড*। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৭।

রিটন, লুৎফর রহমান। *শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মারকগ্রন্থ*। নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৫।

সরকার, অভীক, সম্পাদিত। *বাংলা নামে দেশ*। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪।

Bagchi, Romit. *Gorkhaland: Crisis of Statehood.* Sage India, 2012.

Lama Mahendra P. *Gorkhaland Movement : Quest for an Identity.* Published by Dept. of Information and Cultural Affairs Darjeeling Gorkha Hill Council, 1996.

কাশীনগরের মাইবিবি : শতাব্দী প্রাচীন লৌকিক কিংবদন্তির এক অন্যতম নিদর্শন

সাইদা খাতুন
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ(Abstract): লৌকিক দেবদেবী লোকসংস্কৃতির এক অন্যতম উপাদান। আদিম মানুষ থেকে শুরু করে প্রত্যেকের এক এক রকম বিশ্বাস, সংস্কার তাঁদের সভ্যতা, জাতীর পরিচয়কে নির্ধারণ করেছে। সেগুলি বেশীর ভাগ পাওয়া যায় ইতিহাসের পাতায় আবার কিছুটা স্থান পায় কিংবদন্তির মতো লোকসংস্কৃতির উপাদানের মধ্যে। তবে এগুলি বেশীর ভাগই প্রান্তীয় মানুষের জীবনের উত্থান-পতন, দৈনন্দিন চাওয়া, বলতে গেলে খুব, সাধারণ অথচ ঐতিহ্যগত যেন বিশাল পরম্পরা যা মানব জীবনের সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পর্কিত। লৌকিক দেবী মাইবিবি কে নিয়ে তেমনি একটি অধ্যায় আমরা আলোচনা করবো এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে।
মূল শব্দ (keyward): লৌকিক দেবদেবী, প্রান্তীয় জনজীবন ও জঙ্গল মানুষের ইতিকথা।

মূল আলোচনা(discussion):
দক্ষিন চব্বিশনার সুন্দরবন লাগোয়া এক অন্যতম বিখ্যাত জায়গা কাশীনগরের মাইবিবি। এই স্থানটি তুলনামূলক জনবহুল প্রবন এবং সবথেকে আকর্ষণীয় ‘মাইবিবি’ নামক হাট যা এখানকার এক পরিপূর্ণ বাজার। এটি আয়তনে প্রায় দেড় থেকে দুই কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।

মাইবিবি – এই এলাকার একজন অন্যতম লৌকিক দেবী, যার নাম অনুসারেই এখানকার হাটের নামকরণ হয়েছে ‘মাইবিবি হাট’। হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মিলিত সহাবস্থান এখানে। রাস্তার দু’ পাশে একদিকে যেমন একটা বড়ো শিব মন্দির আছে, তার কিছুটা দূরে আছে মনসার মন্দির ঠিক তেমনি আবার অপর পাশে মসজিদও আছে। তবে এসবের মধ্যে বাজারের সব্জি পট্টির ঠিক মাঝখনে অবস্থান করেছে দেবী মাইবিবির মন্দির। এই ‘মাইবিবি’ স্থানীয় লোকের কাছে ‘মা’ তাঁদের ‘বড়ো মা’। তবে মা কিন্তু একা নয়, তাঁর সঙ্গে আরো আট জন দেবী পূজিত হন। আট জন প্রত্যেকেই তাঁরবোন, মন্দিরে একসঙ্গে নয় বোনের অধিষ্ঠান। মাঝখানে দেবী মাইবিবি এবং তাঁর দুপাশে অর্থাৎ ডান দিকে চার জন ও বাম দিকে চার জন ভগ্নি আছে। প্রত্যেকে সুসজ্জিত নতুন নতুন বস্ত্র (শাড়ী) পরিয়ে তাঁদেরকে বেশ সুসজ্জিত করে রাখা হয়েছে । এই মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত একজন মহিলা, নাম

কাঞ্চন চক্রর্বতী বয়স ৫৫। পুরোহিত প্রতিদিনই দেবীর আরাধনা করেন, দিনে দুবার পুজোর সময় নির্ধারিত আছে। সকাল ৭টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত এবং বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত। তবে এই দেবীর পূজোর নির্দিষ্ট কোন বিধান নেই। মেয়েরা সাধারনত গোটা ফল বাতাসা মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্রবাদি নিয়ে আসে। গোটা ফল দিয়েই মায়ের পূজা করা হয়। মায়ের মন্দিরের দক্ষিনা দিয়েই পুরোহিতের সাম্মানিক দেওয়া হয়। মাসে ছয় থেকে আটটা পর্যন্ত শাড়ী প্রনামী হিসাবে মাকে দিয়ে থাকেন তাঁর ভক্তরা [১]।

কে এই মাইবিবি? তাঁর ঐতিহাসিকতা নিয়ে অনুসন্ধানে জানা যায়- ইনি জঙ্গলের অন্যতম অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যেহেতু পূর্বে মথুরা পুরের বিষ্ণুপুর পুরো এলাকা সব জঙ্গলাকীর্ণ ছিলো, সেখানে বছরেরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতো। জঙ্গলে ঘেরা এইসব এলাকায় মানুষের কাছে একমাত্র ভরসার জায়গা ছিলো দৈবিক কৃপা, আর যেহেতু মানুষের বিপদ আপদ ভালোবাসার সব মুহুর্তের মধ্যে 'মা' – এই আবেগ বেশী করে কাজ করে।তাই ভক্তগনের এক এক কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য এইসব এক এক দেবী রূপের কল্পনা করা হয়েছে। এই নয় বিবির নাম এক এক জনের কাছে এক এক রকম। ক্ষিতিস মণ্ডল নামে এক ভক্তের সাক্ষাৎকারে জানা গেছে যে এখানে প্রথমে একটি মাত্র দেবীর মন্দির বর্তমান ছিলো, পরবর্তীতে একে একে মানুষের কল্পনায় জনমানষে দেবীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে বর্তমানে নয় দেবীতে পরিণত হয়েছে। আর সেকারনেই এই নয় দেবীর পরিচয় সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে রয়ে গেছে ধোঁয়াশা। ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা গেছে এই এলাকার সবথেকে প্রাচীন মন্দির ও এই মাইবিবির মন্দির। দেবী মাইবিবিই গোটা এলাকার রক্ষাকর্তী, তিনি সবরকম বিপদ আপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করেন।বড়োই জাগ্রত দেবী রূপে বেশ সাড়ম্বড়ে পূজিত হন তিনি। মা মাইবিবির পূজা প্রত্যেকদিন করা হলেও আসল মাগুনের পূজা হয় পৌষ এবং মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষ তিথিতে। প্রত্যেক ঘর থেকে মেয়েরা মাগুন করে আনে, বহু দূর দূরান্ত থেকে তারা পূজা দিতে আসে দেবী মাইবিবির মন্দিরে। এই সময় এক বিরাট মেলা বসে এই হাট চত্বরে, এক বিশাল জনসমাগম তৈরী হয় এই মেলাকে কেন্দ্র করে।হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মেল বন্ধনে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

মাইবিবি মন্দিরের দায়িত্ব ভার আছে বাজারকমিটির হাতে, বিশেষ করে এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের উপরে। তবে ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা গেছে যে একসময় এই মন্দিরের পুরো দায়িত্বভার ছিলো এলাকার মুসলিম ফকিরদের উপরে। সেটা প্রায় ১৮ থেকে ২০ বছর আগের কথা, তখন মুসলিম ফকির রা তাঁদের নিজেদের মতো করে মাইবিবির দেখাশুনো করতো, তখন অবশ্য এভাবে দেবীর দুবেলা পূজার্চনা করা হতো না। মুসলিম সম্প্রদায়ের সংস্কার মতো দেবীকে ধূপ ধূনো দিয়ে আরাধনা করা হতো। তাঁদের কল্পনায় জঙ্গলের বিপত্তারিনী 'মা' থেকেই লোকমুখে প্রচারিত হতে হতে 'মাইবিবি' নামে পরিণত হয়েছে।

জঙ্গলের দেবীমাতা মাইবিবিকে কোন কোন ভক্ত আবার ওলাবিবির সঙ্গে তুলনা করেছেন[২], ইঁনার সঙ্গে যে দেবীরা আছেন তাঁরাও একই সহোদরা বলেছেন, যদিও মন্দিরের বর্তমান পুরোহিতের মতে মানুষের অসহায়তায় বিভিন্ন সমস্যা থেকে সমাধানের জন্য এক এক সময় এক এক দেবী কল্পনা থেকেই আর্বিভূত হয়েছে। এই নয় জন দেবীর নাম বা পরিচয় সম্পর্কেও মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন রকম ধারনা আছে। এঁরা যথাক্রমে ওলাবিবি, ঝোলাবিবি, মড়িবিবি, আজগৈবিবি, জরিনাবিবি, ঝেটুনেবিবি, বাহড়বিবি, চাঁদবিবি ও আসানবিবি। যদিও কাল্পনিক দেবী হওয়ার জন্য বিভন্ন সময় বিভিন্ন রকম নামে ভক্তগনের কাছে পূজিত হয়ে থাকেন। মানুষ ভয় ভীতিতে ওলাবিবির পূজা করে, সেই জন্য এখানকার মানুষ ওলাবিবির নাম মুখে উচ্চারণ করতে চাই না। ওলাওঠা বা কলেরার প্রকোপে মহামারী বাঁধলে গ্রাম থেকে গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। ঝোলা বিবি কুষ্ঠ রোগের দেবী। মড়কের দেবী হলেন মড়িবিবি। আসানবিবি হলেন মুসকিল আসানের দেবি, সবরকম বিপদ আপদ থেকে পরিত্রান করে মানুষকে। ঝড় তুফানের দেবী আসগৈ বিবি। শস্যের দেবী হলেন বহেড়া বা বাহড়। ঝেটুনেবিবি হলো কলুষ নাশিনী দেবী। জরিনা বিবি ন্যায় ও ধর্মের দেবী। চাঁদবিবি হলো চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞান বা আলোর দেবী। কোথাও এঁরা সাতবোন আবার কোথাও এঁরা নয় বোন। কাশীনগরে যে মাইবিবির মন্দির আছে সেখানে মোট নয় বিবির অধিষ্ঠান। দেবীদের গড়ন বেশ সুন্দর দৃষ্টিনন্দন। পরাণে বেশ নতুন নতুন ছাপা শাড়ী, কানে মাকড়ি বা দুল এবং হাতে থাকে চুড়ি। এই সব দেবীদের সুন্দর করে মাথায় ঘোমটা দেওয়া আছে। একটি পিঁড়ি জাতীয় উচু আসনে দেবীদের বসানো থাকে। তবে এঁদের কোন বাহন না থাকলেও প্রায় প্রত্যেকের কোলে সন্তান আছে। মন্দিরের পুরোহিতের মতে নাকি ভক্তরাই তাঁদের সন্তান সন্ততি হওয়ার জন্য যখন মানত করেন, পূর্ণ হলে তারাই দেবীদের কলে খুশি হয়ে এগুলি দিয়ে যান। ক্ষেত্রসমীক্ষা কালে জানা গেছে দেবী মাইবিবির পূজো করতে বহু দূর দূরান্ত থেকে মেয়েরা আসে, মাগুন করে আনে, পূজো দেয়। তবে বর্তমানে এইসব পূজো পার্বণে ছেলেদের থেকে মেয়েদেরই সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়। এই এলাকার সকলের কাছেই দেবী মাইবিবি যেন জাগ্রত এক বিগ্রহ।

কাশীনগর হাটের যে বাজার কমিটির তত্ত্বাবধানে এই মন্দিরের সমস্ত আয় ব্যয় নির্ধারিত এবং পুরোহিত নির্বাচন করা হয়।

দেবী মাইবিবির মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে যতটুকু ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা গেছে, বহু বছর পূর্বে এই মন্দির শুধুমাত্র একটি মাটির ঢিপির উপরে এর ভিত্তিস্থাপন করা হইয়েছিলো। সেখান থাকে আটচালা দরমার বেড়া দিয়ে ঘেরা ঘরের মধ্যে দেবীর অধিষ্ঠান হয়েছিলো। বর্তমানে একটি কংক্রিটের নির্মাণের উপরে টিনের ছাওনি দেওয়া মন্দিরে সুদৃশ্যভাবে দেবী মাইবিবি ও অন্যান্য দেবীদের রাখা আছে। এবং মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে সব সময়ের জন্য ধূপ বাতি জ্বালানো হয়। এই মন্দিরের বর্তমান সভাপতি সনৎকুমার প্রামাণিক, কোষাধক্ষ – রামপ্রসাদ পুরকাইত , সম্পাদক- শৈলেন্দ্রনাথ বৈদ্য, এঁদের তত্ত্বাবধানে এবং বাজার কমিটির সহযোগিতায় মন্দিরের কাজকর্ম পরিচালিত হয়। সুন্দরবনের দক্ষিনে রাইদিঘী র এক প্রান্তীয় এলাকা জনসমাগম ও লৌকিক প্রাচুর্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ। এক জঙ্গলের লৌকিক দেবীকে নিয়ে অতিসাধারন জীবন যাপনেও প্রজন্মের পর প্রজন্ম রয়ে যাব মাইবিবি কেন্দ্রিক এইসব গল্পগাথা। আর এই সভ্যতা যতোদিন থাকবে ততোদিন ইতিহাসের পাতায় কিংবদন্তি হয়ে থেকে যাবে লোকমুখে মুখে।

তথ্যসূত্র (References):

১। সাক্ষাৎকার; নাম – কাঞ্চন চক্রবর্তী(বর্তমান মন্দিরের পুরোহিত), স্বামী – বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বয়স- ৫৫ বছর, নিবাস মাইবিবি হাট কাশীনগর রাইদিঘী দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তারিখ- ইং ২৫ অগাস্ট ২০২৩, সময় দুপুর ১ টা।

২। সাক্ষাৎকার; নাম – ক্ষিতিস মণ্ডল(ব্যবসায়ী), বয়স- ৭৫ বছর, , নিবাস মাইবিবি হাট, কাশীনগর, দক্ষিন ২৪ পরগনা , , তারিখ- ইং ২৭ অগাস্ট ২০২৩, সময় সন্ধ্যা ৭ টা।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের ছোটগল্পে বৈচিত্রময়তা (নির্বাচিত)

অর্পন রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কাল্যাণী, নদীয়া

সারসংক্ষেপ: অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'পায়রার খোপ গল্পে একটি পরিবারের নিদারুণ সংকট গোটা পরিবারের ভিত্তি ভূমিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। গগন আচার্যর পরিবারের হতাশাগ্রস্থ জীবনের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছিল। এই গল্পে আমরা দেখি যে আদর্শবান পিতার ছেলে অভাবের কারণে বিপথে এগিয়ে যায়। মেজো ছেলেও নিজের ভিন্ন মতাদর্শের দরুণ প্রাণ হারায়। পরিবারের শেষ অবলম্বন ছোটো ছেলে সুভাসের ভবিষ্যৎ এগিয়ে যায় অন্ধকারের দিকে। আবার এই গল্পে পরাজয় স্বীকার করেনি এরকম চরিত্র হল ব্রজবালা ও মেজো ছেলের স্ত্রী সুলতা। একটি 'মাঝারি মানুষের গল্প' এ প্রতীকী ব্যঞ্জনায় এমন এক মানুষের কাহিনী তুলে ধরেছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র ব্রজভূষণ নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। শুধু সমাজই নয় ব্রজভূষণের চিন্তা ধারাকে তাঁর পরিবারও বুঝতে পারেনি। 'স্বর্গ শ্রেষ্ঠ' গল্পে গল্পাকার আমাদের দুই চরিত্র বেলা ও দ্বিজেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন। তাদের পরিবারের কেউই শহরের বাইরের কারও সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেনি। এটাই তাদের পরিবারের গর্বের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। বেলা ও দ্বিজেন তারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ে করলেও নিঃসন্তান দাম্পত্য জীবন ধীরে ধীরে তাদের জীবনকে তিক্ত করে তুলেছিল। 'সুধীরবাবু' গল্পে আমরা দেখি যে সুধীরবাবু ও সুপর্ণাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই গল্পে আমরা দেখি যে সমাজকে এড়িয়ে বেশিদূর যেতে পারে নি,তাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভবও হয় নি। সমাজকে উপেক্ষা করে তাকে স্বীকৃতি দেবার বা গ্রহন করার সাহস তার হয়নি।
সূচক শব্দ: আদর্শবান, হতাশাগ্রস্থ জীবন, মর্মান্তিক মৃত্যু, কঠোর সত্য, রিফিউজি, বামপন্থী, দারিদ্র।

মূলবক্তব্য:

জগতের যে কোনো বিষয় নিয়েই বা যে কোনো কিছুকে নিয়েই ছোটো গল্প লেখা যেতে পারে। আর এই ছোটো গল্প হয়ে উঠতে পারার একমাত্র উপাদান হল শ্রষ্ঠার তীব্র ইচ্ছা শক্তি। গল্পাকার অমিয়ভূষন মজুমদারের গল্প বলাই উদ্দ্যেশ্য ছিল। তিনি ছোটোগল্পের খাঁচায় বন্দি হতে চান না। অমিয়ভূষণ মজুমদারের গল্পে বর্ণনার বাহুল্য আমরা লক্ষ্য করি। তিনি গল্পের চরিত্রকে নানা দিক থেকে নানা ভাবে বাজিয়ে দেখাতে চান।

গল্পাকার অমিয়ভূষণ মজুমদার মনে করেন ছোট গল্প ছোট হতে হবে একথা তিনি মনে করেন না। এই কারণেই তাঁর ছোটো গল্প পড়তে গেলে মনে হয় বর্ণনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। আমরা গল্পাকারের গল্পে দেখতে পাই যে ছোটগল্প গুলি শব্দ দিয়ে লেখা প্রসঙ্গ দিয়ে নয়। অমিয়ভূষণ মজুমদারের ছোটো গল্পের সংখ্যা খুব বেশি নয়, আজ পর্যন্ত পাঁচটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে 'পঞ্চকন্যা (১৯৬২), 'দীপিতারঘরে রাত্রি (১৯৬৫), 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৮৬), 'গল্প সমগ্র' (১৪০১), 'ম্যাকডাফ সাহের ও অন্যান্য গল্প' (২০০০)। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে আরো সত্তরটির মত গল্প পাওয়া যায়। এই সমস্ত গল্প গুলি মাসিক পত্র পত্রিকা থেকে উদ্ধার করাও বেশ কষ্ট কর। অমিয়ভূষণ মজুমদারের গল্পে চমৎকারিত্ব রয়েছে। তিনি চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য গল্প লেখেন না।তাঁর গল্পে বলার ধরনটি এমনই অভিনব যে তাঁর গল্প পড়ার সময় কেবলই বিস্ময় জাগে।

'পায়রার খোপ' গল্পে আমরা দেখতে পাই অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার গগন আচার্যের পরিবারে হতাশাগ্রস্থ জীবনের ছবি। গগন আচার্যের চাকরি আর মাত্র দু মাস দুমাস রয়েছে।তারই টাকায় তার সংসারের সমস্ত ভরণপোষণ চলে। তার তিন ছেলে। বয়স ষাট বছর হল। বড় ও মেজো ছেলে মারা গেছে, অকাল মৃত্যুই। গগনের বড় ছেলে ফাস্ট ডিভিশন পায় তার ইচ্ছা ছিল সে ইঞ্জিনিয়ার হবে। কিন্তু অর্থের অভাবে তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার উচ্চ আশা পূরণ হয়নি। তাই সে এখন রেলের মিস্ত্রি হয়েছে। নিজের স্বপ্ন তার পূরণ না হওয়ায় তার ছোট ভাই সুভাষকে নিয়ে সে স্বপ্ন দেখতে থাকে।সুভাষকে উচ্চ জীবনে প্রতিষ্ঠিত দেবার লক্ষ্যই তার জীবনে একমাত্র লক্ষ্য হয়ে যায়।তার ইচ্ছে তার ছোট ভাই সুভাষ আই এ এস পড়বে। কিন্তু সেই বরদায় একদিন সমস্ত দায়-দায়িত্ব থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নেয়।বড় ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু বেদনা বহন করে নিয়ে আসে এক কঠোর সত্য। সংবাদপত্রে জানা যায় সে একজন 'তার চোর' ছিল। সুবাসীর বর দেয় শুধু নয় তার মেজদা অকালে প্রাণ হারায়। মেজদার নাম হলো গৌতম। বড় ভাইয়ের মত আবেগপ্রবণ ছিল না,ছিল প্র্যাক্টিক্যাল। সুভাষকে নিয়ে তার বরদার যে স্বপ্ন ছিল তার কাছে কখনো তা বাস্তব বলে মনে হতো না। কারণ তাদের মত একজন রিফিউজি স্কুল মাস্টারের পক্ষে আইএএস হাওয়া কখনোই সম্ভব নয়। সরকারি ব্যবস্থাতে তার খুব বেশি আস্থা ছিল না। নিজেদের ব্যর্থতার জন্য সে সরকারি নিয়ম নীতিকেই দায়ী করতো। সে মনে করত যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো বা যাদের আত্মীয়-স্বজন সঙ্গে যুক্ত বা উচ্চ পদস্থ কর্মচারী তারাই আইএএস পদে উঠতে পারে।কলেজের বামপন্থী শিক্ষক যারা ছিল তাদের প্রতি তার ছিল অনীহা। ভবিষ্যতে সুভাষ যাতে কোন কষ্ট না পায় বা মিথ্যা স্বপ্ন না দেখে তার জন্য সে বাস্তবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সাবধান করতে চাইত তার মেজভাই।এরপর একদিন পুলিশের এস আই পদে চাকরি পেয়ে যায়। এরপর স্ত্রীকে

নিয়ে সে ঢাকুরিয়ায় চলে যায়। সে কোন বিপদের আভাস পেয়েই বাড়ি থেকে সরে গিয়েছিল। কিন্তু সরে গিয়েও তার শেষ রক্ষা হয়নি তার কারণ গৌতম যখন সিনেমা দেখতে যাচ্ছিল তখন পাড়ার ছেলে সুবীর ও সমুকে সে দেখতে পায়।ওদের সঙ্গে কথা বলার জন্য সে থেমেছিল তখনই তাদের হাতে তাকে মরতে হয়। এই ছেলেগুলোই হয়তো গৌতমকে শ্রেণী শত্রুদের প্রতিনিধি হিসেবে মনে করেছিল।এই সমস্ত ছেলেদের মেজদা ভিন্ন মানসিকতা পছন্দ হয়নি কারণ গৌতম তাদের আন্দোলনকে স্বীকার করেনি বা সমর্থন করেনি। আন্দোলনকারীরা তার কাছে ডাকাত ছাড়া আর অন্য কিছু নয় সে ভাবতে পারেনি।

সুভাষের মেজদা একজন নির্ভীক স্বভাবের মানুষ ছিল। তাই সে যেমন নিজের অন্যায় করেনি তুমি নিজেকে অন্যায় কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।দরিদ্র যন্ত্রণা ভোগ করলেও সে কখনোই নিজেকে অন্যায় কাজে যুক্ত করেন। সে সবসময়ই সদ উপায়ে উপার্জন করতে চেয়েছিল। সৎ উপায় উপার্জন করাকেই সে সঠিক বলে মনে করেছিল যা আমাদেরকে একজন আদর্শবান ব্যক্তির পরিচয় দিয়ে থাকে।অন্যদিকে গগন আচার্য তার দুই ছেলেকে হারিয়ে অসহায়ত্ব বোধ করে। সন্তান হারানো দুঃখ। সেইসঙ্গে শোকার্ত স্ত্রী ও বিধবা পুত্রবধূর দায়িত্ব তাকে নিতে হয়। গগন আচার্যের মধ্য দিয়ে গল্পকার আমাদের সামনে আদর্শ নিষ্ঠাবান ব্যক্তি পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরে।

পায়রার খোপ গল্পে আমরা দেখতে পাই যে পরিবারের একটি নিদারুণ সংকট গোটা পরিবারের ভিত্তি ভূমিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এই গল্পে আমরা দেখি যে একজন আদর্শবান পিতার বড় ছেলে অভাবের কারণে বিপথে এগিয়ে যায় এবং মৃত্যুবরণ করেছে।মেজো ছেলে নিজের ভিন্ন মতাদর্শ দরুন প্রাণ হারায় পরিবারের শেষ অবলম্বন ছোট ছেলে সুভাষের ভবিষ্যতেও অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায় এছাড়াও আমরা এই গল্প দেখতে পাই যে যারা নিজেদের জীবনকে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে, তারা পরাজয় স্বীকার করেনি এরকমই চরিত্র হলো ব্রজবালা, গগন আচার্যের স্ত্রী। যে দুটি সন্তান হারিয়েও প্রথম অসুস্থ ও অস্বাভাবিক হলেও ধীরে ধীরে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে।অন্যদিকে মেজ ছেলের স্ত্রী সুলতা নিজের সন্তানকে অবলম্বন করে জীবনকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এই গল্প আমরা দেখতে পাই যে কঠোর প্রতিকূলতা আসলেও সমস্ত ব্যক্তি প্রতিকূল পরিবেশকে পরিস্থিতিকে জয় করেছে নিজের দৃঢ় মানসিকতায়। আঘাতে আহত হয়েছে কিন্তু তাও তারা নিজেদের জীবনকে ধ্বংস করেনি। নিজেদের অস্তিত্ব কেউ বাঁচিয়ে রেখেছে।

'একটি মাঝারি মানুষের গল্প' এ প্রতীকী ব্যঞ্জনায় এমন এক মানুষের কাহিনী কে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে যে নিজের ইচ্ছাও অনিচ্ছাকে, চাওয়া পাওয়াকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারেনি। গল্পের প্রধান চরিত্র উকিল ব্রজভূষণ সমাজে নিজের ইচ্ছাকে

প্রাধান্য দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন জনমত পত্রিকা কে কেন্দ্র করে প্রচলিত রীতির বিপরীতে গিয়ে মানসিক প্রসার ঘটাতে। কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষ তাকে নিতান্তই বোকামি বলে মনে করেছে। শুধু সমাজই নয় ব্রজ ভূষণের চিন্তা ধারাকে তার পরিবারও বুঝতে পারেনি। যে কারণে তার ছোট ছেলেও নানা অসামাজিক অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়েছে। নিজের স্বার্থের কাছে বাবার আদর্শকে তার তুচ্ছ বলে মনে হয়েছে। বানানো চিকিৎসা রশিদে বাবাকে বাধ্য করেছে সই করতে। তবে এ গল্পে সমাজ জয়ী হলেও প্রকৃতপক্ষে জয়ী হয়েছে বোঝো ভূষণ, তাইতো সে তার ছেলের কাগজে সই দিলেও মন থেকে অন্যায় কাজকে সমর্থন করেনি। অসুস্থ হয়েও মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সে অন্যায়ের প্রতিবাদ চালিয়ে গিয়েছে। ব্রজভূষণ নিজের আদর্শকে স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য সমাজের মূল স্রোতের বিপরীতে গিয়ে চেষ্টা চালিয়েছে। আর তাতেই সমাজবদ্ধ জীবনের গণ্ডি ছাড়িয়ে ব্যক্তি অতীতের জয় ঘোষণা হয়েছে এই গল্পে।

'স্বর্গশ্রেষ্ঠ'গল্পে গল্পকার আমাদেরকে দুই প্রধান চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন বেলা ও দ্বিজেন। তিন পুরুষ ধরে বাস দ্বিজেন সাপুইদের।কলকাতার জেনারেল আসেম্বলি কলেজে পড়েছিলেন তার পিতামহ। দ্বিজেন ও তার পিতামহ কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়াশোনা করেছিলেন। দ্বিজেনদের কাছে এই ঐতিহ্য রক্ষায় ছিল তাদের গর্বের বিষয়। তাদের পরিবারের কেউই শহরের বাইরে কারও সঙ্গেই কোনরকম সম্পর্ক স্থাপন করেনি, এটাই তাদের পরিবারের গর্বের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র দ্বিজেনও এই ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে মার্চেন্ট অফিসে কাজ করে।অথচ এই দ্বিজনই পারিবারিক ঐতিহ্য কে ভুলে গিয়ে বেলাকে বিয়ে করে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। গল্প কার এখানেই দ্বিজেন্দ্রের পারিবারিক ঐতিহ্যের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে এক সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় দেখাতে চেয়েছিলেন।

গল্পের দুই প্রধান চরিত্র দ্বিজেন ও বেলার দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্প কর আমাদের দেখিয়েছেন নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা কেমন করে মানুষের জীবনের শূন্যতা ছড়িয়ে দেয় স্পষ্ট করেছেন।দ্বিজেন ও বেলা তারা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসে বিয়ে করলেও নিঃসন্তান দাম্পত্য জীবন ধীরে ধীরে তাদেরকে তিক্ত করে তুলেছিল। একদিন যাকে ভালোবেসে পারিবারিক ঐতিহ্যকে ভুলে গিয়ে বিয়ে করেছিল সেই বেলার ভালোবাসায় আর তার কাছে অনেক ফিকে হয়ে এসেছে। বেলাকে ঘিরে জমতে শুরু করেছে অসন্তোষ। দ্বিজেনের এই তিক্ততা বেলার কাছেও ধরা পড়ে। সাংসারিক জীবনেও দ্বিজেনের এই তিক্ততা প্রকাশ পেতে থাকে। এক সময় তারা এই তিক্ত তার অবসান ঘটাতে চায় এবং বাধাধরা জীবন বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে পড়তে চায়।

দেওগিরির গ্রাম্য পরিবেশে তারা সমস্ত গ্লানিকে মুছে ফেলে এক নতুন অনুভূতি রঙে তারা রঙিন হয়ে উঠেছিল।দেওগিরির মনোরম পরিবেশ তাদের কাছে স্বর্গ হয়ে উঠেছিল।একদিন এই দেওগিরিতে মেজর সিংহ নামে এক সৈনিকের সাথে সাপুই দম্পতির পরিচয় ঘটে। এই পৌর ভদ্রলোকের দুটো পাই কাটা গিয়েছে যুদ্ধে। এই জলা কুটির জঙ্গল বাড়ি সমস্তটাই এই ভদ্রলোকের শীতকালে মাস দুয়েক থাকেন তিনি।সাপুই দম্পতি মেজ সিংহকে পেয়ে তাদের জীবনের একটা অভাব বোধ পূর্ণ হল।মেজ সিং এর জীবনে সান্নিধ্য পেয়ে তাদের জীবনে লাগলো খুশির ছোঁয়া।

মেজর সিংহর চরিত্র কে গল্প কার এখানে জীবনে বাঁচার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরেছেন । একদিকে বেলা ও দ্বিজেন এর জীবনে সন্তানসুখ না থাকলেও তাড়াতাড়ি জীবনকে উপভোগ করতে পারত। তবুও তাদের সবকিছু থাকা সত্ত্বেও তাদের জীবনে আনন্দ ছিল না। অন্যদিকে মেজর সিংহ যার জীবনে আত্মীয়-স্বজন পরিবার নিজের চলার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই তাও সে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ভালোবেসে প্রাণভরে উপভোগ করেছেন। গল্পকার শহুরে জীবনের বিরোধিতা করায় নয় এখানে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন বেঁচে থাকার জন্য মুক্ত পরিবেশের।গল্পকার এখানে মেজর চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছাকে কোন কিছুই বেঁধে রাখতে পারেনা। এরপর আমরা দেখি স্নিগ্ধ জীবন ভাবনা নিয়েই সাপুই দম্পতি কলকাতার বাড়িতে ফিরে আসে। দুইজনের কাছে মনে হয় 'পৃথিবীটা সত্যিই ভালো, স্বর্গই বলা যেতে পারে'।বেলা চলাফেরাতেও নতুন জীবনের সম্ভাবনা ধরা পড়ে। মেজর সিংহ সাপুই দম্পত্তির ভাবী সন্তানের জন্য মাসিক ৫০ টাকার কেন এনুয়িটি পলিসি দিতে পেরে নিজেকে সার্থক বলে মনে করেছেন।প্রথমে চিঠিটা দ্বিজেনকে খুশি করলেও পরে তাকে বিষন্নতায় আচ্ছন্ন করে দেয় –

> "দ্বিজেন বলতে গেল এই তো স্বর্গ।কিন্তু তার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেল।মনের এই গভীর কালো খাদের মধ্যে পড়ে যেতে যেতে সে ভাবল এই অপরিসীম বদান্যতা কি অকারন?"[১]

গল্পের সমাপ্তিতে আমরা দেখতে পাই যে বেলার গর্ভে মেজ সিংহের সন্তান। গল্পে কিন্তু কোথাও মেজর সিংহর সাথে বেলার দৈহিক মিলনের প্রসঙ্গ নেই।কিন্তু গল্পকার তার গল্পের সমাপ্তিতে একটি চিঠির মধ্যে দিয়েই সেই সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। যেখানে বেলা তার দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে গর্ভধারণ করে নি সেখানে সমাজ তাকেই দায়ী করেছে অথচ গল্পের সমাপ্তি থেকে আমরা দেখি বেলা গর্ভবতী। এখানেই পষ্ট হয়ে যায় যে দ্বিজেনের অক্ষমতার জন্যেই বেলা মাতৃত্ব লাভ করতে পারেনি।সেটা উপলব্ধি করেছিল বেলাও।তাইতো সে সমাজকে মান্যতা না দিয়ে নিজের মাতৃত্বকেই পূর্ণতা দিয়েছে।আবার আমরা দ্বিজেনকে দেখতে পাই সামাজিক পরিসরকে অতিক্রম করে সংকীর্ণ মানসিকতার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি।নিজের স্ত্রীর গর্ভে অন্য কারো সন্তান তা

মেনে নিতে পারেনি দ্বিজেন, দ্বিজেন এই সমাজবদ্ধ পরিসরে আবদ্ধ থেকেই স্বর্গভ্রষ্ট হয়েছে।

'সুধীরবাবু' গল্পে আমরা দেখি যে সুধীরবাবু ও সুপর্ণাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সুধীরবাবুর সঙ্গে সুপর্ণা দের কোন পারিবারিক সম্পর্ক ছিল না।সুপর্ণা দের নিউ আলিপুরে ফ্ল্যাটের সুধীর বাবু। ফ্ল্যাট গুলি পাশাপাশি থাকায় তাদের মধ্যে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুপর্ণা দের ছোটবেলা থেকেই তিনি আদরে ভালোবাসায় জড়িয়ে রেখেছিলেন।সুপর্ণার বিয়ের সময় স্বামীকে গাড়ি দিয়েছিলেন তেমনি স্বল্প ভাড়ায় ফ্ল্যাটের একটা অংশ তাদেরকে দিয়েছিলেন।সুপর্ণারা ছোটবেলা থেকেই তাদের আপনজন বলে ভেবে এসেছে।দাদা কাকা মামা ইত্যাদি সম্বোধনের বাবা মায়ের অনুকরণে তাকে সুধীরবাবু বলে ডাকলেও তাদের জীবনে যেকোনো সময়ই তিনি সবসময় পাশে থাকবেন সেটা অনুভব করেছে। এদিকে সুপর্ণাকে মা বলে জেনে এসেছে সে একদিন জানতে পারলো তিনি তার প্রকৃত মা নন, বিমাতা। এই সত্য জানার পর বিরাট এক নিঃসঙ্গতা তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। সুপর্ণা যখন কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল তখন তার পাশে ছিলেন সুধীর বাবু। তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কোলে তুলে নিয়েছিলেন সুধীর বাবু। ছোট্ট সুপর্ণাকে ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই সুপর্ণা সুধীরবাবুকে শ্রদ্ধা করে ভালোবাসে।

সুধীরবাবু ছিলেন একাকী মানুষ।সল্টলেকের একটা ফ্ল্যাটের একটা অংশে একা থাকতেন।তিনি একটা কাগজে সাব এডিটর হিসেবে কাজ করতেন।সুধীরবাবু তার চোখে সব সময় গাঢ় সবুজ রঙের চশমা রাখতেন।সুধীরবাবুর জন্য সুপর্ণা যা করে নিয়ে গেলে বর্না দেখতে পায় যে সুধীর বাবু ঘুমিয়ে আছেন। সুপর্ণার অস্বস্তি বোধ হয়।সুধীরবাবু ঘর গোছাতে থাকে নিজেকে অন্যমনস্ক করতে।সে হঠাৎ করে একজন মহিলার ছবি দেখতে পায়। সেই ছবিটার সঙ্গে সুপর্ণার চেহারার যেন অনেকটা মিল রয়েছে। সুপর্ণা আগ্রহী হয়ে ওঠে সেই ছবি সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করে। বাড়িতে গিয়ে ভাই কে বলে সে অ্যালবাম থেকে ছবি বের করে দেখে। কিন্তু ওই অ্যালবামের সবার ছবি থাকলেও সেই মহিলারই কোন ছবি নেই। সুপর্ণার পরে মনে হল এই ছবিটা সুধীর বাবুর কোন বন্ধুরও তো হতে পারে।বাড়ির অ্যালবামে কোন ছবি দেখতে না পেয়ে সে তখনই বেরিয়ে আসে। তার পুরনো স্মৃতি ভেসে আসে নিজেদের ফ্ল্যাটের একতলায় ছোট দোকানটা দেখে। দোকানে ঢুকে দোকানীর সঙ্গে কথা বলে সে জানতে চায় তিনি সুপর্ণার মাকে দেখেছেন কিনা, তার মা দেখতে কেমন ছিল তার মায়ের মৃত্যুর কারণ কি বা কোন অসুখ করেছিল কিনা। দোকানের সঙ্গে কথা বলে সুপর্ণা এইটুকু জানতে পারি যে তার মা দেখতে তার মতই ছিল। দোকানি সুপর্ণাকে আরো জানান যে তার মা আত্মহত্যা করেছিল। তার মা যখন আত্মহত্যা করেছিল তখন

সুপর্ণার বয়স ছিল ছয় মাস ।সত্য ঘটনা যতই পুরনো হোক না কেন তা মনের মধ্যে একটা ছাপ ফেলবেই। সুপর্ণা যতই নিজের মন থেকে সমস্ত ঘটনা সরিয়ে ফেলতে চাইলেও তবুও সুপর্ণার মনের সব ধারণা এলোমেলো হয়ে যায়। সুপর্ণা মায়ের আত্মহত্যা সংবাদের সঙ্গে কোথাও যেন সুধীরবাবুর ঘরে দেখা ছবিটি তার মনকে ভাবিয়ে তোলে। দুটি ঘটনার মধ্যে কোথাও যেন একটা যোগসূত্র খুঁজে পায়।সুপর্ণা ভেবে দেখতে চাই সতেরোই আগস্ট তারিখটি কি এমন হয়েছে। সুপর্ণার কাছে তখনও অজানা ছিল যে এরপর আরো কি সত্য তার জন্য অপেক্ষা করছে। এরপর সুপর্ণার সুধীর বাবুকে দেখে মনে হয় যে চাকরি সূত্রে হয়তো তার চোখের এমন অবস্থা। নিজের শোয়ার ঘরেও তাকে রং করা চশমা পড়ে থাকতে হয়।সুপর্ণা দেখে যে সুধীরবাবু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছ, চাও খাননি। সুপর্ণা যখন জিজ্ঞাসা করে যে চা খাননি কেন তার উত্তরের সুধীর বাবু বলেন এখন থেকে সতেরো আগস্ট তারিখে আর চা খাবেন না। সুপর্ণা বুঝতে পারে না যে সুধীর বাবু এই তারিখ থেকে কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছে।তার মনে খটকা লেগে যায়। সুপর্ণার মনে হল যে সুধীর বাবুর চোখে জল এসেছে। এমন সময় সুধীর বাবু চশমাটি খুলল যা এই বিশ বছরে প্রথম। সুপর্ণা সুদীপবাবুর এই চোখ প্রথম দেখতে পেল আশ্চর্য হয়ে গেল যে তার চোখের মতই গারো বাদামি। তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় যে অন্য কারোর নয় সেটি তার জননীর।

> "একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল সুপর্ণা তার নিজের চোখের মণির সঙ্গে সুধীরবাবুর চোখের এই মিল দেখে।... তার নিজের চোখদুটো তার সেই ছ'মাসেই ক্রমশ সুধীরবাবুর মতো হয়ে উঠেছিল বলেই কি তার মা সে সময়ে আত্মহত্যা করেছিলেন?... এ জন্যেই, এ জন্যেই কি, সুধীরবাবু কখনও দাদা, কাকা, মামা এসব সম্বন্ধ স্থাপন করতে দেননি।"[২]

সুধীর বাবুই হলো সুপর্ণার পিতা। সুপর্ণা তার মায়ের বিবাহিত স্বামীর সন্তান নয় সুধীর বাবুরই সন্তান।পাশাপাশি দুটি ফ্ল্যাটের মানুষ একে অপরকে ভালবেসেছিল। কিন্তু সমাজকে এড়িয়ে তারা বেশিদূর যেতে পারেনি, তাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি।তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তারে কৃতকর্মের ফল নিষ্পাপ শিশুটিকেই ভুগতে হবে। নিজেকে তিনি স্থির রাখতে পারেননি। আত্মহণের মধ্যে দিয়েই তিনি নিজের শাস্তি নিয়েছেন।অন্যদিকে সুধীর বাবুও সমাজকে উপেক্ষা করতে পারেনি। তাইতো সে তার চোখে সবুজ গারো চশমা রেখে দিয়েছিল। না হলে যাকে এত ভালবেসেছিল তাকে কখনোই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিতে পারতেন না।সমাজকে উপেক্ষা করে তাকে স্বীকৃতি দেবার বা গ্রহণ করবার সাহস তার হয়নি। নিজের সন্তানকে সন্তান বলে পরিচয় দেওয়ার সাউস টুকুও তিনি দেখাননি।তুমি যতটুকু পেরেছেন আড়ালে থেকে তার মেয়ের সব সময় পাশে দেখেছেন। তার মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে যাতে তার

কোন অসুবিধা না হয় তার নিজের চোখকেও আড়াল করে রেখেছেন। আর যাকে ভালবেসেছিলেন তার কথা মনে রেখে নিজেকে দেখেছিলেন একাকী নিঃসঙ্গ।গল্পকার এখানেই সমাজ ও সামাজিক অনুশাসনকে মেনে নিয়ে ব্যক্তি স্বতন্ত্রের পরিচয় দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১) অমিয়ভূষণ মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার রচনা সমগ্র-৪, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, জুন ২০০৭, পৃষ্ঠা-৩৮৮ ।

২) অমিয়ভূষণ মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার রচনা সমগ্র-৭, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা-৪৪৩ ।

রমাপদ চৌধুরীর 'হারানো খাতা' : হয়ে ওঠা জীবন ও কতিপয় ভাবনা

মোসাহিদা খাতুন
আমন্ত্রিত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাংলা স্মৃতিকথার ধারায় রমাপদ চৌধুরীর 'হারানো খাতা' (২০১৫) এক ব্যতিক্রমধর্মী রচনা। যেখানে লেখকের শৈশব ও কৈশোর জীবনের টুকরো টুকরো ছবি ধরা আছে। তবে এটিকে স্মৃতিকথা বলবো, না কি আত্মজীবনী, না কি দুই মিলিয়ে ভিন্ন স্বাদের গ্রন্থ! পরিণত বয়সে পৌঁছে তিনি যখন নতুন আর-কিছু লেখেন না, পাঠকের মনে বেদনা জাগিয়ে লেখকজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন স্বেচ্ছায়, তখনই আচমকা আবিষ্কৃত হল এক বাক্স লেখাজোখা। স্বয়ং লেখকের স্মৃতি থেকেই হারিয়ে গিয়েছিল যার অস্তিত্বের কথা। 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় রমাপদ চৌধুরী সে-লেখার নাম দিলেন 'হারানো খাতা'। 'হারানো খাতা'র পাতায় পাতায় উপস্থিত এক অসাধারণ ছেলেবেলা, আর ফেলে-আসা অপূর্ব কৈশোর, যার গায়ে লেগে আছে হারিয়ে-যাওয়া যুগের অমূল্য স্মৃতিচিহ্ন। এই বই আত্মপ্রচারহীন এক আত্মজীবনী, তার চেয়েও বেশি বিস্মৃত সময়ের রূপকথা। লেখক তাঁর পাঁচ বছর বয়সে অর্থাৎ **১৯২৭** সালে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হওয়া থেকে মেট্রিকুলেশন পাশ দিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ষোলো বছর বয়সের ঘটনা খন্ড খন্ড ভাবে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে স্বাধীনতার পূর্বে রেল শহর খড়্গপুরের বিস্তৃত বর্ণনা প্রথমের দিকের পরিচ্ছেদগুলিতে আলোচিত হয়েছে। তেরো-চোদ্দো-পনেরো নম্বর পরিচ্ছেদে লেখকের পূর্বপুরুষের ভিটা অর্থাৎ গ্রাম্য পরিবেশ বর্ধমানের বর্ণনা দিয়েছেন ও অবশিষ্ট অন্তিম পরিচ্ছেদ গুলিতে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও ইডেন হিন্দু হোস্টেলে থাকার সুবাদে কলকাতার আনন্দ ও বিস্বাদ জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণিত। ইংরেজ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, মেথর, ব্রাহ্মণ, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতির কথা যেমন আছে, তেমনি লেখকের মায়ের সংস্কারও বিদ্যমান। নতুন শহর, নতুন শিক্ষক, নতুন থাকার স্থান, বন্ধুরা আপনি থেকে তুমি থেকে তুই এ পরিণত হওয়া, ক্লাস ফাঁকি দিয়ে সিনেমা দেখা, প্রক্সি দেওয়া খেলাধুলা সত্যজিৎ রায়কে চেনা প্রভৃতি আনন্দ-পূর্ণ দিনের মধ্যে দিয়ে ষোলো বছরের যৌবন জীবনের সুন্দর বর্ণনার মধ্যে দিয়ে 'হারানো খাতা' সমাপ্ত হয়েছে।

মূল শব্দ: স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী, রেল শহর, ইংরেজ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, মেথর, ব্রাহ্মণ, হিন্দু, মুসলমান।

রবীন্দ্র ও স্বাধীনতা পরবর্তী লেখক রমাপদ চৌধুরীর 'হারানো খাতা' (২০১৫) এক ব্যতিক্রমধর্মী রচনা। যেখানে লেখকের শৈশব ও কৈশোর জীবনের টুকরো টুকরো ছবি ধরা আছে। এটিকে স্মৃতিকথা বলবো, না কি আত্মজীবনী, না কি দুই মিলিয়ে ভিন্ন স্বাদের গ্রন্থ! এ প্রসঙ্গে ব্লার্ব থেকে জানা যায়—'বরণীয় সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর 'হারানো খাতা' এক আশ্চর্য উদ্ধার। প্রায় যেন গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার মতোই ঘটনা। পরিণত বয়সে পৌঁছে তিনি যখন নতুন আর-কিছু লেখেন না, পাঠকের মনে বেদনা জাগিয়ে লেখকজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন স্বেচ্ছায়, তখনই আচমকা আবিষ্কৃত হল এক বাক্স লেখাজোখা। স্বয়ং লেখকের স্মৃতি থেকেই হারিয়ে গিয়েছিল যার অস্তিত্বের কথা। 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় রমাপদ চৌধুরী সে-লেখার নাম দিলেন 'হারানো খাতা'। 'হারানো খাতা'র পাতায় পাতায় উপস্থিত এক অসাধারণ ছেলেবেলা, আর ফেলে-আসা অপূর্ব কৈশোর, যার গায়ে লেগে আছে হারিয়ে-যাওয়া যুগের অমূল্য স্মৃতিচিহ্ন। এই বই আত্মপ্রচারহীন এক আত্মজীবনী, তার চেয়েও বেশি বিস্মৃত সময়ের রূপকথা'।

লেখক তাঁর পাঁচ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯২৭ সালে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হওয়া থেকে মেট্রিকুলেশন পাশ দিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ষোলো বছর বয়সের ঘটনা খন্ড খন্ড ভাবে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে স্বাধীনতার পূর্বে রেল শহর খড়্গপুরের বিস্তৃত বর্ণনা প্রথমের দিকের পরিচ্ছেদগুলিতে আলোচিত হয়েছে। তেরো-চোদ্দো-পনেরো নম্বর পরিচ্ছেদে লেখকের পূর্বপুরুষের ভিটা অর্থাৎ গ্রাম্য পরিবেশ বর্ধমানের বর্ণনা দিয়েছেন ও অবশিষ্ট অন্তিম পরিচ্ছেদ গুলিতে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও ইডেন হিন্দু হোস্টেলে থাকার সুবাদে কলকাতার আনন্দ ও বিস্বাদ জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণিত।

লেখকের পিতা মহেশচন্দ্র চৌধুরী ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ যে বছর নোবেল পুরস্কার পান সেই বছর এম.এসসি পাস করেন। ইচ্ছে ছিল বিজ্ঞানের গবেষক হওয়ার কিন্তু ভাগ্যে জুটলো রেলের উচ্চপদস্থ অফিসারের পদ। পরবর্তীকালে লেখক রমাপদ চৌধুরী গণিতে ভালো নম্বর পেলেও পিতার সুপ্ত ইচ্ছা অর্থাৎ সাইন্স নিয়ে পড়াশোনা করানোর ইচ্ছা থাকলেও সন্তানের ইচ্ছাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। আধুনিক মনস্ক ছিলেন পিতা, তাই পুত্রের শিক্ষার স্বাধীনতা দেওয়ায় রামাপদ চৌধুরীর মত একজন লেখককে পাঠকরা উপহার হিসেবে পেয়ে গেছেন। ৬০০ টাকা বেতনের পাঁচ বোন, দুই ভাই ও বাবা-মায়ের একটা সুন্দর সচ্ছল পরিবারে রমাপদ চৌধুরী বেড়ে ওঠেন।

পিতা রেলের কর্মচারী হওয়ায় রেলের সরকারি কোয়ার্টার্সে 7676/1 নম্বর দোতালা বাংলোতে থাকার সুযোগ পান। রেল শহরটি পূর্ব-পশ্চিম আড়াড়িভাবে দুটি রেললাইন চলে গেছে। জনসংখ্যা তখন বেশি ছিল না। তাই রেলের বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন প্রদেশের শ্রমিকরা উত্তর দক্ষিনে বসবাস করতেন। দক্ষিণ দিকে বলা হত সাহেবপাড়া, এখানে উচ্চপদস্থ কর্তারা বসবাস করতেন। লেখকের পিতা ও এখানে বসবাসের যোগ্য ছিলেন কিন্তু পিতার পদে পিতার আগে যে অফিসার কাজ করতেন

সুদর্শন কাশ্মীরি ভদ্রলোক, নাম কাউল তিনি ওই পাড়ায় বসবাস করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি উত্তরে গোলবাজারে বাংলো তৈরি করেন। উত্তরের পাড়ায় তিনটি শ্রেণীর লোক মুসলমান, বাঙালি, হিন্দুস্তানি এরা বসবাস করতেন। সাহেব পাড়াতে অরিজিন্যাল সাহেব, মেম ও মিস্ বাবা থেকে মিসিবাবা হয়ে যাওয়া অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা বসবাস করতেন। তাদের প্রত্যেকের বাংলো ছিল সুন্দর, ঝকঝকে, সামনে ফুলের বাগান ও পিচ ঢালা রাস্তা। এইসব বাংলো দেখে লেখক নিজেদের বাংলোটাকে একটু ঈর্ষা করতেন। লেখকের মা গোলবাজারে বসবাস করে বেশ খুশি ছিলেন কারণ সেখানে ছিল একটি কালী মূর্তি। লেখকের বাংলোর সামনে ও সমগ্র গোলবাজারে লাল মোরাম বিছানো রাস্তা ছিল। এই রাস্তা নিয়ে প্রাচীন কবিরা রোমান্টিক অনেক কবিতা লিখলেও লেখকের বর্ণনায়- "বাংলা সাহিত্যের অনেক রোম্যান্টিক লেখায় লাল মোরাম বিছানো রাস্তা নিয়ে প্রচুর কাব্য করা হয়েছে, পড়লে হাসি পায়। ব্যাপারটা মোটেই কাব্য করার মতো নয়। মোরাম অর্থাৎ লাল কাঁকর দু'দিনেই ধুলোয় পরিণত হয়ে যেত। ফলে বাইরে থেকে দেখতে সুন্দর ছিমছাম বাগানঘেরা রেলের কোয়ার্টার্সের অন্দরমহল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাই ছিল দুরূহ। তবে কৃপাবশে কোম্পানি সেই ধুলোর ওপর জল ছিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। এই লাল ধুলোর অত্যাচারে পোশাক পরিচ্ছদও অচিরেই রঙিন হয়ে উঠত, সাদা ধুতি যারা পরত তাদের দুর্দশাই ছিল সবচেয়ে বেশি।"[১]

রেল শহরে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ১২-১৪ বছরের মেয়েদের লেডিস সাইকেল চালিয়ে যাওয়া লেখককে আপ্লুত করেছিল। ১০-১১ বছরের হাফ ইংরেজ অ্যাংলো মেয়ে পলার সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলতে পেরে লেখক নিজেকে ধন্য মনে করলেও লেখকের মায়ের মনে ছেলের প্রতি একটি আতঙ্ক থেকে যায়। বাঙালি সমাজে প্রচলিত- "ওরা এবং ইংরেজ মায়েরা ছেলে মারা গেলেও কাঁদে না এবং স্বামী মারা গেলে আবার বিয়ে করে । ডিভোর্স করে আবার বিয়ে করে। সুতরাং ওরা সকলেই লুজ ক্যারেক্টার।"[২] গলা ফাটিয়ে সুর কারে কাঁদা এবং জীবনের নানা ঘটনার বর্ণনা দেওয়া বাঙালির কাছে প্রকৃত দুঃখ প্রকাশের উপায়। ইতিমধ্যে পলাদের বাংলোতে তিনদিন গিয়ে এবং একদিন ওর মা মাখন মাখানো পাউরুটি আর চা খাইয়েছে সে কথা লেখক মায়ের কাছে চেপে যান। পিতা হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময় একজন নার্স ঘন ঘন এসে দেখাশোনা করত বলে লেখকের মা নিজেই সংসার ছেড়ে স্বামীর হাসপাতালের কোয়ার্টার্সে আশ্রয় নেয় দুবেলা স্বামীকে ভাত রান্না করে খাওয়ানোর জন্য। গোলবাজার অঞ্চলে উত্তর পাড়ায় হল্যান্ড থেকে ফিলিপিস রেডিও একমাত্র লেখকের বাড়িতে ছিল। দিদিদের সঙ্গে রেডিওর গান শুনতে প্রতিবেশী উঠতি যৌবনের মেয়েরা আসতেন, লেখকের মায়ের অনুপস্থিতিতে তারাও নিজেদের থেকে আসা বন্ধ করে দিয়েছিল। বাঙালি গৃহের শুচিবাঈগ্রস্থতা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শেষে পাই, লেখকের অসুস্থ বাবাকে এক সাদা সাহেব দেখা করতে আসার দরুন যে চেয়ারে বসতে দিয়েছিলেন সেটি

রীতিমতো গঙ্গাস্নানে শুদ্ধ করে তবেই ঘরে তুলেছিল। বন্ধুদের কাছে লেখক পলার সঙ্গে আলাপের বর্ণনায়- "সমবয়স্ক এক অ্যাংলো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তার সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলেছি, এর চেয়ে গর্বের ব্যাপার আর কী হতে পারে। এই নিছক বালালীলাকে কৃষ্ণলীলা বানাবার মতো অতিশয়োক্তি মাখিয়ে স্কুলের বন্ধুদের কাছে বর্ণনা করতে বিলম্ব করিনি। ফলে রাতারাতি আমি তাদের চোখে হিরো হয়ে উঠলাম। আর তাদের সকলেরই একটাই অনুরোধ— মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দে।"[৩] লেখকের কথায় বাজারে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও ইংরেজ মেয়েরা সাইকেল চালিয়ে সারা শহর ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের একজনের সঙ্গে আলাপ করলেই পারতো 'কিন্তু এমনই মজার ব্যাপার, সব পুরুষের মধ্যেই দেখেছি, প্রেমফ্রেমের ব্যাপারে একজন কেউ একটি মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেই অন্য সকলে তার দিকেই আকৃষ্ট হয় এবং পাকেপ্রকারে সেদিকেই ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়'।[৪] ইংরেজদের মতো ফর্সা ইংরেজদের মতো চালচলনে সকল অ্যাংলোরা হিন্দি জানত, বাংলাও। তবে তারা ইংরেজিতে কথা বলতো। যুদ্ধের পরে সকলেই অস্ট্রেলিয়ায় চলে যায়। মেয়েরা অনেকে আমেরিকার সৈন্যদের বিয়ে করে আমেরিকায় চলে যায়, কেউ কেউ ইংল্যান্ডে।

বার্জ সাহেবকে হত্যা করে বিপ্লবীরা নাকি ফুটবল মাঠ থেকে সাইকেল চালিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল তাই আইন করে বাঙ্গালীদের কাছ থেকে সাইকেল কেড়ে নিয়েছিল ব্রিটিশ পুলিশ। সাইকেল না থাকায় কয়েকজন বন্ধু মিলে প্রতিদিন সকালে সাহেব পাড়ার মধ্য দিয়ে মর্নিংওয়াক করতে যেতেন। সাহেব পাড়ার পিচ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে দু'ধারে বিলাতি ফুলের বাগান ও বাচ্চাদের প্যারাম্বুলেটরে বসিয়ে আয়ারা কখনো মা বা মেয়েরা ঠেলে নিয়ে যায়। একদিন প্লাটফর্মের ওপর দিয়ে আসার সময় পাশাপাশি দুটি জানালা খোলা জানালার রাখা একটি নির্জন হাত চোখে পড়েছিল।পাঞ্জাবির হাতা থেকে হাতটি বেরিয়ে এসেছিল, লেখকরা আসছিলেন পূর্ব থেকে পশ্চিমে আর যাত্রী টি তাকিয়ে ছিল পশ্চিম দিকে। যাত্রীটি আর কেউ নন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েরা কোত্থেকে এক টুকরো কাগজ নিয়ে অটোগ্রাফ নিতে ছুটে আসলেও লেখক মোহগ্রস্তের মতো ধীরে ধীরে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েন যে ফুলটিকে বিলিতি চাঁপা ফুল লেখক নাম দিয়েছিলেন, প্ল্যাটফর্মের গাছ থেকে কৃষ্ণচূড়ার একটি ডাল ভেঙে নিয়ে ফুলগুলি নামাতে গেলেন কবিগুরুর পায়ের কাছে- "তিনি দু'হাতে তুলে নিলেন। আর সেই বিলিতি চাপাগুলি তুলে নিয়ে বললেন, মুচকুন্দ? কোথায় পেলে? নাম জানতাম না ফুলটার, নামটা জানিয়ে দিলেন তিনি। একটা ফুল চিনিয়ে দিলেন।"[৫] ছয় বছর বয়সে 'সোনার তরী' পুরস্কার পাওয়া ও চোদ্দো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের দেখা, পরবর্তীকালে রবীন্দ্র দর্শনের বিবরণ 'লেখালেখি' বইটিতে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন।

প্রযুক্তিতে রেলের শহর খড়গপুর ও এমন কি কলকাতা শহর উন্নত হলেও সেপটিক ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা ছিল না। প্রত্যেক কোয়ার্টার্সে ছিল খাটা পায়খানা।

গোলপাড়ার দুর্গা মন্দির থেকে কিছুটা দূরে ছিল মেথরদের বস্তি। প্রতিদিন ওই বস্তির মেয়ে পুরুষ এসে সেগুলি সাফ করতো এবং মাথায় বিষ্ঠাপূর্ন বালতি নিয়ে চলে যেতেন। কোথায় ফেলতো তাও জানা যায় না, দশ-বারো বছরের ছেলেমেয়েরা মাসিক কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে একাজ করতো। লেখকের মনে হয়েছে তাতে সমাজে বিবেকের দংশন ঘটতো না। গ্রামে এই ঝামেলা ছিল না। গ্রামের মানুষজন পুকুরের ধারে কোন মাঠে কিংবা পূর্ববঙ্গ নদী প্রধান হওয়ায় নদীর জলের সারা বছর ভাসতো। এ ব্যাপারে লেখক সুবোধ ঘোষের মুখে শুনেছিলেন পূর্ববঙ্গের কথা; তার বর্ণনায়- ''গান্ধীজি- সঙ্গে নোয়াখালিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। খেতের আল ধরে এক গ্রাম থেকে চলেছি আর এক গ্রামে। ফলে নানারকম লোক। রাজনীতিক, সাংবাদিক, গান্ধী আশ্রমের সঙ্গীরা এবং আরও অনেকে দলের সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন, প্রচুর স্থানীয় মানুষও। গান্ধীজি যেরকম দ্রুত হাঁটতেন তাতে আমাদের মতো লোকদের পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে। সেই সময় নজরে এল এমন কিছু লোক ওই মিছিলে ঢুকে গেছে যাদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় যে তারা অবাঙালি, সম্ভবত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের লোক। তাদেরই একজন হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজ, ইধারকা আদমি লঘুক্রিয়া কাঁহা করে? বললাম, যেখানে খুশি করুন। তাতে থমকে গিয়ে লোকটি বললে, আউর গুরুক্রিয়া? বললাম, আপনার কি এ ব্যাপারে কোনও অসুবিধে হচ্ছে? সব গ্রামেই তো রয়েছে টুংগিঘর, যেখানে বাঁশের হাতল ধরে উঠে যেতে হয়। তাতে লোকটি হাত জড়িয়ে ধরে বলল, তো কুম্ভীপাক হ্যায়। হামে ও কুম্ভীপাক সে বাঁচাইয়ে। বলে প্রায় কেঁদে ফেলল। কথাটা মিথ্যে নয়। যে-বাঁশের ওপর পা রেখে উঠতে হয় সেটি অত্যন্ত পিচ্ছিল, পা পিছলে পড়ে গেলেই স্তূপীকৃত মলের কুণ্ডের মধ্যে পড়তে হবে।''[৬] লেখকের বর্ননায় - "ফরিদপুর অন্যান্য জলা-জায়গায় 'গাছাইমু' ব্যাপারটা হল গাছের ডালে বসে গুরুক্রিয়া করা। পূর্ববঙ্গীয় এই জাতীয় পদ্ধতি অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের 'মাঠে যাওয়া' একাংশে অনেক সেফ এবং তা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। তবে খাটা-পায়খানা কিন্তু উভয়ের চেয়ে নিকৃষ্ট। সেখানে একটি দেওয়াল ঘেরা পায়খানা থাকে উঁচু পেডেস্টালের ওপর, আর নীচে একটি চৌকো টিনের ট্রে থাকে। পিছন দিকে বাড়ির বাইরে যথাস্থানে ছোট একটি ঢাকা দেওয়া গমন-নির্গমনের পথ থাকে। সেই আচ্ছাদন তুলে মেথর ট্রে-টি বের করে বিষ্ঠা একটি বালতিতে ঢেলে সেটি মাথায় করে নিয়ে যায় এবং ফেলে দেয়। বারো-চোদ্দো বছরের ছেলেমেয়ে থেকে বয়স্ক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকেও এ কাজ করতে দেখেছি।কখনও কারও কাছে তা অমানবিক ঠেকেনি। বলাবাহুলা রেলের মতো শিল্পনগরীতেও এই ব্যবস্থা ছিল। এমনকী, সাহেব পাড়ার বাংলোগুলিতেও। তবে সেখানে দিশি প্রথার বদলে এক ধরনের কমোড সিস্টেম ছিল।"[৭] তৎকালীন সাম্যবাদীরা অফিসার ও কেরানির বেতনের অসাম্যের প্রতি সচেতন হলেও পুরুষানুক্রমে মেথর বৃত্তিতে তাদের নিয়োগ করে তাদেরই অস্পৃশ্য অশুচি বলার মধ্যে কতখানি বর্বরতার ও নিচতা লুকিয়ে ছিল তার মহামহা সামবাদীরা সচেতন ছিলেন না।

আর্থিক অসাম্য থাকলেও জাতিগত অসাম্য রেল কোম্পানি কখনোই বরদাস্ত করেনি এই প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন- "রামদুলালের বাবা এবং মা-ও খাটা-পায়খানা সাফ করত, মাথায় করে বিষ্ঠার বালতি নিয়ে যেত। হঠাৎ বস্তিতে কলেরা দেখা দিলে রামদুলালের বাবা-মা দু'জনেই মারা যায়। রামদুলাল অনাথ হয়ে পড়ে। তখন সাহেবদের বাংলোর সঙ্গে মেথর, ধোপা এবং মালির কোয়ার্টার্সও থাকত। মার্টিন নামে এক সাহেব রামদুলালকে নিয়ে গিয়ে সেই কোয়ার্টার্সে থাকতে দেন এবং তার পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দেন। পরে রামদুলাল এনট্রান্স পাশ করলে তাকে কম্পাউন্ডারি পাশ করান।ছোট হাসপাতালের কম্পাউন্ডার ছিল এই রামদুলাল। হাসপাতালের কাছেই দু'জন কম্পাউন্ডারের কোয়ার্টার্স ছিল, গায়ে গায়ে। একজন ব্রাহ্মণ, অন্যজন এই মেথর। এই সাম্যবাদ আমাদের সাম্যবাদী বাংলা দেশে কখনও দেখিনি।"[৮]

দোলের আগের দিন রাত্রে চাঁচরের দিন বালকদের বড় আনন্দের দিন ছিল। নোড়াপোড়াও এর দিনে বালকরা বড়দের উস্কানিতে গৃহস্থ বাড়িতে যা কিছু পেতে চুরি করে এনে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিত। এখান থেকে চুরি বিদ্যার হাতে খড়ি হয়। লেখকদের বাংলো থেকে কিছু দূরে একটি কোয়াটার্সে বিনয় বাবু থাকতেন। বিনয় বাবুর পিতা ভদ্রলোক, একটু ছিটগ্রস্ত ছিলেন। তাই ছেলেরা সুযোগ পেলে ক্ষ্যাপাতো 'ঝিঁঝিপোকা কুপোকাত' বলে। বিনয় বাবুর অজ্ঞাতে একটি ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে ঝিঝিঁ পোকার সঙ্গে বিয়ে দেয় ও গাঁদা ফুলের মালা বদলের পর মেয়ের সাজ খুলে মোহভঙ্গ করেন। ঝিঁঝিপোকার শখ ছিল ছাগল পোশা। প্ল্যান করে ছাগল চুরি ও সুন্দর পিকনিক ভেঙ্গে দেয় বন্ধু নারায়ণ চৌবে।

রেল শহরের সিজন ফ্লাওয়ারের, মৌসুমী ফুলের মতো যাযাবর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ইরানি বেদের দল। লেখক এদের নিয়ে সুন্দর গল্প লিখেছিলেন 'কাল আয়ো'। তিনটি ইরানি মেয়ে ন'টাকার বিনিময় নাচ দেখাবে বলেছিল কিন্তু পরের দিন পুরো দলটি হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এরা সকলে যে যাযাবর থাকে তাও নয়, এক ইরানি বেদের সঙ্গে ফল বিক্রেতা রহিমের মোহাব্বত হয়েছিল তাই রহিম তাকে কোয়ার্টারে নিয়ে এসে আটকে রাখে। মুস্তাফার কাছে মেয়েটি চলে যাওয়ার জন্য সাহায্য চাইলেও সাহায্য করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করতে না পেরে বড় হয়ে অপরাধে ভুগেছিলেন আমাদের লেখক।

শহর জীবনে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে হীনম্মন্যতায় ভোগা ও সাবালকে সিগারেট খাওয়া। স্কুল জীবনে একেবারে নিষেধ হলেও কলেজে গিয়ে ডবল প্রমোশন অর্থাৎ হুইস্কি সেবন দেখেছিলেন। লেখকের প্রথম দিনের সিগারেটের স্বাদ ভালো লাগেনি।

তৎকালীন লাইট আলো বাদ্য বাজনা জাঁকজমকপূর্ণভাবে প্রাচীন ঐতিহ্য দুর্গাপূজা করা হতো না। বিজয়া দশমীর দিন সকালে বাঙালিরা ঢাকঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেয়া হতো দূর মহল্লা পর্যন্ত কাঙালী বিদায়ের খাদ্য পরিবেশন এর কাজ পেয়ে নিজেকে দামি

মনে করতেন। লেখকের বর্ননায়-"চাঁদার টাকা ফালতু খরচ করা হত না। তার বদলে কাঙালি পুরুষদের একটি করে ধুতি, মেয়েদের সধবা-বিধবা অনুযায়ী লালপাড় শাড়ি বা থান, বাচ্চাদের ফ্রক আর হাফ প্যান্ট দেওয়া হত। আর সারি দিয়ে বসিয়ে খাওয়ানো হত, ম্যাও বোঁদে এবং দই। মনে রাখতে হবে, সেটা ছিল স্বদেশিয়ানার যুগ।"[৯]

শনিচার নিজের শিল্পমন মেটাতে প্রতি রবিবার বার্মাটিক কাঠে লেখকের বাড়িতে আসবাবপত্র তৈরী করতেন। দুর্গা মন্দিরের প্যান্ডেলে শটশার্কিট থেকে বৈদ্যনাথদার বাঁচাতে মায়ের অবদান সমস্ত পুরুষ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। করুর ছাগল ইদ্রিসের উপার্জনের পন্থা 'ইন হিউম্যান শব্দটি নিশ্চয় ওই রামছাগলটির গায়ে লাগেনি'।[১০] চিলের ছোঁ মাথায় সমস্ত রসগোল্লা বাজারে ছিটকে গেলে সুন্দরলাল বিনা পয়সায় আবার ঠোঙা ভরে মিষ্টি দিয়ে জামা দিয়ে ঢেকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন 'এক খিলি মিঠে পান' এই প্রেক্ষাপটে লেখা।

তেরো, চোদ্দো নম্বর পরিচ্ছেদে ১৭-১৮ বছরের জেঠতুতো দাদার বিয়ের উপলক্ষে গ্রামের সঙ্গে লেখকের পরিচয় ঘটে। গ্রামের গরুর গাড়ি, খড়ের উপর তোষক এবং তার ওপরে সুজনি বিছানো, মেটে রাস্তা, ছইয়ের কারুকার্য পরিচয় ঘটে। গ্রামে পা দিতেই ঝাংলাইয়ের পরিচয় ঘটে। গ্রামের মানুষের অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার ও সরল মনোভাব এখানে ফুটে উঠেছে। নিতবর নিতকণের প্রসঙ্গ উপভোগ্য। নয় দশ বছরের গ্রাম্য মেয়ে রিনা; চিনিয়ে দিয়েছিল বকুল, নয়নতারা, আকন্দ, কদম, কলকে, জুঁই, চাঁপা এছাড়া, সাঁওতাল মেয়ের দল পরস্পর কোমর জড়াজড়ি করে হাসতে হাসতে যাওয়া ও খোঁপায় দেওয়া ঝিঙেফুল চিনিয়ে দিয়েছিল। ওই চারজন সাঁওতাল মেয়ের চলার ছন্দ লেখককে মুগ্ধ করেছিল। রিনাকে ছেড়ে আসার সময় লেখকের হৃদয় কষ্ট অনুভব করেছিলেন তাই পরবর্তীকালে রীনাকে নিয়ে লিখেছিলেন 'জনৈক নায়িকার মৃত্যু'।

স্কুল জীবনের একজন অখ্রিস্টান শিক্ষকের সামান্য কথা 'বাইবেল পড়ে দেখো' কথাটি পরবর্তী কালে লেখকের জীবনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। 'তোরা হিন্দু না মুসলমান?', 'মুসলমান না বাঙালি?' কিংবা 'তোকে দেখে মনেই হয়না তুই মুসলমান।' এই কথাগুলো মানুষকে আঘাত করে অথচ যারা বলে তারা সচেতন হয়ে বলে না লেখক জানিয়েছেন। লেখকের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য ক্লাস নাইনে ওঠার পর বাবা মাঝে মাঝে দূরে কোথাও ট্রেনে একা একা পাঠিয়ে দিতেন। এই সুবাদে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরাও এ দেশে বসবাস করতে করতে এ দেশকে ভালোবেসে ফেলেছে তা জানতে পারেন গলসি যাওয়ার পথে একটা নির্জন পাহাড়ের বাংলোতে এক বৃদ্ধ সাহেবের খুপরি নিয়ে বাগান চর্চা করতে দেখে পূর্বস্মৃতি 'লুক, দিস ইজ আওয়ার গ্রিন বেঙ্গল'[১১] কথার মধ্যে দিয়ে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হয় এবং সিট পড়ে হেয়ার স্কুলে, ফলাফলের টেনশনে বিলাসপুরে দিদির বাড়ি চলে আসে। বাবার টেলিগ্রাম- "Congratulations for Result, come sharp— Baba."[১২] প্রেসিডেন্সি

কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়ে রেল শহর ছেড়ে চলে আসেন শহর কলকাতায়। ভর্তি হন ইডেন হিন্দু হোস্টেলে। অধ্যাপক বার্টলেট টিউটোরিয়াল ক্লাসের ৬ জনের ব্যাচ করে পড়ানো ও একটি ইংরেজি কবিতা লিখে নিয়ে যাওয়ায় প্রশংসা, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এর বিএ ক্লাসের শেক্সপিয়ার পড়ানো, সোমনাথ মৈত্র রবীন্দ্রনাথের কিছু গল্প ইংরেজিতে অনুবাদ করে সেগুলো শুধু রিডিং পড়ানো তাতে লেখকের মনের মধ্যে গেঁথে যেত। এছাড়া বাঙালি অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সোমনাথ মৈত্র, তারকনাথ সেন, মহেন্দ্রনাথ সরকার, গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ইউ এন ঘোষাল, জে সি সিনহা, সুশোভন সরকার প্রমুখ ব্যক্তি বরণ্য। প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং ইডেন হিন্দু হোস্টেলের উজ্জ্বল দিনগুলির কথা বলে গেলেও অনেক চাপা গ্লানিও ছিল। তার মধ্যে একটি হলো ডাইনিং হলে দরজার মাথায় লেখা "For Brahmin's only" এ ব্যাপারে লেখক জানিয়েছেন- "তা হলে ওটা লেখা কেন? মজার ব্যাপার হল, প্রতি বছরই সারা হস্টেলের কলি ফেরানো হয়। অর্থাৎ হোয়াইট ওয়াশ করানো হয়। কিন্তু এক রহস্যময় কারণে দরজার ওপর লেখা 'For Brahminy only' সযত্নে টিকিয়ে রাখা হত। কেন? এক সিনিয়র 'দাদা', যিনি আমাদের সঙ্গেই খেতে এসেছেন, উত্তর দিলেন, বাঙালি আসলে কত ছোটলোক ছিল, তা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে। অধিকাংশই হো হো করে হেসে উঠল, যে দু'-চারজন ব্রাহ্মণ ছিল তাদের ম্রিয়মাণ দেখাল কি না লক্ষ করিনি। এবং সেদিনই এক সিনিয়র ছাত্রের মুখে ইডেন হিন্দু হস্টেলের গ্লানিময় ইতিহাসটি শুনলাম। অনেকেই হয়তো জানেন না, সেকালের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এবং বিজ্ঞানজগতের কয়েক জন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের পদার্পণ ঘটেছিল এই হস্টেলে। কিন্তু জাতপাত নীচতার জন্যে ঘটে গিয়েছিল এক কল্পনাতীত দুর্ঘটনা। যার প্রতিবাদে একসময় তাঁরা হস্টেলটি পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।"[১৩] মেঘনাদ সাহা, তাঁর বন্ধু জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহ বেশ কয়েকজন হোস্টেল ছেড়ে আস্তানা নিয়েছিল কাছেই আরেকটি প্রাইভেট মেসবাড়িতে। নতুন শহর, নতুন শিক্ষক, নতুন থাকার স্থান, বন্ধুরা আপনি থেকে তুমি থেকে তুই এ পরিণত হওয়া, ক্লাস ফাঁকি দিয়ে সিনেমা দেখা, প্রক্সি দেওয়া খেলাধুলা সত্যজিৎ রায়কে চেনা প্রভৃতি আনন্দ-পূর্ণ দিনের মধ্যে দিয়ে ষোলো বছরের যৌবন জীবনের সুন্দর বর্ণনার মধ্যে দিয়ে 'হারানো খাতা' সমাপ্ত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. রমাপদ চৌধুরী, 'হারানো খাতা', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০২২, পৃ-৩৮।
২. প্রাগুক্ত, পৃ-৭৭।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ-৭৮।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ-৭৮।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ-১০৫।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ-৮০।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৮০-৮১।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ-৮২-৮৩।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৭।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ-১৪৯।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ-১৯৬।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ-২০৪।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ-২৪২।

‘ফুলকুসুমা’: প্রবীণ দম্পতীর পশু-বাৎসল্যের আখ্যান

সুচিস্মিতা কাঞ্জি
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী

সারসংক্ষেপ: আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে নলিনী বেরার নাম সুপ্রসিদ্ধ। জীবনদরদী এই কথাসাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মে মানব জীবন যেমন দক্ষতার সাথে চিত্রিত হয়েছে, তেমনি মানবের সাথে মানবেতর প্রাণীর সম্পর্কও সুদক্ষতার সাথে চিত্রিত হয়েছে। নলিনী বেরার ‘ফুলকুসমা’ উপন্যাসটি তাঁর এজাতীয় সাহিত্যকর্মগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি এঁড়েবাছুরকে অবলম্বন করে এক প্রবীণ দম্পতির জীবন সংগ্রামের কথাচিত্র আলোচ্য ‘ফুলকুসমা’ উপন্যাসের উপজীব্য। আলোচ্য উপন্যাসে নলিনী বেরা যে আশ্চর্য শিল্প নৈপুণ্য ও সহমর্মিতার সাথে মানব ও মানবেতর প্রাণীর জীবনকে একাত্ম করে উপস্থাপিত করেছেন, সেটাই এই গবেষনা প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।
মূল শব্দ: নলিনী বেরা, উপন্যাস, ‘ফুলকুসমা’, প্রবীণ দম্পতি, জীবন সংগ্রাম, পালিত পশু, পশু বাৎসল্য।

মূল প্রবন্ধ:

সভ্যতা সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে মানুষের সাহায্যকারী হিসেবে পালিত পশু-পাখির বিশেষ ভূমিকা আমরা লক্ষ করি। মানব সংসারে পালিত পশু-পাখির ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তার প্রমাণ আমরা সুপ্রাচীন সাহিত্যগুলোতেও পেয়ে থাকি। হিন্দু ধর্মের আকর গ্রন্থ ‘ঋগ্বেদ’কে ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়। এর রচনাকাল আনুমানিক ১০০০ - ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। এতে পাই —

> “যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ উ লোকমগ্নে কৃণবঃ স্যোনম্।
> অশ্বিনং স পুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্তং রয়িং নশতে স্বস্তি।।”[১] (৫/৪/১১)

অর্থাৎ, যে শোভনকর্মার প্রতি, হে জাতবেদস্, হে অগ্নি, (তার) বাসস্থলকে তুমি বিস্তৃত ও সুখকর করে থাক, সে অশ্বসমন্বিত, পুত্রসমন্বিত, যোদ্ধাসমন্বিত এবং গাভীসমন্বিত ধন কল্যাণের জন্য লাভ করে।

আলোচ্য মন্ত্রটির সুত্রে মানবজীবনে গোসম্পদের ভূমিকা ও গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটি ছিল সর্বভারতীয় সুপ্রাচীন গ্রন্থ ‘ঋগ্বেদ’ থেকে একটি উদাহরণ। এখন বাংলা ভাষায় রচিত সর্বপ্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থ ‘চর্যাপদ’এ পালিত পশু সম্পর্কে লেখা দুই একটি পদের উল্লেখ করা যেতে পারে।

"দুহিল দুধু কি বেন্টে ষামাঅ।।
বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে।" (চর্যা : ৩৩) (টেন্টণপা)[২]

অর্থাৎ, দোয়ানো দুধ কি পুনরায় বৃন্তে ফিরে যায়। বলদ প্রসব করল আর গাভী হল বন্ধা। এখানে স্পষ্টতঃ পশুপালনের কথা বলা হয়নি, কিন্তু মানবজীবনে তার সংযোগের সুত্র স্পষ্টরুপে দ্যোদিত।

সুতরাং, উপরের নিদর্শনগুলো থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন কালে মানুষের জীবনে পালিত পশুপাখির যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। আজকের দিনেও পালিত পশু-পাখির গুরুত্ব যে কোন অংশে কম হয়নি তার প্রমাণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্যা কিংবা আধুনিক কালে রচিত বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে স্পষ্ট। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুভা'; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী'; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ'; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালাপাহাড়' প্রভৃতি অমর সৃষ্টিকর্মের পাশাপাশি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'গোঘ্ন'; হাসান আজিজুল হকের 'আমৃত্যু আজীবন'; নাজিব ওয়াদুদের 'কসাই' প্রভৃতি উল্লেখের দাবি রাখে। এই দৃষ্টান্তগুলো ছাড়াও, পালিত পশুর প্রসঙ্গে স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক নলিনী বেরার 'ঈশ্বর কবে আসবে' উপন্যাসটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। উপন্যাসটি ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর, ২০০৭ সালে 'ফুলকুসুমা' নাম নিয়ে পুনরায় প্রকাশিত হয়। নলিনী বেরার এই উপন্যাসে যেমন সুবর্ণরেখা নদীতীরবর্তী প্রান্তিক জনজীবন চিত্র রূপায়িত হয়েছে তেমনি এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী, গাছপালা, পশুপাখিও আশ্চর্য সহমর্মিতার সাথে স্থান পেয়েছে।

সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত 'ফুলকুসুমা' উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে ঈশ্বর বেহারা। আর ঈশ্বর বেহারাকে কেন্দ্র করে রয়েছে তার পরিবারের আরও দুটি সদস্য। প্রথমজন ঈশ্বরের স্ত্রী নিভাননী এবং দ্বিতীয়জন সংসারের তৃতীয় জীবিত প্রাণী একটি এঁড়ে বাছুর। কিন্তু আজ তাদের না খেতে পেয়ে মরার মত অবস্থা। এর কারণ ঈশ্বর বেহারার একমাত্র পুত্র নিবারণের অবহেলা। নিবারণ কলকাতা পুলিশে কর্মরত একজন কনস্টেবল। কিন্তু নিবারণ গত তিন মাস ধরে তার বৃদ্ধ পিতা মাতার জন্য কোনো টাকা পাঠাচ্ছে না। যার ফলস্বরূপ ঈশ্বর বেহারার ঘরে আজ অর্থাভাব এবং নিভাননীর সংসারে চাল বাড়ন্ত।

বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি একমাত্র পুত্র নিবারণের এই উদাসীনতা ঈশ্বরকে অন্তর থেকে কষ্ট দেয়। তাদের প্রতি নিবারণের বিমুখতাকে ঈশ্বর নিজের মতো করে বিশ্লেষণ করতে থাকে। অকৃতদার পুত্রের টাকা না পাঠানোর কোনো যথার্থ কারণ সে খুঁজে পায় না। একসময় তার ধারণা হয় পোস্টঅফিসের ডাকপিয়ন কিংবা পোস্ট-অফিসের কোনো কর্মচারীই হয়ত নিবারণের পাঠানো মানি অর্ডারের টাকাগুলো আত্মসাৎ করছে। কিন্তু ঈশ্বর বেহারার এই ধারণা যে কত ভিত্তিহীন তা সে অচিরেই বুঝে যায়। এই ঘটনার মূলে নিবারণই দায়ি, এ সত্য তার কাছে ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

প্রতিকূল পরিস্থিতি ও ক্ষুন্নিবৃত্তির চিন্তায় কাতর ঈশ্বরকে প্রবল হতাশা, অসহায়তা ও ক্ষোভ গ্রাস করতে থাকে। ঈশ্বর সত্য, স্বপ্ন আর বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য হারিয়ে ফেলতে থাকে। ঈশ্বরের এই হতাশা ও নৈরাশ্যকে লাঘব করতে এগিয়ে আসে তার দীর্ঘদিনের সুখ দুঃখের সঙ্গী স্ত্রী নিভাননী। নিভাননী ঈশ্বরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে— "নেবারণ যদি একান্ত নাই-ই আসে, তবে জানব আঁড়িয়াটাই আমার নেবারণ, উকেই গরভে দশ মাস ধরেছিলাম।"[৩] এখান থেকেই শুরু হলো এক গোবৎসকে কেন্দ্র করে প্রবীণ দম্পতি ঈশ্বর ও নিভাননীর এক অদ্ভুত দাম্পত্য-জীবন কাহিনী। আমরা এই নিবন্ধে সেই কাহিনীরই একটি বিশ্লেষণ দেখানোর চেষ্টা করেছি।

ঈশ্বর ও নিভাননী ধীরে ধীরে নতুন পরিস্থিতির সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে শুরু করে। এখন ঈশ্বর-নিভাননীর সংসারে হয়তো অভাব আছে, না খেতে পাওয়ার কষ্ট আছে। কিন্তু তাদের জীবনে শান্তি আছে, সন্তান তুল্য একটি বাছুর আছে, আর এই বাছুরকে ঘিরেই প্রবীণ দম্পতির বেঁচে থাকার আশা আছে।

কিন্তু ঈশ্বর-নিভাননীর সংসারে শান্তি স্থায়ী হয় না। সমস্যা দেখা দেয় অন্যত্র থেকে। ফুলকুসুমা গ্রামের তথাকথিত কিছু ক্ষমতাশালী অর্থবান ব্যক্তির নজরে পড়ে যায় ঈশ্বরের একমাত্র বাছুরটি। তাদের উদ্দেশ্য ঈশ্বর বেহারার আর্থিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে যথাসম্ভব কম দামে বাছুরটিকে কিনে নেওয়া। প্রথমে বড়ডাঙ্গা গ্রামের সম্পন্ন কৃষিগৃহস্থ দণ্ডপাটদের মেজোতরফ বাছুরটিকে কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দেয়। ঈশ্বর এই প্রস্তাবে অপ্রস্তুত হয়, বিব্রত বোধ করে। বিস্ময়ে তার মুখ থেকে একটা কথাই বেরিয়ে আসে "বেচব?"[৪] বিস্ময়ের ঘোর কাটার সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বর এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।

ঈশ্বর বংশপরম্পরায় জেনে এসেছে, ঈশ্বরের পূর্বপুরুষ বাইধর সামান্য গুড়মুড়ি খাওয়ানোর প্রতিদানে বিঘার পর বিঘা নদীধারের উর্বর জমি বড়ডাঙ্গার দণ্ডপাটদের নামে লিখে দিয়েছিল। ঈশ্বর বেহারার পূর্বপুরুষের দান করা সম্পদে দণ্ডপাটরা আজ সম্পদশালী। সেই দণ্ডপাটদেরই একজন ঈশ্বরের দুর্বল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার শেষ সম্বল সন্তানসম বাছুরটিকেও কেড়ে নিতে চায়। ভাগ্যের এই করুণ পরিহাস ঈশ্বর কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সে স্পষ্টতই জানিয়ে দেয়, "আঁড়িয়া বাছুরটাকে আমি বেচব নাই। নিবারণ যদি আর নাই-ই আসে, তবে জানব আঁড়িয়াটাই আমার নিবারণ, উকেই আমার স্ত্রী গর্ভে দশমাস ধারণ করেছিল। বুঝলে কী না দঁড়পাটের পো, উটাকে আমি বেচব নাই, নাই হে।"[৫] ঈশ্বরের এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে তার হার না মানা প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি সন্তানসম বাছুরটির প্রতি মমত্ববোধও প্রকাশিত হয়েছে।

এরপর, বাছুর কেনার দ্বিতীয় প্রস্তাবটি আসে হেডমাস্টার অতীশরঞ্জনের থেকে। ফুলকুসুমা গ্রামের 'ফুলকুসুমা জুনিয়ার হাই স্কুল'-এর হেডমাস্টার অতীশরঞ্জনও সুযোগ বুঝে বাছুরটা কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দেয়। ঈশ্বর এক্ষেত্রেও সরাসরি প্রস্তাব

নাকচ করে দেয়। ঈশ্বর মনে মনে তখন একটা কথাই বার বার ভাবতে থাকে। যে 'ফুলকুসুমা জুনিয়ার হাই স্কুল'-এ দাঁড়িয়ে অতীশরঞ্জন তাকে এই প্রস্তাব দিচ্ছে, সেই স্কুল প্রতিষ্ঠার পেছনে ঈশ্বরের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বলতে গেলে স্কুল প্রতিষ্ঠার মূল উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হল ঈশ্বর বেহারা। অনুদানকারীদের নামের তালিকায় ঈশ্বর বেহারার নাম সুস্পষ্ট। এখনও স্কুলের ফাউন্ডার মেম্বার হিসাবে স্কুলের সবাই তাকে সম্মান করে। আজ সেই স্কুলেরই হেডমাস্টার অতীশরঞ্জন ঈশ্বরের দুর্দিনের সুযোগ নিয়ে তার শেষ সম্বল সন্তানসম এঁড়ে বাছুরটাকেই কিনে নিতে চায়। নবপ্রাপ্ত ক্ষমতার এই আস্ফালন ঈশ্বর সহ্য করতে পারে না। তাই ঈশ্বরের কন্ঠ থেকে ভেসে আসে তার প্রতিবাদের স্বর — "নিবারণ যদি আর নাই-ই আসে, তবে জানব এই দামড়াটাই আমার নিবারণ। উকেই আমার স্ত্রী গর্ভে দশমাস ধারণ করেছিল। ইকে আমি নাই বেচব অতীশ, নাই হে মাস্টার।"[৬] স্পষ্টতই বোঝা যায়, বাছুরটি যেন ঈশ্বরের প্রতিবাদের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এটা যেন এক গোবৎসকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাশালীদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অসম লড়াইয়ের ঘোষণা।

এরপরের কাহিনী আর সমান্তরাল থাকে না। বাছুর কেনার তৃতীয় প্রস্তাবটি আসে এক বিচিত্র ঘটনাক্রমের মধ্যে দিয়ে। নদীর ধারে গোচারণের সময় এঁড়ে বাছুরটি হঠাৎই নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ঈশ্বর তন্ন তন্ন করে তাকে খুঁজতে থাকে। আর মুখ দিয়ে এক অদ্ভুত আওয়াজ করে ডাকতে থাকে। যার পরিষ্কার অর্থ দাঁড়ায় "ওরে নিবারণ রে"[৭]। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পায় না। শূন্য হাতে ঘরে ফিরলে স্ত্রী নিভাননী কান্নায় ভেঙে পড়ে "কোথায় রেখে এলে গো নিবারণকে?"[৮] নিভাননীর এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে যায় নিবারণ এখানে আর অন্য কেউ নয় এই বাছুরই তাদের নিবারণ, তাদের একমাত্র সন্তান। বাছুর হারানোর এই ঘটনা বুঝিয়ে দেয় এই গোবৎসের প্রতি এই প্রবীণ দম্পতির মমত্ব কত গভীর ও অন্তরস্পর্শী। বাছুরটা আর বাছুর থাকে না, সে হয়ে ওঠে নিভাননীর গর্ভের সন্তান।

অবশেষে বাছুরটির সন্ধান পাওয়া যায় চারুবাবুর খোঁয়াড়ে। দণ্ডপাটদের ধানক্ষেতে মুখ দিয়ে বাছুরটি অপরাধ করেছে। তাই তাকে খোঁয়াড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন বাছুরটিকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজন দিন প্রতি আড়াই টাকা জরিমানা ও আট আনা খোরাকি। আমরা এখানে এক ধরনের ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাই। দরিদ্র বৃদ্ধ-দম্পতিকে বিপাকে ফেলে তাদের শেষ সম্বল বাছুরটিকে হাতিয়ে নেবার ষড়যন্ত্র।

এদিকে নিভাননীর সংসারে তখন নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মতো অবস্থা। সামান্য যেটুকু সঞ্চিত অর্থ ছিল তা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। শেষের দিনগুলো পাড়া-প্রতিবেশীদের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে চলছিল। নিভাননী এ সমস্ত জানা সত্ত্বেও তন্ন তন্ন করে ঘরে টাকা খুঁজতে থাকে, আর স্বামীকে প্রবোধ দিতে থাকে। শেষে ব্যর্থ হয়ে টাকা ধার করার দুর্দম সংকল্প নিয়ে ঈশ্বরের সামনে দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। দারিদ্র্যের এক চরম রূপ আমরা দেখতে পাই নিভাননীর সংসারে।

ঈশ্বর এতদিন দারিদ্র্যের এই চরম রূপ দেখেও উদাসীন ছিল। কিন্তু আজকের এই ঘটনা তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তাদের দুরাবস্থাকে। সংসারের এই করুণ অবস্থা ঈশ্বর কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। দিগ্-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঈশ্বর উপস্থিত হয় চারুবাবুর খোঁয়াড়ে। খোঁয়াড়ে বন্দি বাছুরটির গায়ে কালশিটে দাগ দেখে ঈশ্বরের রাগের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। ঈশ্বর মনে মনে ভাবতে থাকে, "তাকে প্রহার করাই উচিত। তার জায়গা পিটুনি খেয়েছে তার ছ-দাতের দামড়াটা!"[৯] বাছুরের গায়ে লাগা প্রহারগুলো যেন সে অনুভব করতে থাকে। বাছুরের কষ্টকে সে অনুভব করতে থাকে। কোনো প্রকার জরিমানা ছাড়াই বাছুরটিকে ছেড়ে দেওয়ার দাবি করে বসে। ঈশ্বর খোঁয়াড়ের বাঁশের আগড় ধরে গলা তুলে বলতে থাকে, "অবলা জীবকে পিটুনি দেওয়ার কথা তো লেখা নেই চারুবাবু, গরু ছেড়ে দাও।"[১০] এরপরের ঘটনাক্রম হয়তো সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতি ও হাতাহাতির পর্যায়ে যেতে পারত। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে নিভাননী ধার করা টাকা নিয়ে উপস্থিত হলে উত্তপ্ত আবহাওয়া সাময়িক ভাবে হয়ত শান্ত হয়। কিন্তু এর ফল হয় সুদূরপ্রসারী। ডাকা হয় সালিশি। সেখানে বিচারক হিসেবে উপস্থিত হয় দণ্ডপাটদেরই একজন। ভোলানাথ দণ্ডপাট এখন ফুলকুসুমা গ্রামের অঞ্চল প্রধান। অতঃপর সালিশির প্রহসন শেষ হলে আবারো আসে সেই একই প্রস্তাব, "বেচবে বলতো কিনি।"[১১] এবার ঈশ্বর আর কোনো উত্তর দেয় না। নিঃশব্দে ঘরে ফিরে আসে।

আসলে, বিত্তবান ও ক্ষমতাশালীদের বিরুদ্ধে দরিদ্রের লড়াই সর্বদাই অসম। বিশেষ করে দরিদ্র ব্যক্তিটির ভাগ্য ও পরিস্থিতি যদি প্রতিকূল হয়। সেক্ষেত্রে ফলাফল সর্বদাই একপাক্ষিক হয়ে থাকে। যেমন হয়েছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' গল্পে গফুরের ক্ষেত্রে। দরিদ্র কৃষক গফুর মিঞা গ্রামের দোর্দণ্ড প্রতাপ ক্ষমতাশালী হিন্দু জমিদার ও সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কাছে পরাজিত হয়ে সন্তানসম ষাঁড় মহেশকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'গোঘ্ন' গল্পে হারাইও প্রতিকূল পরিস্থিতি ও কুচক্রী কসাই দিলজানের কাছে হার মেনে তার সন্তান অধিক গরু ধনাকে কসাইয়ের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল। নাজিব ওয়াদুদের 'কসাই' গল্পের হারেজুদ্দিনও তার মৃত সন্তান শাজাহানের প্রিয় গরুটিকে সমাজের কসাইদের হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হলো, শরৎচন্দ্রের গফুর যা পারেনি, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের হারাই যা পারেনি, নাজিম ওয়াদুদের হারেজুদ্দিনও যা পারেনি, তা ফুলকুসুমা গ্রামের বৃদ্ধ ঈশ্বর বেহারা কেমন করে পারবে?

সালিশি সভার সমস্ত ঘটনাক্রম ঈশ্বরের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। ক্ষমতাশালীদের হেনস্থা ও দারিদ্র্যের দুর্বিষহতা ঈশ্বরকে অন্তর থেকে ভেঙে ফেলে। ঈশ্বর যেন হার মেনে নেয়, তার পরাজয়কে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু হার মানতে রাজি হয় না ঈশ্বরের জীবনসংগ্রামের সহযোদ্ধা স্ত্রী নিভাননী। দারিদ্র্যের ভ্রুকুটি, ক্ষমতাশালীদের চোখ রাঙানির থেকেও মাতৃত্ব-মমত্ব-আত্মমর্যাদা নিভাননীর কাছে

অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই সে আগের মতোই মলিন আঁচল দিয়ে সযত্নে বাছুরটির চোখ মুছিয়ে দেয়। ঈশ্বরকে ডেকে বলতে থাকে, “দ্যাখো, চোখদুটি।” “নিবারণের মতোই টানা টানা না?”[১২] কিন্তু এসব কথা ঈশ্বরকে আর স্পর্শ করে না। এমনকি, করম উৎসবের কথকের আসনও তাকে আর আনন্দ দিতে পারে না। তার মনে এখন গভীর দ্বন্দ্ব ও হতাশা। ঈশ্বরের মনের এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব বেশিদিন মনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। ক্রমশ প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকে। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে ঈশ্বর-নিভাননীর দাম্পত্যে। ঈশ্বর-নিভাননীর দাম্পত্যে শুরু হয় মতানৈক্য, বচসা ও কলহ। নলিনী বেরা একে বলেছেন ‘গোবৎস-কলহ’[১৩।] কারণ বাছুরটি সম্পর্কে দুজনের মতামত এখন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী।

ঈশ্বর এখন কোনোমতে তার প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে চায়। তার জন্য প্রয়োজন এই দারিদ্র্যতা থেকে মুক্তি। আর এই মুক্তির একটাই উপায়। এঁড়ে বাছুরটাকে বেচে দিয়ে টাকা উপার্জন করা। কিন্তু নিভাননী এ বিষয়ে ঈশ্বরের সাথে সহমত হতে পারে না। সংসারে দারিদ্র্য যতই নখ-দাঁত দেখাক না কেন, নিভাননী কোনো মূল্যেই তার আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে দণ্ডপাটদের কাছে সন্তান অধিক বাছুরটিকে বিক্রি করবে না। তাই সে বলে, “গুড়-মুড়ি খাওয়ায় তোমাদের লাটকে লাট জমি হাত করে নেয়নি ওই দঁড়পাটেরা?” “তা হলেও মানইজ্জত ধূলায় লুটায় ওকেই বেচবে?”[১৪] কিন্তু ঈশ্বর তখন মরিয়া, “উকে আমি বেচবই বেচব”[১৫]। তাই নিভাননীকেও এক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

এখানেই শেষ হয় ঈশ্বর-নিভাননীর শেষ দাম্পত্য কলহ, তাদের শেষ দাম্পত্য বার্তালাপ। শেষ হয় ঈশ্বর নিভাননীর সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনকাহিনী। সুদীর্ঘ জীবন পথের সহযাত্রী ঈশ্বর ও নিভাননীর পথ এখন সম্পূর্ণ ভিন্নগামী। নিভাননীর যাত্রাপথ এখন বাপের বাড়ি বেলিয়াবেড়ার দিকে, পথে সম্বল তার সন্তানসম বাছুরটি। আর ঈশ্বরের সম্বল হয় তার অসীম নিঃস্বতা ও শূন্যতা। শুরু হয় বাস্তবকে অতিক্রম করে এক অধিবাস্তব জগতের দিকে ঈশ্বর বেহারার অনন্ত অভিযাত্রা।

নলিনী বেরা মানব ও মানবেতর প্রাণীর সহাবস্থানকে এক আশ্চর্য শিল্পরূপ দান করেছেন তাঁর ‘ফুলকুসুমা’ উপন্যাসে। উপন্যাসে চরিত্র নির্মাণে ও মানব জীবনচিত্র রূপায়ণে তিনি আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রাম- বাংলার একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষকে কেন্দ্র করে তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, দারিদ্র্য-অসহায়তাকে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। উপন্যাসের প্রবীণ দম্পতি ঈশ্বর-নিভাননীর এই করুণ পরিণতি আমাদেরকে কষ্ট দেয়, ভাবতে বাধ্য করে ঠিকই। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ই নলিনী বেরার ‘ফুলকুসমা’ উপন্যাসটিকে করে তুলেছে হৃদয়স্পর্শী ও মনোগ্রাহী।

তথ্যসূত্র:

১. ঋগ্বেদ ৫/৪/১১

২. ড. নির্মল দাশ : 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', দে'জ পাব্লিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, দশম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা - ২০০

৩. নলিনী বেরা : 'ফুলকুসুমা', করুণা প্রিন্টার্স, ১৩৮, বিধান সরনি, কলকাতা – ৭০০০০৪, প্রথম করুণা সংস্করন বইমেলা ২০০৭, পৃষ্ঠা – ২৮

৪. পূর্বোক্ত, 'ফুলকুসুমা', পৃ – ৩৩

৫. পূর্বোক্ত, 'ফুলকুসুমা', পৃ – ৩৪

৬. পূর্বোক্ত, 'ফুলকুসুমা', পৃ – ৪১

৭. পূর্বোক্ত, 'ফুলকুসুমা', পৃ – ৪৯

৮. পূর্বোক্ত, 'ফুলকুসুমা', পৃ – ৫০

৯. পূর্বোক্ত, 'ফুলকুসুমা', পৃ – ৫৩

১০. পূর্বোক্ত, 'ফুলকুসুমা', পৃ – ৫৪

১১. পূর্বোক্ত, 'ফুলকুসুমা', পৃ – ৫৮

১২. পূর্বোক্ত, 'ফুলকুসুমা', পৃ – ৬৩

১৩. পূর্বোক্ত, 'ফুলকুসুমা', পৃ – ৭৮

১৪. পূর্বোক্ত, 'ফুলকুসুমা', পৃ – ৮১

১৫. পূর্বোক্ত, 'ফুলকুসুমা', পৃ – ৮১

বিবেকানন্দের Practical বেদান্তের একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

আসমিন সেখ
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ,
হাজী এ. কে. খান কলেজ, মুর্শিদাবাদ

সারাংশ: বিবেকানন্দের অদ্বৈত দর্শন শ্রী দ্বারা প্রভাবিত ছিল। রাম কৃষ্ণ, এইভাবে তিনি তত্ত্ব গ্রহণ করেন, "একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, বাকি সব মিথ্যা। আমি ব্রাহ্মণ।" বাস্তবতা, বিবেকানন্দের মতে, একমাত্র পরম ব্রহ্ম। তিনি বাস্তবতার অদ্বৈত প্রকৃতির উপর জোর দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ, একজন নব্য-বেদান্তবাদী, ব্রহ্মকে স্থান, সময় এবং সময়ের বাইরে বিদ্যমান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তার মহান ইতিবাচক মনোবিজ্ঞানের ফলস্বরূপ। মানুষ এবং স্বতন্ত্র মানবিক শক্তিকে দেবত্বের একটি রূপ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া। তার কৃতিত্ব তার ধারণাগুলি থেকে অদ্বৈত বেদান্তের সামাজিক দর্শন তৈরি করার মধ্যে রয়েছে, যা ভারতে সামাজিক সংস্কারের পথ প্রশস্ত করেছে। দৈনন্দিন জীবন। তিনি মানবতা ও আধ্যাত্মিকতা উভয়কেই এগিয়ে নিতে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন ব্যবহার করেছিলেন। এই সবই ছিল তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বেদান্ত দর্শনের প্রতিফলন।
মূলশব্দ: বেদান্ত, অদ্বৈত বেদান্ত, নব্য-বেদান্তবাদী, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ হলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে যে কয়েকজন মহান ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। একজন বিশিষ্টপরাধীন ভারতবাসীকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সামাজিক সংস্কার-ধর্মবোধ বা আধ্যাত্মিকতার দীপ্তিময় গৌরবোজ্জ্বল জীবনের পথ প্রদর্শনে যে কয়জন মনীষী আজও ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন- তাঁদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান এক বাক্যে স্বীকার্য। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একজন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, একজন বেদান্তপন্থী মুক্তিসাধক। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, সংসারকে একদিকে ত্যাগ করে অন্যদিকে তিনি গ্রহণ করেছেন। সংসারকে মায়া বা অলীক বলে অবহেলা নয় বরং তার মলিনতা, কলুষ দূর করা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের কর্মবহুল স্বল্পস্থায়ী জীবনের প্রধান অভীপ্সা। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত শিক্ষিত বাঙালির কাছে শিক্ষা যখন কেরানী সৃষ্টির নামান্তর তখন স্বামীজি শিক্ষা চিন্তায় এক নতুন আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। খ্রিস্টান মিশনারী ও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী যখন একযোগে ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধর্ম তথা আধ্যাত্মিকতা নিয়ে অপপ্রচারে লিপ্ত, ভারতবর্ষে শিক্ষা প্রসারের জন্য যখন তারা 'নিম্নগামী পরিস্রাবণ নীতি (Downward filtration theory)', উডের ডেসপ্যাচ, হান্টার কমিশন প্রভৃতি নিয়ে 'পরীক্ষণে' ব্যস্ত এমনই এক সময়ে স্বামী

বিবেকানন্দ অধ্যাত্ম শিক্ষাকে হাতিয়ার করে বাংলা তথা ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আমূল পরিবর্তন সাধনের মূলমন্ত্র শুনিয়েছেন। শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক বিকাশ সাধনের জন্য তিনি শিক্ষা সংস্কারের কথা বলেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি কি হবে, শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠক্রম ও শিক্ষার বাহন কি হওয়া উচিত এবং স্ত্রীশিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কেও তিনি বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের পিতা নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৮৪ সালে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তিনি অর্থকষ্টে ভোগেন। এ সময় তিনি অনুবাদ কার্যের দ্বারা আয়ের চেষ্টা করেন। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০ – ১৯০৩) এর 'Education: Intellectual, Moral and Physical' পুস্তকটি 'শিক্ষা' নামে বাংলায় অনুবাদ করেন। এছাড়াও তিনি ১৮৮৬ সালে কিছুদিন শিক্ষকতাকার্যে ব্রতী হন। তিনি ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের চাঁপাতলা শাখায় প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আমরা অনুমান করতে পারি যে, সে সময় শিক্ষার দর্শন ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর বিরাট মনীষা আলোড়িত হয়। ছাত্রজীবনে তিনি কিছুকালের জন্য হার্বার্ট স্পেন্সারের মতো অজ্ঞেয়বাদে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। স্পেন্সারের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ ছিল। সেইসব পত্রে স্পেন্সারের কোনো কোনো মতের সমালোচনাও তিনি করেছিলেন। এক কথায়, স্বামী বিবেকানন্দ কিছু কালের জন্য হার্বার্ট স্পেন্সারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে এসে তিনি পাশ্চাত্যদর্শন ও হার্বার্ট স্পেন্সার থেকে বহুদূরে সরে এসেছিলেন। পরিণতিতে শিক্ষাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বেদান্ত দর্শনের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর, যে দর্শন শেখাচ্ছে— মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশই শিক্ষা। এই পূর্ণতা লাভ করতে হলে বহির্জগৎ হতে কিছু বিষয় শুধুমাত্র আহরণ করলেই চলবে না, যে জ্ঞান মনের সংস্পর্শে আগে থেকেই রয়েছে, তার উপরের আবরণগুলোকে সরিয়ে দিতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন ভাবের আন্তরীকরণ, সদগুরুর সান্নিধ্য, ব্রহ্মচর্য ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন মুখ্যতঃ মানবকেন্দ্রিক। উপনিষদ থেকেই তিনি এ শিক্ষা নিয়েছিলেন। উপনিষদের লক্ষ্য হলো মানুষকে নানা স্তরে বিশ্লেষণ করে, প্রত্যেক স্তরের পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে অবশেষে মানুষের নিগূঢ়তম সত্যের পরিচয় প্রদান করা। স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে উপনিষদের দৃষ্টির মাধ্যমেই দেখতেন। মানুষের দেহ-মন আশা-আকাঙ্ক্ষা কোনটাই অবহেলা করার নয়। কিন্তু তার অন্তরতম সত্য সর্বাপেক্ষা আদরণীয়। মানুষ যদি এই সত্যকে ভুলে তার বাহিরের সত্যগুলোকেই বড় করে তুলতে চায় তা হলে সে শ্রেয়ের পথ থেকে বিচ্যুত। সে নিজের ব্যক্তিগত কল্যাণকে সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ করতে তো পারবেই না উপরন্তু সমাজকল্যাণকেও সে পদে পদে ব্যাহত করবে। কেননা, মানুষের দৈবসত্তাকে বাদ দিলে মানুষ স্বার্থপর হতে বাধ্য। হিংসা, ঘৃণা, লোভ, দম্ভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন মানুষের দেবত্ব-উপলব্ধি ব্যাপকভাবে অভ্যাস করার সময় এসেছে। মানুষের শ্রেষ্ঠ সত্য

তার জীবনের সর্বস্তরে প্রয়োগ করা যায় এবং করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শনে এই উল্লেখিত প্রয়োগের নাম 'কর্ম-পরিণত বেদান্ত' (Practical Vedanta)। এছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শনে 'অভয়' একটি প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর মতে, সাহস ও শক্তিমত্তা সর্বস্তরেই মানুষকে অগ্রগতিতে সাহায্য করে। সেইজন্য তিনি ব্যক্তিগত, পরিবারগত অথবা সমাজগত, শিক্ষাগত কিংবা ধর্মগত সকল ক্ষেত্রেই উদ্যম, সাহস এবং নির্ভিকতার অনুশীলনের কথা বলতেন। তাঁর জীবনদর্শনের অন্যতম প্রতিজ্ঞা—সকল মানুষের অন্তরশায়ী আত্মা যিনি সর্বশক্তির আকর, চিরমুক্ত, চিরস্বচ্ছ, তাঁর জাগরণই মানুষের সকল কল্যাণের নিদান। তিনি বলেছেন, "উপায়" শিক্ষার প্রচার। প্রথমত আত্মবিদ্যা—ঐ কথা বললেই যে জটাজূট, দণ্ড, কমণ্ডলু ও গিরিগুহা মনে আসে, আমার বক্তব্য তা নয়, তবে কি? যে জ্ঞানে ভববন্দন হতে মুক্তি পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাতে কি সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অবশ্যই হয়। মুক্তি, বৈরাগ্য, ত্যাগ এসকল তো মহাশ্রেষ্ঠ আদর্শ; কিন্তু 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'। "এই আত্মবিদ্যার সামান্য অনুষ্ঠানেও মানুষ মহাভয়ের হাত হইতে বাঁচিয়া যায়। মানুষের অন্তরে যে শক্তি রহিয়াছে, তাহা উদ্বুদ্ধ হইলে মানুষ অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া সব কিছুই অনায়াসে করিতে পারি।" "এই শক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে দ্বারে দ্বারে যাইয়া। দ্বিতীয়ত সেই সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা দিতে হইবে।"

বেদান্ত সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের "নতুন উপলব্ধি" এবং "বাস্তব জীবনে" তার প্রয়োগের বিষয়টিই সাধারন ভাবে "নব্য বেদান্ত" নামে পরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দ যে Practical বেদান্তের কথা বললেন, সেই তত্ত্বে কর্মের স্থান আছে। জীবনে কর্তব্যকে অবহেলা করলে চলবে না। স্বামীজী বললেন যে "ব্রহ্মজ্ঞানী মানুষকেও নিস্পৃহ হয়ে সামাজিক কর্তব্য করতে হবে" পদ্মের পাতায় জল থাকলেও পদ্মপত্রে যেমন তার কোন আভাস থাকে না অর্থাৎ জল যেমন: পদ্মপত্রকে সিক্ত করে তুলতে পারে না, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানী মানুষ ও প্রকৃত সন্ন্যাসী, সংসারের সকল কর্মে লিপ্ত হয়েও সেই কর্মফলের দ্বারা প্রভাবিত বা অভিভূত হয়ে পড়ে না। জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করার আদর্শ স্বামীজী আমাদের দেখিয়েছেন। সিংহ বিক্রমে বিপুল কর্মময় জীবন যাপন করার আদর্শ হল স্বামীজীর কর্মের আদর্শ। একেই আমরা স্বামীজীর কর্মযোগ বলতে পারি। সমাজের চোখে অদ্বৈতবাদের অর্থ শুধুমাত্র শুভজ্ঞানচর্চা নয়। তিনি বললেন, সংসারে বীরের মত আমাদের নিজ নিজ কর্তব্য, কর্ম করে যেতে হবে। তবে সেই কর্তব্য কর্মের মাধ্যমে কোন ফলাকাঙ্ক্ষা থাকবে না। এই তত্ত্বই হল শঙ্করের বেদান্তে সেই সন্ন্যাসের আদর্শ। গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শে, অভীলিত বস্ত্রলাভ করার জন্য মরণপণ সংগ্রামই হল স্বামী বিবেকানন্দের নীতি দর্শণের মৌল প্রতায়। স্বামীজী যে সব মঞ্জু মানুষকে দিলেন সেই সেবার মঙ্গল তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর গুরুঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে। 'সর্বজীবে পয়া' – এই তত্ত্বটি ঠাকুর রামকৃষ্ণের মনঃপুত হয়নি। তিনি বললেন, জীবিত

শিশু, অতএব শিবকে দয়া করা অসম্ভব, প্রকৃত নৈতিক তত্ত্ব হল সর্বজীবে সেবা। এই নরনারায়ণের সেবার মধ্য দিয়েই স্বামীজী ভগবানকে লাভ করার পথ দেখিয়েছিলেন। নৈতিক সাম্যবাদ হিন্দু দর্শনের মূল উপজীব্য। সেই তত্ত্বটি আমরা স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে পাই। ব্রাহ্মণেরা নিজেদের অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে অন্যান্য বর্ণের মানুষের কাছে পূজা এবং সম্মান দাবী করেন।

স্বামীজী বললেন যে, এর চেয়ে মিথ্যা এবং অনাচার আর কিছুই হতে পারে না। স্বামীজীর কথা উদ্ধৃত করে দিই: আত্মার নিরিখে একে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর এই ধরণের মূল্যায়ণ একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। যেখানে জীবসত্তা সেখানেই তার অন্তরে নিত্যকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে থাকে অন্তরের সেই বাণী। সেই বাণীটি আসে উচ্চতম পরম সত্তার কাছ থেকে। বিবেকানন্দের মতে জীবন শুদ্ধ কঠোর নয়, জীবন প্রেমের আধার, জগৎ ব্রহ্মময়। মানুষের সেবায় সর্বশ্রেষ্ঠ আধার হল জননী জন্মভূমি, তাইতো স্বামীজী চাইলেন এই জন্মভূমির বুক থেকে সর্ববিধ অনগ্রসরতাকে দুর করতে। তাঁর দেশ প্রেমের আদর্শ, দেশ থেকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের মধ্যে, শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের মধ্যে বিধৃত হয়ে রইল। তিনি তাঁর ধ্যানের জাগৎকে কর্মের জগতের সঙ্গে যুক্ত করে দেশকে বড় করতে চেয়েছিলেন। তিনি মিলের হিতবাদকে (Utilitarianism) গ্রহণ করেননি। উপযোগবাদকে অস্বীকার করেছেন। তার মতে মানুষে মানুষে শত্রুতার অর্থ হয় না, কেননা সকল মানুষই ব্রহ্মের প্রকাশ। অতএব এই বিশ্বাস থেকে আমাদের নৈতিক আচরণে সম্পূর্ণতা সহজেই উদ্ভূত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমরা জয়সেনের “Philosophy of the Upanishads” গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিই : বেদান্ত পাঠের সময় আমরা উচ্চতম নৈতিক আদর্শের সন্ধান পাই। বাইবেলে প্রতিবেশীকে আপনার মত করে ভালবাসায় যে অনুজ্ঞা জারী করা হয়েছে, সে অনুজ্ঞাটি যে নৈতিক আদর্শ হিসেবে অত্যুচ্চ এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এই অনুজ্ঞাটি আমার পক্ষে কেন পালনীয় তার যুক্তিযুক্ত উত্তর বাইবেলে নেই। আমি ‘ত’ কেবল মাত্র আমার নিজে সুখ-দুঃখটুকু অনুভব করতে পারি আমি ‘ত’ আমার প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখ অনুভব করতে পারি না। তবে কেন বাইবেলের এই নির্দেশঃ

বেদে ‘তত্ত্বমসি’ মন্ত্রে এই প্রশ্নের জবাব মিলেছে। এই মন্ত্রটিতে পরাতত্ত্ব ও নৈতিক আদর্শের সমন্বয় ঘটেছে।

> The highest and the purest morality is the immediate consequence of the Vedanta. The Gospeh fits quite. Correctly as the highest law of morality. Love your neighbour as yourself. But why should I do so, since by the order of the nature, I fell pain and pleasure only in myself and not in my neighbour? The answer in not in the Bible-But is in the

> Vedas, in the great formula, That thou art Tvat Twamasi' which gives in three words, Metaphysics and morals together.

প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন, আধুনিক ভারতে বেদান্ত নিয়ে প্রথম চর্চার সূত্রপাত করেন রাজা রামমোহন রায়। বেদান্তের ভাবনা ও দর্শনের আলোকে তিনি ভারতের পুনঃজাগরনের স্বপ্ন দেখেন। আত্মীয়সভা, ব্রাহ্মসভা, বেদান্ত কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি বেদান্ত ভাবনাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা চালান। রামমোহনের পরে স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি, যিনি অত্যন্ত সফল ভাবে বেদান্ত ভাবনা ও দর্শনের আলোকে নবভারতের নির্মান ও জাগরন ঘটাতে পেরেছিলেন। বেদান্ত চর্চা এবং তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান,দুটি ক্ষেত্রেই স্বামী বিবেকানন্দ রামমোহনের থেকে শুধু যে এগিয়ে ছিলেন, তাই নয়, মৌলিকত্বের সাক্ষরও রেখে যেতে পেরেছিলেন। বেদান্ত চর্চায় রামমোহন কোন নতুন ব্যাখ্যা বা ভাষ্য দেননি। কিন্তু বিবেকানন্দ তাঁর "নব্য বেদান্তের" মধ্য দিয়ে বেদান্ত দর্শনের এক নতুন ব্যাখ্যা ও ভাষ্য তুলে ধরেন। রামমোহন রায় বেদান্ত ভাবনার জাগরনের জন্য যে প্রতিষ্ঠান গুলির জন্ম দিয়েছিলেন, তা যুগোত্তীর্ণও হতে পারে নি। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত ভাবনার জাগরন ও প্রসারের জন্য যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেন, তা যুগ, কাল, এবং স্থান তিনটিকেই অতিক্রম করে আজ শুধু যে টিকে আছে তাই নয়, সারা বিশ্বে মহীরুহের মতো বিস্তার লাভ করেছে।

তাই বলা হয়ে থাকে, সাংগঠনিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং তাত্ত্বিক এই তিনটি দিক থেকেই বিবেকানন্দ উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজগরনের অন্যান্য নায়ক দের থেকে অনেক বেশি সফল এবং সার্থক ছিলেন। বেদান্ত চর্চার ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দই –

- প্রথম বিশ্বে ভারতের বেদান্ত দর্শন প্রচার করেন,
- অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে সর্বসাধারনের উপযোগী করে বেদান্ত দর্শকে ব্যাখ্যা করেন, এবং
- বেদান্তকে আত্মমুক্তি ও পুঁথিগত স্তরে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেন।

এখন বিবেকানন্দের নব্য বেদান্তের মূল ভাবনা ও বৈশিষ্ট্য গুলিকে বুঝতে গেলে সবার প্রথমে "বেদান্ত" সম্পর্কে আমাদের ধারনা থাকা প্রয়োজন। আলোচনার ক্ষেত্রে তাই আমরা প্রথমেই বেদান্ত সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো, তারপর আমরা নব্য বেদান্তের পর্যালোচনাতে আসব। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ছিলো বেদ। এই বেদ চারটি ভাগে বিভক্ত ছিলো - ঋকবেদ, সামবেদ, যজুবেদ, এবং অর্থববেদ।প্রত্যেকটি বেদের আবার চারটি ভাগ ছিলো। যথা - সংহিতা, ব্রাহ্মন, আরন্যক এবং উপনিষদ। উপনিষদে বেদের দর্শনভাবনা এবং মূল তত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছিলো। উপনিষদ বেদের একেবারে অন্তে বা শেষে অবস্থান করে বলে উপনিষদকে "বেদান্ত" বলা হয়। বেদান্ত বা

উপনিষদেই বর্তমান হিন্দু ধর্মের মূল দর্শন সংকলিত হয়েছিলো। বেদান্তের মূল ভাবনা ও দর্শনটিতে বলা হয়েছিলো, এই জগতে ঈশ্বর পরম ব্রহ্ম রূপে বিরাজ করছেন। প্রতিটি প্রানীতে এবং প্রতিটি বস্তুতেই তার অবস্থান। জীবের ভিতরে তিনি "আত্মা" রূপে বিরাজ করছেন। ব্রহ্মকে চোখে দেখা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, কিন্তু তিনিই সকল শক্তির আধার। তিনি সাকার ও নিরাকার রূপে অবস্থান করেন।

এখন প্রশ্ন হলো, বেদান্তে ব্রহ্ম কে ঈশ্বর বলা হয়েছে, আবার এটিও বলা হয়েছে, সেই ব্রহ্মই জগতে প্রতিটি প্রানীর মধ্যে বিরাজ করছেন। তাহলে ব্রহ্ম এবং জগৎ এক, নাকি আলাদা? - এই জটিল এবং কঠিন প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে গিয়ে বেদান্ত শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে হিন্দু ধর্মে তিনটি মতবাদের জন্ম হয়েছিলো। যথা - (১.) দ্বৈতবাদ, (২.) দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং (৩.) অদ্বৈতবাদ। দ্বৈতবাদের প্রবক্তা ছিলেন মাধবাচার্য, দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রবক্তা ছিলেন শ্রীরামানুজ, এবং অদ্বৈতবাদের প্রবক্তা ছিলেন জগতগুরু শংকরাচার্য। এখন এই ৩ টি মতবাদে জগৎ ও ব্রহ্ম সম্পর্কে কি বলা হয়েছিলো, দেখে নেওয়া যাক। দ্বৈতবাদে বলা হয়েছিলো, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং জগৎ এক নয়, আলাদা। দ্বৈত কথাটির অর্থই হলো, দুই অর্থাৎ এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর এবং জগৎ আলাদা বা পৃথক। ঈশ্বর আনন্দ স্বরূপ এবং একমাত্র ভক্তির মধ্য দিয়েই তার দর্শন পাওয়া যায়। দ্বৈতাদ্বৈতবাদে সম্পূর্ন আলাদা কথা বলা হয়। এখানে বলা হয়েছিলো, জগৎ ব্রহ্ম থেকে আলাদা বা পৃথক নয়। ব্রহ্মই জগতে পরিনত হয়েছে। কিন্তু জগৎ মানেই ব্রহ্ম নয়। মুন্ডক উপনিষদে বিষয়টা বোঝাবার জন্য একটা ভালো উদাহরন দেওয়া হয়। সেখানে বলা হয়, মাকড়সা তার দেহ থেকে সুতা নির্গত করে জাল তৈরি করে। ঐ জাল মাকড়সার দেহ থেকে আলাদা নয়। ঐ জাল মাকড়সার দেহেরই একটি রূপান্তরিত অংশ। কিন্তু তাই বলে জালকে মাকড়সা বলা যাবে না। ঠিক তেমনিই জীব জগৎ মানেই ব্রহ্ম নয়, তারা ব্রহ্মের পরিবর্তিত রূপ। অদ্বৈত কথাটির অর্থ হল দুই নয়, এক। অদ্বৈতবাদের মতে, ব্রহ্ম এবং জগৎ আলাদা কোন সত্ত্বা নয়, একই। ব্রহ্মই সত্য। শংকরাচার্য বলেছিলেন, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" অর্থাৎ জগতের পৃথক অস্তিত্ব নেই। জগৎ বলে যেটি আমরা দেখে থাকি ওটি মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

জগৎ সদা পরিবর্তনশীল। তাই এক একজন ব্যক্তি এক একরকম ভাবে জগৎ এবং জগতের বস্তু গুলিকে দেখে থাকেন। সকলের কাছে জগৎ একই রকম ভাবে ধরা দেয় না। তাই জগৎ মায়া এবং মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে বলা প্রয়োজন, শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ জগৎ ও ঈশ্বরের আলাদা অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও, এই মতবাদ জগৎ এবং যাবতীয় জাগতিক বিষয় সম্পর্কে একটি উদাসীন মানসিকতার জন্ম দেয় এবং ব্যক্তিকে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনে শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদের প্রভাব ছিলো সবথেকে বেশি। এই মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই আমাদের দেশে এমন একটি আধ্যাত্মিক গোষ্ঠী বা সন্ন্যাসীদলের সৃষ্টি হয়েছিলো,

যারা জগৎ সংসার থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে, পর্বতগুহা এবং বন জঙ্গলে নিজেদের আবদ্ধ রেখে আত্মমুক্তির প্রলভনে পরমব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। এরা সংসারকে মায়া এবং মোহ বলেই মনে করেছিলেন। এই মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই বহু সাধু সন্ন্যাসী জগৎ সংসার কে মিথ্যা মনে করে গৃহত্যাগ করে আসছিলেন।

বেদান্ত দর্শনের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ উপরে উল্লেখিত তিনটি পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যার সমন্বয় সাধন করে বেদান্তের একটা সহজ সরল ব্যাখ্যা দেন। দ্বৈতবাদের ঈশ্বরের আলাদা অস্তিত্বের তত্ত্ব এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের ঈশ্বর ও জগতের অভিন্ন সত্ত্বার দিকটির সমন্বয় সাধন করে তিনি বলেন - জগৎ, জীব এবং মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটে থাকে। যত্র জীব, তত্র শিব। প্রত্যেক মানুষ ও জীবের মধ্যেই দেবত্ব লুকিয়ে থাকে। সেই সুপ্ত দেবত্ব কে মহৎ গুনাবলীর দ্বারা জাগরিত করা যায়। তার মতে, যেহুতু পরমব্রহ্ম "আত্মা" রূপে সকল জীবের মধ্যেই অবস্থান করছেন, তাই জীব ও জগতের সেবা করা মানেই ঈশ্বরের সেবা করা। এই জন্য তিনি বলেন, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। তিনি আরও বললেন, ঈশ্বর লাভের জন্য বন, জঙ্গল বা হিমালয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর এই জগতের মধ্যেই রয়েছেন। এই জগৎই ঈশ্বর। জগতের সেবা ও কল্যানের মধ্য দিয়েই প্রকৃত ঈশ্বরের সেবা হয়ে থাকে। বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পূর্বক্ত মতবাদ গুলি জীব ও জগৎ সম্পর্কে একটি উদাসীন মানসিকতার জন্ম দিয়েছিলো। জীব ও জগৎ সম্পর্কে উন্নাসিক একদল সাধক ও সন্ন্যাসী তৈরি করেছিলো। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য ও ব্যাখ্যায় জগৎ সম্পর্কে যাবতীয় উদাসীন ও উন্নাসিক মানসিকতার অবসান ঘটান। জগৎ ও ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে যাবতীয় সংশয়ের অবসান করেন। বেদান্ত দর্শনে স্বামী বিবেকানন্দের এই নব ভাষ্য ও ব্যাখ্যাই "নব্য বেদান্ত" নামে পরিচিত হয়।

বিবেকানন্দ শুধু বেদান্তের নতুন ব্যাখ্যাই দিলেন না, মানুষের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে তাকে প্রয়োগ করতেও উদ্যোগী হলেন। এতদিন যে বেদান্ত বনে, জঙ্গলে, পর্বতে এবং নিভৃত গুহাতে লোকচক্ষুর অন্তরালে মুনি ঋষিদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলো, সেই বেদান্তকে তিনি লোকালয়ে টেনে নিয়ে এলেন। জীবনের সঙ্গে বেদান্ত ভাবনার সংযোগ ঘটিয়ে তাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করলেন। প্র্যাকটিক্যাল লাইফে নব্য বেদান্তের এই প্র্যাকটিক্যাল প্রয়োগটিই "প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত" নামে পরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম নব্য বেদান্তের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মমুক্তির সাধনা স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত মুক্তির জন্য সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরকে খোঁজার জন্য বনে বা জঙ্গলে যাওয়ারও দরকার নেই। জীব ও জগতের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন। তাই জীব জগতের কল্যানের জন্য নিষ্কাম কর্ম করে যেতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ তাই তার নব্য বেদান্তকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে গিয়ে - এমন একদল সন্ন্যাসীর জন্ম দেন, যারা বনে, জঙ্গলে আত্মমুক্তির

সাধনায় নিমগ্ন না হয়ে, সংসারের মধ্যে থেকে, মানব কল্যানের ব্রত নিয়ে পরমব্রহ্মের সাধনায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। ১৮৯৭ খ্রিঃ মানবসেবা, জগৎ কল্যান ও শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিষয়ে বিবেকানন্দের অভিমত ছিলো, একমাত্র প্রকৃত শিক্ষাই মানুষের অন্তরের দেবত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। সকল প্রানের মধ্যেই যেহেতু পরমব্রহ্মের অবস্থান, তাই বিবেকানন্দ সব ধরনের জাতিভেদ ও বর্নবৈষম্যবাদের তীব্র সমালোচনা করে সব মানুষের ঐক্যের কথা বলেন। জীব ও জগৎ পরম সত্ত্বার অংশ, এই বৈদান্তিক ভাবনায় স্বামীজি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে সমন্বয়বাদের কথা বলেন। তার মতে এই সমন্বয় হবে - মানুষের সঙ্গে মানুষের, ভারতীয় জীবনাদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্যের কারিগরি জ্ঞানের, বৈদান্তিক হৃদয়ের সঙ্গে ইসলামের দেহের। আধ্যাত্মিক জীবনে আত্মমোক্ষের বদলে বিবেকানন্দ সমষ্টির মোক্ষের কথা তুলে ধরেন। এই বিষয়ে তার অভিমত ছিলো - "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্বিতায়চ" অর্থাৎ জগতের কল্যানের ঘটবে নিজের মোক্ষ। সবচেয়ে বড়ো কথা, প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তের মধ্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাস এবং সমাজের মেলবন্ধন ঘটান। সংসার বিমুখ সন্ন্যাসকে অরন্য, এবং পর্বত গুহার অন্ধকার থেকে টেনে এনে সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্তব্যস্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। বেদান্তের মূল ভাবনাই হলো জাগরন। বিবেকানন্দ পরাধীন, জাতি বৈষম্যে জর্জরিত নূন্যমান দেশবাসীকে আত্মজাগরনের নতুন মন্ত্র দেন, এবং এইভাবেই স্বামী বিবেকানন্দ নব্য বেদান্তের ভাবনাকে প্র্যাকটিক্যাল রূপ দেন।

স্বামী বিবেকানন্দের নব্য বেদান্ত গভীর ভাবে পর্যালোচনা করলে এর কয়েকটি বিশেষ দিক লক্ষ্য করা যায় - সমন্বয়বাদী ভাবধারায় ও আদর্শ, যা ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, মানুষের সঙ্গে মানুষের, প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের মিলনের কথা তুলে ধরে। আত্মমুক্তির বদলে সমষ্টির মুক্তি, যা ব্যক্তির কল্যানের বদলে গোষ্ঠীর কল্যান ও বৃহৎ মানব সমাজের কল্যানের কথা বলে। মানবতাবাদী দর্শন ও আদর্শ, যা সমস্ত সামাজিক বৈষম্যকে অস্বীকার করে এবং ভেঙ্গে ফেলে সকল মানুষের মিলনের কথা তুলে ধরে। ঈশ্বর জ্ঞানে মানব ও জীবসেবার আদর্শ, যা অসহায়, নিপীড়িত, দরিদ্র, অশিক্ষিত, ক্ষুধার্ত মানুষের মুক্তির মহান সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্তব্যবোধে আমাদের দীক্ষিত করে। সুতরাং এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম - স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের যে নতুন ব্যাখ্যা দেন, সেটাই হলো "নব্য বেদান্ত", আর এই নব্য বেদান্তের ভাবনা ও দর্শনকে কর্মে বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যখন তিনি প্রয়োগ করেন, সেটাই "প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত" নামে পরিচিত হয়।

তথ্য সূত্র:

1। Complete works of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, Kolkata 1989, Vol.VII.

2। Radjakrishnan, S. The Ethics of Vedanta, "International Journal of Ethics", Vol-24(2), 1914.

3। Ibid,

4। Vivekananda: The Yogas and other Works, Chosen and with a biography by Swami Nikhilananda (New York: Rama Krishna-Vivekananda Centre, 1984)

5। Ibid, p.44

6। ঘোষ, গোবিন্দচরন, সমকালীন ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিকেশন, ২০২০।

7। বন্দোপাধ্যায়, নিখিলেশ, বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস, সুদেশ

গ্রন্থপঞ্জিঃ

1। ঘোষ, গোবিন্দ চরন, সমকালীন ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিকেশন, ২০২০।

2। বন্দোপাধ্যায়, নিখিলেশ, বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস।

3। Complete works of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, Kolkata 1989, Vol. VII.

4। Kumar Lal, Basant, Motilal Banarasidass publishers Private Limited Delhi, Second Revise Edition Reprint 2002.

5। Radjakrishnan, S. The Ethics of Vedanta, "International Journal of Ethics", Vol-24(2), 1914.

6। Vivekananda: The Yogas and other Works, Chosen and with a biography by Swami Nikhilananda (New York: Rama Krishna-Vivekananda Centre, 1984)

আলপনা : বাংলার অনন্য লোকশিল্প

শ্রী ভট্টাচার্য্য
স্নাতকোত্তর, কণ্ঠসঙ্গীত বিভাগ (লোকসঙ্গীত)
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : লোকসংস্কৃতির বিশেষত্ব নিহিত আছে 'লোক' বা 'Folk' কথাটির মধ্যে। লোক সংস্কৃতি তথা FolkCulture-র জন্ম সাধারণ মানুষের মুখে মুখে, তাদের চিন্তায় ও কর্মে।লোক সংস্কৃতির নানান উপাদানের মধ্যে অন্যতম উপাদান হলো লোক শিল্প। লোকশিল্প গ্রামীণ সমাজ জীবনকে প্রতিফলিত করে। গ্রামীণ জীবনযাত্রা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, গ্রামীণ মেলা উৎসব ইত্যাদির চিত্র, দেয়ালে চিত্র ও ভাস্কর্যের রূপকেই লোকশিল্প বলে।বাংলার লোক শিল্পের অন্যতম একটি উদাহরণ হলো বাংলার আল্পনা। আল্পনা বা আলপনা একধরনের লোকশিল্প এবং বলা যায় মানুষের সহজাত অভিব্যক্তি। এতে সমাজের অতীত অভিজ্ঞতা যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি একই সঙ্গে ফুটে ওঠে বর্তমানের অস্তিত্ব। আল্পনা হলো বাঙালী নারীর আচার-অনুষ্ঠানের অংশ। প্রার্থনার সাথে এই আচারটি জোরা হয়। যেমন, যদি খরা হয়, তাহলে আল্পনায় বৃষ্টি হবার জন্য কাঙ্খিত চিত্র অন্তর্ভুক্ত থাকে। জীবন যাপনের বাস্তবিক ঘটনাগুলি নকশাগুলিকে প্রভাবিত করে, তাই ভালো ফসলের জন্য অনুরোধ করা এমন একটি নকশায় পাকা গম বা ধান এবং শস্যভান্ডারের মতো মোটিফ থাকে। বর্তমান অতি-আধুনিক যুগের দরজায় দাঁড়িয়ে এই শিল্পটি ধীরে ধীরে নিজের অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। আলোচ্য নিবন্ধের মাধ্যমে আল্পনা শিল্প নিয়ে নানান খুন্তিনাতি বিসয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা হলো।

মূল শব্দ : লোক শিল্প, আল্পনা, শান্তিনিকেতনের আল্পনা, বর্তমান যুগে এর আস্তিত্ব।

লোকসংস্কৃতির বিশেষত্ব নিহিত আছে 'লোক' কথাটির মধ্যে। লোক সংস্কৃতির জন্ম সাধারণ মানুষের মুখে মুখে , তাদের চিন্তায় ও কর্মে। ঐতিহ্যনুসারে বৃহত্তর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান, জীবন-যাপন প্রণালী, শিল্প ও বিনোদন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা সংস্কৃতিকে সহজ ভাষায় লোকসংস্কৃতি বলা হয়।লোক সংস্কৃতির নানান উপাদানের মধ্যে অন্যতম উপাদান হলো লোক শিল্প। লোকশিল্প গ্রামীণ সমাজ জীবনকে প্রতিফলিত করে। গ্রামীণ জীবনযাত্রা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, গ্রামীণ মেলা উৎসব ইত্যাদির চিত্র, দেয়ালে চিত্র ও ভাস্কর্যের রূপকেই লোকশিল্প বলে। পটশিল্প এই লোকশিল্পের একটি অন্যতম প্রধান আঙ্গিক। সংস্কৃতির চিত্রিত রূপই হল লোকশিল্প। লোকশিল্প বা ফোক আর্টের উদাহরণ হল উড়িষ্যার জগন্নাথের পট, কালীঘাটের পট, বাঁকুড়ার ঘোড়া, পুরুলিয়ার মুখোশ ইত্যাদি।

'Folk in ethnology is the common people who share a basic store for old tradition.' অর্থাৎ, পুরাতন ঐতিহ্যের অংশীদার যেসব সাধারণ মানুষ, নৃতত্ত্বের পরিভাষায় তারা Folk বা লোক নামে অভিহিত। আর শিল্প হলো, মানব সত্তার আনন্দিত উপলব্ধির গভীরতম বহিঃপ্রকাশ। সাধারণ মানুষ তাদের বেঁচে থাকার তাগিদে যে সব কার্যক্রম করে থাকে, তার ভেতরের সৌন্দর্য ও আনন্দটুকুই লোকশিল্প। সুন্দরের উপস্থাপন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।

আবহমান কাল ধরে নিজেদের প্রয়োজনেই মানুষ নানা রকম তৈজসপত্র, পোশাক-আশাক, ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে আসছে। সেইসব নির্মিত জিনিসপত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু বিষয়ের সংযুক্তি ঘটে, যা মানুষের শিল্পিত মনের নান্দনিক প্রকাশ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি মাটির হাঁড়ি, সাদামাটা না রেখে তাতে রঙের নকশা করা হয়। একটি ঝুড়ি, তার বন্ধনীতেও আনা হয় নানান কারুকার্য। পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রেও যেমন নকশিকাঁথা, রুমাল, শাড়িতে বা চাদরে নানা রঙের সুতার বুনন ইত্যাদি। এ সবই লোকশিল্পের নিদর্শন। এছাড়াও, দৈনন্দিন প্রয়োজনের বাইরেও কিছু জিনিস রয়েছে যা শুধুই মানুষের ব্যক্তিগত আনন্দ থেকে তৈরি। যেমন, মাটি দিয়ে তৈরি খেলনা, বাঁধাই করা কাপড়ের নকশা ইত্যাদি।বাংলার লোক শিল্পের অন্যতম একটি উদাহরণ হলো বাংলার আল্পনা। আল্পনা একধরনের লোকশিল্প এবং বলা যায় মানুষের সহজাত অভিব্যক্তি। এতে সমাজের অতীত অভিজ্ঞতা যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি একই সঙ্গে ফুটে ওঠে বর্তমানের অস্তিত্ব। সামাজিক জীবনের চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে আল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম।

আলপোনার উৎপত্তি

বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষেরা বছরের বিভিন্ন সময়ে নানান ব্রত-আচার পালন করে থাকেন ।'ব্রত' বলতে কিছু ইচ্ছা পূরণের জন্য করা মানত বা প্রার্থনাকে বোঝায়। আল্পনা বা আলপনা অথবা আলপোনা সংস্কৃত শব্দ 'আলিম্পানা' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'প্লাস্টার করা' বা 'কোট দেওয়া'। কোনো কোনো পন্ডিতের মতে, আল্পনা শব্দটি সম্ভবত এসেছে আলিপোনা থেকে। 'আলিপোনা' মানে 'আইল অথবা বাঁধ দেওয়া।' এটি প্রাথমিকভাবে মহিলারা অনুশীলন করতেন। প্রাচীন কোনো শিল্পবিষয়ক গ্রন্থে আল্পনার উল্লেখ পাওয়া যায় না, যদিও কোথাও কোথাও রঙ্গবলীর উল্লেখ পাওয়া যায়। রঙ্গবলী দ্বারা রং দিয়ে করা লতানো নকশা বুঝায়। এ শিল্পের বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, রঙ্গবলী ছিল এক ধরনের আল্পনা। হয়তো এই রঙ্গবলী শব্দ থেকেই আধুনিক "রঙ্গলী" এসেছে। কাদম্বরী ও তিলকমঞ্জরীর মতো সংস্কৃত গ্রন্থে এই নকশার অসাধারণ শৈলী ও কারিগরি কৌশল সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায়। আল্পনার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় পরবর্তীকালের কাজলরেখা ও অন্যান্য গ্রন্থে।

আল্পনা শিল্পের কাল নিরূপণ করা কঠিন। অনেক পন্ডিতই ব্রত ও পূজার সঙ্গে সঙ্গেই আল্পনাকে প্রাক-আর্য কালের উৎপত্তি বলে চিহ্নিত করেন। কোনো কোনো পন্ডিত মনে করেন যে, আল্পনার উত্তরাধিকার লাভ করা হয়েছে অস্ট্রিক জাতিগোষ্ঠীর কাছ থেকে, যারা আর্যদের আগমনের অনেক পূর্ব থেকেই এ দেশে বাস করত। তাঁদের মতে, ধর্মীয় আচার সম্বলিত ও ঐতিহ্যগত লোকশিল্পসমূহ (আল্পনাসহ), প্রকৃতপক্ষে কৃষিযুগে, শস্যের প্রচুর উৎপাদন ও অপদেবতা বিতাড়নের নিমিত্তে উদ্ভূত।আল্পনা হলো বাঙালী নারীর আচার-অনুষ্ঠানের অংশ। প্রার্থনার সাথে এই আচারটি জোরা হয়। যেমন, যদি খরা হয়, তাহলে আল্পনায় বৃষ্টি হবার জন্য কাঙ্খিত চিত্র অন্তর্ভুক্ত থাকে।জীবন যাপনের বাস্তবিক ঘটনাগুলি নকশাগুলিকে প্রভাবিত করে, তাই ভালো ফসলের জন্য অনুরোধ করা এমন একটি নকশায় পাকা গম বা ধান এবং শস্যভান্ডারের মতো মোটিফ থাকে। ভাদ্র মাসের ভাদুলি ব্রতের আল্পনাতে সাত সমুদ্র, তেরো নদী, কাঁটার পর্বত, মহিষ, কাক, বাবুই এর বাসা, ভেলা, আমন এবং জোড়া ছত্র মাথায় ভদ্রালি ঠাকুরানীর ছবি আঁকা হয় আবার জ্যৈষ্ঠের বসুধারা ব্রতে ইন্দ্র দেবের উদ্দেশ্যে আটটি তারা সহযোগে আকাশ আঁকা হয় এবং তা থেকে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে কিভাবে বসুমাতা জল পান তার চিত্র ফুটিয়ে তলা হয় আল্পনার মাধ্যমে।

আল্পনার উপাদান

এই ধরনের নকশার মূল উপাদান হচ্ছে চালের গুঁড়ো , জলে গোলা চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী চালের মন্ড, শুকনো পাতা গুঁড়ো করে তৈরী রঙ, কাঠকয়লা, পোড়ামাটি, পিটুলী বা খড়ি মাটি ইত্যাদি। সাধারণত মেঝের উপরই আল্পনা করা হয়। এটি অজন্তার গুহাচিত্রের ন্যায়ে দেয়াল অথবা সিলিং-এ আঁকা হয় না।তবে কোথাও কোথাও দরজার ফ্রেমের চারিপাস দিয়ে, বা গ্রাম্য দৈনন্দিন গৃহস্থালির নানান সরঞ্জাম যেমন কুলো, মাটির হাঁড়ি ইত্যাদির গায়েও আল্পনা আঁকার রীতি প্রচলিত আছে। স্মরণাতীতকাল থেকেই বাংলার মহিলারা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদির উদ্দেশ্যেই এ নকশার অনুশীলন করে আসছেন। নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করতে আল্পনা করাকালীন মেয়েরা বলে থাকেন,

"আমি আঁকি পিটুলীর গোলা
আমার হোক ধানের গোলা"
"আমি আঁকি পিটুলী বালা
আমারহোক সোনার বালা।"

পূর্বে আল্পনা প্রক্রিয়া শুরুর আগে বেশ কিছু আচার-অনুষ্ঠানও প্রচলিত ছিল যা কালের চক্রে লুপ্তপ্রায়।

ইতিহাস এবং আলপোনা

লোক ঐতিহ্যে, গ্রামের মহিলারা দরজার ফ্রেমে এবং মাটির কুঁড়েঘরের দেয়ালে আলপোনা আঁকতেন। তারা মন্দ কিছু থেকে রক্ষা পেতে পূজা - অর্চনার পাশাপাশি আশীর্বাদের ও প্রার্থনার প্রতীক হিসাবে এই আল্পনার ব্যবহার করতেন। মহিলারা মৃৎপাত্র, বাসনপত্র এবং পোড়ামাটির বস্তুতেও আলপোনার নকশা আঁকতেন। পরবর্তীকালে, অনুশীলনটি ফ্লোর আর্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। তিন ধরনের আলপোনা ছিল: জ্যামিতিক নকশা যা দেয়াল, মেঝে এবং বস্তু সাজাতে ব্যবহৃত হত; মূর্তির জন্য পাদদেশ বা বেস হিসাবে ব্যবহৃত বৃত্তাকার নিদর্শন; এবং প্যানেলগুলিকে চিত্রিত করতে ব্যবহৃত বিস্তৃত ফুলের প্যাটার্ন বা অন্যান্য নকশা।প্যানেলের নকশাগুলি হিন্দু প্যান্থিয়নের বহু দেবতাকে উৎসর্গীকৃত ব্রতগুলিকে চিত্রিত করে। বিংশ শতাব্দীতে 'ব্রত' আল্পনা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ঐতিহ্যগতভাবে, গোবরের সাথে মিশ্রিত কাদামাটি বা কাদা, আল্পনার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হতো । মহিলারা আতপ চালের (পরিশোধিত চাল) একটি তরল স্লারি তৈরি করে তা কাপড় বা তুলোয় ভিজিয়ে, হাতের চাপ ব্যবহার করে নকশা তৈরি করেন। যদিও ব্যবহৃত প্রধান রঙ সাদা, তবে অন্যান্য রঙের ব্যবহার আনতে হলুদ এবং সিঁদুরের রঙ তৈরি করতে স্লারিতে হলুদ বা লাল কাদামাটি যোগ করা হয়। বর্তমানকালে আলপোনা শিল্প তৈরি করতে পোস্টার রঙ, জিঙ্ক অক্সাইড বা তৈরি স্টিকার ব্যবহার করার অধিক প্রচলন দেখা যায়।

আলপনা শিল্পের লোক শৈলী

লোক-শৈলীর আলপোনাগুলিতে জ্যামিতিক এবং স্টাইলাইজড প্যাটার্ন তৈরি করতে বৃত্ত, অর্ধ-বৃত্ত, তরঙ্গায়িত রেখা, কলকা (কাইরি মোটিফ) এবং প্যানেল ব্যবহার করা হয়। নারীরাও প্রকৃতি ভিত্তিক মোটিফ ব্যবহার করে যেমন রাত-রানী (রাতে প্রস্ফুটিত জুঁই), কদম ফুল (বুড় ফুল), পাখি, শঙ্খ, লতা, সূর্য ও চাঁদ, পাতা, মাছ ইত্যাদি। ধানের পাতা, দেবী লক্ষ্মীর পা এবং প্রতীক। ঐতিহ্যবাহী আলপোনা ডিজাইনেও সম্পদ ও সমৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহিলারা আলপোনার বিভিন্ন শৈলী ব্যবহার করে। সাঁওতাল উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলারা বাঙালি সম্প্রদায়ের তুলনায় বিভিন্ন আলপোনার নকশা আঁকেন। হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের শৈলীতেও পার্থক্য রয়েছে। প্রতিটি সম্প্রদায়ের মহিলারা আলপোনাকে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করে, যার

ছবি - ১

ফলে শিল্প শৈলীতে বৈচিত্র্য আসে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মহিলারা সাধারণ জ্যামিতিক নিদর্শন এবং প্রতীকী প্রকৃতি-অনুপ্রাণিত মোটিফগুলি বেশি আঁকেন। হিন্দু মহিলারা সাংকেতিক নকশা, ধর্ম এবং উৎসবগুলির সাথে যুক্ত ধর্মীয় মোটিফ সহ আলপোনা বেশি আঁকেন।

শান্তিনিকেতনের আল্পনা

ছবি - ২

শান্তিনিকেতনে যে কয়েকটি লোকশিল্পের প্রচলন হয়েছিল তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁর ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ শিল্পকলার একটি বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন করেছিলেন এবং 'বাংলার ব্রত'-তে উল্লেখ করেছেন যে কিছু মোটিফ হায়ারোগ্লিফিক এবং প্রতীকী প্রকৃতির ছিল। তিনি ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত আলপোনা ডিজাইনের উপর একটি বই 'L'Alpona ou les decorations rituelles au Bengale' লিখেছিলেন। ক্ষিতিমোহন সেন এই শিল্পরীতিতে প্রাচীন বৈদিক নীতির প্রয়োগ প্রবর্তন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরে সুকুমারী দেবীকে কলা ভবনে আল্পনা শিল্প শেখানোর জন্য আমন্ত্রণ জানান। যদিও তিনি ঐতিহ্যবাহী কৌশলগুলিতে পারদর্শী ছিলেন, সুকুমারী তার নিজস্ব একটি অনন্য শৈলী গড়ে তুলেছিলেন।নন্দলাল বসু 1919 সালে শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের অধ্যক্ষ হন। তিনি সুকুমারী দেবীকে আল্পনা তৈরি করতে দেখেছিলেন এবং শিল্পের প্রতি আগ্রহ তৈরি করেছিলেন। বোস লক্ষ্য করেছেন যে লোকজ আল্পনাগুলি প্রাথমিক রূপ এবং এতে সমতল অঙ্কন রয়েছে। লোক মহিলারা রূপক প্রকৃতি-অনুপ্রাণিত মোটিফ ব্যবহার করেন এবং বাস্তব জীবনের বিশ্বস্ত উপস্থাপনা হিসাবে তাদের আঁকেন যার কারণে তাদের নকশাগুলি সুসংহত থাকে না এবং তাদের একীভূত শৈলী বা কাঠামো থাকে না।

নন্দলাল বসু শান্তিনিকেতনে আলপোনা চিত্রকলার একটি নতুন শৈলী তৈরি করেছিলেন যাতে লোক আল্পনা শিল্পের প্রতিসাম্য বা পুনরাবৃত্তিমূলক উপাদান ছিল না। বোস চেয়েছিলেন এটি অবাধে প্রবাহিত হোক এবং গভীরতা, আলো এবং ছায়া দেখাক। তিনি সূক্ষ্ম শিল্পের মতো আলপোনা আঁকেন বিস্তৃত নকশা দিয়ে যা ছিল চিত্রকলার মতো। এই শিল্পকলার একাডেমিক অধ্যয়ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে শুরু হয়েছিল এবং নন্দলাল বসু 'উচ্চ শিল্প' হিসাবে আল্পনাকে প্রবর্তনের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল। স্বাতী ঘোষ তাঁর বই 'ডিজাইন মুভমেন্ট ইন ঠাকুরের শান্তিনিকেতন: আল্পনা — অ্যান এক্সপেরিমেন্ট ইন অ্যাসথেটিসিজম' বইয়ে লোক থেকে ললিত শিল্পে আল্পনার যাত্রার বর্ণনা করেছেন।

আধুনিক ভারতীয় শিল্পে আলপোনার প্রভাব

"পুরানো দিনে প্রত্যেক মহিলাই আল্পনা-নির্মাতা ছিলেন, যদিও কিছু অন্যদের চেয়ে অনেক ভালো ছিল — সাধারণ লোক মোটিফগুলি কিছু অনুশীলনের মাধ্যমে সকলের দ্বারা আয়ত্ত করা যেতে পারে। শিল্পীদের দ্বারা বিকশিত শান্তিনিকেতন শৈলীতে নিনজা ব্রাশের দক্ষতা প্রয়োজন। বিশেষীকরণের এই যুগে আল্পনাও সাধারণ নারীর চরিত্র থেকে শিল্পীর কাছে চলে গেছে।" - পারোমিতা সেন

নন্দলাল বসু এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাদের শিল্পে ঐতিহ্যবাহী আলপোনা মোটিফ ব্যবহার করেছেন। স্বাধীনতার যুগের কয়েকজন শিল্পী, চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায় চিত্র, বইয়ের প্রচ্ছদ এবং বিজ্ঞাপনগুলিতে আল্পনা শিল্পের ফর্ম থেকে বিভিন্ন মোটিফগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তিনি জিন রেনোয়ারের ফিল্ম 'দ্য রিভার'-এর লোকেশনও খুঁজে বের করেছিলেন। ছবির উদ্বোধনী দৃশ্যের পাশাপাশি ছবির পোস্টারে দেখানো হয়েছে আল্পনা আঁকা নারীদের। এই শিল্প ফর্মটি আধুনিক শিল্পী যামিনী রায়কেও অনুপ্রাণিত করেছিল , যিনি শান্তিনিকেতনে আলপোনার বিকাশের ফটোগ্রাফিক ডকুমেন্টেশনের জন্যও বিশেষভাবে নিয়োজিত ছিলেন। শিল্পী এবং ফটোগ্রাফার দেবী প্রসাদ তার চিত্রকর্ম এবং মৃৎশিল্পে এর আলংকারিক মোটিফগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরী দেবী বস্ত্র মাধ্যমে লোকশিল্পের প্রবর্তন করেন। তারও পরে, শান্তিনিকেতনের মহিলা শিল্পীদের বাটিক কাজে এর মোটিফগুলি প্রায়শই প্রদর্শিত হত।

বর্তমান যুগে আলপনার গুরুত্ব

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর আর্ট অ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজ (INTACH) এবং দারিচা ফাউন্ডেশন বক্তৃতা ও কর্মশালা পরিচালনার মাধ্যমে শিল্পীদের আলপোনা শিল্পে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 2016 সালে, এটি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ, কলা ভবনে স্নাতকদের জন্য ফাউন্ডেশন কোর্সে অন্তর্ভুক্ত হয়। শিক্ষার্থীদের আর্ট ফর্মের মূল বিষয়গুলির পাশাপাশি কিছু সাধারণ মোটিফ এবং ডিজাইন শেখানো হয়। শিল্পী রবি বিশ্বাস তাঁর দিদিমা, সুমিত্রা মন্ডলের কাছ থেকে আলপোনা সম্পর্কে শিখেছেন এবং এখন কর্মশালা শেখাতে এবং এই প্রাচীন শিল্প ফর্ম সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে সারা দেশে ভ্রমণ করছেন। আধুনিক বাংলায়, আল্পনা এখনও দুর্গা পূজার মতো আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ সময় বেশ কিছু আলপনা শিল্প প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মহিলারা সরকারী এবং ব্যক্তিগত জায়গায় তাঁদের অল্পনার নিদর্শন আঁকেন। স্বেচ্ছাসেবকরা বিশেষ মকর সংক্রান্তি উৎসবের অংশ হিসেবে লঙ্কামুরার রাস্তায় বিশাল এবং বিস্তৃত আলপোনা তৈরি করে। ব্যাপকভাবে উৎপাদিত স্টিকার জনপ্রিয়তা লাভ করায় হাতে আঁকা আলপোনার ঐতিহ্য কমে গেছে। যুগের সাথে তালে তাল মিলিয়ে আধুনিককালে মানুষ এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ছে যে

প্রাচীন এই শিল্পের অস্তিত্ব ক্রমেই সংকটের মুখে আসীন হচ্ছে। ব্রতের সংখ্যা কমেছে, হারিয়ে গেছে বহু নিয়ম এবং তার সাথে সাথেই হারিয়ে গেছে তার সাথে জুড়ে থাকা নানান আচারগুলিও। এটি শিল্প ফর্মের কৌশল সংরক্ষণের জন্যও ক্ষতিকর। তবুও লোকশিল্পের রূপটি তার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের কারণে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। রবি বিশ্বাসের মতো শিল্পীরা এখন কাগজে আল্পনা আঁকেন, যা এটিকে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হতে সাহায্য করেছে।

তথ্যঋণ:

১। আলপনা – পল্লব সেন গুপ্ত
২। চিত্রশিল্পে পল্লীরমণী ও আলপনা – প্রফুল্লকুমার দাস
৩। বাংলার ব্রত – অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪। লোকজ শিল্প – ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী
বৈদ্যুতিন তথ্যঋণ:
১। https://banglalive.com/bengal-alpana
২। https://bengali.news18.com/photogallery/life-style/alpana-rangoli-would-bring-money-with-good-luck-to-your-family-arc-1158365.html

বঙ্কিমচন্দ্রের অমরনাথ : অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের টানাপোড়েন

সিদ্ধার্থ ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার: বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের খ্যাতি বিশ্ববন্দিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বিশেষ লগ্নে তাঁর আবির্ভাব বঙ্গ সাহিত্যকে এক আলোকসামান্য রূপদান করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারাকে সঙ্গী করে তিনি সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হয়ে বাঙালি হৃদয়কে আপ্লুত করার পাশাপাশি বাংলা উপন্যাসে এক নতুন দিকের উন্মোচন ঘটান। বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ উপন্যাস প্রণেতা হিসেবেও তার পরিচিতি এক অনুপম স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছে। তবে তাঁর আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট ছিল বেশ তাৎপর্যময়। যা তাঁর সাহিত্য উপাদানকে প্রভাবিত করেছে। তিনি যে সময়ে উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হন, তখনকার পরিস্থিতি ছিল বড্ড অস্থির ও পরিবর্তনময়। সেসময়ই নাগরিক সমাজ আকৃষ্ট হয় শহরের ঠিকানায়। স্বাভাবিকভাবেই মানবিক সম্পর্কেও নানা টানাপোড়েন দেখা যায়। এছাড়া মধ্যবিত্ত জীবনকে কেন্দ্র করে চলে নানা ভাঙ্গা-গড়ার খেলা, যা বাংলার আকাশে বাতাসে এক অনুরণন সঞ্চার করে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংঘাত, সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার প্রাবল্যতা, নারী ব্যক্তিত্বের বিবর্তন, মানবিক মূল্যবোধের বৈপরীত্য, প্রভৃতির পথ ধরেই বঙ্কিম উপন্যাসে সৃষ্টি হয়েছিল বেশ কিছু অনিকেত চরিত্রের। এদের মধ্যে অমরনাথ বিশেষভাবে স্মরণীয়। অমরনাথ কোথাও তার স্থানকে নির্দিষ্ট করে উঠতে পারেনি। সবসময় তার অন্তরে প্রবল দ্বিধাবোধ কাজ করেছে। সব কিছু থেকেও যেন তার কিছুই নেই। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের আলোড়ন চরিত্রটিকে শূন্যতার অতলে নিক্ষেপ করেছে।
সূচক শব্দ: টানাপোড়েন, স্থায়ী, শিক্ষা, অর্থ, অপমান, স্মৃতি, লবঙ্গলতা, শূন্যতা প্রভৃতি।

অমরনাথের পরিচয় হল, সে রজনী উপন্যাসের নায়ক। নবজাগরণের আলোতে প্রভাবিত একজন পুরুষ। কোনো বিষয়ের প্রতি তার তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি। পরিস্থিতির প্রয়োজনে সে নিজেকে নির্মাণ করেছে, নিজস্ব স্বকীয়তা নেই বললেই চলে। যৌবনের সূচনাপর্বে লবঙ্গলতার থেকে পাওয়া অপমানের স্মৃতি তাকে প্রবল অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে। সুখী হতে চাওয়ার বাসনাতেও অমরনাথের স্ববিরোধ কাজ করেছে। দুই ধরনের সত্তা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। একদিকে নিজস্ব ভাবনার জগৎ ও অন্যদিকে কোলাহলে পরিপূর্ণ বহির্বিশ্ব-এই দুইয়ের কোনো অলিন্দেই তার স্থান নিশ্চিত

হয়নি। এরপরেও এক প্রবল বিশ্বাসকে সঙ্গী করে রজনীর মধ্যে নিজের স্থানকে আবৃত করতে উদ্যোগী হতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছে অমরনাথ। রজনী যে তার প্রতি প্রবল অনুরক্ত, এই বিশ্বাস তাকে শেষপর্যন্ত শূন্যতায় দীর্ণ করেছে।

উপন্যাসের প্রথম পর্বে দেখা যায়, শান্তিপুর নিবাসী সৎ কায়স্থবংশ-জাত সন্তান অমরনাথ পিতার মৃত্যুর পর পিসিমার শ্বশুরবাড়ি কালিকাপুরে গেলে তার জীবনে চরম অভিঘাত নেমে আসে। লবঙ্গলতা ও তার মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক তৈরি হয়েও শেষে বিচ্ছেদে পর্যবসিত হয়। এর জন্য অমরনাথের পরিবারের কলঙ্ককেই দায়ী করা হয়। এরপর লবঙ্গলতার বিবাহ হয় বৃদ্ধ রামসদয়ের সঙ্গে। কোনো একদিন যৌবনের নেশায় মত্ত অমরনাথ লবঙ্গলতার শয়ন কক্ষে গেলে তা মেনে নেয়নি লবঙ্গলতা। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লোকজন ডেকে তার পূর্বের প্রেমিকের শরীরে তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে ‘চোর’ শব্দ লিখে ক্ষান্ত হয়, অমরনাথের পূর্বের প্রেমিকা লবঙ্গলতা। যে অমরনাথ তার প্রিয় লবঙ্গকে একসময় হৃদয়ে মহৎ স্থান দিয়েছিল, পরবর্তীতে তার এমন হীন আচরণ মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। এই কারণেই আত্মধিক্কারে জর্জরিত হয়ে অজানার ঠিকানায় পাড়ি দিতে বাধ্য হন ‘রজনী’ উপন্যাসের নায়ক অমরনাথ। এরপর থেকেই তার মধ্যে দুই সত্তার টানাপোড়েন শুরু হয়— একদিকে রয়ে যায় নিজস্ব চেতনার জগৎ অপরদিকে বাইরের পার্থিব জগৎ। কোনো অলিন্দেই নিজের জায়গাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি নব্য বাঙালি সমাজের প্রতিনিধি অমরনাথ।

‘রজনী’ উপন্যাসের নায়ক অমরনাথ নানা ঘাত প্রতিঘাতে দীর্ণ হওয়া এক পুরুষ। অর্থ, প্রাচুর্যতা, শিক্ষা, রূপ সব থাকা সত্ত্বেও কোথাও তিনি স্থায়ী হতে পারেননি। নিজের কাছে নিজেই উত্তর খুঁজেছেন, এবং শেষপর্যন্ত বুঝেছেন কিছুই তিনি চান না। যশ, খ্যাতির প্রতিও তার কোনো মোহ তৈরি হয়নি। কারণ তিনি জানেন, পৃথিবীতে কারও ভাগে নিরঙ্কুশ যশ প্রতিষ্ঠা পায় না। তিনি আরও মনে করেন ‘সাধারণ লোক মূর্খ এবং স্থূলবুদ্ধি’–সুতরাং তাদের যশে তার কোনো আগ্রহ নেই। মানও তিনি চান না, কারণ আপামর সাধারণ মানুষ যা কিছু চায়, তার সবকিছুকে এক লহমায় প্রত্যাখান করতে সে সদা পটু। সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে অমরনাথের কোনো সম্বন্ধ নেই, কারণ সাধারণের সব কিছুকেই হেলায় উপেক্ষা করতেই সে প্রস্তুত। অমরনাথ ধনী ও শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও কোথাও নিজের শিকড়কে মেলে ধরতে পারেনি, হাজার চেষ্টা করেও কোথাও স্থায়ী হতে পারেনি—“কোথাও স্থায়ী হই নাই। কিন্তু মনে করিলেই স্থায়ী হইতে পারিতাম মনে করিলেই কুলীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক বিবাহ করিতে পারিতাম। আমার সব ছিল–ধন, সম্পদ, বয়স, বিদ্যা, বাহুবল, কিছুরই অভাব ছিল না।”[১]

অমরনাথের শূন্যতায় ভরা জীবনের মূল কারণ ছিল লবঙ্গলতা। একসময় তাকে নিয়েই জীবনের সমস্ত ভাবনার শুরু। তাকে ঘিরেই তার স্বপ্ন বুননের পথ চলা। তবে শেষপর্যন্ত অমরনাথের পরিপূর্ণভাবে তাকে পাওয়া হয়ে ওঠেনি। অমরনাথের কুলের

কলঙ্ক এর জন্য অনেকাংশে দায়ী বলেও মনে করা হয়। ব্যর্থ এই প্রণয়ই তাকে ক্রমাগত ক্ষতবিক্ষত করে নানা সংশয়ে বিদ্ধ করেছে। লবঙ্গলতার প্রতি তীব্র প্রণয়ের কারণেই তিনি কখনো স্বাভাবিক হতে পারেননি। লবঙ্গলতার থেকে পাওয়া অপমানের স্মৃতি তাকে আরও বেদনাতুর করে তুলেছে। এর মধ্যে দিয়েই ক্রমশ তার চিত্ত আলোড়ন ঘটেছে। নিজেই নিজের কাছে উত্তর খুঁজেছেন নানা জিজ্ঞাসার, কোনো উত্তরই ঠিকমতো পাননি। যার কারণে জীবন তার কাছে বড্ড বিষণ্ণ বলে মনে হয়েছে— "কিছু কাম্য কি খুঁজিয়া পাই না? এই অনন্ত সংসার, অসংখ্য রত্নরাজিময়, ইহাতে আমার প্রার্থনীয় কি কিছু নাই? যে সংসারে এক একটি দুরবেক্ষণীয় ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ অনন্ত কৌশলের স্থান, অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, যে জগতে পথিস্থ বালুকার এক এক কণা, অনন্তরত্নপ্রভব নগাধিরাজের ভগ্নাংশ, সে জগতে কি আমার কাম্য বস্তু কিছুই নাই।"[২]

অমরনাথকে দুটি বিষয় প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে, একটি তার শিক্ষা এবং অপরটি তার ব্যর্থ প্রেম। শিক্ষার দিক থেকে তিনি যথেষ্ট বিদগ্ধতা অর্জন করলেও প্রেমের দিক থেকে সম্পূর্ণ নিস্ফল। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্বে তার অগাধ জ্ঞান থাকলেও জীবনের হিসেব বুঝতে সে বড্ড দিশেহারা। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগত নিয়েও তার মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে সর্বত্র—"সুখ দুঃখ পরের হাত, না আমার নিজের হাত? পর কেবল বহির্জগতের কর্তা- অন্তর্জগতে আমি একা কর্তা। আমার রাজ্য লইয়া আমি সুখী হইতে পারি না কেন? জড়জগৎ জগৎ অন্তর্জগত কি জগত নয়? আপনার মন লইয়া কি থাকা যায় না?"[৩]

অমরনাথের চরিত্রের মধ্যে দ্বিধার সঙ্গে সঙ্গে স্ববিরোধও পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি চেয়েছেন কোনো কিছুর মধ্যে স্থায়ী হতে, কিন্তু পারেননি। তার সবচেয়ে বড় কারণ হল—আত্মকেন্দ্রিক স্বভাব। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ নিয়ে টানাপোড়েন তাকে কোথাও থিতু হতে দেয়নি। এমনই এক বিষণ্ণ পরিবেশে তার জীবনে যুক্ত হয়েছে রজনী। লবঙ্গলতার অপমান স্মৃতিতে দীর্ণ অমরনাথ নতুন করে স্বপ্ন দেখেছে রজনীকে আশ্রয় করে। রজনী তার জীবনের দ্বিতীয় নারী। রজনীর অতীত ও সম্পত্তি উদ্ধারকে কেন্দ্র করে অমরনাথের জীবনে ঘটে গেছে অপ্রত্যাশিত নানা ঘটনা। আর এই সূত্র ধরেই তার জীবনে বয়ে এসেছে অতর্কিত নানা অভিশাপ। লবঙ্গলতার আঘাতের উপশম হিসেবে রজনীর মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সেই কারণেই রজনীর নানা কাজে তার প্রবল উৎসাহ দেখা যায়। রজনীকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করাই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। সেই লক্ষ্যকে পূরণ করতে গিয়েই তার জীবনে নানা অস্থিরতা তৈরি হয়েছে।

অমরনাথের জীবনে রজনী আসার পরেই আবার পুনরায় তার অতীত স্মৃতির হাতছানি দেখা গেছে। আবার দেখা হয়েছে তার প্রাক্তন প্রেমিকার সঙ্গে। একদিকে রজনী আর অপরদিকে লবঙ্গলতা দুই এর মাঝে পড়ে সে অসহায় হয়ে উঠেছে।

অতীতের লবঙ্গলতা আর বর্তমান লবঙ্গলতার মধ্যে পার্থক্য প্রবলভাবে নজরে এসেছে। লবঙ্গলতার পরবর্তী পরিচয় হয়ে উঠেছে শচীন্দ্রের সৎ মা হিসেবে। এমন পরিস্থিতিতে রজনীর নানা কাজের সহায়তা করতে চাইলেও তা পছন্দ হয়নি লবঙ্গলতার। শচীন্দ্রের পরিবারের সম্পত্তি অন্য কেউ পাবে এটাও মন থেকে মেনে নিতে পারেনি লবঙ্গলতা। আর সেই কারণে অমরনাথকে রজনীর পাশ থেকে উৎখাত করতে উদ্যোগী হয়েছে। অমরনাথকে রজনীর নানা কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে লবঙ্গলতা নানা প্ররোচনার আশ্রয় নিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেনি। একদিন যাকে মনে প্রাণে নিজের করে পেতে চেয়েছিল, সেই মানুষটা যে এমন অভিশাপ বয়ে আনবে তা বিন্দুমাত্র কল্পনা করেনি অমরনাথ। একদিকে লবঙ্গলতার কাছ থেকে পাওয়া প্রতিদান, অপরদিকে রজনীর দেবতারূপে অমরনাথকে মানা, এই দুই ঘটনা আত্মবিস্মৃত করেছে অমরনাথকে। যে অমরনাথ তার অতীতের সব কিছু ভুলে নতুনভাবে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, অচিরেই তার স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। লবঙ্গলতার স্মৃতি ভুলে রজনীর মধ্যে নিজের আশ্রয় তৈরি করতে চেয়েও শেষ মুহূর্তে তা বিনষ্ট হয়েছে, যা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি অমরনাথ। পরাজিত নায়কের ন্যায় শেষ উচ্চারণ রেখেছেন—“সুখ তোমাকে সর্বত্র খুঁজিলাম-পাইলাম না। সুখ নাই তবে আশায় কাজ কি? যে দেশে অগ্নি নাই, সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়া কি হইবে! প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সব বিসর্জন দিব।”[৪]

যে অমরনাথ একদিন সাংসারিক সমস্ত সুখ অর্জন করতে চেয়েছিল পরবর্তীতে সেই মানুষটিই সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে গভীর শূন্যতায় পৌঁছে গেছে। সমস্ত আশা, সুখের বিসর্জন দিয়ে ঈশ্বরের চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছে। সমস্ত আশা ভঙ্গ হলে সংসারকে তার অন্ধকার বলে মনে হয়েছে। তার বুক ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে, স্ত্রীলোকের মতো কাঁদতেও ব্যর্থ হয়েছে। নিজের যন্ত্রণা নিজের কাছে রেখে কেবলই বলে উঠেছে—“আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। রজনী কাঁদিতেছে, লবঙ্গ কাঁদিতেছে। ইহারা স্ত্রীলোক, চক্ষের জল ফেলে; আমার চক্ষের জল পড়িতেছিল না–কিন্তু রজনীর কথায় আমার হৃদয়ের ভিতর হইতে রোদনধ্বনি উঠিতেছিল। লবঙ্গ কাঁদিতেছে, আমি কাঁদিতেছি-আর শচীন্দ্রের এই দশা! কে বলে সংসার সুখের? সংসার অন্ধকার!”[৫]

উপরিক্ত নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে অমরনাথ চরিত্রের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের টানাপোড়েনের রূপটি প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রথম থেকে শেষ অবধি তার চরিত্রের সুপষ্ট বিবর্তন পরিস্ফুট হয়েছে। আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সে জানতে চেয়েছে—সে নিজে কী চায়, পরিশেষে বুঝতে পেরেছে তার প্রার্থনার কিছুই নেই। সাধারণ মানুষ যা চায়, মোটেও সেই পথের পথিক তিনি নন। আর সে জন্যই বোধহয় তার পথ আলাদা। তবে তার জীবনেও প্রেম এসেছে। আর এই ভালোবাসার হাত ধরেই তার প্রথম সংসার করার বাসনা জেগেছে, তবে এই বাসনায় তাকে শেষ আঘাতটা দিয়েছে।

অমরনাথ দুই নারীকে ভালোবেসেছে এবং তাদের দুজনকেই হারিয়েছে। রামসদয় ও শচীন্দ্র তার মূল্যবান জিনিসকে ছিনিয়ে নিয়েছে। সব মিলিয়ে অমরনাথের

প্রাপ্তির ভান্ডার শূন্য। শেষপর্যন্ত তার পরিচয়, প্রেমের নীলকণ্ঠ তাপসমূর্তি অভিযোগহীন নিস্পন্দ এক পুরুষ ছাড়া আর কিছু নয়। পরিশেষে প্রেম ও বৈরাগ্যের সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে শূন্যতার ঊষর ভূমিতে পর্যবসিত হয়েছে বঙ্কিমের মানস পুত্র অমরনাথ।

তথ্যসূত্র :

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উপন্যাস সমগ্র, সাহিত্যম, ১৪০৯, পৃষ্ঠা ৬১৬
২. তদেব, পৃষ্ঠা ৬১৮
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৬১৬
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৬৫২
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৬৫১

সহায়ক গ্রন্থ :

১. শংকর চট্টোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের নিঃসঙ্গ নায়ক, করুণা প্রকাশনী, ২০০২
২. রজনীর বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী, গ্রন্থবিকাশ, ২০০৫

শৈলী বিজ্ঞানের আলোকে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার শৈলী বিচার

আচিন্ত্য কুমার দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বিশ শতকের বাংলা কাব্য-কবিতার ইতিহাসে একজন বিশিষ্ট কবি হলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাঁর কবিতার প্রধান অবলম্বন বাস্তব জীবন ও জগৎ। কবিতার বিষয়, ছন্দ, অলংকার এবং শব্দ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। কবির এই স্বতন্ত্রতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। কোনো একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত মনন-চিন্তন যখন ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তখন তার মাধ্যমে তৈরি হয় তাঁর নিজেস্ব শৈলী। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের শৈলী সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ আলোচনা, ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় করা হয় তাকে বলা হয় শৈলীবিজ্ঞান। এটি ভাষাবিজ্ঞানের একটি ফলিত শাখা। মূলত উনিশ শতকে এর সূচনা হলেও পরিপূর্ণতা লাভ করে বিশ শতকে এসে। শৈলী সম্পর্কিত আলোচনায় ভারতীয় অলংকারিকরা যে রীতির কথা বলেছেন সে প্রসঙ্গও উঠে আসে। কিন্তু রীতি এবং শৈলী এক বিষয় নয়। রীতি হল পদ রচনার এক বিশিষ্ট ভঙ্গি। এই রীতি আবার আঞ্চলিকতার মধ্যেও আবদ্ধ। অন্যদিকে শৈলী বলতে কোনো একজন লেখকের ব্যক্তিগত মননের কাব্যিক প্রকাশকে বোঝানো হয়ে থাকে। শৈলী বিশ্লেষণে লেখকের ব্যক্তিগত সত্ত্বাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কোনো একজন সাহিত্যিকের শৈলী নির্ণয়ের মূলে যে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে কাজ করে থাকে সেগুলি হল - নির্বাচন, বিচ্যুতি, প্রমুখন, উদ্ভাসন এবং সমান্তরালতা প্রভৃতি বিষয়।

সূচকশব্দ: শৈলী, স্টাইল, নির্বাচন, বিচ্যুতি, আদর্শ গঠন, প্রমুখন, উদ্ভাসন, সমান্তরালতা ।

মূল আলোচনা:

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন হেমন্তকালে অবিভক্ত বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চান্দা গ্রামে ১৯শে অক্টোবর ১৯২৪ সালে। কবির পিতার নাম জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও মাতার নাম প্রফুল্লনলিনী। কোনো একজন কবিকে এবং তার লেখা কাব্যকে বোঝার জন্য প্রথমে আমরা কবি সম্পর্কে নানা তথ্য আহরণ করে থাকি, কিন্তু কবির লেখা কাব্যের ভাষা সম্পর্কে আমরা বিশেষ যত্নবান হই না। কবি যেহেতু তার মনের ভাবকে ভাষার মাধ্যমে কাব্য রূপে প্রকাশ করে থাকেন সেহেতু ভাষার দ্বার দিয়েই কবির এবং কবিতার অন্দরমহলে পৌঁছানো সম্ভব হয়ে থাকে। তাই

আমরা ভাষাবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা শৈলীবিজ্ঞানের সাহায্যে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশেষভাবে আলোচনা করে দেখব। শৈলীবিজ্ঞান বলতে সাধারণত কোনো এক ব্যক্তির রচিত রচনার ব্যক্তিগত ভাবনা ও তার প্রকাশ রীতিকেই বোঝায়। প্রত্যেক কবি তার কবিতার মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখে যান। শৈলীবিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে আমরা এই ভিন্নতাকে বিশ্লেষণ করে থাকি। শৈলীবিজ্ঞান যেহেতু ভাষাবিজ্ঞানেরই একটি অংশ তাই এখানে ধ্বনি, শব্দ, বাক্য যেমন প্রাধান্য পেয়ে থাকে তেমনই প্রাধান্য পায় কবির সামাজিক ও মানসিক স্থিতির কথা। কবি তার কাব্য রচনা কালে বহু ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার করে থাকেন এবং কবিতার সৌন্দর্য রক্ষার জন্য বাক্য গঠনগত রীতিরও পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন। এই শব্দ বাক্য ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করেই শৈলী বিজ্ঞানের আলোচনা সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। শৈলীবিজ্ঞানে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রধানত আলোচনা করা হয় সেগুলি হল নির্বাচন, আদর্শ গঠন, বিচ্যুতি, প্রমুখন, উদ্ভাসন, সমান্তরালতা ইত্যাদি।

'Stylistics' শব্দটির ব্যবহার ১৮৪৬ সালে প্রথম অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধানে স্থান পায়। রচনার নৈপূণ্য গড়ে তোলার জন্য এক ধরনের শাস্ত্রের প্রয়োজন এরকম একটা ভাবনার প্রতিফলন মেলে এই অভিধানে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে 'স্টাইলিস্টিক' শব্দটি সাহিত্য শৈলীর বিজ্ঞান অর্থে বিশেষ্য ও বিশেষণের অভিন্ন রূপ নিয়ে প্রথম ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। রচনার রূপ ও ভাবব্যঞ্জক অর্থে শব্দটি ফরাসি সাহিত্যের অভিধানে স্থান পেয়ে থাকে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইংরাজিতে 'স্টাইলিস্টিক' শব্দটির প্রয়োগ শুরু হয়।

ল্যাটিন 'স্টাইলাস' শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত এই 'স্টাইল' শব্দটি। 'স্টাইলাস'-এর অর্থ মোমের চৌকো টুকরোর ওপর লেখার জন্য সূচালো কলম। পরবর্তীকালে অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে 'স্টাইলাস' অর্থ হয়েছে রচনা পদ্ধতি নির্ধারণকারি 'স্টাইল'।

এই 'স্টাইল' শব্দটির বাংলা পরিভাষা কী হবে এই নিয়ে বেশ মতান্তর দেখা গিয়েছিল সমালোচক মহলে। অনেক সমালোচক স্টাইলকে 'রীতি' নামকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। 'Style'-কে যদি রীতি বলা হয় তবে তা কিছুটা অস্পষ্টতা থেকে যায়। কারণ রীতি শব্দটি একার্থে নয় অনেকার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রীতি বলতে পদ্ধতি, প্রথা ও প্রকৃতি ইত্যাদিকেও বোঝানো হয়ে থাকে। অন্যদিকে সংস্কৃতে রীতিবাদী আলংকারীকগণ রীতির ভিন্নমাত্রা যোযনা করেছেন। সাহিত্য সমালোচনায় মন্ময় বিষয়কে উপেক্ষা করে স্টাইলিস্টিক বয়ানের বস্তুবাদী বিশ্লেষণের মাধ্যমে তন্ময় উপাদানকেই বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তাই এখানে ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ এবং লেখক ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করে থাকে। সংস্কৃত ধ্বনিবাদ বা রসবাদ Style-এর মধ্যে পড়ে না। তাই সমালোচকগণ রীতি অপেক্ষা 'শৈলী' পরিভাষাটিকেই বিশেষ রূপে গ্রহণ করেছেন।

এই 'Style' শব্দটির বাংলা পরিভাষা হিসেবে শৈলী শব্দটির বহুল প্রচলিত। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অভিধানে শৈলীর দুটি অর্থ দেখতে পাওয়া যায়।

ক. শীল বা স্বভাব খ. প্রজ্ঞপ্তি বা সংকেতভেদ।

আবার জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' গ্রন্থে শৈলী শব্দের অর্থ হল

ক. সদ্ব্যবহার বারচনাকৌশল খ. রচনারীতি বা ধারা।

এই সমস্ত দিক বিচার করে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান কৃত শেষ অর্থটিকে শৈলীর অভিধা ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য বলে মনে করেন সমালোচকগণ।

অষ্টাদশ শতকে ড্রাইডেন বলেছিলেন –

'ভাষা চিন্তার পোশাক (Language is the dress of thought) এবং স্টাইল পোশাকের নির্মিতি(Style is the particular cut and fashion of the dress)'[১]

তাঁর মতে ভাষার বিশেষ নির্মিতি বা স্টাইল হবে সম্পূর্ণ বিষয়কেন্দ্রিক, বিষয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্টাইলেরও পরিবর্তন হবে। এবং স্টাইল হবে ব্যক্তির রুচির অনপেক্ষ। পরবর্তীকালে স্টাইল সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে অনেকেই কবি-সাহিত্যিকের ব্যক্তিসত্ত্বার বিশেষ প্রকাশকেই স্টাইল বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এই স্টাইল সম্পর্কে ব্যুফঁ (Buffon) বলেছে- 'style is the man himself'[২]। শোপেনহায়ার (Schopenhauer) বলেন - 'physioghomy of mind'[৩].

পাশ্চাত্যে শৈলী বিজ্ঞানের চর্চায় মূলত দুটি ধারা বর্তমান ছিল একটি ভাষাবিজ্ঞানের অন্যটি সাহিত্য সমালোচনার। উনিশ শতকের পূর্বে সাহিত্য সমালোচনার মধ্য দিয়ে শৈলী আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু উনিশ শতকের চারের দশকে লিও স্পিৎজর (Leo Spitzer)প্রথম ভাষাবিজ্ঞানের মাধ্যমে শৈলী বিচারে অগ্রসর হন। এরপরে ভাষাবিজ্ঞানী সসুর তাঁর আলোচনায় প্রথম Langue এবং Parlo-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। Langue বলতে তিনি বলেছেন ভাষার এমন একটা রূপ যা ব্যক্তি ব্যবহার করতে পারেন কিম্বা বলা যেতে পারে ভাষার আদর্শ সম্ভাবনার দিক। অন্যদিকে Parole বলতে বোঝায় ব্যবহৃত ভাষাকে। এই কারণে অনেকে মনে করেন শৈলী হল Langue-এর অন্তর্গত কিন্তু ভাষার উপাদান নির্বাচন এবং সেগুলির প্রতিস্থাপনের পর যে বাক্য গঠিত হয় সেটা Parole-এর অন্তর্গত হয়ে থাকে। এই কারণে শৈলী মূলত Langue-কে আশ্রয় করলেও Parole-কেও অস্বীকার করে না। এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধানে ব্রতি হয়েছিলেন Charles Bally.

বিংশ শতাব্দীতে নব্যসমালোচনা সাহিত্যের প্রবক্তা I.A Richards, T.S Eliat, F.R Leavis প্রমূখ ব্যক্তির দ্বারা ইংল্যান্ডে শৈলী বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। রিচার্ডস যে সমালোচনার সূচনা করেছিলেন তিনি তার নাম দিয়েছিলেন - 'প্র্যাকটিকল ক্রিটিসিজম'। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম 'Practical criticism: A study of Literary Judgement' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি কবি অপেক্ষা কবিতার

নিবিড় পাঠের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। রিচার্ড ‘Documentation’ এবং ‘Analysis’ এই দুই পন্থা দ্বারা কবিতা সমালোচনার পথে অগ্রসর হন।

পাঁচের দশকের শুরুতে আমেরিকার অন্যতম ভাষাবিজ্ঞানী হ্যারিস(Z.S Harris)১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ‘Methods in Structural Linguistics’ নামক একটি গ্রন্থটি প্রকাশ করেন এবং ওই একই সময়ে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ট্র্যাগার (G.L Tragar) তাঁর ‘Outline of English Structure’ নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এই দুই গ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে অবয়ববাদ (Structuralism)-এর ধারণাটি পরিপূর্ণতা লাভ করে। অবয়ববাদকে কেন্দ্র করেই বাক্যের গঠন বিশ্লেষণে ব্যাকরণগত সীমাবদ্ধতা নিয়ে সমালোচনার সূত্রপাত হয়। বাক্য গঠন এবং বিশ্লেষণ নিয়ে এই শতাব্দীর শেষের দিকে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে হ্যারিসের শিষ্য নোয়াম চমস্কি ‘Syntactic Structures’ নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থেই প্রথম Transformational and generative Grammar সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। T.G Grammar-এর দ্বারা বাক্যকে দেখোান হলো-

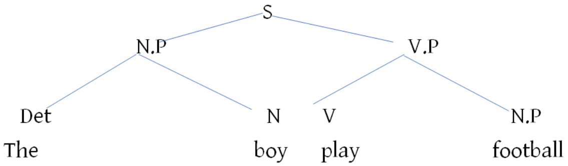

S = Sentence N.P = Noun Phrase
V.P = Verb Phrase Det = Article

এইভাবে শৈলীবিজ্ঞানে এক নতুন দিক উন্মোচিত হলো সুতরাং ভাষাবিজ্ঞানের পথকে অনুসরণ করে শৈলী বিজ্ঞানে মূলত দুটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করে ১. সংবর্তনী সংযোজনী ব্যাকরণ (Transformation and generative grammar) ২.বাক্য ও শব্দের অর্থ (semantic)

‘Style is to the writer what colour is to the printer’[৪]এমনটি বলেছিলেন Stephen Ullman তাঁর ‘meaning and style’ গ্রন্থে। চিত্রশিল্পী রঙের মতোই লেখকের কাছে তার শৈলীর ভূমিকা এমনটি মনে হয়েছিল তাঁর। ভারতীয় আলংকারিকগণ ব্যক্তিগত শৈলীকে সেইভাবে প্রাধান্য না দিলেও তাঁরা রীতি সম্পর্কে বলেছিলেন ‘রীতিষু রেখাস্বিবং চিত্রং কাব্যং প্রতিষ্ঠিতম’ এর থেকে মূলত এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শৈলী হল একটি ব্যক্তিগত বিষয়।কিন্তু এই ব্যক্তিগত শৈলী বা ভাব প্রকাশের উপায় বলতে ঠিক কী বোঝায় তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়নি। তাই কোনোকোনো সমালোচক বলে থাকেন চিরাচরিত বাক্যের গঠন ও শব্দের ব্যবহার গত দিক থেকে সরে আসা আবার কেউ কেউ বলে থাকেন নিয়মের পারবশ্যতা থেকে বিচ্যুতি। কেননা প্রতিভাধর শিল্পী সাহিত্যিক কখনো যুগের প্রচলিত রীতির আনুগত্য

স্বীকার করেননা। শব্দের মধ্য দিয়ে তারা তাদের মনের ভাবকে সাহিত্যাকারে প্রকাশ করে থাকেন নতুন ভাবে। তাই শব্দ হয়ে ওঠে তাদের ভাব ব্যঞ্জনার একমাত্র সোপান।

আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে শব্দের দুটি অর্থের কথা বলা হয়েছে Lexical meaning and structural meaning।আবার অন্য দিক থেকে দেখলে শব্দকেও দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায় full word এবং Function word. আধুনিক শৈলীবিজ্ঞান তাই শব্দের ধ্বনিগত, রূপগত ও অর্থগত দিককে বিচার করে থাকে। শৈলীবিজ্ঞানে ধ্বনিগত আলোচনায়দুটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ১. primary onomatopoeia ২. Secondary onomatopoeia.

'Meaning and style' গ্রন্থে Stephen Ullman বলেছেন—
'Onomatopoeia, sound symbolism, phonaesthetic effects and kindred phenomena are part of the fabric of poetry, and although a recent monograph has uttered a salutory waring against auto suggestion and fanciful speculations, there remains one of the most active area of style study.'[৫]

শৈলীর আলোচনার ক্ষেত্রে আরো যে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেগুলি হল সমাজ ভাষাবিজ্ঞান এবং মনস্তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞান। সামাজিক পরিবেশ এবং ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক ভাবনাচিন্তা এক নতুন শৈলীর সৃষ্টি করতে পারে।ফলে সামাজিক পরিবেশ ও মনস্তত্ত্ব ভাষা ব্যবহারকারীর শৈলী বদলে দিতে পারে। সেখানে ক্রিয়াশীল থাকে Memory, motivation, perception ইত্যাদি বিষয়গুলি। এই বিষয়গুলির দ্বারাই লেখকের বিশেষ শৈলী গড়ে ওঠে। তবে এসবের মূলে রয়েছে নির্বাচন(Choice), আদর্শ গঠন থেকে বিচ্যুতি(Deviation), উদ্ভাসন(Focussing), প্রমুখন(Foregrounding) প্রভৃতি বিষয়।

নির্বাচন (Choice):

সাধারণত আমরা যে ভাষায় কথা বলে থাকি অর্থাৎ যাকে বলা হয় মৌখিক ভাষা সেই মৌখিক ভাষাকে কবি সাহিত্যিকরা তাঁদের কাব্যের মধ্যে ব্যবহার করে থাকেন না। কাব্যের ক্ষেত্রে কবি সাহিত্যিকরা বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে থাকেন যাকে বলা হয় কাব্যিক শব্দ। কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যই কবিরা বিশেষত্ এই ধরনের কাব্যিক শব্দের প্রয়োগ করে থাকেন। যার মধ্য দিয়ে কাব্যের ভাষা মৌখিক ভাষা থেকে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।ভাষার মধ্য দিয়ে কবি আবেগ, অনুভূতি, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, সংবাদ প্রভৃতি বিষয়কে রূপ দান করে থাকেন। আর এই সমস্ত কিছুকে একত্রিত করে কবি সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকেন। এই কারণে কবিকে কতগুলি কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যার প্রথম ধাপটি হল নির্বাচন। এই নির্বাচন দুই প্রকার হতে পারে বৈকল্পিক ও আন্বয়িক। আমাদের শব্দ ভাণ্ডারে একই প্রকার বহু শব্দের সমাবেশ রয়েছে। কবি তাঁর কাব্যের উপযুক্ত কোনো একটি শব্দকে বেছে নিয়ে অন্য শব্দকে উপেক্ষা করে যান।

কবির মনোনীত এই শব্দ নির্বাচন প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় বৈকল্পিক নির্বাচন। কেবলমাত্র শব্দ চয়ন করলেই হয় না। নির্বাচিত সেই শব্দটিকে যথাযথভাবে বাক্যে প্রয়োগ করতে হবে যার দ্বারা ওই বাক্যটি চমৎকারিত্ব লাভ করতে পারে অর্থগতভাবে এবং অন্বয়গতভাবে। ফলেওই বাক্যটি কাব্যের যথাপ্রযুক্ত হয়ে উঠবে। একেই বলা হয় আন্বয়িক নির্বাচন। যেমন-

বিশেষণ:

১. মরু কঠিন হাওয়া। ['ঢেউ', কবিতা সমগ্র-১, পৃষ্ঠা- ১১]

২. ত্রিকূটের ম্লান চূড়া। ['সাঁওতাল পরগনার বর্ষা', কবিতা সমগ্র-১,পৃষ্ঠা- ১১]

বিশেষ্য:

১. আশার নিবিড় মোহে
ভালো প্রাণবারি। ['গ্রীষ্মের প্রার্থনা', কবিতা সমগ্র- ১, পৃষ্ঠা- ১৫]

২. হিজলের ফ্রেমে ফুটে ওঠে শিশু সূর্যের মুখ। ['পূর্বরাগ',কবিতা সমগ্র- ১, পৃষ্ঠা- ২০]

ক্রিয়া:

১. এবারে সব কথা সাঙ্গ করো। ['শীত সায়াহ্ন', কবিতা সমগ্র- ১, পৃষ্ঠা- ১৮]

২. তোমার বিহঙ্গ মন আনন্দের পাখায় উড্ডীন। ['অন্বেষণ', কবিতা সমগ্র- ১, পৃষ্ঠা-২৭]

ক্রিয়া বিশেষণ:

১. মগ্ন হয়ে দেখা যায়। ['বারান্দা', কবিতা সমগ্র- ১, পৃষ্ঠা- ৫২]

২. ত্রস্ত পায়ে
নিচে নেমে আর এক বিস্ময়। ['হেলং', কবিতা সমগ্র- ১, পৃষ্ঠা- ৫৫]

বিচ্যুতি(Deviation):

প্রতিটি ভাষায় বাক্য গঠনের একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকে। এই নিয়মকে অনুসরণ করেই ওই ভাষার বাক্য গঠন হয়ে থাকে। যেমন - বাংলা বাক্যের স্বাভাবিক গঠন প্রবণতা রয়েছে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া। বাংলা বাক্যের এই নিয়মকে মেনে নিয়ে যদি বাক্য গঠন করা হয় তখন তাকে বলা হবে বাক্যের আদর্শ গঠন। কিন্তু কবি সাহিত্যিকেরা অনেক সময় প্রথাগত এই নিয়মকে অস্বীকার করে বাক্য গঠন করে থাকেন। ফলে আদর্শ গঠন থেকে তাদের বাক্য বিচ্যুত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াটিকেই শৈলী বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় বিচ্যুতি। বিচ্যুতি প্রসঙ্গে প্রথমআলোচনা করেন প্রাগ ভাষা বিজ্ঞানী J.Mukarovsky। তাঁর মতে কবিতার ভাষা সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণের তুলনায় সব থেকে বেশি বিপর্যস্ত এবং বিচ্যুত। কবিতা গঠনের মূল ভিত্তি এই বিচ্যুতি। সাহিত্যে প্রযুক্ত বাক্যের শব্দগুলির বিচ্যুতি ঘটে তাদের অবস্থানে। যেমন কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া এদের স্থান পরিবর্তন ঘটে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থান বা আদর্শ গঠনে যেখানে যে পদটি বসার কথা বিচ্যুতির ফলে সেই পদটি তার স্থান পরিবর্তন করে থাকে। আবার অনেক সময় কিন্তু, এবং, বরং প্রভৃতি শব্দ দিয়েও কবিতা শুরু হয়ে থাকে।

বিচ্যুতি নির্ণয়:

১. আদর্শ গঠন - গল্পের রাজা বাস্তবের প্রকাশ্য রাস্তায় নেমেছে।
বিচ্যুতি - নেমেছে গল্পের রাজা বাস্তবে প্রকাশ্য রাস্তায়। ['উলঙ্গ রাজা', কবিতা সমগ্র- ২, পৃষ্ঠা- ১৩]

২.আদর্শ গঠন - নিদ্রার মুহূর্তে এই শুধু আমার শেষ প্রার্থনা।
বিচ্যুতি - নিদ্রার মুহূর্তে শুধু এই শেষ প্রার্থনা আমার। ['এখন প্রার্থনা', কবিতা সমগ্র- ২, পৃষ্ঠা- ১৫]

৩. আদর্শ গঠন - প্রকৃতির ভিতরে ব্যাধির ওষুধ আছে।
বিচ্যুতি - ব্যাধির ওষুধ আছে প্রকৃতির ভিতর। ['প্রকৃতির বচন', কবিতা সমগ্র- ২, পৃষ্ঠা- ১৭]

প্রমুখন(Foregrounding):

কবি তাঁর কবিতার মধ্যে যখন কোনো বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে চান তখন তিনি বাক্যে অবস্থিত পশ্চাদের বিষয়কে সম্মুখে স্থাপন করে থাকেন। এর ফলে যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে সেই বিষয়টি পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়। সাধারণত বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে এই প্রমুখনের উদ্দেশ্য পূরণ করে থাকেন কবি সাহিত্যিকগণ। বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন প্রমুখনের সৃষ্টি হয় তেমনি অন্যদিকে সৃষ্টি হয়ে থাকে উদ্ভাসনের।

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা থেকে প্রমুখনের কতগুলি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো-

১.বুড়ো ওই মানুষটি স্থির হয়ে বসে আছে বিকেল বেলায়
রাস্তার একপাশে তার বাড়ির সিঁড়িতে
হাটুভাঙা দ-এর মতন। ['বুড়ো মানুষটি', কবিতা সমগ্র- ৩, পৃষ্ঠা- ২৪৭]

২.তোমার কাছে আসতে হলো
বিশ্বভুবন ঘুরে। ['সন্ধ্যাবেলায়',কবিতা সমগ্র- ৫, পৃষ্ঠা- ১৮]

ক্রিয়া প্রমুখন:

১. সন্ধ্যাবেলায় বসে আছি
একলা নদীর ধারে। ['নদীর ধারে',কবিতা সমগ্র- ৫, পৃষ্ঠা- ২০]

২.রয়েছে চোরাবালির ভয়
সবাই সেটা জানে, ['হাট-ফিরতি', কবিতা সমগ্র- ৫, পৃষ্ঠা- ৮৩]

উদ্ভাসন (Focussing):

কবি তাঁর কবিতার মধ্যে যখন কোনো বিষয়ের উপরে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন তখন তিনি এক বা একাধিক উপাদান সংযুক্ত করে থাকেন। উপাদানের সংযুক্তিকরণের ফলে কবির অভিপ্রেত বিষয়টি পাঠকের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। এই উদ্ভাসন শব্দের দ্বারা, পঙক্তি সজ্জার দ্বারা আবার কখনো ছেদ-যতি চিহ্নের দ্বারাও হতে পারে।

কতগুলি উদাহরণের সাহায্যে উদ্ভাসনটিকে দেখানো হলো-

১.কিছুটা ছাড়বো যেমন
বাকিটা ঝাপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে নেব। ['এবারে অন্য রকম', কবিতা সমগ্র-১ পৃষ্ঠা- ২০৩]

এখানে 'কিছুটা', 'বাকিটা' শব্দ দুটির পরে যে ছাড় দেওয়া রয়েছে তার মধ্য দিয়ে 'কিছুটা' এবং 'বাকিটা' শব্দ দুটি উদ্ভাসিত হয়েছে।

২.রাত্রিগুলি
এখনো বাঘের মত পিছু নেয়।
স্বপ্নগুলি
এখনো নিদ্রার পিঠে ছুরি মেরে
হেসে ওঠে। ['যুদ্ধক্ষেত্রে এখনো সহজে', কবিতা সমগ্র- ১, পৃষ্ঠা- ২০৮]

এখানে প্রথম পঙক্তিতে এবং তৃতীয় পঙক্তিতে কেবলমাত্র একটি করেই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলি হলো 'রাত্রিগুলি' এবং 'স্বপ্নগুলি'। ওই শব্দ দুটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার জন্যই কবি এইভাবে পঙক্তি সজ্জা করেছেন।

৩.এবং তোমারও থাকা চাই। ['ঘর বদল কবিতা', কবিতা সমগ্র- ১, পৃষ্ঠা- ২২৩]

এখানে 'এবং' শব্দটির দ্বারা পরবর্তী 'তোমারও' শব্দটির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সমান্তরালতা (parallelism):

সমান্তরালতা এক ধরনের বিশেষ ভাষা ব্যবহারের রীতি যা একই প্যাটার্নের একাধিক বাক্যের পরপর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়। গদ্য এবং পদ্য উভয় প্রকার রচনার মধ্যেই সমান্তরালতা দেখা যায়। সমান্তরালতা সম্পর্কে প্রথমবিধিবদ্ধ আলোচনা করেন ব্রিটিশ ভাষাবিজ্ঞানী হ্যালিডে এবং লিচ। লিচ পুনরুক্তিকেও সমান্তরালতার অন্তর্গত বলেছেন। এই মতে অনুসরণ করেছেন শিশির কুমার দাস। তবে গভীরভাবে বিষয়টিকে বিচার করলে দেখা যাবে পুনরুক্তি ঠিক সমান্তরালতা নয়। এই কারণে ধ্রুবপদকেও সমান্তরালতার অন্তর্গত ধরা হয় না। সমান্তরালতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাক্যগুলির আধোগঠনে (D.S) অর্থের পার্থক্য থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি দুটি বাক্যের বাহ্যগঠন একই প্রকারের হয়ে থাকে কিন্তু আধোগঠনে অর্থের পার্থক্য থাকে এবং ওই বাক্য দুটি যদি একই Operator-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে ওই বাক্য দুটির মধ্যে সমান্তরালতা রয়েছে এমনটা বলা যেতে পারে।

সমান্তরালতা রয়েছে এমন বাক্যের গঠন প্রক্রিয়া নির্ণয় করতে যে তত্ত্বের সাহায্য নেওয়া হয় তা হল Parallel constant and operator binding theory বা P.C.O.B Theory। সমান্তরালতা রয়েছে এমন বাক্যের একটি অংশ থাকে নিয়ন্ত্রক Operatorএবং অপর অংশগুলি parallel constant হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একটা

অংশ যখন নিয়ন্ত্রকের বা operator ভূমিকা পালন করে অপর অংশগুলি তখন সংযুক্তির বা binding কাজে নিযুক্ত থাকে।

উদাহরণ-

১. কি করে সমস্ত পাতা কুঁকড়ে গিয়েছিল → Parallel Constant
কি করে সমস্ত ডাল ঝলসে গিয়েছিল → Parallel Constant
কি করে সমস্ত গাছ ভয়াবহ ভাবে → Parallel Constant
বেঁকে দুমড়ে গিয়েছিল,
আর কিছুক্ষণ পরেই তার বিবরণ জানতে পারবেন আপনারা। → Operator

['জ্বলন্ত EXIT', কবিতা সমগ্র- ১, পৃষ্ঠা- ১৫২]

২. পৃথিবীর সমস্ত কাঠুরিয়াকে ভয় পাইয়ে দিয়ে → Operator
এখন তোমাদের চেঁচিয়ে ওঠবার সময়। → Parallel Constant
এখন তোমাদের বলবার সময়: → Parallel Constant
দূরে যাও।

['বনের মধ্যে ঝড়', কবিতা সমগ্র - ২, পৃষ্ঠা - ৫৮]

১০. সেই রাজবাড়িতে → Operator
যে কতকগুলি মহল ছিল, আর → Parallel Constant
কতকগুলি ঘর, → Parallel Constant
কতগুলি চোরা-কুঠুরি, আর → Parallel Constant
কতকগুলি চত্বর, → Parallel Constant
কতগুলি সিঁড়ি, আর → Parallel Constant
কতকগুলি বারান্দা, → Parallel Constant

['রাজবাড়ি', কবিতা সমগ্র- ৩, পৃষ্ঠা- ১২৫]

তথ্যসূত্র:

আকরগ্রন্থ:

১. চক্রবর্তী নীরেন্দ্রনাথ, 'কবিতা সমগ্র-১',১৯৯২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,
২. চক্রবর্তী নীরেন্দ্রনাথ, 'কবিতা সমগ্র-২',১৯৮৫, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,
৩. চক্রবর্তী নীরেন্দ্রনাথ, 'কবিতা সমগ্র-৩',১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,
৪. চক্রবর্তী নীরেন্দ্রনাথ, 'কবিতা সমগ্র-৫',২০০৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,

সহায়ক গ্রন্থ :

১. রায়, অপূর্ব কুমার, শৈলীবিজ্ঞান, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-১৫
২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬
৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬
৪. মাইতি, প্রকাশ কুমার, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা,কলকাতা, আরামবাগ বুকহাউস, ২০০০, পৃষ্ঠা- ২৭৩
৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭৬

‘বহুরূপী’ নাট্য পত্রিকার সম্পাদক প্রভাতকুমার দাস

মিলন সিংহ
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ

সারসংক্ষেপ : নাট্যকার শম্ভু মিত্র ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’ থেকে বেরিয়ে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, কলিম শরাফি, মহম্মদ ইসরাইল, সত্যজীবন ভট্টাচার্য, জলদ চট্টোপাধ্যায়, ললিতা বিশ্বাস, ঋত্বিক ঘটক, রবীন মজুমদার, অরীন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শোভেন মজুমদার, মুক্তি গোস্বামী ও তৃপ্তি মিত্র প্রমুখকে নিয়ে নতুন নাট্যদল গঠন করেন যার নাম ‘বহুরূপী’।পরবর্তীকালে আরও অনেকে যোগ দেন।‘বহুরূপী’ নাট্যদলের সূচনা হয়েছিল ১৯৪৮ সালে।‘বহুরূপী’ নাট্যদলের একটি কর্মসূচি ছিল নাট্য পত্রিকা প্রকাশ করা। অবশ্য নাট্য পত্রিকাটির নামকরণ দলীয় নামানুসারেই হয়। পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যার পৃষ্ঠা দেখলে বোঝা যায়, পত্রিকাটি বাংলা নাটক সাহিত্য এবং নাট্যচর্চার ধারাকে বহন করে নিয়ে গেছে।বাংলা নাট্য পত্রিকার ইতিহাসে ‘বহুরূপী’ নাট্য পত্রিকা সর্বোচ্চ দীর্ঘায়ু নাট্য পত্রিকা। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালের মে মাসে। পত্রিকাটি অনেকেই সম্পাদনা করেছেন মূলত এখানে বহুরূপী নাট্য পত্রিকার সূচনাপর্বটি ছুঁয়ে সম্পাদক প্রভাতকুমার দাসের সময়পর্বটি আলোকপাত করা হয়েছে।
সূচক শব্দ : বহুরূপী নাট্যদল, বহুরূপী নাট্য পত্রিকা, গঙ্গাপদ বসু, কুমার রায়, প্রভাতকুমার দাস।

‘বহুরূপী’ নাট্যদলের সূচনা হয়েছিল ১৯৪৮ সালে। ‘বহুরূপী’ নামকরণের পূর্বে ‘বহুরূপী’র সূচনা পর্বের একটি ইতিহাস রয়েছে। প্রসঙ্গত গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসটি বর্ণনা করেছেন বহুরূপী নাট্যদলের সম্পাদক অশোক মজুমদার:

> বহুরূপীর ইতিহাস পাঁচ বছরের; কিন্তু তার কাহিনী সুরু করা যায় আরও দু’বছর আগে থেকে কয়েক জনের মনভূমিতে ‘বহুরূপী’ জন্ম নিয়েছিল দু’বছর আগেই।...
>
> ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি পার্কসার্কাসের একটা ঘরে শম্ভু মিত্রকে কেন্দ্র করে কিছু লোক জড় হয়েছিলেন। কয়েকজন ছিলেন গণনাট্য সংঘের ভূতপূর্ব্ব সভ্য আর বাকী সব নতুনের দল। সেপ্টেম্বর মাসে তাঁরা রংমহলে তিন রাত ‘নবান্ন’ অভিনয় করলেন।[১]

'কিছু লোক' বলতে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, কলিম শরাফি, মহম্মদ ইসরাইল, সত্যজীবন ভট্টাচার্য, জলদ চট্টোপাধ্যায়, ললিতা বিশ্বাস, ঋত্বিক ঘটক, রবীন মজুমদার, অরীন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শোভেন মজুমদার, মুক্তি গোস্বামী ও তৃপ্তি মিত্র প্রমুখ। 'বহুরূপী'র 'নবান্ন' অভিনয়ে পুলিশের অনুমতি নিতে গিয়ে আমন্ত্রণ পত্রে দলের নাম ছাপা হয়েছিল 'অশোক মজুমদার সম্প্রদায়'।[২] কিন্তু ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় আবার 'নবান্ন'র অভিনয় হল। এরপর ১৯ সেপ্টেম্বর তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক' পড়া হল অভিনয়ের জন্য। প্রথম অভিনয় হয় ১৬ অক্টোবর ১৯৪৯ সালে।[৩] তখনও দলের নামকরণ 'বহুরূপী' হয়নি। এ প্রসঙ্গে বহুরূপী'র অমর গাঙ্গুলীর মন্তব্য স্মরণযোগ্য :

> বহুরূপীর জন্মদিন যে ১লা মে ১৯৪৮ সেটা কে বললো? সেটা কবে ঠিক হয়েছে -১লা মে ১৯৪৮ সালেই কি? না জন্মদিন যে ১লা মে সেটা ঠিক হয়েছিল ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে।... ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে কিছুদিন এদিক-ওদিকের হিসাবের গড় করে ঠিক করা হলো, আমরা ১লা মে-তেই জন্মেছি। ১লা মে দিনটাতো বিশেষ।[৪]

অর্থাৎ ১৯৫০ সালের মে মাস থেকে অশোক মজুমদার সম্প্রদায়' থেকে 'বহুরূপী' নাট্যদলের নামকরণ হয়েছিল। অবশ্য 'বহুরূপী' নামকরণ দলের সকল সদস্য মিলেই ঠিক করেছিলেন।এই প্রসঙ্গে অশোক মজুমদারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> .. একজন নাম দিয়েছিল 'শিল্পায়তন', তারপরেতে 'নাট্যশিল্প সম্প্রদায়' এরকম নানান রকম নাম সব আসতে লাগল। তার মধ্যে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বললেন যে, আমরা তো রং চং মেখে নাটক করব সব বাইরে – আগেকার দিনে সব বহুরূপী সম্প্রদায় ছিল – তারা যেমন রং-টং মেখে সব গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে নানান রকম অভিনয় করত, দেখাত, অভিনয় – তা আমরাও তো বহুরূপীর দল। আমরাও তো সেইরকমই করব। বলে উনি বলেন যে 'বহুরূপীর দল' নাম হোক। তখন আমি সাজেস্ট করি যে, দল কথাটা বাদ দিন। ... সকলেই বলে, ঠিক আছে, তাহলে নাম বহুরূপী হোক।[৫]

শিশু জন্মানোর ঠিক পরে যেমন নামকরণ হয়ে থাকে ঠিক 'বহুরূপী' নাট্যদলের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। শুধু 'বহুরূপী' নাট্যদলের নামকরণ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য করেননি তিনি দলের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন বহুরূপীর:

> 'দেখ, তোমাদের কথা জানবার একটা আগ্রহ লোকের হয়েছে, কিন্তু জানবে কি করে? এই জন্যেই কাগজ একখানা থাকা খুব প্রয়োজন। [৬]

'বহুরূপী' নাট্যদলের কাগজ অবশ্য প্রকাশিত হয়েছিল 'বহুরূপী' নামেই।নাট্য পত্রিকার পাঠক সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে চলেছে বছরের পর বছর। সমসাময়িক নাট্য সংস্কৃতির ইতিহাস এবং বাংলা নাটক সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনায়

'বহুরূপী' নাট্য পত্রিকা তার স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে। 'বহুরূপী' নাট্য পত্রিকাটির মধ্য দিয়ে নাট্যচর্চার একটি দীর্ঘ ইতিহাসকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রথমেই আমরা 'বহুরূপী' নাট্য পত্রিকার প্রথম তিনটি সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করে নেবো। কারণ এই তিনটি সংখ্যাতে কোনো সম্পাদকের নাম প্রকাশিত হয়নি। সাধারণত একটি প্রকাশিত পত্রিকায় কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় :

১) আলাদা করে পত্রিকার প্রকাশকাল দেওয়া।

২) পত্রিকায় সম্পাদকের নাম প্রকাশ করা।

৩) পত্রিকায় প্রচ্ছদকারের নাম উল্লেখ করা।

৪) পত্রিকায় সূচিপত্র রাখা।

৫) পত্রিকাটি কোন স্থান থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রকাশক কারা তা বিস্তারিতভাবে জানানো।

৬) পত্রিকা সংগ্রহের মূল্য উল্লেখ করা।

'বহুরূপী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় এই ছ'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কোনোটিই উল্লেখ নেই। অর্থাৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি দলের একটি স্মারক পুস্তিকা। পত্রিকা প্রকাশের তারিখ পাওয়া যায় শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'বহুরূপী' প্রবন্ধের একেবারে সমাপ্তি অংশে। প্রকাশের তারিখ ছিল '১লা মে, ১৯৫৫।'[১৬] তারিখ থেকেই নির্দিষ্ট হয় 'বহুরূপী' নাট্য পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালে ১লা মে। প্রসঙ্গত দ্বিতীয় সংখ্যায় অমর গাঙ্গুলীর 'আমাদের কথা'-য় লিখেছেন:

> শেষ পর্যন্ত 'বহুরূপীর' দ্বিতীয় সংখ্যা বার করা গেল। প্রথম সংখ্যার পর এক বছর গত হয়েছে। প্রথম সংখ্যায় আমরা অনেক আশা আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়ে ছিলাম। বলেছিলাম উৎসাহ পেলে 'বহুরূপী' নিয়মিত বার করার চেষ্টা করবো।[৭]

অবশ্য উৎসাহের কথা শুনিয়ে ছিলেন গঙ্গাপদ বসু:

> 'দৈনিক নয়, সাপ্তাহিক নয়, মাসিক নয় – আমাদের পত্রিকা নিতান্তই আকস্মিক। দরদীর কাছ থেকে উৎসাহ পেলে নিয়মিত ভাবে পত্রিকা প্রকাশের কল্পনা তো রয়েছেই – কেননা আমরা বিশ্বাস করি দরদীদের আগ্রহ এবং উৎসাহই যে-কোনো শিল্প সংস্থার অগ্রগতির পথের পাথেয়।'[৮]

পত্রিকার চরিত্র কেমন হবে তা নির্ধারণ করা হয়নি। 'বহুরূপী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার মতো দ্বিতীয় সংখ্যাতেও প্রকাশ কাল, সূচিপত্র, সম্পাদক এবং প্রচ্ছদকারের উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র অর্থমূল্য, প্রকাশক ও প্রকাশস্থান দ্বিতীয় সংখ্যায় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় সংখ্যাতেই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানানো হল :

> এ পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগটা আমাদের – বাংলা দেশে প্রথম থিয়েটার প্রসঙ্গে সত্যকার কিছু বলবার এবং শোনবার প্রচেষ্টায়। কিন্তু এ পত্রিকা শুধু বহুরূপীর মতামত প্রকাশের জন্যই নয় – যাঁরাই এ সমস্যা নিয়ে ভেবেছেন

> এবং সমাধানের সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের সকলের মতামতের স্বাতন্ত্র্যকেই আমরা মর্য্যাদা দিতে চাই।[৯]

এই সংখ্যাতেই পত্রিকার চরিত্র সম্পর্কে দলীয় সম্পাদক অমর গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করলেন:

> এই সংখ্যা নিয়ে 'বহুরূপী' দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হলো। আমাদের অনেকদিনের ইচ্ছে নিয়মিত আমাদের কাগজ প্রকাশ করা, যার মাধ্যমে আমাদের কথা আপনাদের জানাতে পারবো এবং আপনাদের কথা আমরা জানতে পারবো, যেখানে সহজভাবেই সমস্ত আলাপ আলোচনা চালানো যেতে পারবে। - তাই আমরা ঠিক করেছি এবার থেকে ষাণ্মাসিক ক্রমে আমারা 'বহুরূপী' প্রকাশ করবো। পরবর্তী সংখ্যা বেরুবে 'ডিসেম্বর' ৫৬-এ।[১০]

অর্থাৎ পত্রিকাটি দৈনিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক নয় ষাণ্মাসিক। 'বহুরূপী' নাট্য পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যাকে চিহ্নিত করা হয় সংখ্যামান দ্বারা। তার সূচনা হয়েছে তৃতীয় সংখ্যাতে। সেই সঙ্গে সূচিপত্রও প্রথম ছাপা হয়। কিন্তু সম্পাদক, প্রচ্ছদকার ও প্রকাশ সালের উল্লেখ তৃতীয় সংখ্যাতেও দেখা গেল না। বহুরূপীর বিভিন্ন সালের কার্যনির্বাহক সমিতির প্রকাশ কালের তথ্য থেকেও পত্রিকা প্রকাশের তথ্য নির্দিষ্ট করে নেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে বহুরূপী নাট্য পত্রিকার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংখায় ১৯৫৬ সালের কার্যনির্বাহক সমিতির উল্লেখ রয়েছে। আর বহুরূপী যেহেতু 'ষাণ্মাসিক' পত্রিকা অর্থাৎ ১৯৫৬ সালেই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংখ্যায় কার্যনির্বাহক সমিতির বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি 'বহুরূপী অভিনীত নাটকাবলী' বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। এই বিজ্ঞাপনের শেষ অভিনীত নাটক অজিত গাঙ্গুলীর 'নাট্যকারের বিপত্তি', প্রথম অভিনয়ের তারিখ '২রা মে '৫৬'। সুতরাং দ্বিতীয় সংখ্যাটি ১৯৫৬ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। আর দ্বিতীয় সংখ্যায় অমর গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন 'পরবর্তী সংখ্যা বেরুবে 'ডিসেম্বর' ৫৬-এ'। অর্থাৎ তৃতীয় সংখ্যাটি ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসেই প্রকাশিত হয়েছিল। অথচ এই পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক প্রভাতকুমার দাস তাঁর "'বহুরূপী' পত্রিকা : শততম সংখ্যা পর্যন্ত সূচি" প্রবন্ধে প্রথম তিনটি সংখ্যার 'সংখ্যানুক্রমিক তথ্যে' সম্পাদক, প্রচ্ছদকার এবং প্রকাশ সালের তথ্য জানিয়েছেন।[১১] কোনোরকমভাবে প্রমাণসহ তথ্যের উল্লেখ করেননি। আবার তিনিই তাঁর 'প্রসঙ্গ: 'বহুরূপী' নাট্য পত্রিকা' গ্রন্থে জানাচ্ছেন:

> প্রথম তিনটি সংখ্যা সম্পাদকহীন; চতুর্থ সংখ্যা থেকে থেকে পঁয়ত্রিশ সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক গঙ্গাপদ বসু।[১২]

তথ্যের বিভ্রান্তি ঘটেছে। এ বিষয়ে প্রসঙ্গত বহুরূপী পত্রিকার সম্পাদক কুমার রায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> ... পত্রিকার প্রতিসংখ্যার বিষয় বস্তু এবং লেখক সূচী, রচনাপঞ্জী, চিত্রপঞ্জী ইত্যাদি উল্লেখ করে পত্রিকার পঞ্জী প্রকাশ করা আমাদের প্রকল্পের অন্যতম বিষয়। এ কাজ শ্রমসাধ্য। সেই শ্রমসাধ্য পঞ্জী প্রস্তুত করে দিয়েছেন 'বহুরূপী' পত্রিকার এক গভীর মনোযোগী পাঠক – শ্রীপ্রভাতকুমার দাস। এই পঞ্জী রচনায় তিনি যোগ্য স্বীকৃতি রীতিটি গ্রহণ করেছেন। মূলত: পত্রিকায় মুদ্রিত এবং ঘোষিত তথ্যই তিনি সংকলিত করেছেন।[১৩]

অর্থাৎ সম্পাদক প্রভাতকুমার দাস 'ঘোষিত তথ্য' ব্যবহার করেছেন। আর সেখানেই প্রাথমিক তথ্যের ত্রুটি ঘটেছে। 'ঘোষিত তথ্যে'র কোনো প্রামাণ্য থাকে না। আমরা মূলত পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যকেই প্রাধান্য দেবো। চতুর্থ সংখ্যাটি সে দিক থেকে অনেকখানি সম্পূর্ণ। সম্পাদক হিসেবে নাম দেখা গেল গঙ্গাপদ বসুর। এই সংখ্যা থেকেই পত্রিকা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যই উল্লেখ করা হলেও প্রচ্ছদকারের নাম দেওয়া নেই। চতুর্থ সংখ্যা থেকে পঁয়ত্রিশ সংখ্যা (১ মে ১৯৫৭ – সেপ্টেম্বর ১৯৭০) পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন গঙ্গাপদ বসু। ছত্রিশ সংখ্যা থেকে ঊনপঞ্চাশ সংখ্যা (সেপ্টেম্বর ১৯৭১ – মে ১৯৭৮) পর্যন্ত শম্ভু মিত্র সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু তেত্রিশ সংখ্যা থেকে চুয়ান্ন সংখ্যা (অক্টোবর ১৯৬৯ – অক্টোবর ১৯৮০) পর্যন্ত সংখ্যাগুলির সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ। পঞ্চাশ নম্বর সংখ্যাটি (অক্টোবর ১৯৭৮) কোন সম্পাদকের নাম উল্লেখ ছিল না কিন্তু সম্পাদনা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ। একান্ন সংখ্যা থেকে একশত বারো সংখ্যা (জুন ১৯৭৯ – সেপ্টেম্বর ২০০৯) পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন কুমার রায়। বাষট্টি সংখ্যার (সেপ্টেম্বর ১৯৮৪) সম্পাদক কুমার রায়ের সঙ্গে দেবতোষ ঘোষ এর নাম দেখতে পাওয়া যায়। ৮৮ থেকে ৯৫ সংখ্যা (অক্টোবর ১৯৯৭ – মে ২০০১) পর্যন্ত সহযোগী সম্পাদক রূপে দেখা যায় রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়কে আবার ছিয়ানব্বই সংখ্যা থেকে একশত বারো সংখ্যা (অক্টোবর ২০০১ – সেপ্টেম্বর ২০০৯) পর্যন্ত নির্বাহী সম্পাদক রূপে এবং একশত তেরো সংখ্যা থেকে একশত বত্রিশ সংখ্যা (মে ২০১০ – সেপ্টেম্বর ২০১৯) পর্যন্ত প্রভাতকুমার দাস সম্পাদক ছিলেন। প্রভাতকুমার দাসের পরে বহুরূপী নাট্য পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক হলেন অংশুমান ভৌমিক। তিনি প্রভাতকুমার দাসের পরে ১৩৩ নম্বর (অক্টোবর ২০২৩) সংখ্যাটি প্রকাশ করেছেন। 'বহুরূপী' পত্রিকার প্রথম থেকে এগারো সংখ্যা পর্যন্ত কোন প্রচ্ছদকারের নাম পত্রিকায় উল্লেখ নেই। বারো নম্বর সংখ্যায় প্রথম প্রচ্ছদকারের নাম উল্লেখ করা হয়। তিনি হলেন সূর্য রায়। পরবর্তীকালে প্রচ্ছদ এঁকেছেন খালেদ চৌধুরী, দেবতোষ ঘোষ, কুমার রায়, অনিমেষ চৌধুরী, পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, ইন্দ্রপ্রমিত রায়, হিরণ মিত্র, দেবব্রত ঘোষ, রাহী দে রায়, প্রার্থপ্রতিম দেব। পত্রিকার অলংকরণ করেছেন খালেদ চৌধুরী, কুমার রায়। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে চতুর্দশ সংখ্যা পর্যন্ত পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন বিমল গুপ্ত। পঞ্চদশ সংখ্যা থেকে পঁয়ষট্টি সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশক ছিলেন কালীপ্রসাদ ঘোষ। সাতষট্টি সংখ্যা থেকে একশত ষোলো সংখ্যা পর্যন্ত তারাপদ মুখার্জি। পরবর্তী সময়ে

সুশান্ত দাস এবং প্রবাল মুখোপাধ্যায় প্রকাশক ছিলেন। পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে অনেকেই যুক্ত ছিলেন, যেমন - দেবতোষ ঘোষ, শান্তি দাস, শ্রীমতী সাজেদা আসাদ প্রমুখ। পত্রিকা সম্পাদক কুমার রায়ের কথায় আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তিনি প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন:

> বহুরূপীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রী তারাভূষণ মুখোপাধ্যায় এগিয়ে এসছিলেন সেদিন এই পত্রিকা প্রকাশনার দায় বহন করে। 'নাভানা' প্রেসে ছাপা হল পত্রিকা, তারাবাবুর তত্বাবধানে। 'নাভানা'র শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায় ছাপানর ব্যাপারে সাহায্য করলেন।[১৪]

'বহুরূপী' পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রথম দিকে সংগ্রহ করতেন শান্তি দাস। পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা খুবই শ্রমসাধ্য ব্যাপার। শান্তি দাস খুবই ভালো করে করতেন কাজটি। তাঁর সম্পর্কে সমীর চক্রবর্তী লিখেছেন:

> বহুরূপী পত্রিকার প্রথম দিকে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ সবটাই ও করত। বাইরের জগতে অনেকের সঙ্গে পরিচয় থাকায় বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে সুবিধা হতো।[১৫]

পরবর্তীকালে 'বহুরূপী' নাট্য পত্রিকার জন্য অনেকেই বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজ করতেন। বিষয়টি সম্পর্কে সৌমিত্র বসু লিখেছেন:

> বছরে দু'বার করে বহুরূপী পত্রিকা এখন যেমন বেরোয় তখনও রেরোতো, সেই পত্রিকার জন্যে নানা অফিস ঘুরে ঘুরে বিজ্ঞাপন জোগাড় করে আনতে হত আমাদের। একটা দল করা হয়েছিল, সেই দলে আমি ছিলাম, আভেরী ছিল, রমেন সান্যাল বলে একটি ছেলে ছিল, সুমিতাও ছিল বলে মনে পড়ছে। যে কোনো অফিসে ঢুকে পড়ে পত্রিকার জন্যে বিজ্ঞাপন চাওয়া ছিল আমাদের কাজ।[১৬]

এখানে 'আমি' বলতে সৌমিত্র বসু, 'আভেরী' হলেন আভেরী দত্ত আর 'সুমিতা' হলেন সুমিতা বসু –এঁরা প্রত্যেকেই বহুরূপীর তখন সক্রিয় সদস্য।

চিত্তরঞ্জন ঘোষের মতো নাট্যদল বহুরূপীর সঙ্গে অভিনয়ের যোগাযোগ না থাকলেও প্রভাতকুমার দাসকে পত্রিকার সম্পাদকরূপে দেখতে পেলাম। শুরুতে ছাত্রাবস্থায় মহিষাদল রাজ কলেজের পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। পরে 'অন্বিষ্ট' ত্রৈমাসিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলে। বহুরূপীর সঙ্গে সম্পাদক প্রভাতকুমার দাসের যোগাযোগ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগের কর্মসূত্রে। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন :

> রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কর্মজীবনে কয়েক বছর রাজ্য আকাদেমিতে কাজ করার সুবাদে সংগীত, নৃত্য, নাটক ও দৃশ্যকলা জগতের বহু নাম করা মানুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেরকম সময়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের অধ্যাপক কুমার

> রায়ের সস্নেহ প্রশয় ও সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম। তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমার লেখা পড়ে সম্ভ্রমসূচক-সমাদর করতেন। প্রাঙ্গনে আসা-যাওয়ার পথে দেখা হলে সময় থাকলে কথা বলতেন। একদিন নিজের থেকে প্রস্তাব দিলেন – বহুরূপী পত্রিকায় আমার পছন্দমতো বিষয় নিয়ে একটা লেখা করে দেওয়ার।[১৭]

এরপরই তিনি 'বহুরূপী' পত্রিকার ৬৮ নম্বর সংখ্যায় (২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭) লিখলেন 'প্রসঙ্গ 'বহুরূপী' নাট্যপত্রিকা।' পত্রিকার সূচিগত একটি ইতিহাস পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। পরবর্তীকালে ১৯৮৮ সালে এই প্রবন্ধটিই গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয় বহুরূপী থেকে, গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন স্বয়ং কুমার রায়। পরে এই প্রবন্ধটিকেই আরও বিস্তারিতভাবে লেখেন বহুরূপী পত্রিকার শততম সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর ২০০৩) 'বহুরূপী পত্রিকা : শততম সংখ্যা পর্যন্ত সূচি' শিরোনামে। এরই মধ্য পর্যায়ে 'বিশেষ বহুরূপী প্রযোজনা' সংখ্যার মুদ্রণ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেন এবং তা পালন করেন। এই প্রযোজনা সংখ্যা থেকেই 'এই সংখ্যার সহযোগী সম্পাদক' রূপে প্রভাতকুমার দাসকে আমরা দেখতে পেলাম। প্রসঙ্গত প্রভাতকুমার দাসের কাজের মর্যাদা দিলেন এবং ৮৯ নম্বর সংখ্যায় লিখলেন কুমার রায় :

> এই সংখ্যার পরিশিষ্ট অংশটিতে 'বহুরূপী' নাট্য সম্প্রদায়ের প্রযোজনা বিষয়ক তথ্য সংকলনের কাজটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা এবং সঙ্কলনের পরিশ্রমী কাজটি করে দিয়েছেন বহুরূপীর বান্ধব শ্রী প্রভাতকুমার দাস। এর আগে বহুরূপীর চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দুটি সংখ্যায় এই কাজ তিনি করে দিয়ে-ইতিহাস সচেতন মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আমরাও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।[১৮]

শুধু 'বহুরূপী' পত্রিকা নয় 'গন্ধর্ব' নাট্য পত্রিকারও সূচি প্রস্তুত করেছেন ৭৬ নম্বর সংখ্যায়। অবশ্য সূচিটি অসম্পূর্ণ। তিনি 'গন্ধর্ব' নাট্যপত্রের কয়েকটি সংখ্যার উল্লেখ করেননি। পাঠক এবং পরবর্তী গবেষকেরা বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁর সম্পাদনা পর্বে 'বহুরূপী' পত্রিকায় বেশিরভাগই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সম্পাদনা পর্বের প্রথম সংখ্যাটিই ছিল বহুরূপী নাট্যপত্রের প্রথম সম্পাদক গঙ্গাপদ বসুর জন্মশতবর্ষ সংখ্যা। পরের সংখ্যাটি 'বিশেষ কুমার রায় স্মরণ সংখ্যা'। পরের দুটি সংখ্যা আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর কারণ রবীন্দ্র জন্মের সার্ধশতবর্ষ ছিল সেই সময়। বেশিরভাগ প্রবন্ধই পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছিল। ১২৪ নম্বর সংখ্যাটি (অক্টোবর ২০১৫) 'যাত্রা বিশেষ সংখ্যা' রূপে প্রকাশ করেছিলেন। নাটকের একটি পত্রিকা কেন যে যাত্রা বিষয়ক বিশেষ সংখ্যায় পরিণত হলো তার কোনো ব্যাখ্যা দেননি। যাত্রা আকাদেমির পত্রিকাটির সম্পাদক তিনিই ছিলেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে বহুরূপী নাট্যপত্রিকারকয়েকটি ক্রোড়পত্র করেছিলেন – তারাপদ মুখোপাধ্যায়, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, খালেদ চৌধুরী, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, আরতী মৈত্র, গৌতম বসু, অশোক মজুমদার, শ্যামল

ঘোষ, এখন শেকসপিয়ার, লোকনাট্য পালা, কথা সাহিত্যের নাটক রূপ, অশোক মিত্র, রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, গিরিশ কারনাড।

প্রভাতকুমার দাসও পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে বেশকিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। বিশেষ করে লেখক সমস্যা যা পূর্বেও ছিল। তিনি প্রসঙ্গত জানিয়েছেন :

> বিষয় নির্ধারণে যোগ্যজনের উপর নির্ভর করতেই হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে তা পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে – দিন এগিয়ে আসে, দেওয়ালপঞ্জির তারিখ ক্রমশ খেয়ে নেয় মহাকাল, অনন্যোপায় সম্পাদকের অসাহয়তা বাড়তে থাকে – ফোনে কিংবা এস এম এসে নিরুত্তর-নিরদ্দেশ হয়ে যান বারবার অনুরুদ্ধ লেখক। শেষমেশ যদি ধরাও যায়, মুদ্রণালয় তখন অন্যতর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ায় বাধ্যত হেটমুণ্ডে অপেক্ষা করতে হয় সম্পাদককে।[১৯]

'বহুরূপী' পত্রিকা প্রথম ১০৪ নম্বর সংখ্যাটিতে প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য পেয়েছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে। তারপর থেকে সাহায্য করেছে নিউ দিল্লির সঙ্গীত নাটক একাডেমী। অর্থাৎ পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য একেবারেই ছিল না বলা যায় না কারণ এই সময়ে প্রত্যেকটি সংখ্যার পিছনের মলাটে ছাপা হয়েছে 'Published with the financial Assistance of Sangeet Natak Akademi, New Delhi.' বহুরূপীপত্রিকা প্রকাশ আর সম্ভব নয় তা সম্পাদক প্রভাতকুমার দাস বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি ১২৫ নম্বর সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লিখলেন :

> অভিজ্ঞতা আছে যাঁদের, তাঁরা নিশ্চয় মানবেন, নাট্য-প্রযোজনার কাজের মতোই পত্রিকার প্রকাশনা, সবসময়ই বহুজনের সহযোগ ছাড়া সম্পন্ন হয় না। পত্রিকার ক্ষেত্রে একজন সম্পাদককেই সবদিকে দৃষ্টি রাখতে হয়, কিন্তু প্রধানত বিষয় নির্ধারণ করে এক-একজন লেখককে দায়িত্ব দিয়ে সময় মতো লেখা আদায় করা যে কি কঠিন কাজ ভুক্ত ভোগীরা ছাড়া বুঝবেন না। এরপর মুদ্রণালয়ের উপর নির্ভর করে যদি সম্পাদকের এমন মতি হয় যে – তাগাদা না দিলেও ছাপার কাজ যথা সময়ে সম্পন্ন হয়ে যাবে, তা হলে সেই নিবুর্দ্ধিতার খেসারত দিতে তাকে মনে মনে প্রস্তুত থাকতেই হবে।[২০]

এরপরেও তিনি আরও কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন। ১৩২ নম্বর (সেপ্টেম্বর ২০১৯) সংখ্যা পর্যন্ত তিনি সম্পাদক ছিলেন। বহুরূপী নাট্যপত্র এই সময়পর্বে বিশেষ সংখ্যায় নতুন রূপে দেখা দিয়েছিল পাঠকের কাছে। যা যত্নসহকারে সম্পাদক প্রভাতকুমার দাস করতেন। প্রভাতকুমার দাস সম্পাদনা পর্বে বহুরূপী নাট্যপত্রের নতুন লেখকেরা হলেন পুষ্পল মুখোপাধ্যায়, অরুণ মহাপাত্র, সুমন মুখোপাধ্যায়, গৌতম হালদার, রুশতী সেন, মলয় রক্ষিত, অসিত বসু, বিশ্বজিৎ রায়, ভাস্কর লাহিড়ী, তপনজ্যোতি দাস, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবল গুহরায়, গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, সুশান্ত দাস, অলখ মুখোপাধ্যায়, অংশুমান ভৌমিক, সায়ন্তন মজুমদার, অনিল সাহা, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়, ভবেশ দাশ, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, অরূপশঙ্কর মৈত্র, দেবশঙ্কর হালদার, অনীত

রায়, অতীন্দ্রিয় পাঠক, শান্তি সিংহ, মারুফ কবির, কুন্তল মুখোপাধ্যায়, মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়, রামচন্দ্র প্রামাণিক, দত্তাত্রেয় দত্ত, সৌরীন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

তথ্যসূত্র :

১. অশোক মজুমদার, "'পথিক' থেকে 'রক্তকরবী'", বহুরূপী, সংখ্যা-১, মে ১৯৫৫, পৃ. ৩৬
২. অশোক মজুমদার, "শম্ভু মিত্র বহুরূপী এবং আমরা", শূদ্রক, সংকলন ১৪, শরৎ ১৪০৪, পৃ. ১৭৬
৩. বিজ্ঞাপন, 'বহুরূপী অভিনীত নাটকাবলী', বহুরূপী, সংখ্যা-১, মে ১৯৫৫, পৃ. ৮
৪. অমর গাঙ্গুলী, "গোড়ার কথা", বহুরূপী, সংখ্যা-৩৮, মে ১৯৭২, পৃ. ১৭
৫. অশোক মজুমদার, "শম্ভু মিত্র বহুরূপী এবং আমরা", শূদ্রক, সংকলন ১৪, শরৎ ১৪০৪, পৃ. ১৭৬
৬. গঙ্গাপদ বসু, "কৈফিয়ৎ", বহুরূপী, সংখ্যা-১, মে ১৯৫৫, পৃ. ৪৮
৭. অমর গাঙ্গুলী, "আমাদের কথা", বহুরূপী, সংখ্যা-২, মে ১৯৫৬, পৃ. ৭৫
৮. গঙ্গাপদ বসু, "কৈফিয়ৎ", বহুরূপী, সংখ্যা-১, মে ১৯৫৫, পৃ. ৪৭
৯. অমর গাঙ্গুলী, "আমাদের কথা", বহুরূপী, সংখ্যা-২, মে ১৯৫৬, পৃ. ৭৮
১০. অমর গাঙ্গুলী, "সবিনয় নিবেদন", বহুরূপী, সংখ্যা-২, মে ১৯৫৬, পৃ. ৮৩
১১. প্রভাতকুমার দাস, "বহুরূপী পত্রিকা: শততম সংখ্যা পর্যন্ত সূচি", বহুরূপী, সংখ্যা-১০০, অক্টোবর ২০০৩, পৃ. ৩১১
১২. প্রভাতকুমার দাস, 'প্রসঙ্গ: 'বহুরূপী' নাট্য পত্রিকা', কলকাতা, বহুরূপী, ১ মে ১৯৮৮, পৃ. ২২
১৩. কুমার রায়, "ভূমিকা", 'প্রসঙ্গ: 'বহুরূপী' নাট্য পত্রিকা', কলকাতা, বহুরূপী, ১ মে ১৯৮৮, পৃ.১
১৪. তদেব
১৫. সমীর চক্রবর্তী, "আমাদের শান্তি দাস", বহুরূপী, সংখ্যা-১২৫, পৃ ১৪
১৬. সৌমিত্র বসু, 'বহুরূপী যাপন', কলকাতা, সপ্তর্ষি প্রকাশন, জুলাই, ২০১৫, পৃ. ৮০
১৭. প্রভাতকুমার দাস, "অন্তহীন নক্ষত্রের আলো", নান্দীপট, তৃতীয় বর্ষ, ২০২১, পৃ. ২৭
১৮. কুমার রায়, "সম্পাদকীয়", বহুরূপী, সংখ্যা-৮৯, মে ১৯৯৮, পৃ. ৭
১৯. প্রভাতকুমার দাস, "সম্পাদকীয়", বহুরূপী, সংখ্যা-১২২, অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ৮
২০. প্রভাতকুমার দাস, "সম্পাদকীয়", বহুরূপী, সংখ্যা-১২৫, মে ২০১৬, পৃ. ৭

গার্হস্থ্য হিংসা থেকে নারী সুরক্ষার্থে ভারতীয় দণ্ডবিধি : সাম্প্রতিক মূল্যায়ন

শর্মিলা রায়
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক
স্বরাজ বক্সী
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সংক্ষিপ্তসার : ভারতের নারী নির্যাতনের ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। প্রতিবছরই লক্ষ্য করা যায় সমাজে নারীরা পরিবারে তার স্বামী এবং তার স্বামীর আত্মীয়দের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। পরিবারের সদস্যরা নারীকে যৌতুকের জন্য মৃত্যু এমনকি গুরুতর আঘাত ও খুনের মতো অপরাধ করে চলেছে। এছাড়াও স্বামী কর্তৃক নারীটি বৈবাহিক ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। ভারতে অপরাধী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন ১৮৬০ সালে চালু করা হয়। এই দন্ডবিধি আইনের কিছু ধারা রয়েছে, যা বিভিন্ন বিষয়ে অভিযুক্ত অপরাধীদের শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে বর্ণিত বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে ধারা গুলি সরাসরি নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সদর্থক ভূমিকা পালন করে এবং একই সঙ্গে এই ধারা গুলির সাম্প্রতিক গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণালাভের সারস্বত প্রচেষ্টা করা হয়েছে।
সূচক শব্দ : নারী, গার্হস্থ্য হিংসা, সুরক্ষা, ভারতীয় দণ্ডবিধি।

মূল প্রবন্ধ :

প্রাচীনকাল থেকে ভারতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বিদ্যমান থাকায় এবং নারীরা নিরক্ষর থাকায় নারীর বিরুদ্ধে পারিবারিক হিংসা ক্রমশ প্রকট রূপ ধারণ করেছে। ভারতীয় নারীদের বিশেষ করে পর্দা প্রথা, সতীদাহ প্রথা এবং পারিবারিক হিংসার মধ্যে খুন, ভ্রুণহত্যা, বিভিন্ন ধরনের শারীরিক, মানসিক নির্যাতন, শিশু কন্যা হত্যা, যৌতুকের জন্য মৃত্যু, নিষ্ঠুরতা, বহুবিবাহ ইত্যাদির কারণে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। যদিও উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ভারতে যে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল তাতে নারীদের রক্ষা করতে নারীদের প্রতি ন্যায়বিচার করা, সামাজিক অন্যায়ের হাত থেকে নারীদের রক্ষা করা, ইত্যাদি বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাদের প্রচেষ্টার ফলে ভারত থেকে বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা নিবারণ এবং হিন্দু বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তন হয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতীয় সংবিধানে নারীদের উন্নতি ও নানা রকম সামাজিক অন্যায় ও

অপরাধের হাত থেকে নারীদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম আইন প্রবর্তন করা হয়। শুধু তাই নয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম আইনের সংশোধন করে নতুন নতুন আইন তৈরি করে নারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পারিবারিক হিংসায় অপরাধীদের শাস্তি দিতে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে যে আইনগুলি রয়েছে, সেগুলি হল :

অপরাধমূলক ভাবে নারী হত্যা করা : ভারতের নারীরা অনেক সময় তাদের স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ি লোকজনের দ্বারা খুন হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০৯ ধারায় এই ধরনের খুনকে 'অপরাধযোগ্য হত্যাকান্ড'[১] বলা হয়। অপরাধযোগ্য হত্যাকাণ্ডের মধ্যে যেসকল বিষয়গুলি পরে সেগুলি হল- ১) নারীটির মৃত্যুর কারণ হতে পারে তার শারীরিক আঘাত। ২) নারীটির মৃত্যু যদি গুলি দ্বারা হয়। ৩) নারীটিকে যদি কোন ভারী জিনিস দিয়ে মাথায় মেরে হত্যা করা হয়। ৪) নারীকে যদি ফাঁস দিয়ে মারা হয়। এরকম মৃত্যুকে অপরাধ যোগ্য হত্যাকাণ্ড বলা হয়। দন্ডবিধির ২৯৯ ধারায় বলা হয়েছে কোন নারীকে যদি ঝোপের আড়াল থেকে গুলি করা হয়, এবং তাতে যদি নারীটির মৃত্যু হয়। এবং কোন নারীর মৃত্যু ঘটানোর জন্য যদি গর্ত করে রাখা হয় এবং নারীটি সেখানে না জেনে পড়ে গিয়ে যদি তার মৃত্যু হয় ইত্যাদি। পারিবারিক হিংসার মধ্যে অনেক সময়ই খুন একটি উল্লেখযোগ্য অপরাধ। নারীদের অনেক পরিবারেই লাঞ্ছনা-বঞ্চনার শিকারের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে তার স্বামী বা শ্বশুর বাড়ির লোকেরা তাকে খুন করার মতো অপরাধও করে থাকে। আবার অনেক সময় পরিবারের লোকেরা নারীটির গায়ে অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে এবং কেরোসিন তেল ঢেলে নারীটির মৃত্যু ঘটানো হয়। পণের জন্য অনেক পরিবারের "স্ত্রীকে অগ্নি দগ্ধ করে বা লোহার দন্ড দিয়ে মাথায় মেরে হত্যা করা হয়।"[২] এরকম হত্যাকাণ্ডে যুক্ত অভিযুক্ত অপরাধীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দন্ডিত হতে হয়।

যৌতুকের জন্য মৃত্যু : দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় সমাজে পণপ্রথা একটা সামাজিক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পণপ্রথা ভারত সরকার আইন তৈরি করে বন্ধ করার প্রচেষ্টা করেছে তা হল পণপ্রথা নিরোধক আইন ১৯৬১। তবুও সমাজে এই কুপ্রথার প্রচলন বর্তমান সময়ও লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার সময়, মেয়ের পরিবারের লোকজনদের অর্থনৈতিক সংকটে পড়তে হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এই "পণপ্রথার জন্য অনেক মেয়েদের বিবাহের পর পারিবারিক নির্যাতনেরও শিকার হতে হয়। কোন নারীর মৃত্যু যদি ধাক্কা বা শারীরিক আঘাতের কারণে ঘটে অথবা নারীর বিবাহের সাত বছরের মধ্যে কোনো কারণে মৃত্যু ঘটে। এবং যদি কোন নারীর মৃত্যু পোড়া এবং কোন শারীরিক ক্ষতের চিহ্ন থাকে।"[৩] তবে দেখা যায় নারীর মৃত্যুর আগে নারীটি তার স্বামী বা তার স্বামীর আত্মীয়দের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। নারীর মৃত্যু যদি তার স্বামী বা স্বামীর কোনো আত্মীয়দের নিষ্ঠুরতার দ্বারা ঘটে তবে এই ধরনের মৃত্যুকে যৌতুক মৃত্যু বলা হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধি

৩০২ ও ৩০৪-বি ধারার দ্বারা যৌতুক মৃত্যু পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং আইনসভা এই ধারার মধ্যে দিয়ে কঠোর শাস্তির বিধান প্রবর্তন করেছে। "ফৌজদারী আইনে বলা হয়েছে কোন বিবাহিত নারীর উপর যদি অমানবিক নিপীড়ন হয়। এবং এই অপরাধের অভিযুক্তকে খুঁজে বের করাই এই আইনের প্রাথমিক কাজ।"[৪] এছাড়াও "মৃত নারীটির মৃত্যু যদি অর্থের দাবির জন্য বা যৌতুকের জন্য হয়ে থাকে তাহলে এই মৃত্যুর সঙ্গে অভিযুক্ত অপরাধীদের সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হবে, যা বাড়তে পারে, এমনকি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।"[৫] একই সঙ্গে আরো বলা হয়েছে, যৌতুকের জন্য এই হত্যাকান্ড যদি চার দেওয়ালের মধ্যে ঘটে তাহলেও এই মৃত্যুকে যৌতুক মৃত্যু বলে গণ্য হবে ১৯৮৩ সালের সংশোধনী আইনের মাধ্যমে। সাধারণত যৌতুকের কারণে মৃত্যুর অপরাধের জন্য সরাসরি কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তাই আদালতকে অবশ্যই পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর নির্ভর করে অনুমান করতে হবে। এই বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে হবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুমানের মধ্যে দিয়ে -

১. নারীটির মৃত্যুর পর তার স্বামীর আচার-আচরণের মধ্যে দিয়ে।

২. আগুন নেভানোর চেষ্টা না করা।

৩. নারীটিকে হাসপাতালে না নিয়ে যাওয়া।

৪. নারীটির সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়া।

উক্ত পরিস্থিতি গুলো যদি ঘটে থাকে তাহলেই ধরে নেওয়া হবে, নারীটির মৃত্যু যৌতুকের দাবির কারণেই ঘটেছে।

আত্মহত্যার প্ররোচনা : বিদ্যমান আইনে কোন নারীকে মেরে ফেলা তো অপরাধ, এমনকি "কোনো নারীকে আত্মহত্যার চেষ্টা করাও অপরাধ"[৬] । যদি কোন নববধূ আত্মহত্যা করে, বা কেউ যদি আত্মহত্যার প্ররোচনা দেয়, তবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৬ নম্বর ধারায় অপরাধী ব্যক্তির শাস্তির বিধান রয়েছে। আত্মহত্যা সমাজে একটি অভিশাপ। নিমিষেই একটি স্বপ্ন ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। তিলে তিলে গড়ে ওঠা কোন নারীর স্বপ্ন, আশা ভেঙে দিতে পারে এই আত্মহত্যার মতো প্ররোচনা। কোন নারীর সম্মতি ছাড়া বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি যদি কোন কার্যসিদ্ধি করে, এবং সেইক্ষেত্রে যদি নারীর সম্মানহানি হয় তাহলে সেই নারীটি আত্মহত্যার মতো পথ বেছে নেয়। এইরকম পরিস্থিতিতে যদি কোন নারীর মৃত্যু হয় সেইক্ষেত্রে অপরাধী ব্যাক্তিটিকে আদালত শাস্তি প্রদান করতে পারে। দণ্ডবিধির আইন ৩০৬ ধারায় বলা হয়েছে আত্মহত্যায় প্ররোচনার জন্য অপরাধি ব্যক্তিকে দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত থাকতে হবে। দন্ডবিধি ৩০৫ ধারায় বলা হয়েছে আঠারো বছরের কমবয়স্ক লোক, পাগল, অবুঝ, মাতাল প্রভৃতি নারী বা ব্যক্তিকে যদি আত্মহত্যায় প্ররোচনা করা হয়, সেইক্ষেত্রে সে যদি আত্মহত্যা করে ফেলে, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তিটিকে ফাঁসি দেওয়া পর্যন্ত হতে পারে। পরিবারের অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হয়ে নারীটি আত্মহত্যা করেছে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। ভারতের মতো দেশে লক্ষ্য করা যায় যে

নির্যাতিত নারী তার নিকটবর্তী থানায় গিয়ে অভিযোগ জানায়, তাকে জোর করে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয় বা শাশুড়ি তাকে ক্রমাগত অত্যাচার করে। এছাড়াও নির্যাতিতা নারীটির স্বামী প্রতিনিয়ত টাকা আনার জন্য হুমকি দেয়, টাকা না আনলে নানারকম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে, এমনকি মেরে ফেলারও হুমকি দেয়। উক্ত ঘটনাবলি যদি নারী থানায় গিয়ে জানায় সেক্ষেত্রে অপরাধী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার বিধান রয়েছে এই দন্ডবিধি আইনে।

নারীর ভ্রূণ হত্যা বা নারীকে জোর করে গর্ভপাত করানো : পারিবারিক নির্যাতনে মধ্যে নারীকে জোর করিয়ে গর্ভপাত করানো একটি দণ্ডনীয় অপরাধ ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে। পরিবারে নারীদের স্বামী যদি নারীটির গর্ভপাত ঘটানোর জন্য ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় সেইক্ষেত্রে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩১৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে মহিলার সম্মতি ছাড়াই গর্ভপাত ঘটানোও অপরাধ। নারীকে দ্রুত সন্তান ধারণ করা বা না করার উপর জোর দেওয়াও একটি অপরাধ। ভ্রূণ হত্যার মতো অপরাধগুলির জন্য অপরাধী ব্যক্তিকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয় যা যাবজ্জীবন অথবা দশ বছর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। এবং একই সঙ্গে জরিমানাও হতে পারে।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩১৪ নম্বর ধারায় করা হয়েছে কোন নারীকে গর্ভপাত করানোর সময় যদি তার মৃত্যু ঘটে সেক্ষেত্রে এই অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দণ্ডিত হতে হবে।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩১৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে নারীটির সন্তান জন্মের পূর্বে যদি সন্তানটিকে জীবিত জন্ম হওয়া থেকে রোধ করার অভিপ্রায়ে কোন কাজ করা হয়। জন্মের পরে যদি সন্তানটিকে মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্যে কাজ করা হয়, তাহলে এইক্ষেত্রে দন্ডবিধি অনুযায়ী অভিযুক্ত অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার সাথে সাথে দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে এবং জরিমানা দিতে হবে।

৩১৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি অপরাধমূলক নরহত্যার মত শিশুর মৃত্যু ঘটায় সেইক্ষেত্রে তাকে কারাদণ্ডের দন্ডিত করা হবে। এছাড়াও কোন স্বামী যদি তার গর্ভবতী স্ত্রীর পেটে লাথি মেরে মৃত্যু ঘটায় সেইক্ষেত্রে নারীটির মৃত্যু হলে বা আহত হলে বা শিশুটির মৃত্যু হলে এই দণ্ডবিধির ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিটির দশ বছর কারাদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে থাকতে হবে।

আঘাত : শারীরিক আঘাত করা পারিবারিক হিংসার একটি সাধারন রূপ। ভারতীয় দণ্ডবিধিতে আঘাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে "কোন নারীর শারীরিক ব্যথা রোগ বা দুর্বলতা ইত্যাদি এই আঘাতের মধ্যে পড়ে"[৭]। আরো বলা হয়েছে একজন ব্যক্তি যদি অন্য কারোর দ্বারা ব্যথা পায় সেই ক্ষেত্রে সেই বিষয়টিকে আঘাত করা বোঝায়। নারীকে টেনে হিঁচরে ঘর থেকে বের করে দেওয়া মতো অপরাধ এটিও একটি আঘাতের কারণ। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩১৯ নম্বর ধারায় এই আঘাত সম্পর্কে

বর্ণনা করা হয়েছে। বিবাহের পর নারীটির স্বামী যদি নারীটির সঙ্গে উপরিউক্ত আচরণ গুলি করে থাকে তাহলেও সেটি এই আইনের আওতাধীন।

দন্ডবিধির ৩২০ নম্বর ধারায় গুরুতর আঘাতের বিষয়টিকে বলা হয়েছে। এই গুরুতর আঘাত নারীটির স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় দ্বারা ঘটে থাকে। এই গুরুতর আঘাতের মধ্যে যে বিষয়গুলি পরে সেগুলি হল- নারী চোখের দৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া আঘাতের কারণে, নারীর কানে আঘাত করে শ্রবণ শক্তি বন্ধ করে দেওয়া, নারীকে মেরে তার মুখ বা মাথা ফাটিয়ে দেওয়া, দাঁত বা হাড়ের ফাটল বা ভেঙে ফেলা, আঘাত করে নারীর জীবনকে বিপন্ন করা বা তীব্র শারীরিক ব্যাথা করে দেওয়া এই আইনের অন্তর্ভুক্ত।

৩২১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে ইচ্ছাপূর্বক আঘাত করার কথা। যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীকে ইচ্ছা করে আঘাত করে অথবা যদি সেই ব্যক্তির কাজের ফলে নারীদের আঘাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও সেই কাজ সম্পাদন করে।

৩২২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে ইচ্ছাপূর্বক গুরুতর আঘাত করার কথা। কোন নারীকে যদি কেউ ইচ্ছে করে গুরুতর আঘাত করে এবং তাতে নারীটির নিদারুণ যন্ত্রণা হয়। তখন সেই আঘাত করাকে ইচ্ছাকৃত আঘাত বলা হয়।

৩২৩ ধারায় বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন নারীর রাত হবে জেনেও কাজটি করে তাহলে কাজের জন্য সে অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তির বিধান রয়েছে। কারণ এইরকম অনেক কিছু সময় দেখা যায় কোন নারীকে দৈহিক নির্যাতন করে, ঘুষি মারার মতো নির্যাতন করে থাকে। এই অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ৩২৩ নম্বর ধারা বলে একবছর কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা অব্দি জরিমানা অথবা উভয়-প্রকার দন্ডে দণ্ডিত করা হয়।

৩২৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে স্বেচ্ছায় বিপদজনক অস্ত্র দিয়ে যদি কোন নারীকে আঘাত করা হয় তাহলে সেটি এই আইনের অন্তর্ভুক্ত। অভিযুক্ত সত্যি যদি নারীকে মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে অর্থাৎ ছুরি বা চাকু দিয়ে প্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করে বা মেরে ফেলে সেই ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো যায়।

৩২৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে ইচ্ছাকৃত গুরুতর আঘাত ঘটানোর জন্য শাস্তি। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তি যদি কোন নারীকে গুরুতর ভাবে আঘাত করে তাহলে তাকে অর্থদন্ড এবং কারাদন্ডে দণ্ডিত হতে হয়।

৩২৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে ইচ্ছাপূর্বক বিপদজনক অস্ত্র দ্বারা গুরুতর আঘাত করার কথা। পরিবারে কোন নারীকে যদি কেউ ইচ্ছাপূর্বক বিপদজনক অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে, গুলি করে বা ছুরি দিয়ে আঘাত করে বা কোন গরম বস্তু বা আগুন দিয়ে ক্ষত করে বা অ্যাসিড নিক্ষেপ বা নিক্ষেপ করার চেষ্টা করে সেই ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দশ বছর অব্দি কারাদন্ডে দণ্ডিত হতে হয় এবং অর্থদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়।

অন্যায়ভাবে বাধা দেওয়া এবং অন্যায় ভাবে বন্দি করার জন্য শাস্তি : ভারতীয় সমাজে অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় পারিবারিক হিংসার কারণে নারীটির স্বামী বা তার আত্মীয়রা বিবাহের পর তাকে আটকে রেখেছে, বাড়ি থেকে বের হতে দিচ্ছে না, এমনকি কারো সাথে মিশতে পর্যন্ত দিচ্ছে না সেক্ষেত্রে ৩৪১ নম্বর ধারা অনুযায়ী যুক্ত ব্যক্তিকে একমাস কারাদণ্ড অথবা ৫০০ টাকা জরিমানা দিতে হতে পারে।

ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৪২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে নারীকে যদি একটানা ঘরের মধ্যে কয়েকদিন বন্ধ করে রাখা হয় সেইক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি দানের বিধান রয়েছে একবছর পর্যন্ত কারাদণ্ড।

বৈবাহিক ধর্ষণ : পারিবারিক হিংসার আরেকটি সাধারণ রূপ হল বৈবাহিক ধর্ষণ। নারীর ওপর সংঘটিত যৌন অত্যাচারের সঙ্গে তার সম্মান ও লজ্জার বিষয়টি জড়িত, পিতৃতন্ত্র যার ব্যবহার করে নারীর অধীনতা নির্দিষ্ট করার জন্য। পারিবারিক হিংসার ক্ষেত্রে যৌন হিংসার সর্বপ্রধান বোঝাপড়া নারীর সম্মানের সঙ্গে সম্পর্কিত। ধর্ষণকে বলা হয় 'সম্মান হরণ' এবং গণ্য করা হয় সামাজিক মৃত্যুর সমান হিশাবে। এটি লজ্জা এবং সম্মানের ভাবধারা দ্বারা গৃহীত এবং এগুলি সামাজিক সম্পর্ক এবং আত্মীয়তার স্তরবিন্যাসের সংগঠনকারী নীতি হিশাবে কাজ করে। লজ্জা এবং সম্মানের ভাবধারার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে নারীর যৌনতার উপর নিয়ন্ত্রণ এবং তা একমাত্র বৈধ ক্ষেত্রে প্রকাশের অনুমোদন। এই ভাবধারার প্রতিফলন দেখা যায় আইনের ৩৭৫ ধারায়। "একজন নারীর যৌন সম্মান তার কাছে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ এবং তাকে যেকোন মূল্যে রক্ষা করতে হবেই"—এইরকম পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল বিচারের রায়ে এর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। নারীর যৌনতার উপর নিয়ন্ত্রণ, পরিবার এবং সম্প্রদায় পরিচিতি এবং ক্ষমতার বেড়াজালের মধ্যে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ থাকে এবং ধর্ষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই নিয়ন্ত্রণ। তাই নারীদেহকে নারীর যৌনতাকে অবৈধ অধিগ্রহণ থেকে রক্ষা করা হয়, কিন্তু কেবলমাত্র বৈধ যৌনমিলনের ক্ষেত্রে কোন আপত্তি তোলা হয় না। শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার ধারণাটি নারীর উপর জোর করে চাপিয়ে দেয় এক অলিখিত, অদৃশ্য নিষেধের বেড়াজাল এবং তাদের বৈধ ক্ষেত্রটির অধিকারকে সংজ্ঞায়িত করা হয় কেবলমাত্র ব্যক্তি এবং গণ পরিচয়ের নিরিখে নয়, যৌনসম্পর্ক অনুসারেও। এইসব নিয়মগুলি তখন সম্প্রদায় কর্তৃক সুবিধাজনকভাবে কাজে লাগানো হয় নারীর জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। নারীদেহকে গোপন অঙ্গ এবং প্রকাশ্য অঙ্গ এই দুভাগে ভাগ করে চিহ্নিত করা হয়। যদিও অনেক প্রগতিশীল দেশে বৈবাহিক ধর্ষণের বিষয়টি নিয়ে অনেক আইন করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে এই আইনটি তৈরি করা হয়েছে এবং এর ক্ষমতাকে সীমিত স্বীকৃতি দিয়েছে। আমাদের সমাজে স্বামী তার স্ত্রীর সঙ্গে যৌন মিলন করবে এটা আপাতদৃষ্টিতে ধর্ষণ বলে বিবেচিত হয় না। কিন্তু ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ নম্বর ধারায় বলা আছে স্বামী যদি স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে যৌনমিলন করে তাহলে সেটি

ধর্ষণ বলে বিবেচিত হবে। ৩৭৬ নম্বর ধারায় বলা আছে অভিযুক্ত ব্যক্তিটি দোষী সাব্যস্ত হলে চার বছর কারাবাস বা ছয় মাস কারাবাসে দেওয়া হয়।

নারীর সম্পত্তির অপব্যবহার : সমাজে অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় নারীর যাতে নিজস্ব সম্পত্তি না থাকে এবং থাকলে সেটির অপব্যবহার করে নারীদের অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়া হয়। এমনকি নারী সম্পত্তিটাকে জোর করে স্বামী তা নিজের নামে করিয়ে নেয়। ৪০৫ নম্বর ধারায় রয়েছে নারীটির যদি মৃত্যু ঘটে তাহলে তার সম্পত্তির অপব্যবহার করে নষ্ট করে দেয় এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষেরা। এই অপরাধের জন্য অভিযুক্তদের তিন বছর কারাদণ্ড ও আর্থিক জরিমানা হতে পারে।

স্ত্রী জীবিত থাকা অবস্থায় পুনরায় বিবাহ করা : বর্তমান সময়ে পুরুষেরা তাদের প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও আবার বিয়ে করার ঘটনা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা যায়। এই ঘটনা ও পারিবারিক নির্যাতনের আরেকটি রূপ। সমাজে এই অপরাধ কমানোর জন্য দন্ডবিধির ৪৯৪এ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে স্ত্রী বেঁচে থাকা অবস্থায় পুনরায় বিবাহ করা দণ্ডনীয় অপরাধ। সমাজে এরকম অপরাধ করলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাত বছর পর্যন্ত কারাদন্ডে দণ্ডিত হতে পারে এবং একই সঙ্গে জরিমানাও হতে পারে। ৪৯৫ নম্বর ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে বিবাহ করার সময় প্রথম বিবাহকে গোপন করার হলে সেই ব্যক্তিকেও শাস্তি দেওয়া হবে।

স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়দের দ্বারা নিষ্ঠুরতা : ভারতীয় দণ্ডনীতিতে বলা হয়েছে, "বিবাহের পর নারী যদি তার স্বামী বা স্বামী পরিবারের আত্মীয়দের দ্বারা নিষ্ঠুরতার শিকার হয়"[৮] তাহলেও সেটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। ১৯৮৩ সালে ভারতীয় দন্ডে বৈবাহিক নিষ্ঠুরতা আইন প্রবর্তন করা হয়। আমাদের দেশের যৌতুকের লোভে স্বামী বা তার পরিবারের লোকজনেরা সদ্যবিবাহিত নারীটির উপর নানারকম ভাবে নির্যাতন করে থাকে। পারিবারিক নির্যাতনে নারীরা যে তাঁর স্বামী বা তাঁর স্বামীর আত্মীয়দের দ্বারা নানা ভাবে নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা স্বীকার হচ্ছে তার থেকে সুরাহা পেতে এবং নির্যাতনকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ৪৯৮-ক ভারতীয় দণ্ডবিধিতে ফৌজদারি আইন চালু করা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি ১৮৬০ -এর কুড়ি অধ্যায়ে স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়দের দ্বারা নিষ্ঠুরতার কথা উল্লেখ করে ও পরবর্তী সময়ে ৪৯৮এ নম্বর ধারা অন্তর্ভুক্ত করে। ৪৯৮এ ধারায় বলা হয়েছে যে নারীটির স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় যদি নারীকে নির্যাতন করেন তাহলে তাকে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দন্ডিত করা হবে এবং জরিমানা ও দিতে হতে পারে। এই নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতার মধ্যে যে দিকগুলি উল্লেখ করা হয় সেগুলি হল- (ক) যেকোন ইচ্ছাকৃত আচরণ যা নারীকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করতে পারে বা গুরুতর আঘাত বা জীবন, অঙ্গ, স্বাস্থ্যের জন্য বিপদ ঘটাতে পারে যা (শারীরিক বা মানসিক) উভয় হতে পারে মহিলাদের ক্ষেত্রে। এবং (খ) নারীর হয়রানির ক্ষেত্রে যেখানে তাকে বা তার সাথে সম্পর্কিত যেকোন ব্যক্তিকে এই ধরনের দাবি পূরণের জন্য তার সঙ্গে সম্পর্কিত যেকোনও ব্যক্তি কোন বেআইনি দাবি

পূরণ করার উদ্দেশ্যে হয়রানি করা হয়। যৌতুকের কারণে মৃত্যুর হুমকির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এই ধারাটি প্রণয়ন করা হয়েছিল। এটি ফৌজদারী সংশোধনী আইন ১৯৮৩। এই একই আইনের দ্বারা বিবাহিত নারীর আত্মহত্যার পর বিষয়টিও অনুমান তৈরি করতে ভারতীয় প্রমাণ আইনে ১১৩-ক ধারা যুক্ত করা হয়েছে। এই ১১৩-ক যৌতুকের কারণে মৃত্যু অনুমানে যখন প্রশ্ন করা হয় যে, একজন ব্যক্তি যৌতুকের লোভের জন্যই একজন নারীর মৃত্যু হয়েছে এবং নারীটির মৃত্যুর আগে ওই নারীটি এই ধরনের ব্যক্তির দ্বারা নিষ্ঠুরতা বা হয়রানি শিকার হয়েছে বা কোন যৌতুকের দাবির সাথে সম্পর্কিত সেইক্ষেত্রে আদালত অনুমান করবে যে এই ধরনের নির্যাতন যৌতুকের কারণেই নারীটির মৃত্যু হয়েছে, সেক্ষেত্রেই দন্ডবিধিটি প্রযোজ্য হবে।

গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ আইনে যেসমস্ত বিশেষ শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে যেমন- শারীরিক নিগ্রহ এবং অর্থনৈতিক নিগ্রহ প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এই আইন অনুযায়ী নিগৃহীত নারী কোন আইনজীবীর মাধ্যমে বা নিজে সরাসরি তার এলাকায় বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আবেদন করতে পারে। গার্হস্থ্য হিংসা আইনে এরকম বিধান আছে যে আবেদন গৃহীত হবার ৩ দিনের মধ্যে মামলার বিভিন্ন পক্ষকে নোটিশ দিয়ে জবাবদিহি চাইতে হবে এবং বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলার শুনানি ও বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সর্বোচ্চ ৬০ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হবে এবং নারীকে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। কোন ভুক্তভোগী নারীর বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের পাশাপাশি প্রতিবিধানকারী অফিসারদের কাছে আবেদন করেও এর প্রতিকার চাইতে পারে। এই আইনে বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের দেওয়া নির্দেশ যদি প্রতিপক্ষ বা বিবাদী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যদি না পালন করে তবে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবাহ চালু করা এবং এছাড়া জেল, জরিমানা প্রভৃতি শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা রয়েছে। গার্হস্থ্য হিংসা আইনে আদালতকে নানারকম নির্দেশ দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এইগুলি নিম্নরূপ- প্রতিবিধান মূলক নির্দেশ যার দ্বারা বিচারক বাদীকে প্রতিবিধান দেওয়া এবং বিবাদী পক্ষকে নিগ্রহমূলক কাজকর্ম বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারে। এই আইনে বিচারক নিগৃহীত নারীকে সাময়িক ভাবে আলাদা বাসস্থানে থাকার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য বিবাদী প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারে। সেইক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ নিগৃহীত নারীকে পৃথক বাসস্থান বা তার জন্য প্রয়োজনীয় ভাড়া দিতে বাধ্য থাকেন। এছাড়াও রয়েছে অনুদান, নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা যাতে ম্যাজিস্ট্রেট নিগৃহীত নারীকে মাসিক বা এককালীন আর্থিক অনুদান দেওয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারেন। এই আইনটির মধ্যে দিয়ে নারীদের সুরক্ষার বিধান দেওয়া হয়েছে।

পারিবারিক প্রেক্ষাপটে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধি অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় পরাধীন ভারতবর্ষের সময়কাল থেকে দায়িত্ব পালন করে আসছে। তবে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ভারতীয় দণ্ডবিধির বেশ কিছু সংশোধন করা হয়েছে। এই সংশোধনগুলির

মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ভারতীয় দণ্ডবিধিকে নারীর সুরক্ষায় সঠিকভাবে ব্যবহার করার পরিবেশ তৈরী হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে বর্ণিত বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে ধারা গুলি সরাসরি নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সদার্থের ভূমিকা পালন করে। একইসঙ্গে সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই আইনের অনেক ফাঁকফোকর থেকেই যায়। অপরাধীরা এই সকল ফাঁকফোকরে সুবিধা অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে ব্যবহার করে। আবার জাতির জন্য এই আইন অর্থাৎ সেই নারীরা এই আইনের সুযোগ নিয়ে একতরফা ভাবে পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনদের বিভিন্ন রকম ভাবে অপদস্ত করার সুযোগ পেয়ে যায়। তাই বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির সঠিক প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে সমাজের সকলের সার্বিক সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে। সমাজের সকল স্তরের মানুষের ভারতীয় দণ্ডবিধি সম্পর্কে সম্যক ধারনাই একমাত্র প্রকৃত সমাধান সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

তথ্য ঋণ:

১. ধারা ২০৯, ভারতীয় দন্ডবিধি।
২. Surinder Kumar vs. The State of Punjab, Date of Judgement: 6 January, 2020, Bench: Mohan M. Shantanagoudar, R.S. Reddy, https://indiankanoon.org/doc/175073356/, Accessed: 22th March 2023.
৩. ধারা ৩০৪,ভারতীয় দণ্ডবিধি।
৪. State Of Punjab vs Iqbal Singh and Ors, Date of Judgement: 10 May, 1991, Equivalent citations: 1991 AIR 1532, 1991 SCR (2) 790, Bench: Ahmadi, A.M. (J), https://www.lawinsider.in/judgment/state-of-punjab-vs-iqbal-singh-and-ors, Accessed: 14th March 2023.
৫. Shyam Lal And Ors vs State of Haryana and Anr, Date of Judgement: 6 October, 2020, Judge: A. G. MASIH, J. (ORAL), https://indiankanoon.org/doc/74675494/, Accessed: 11th March 2023.
৬. ধারা ৩০৬, ভারতীয় দণ্ডবিধি।
৭. ধারা ৩১৯, ভারতীয় দণ্ডবিধি।
৮. ধারা ৪৯৮-ক, ভারতীয় দণ্ডবিধি।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : সহজ ভাষার, সহজ ভাবের কবি

খোকন বর্মন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
নয়াগ্রাম পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সরকারি মহাবিদ্যালয়

চন্ডীদাসের কবি প্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি’ প্রবন্ধে লিখেছিলেন—“চন্ডীদাস সহজ ভাষার, সহজ ভাবের কবি। ...তিনি এক ছত্র লেখেন ও দশ ছত্র পাঠকদের দিয়া লিখাইয়া লন।”[১] নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী'র কবি প্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়েও আমরা প্রাথমিক উচ্চারণে বলতে পারি, নীরেন্দ্রনাথ সহজ ভাষার, সহজ ভাবের কবি। এবং এমন মন্তব্য যেঅযথার্থ নয় তা নির্ণয় করাই এই আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী চল্লিশের দশকের ভিন্নধারার প্রতিনিধি স্থানীয় কবি, প্রধান কবি বললেও অত্যুক্তি হয় না। ভিন্নধারার এই কারণে বলা যে, চল্লিশের মূল ধারার কবিরা ছিলেন একটি বিশেষ দর্শনে দীক্ষিত এবং তাঁদের লেখায়ও রয়েছে তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। কিন্তু নীরেন্দ্রনাথ কোনো বিশেষ দর্শনের দীক্ষা না নিয়ে নিয়েছিলেন নির্বিশেষ জীবন দর্শনের দীক্ষা। তাই নীরেন্দ্রনাথ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন জীবনের সর্বভূমির কবি।

বিশ শতকের তিনের দশকে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের আত্মপ্রকাশ। আধুনিক কবিতা ঔপনিবেশিক আধুনিকতার জটিল সংস্করণ। স্বভাবতই দুরূহতা বা দুর্বোধ্যতা আধুনিক কবিতার একটি অন্যতম অভিজ্ঞান। তিরিশের বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দুর্বোধ্য আখ্যা পান। জীবনানন্দের কবিতাকেও সুবোধ্য বলা চলে না নিশ্চয়ই। ১৯৭৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযয়ে বিদ্যাসাগর-বক্তৃতামালায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কবিতা ও কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক পাঁচটি নিবন্ধ তুলে ধরেন। যার মধ্যে একটি নিবন্ধ হল ‘কঠিন কবিতা’ শীর্ষক। এই নিবন্ধে নীরেন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, কবিতা দুরূহ বা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে মূলত দু’টি কারণে। এক. শব্দগত কারণে এবং দুই. ভাবনাগত কারণে। অপরিচিত, অপ্রত্যাশিত এবং জোর করে বানিয়ে তোলা শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহারে কবিতা অনেক সময় দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। যেমন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা বিষ্ণু দে-র কবিতা। আবার ভাবগত কারণেও কবিতা অনেক সময় দুরূহ বা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। যেমন, জীবনানন্দ দাশের কবিতা। কিন্তু নীরেন্দ্রনাথ কবি হিসেবে এই দু’টির কোন পথেই হাঁটেননি। তিনি সুধীন্দ্র, বিষ্ণু দে-র মতো কবিতায় অপ্রচলিত অপরিচিত বানিয়ে তোলা শব্দের ব্যবহারে যেমন কবিতাকে দুরূহ বা দুর্বোধ্য করে তোলেন নি, তেমনি জীবনানন্দের মতো সাধারণ কবিতা পাঠকের ভাবনার বৃত্তটিকেও ছাড়িয়ে অন্য কোন আকাশের ওপারে আকাশের অন্বেষণে নিজেকে নিরত রাখেননি।

এই বিষয়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অত্যন্ত স্পষ্টবাদী। দ্বিধাহীনভাবে তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানান—

> "এমন কোন মানুষের কথা আমার কবিতায় পাওয়া যাবে না, যে মানুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় কখনো ঘটেনি। এমন কোন গাছপালার কথাও পাওয়া যাবে না, যেটা আমার অপরিচিত, যার পাতায় আমি হাত বোলাইনি। এমন কোন রাস্তার কথা আমার কবিতায় নেই, যে রাস্তার ধুলো আমার গায়ে লাগেনি।"[২]

তাঁর লেখা একটি কবিতায়ও আছে এরকম ভাবনার বহিঃপ্রকাশ—

"তাহাই কবিতা। আমি চতুর্দিকে চোখ রেখে রেখে
পৃথিবীর পায়ের ডগার থেকে মস্তক অবধি
যা-কিছু দেখতে পাচ্ছি, প্রতিটি নিঃশ্বাসে
যা-কিছু গ্রহণ করেছি বুকের ভিতরে,
যা-কিছুতে হাত রাখছি, কিংবা বাঁ পায়ের
লাথি মেরে হটাচ্ছি যা-কিছু,
তাহাই কবিতা।" তাহাই কবিতা/ নক্ষত্র জয়ের জন্য

তাই নীরেন্দ্রনাথ কবিতা রচনার সময় মগ্ন-চৈতন্যে উঁকি না মেরে তাঁর চারপাশের চেনাজানা জগতকে এবং সর্বোপরি নিজের চোখে দেখা মানুষকে প্রাধান্য দেবার কারণে তাঁর কবিতা তথাকথিত কাঠিন্য বা দুরহতা থেকে মুক্তি পেয়েছে।

সারা পৃথিবীর কবিতার নিরিখে বলা যায়, প্রেম ও প্রকৃতি কবিতার প্রধান আলম্বন বিভাব এবং এই দু'য়ের বর্ণনায় তাবৎ কবিদের আবেগ আতিশয্যের অন্ত নেই। কিন্তু নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রেম ও প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে কবিতা রচনা করলেও আবেগ আতিশয্যের প্রবাহমান স্রোতধারায় নিজেকে ভাসিয়ে দেননি। বরং—

> "তিনি বাংলা কবিতাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন অকারণ ভাবালুতা, রোমান্টিক ধূসরিমা এবং আর্দ্র সেন্টিমেন্ট থেকে। মানুষ-মানুষীর আবেগ সর্বস্ব প্রেমকে ঘিরে যে বহুযুগবাহিত ট্র্যাডিশন, অতিরঞ্জিত ঐতিহ্য, অতিকথনের আতিশয্য, সেসব থেকে স্বেচ্ছায় এক ধরনের নির্বাসনকে বেছে নিয়েছিলেন তিনি। কবিতাকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন এমন একটা নিশ্চিত নিরেট জমির উপর যেখানে অলীক ভাববিলাস বা বিহ্বল চিত্ত-চাঞ্চল্যের কোন অনুমোদন নেই।"[৩]

নীরেন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় কোন বিষয়কে অকারণে জটিল করে তোলেন নি; অথচ চকিতে যে কোন বিষয়ের আন্তর সত্যটিকে তিনি উদঘাটিত করেছেন কি সুন্দর অনায়াস নিপুণতায়। অতিশয়োক্তি প্রেমভাবনা প্রকাশে একটি মান্য মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এসেছে। যেমন সুধীন্দ্রনাথের কবিতা—

"একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী;

একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি;" শাশ্বতী/অর্কেস্ট্রা

নীরেন্দ্রনাথের উচ্চারণ এমন অতিশয়োক্তিকে সমর্থন করেনি; কিংবা রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর ভাবনা অতীতচারী এবং রহস্যময় নয়। প্রেম সম্পর্কে নীরেন্দ্রনাথের উপলব্ধি একান্তই নিজস্ব এবং তা আন্তরিকতায় আপ্লুত। নীরেন্দ্রনাথের প্রেম পরকীয়া নয়, স্বকীয়া— এবং তাতেই তিনি তৃপ্ত। তাঁর প্রেম একই সঙ্গে রোমান্টিক ও গার্হস্থ্যপ্রবণ।—

"একে একে বানিয়ে তুলবো সব, তুমি দেখে নিও।
বাড়িঘর খেতখামার,
উঠোনে লাউয়ের মাচা, জানালার পাশে
লতানে জুঁইয়ের ঝাড়—
একে একে সমস্ত বানাব, তুমি
দেখে নিও।
ভালোবাসা থাকলে সব হয়।"

তুমি দেখে নিও/ কলকাতার যীশু

'ভালোবাসা থাকলে সব হয়'— এমন সহজ, সরল ও একান্ত আন্তরিক উচ্চারণ নীরেন্দ্রনাথের কবিতাকে প্রাণময়, জীবন্ত করে তুলেছে। তাই পাঠক একবার এই পংক্তি উচ্চারণ করে থেমে গেলেও মনের মধ্যে তা অনুরণিত হতে থাকে বারবার—'ভালোবাসা থাকলে সব হয়...'।

প্রেম ভালোবাসা যেমন সমস্ত কিছুকে সম্ভব ও সফল করে তোলে তেমনি প্রেম বিহীনতায় যাবতীয় কিছু যে না হয়ে যায়— সে কথাও কবি জানিয়েছেন তার স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বস্ত উচ্চারণে—

"আমি তাকে গত সাক্ষাৎকারে
বলেছি যে, দক্ষিণের হাওয়া
আবার উত্তরে ঘুরে যাবে।
বলেছি, সন্ধ্যার দীর্ঘ ছায়া
ছিঁড়ে খুঁড়ে যাবে।
সন্ধ্যায় বাড়াবে থাবা অতীত শীতের অন্ধকার।
যদি না হৃদয়ে থাকে প্রেম।
যদি না হৃদয়ে থাকে প্রেম।
যদি না হৃদয়ে থাকে প্রেম।"

প্রধান আঁধারে/ অন্ধকার বারান্দা

কবি নীরেন্দ্রনাথের প্রেম কামগন্ধহীন, কিন্তু সৌরভময়। তাঁর কবিতায় প্রিয়তমা নারীর শরীরী বর্ণনা আমাদের সন্ধানী দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে না। কবি তাঁর প্রিয়াকে কখনো নগ্ন

করে ভেবেছেন বলেও আমাদের মনে হয় না। যেমন ভেবেছেন অগ্রজ কবি বুদ্ধদেব বসু—

“...শঙ্খের মতো গ্রীবা, দুটি কান যেন উজ্জ্বল কমন্ডলু
বুকের দুটি মাংসপিণ্ড নৈবেদ্যের মতো বিদগ্ধ ও বর্তুল
মন্ত্রোচ্চারণের ছন্দ তার জানুতে ও জঙ্গায়—”

মরচে পড়া পেরেকের গান/ মরচে পড়া পেরেকের গান

প্রেম ভালোবাসা মূলত তাঁর কবিতায় অমেয় অনুপ্রাননা হয়ে অম্লান জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তাই তাঁরপ্রথম ও শেষ উচ্চারণ ‘ভালোবাসি’।

প্রকৃতিকে নিয়েও তাঁর কবিতায় কোনরকম আবেগ-আতিশয্য বা অতিরিকের প্রকাশ নেই। কিংবা রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দের মতো অতিরিক্ত আত্মমগ্নতারও বহিঃপ্রকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘বসুন্ধরা’ কিংবা জীবনানন্দের ‘ঘাস’ প্রভৃতি কবিতা স্মরণীয়। নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতির যে চিত্র আভাসিত হয়েছে তা একান্তরূপে চারপাশের চোখে দেখা প্রকৃতি। যেখানে দৃষ্টির-দর্শনই মুখ্য, তার অতিরিক্ত কোন মনন বা চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ নেই। তাঁর বেশ কিছু কবিতায় এসেছে আকাশের প্রসঙ্গ। যেমন—

এক. “স্নানের পাট চুকিয়ে
মেঘের শাড়ি খানাকে খুলে রেখে
আশ্বিনের খটখটে রোদ্দুরে নিজেকে শুকিয়ে নিচ্ছিল
আকাশ। ”

লাল দিঘিতে বৃষ্টি/সময় বড় কম

দুই. “সাবান দিয়ে আচ্ছা করে কেচে তারপর
নীলের গামলায় জব্বর করে
চুবিয়ে নিয়ে
আকাশ জুড়ে টান করে কেউ
পেতে রেখেছিল
সূর্যদেবের গায়ের সাদা চাদর।”

এই-বৃষ্টি নেই-বৃষ্টি/যাবতীয় ভালোবাসাবাসি

তিন. “আমি দেখেছিলুম যে,
পুবের আকাশে মেঘ জমেছে। কিন্তু
স্বর্গের দর্জি সেই
কালো মেঘের চতুর্দিকে অতিশয়
দ্রুত হাতে বনে যাচ্ছে
জরির পাড়।”

হরিদ্বার ছাড়িয়ে/জঙ্গলে এক উন্মাদিনী

ঘরের বাইরে বেরোলেই খোলা আকাশের নীচে সকলকে দাঁড়াতে হয়। তাই বোধহয় নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় বারে বারে এসেছে আকাশের প্রসঙ্গ। লক্ষণীয় যে, কবি আকাশের কথা বলতে গিয়ে আকাশের ওপারে আকাশকে খোঁজেননি, বরং আকাশের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি যেসব বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যেমন—শাড়ি, সাবান, গামলা, চাদর, জরির পাড়, দর্জি প্রভৃতি আমাদের দৈনন্দিন সমাজ-জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংলগ্ন। অথচ বর্ণনার আশ্চর্য গুণপনায় তা কাব্য সুষমায় মন্ডিত হয়ে উঠেছে।

কোন বিশেষ ঋতুর প্রতি কবিদের বিশেষ আকর্ষণ ও অনুরাগ থাকে। এই বিশেষ ঋতু-প্রীতি অনেক সময় আমাদের কবিরমানস-প্রবণতা বুঝতে সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথের যেমন বর্ষা, জীবনানন্দের হেমন্ত— নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় তেমনি শরতের প্রাধান্য। বর্ষার বিদায়ে বেজে ওঠে শরৎকালীন আগমনী গান—

"বর্ষা কাটছে, এখন আকাশ
বলছে, আসছে আশ্বিন মাস।"

হাসপাতালে-১/ জঙ্গলে এক উন্মাদিনী

আর—

"আশ্বিন বলতেই চোখে ভেসে ওঠে রোদ্দুরের ছবি,
চক্রাকারে চিল
মাথার উপর দিয়ে ডানা মেলে
উড়ে যায়
মেঘের জানালার দিকে,আশ্বিন বলতে
আলোর তরঙ্গে ধোয়া দৃশ্যাবলী চোখের সম্মুখে
দেখতে পাই।"

আশ্বিন দিবসে/ পাগলা ঘন্টি

শরৎ ঋতুর রাণী; অঙ্গ জুড়ে তার সর্বাঙ্গীন স্ত্রী ও সৌন্দর্যময়তার ছাপ, সেই সঙ্গে সমৃদ্ধিরও। কবি ও সকলের জন্য এমন সমৃদ্ধিময় পুরন্ত ভ্রান্ত জীবন কামনা করেন—

"আহা, সবাই বুঝে যাক,
চলতে থাকুক খেলা
পুরন্ত হোক ঘর—গৃহস্তি, ভরন্ত খেত খামার।"

বৃদ্ধ রাজা/ নক্ষত্র জয়ের জন্য

তাই নীরেন্দ্রনাথের প্রিয় ঋতু শরৎ। আমরা বলেছি নীরেন্দ্রনাথ সহজ ভাব ও সহজ ভাষার কবি। ভাবগত ও ভাষাগত যাবতীয় জটিলতাকে পরিহার করেও যে কবিতা কবিতা হয়ে উঠতে পারে যেন তারই অলিখিত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন নীরেন্দ্রনাথ। উদ্ধৃত পংক্তি গুলির সহজ সরল এবং আন্তরিক উচ্চারণ সে কথাটিরই যেন প্রমাণ তুলে ধরে।

কবি নীরেন্দ্রনাথের মুখ্য পরিচয় এই নগ্ন সমাজের ব্যাখ্যাতা তিনি, এই সুস্থ জীবনের ভাষ্যকার। কখনো কখনো তিনি সামাজিক বিবেকের ভূমিকায়ও অবতীর্ণ। নীরেন্দ্রনাথের জন্ম ১৯২৪-এ। ফলে কবির বেড়ে ওঠা এমন এক বিনাশী সময়ের পটভূমিকায় যে, যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আঁচ থেকে নিজেকে বিযুক্ত রাখা অসম্ভব প্রায়। কারণ কবি সমাজ বিবিক্ত কোন কল্পলোকের অধিবাসী নন। এ বিষয় নীরেন্দ্রনাথ জানান—

> "কবির কাজ তাঁর নিজস্ব হৃদয়কে উন্মোচিত করে দেখানো। কিন্তু তার মানে কি এই যে শুধু ব্যক্তিগত কিছু দুঃখ সুখের কথাই তিনি বলবেন? আমার তা মনে হয় না। ...তিনিও সামাজিক মানুষই।"[৪]

বস্তুতপক্ষে নীরেন্দ্রনাথ ছিলেন আপাদমস্তক এক সামাজিক মানুষ। তাই চারপাশের সমস্ত কিছুর দ্রষ্টা তিনি, কেবল দ্রষ্টা নন, তার ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভের অংশভাগ ও দায়ভাগও তিনি। তা এড়িয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। এবং কবি তা এড়িয়েও যাননি।

বিশ শতকের প্রথম অর্ধ ছিল কি দেশীয়, কি বৈশ্বিক সবদিক থেকে সমাজ সভ্যতার সংকট ও বিপর্যয়ের কাল। দু'-দুটো মহাযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান ও আস্ফালনের পাশাপাশি দেশের পরাধীনতা, স্বাধীনতা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দুর্ভিক্ষ সবকিছু মিলে এক অদ্ভুত আঁধার নেমে এসেছিল এই পৃথিবীতে। পৃথিবীর সকল ভাষার কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক এই ভাঙ্গন বিপর্যয় আর ধ্বংসের কথা তাঁদের সৃষ্টিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্যের কবি টি এস এলিয়ট থেকে শুরু করে বাংলা বাংলা ভাষার আধুনিক কবিরাও তাঁদের কবিতায় তা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। এলিয়ট সমকালীন ভাঙ্গন-জর্জর অনুর্বর পৃথিবীর বর্ণনা করলেন 'ওয়েস্ট ল্যান্ড'বলে। তিরিশের বাঙালি কবিরা যেমন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণুদে, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখেরা তাঁদের কবিতায় নানান প্রতীক চিত্রকল্পের মধ্যস্থতায় সেই সার্বিক সংকটকে বাণীরূপ দিতে চেস্টিত হয়েছেন। সবসময় তা সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে এমন নয়। অনেক সময় তা ভাবনাগত ও ভাষাগত কারণে জটিল বা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। মহাযুদ্ধোত্তর জটিল ও যান্ত্রিক পৃথিবীর চালচিত্র সহজ সরল ভাষায় তা প্রকাশ করা সম্ভব নয় এই ছিল তাঁদের অভিমত। কিন্তু নীরেন্দ্রনাথ কোনরকম প্রতীক-চিত্রকল্পের আশ্রয় না নিয়ে স্বভাবসিদ্ধ সরলতায় সেই আঁধার পৃথিবীর বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর কবিতায়—

"পিতামহ, আমি সেই দারুণ নিবিড় অন্ধকারে
দাঁড়িয়ে রয়েছি। পিতামহ,
দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর চেয়ে দেখছি রাত্রির আকাশে
ওঠেনি একটাও তারা আজ।
মনে হয়, আমি এক অমোঘ মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়েছিআশ্রয়।
আমি ভিতরে বাহিরে যেদিকে তাকাই

আমি স্বদেশ বিদেশে যেখানে তাকাই—
শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার
অন্ধকারে জেগে আছে মৌলিক নিষাদ— এই ভয়।” মৌলিক নিষাদ/ অন্ধকার বারান্দা

ভাব ও ভাষাগত কাঠিন্যকে পরিহার করে ‘আকাশে ওঠেনি একটাও তারা আজ' কিংবা একাধিকবার ‘অন্ধকার’ কিংবা ‘শুধু অন্ধকার’ প্রভৃতি শব্দ বা শব্দযৌগের ব্যবহারে সমকালীন নানামাত্রিক অন্ধকারকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি, তা দিনের আলোর চেয়েও স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়েছে।

নীরেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে বেশ কিছুদিন সাংবাদিকতার পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। সাংবাদিকের কাজ হল সহজ ভাষায় যথাযথ খবর পরিবেশন করা। নীরেন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে বসে তার সাংবাদিক সত্তাকে ভুলে না গিয়ে বরং তার সঙ্গে কবিসত্তার আশ্চর্য সহযোগে ‘সংবাদ-কবিতা’র নবজন্ম দিলেন—

“মানুষগুলি তখন পোকা মাকড়ের মতো মরে যাচ্ছিল।
সে বড় অদ্ভুত একসময়।
পলকা ঠুনকো কাচের বাসনের মতোই তখন
ভেঙে যাচ্ছিল সব মূল্যবোধ।
কি দেখিনি আমি এখানে?
সাফল্য, হতাশা, দারিদ্র, বৈভব, বোমা, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা—
চল্লিশের সেই
স্বপ্নে আর দুঃস্বপ্নে ভরা দিনগুলিতে
সবই আমি দেখেছি।
দেখেছি, ছাত্র মিছিলের উপর দিয়ে ছুটছে
লালবাজারের
মাউন্টের পুলিশের ঘোড়া, দেখেছি,
ধর্মতলা স্ট্রীটের ট্রাম লাইনের উপর ছড়িয়ে রয়েছে
চাপ চাপ রক্ত
কেমিস্ট্রি প্রাকটিক্যালের খাতা, ভাঙ্গা চশমা আর
ছেঁড়া চপ্পল।” চল্লিশেরদিনগুলি/চল্লিশের দিনগুলি

কবির কাজ সাংবাদিকতা করা নয়, সাংবাদিকের কাজও নয় কবিত্ব করা। তবে নীরেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এই যে তিনি সাংবাদিক সারল্যকে কবিতার সারল্যে বদলে দিয়েছেন। এখানেই তার হাতযশ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় ব্যবহৃত সহজ সরল ভাষা অসামান্য দার্ঢ্যতা গুণ লাভ করেছে তাঁর বলিষ্ঠ উচ্চারণের কারণে। কাব্যের সুর-সাধনায় তিনি তাঁর গলা সপ্তমে না তুলেও পাঠকের মনে সমান আবেদন জাগাতে সক্ষম হয়েছেন তাঁর এই কণ্ঠ না-কাঁপা উচ্চারণের কারণে। দু’টি উদাহরণে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে—

এক. "নিস্তার নেই গো বাবুমশাইরা,
এই তোমাদের বাঘ সিঙ্গিতে ভরা জঙ্গলের মধ্যে
পাগলদেরও নিস্তার নেই।" জঙ্গলে এক উন্মাদিনী/ জঙ্গলে এক উন্মাদিনী

মানুষ যতই সভ্যতার বড়াই করুক না কেন, সে যে তার পূর্বজন্মের ঘৃণ্য আদিমতাকে জয় করতে ব্যর্থ হচ্ছে নিয়ত তা পারুলবালার এই দৃপ্ত উচ্চারণে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দুই. "মাটি বলতে তিনি নির্বাচন কেন্দ্র বোঝেন, এবং
মানুষ বলতে ভোটার।
রামপুরের মাটি যে সাত ফুট জলের তলায় শুয়ে আছে,
এই খবরে তাঁর
সুনিদ্রার কোন ব্যাঘাত ঘটেনি,
কেননা
রামপুর তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত নয়।" না রাম, না গঙ্গা/ পাগলা ঘন্টি

লক্ষ্যনীয় যে, কত সহজ কথায় কবি এখানে ভোট সর্বস্ব মেকী রাজনৈতিক নেতাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। আর এই জাতীয় কবিতা পড়েই বোধহয় অনুজকবি সুবোধ সরকার মন্তব্য করেছিলেন—

> "নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা থাপ্পড়ের মত। তাঁর কবিতা একবার পড়তে শুরু করলে যেহেতু পাতা উল্টে চলে যাওয়া যায় না, সুতরাং শেষ পর্যন্ত একটা গাল এগিয়ে দিতেই হয়।"[৫]

জীবনের সমস্যা সংকট বিপর্যয় যাই থাকুক না কেন কবিতাকে সর্বৈব সত্য বলে মানেন না। ভাঙ্গা-গড়াকে জাগতিক সত্য ও জীবন-সত্য বলে জেনেছেন তিনি। তাই যদি ভেঙে থাকে তার জন্য দুঃখ না করে কিংবা নিশ্চুপ জড় হয়ে বসে না থেকে এক্ষুনি তা গড়ে নিতে হবে একক বা সমবেত প্রচেষ্টায়— এই আশাবাদী সুর কবি নীরেন্দ্রনাথের প্রাণের সুর—

"সমস্যার খুলতে হবে জট
চতুর্দিকে আমূল পাল্টাতে হবে দৃশ্যপট।
বৃদ্ধ যাতে ভোলে শোক,
হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে বেড়ে ওঠে সমস্ত বালক,
ভিটে মাটি কোথাও না করে খাঁখাঁ।"পাগলা ঘন্টি/ পাগলা ঘন্টি

জীবনকে গড়ে নিতে হবে এই কথা সবথেকে বেশি সংখ্যক পাঠকের কাছে যে কবি পৌঁছে দিতে চান তাঁর উচ্চারণ দুরূহ বা দুর্বোধ্য হলে তিনি যে ব্যর্থ হবেন এ কথা বুঝতে দু'বার ভাবার দরকার পড়ে না। কবিও দ্বিতীয়বার ভেবেছেন বলে মনে হয় না। নতুন কিছু গড়ার প্রশ্নে অনেক সময় ভাঙার দরকার পড়ে। তাই কবি আগামীর সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করতে নির্দ্বধ কণ্ঠে ডাক দেন ভাঙার খেলা সাঙ্গ করার জন্য—

"কাপড় শুকোচ্ছে রোদ্রে, ছিঁড়ে ফেলো।
কার্নিশে ফুলের টব আকাশ দেখছে,
দেখতে দিওনা,
লাথি মেরে রাস্তার মাঝখানে তাকে ফেলে দাও।
লতানে গোলাপ তার তিন দিনের যৌবনে দেখিয়ে
হাততালি চাইছে,
শিকড় সমেত তাকে উপড়ে আনো।
এখন ভাঙার খেলা। ভেঙ্গে যাও। কোনো দিকে
দৃকপাত কোরোনা।" এসো হে তোমরা/ নক্ষত্র জয়ের জন্য

মৃত্যু ভাবনার কথাও এসেছে নীরেন্দ্রনাথের কবিতায়; তবে মৃত্যুকে নিয়ে আলাদা কোনো আবেগ ধরা পড়েনি তাঁরকবিতায়। মৃত্যুকে জীবনের একটা অংশ বলে জেনেছেন তিনি। এবং সেই সঙ্গে মৃত্যুর আকস্মিকতা সম্বন্ধেও সচেতন তিনি—

"দেখতে দেখতে কেটে যাচ্ছে বরাদ্দ সময়।
ভাবছেন এ তিনি যে, এই ছড়ানো সংসারে
যে-কোনো মুহূর্তে ঘন্টা বেজে যেতে পারে।
বাজলে আর রক্ষে নেই।এসে পড়বে গাড়ি
গুটিয়ে ফেলতে হবে এক্ষুনি পাততাড়ি।" ধরা রইল/ অন্য গোপাল

তবে মৃত্যু নয়,তাঁর কবিতায় জীবন-ই কথা বলেছে বেশি। অর্থাৎ নীরেন্দ্রনাথ মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে জীবনের কথা বলেননি, বরং জীবন মৃত্যুর এই মিষ্টি-মধুর দ্বৈরথে জীবন-ই জয়ী থেকেছে সর্বত্র—

এক. "অন্ধকারের মধ্যে
নিজেরই দুই চোখে দুই অগ্নিশিখা জ্বেলে
মৃত্যুর মুখের উপর তর্জনী তুলে
জীবন বলছে,'তুমি ফিরে যাও'।
জীবনকে আর কখনও এত
জীবন্ত দেখায়নি।"জীবন্ত দুপুর/ সময় বড় কম

দুই. আরো কয়েকটা বছর
এই পৃথিবীর
ভালোবাসার চাঁছি না খেয়ে আমার
শান্তি নেই।
ঠিক এক্ষুনি আমি মরবনা।
... ...
জানালার পাল্লা থেকে
শূন্যে বাঁক দিয়ে

বাতাসে তার কালো বিশাল ডানা ছড়িয়ে
মৃত্যু এখন ফিরে যাচ্ছে।"এক্ষুনি নয়/ জঙ্গলে এক উন্মাদিনী

জীবন সম্পর্কে এই আত্মপ্রত্যয়ী আশাবাদী সুর কবি নীরেন্দ্রনাথের আত্মপরিচয়। তাই জীবনে যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-দীর্ণতা, বিষন্নতা-ব্যথা-বেদনা ও সমস্যা-সংকট-বিপর্যয় প্রকৃতিকে অস্বীকার না করেও সহজ ও নিভৃত উচ্চারণে পরম বিশ্বাসে বলতে পারেন—

"একদিন সমস্ত যোদ্ধা বিষন্ন হবার মন্ত্র শিখে যাবে।
একদিন সমস্ত বৃদ্ধ দুঃখহীন বলতে পারবে, যাই।
একদিন সমস্ত ধর্ম অর্থ পাবে ভিন্ন রকমের।
একদিন সমস্ত শিল্পী কল্পনার প্রতিমা বানাবে।
একদিন সমস্ত ধর্মযাজকের উর্দি কেড়ে নিয়ে
নিষ্পাপ বালক বলবে। হা হা।
একদিন এইসব হবে বলেই এখনো
সূর্য ওঠে বৃষ্টি পড়ে এবং কবিতা লেখা হয়।" একদিন এইসব হবে, তাই/ কবিতার বদলে কবিতা

তাই নীরেন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার মূল্যায়নে যখন বলা হয় যে—

> "আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতার সব আবরণ ছিড়ে ফেলে কবিতার শরীরে আনলেন সরল সত্যের দীপ্তি। বাংলা কবিতায় একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন তিনি। এই পর্যায় থেকে তাঁর কবিতা বৃহত্তর পাঠক সমাজকে খুব কাছে ডেকে আনল। আধুনিক কবিতা সম্পর্কে যাঁদের ভয় ছিল,তাঁদের ভয় তিনি ভাঙলেন,রোদ্দুর-বাতাস-বৃষ্টির মতন ...কবিতার রসও গ্রহণযোগ্য হল।"[৬]

তখন তা যথার্থ মূল্যায়ন বলে মেনে নিতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না।

উল্লেখ-পঞ্জি:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: সমালোচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী-দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ - ১৩৪৮, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-১১১
২. সাক্ষাৎকার, কবিতাই আমার মাতৃভাষা: নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সংখ্যা, বইমেলা ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ১৭৬
৩. গঙ্গোপাধ্যায়, সুব্রত: নীরেন্দ্রনাথকে পাঠ করা আমার কাছে এক পাঠক্রম, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সংখ্যা, বইমেলা ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ১৮
৪. মুখোপাধ্যায়,তরুণ: চল্লিশের দিন ও দুই কবি, বুকস স্পেস, কলিকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা- ৪
৫. পাল, অপর্ণা: চল্লিশের চালচিত্র/ দুই কবি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০০৯, পৃষ্ঠা- ৯২
৬. কবি পরিচিতি, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কবিতা সমগ্র- ১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ২০১০

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় ‘স্বদেশ ভাবনা’

রসরাজ রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
চাঁচল কলেজ, চাঁচল, মালদা

আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের উনিশ-বিশ শতকের অন্যতম কবি হলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি কখনও প্রচারের আলোয় আসেননি। অনেকে হয়তো তাকে ব্রাত্য মনে করতে পারেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে সময়ে বসে কবিতা লিখতে শুরু করেন, সেই সময়ের প্রেক্ষাপট আমাদের জানা প্রয়োজন। একদিকে আমরা শৃঙ্খলে বন্দী, অপরদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু ও শেষ। এর কয়েক বছর পরে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। তিনি দেখেছেন ভয়াবহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথমত স্বাধীনতা সংগ্রামী অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত থেকেও দেশ ভাগ হওয়া থেকে আটকাতে পারলেন না। দেশ বিভাগ জনিত যন্ত্রণায় তিনি ছিলেন মর্মাহত। পরবর্তী কালে বামপন্থী পন্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন —

> ‘যখন স্কুলে পড়তাম তখন আমি টেররিস্ট পার্টির হুকুমে ওঠবোস করেছি। যখন আরেকটু বড় হয়েছি তখন আমি চেষ্টা করেছি একজন ক্ষুদে কমিউনিস্ট হতে।'

(নান্দীমুখ-১৯৮০)

বামপন্থী পার্টির সূত্র ধরেই ১৯৪২ সাল থেকে তিনি ‘অরণি’ পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা লিখতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে বামপন্থী রাজনীতি থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে নেন। তিনি কখনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেননি। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বিচারিতা পছন্দ করতেন না। তাই তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে দ্বিচারিতা শূন্য। ঢাল তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না, তাই তিনি কলম ধরলেন।

১৯৪৬-৪৭ এ ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, নকশাল আন্দোলন, ১৯৫৯ থেকে খাদ্য সংকট ও খাদ্য আন্দোলন, চীন-ভারতযুদ্ধ (১৯৬২), পুলিশ, মহাজনদের অত্যাচার, আসামের ভাষা আন্দোলন প্রভৃতি ছিল তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। তাঁর লেখনী সত্তা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোষণ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সদা জাগ্রত ছিল। তাঁর কবিতায় উঠে আসে ভ্রষ্টাচার, শাসকের নির্মম অত্যাচার, ভন্ডনেতা কবি এবং মুখোশধারী সাংবাদিকদের কীর্তিকলাপ।

প্রথম জীবনে প্রেমের কবিতা লিখে কাব্যজগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। নারীকে কাছে পাওয়ার আর্তি ও না পাওয়ার বিরহ ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা যায়।কবিতার নামকরণগুলি লক্ষণীয় ‘তোমার বিয়ের আগে’, ‘তোমার সিঁথিতে চিহ্ন’, ‘তুমি তো চলেই গেলে’

তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যগ্রন্থ — 'গ্রহচ্যুত', 'রাণুর জন্য', 'লখিন্দর' প্রভৃতি। 'রাণুর জন্য' থেকে তাঁর মনে হয়েছে স্বাধীনতা শুধু তামাশা আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। কবি জনতাকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সংঘবদ্ধ জনতারাই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবে। তিনি কখনও আশাহত হননি। তিনি ব্যথা-বেদনা, অন্যায়, শোষণের কাছে কখনও মাথা নত করেননি।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দহন জ্বালায় পীড়িত হয়ে লিখতে শুরু করেন নাগরিক জীবন নিয়ে। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন — 'চল্লিশের একজন পুরোধা কবিও দেশ ভাগের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন না।' বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই ধরনের মন্তব্য অস্বীকার করার অবকাশ নেই। তিনিই একমাত্র কবি যিনি উপলব্ধি করেছেন একার পক্ষে অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। তাই তিনি কবিতার মাধ্যমে সংঘবদ্ধ জনতাকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জীবনে চলার পথে কারো সঙ্গে আপোস করেন নি, এমন কি রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভুল সিদ্ধান্ত, ভুল নীতির বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। 'স্বদেশ' নামক কবিতায় অনাহারে মৃত্যুর ছবি তুলে ধরেছেন এইভাবে—

'অনাহারে মৃত্যু
অনাহারে মৃত্যু, অনাহারে
আমার স্বদেশ রক্তবমি করছে, আমার স্বদেশ।'

তিনি দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে ভেবেছিলেন যে এবার নতুন ভারতবর্ষ আসবে, যেখানে কোন শাসন, শোষণ, চোখ রাঙানি থাকবে না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এমন স্বাধীনতা মেনে নিতে না পেরে, 'লখিন্দর' কাব্যের 'বেহুলা' কবিতায় রূপকের আড়ালে দেশের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন —

'সে জাগবে। জাগবেই। আমি তাকে কোলে নিয়ে
বসে আছি রক্তে পুঁজে মাখামাখি রাত্রি।
ভেলায় ভাসিয়ে .... ।'

দেশ-ভাগ হওয়া তিনি মেনে নিতে পারেননি। ভারতের ডান ও বাম হাত চিরতরের জন্য দেশের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। এই যন্ত্রণায় কবি সব থেকে বেশী ব্যথিত হয়েছেন। চীন, ভারত আক্রমণ করলে, ভারতের আসামের অনেকটা অংশ চীনের দখলে চলে গিয়েছিল। সেই সময়ে শোচনীয়ভাবে ভারতের পরাজয় হয়। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ভেঙ্গে পড়লেও কবির মন পড়ে থাকত সত্যিকারের স্বদেশের জাগরণের দিকে। কবি সব সময় মানবতার জয়গান করেছেন তিনি কখনও যুদ্ধ সমর্থন করেননি। 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে' নামক কবিতায় তুলে ধরেছেন—

'পৃথিবীতে কোথাও আর নদী পাহাড় আকাশ
কোথাও আর ঘুমিয়ে থাকার ছ, ফুট জমি নেই।'

যুদ্ধ সব সময় জীবনে, পরিবারে, দেশে, বিদেশে ধ্বংসের বার্তা বহন করে চলে। তাই কবি এই ধ্বংস স্তুপের মধ্যে মরতে চান না। বেঁচে থাকার জন্য কবি চাঁদের দেশেও যেতে প্রস্তুত আছেন। 'আমার ভারতবর্ষ' কবিতায় কবি তুলে ধরেছেন —

'কত রাজা আসে যায়, ইতিহাসে ঈর্ষা আর দ্বেষ
আকাশ বিষাক্ত করে
জল কালো করে, বাতাস ধোঁয়ায় কুয়াশায়
ক্রমে অন্ধকার হয়।
চারদিকে ষড়যন্ত্র, চারিদিকে লোভীর প্রলাপ
যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ আসে পরস্পরের মুখে চুমু খেতে খেতে।'

ভারতবর্ষের এইরূপ দৃশ্য তিনি দেখতে চাননি। তিনি চেয়েছেন সাম্য ফিরে আসবে। কিন্তু তিনি শুধু দেখেন চারদিকে দুর্ভিক্ষ, মহাজন-জোতদারদের রক্তচক্ষু শাসানি, বাঘ-হায়না, বেভুনের রক্তক্ষয়ী অত্যাচারে ভারতবর্ষ রক্তাক্ত হয়েছে। বাইরে তাকালে দেখা যায় শুধু রক্তের স্রোত, কঙ্কাল সার সাধারণ মানুষের চেহারা, খাদ্যাভাব, খাদ্য সংকট, মহাজনদের কালোবাজারি প্রভৃতি তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর কবিতায় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে 'উত্তর পাড়া : কলেজ হাসপাতাল' কবিতাটি —

'রক্ত রক্ত শুধু রক্ত' দেখতে দেখতে দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়।
শিক্ষক-ছাত্রের রক্তে প্রতিটি সিঁড়িতে, ঘরে চেয়ারে চৌকাটে'।

সেই সময়ের ক্ষত চিহ্ন কতটা গভীর ছিল নিম্নে উল্লিখিত কবিতার নামকরণ দেখে খুব সহজে উপলব্ধি করা যায়। 'মানুষের মুখ'-১৯৬৪', 'মুন্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে' (১৯৬৪), 'জ্বলুক সমগ্র চিতা অহোরাত্র এপাড়ায় ওপাড়ায়' (১৯৭৩), 'মানুষ খেকো বাঘেরা বড়ো লাফায়' (১৯৭৩) 'ন্যাংটো ছেলে আকাশ দেখছে' (১৯৭৮) ইত্যাদি।

বর্তমান কালের মতো তৎকালীন সময়েও সর্ব সাধারণের অবাধ বাক্ স্বাধীনতায় নিষেধাজ্ঞা জারি থাকত। রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রশ্ন করলে বা জিজ্ঞেস করলে, শাসক শ্রেণীর রোষানলে পড়তে হতো। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় উঠে এসেছে অত্যাচারিত মানুষের কথা। ফলস্বরূপ তাকে জেলে যেতে হয়েছে। জেলে থেকে কবি 'একলা জেলে বন্দী তিনি' কবিতায় উচ্চারণ করেছেন —

'একশো গাধার জয়ধ্বনি
দিন দুপুরে শোনেন তিনি।
শুনতে শুনতে ভাবেন তিনি
বাঘের তাতে কী আসে যায়?'

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জেলে গেলেও কখনও তিনি মাথা নত করেননি। রাষ্ট্রনেতাদের ভুল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন প্রতিবাদ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর 'উলঙ্গ রাজা' কবিতার কয়েকটি পংক্তি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে —

'সবাই দেখছে যে, রাজা উলঙ্গ, তবুও
সবাই হাততালি দিচ্ছে।
....
....
কারও মনে সংস্কার, কারও ভয়;
কেউ বা নিজের বুদ্ধি অন্য মানুষের কাছে বন্ধক দিয়েছে;
কেউ বা পরান্ন ভোজী, কেউ
কৃপা প্রার্থী, উমেদার, প্রবঞ্চক;'

নীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবস্থান বদল করে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা কবিতা — 'নীরেন, তোমার ন্যাংটো রাজা' র কয়েটি চরণ —

'নীরেন! তোমার ন্যাংটো রাজা
পোশাক ছেড়ে পোশাক পরেছে!
নাকি, তোমার রাজাই বদলেছে?'

একদিকে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বুর্জোয়া সমাজ সভ্যতার উপর প্রশ্ন ছুরে দিয়েছেন। অপরদিকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মানুষের কথা বলতে চেয়েছেন। তিনি নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেখেছেন পার্টির গাঙে বেনোজল ডুকতে, শুনেছেন শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। তিনি দেখেছেন মানুষের স্বপ্ন নিয়ে খেলা করতে আর গিরগিটির মতো রঙ পরিবর্তন করতে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শোষণের নতুন চিত্র দেখে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিতার মাধ্যমে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। কবি- নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখতেন। রাতের ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে নতুন ভোর এল ঠিকই, সে ভোর আরও বেশী ভয়ংঙ্কর, যেখানে মনুষ্যত্বের কোন মূল্য থাকে না, প্রেম হেরে যায়। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এক সময় মনে হয়েছে যা লিখেছি সবই অর্থহীন। কঠিন বাস্তবের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি জীবনকে মেলাতে না পেরে আক্ষেপের সুরে কবিতায় তুলে ধরেছেন —

'ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে।
আমি যদি মাটিকে জানতাম!'

তিনি বিশ্বাস করতেন, চারিদিকে ঘন কুয়াশায়, অন্ধকারে ঢাকা থাকলেও দীর্ঘস্থায়ী হবে না। তিনি উপলব্ধি করেছেন শেষ হাসি হবে জনগনেরই। চীন যুদ্ধের কয়েক বছর পর তিনি লিখেছেন মে দিনের কবিতা—

'চারিদিকে নবজন্ম, দেশে দেশে শঙ্খ বাজে,
শোনা যায় মানুষের গান।'

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন স্বদেশের কবি। তাঁর কাছে দল, সঙ্ঘ, গোষ্ঠী কিছুই প্রাধান্য পায়নি। তিনি সব সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। রাষ্ট্রের হুঙ্কারের কাছে তিনি কখনও মাথা নত করেননি, নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেননি। মানুষের স্বপ্ন নিয়ে এক শ্রেণীর সুদখোর, মাফিয়াদের চলছে আখের গোছানোর পালা। ভারতবর্ষের নতুন চিত্র, নতুন রূপ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেনে নিতে না পেরে লিখেছেন- 'প্রতিবাদ' কবিতা। প্রসঙ্গত 'প্রতিবাদ' কবিতায় উল্লেখ্য —

'এভাবে মানুষ নিয়ে খেলা
মানুষের স্বপ্ন সাধ বিশ্বাস সম্মান নিয়ে
মানুষের মস্তিষ্ক হৃদয় নিয়ে
এর চেয়ে আর কী নরক, স্বাধীন স্বদেশ।'

সেই সময়ে অর্থাৎ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের ছাদ/আকাশ দূরে সরে যেতে থাকে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও সাধারণ মানুষের কাছাকাছি চলে আসেন। তাঁর কবিতায় উচ্চারিত হতে থাকে—

'......আমরা সবাই যে ন্যাংটো।
আমরা সবাই রাজা আমাদের এই
রাজার রাজত্বে!'

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মানুষের দুঃখ দেখে চুপ করে না থেকে, কবিতায় সেই বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাই মানুষের সুখ-দুঃখের কথাই তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে। দেশ বিভাগ ও মহামারীর কোপ এসে পড়েছে সাধারণ মানুষের উপর। নিম্নবর্ণের মানুষের কথা তাঁর কাব্যে বিশাল একটা স্থান দখল করে আছে। বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন তাঁর কোন দিনই ছিল না। তাঁর স্বপ্ন ছিল সকলে-যেন সুখে-শান্তিতে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকে। ভারতচন্দ্র রায়গুনাকরের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের ঈশ্বরী পাটনির চিরস্মরণীয় উক্তি —

'আমার সন্তান যেন
থাকে দুধে ভাতে।'

ঠিক তদ্রূপ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর অনুরূপ হিসেবে 'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ' নামক কবিতায় তুলে ধরেছেন মেহেনতি মানুষের বাস্তব চিত্র —

'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে
কারা যেন আজো ভাত রাঁধে
ভাত বাড়ে, ভাত খায়।'

আসলে তিনি ছিলেন জনদরদী, স্বদেশ প্রেমিক। তাঁর লেখায় বারবার উঠে এসেছে স্বদেশের বাস্তব চিত্র। কবি কখনও ঠকবাজদের নীতি আদর্শের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেননি। কবি লক্ষ্য করেছেন সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার যারা খর্ব করেছে তারাই আজ উঁচু মহল দখল করে আছে। কবি অন্যায় কারীদের বুক উঁচিয়ে চলা

দেখতে পেয়ে শোষক শ্রেণীর উৎখাতের জন্য ডাক দিয়েছেন। কবি দেখেছেন দেশ বিভাগের ফলে নিরীহ সাধারণ মানুষ ছিন্নমূল হয়ে ঘর খোঁজার জন্য এপারে ওপারে মফঃস্বল গ্রামে/শহরে ঘুড়ে বেড়াতে থাকে। তিনি আরও দেখেছেন ক্ষুধার তারণায় নিরীহ মানুষকে কুকুরের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে। দুমুঠো ভাতের জন্য সাধারণ মানুষের হৃদয়ার্তি ফুঁটে উঠেছে এইভাবে—

'মাগো, এত ডাকি খিদের দেবতাটাকে
বেশি নয় যেন দুবেলা দুমুঠো নুন-মাখা ভাত রাখে।'

('কালো বস্তির পাঁচালী)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লক্ষ্য করেছেন স্বাধীন দেশে সাধারণ মানুষের নিজস্ব মতামতের গুরত্ব দেওয়া হয় না। সাধারণ মানুষের মগজ ধোলাই করে নেতা-মন্ত্রীদের বড় হওয়ার কাহিনী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নজরে আসে। চারিদিকে শুধু দলের নামে ভন্ডামি, দল ভাঙিয়ে আখের গোঁছানোর পালা। তাই কবির সমাজের কাছে প্রশ্ন—

'দল বড়ো না দেশ বড়ো?
দেশ বড়ো না তুই বড়ো?'

('ভাতে পড়ল মাছি')

সাধারণ মানুষের আত্ম-জাগরণ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় বারবার উঠে এসেছে। বিপদকালে উটপাখি মাথা গুঁজে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার উপায় খোঁজে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মানসিক এবং রাজনৈতিক অবস্থান ছিল ঠিক এর বিপরীতে। ঘোর সংকটকালে তাঁর লেখায় উঠে আসে প্রতিবাদী মানুষের কথা। মানুষের মূল্যবোধ যখন অবক্ষয়ের পথে প্রবহমান তখন তিনি ভেঙে পড়া মানুষের পাশে থেকেছেন। যারা দেশের হাল ধরার পরিবর্তে আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখে তাদেরকে শতর্ক করতে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত কবিতা —

'মন্ত্রী মশায়, একটু ভাবুন
কাদের নিয়ে আপনি
আকাশে দেন লাফ?'

স্বৈরাচারী শাসক মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা বোঝার চেষ্টা করে না, নিজের প্রতিপক্ষকে প্রতিদ্বন্দ্বী না ভেবে শত্রু হিসেবে ভাবতে শুরু করে। আর শুধু চায় রক্ত। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটা সময়ে জানতেন রক্তের বিনিময়ে আসবে স্বাধীনতা। এখন সেটা অতীত, তিনি চারিদিকে শুধু শুনতে পান জনতার আর্তনাদ, জনতার হৃদয়ার্তি। সত্যিকারের স্বদেশের যাঁরা কান্ডারী তাদের চোখে ধরা পড়ে রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রক্তের দাগ। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই রূপ একটি কবিতার লাইন নিম্নে তুলে ধরা হল—

'রক্ত রক্ত শুধু রক্ত, দেখতে দেখতে দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়
শিক্ষক ছাত্রের রক্ত প্রতিটি সিঁড়িতে, ঘরে, চেয়ারে,

চৌকাঠে বারান্দায়!'

....

....

কেউ লাফদিয়েছে বিশ ফুট নিচে; কাউকে ছুঁড়ে দিয়েছে পুলিশ'

('উত্তরপাড়া, কলেজ হাসপাতাল')

তিনি সারা জীবন ধরে সত্যিকারের স্বদেশের অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর চেতনায় উন্মোচিত হয়েছে দেশের মানুষের কথা। দেশের মানুষ হল দেশের মূল্যবান সম্পদ, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কবি দেশের মাটিকে মায়ের মতো দেখেছেন। কবি জানতেন বই, গ্রন্থাগার মানুষকে ঠকায় না, করে না প্রবঞ্চনা ঠিক তদ্রূপ মাটিও কখনো প্রত্যাঘাত করতে জানে না। এখানেই তাঁর কবিতা'জন্মভূমি আজ' প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে —

'যদি তুমি বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে যাও
তোমার স্বদেশ তাহলে মরুভূমি।'

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুধু বাংলা ভাষারই কবি নন, সারা ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের বাইরের অন্যান্য দেশ নিয়েও তিনি চিন্তিত ছিলেন। পৃথিবীতে যখন অন্যায় সংঘটিত হয়েছে তখন কবির মনন বিশ্ব অস্থির হয়ে পড়েছে। আজ বর্তমান প্রজন্মে দাঁড়িয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজা আসে যায়' কবিতা সমহারে গ্রহণযোগ্য—

"রাজা আসে যায়   রাজা বদলায়,
নীল জামা গায়   লাল জামা গায়
এই রাজা আসে,   ওই রাজা যায়
জামা কাপড়ের   রং বদলায়
দিন বদলায় না।"

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সময়ে শোষণ পীড়ন, আধিপত্য বিস্তার ছিল, আজও আমরা এর বেড়াজাল ছিন্ন করে বেড়িয়ে আসতে পারিনি। চারিদিকে শুনতে পাওয়া যায় জনতার কলরব। দিকে দিকে চলছে মানুষের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করে দেওয়ার পালা। রাজার কাছে সামাজিক অবক্ষয়, সামাজিক মূল্যবোধের কোন স্থান নেই। সে শুধু চায় গদি, গদি। একটু গদি, লালসার লোভে জনগণকে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়। সর্বক্ষন মঞ্চে মিথ্যার বুলি শুনিয়ে প্রজাদের ভুল পথে পরিচালিত করা হয়ে থাকে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন একদিন শোষণ, অত্যাচারের অবসান ঘটবে। এখনকার রাজনীতি আর রাজার নীতি নয়। এখনকার রাজনীতি হল দলীয় প্রতীক কাঁধে নিয়ে কিছু করে খাওয়ার নীতি। এই করে খাওয়ার নীতি যতদিন থাকবে ততদিন সাধারণ মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার থাকবে, দলীয় নীতির কোন ভাবাদর্শ বাস্তবায়িত হবে না। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সমাজ, দেশ, বিশ্ব গড়ার কান্ডারী। আজ কঠোর বাস্তবে দাঁড়িয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা জনগণকে এক নতুন দিশা

দেখাতে শুরু করেছে। মানুষের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্যই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। কবি শঙ্খ ঘোষ যথার্থ্ই বলেছেন —

"সত্তর সালের অল্প আগে থেকে সমস্ত দশকজুড়ে উঠতে থাকে তার ক্ষুদ্র মুখ্যছবি, সমস্ত ভণ্ডতা আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশের বিবেক ছড়িয়ে পড়তে থাকে তাঁর বিরামহীন প্রতিবাদে সেই প্রতিবাদে কাব্যরীতির অনেক পুরনো শর্ত নিশ্চয়ই ভেঙে ফেলেন তিনি, ভেঙে ফেলেন ছন্দ প্রতিমার অনেক প্রাক সংস্কার, শিল্পিত কবিতা লেখা হলো না বলে ছন্দ বিলাপও করেন কখনও বা নিরাভরণ ঘোষণার ভাষাই বা পথচলতি দৈনন্দিন রূঢ়তায় ছড়িয়ে দেন তিনি, কবিতা আর কবিতা বিচারের এক নতুন মানে তখন আমাদের তৈরী করে নিতে হয়। তাঁরই কবিতার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ সামনে রেখে।"

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

(১) 'কবিতার বহুস্বর' – তপোধীর ভট্টাচার্য
(২) 'কবির প্রেম, কবির প্রতিবাদ'— তরুণ মুখোপাধ্যায়
(৩) 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'— ডঃ দেবেশ কুমার আচার্য
(৪) 'আধুনিক' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'— তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়
(৫) 'কবিতার দ্বীপ কবিতার দীপ্তি'— জহরসেন মজুমদার

বনফুলের বুধ্নী : মানব মনস্তত্ত্বের এক নিবিড় পাঠ

প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : সাহিত্যিক বনফুল ছিলেন এক বিচিত্রচারী স্রষ্টা। সেটিই ছিল তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। স্বাভাবিক কারণেই নিজের সাহিত্য সৃষ্টির কালে তিনি তাঁর গল্প উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছিলেন মানব জীবন – সমাজ ও মনের বিচিত্র গতিকে। যদিও তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের আঙ্গিক ও লেখনশৈলী বারে বারে বিস্মিত করেছে সমালোচক ও পাঠককে। বৈজ্ঞানিক মনস্কতা নিয়ে তিনি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির পথে হেঁটেছিলেন। ফলে সেখানে ছিল এক অদ্ভুত নিস্পৃহতা। আর সেই নিস্পৃহতা নিয়েই তিনি মানব মনস্তত্ত্বের যে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করেছিলেন তাঁর সাহিত্যে তা চমৎকৃত করে আজকের পাঠককেও। বুধ্নী তাঁর সেই ধারারই একটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প। যা প্রকৃতপক্ষেই একটি ছোটগল্প। খুবই ছোট অবয়বের এই গল্পে তিনি বিলটু চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন মানবমনের সেই বিচিত্রগতির রূপকে। যার কোনও ব্যাখ্যা হয়তো আপাত দৃষ্টিতে করা সম্ভব নয়। তাই নিজের সন্তানকে ঈর্ষার বশে খুন করা বিলটুর শেষ অব্দি ফাঁসি হলেও যার নাম ধরে ক্রমাগত ভাবে সে কাতর স্বরে ডেকে গিয়েছিল শেষ নিঃশ্বাস অব্দি সেই বুধ্নীর কি হল তা জানা যায় না। জানা যায় না বুধ্নীর মনের কথাও। তারপরেও গল্পটি পাঠককে মানব মনস্তত্ত্বের নিবিড় পাঠ দেয়।

সূচক শব্দ : মানবমন, মনস্তত্ত্ব, বিচিত্র গতি, প্রেম, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, উওরণ, পরিণতি।

বাংলা সাহিত্যের এক বিচিত্রচারী স্রষ্টা হলেন সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুল। লেখালেখির জগতে তাঁর পথচলা ছাত্রাবস্থা থেকে কবি রূপে শুরু হলেও কথাসাহিত্যিক রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ হয় কল্লোলের সম-সাময়িক কালের এক নব পর্যায়ে যেখানে তাঁর স্রষ্টা মানস যেন প্রকৃত বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু কথাসাহিত্যের জগতে আত্মপ্রকাশের পর কথাসাহিত্যিক বনফুল বহুমাত্রার উপন্যাস – ছোটগল্প পাঠককূলকে উপহার দিয়েছেন। তবে তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের রচনার আঙ্গিক ও লেখনশৈলীতে প্রভেদ এতখানিই ছিল যে বহু সমালোচকই তাঁর উপন্যাসের তুলনায় ছোটগল্পের আলোচনায় যথেষ্ট বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। সাহিত্যিকের প্রথম গল্প 'চোখ গেল' ১৯২৩ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও বিষয়ের বৈচিত্র্যে অনন্য ছোটগল্পকাররূপে তাঁর প্রকাশ ঘটেছিল 'শনিবারের চিঠি'কে কেন্দ্র করে। যদিও তিনি সেই 'শনিবারের চিঠি' গোষ্ঠীর মধ্যে থেকেও ছিলেন এক স্বতন্ত্র ধারার। প্রকৃতপক্ষে

জীবনে চলার পথে বহু অভিজ্ঞতার অধিকারী এই সাহিত্যিক জীবনকে দেখেছিলেন এক নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে, যে দেখার মধ্যে মিশেছিল একজন স্রষ্টা এবং বিজ্ঞানী উভয়ের নিঃস্পৃহতা। সেই দৃষ্টি নিয়েই তিনি জীবনের চারপাশকে দেখেছিলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, যেখানে জীবন পথের আশে-পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট থেকে ছোট বিষয়ও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। একদিকে সেই সমস্ত ছোট ছোট বিষয়গুলিকেই তিনি তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলিতে যেমন তুলে ধরেছিলেন তেমনই তিনি লেখক হিসেবে কলম ধরাকালীন সময়ে সুখ ও দুঃখ - জীবনের এই দুই প্রান্তের অনুভূতি থেকেই সমান দূরত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাসগুলি পাঠকের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছিল নিজস্ব কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিক নিয়ে। তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলি বহুক্ষেত্রে আয়তনে ছোট হলেও বৈচিত্র্যের দিক থেকে তাতে জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে নানা ভাবে, উঠে এসেছে মানব মনোজগতের নানা দিক। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য সাহিত্যিক বনফুল যে সময়পর্বে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন সেই সময়ে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের জগতে যে প্রবণতা বহমান ছিল তাতে পাশ্চাত্যের নব আবিষ্কৃত সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রতি যুব সমাজের এক অদম্য আকর্ষণ ও অনুকরণের প্রচেষ্টা যেমন ছিল তেমনই ছিল সমাজ ও সময়ের অস্থির বাস্তব চিত্রকে সরাসরি তুলে ধরার প্রচেষ্টার এক স্বতন্ত্র ধারা। কিন্তু প্রবহমান এই স্রোতধারার মধ্যে থেকেও স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছিলেন সাহিত্যিক বনফুল। কারণ তাঁর কথাসাহিত্যের অধিকাংশ রচনার ক্ষেত্রে তিনি মানব জীবন ও সেই জীবনকেন্দ্রিক বাস্তবের নানা রূপকে সরাসরি প্রকাশ করার মাধ্যমকে গ্রহন না করে তার পরিবর্তে এক নির্মোহ ও নিষ্ঠুরতার ছদ্মবেশে ব্যঙ্গ-কৌতুকের মাধ্যমকে গ্রহন করেছিলেন। উদ্দেশ্য - ক্রমশই ঘুমিয়ে পড়া পাঠকের মনোজগতকে একটু নাড়িয়ে দেওয়া। ফলস্বরূপ তৎকালীন সময়ের উচ্ছ্বাস ও বাস্তবকে চিরাচরিত পথে তিনি দেখেননি বরং একটু এড়িয়ে গিয়ে এক নিজস্ব স্বতন্ত্র আঙ্গিক তৈরি করেছিলেন মানবজীবন - মনোজগৎ ও তার বাস্তবকে তুলে ধারার ক্ষেত্রে। বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অদ্ভূত বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর গল্প – উপন্যাসগুলির মধ্যে দিয়ে জীবনের বিচিত্ররূপ নব নব আঙ্গিকে তুলে ধরেছিলেন। ফলস্বরূপ একদিকে যেমন ‘চোখ গেল’, ‘বাড়তি মাশুল’, ‘নিমগাছ’ এর মতো প্রকৃত ছোট ছোট গল্পগুলি পাঠক পেয়েছেন, একই ভাবে পেয়েছেন ‘স্থাবর’, ‘জঙ্গম’, ‘ডানা’র মতো বৃহৎ কলেবরের উপন্যাসও। সর্বত্রই তাঁর সৃষ্টির প্রধান উপজীব্য হয়ে থেকেছে মানুষ এবং তাঁর জীবন।

যেহেতু আমাদের আলোচ্য বিষয় বনফুলের ছোটগল্পকেন্দ্রিক তাই তাঁর উপন্যাসগুলির উল্লেখ করার পরেও একথা বলতেই হয়, ছোটগল্পকার রূপে বনফুলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল একেবারে স্বতন্ত্রভাবে। তাঁর প্রতিটি ছোটগল্পই যেন মানবজীবন ও মনের নানা রূপকে ও তাঁর সুক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকেই পরিস্ফুট করে তুলেছে পাঠকের কাছে। বনফুলের ছোটগল্পের কাহিনিতে উঠে আসা চরিত্রেরা কেবল মাত্রই রক্ত-মাংসের

মানুষ, যাদের জীবনচক্রে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সততই ক্রিয়াশীল থাকে নিয়তি নামক এক অদৃশ্য কিছু। মানুষ - যাদের মধ্যে দেবতাও আছে শয়তানও আছে, যারা ভুল যেমন করে তেমনই ভুলের মাশুলও দেয়, জীবনে করা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে নিজেদের জীবনেরই মূল্যে। সৃষ্টির আদিম অভিব্যক্তিসমূহের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ মানুষ প্রেমে পড়ে, ভালবাসে, সুখী হয়, ঘৃণা করে, রেগে যায়, নিজের স্বাভাবিক মানসিকবোধ হারায়, যন্ত্রণায় পঙ্গু হয়, তা সে শারীরিক হোক বা মানসিক। আর এসবের পথ ধরেই আসে স্খলন আর পতন। যুগ যুগ ধরে চলা সময় ও সভ্যতার ইতিহাসে এরই নাম জীবন। গল্পকার বনফুল নিয়তি চালিত জীবনের এই ওঠা-পড়া-ভীতি ও করুণার প্রতিফলনকেই এক অদ্ভূত হাস্যরসের মোড়কের মধ্যে দিয়ে জীবনের যে পরম সত্য- তার সঙ্গে পরিচয় করান পাঠক মনের। 'বুধনী'-ও সেই ধারারই অন্যতম এক উদাহরণ।

গল্পকার ছয় পরিচ্ছেদে বিভক্ত 'বুধনী' গল্পের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিলেন সভ্য মানব সমাজের থেকে দূরে আদিম অরণ্য প্রকৃতির বুকে। ফলে গল্পের নির্মিত চরিত্রদ্বয় বুধনী-বিলটু সেই আদিম অরণ্য প্রকৃতির সন্তানদেরই প্রতিনিধিত্ব করে। যাদের অভিব্যক্তিসমূহের বহিঃপ্রকাশেও থাকে আদিমতা। আর সেই আদিমতার বহিঃপ্রকাশেই গল্পের পরিণতিই হয়ে ওঠে গল্পের সূচনা। মানব জীবনের সঙ্গে তুলনীয় হয় প্রদীপের উপমা। এরই সঙ্গে পাঠককে গল্পকার নিয়ে চলেন প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা আদিম সমাজের অন্দরে। তাঁদের নিজস্ব নিয়ম-কানুনের জগতে। যে জগতে প্রিয়ের প্রতি প্রেম-ভালবাসা নামক আদিম প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ সহজ সরল হলেও সেই প্রিয়জনকে জীবনে চলার পথে কাছে পাওয়া একেবারেই সহজ নয়। অন্তরায় হয় তাঁদের সেই সমাজের নিজস্ব কিছু নিয়ম।

হাজারিবাগের পার্বত্য প্রদেশের পার্বত্য পল্লীতেই বেড়ে ওঠা শিকারের সন্ধানে ঘুরতে থাকা শিকারি বিলটুর নজর একদিন পড়ে এক মহুয়া তলায় থাকা কৃষ্ণাঙ্গী কিশোরী বুধ্নীর প্রতি। প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে বিলটু। শিকারি যেমন তাড়া করে বেড়ায় নিজের শিকারকে, একইভাবে সেও বুধ্নীকে নিজের করে পাওয়ার ইচ্ছে নিয়ে বন্য পশুর মতো করে তাঁকে তাড়া করে বেড়াতে থাকে। সাময়িক ভাবে পালিয়ে বুধ্নী নিস্তার পেলেও বিলটুর প্রেমের কাছে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতেই হয়। তারপর তাঁদের জীবনে আসে কাঙ্ক্ষিত মিলনের সময়। কিন্তু এই মিলনের পথে বাধা হয় তাঁদের সমাজ নির্দিষ্ট চিরাচরিত নিয়ম। কঠিন পরীক্ষা দিয়ে প্রিয়তমাকে কাছে পেতে হয় বিলটুকে। পাণিপ্রার্থী রূপে যখনই সে বুধ্নীর কপালে সিঁদুর লাগিয়ে দেয় তখনই জীবন সংশয় হয় তাঁর। বুধ্নীর পরিবারের হাত থেকে নিজের জীবনরক্ষায় সারাদিন সফলভাবে পালিয়ে বেড়াতে হয় বিলটুকে। এইভাবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণে সফল হওয়ার পর দিনের শেষে মহা ধুমধামের সঙ্গে পরিবার পরিজনেরা বুধ্নীকে পৌঁছে দেয় বিলটুর গৃহে। শুরু হয় বুধ্নী-বিলটুর আদিম প্রেমে-সোহাগে-আদরের প্রবল জোয়ারে ভেসে

যাওয়া দাম্পত্য। তাঁদের সেই দাম্পত্যজীবন হয়তো আমাদের সভ্য সমাজের তথাকথিত আদব-কায়দার দাম্পত্যের প্রেম-ভালবাসার নিরিখে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই দাম্পত্যে বিলটুর সমস্ত অস্তিত্বই আবর্তিত হতে থাকে বুধ্নীকে কেন্দ্র করেই। বুধ্নী হয়ে ওঠে যেন একান্তই তাঁর নিজস্ব। যেখানে কোনও তৃতীয় সত্তার অস্তিত্ব থাকার কথা ভাবতেই পারেনি বিলটু। আর এখানেই গল্পের পরিণতি সূচিত হয়ে যায়। সময় ও প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে জীবনও চলে তার নিজস্ব ছন্দ ও গতিতে। যার ব্যতিক্রম হয়নি বিলটু-বুধ্নীর জীবনের ক্ষেত্রেও। সময়ের নিজস্ব ধারায় বুধ্নীর নারীসত্তা কেবলমাত্র বিলটুর প্রেমিকা আর স্ত্রী রূপেই সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রকৃতির নিয়মে নারীসত্তার পরবর্তী ধাপে পা রাখে সে। সন্তানের জন্ম দেওয়ার সঙ্গে জন্ম নেয় তাঁর মাতৃসত্তা। এক ক্ষুদ্র মানবশিশু ধীরে ধীরে থাকতে শুরু করে বুধ্নীর অন্তরের স্নেহ, আদর, ভালবাসার সমস্তটা জুড়ে। স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তন আসে বুধ্নীর জীবন ও ব্যবহারে। আর এখানেই প্রবলভাবে ধাক্কা খায় বিলটুর অধিকারবোধপ্রিয় সত্তা। কিন্তু মানব চরিত্রের মতই মানব মনের গতিও বিচিত্র। বিলটুর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় না। বিবাহের পর থেকে যে বুধ্নীকে সে একদন্ডের জন্যেও একা ছাড়েনি সেই বুধ্নীর প্রায় সর্বস্ব অধিকার করে নেয় তাঁর নিজেরই ঔরসজাত একরত্তির সন্তান, তাঁরই চোখের সামনে। কিন্তু বুধ্নীর প্রতি তাঁর নিজের যে একক অধিকারবোধ সেই বোধের অনুভূতিতে সে তাঁর নিজের সন্তানকেও মেনে নিতে পারে না। বুধ্নীর প্রতি আধিপত্য বিস্তারের ভাবনায় তাঁর নিজের ক্ষুদ্র সন্তানই হয়ে ওঠে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। ফলস্বরূপ ক্রমশই এক বিকৃতি গ্রাস করতে থাকে বিলটুর মনকে। যার বশবর্তী হয়ে সে চরম নৃশংসতার পরিচয় দেয় - হত্যা করে তাঁর নিজের সন্তানকে। উদ্দেশ্য –বুধ্নীর প্রতি তাঁর একমাত্র একক আধিপত্য। যুগে যুগে মানুষ যখনই নিজ প্রবৃত্তির তাড়নার বশবর্তী হয়ে নিজ বোধ শূন্য হয়েছে তখনই নিয়তির নির্মম প্রহার তাকে সহ্য করতে হয়েছে। বিলটুর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এক সদ্যজাত শিশুকে হত্যার শাস্তি স্বরূপ বিলটুর প্রাণদণ্ডের সাজা হয়। কিন্তু তাতেও নিজ কৃতকর্মের জন্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না বিলটু। বরং সে বিচলিত হয় বুধ্নীর থেকে দূরে চলে যাওয়ার আতঙ্কে, চিরতরে তাঁকে হারানোর ভয়ে। তীব্র আর্তির সঙ্গে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বুধ্নীকে ডেকে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে বিলটুর মনের যে অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে তা নাড়িয়ে দেয় স্বয়ং গল্পকথককেও। ভাবতে বাধ্য করে পাঠককে। জানতে ইচ্ছে করে সেই আর্ত ডাকে বুধ্নী কি সাড়া দিয়েছিল? বুধ্নী যার মনে একদিকে যেমন ছিল সন্তান হারানোর তীব্র হাহাকার, অপরদিকে ছিল নিজের সঙ্গীকেও হারানোর তীব্র যন্ত্রণা। কিন্তু সদ্যোজাত কোলের সন্তানকে হারানোর বেদনা বুধ্নীকে হয়তো বোবা করে দিয়েছিল। তাই গল্পপাঠে জানা যায় না, সন্তানহারা জননী বা স্বামীর জীবন প্রদীপ নিজের চোখের সামনে নিভতে দেখা নারী বুধ্নীর অভিব্যক্তির স্বরূপকে। শুধু হয়তো ধরে নেওয়া যায় যে, নিজ শরীরে ধারণ করা এক প্রাণ – নিজের একমাত্র

সন্তানকে হারানো জননীর যন্ত্রণায় ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল তাঁর প্রেমিকা বা স্ত্রী সত্তা। কারণ একজন নারীর সম্পূর্ণতা তার মাতৃসত্তার মধ্যে দিয়ে। যা সভ্যতা-সমাজ-দেশ-কাল-সময়ের উর্দ্ধে। কিন্তু গল্পের প্রথম থেকে শেষ অব্দি এই বুধ্‌নীই জুড়ে থাকে - বিলটুর আকাঙ্ক্ষায় ও আর্ত চিৎকারে, তাঁর মনোজগতে, কাহিনির ফ্ল্যাশব্যাকে সর্বত্র। বুধ্‌নীই হয়ে ওঠে বিলটুর সমগ্র চিন্তন সত্তা তথা কাহিনির পরিণতির মূল কেন্দ্র। শুধু সেই বুধ্‌নীর কোনও অভিব্যক্তির প্রকাশ হয় না কাহিনির শেষে। ফলস্বরূপ মৃত্যুর পূর্ব সময় পর্যন্ত চিৎকার করে যাওয়া নৃশংস শিশু-হত্যাকারী বিলটুর প্রতি কারোর কোনো সহানুভূতি হয় না।

আসলে মানুষের ভাবনা বা কর্ম যাইহোক না কেন সে কখনই কোনও পরিস্থিতিতেই জীবনসত্যকে অস্বীকার করতে পারে না। বিলটুর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সাহিত্যিক বনফুলও তাঁর নিজ জীবনচৈতন্যের আধারে তাই একদিকে অস্বীকার করতে পারেননি ‘পুরুষের সর্বগ্রাসী-রাহুর-প্রেমের এই বল্গাহীন আদিম রূপটিকে’, কারণ প্রেম নামক সৃষ্টির এই আদিম অনুভূতি ও তার অভিব্যক্তিকে অস্বীকার করলে তো প্রকৃতপক্ষে জীবনকেই অস্বীকার করতে হয়। অপরদিকে তুলে ধরেছেন বল্গাহীন সর্বগ্রাসী সেই আদিম অনুভূতির বহিঃপ্রকাশের ভয়াবহ পরিণতিকে। আসলে যা মানুষের জীবনে অনিবার্যরূপে আছে তার কথাই সাহিত্যিক বনফুল তুলে ধরতে চেয়েছেন সর্বদা, কেবল তার উপরের মিথ্যে ভাবের আবরণটুকু সরিয়ে সরিয়ে পথ চলেছেন। বলা যায়, ছোটগল্পকাররূপে বনফুলের স্বাতন্ত্র্য তাঁর গল্পের এই নব রূপ-সৃষ্টিতে। যেখানে গল্পের অবয়ব এবং ভাববস্তু ছোট হলেও তা জীবনের বৃহৎ গভীর সত্য ও বোধকে প্রকাশ করে অনিবার্যভাবে। তাই ‘বুধ্‌নী’ গল্পের শেষ বাক্য “নৃশংস শিশু-হত্যাকারীর প্রতি কাহারও সহানুভূতি হইল না” – এর মধ্যে দিয়ে পাঠকের মনে যেমন ভাবনার বিস্তার ঘটে তেমনই বোধের উদ্ভব ঘটায়। না বলা বহু কথা নানা ভাবে পাঠকের মনে আনাগোনা করতে থাকে। পাঠক নিবিড়ভাবে পরিচিত হন মানব মনস্তত্ত্বের বিচিত্র জটিল গতির সঙ্গে। যে গতি কখন কোনদিকে কেন ধাবিত হয় তার কোনও সদুত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে পরিণাম ভয়াবহ হবে জেনেও বহুক্ষেত্রেই মনের গতির কোনও পরিবর্তন হয় না। বিলটুর মনোজগতের বুধ্‌নীকেন্দ্রিক একবগগা গতি ও সেই গতির পরিণাম তারই পরিচায়ক হয়ে ওঠে কাহিনিতে। পাঠ শেষে স্তব্ধ হয়ে থাকে পাঠক মন।

গ্রন্থঋণ :

১। বনফুল : ‘বুধ্‌নী’, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, বাণীশিল্প, কলিকাতা, এপ্রিল ২০১০।
২। তদেব, ভূমিকা : জগদীশ ভট্টাচার্য, পৃ : ৭ – ১৯।
৩। শ্রীভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, নতুন সংস্করণ, ২০১০-১১।

ভগীরথ মিশ্রের ছোটগল্প : শোষক-শোষিতের সম্পর্কের অভিনব রূপায়ন

রজত কিশোর দে
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
হৈমন্তী সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বিশ শতকের সত্তর দশক বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে এক তীব্র অভিঘাত সঞ্চারী সময়কাল। এই বিক্ষুব্ধ টালমাতাল সময় পরিস্থিতিতে বাংলা সাহিত্যে ভগীরথ মিশ্রের আগমন ঘটে ছোটগল্পের হাত ধরে। বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ভগীরথের গল্পভুবন বিষয় বৈচিত্র্যে অনন্য। ব্রাত্যজীবন, নাগরিক জীবনের আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা, রাজনীতি, প্রশাসনিক বিচার-ব্যবস্থা, প্রান্তিক মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, লোকায়ত সমাজের বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি ইত্যাদি নানা বিষয় ভগীরথের গল্পে ভিড় করে এসেছে। তবে তাঁর বারো আনা গল্পের পটভূমি গ্রামজীবন। কারণ গ্রামজীবন ও গ্রামীণ সমাজকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। গ্রামীণ জীবনের চোরাস্রোত ও তার মানসলোকটিকে তিনি নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর গল্পের বিস্তৃত পরিসর জুড়ে রয়েছে পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলের নিম্নবৃত্তির প্রান্তিক মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র। লক্ষণীয় বিষয় ভগীরথের গল্পের এই বিষয়বৈচিত্রের মধ্যে তাঁর গল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হল শোষক-শোষিতের সম্পর্কের অভিনব সমীকরণ। ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উপলব্ধি করেছেন ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে শোষণ করার প্রবণতা রয়েছে। অবস্থা ও অবস্থান ভেদে সমাজে কেউ শোষক কেউ শোষিত। তিনি এও বিশ্বাস করেন এই শোষণ প্রক্রিয়া কখনো বন্ধ হবে না, সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে অন্তিমক্ষণ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন এই শোষণ প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। শোষক-শোষিতের সম্পর্কের এই তত্ত্ব তিনি তাঁর বেশ কয়েকটি ছোটগল্পের চরিত্রের ভিতর প্রয়োগ করে বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপন করেছেন। বর্তমান নিবন্ধে ভগীরথের শোষক-শোষিতের সম্পর্ক বিষয়ক গল্পগুলি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই পর্যায়ের গল্পগুলি হল – 'রাবণ', 'বিষকপ্পুর', 'বাড়িউলি', 'শিকার ও শিকারি', 'চেকভের অন্যদিন', 'পাঁঠার চোখ' ইত্যাদি।

সূচক শব্দ : মানুষের অন্তর্গত সহজাত শোষকসত্তা, শোষক-শোষিতের সম্পর্ক, নিরবিচ্ছিন্ন চলমান শোষণ প্রক্রিয়া।

সূচনা : সভ্যতা সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই শক্তিমানরা চিরকাল দুর্বলদের শোষণ করে এসেছে। শোষক-শোষিতের সম্পর্কে এটাই যেন ধ্রুবসত্য হয়ে আছে। কিন্তু ভগীরথ মিশ্র নিজের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির গুণে এই বাহ্যবাস্তবতার সমান্তরালে অন্য একটি অন্তর বাস্তবতাকে দেখতে পেয়েছেন। তাই তাঁর গল্পের বিষয় নির্মাণে শোষক-শোষিতের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিষয়টি একটা অন্য মাত্রা লাভ করেছে। ভগীরথের গল্পে শোষক ও শোষিতের সম্পর্কের সমীকরণ একটু ভিন্ন। এই সম্পর্কের ভিন্নতাকেই তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে গল্পের চরিত্রের ভিতর প্রয়োগ করে বাস্তব সমাজ জীবনকে আরো সূক্ষ্মভাবে চিনিয়ে দিয়েছেন। তিনি দেখেছেন সমাজে শোষক-শোষিত এই দুটি শ্রেণিবিন্যাসের বাইরেও প্রত্যেকটি মানুষের অস্তিত্বের ভিত্তিমূলেই শোষণ করার প্রবণতা রয়েছে। কেবল অবস্থা ও অবস্থানভেদে সেই সত্তার বদল ঘটে মাত্র, একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। আগ্নেয়গিরির সুপ্ত লাভার মতো প্রতিটি মানুষের অবচেতন স্তরে তা বিদ্যমান থাকে। এই শোষণ শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে ভগীরথ মিশ্র ব্যক্তিগত এক আলাপচারিতায় জানিয়েছেন -

> "আমি তো এমনিতেই মার্কসবাদে বিশ্বাসী একজন মানুষ। আমিও একটি শোষণমুক্ত দুনিয়ার স্বপ্ন দেখি। কিন্তু এই একটা বিষয়ে আমার মধ্যে সত্যিসত্যিই কিছু ধন্ধ রয়ে গিয়েছে। ধন্ধটা এইখানেই যে, মানুষ যে একটা শোষণমুক্ত সমাজের কথা ভাবছে, তার জন্ম থেকেই মৃত্যু পর্যন্ত পুরো সময়কালটিই তো একটা ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন শোষণের ইতিহাস। কেবল দুর্বল মানুষটিকেই তো নয়, সে তো অবিরাম চারপাশের জীবজগৎ আর উদ্ভিদজগৎকে শোষণ করেই বেঁচে রয়েছে। সেই শোষণ বন্ধ করলে মানুষ তো বেঁচে থাকতেই পারবে না। শোষণ তো দেখতে পাচ্ছি, মানুষের একটা অতি প্রয়োজনীয় প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিটা মানুষের মনোজগতে অঙ্কুরিত হয়, শাখাপ্রশাখা মেলে বাড়তে থাকে। সেই প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ শোষণ করে। মানুষের মনে সেই প্রবৃত্তিটা যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন সে সুযোগ পেলেই তার চেয়ে দুর্বলকে শোষণ করবে। তাহলে, পৃথিবীর বুক থেকে শোষণকে নির্মূল করতে হলে, মানুষের মন থেকেই শোষণের প্রবণতাটিকে নির্মূল করতে হবে। যদি কোনো প্রক্রিয়ায় সেই প্রবণতাটিকে নির্মূল করা যায়, তাহলে মানুষ বেঁচে থাকবে কেমন করে? তুমি হয়তো বলবে, মানুষ জীবজগৎকে, উদ্ভিদজগৎকে শোষণ করুক ক্ষতি নেই, মানুষকে শোষণ না করলেই হল। কিন্তু তেমনটা তো বাস্তবিক সম্ভব নয়। জীবজগৎই হোক কিংবা উদ্ভিদজগৎ হোক, তার মনের ভেতরে যদি দুর্বলকে শোষণ করবার প্রবণতাটিই বেঁচে বর্তে থাকে, তবে সেই প্রবণতার দ্বারা তাড়িত হয়েই সে সুযোগ পাওয়া মাত্র দুর্বল মানুষকেও শোষণ করবে। মানুষ তার শোষণের ওই

সহজাত প্রবৃত্তি টিকে জীবজগতের বেলায় প্রয়োগ করবে, মানুষের বেলায় প্রয়োগ করবে না, তেমনটা হয় নাকি? শোষণ প্রক্রিয়াটিকে পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে, মানুষের মন থেকে শোষণের প্রবৃত্তিটাকেই নিঃশেষে নির্মূল করতে হবে, আর সেক্ষেত্রে মানুষের অস্তিত্বটাই বিপন্ন হয়ে পড়বে, কেন কি, জীবজগৎ আর উদ্ভিদজগৎকে প্রতি মুহূর্তে শোষণ করতে না পারলে মানুষ বাঁচবেই না। জীবজগতের এবং উদ্ভিদজগতের ওপর অন্য কারণে মানুষ যেসব নিপীড়ন চালায় সারাক্ষণ, তা যদি বন্ধ করা যায়ও কেবলমাত্র খাদ্যের প্রয়োজনেই তো মানুষ জীবজগৎ ও উদ্ভিদজগৎকে প্রতি মুহূর্তে শোষণ করতে বাধ্য। এর থেকে তো, তার কোন রেহাই নেই।”[১]

ভগীরথ দেখেছেন কেবল সবল দুর্বলকে শোষণ করে না, যে এককালের ধনিক শ্রেণির দ্বারা শোষিত-লাঞ্ছিত- নিপীড়িত হয়েছে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কিংবা অবস্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে সেও অবলীলায় শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাঁর এই শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য – ‘রাবণ’, ‘বিষকপ্পুর’, ‘বাড়িউলি’, ‘শিকার ও শিকারী’, ‘চেকভের অন্যদিন’ প্রভৃতি।

ভগীরথ মিশ্রের গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হল শোষক-শোষিতের সম্পর্কের সমীকরণ। তাঁর গল্পে শোষক ও শোষিত যেন একই আত্মার দুই ভিন্নরূপ। যার সার্থক প্রতিরূপায়ন আমরা প্রত্যক্ষ করি ‘রাবণ’ (১৯৯১, অনুষ্টুপ) গল্পে। ভগীরথের একটি অসামান্য গল্প ‘রাবণ’। এই গল্পের অসামান্যতার সঙ্গে তাঁর গল্প সংকলনের অন্য কোনো গল্পই তুলনীয় নয়। সাহিত্যিক অমর মিত্র ‘রাবণ’-কে বাস্তুতন্ত্রের পিরামিড শৃঙ্খলার ভাষায় ‘খাদ্য-খাদকের’ গল্প বলে অভিহিত করেছেন। ‘রাবণ’ গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয় শোষণচক্র, যা আমাদের সমাজে চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে। এই গল্পে লেখক শোষণের পরম্পরাগত চলমানতাকে এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাতে চেয়েছেন।

জিরাবাইদ গ্রামের প্রভাবশালী জমিদার সতীকান্ত সিংহবাবু জমিদার বংশের শেষ উত্তরাধিকারী। তার সামন্ততান্ত্রিক শাসন, শোষণ ও অত্যাচারে গ্রামের মানুষরা সবসময় ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। এরকম প্রবল প্রতাপশালী জমিদার সতীকান্তের স্বভাবে জমিদারি সুলভ দাম্ভিকতার সঙ্গে মিশে ছিল নারীলোলুপ মানসিকতাও। সেই সুবাদে গাঁয়ের অনেক মেয়ের জীবন নষ্ট করেছে সে। ক্ষমতা ও বাহুবলে বলীয়ান হওয়ার জন্য গাঁয়ের জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি গ্রামবাসীরা। রাবণের দিদির ওপরও সতীকান্তের কুদৃষ্টি পড়ে। রাবণের বাবা মেয়েকে তার কাছে পাঠাতে অস্বীকার করায় সতীকান্তের শোষণ, অত্যাচারে রাবণের পুরো পরিবার সর্বস্বান্ত হয়। তাদের অন্নসংস্থানের একমাত্র অবলম্বন চারবিঘা জমি থেকে চক্রান্ত করে সতীকান্ত তাদের উচ্ছেদ করে। ফলে রাবণের বাবার অকাল মৃত্যু ঘটে, ছোট ভাই খিদের জ্বালায় গাছ থেকে রিঠা ফল পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে মারা যায়, রাবণের বড়দাদা মজুরির কাজ করতে ভিনগাঁয়ে চলে যায়। আর অসহায় রাবণ জীবন বাঁচাবার তাগিদে

শক্তিচঁদের ইস্টেটে 'পেটভাতুয়ার' কাজ করতে বাধ্য হয়। যে দিদির কারণে তাদের স্বপরিবার সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে, পরিস্থিতির চাপে সর্বনাশা জঠর জ্বালায় অবশেষে সেও সিংহবাবুর রক্ষিতায় পরিণত হয়। সতীকান্ত তাকে সম্ভোগ করে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় খুন করে। সতীকান্তের শোষণ নির্যাতনে রাবণের সমগ্র পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এখানে গল্পের একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছ, সেটি হল – আধিপত্যবাদী সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ধনীশ্রেণির প্রতিভূ সিংহবাবুর শোষণ প্রক্রিয়ার বৃত্ত। দুর্বলের উপর সবলের শোষণ – যা চিরাচরিত, যেখানে শোষক সতীকান্ত সিংহবাবু এবং শোষিত রাবণসহ তার সমগ্র পরিবার।

গল্পের অন্যবৃত্তটিতে রয়েছে রাবণের শোষণ প্রক্রিয়ার চিত্র। শক্তিচঁদের গুড়ের মহালে 'পেটভাতুয়া'র কাজে নিযুক্ত থাকার সময় বি.ডি.ও সাহেবের সাহায্যে ব্যাঙ্ক থেকে লোন পেয়ে রাবণ প্রথমে ঘোড়ার গাড়ি কিনে নিজেকে 'পেটভাতুয়া'র দাসত্ব থেকে মুক্ত করে। অতঃপর নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধির জোরে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে নিজেই একটা গুড়ের মহাল খোলে। গুড় মহালের দৌলতে রাবণের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও প্রতিপত্তি দেখা দেয়। নিঃস্ব অসহায় রাবণ হঠাৎই এক ভেলকি চালে ধনী হয়ে ওঠে। আর্থিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে একসময় শোষিত, অত্যাচারিত রাবণের মনের অন্তর প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটে, সে নিজেকে শোষকের ভূমিকায় স্থাপন করে। যদিও শৈশবে অত্যাচারিত হওয়ার স্মৃতি, জমিদার কর্তৃক দিদির নির্যাতন ও হত্যার যন্ত্রণা সে ভুলতে পারেনি। দিদির মৃত্যুর পর সিংহবাবুকে খুন করতে চেয়েছিল রাবণ। কিন্তু সে কাজে সে ব্যর্থ হয়। সেই কারণেই দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্রোধ ও ক্ষোভকে প্রশমন করেছে দিনের পর দিন যন্ত্রনাদগ্ধ মুমূর্ষু মৃত্যুপথযাত্রী সতীকান্তর অবর্ণনীয় দুর্ভোগ তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করার মধ্য দিয়ে। রাবণের স্বীকারোক্তি –

> "একটা সময় এলো, যখন দিন যায়, রাত যায়, একলা ঘরে একরাশ আঁধার, মাছি, দুর্গন্ধ ও যন্ত্রণা নিয়ে শুয়ে থাকত সতীকান্ত সিংহবাবু। দিন নয়, তখন কেবল ক্ষণই গুনত। তখন প্রতিটি দণ্ডকে মনে হতো যেন এক একটি যুগ। সতীকান্ত সিংহবাবুর ঐ সময়টাতেই আমি ওর ঘরে যেতাম। রোজ পালা করে একবার। নাকে কাপড় চাপা না দিয়েই ঘরের মধ্যে ঢুকতাম। থির পলকে দেখতাম ওকে। শুধু দেখবার জন্যই তো যেতাম। অন্য কোনও কারণেই নয়। সতীকান্ত সিংহবাবুর মতো একটা মানুষ মরছে। দন্ডে-দন্ডে পলে-পলে। সেটাই তাকিয়ে দেখবার মতো ব্যাপার ছিল আমার কাছে।....মাস কয় বাদে মরে গেল সতীকান্ত সিংহবাবু। সবাই স্বস্তির শ্বাস ফেলল, কেবল আমি ছাড়া। বড় দুঃখু হয়েছিল আমার। হায়রে! অত জলদি মরে গেল! আরো কিছো দিন দেখতে পেলাম নাই শালার লরকযন্তনাটা! আমার বুকের মইধ্যে একটা শাগনার বাচ্চা, সেই ছা' বেলা থেকেই কাঁদছে। অহরহ শুধুই কাঁদছে। সতীকান্ত সিংহবাবুর লরকভোগের দৃশ্যটা দেখে সে টুকচান থামাত তার

কাদনাটা। আসলে ঐ শাগনার ছা'র কাঁদনাটা থামাবার তরেই লিত্যিদিন সতীকান্তর ঘরে যেতাম আমি।"[২]

যৌবনের দাপুটে জমিদার বার্ধক্যে অসহায় পরনির্ভরশীল হয়ে মারা যাওয়ার যে বর্ণনা ভগীরথ গল্পে দিয়েছেন তাতে আঁতকে উঠতে হয়। আর সেই দৃশ্য দর্শন করে রাবণের যন্ত্রনাদগ্ধ হৃদয়ে আনন্দানুভূতির সৃষ্টি হয়। প্রত্যক্ষ ভাবে নয় বিকল্প উপায়ে রাবণ সতীকান্তর অত্যাচারিত ভোগীসত্ত্বার মর্মান্তিক পরিনাম উপভোগ করেছে প্রতিশোধ স্পৃহার আগুনে জলসেচনের উদ্দেশ্যে। এখানেই রাবণের অন্তর্গত পৈশাচিক সত্তার সন্ধান পাওয়া যায়। এই গল্পে রাবণের পৈশাচিকতার বাস্তব রূপায়ণ দেখি প্রহরাজ বেজকে খুন করার পদ্ধতিতে। একসময় নিজে অত্যাচারিত হয়েও মহালের মালিক হওয়ার পর রাবণ তারই মহালের 'রাত জাগুয়া' কর্মচারী প্রহরাজকে একইভাবে নির্যাতন করেছে। প্রহরাজকে মহাল পাহারায় নিযুক্ত রেখে তার বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীকে দিনের পর দিন ভোগ করেছে। প্রহরাজ টের পেয়ে বাঁধা দেয়, বউকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুনয়-বিনয়ও করে। অবশেষে নিরুপায় হয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মদ্যপ অবস্থায় নেশার ঘোরে প্রহরাজ তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা রাবণকে জানায়। সে গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে রাবণ আর তার স্ত্রীকে সম্ভোগ করতে পারবে না – সেই আক্রোশে রাবণ নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করে। প্রহরাজ বেজের হত্যার সংবাদ দিয়ে 'রাবণ' গল্পের আরম্ভ এবং সমাপ্তিতে সেই মৃত্যু প্রক্রিয়ার যে বর্ণনা গল্পে রয়েছে তা যেমন বীভৎস তেমনি নারকীয়। রাবণের স্বীকারোক্তিতে এই বিষয়টি স্পষ্ট –

"দু'গাছা মোটা পাটের দড়ি নিয়ে ফিরে আসি তেঁতুল গাছের গোড়ায়। প্রথমে ওর হাত দু'টাকে গাছের সাথে বেড় দিয়ে পেছনের দিকে শক্ত করে বাঁধি। বার-দুই হাত নাড়ায় সে। কিন্তু বেহুশ ভাবটা কাটে না। তারপর তার পা' দুটোকে একসাথে কষে বাঁধি। জোড়া-পা খিঁচে বেঁধে দিই গাছের সাথে। ততক্ষণে বোধ লেয় নেশাটা খানিক কেটে এসেছে ওর। মৃদু টানাটানি জুড়ে দেয় প্রহরাজ। মুখে বিড়বিড় করে বলতে থাকে, 'আমাকে বাঁইধল্যে ক্যানে রাবণদা? বাঁইধল্যে ক্যানে? 'অমনি রে। ভয় পাস্ নাই।' বলতে বলতে ওর পরনের নৈতাখানা খুলে নিয়ে চরচর করে দু'টুকরা করে ফেলি। এক টুকরা ওর মুখের মধ্যে ভালো করে গুঁজে দিই। অপর টুকরা দিয়ে ওর মুখখানা ঠেসে বেঁধে দিই। এবার অন্য দড়িগাছা দিয়ে ওকে পা থেকে গলা অবধি গাছের সাথে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আচ্ছাটি করে বাঁধি। বিপদের আঁচ পেয়ে তখন নিষ্ফল ছটকানি শুরু হয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত নড়াচড়া কিংবা কথা বলার আর কোন উপায়ই নেই ওর। আমার আর অল্পই কাজ বাকি ছিল। আড়ত থেকে একখানা গুড়ের পায়া এনে গাছের তলায় রাখি। তারপর খাবলা খাবলা গুড় দিয়ে যেমন করে আবড়া মেয়ার গায়ে তেল-হলুদ মাখায় বিয়ার আগে, ঠিক

> তেমনি করে মাখাতে থাকি প্রহরাজের সারা গায়ে। বেশ পরিপাটি করে মাখাই। নাকের ছ্যাঁদা, কানের গর্ত, চোখ, মুখ, লিঙ্গ, অন্ডকোষ - কিছুই বাদ দিইনা। গুড়ের মিঠে গন্ধটা আমার নাকে ধাক্কা মারছিল বারবার। গন্ধটা চিরকালই আমার বড় প্রিয়। আহা, কী মিঠা সুবাস! তেঁতুল গাছের বিষপিঁপড়াগুলানও এই গন্ধটাকে যে কী ভালবাসে।”[৩]

সারারাত বিষপিপড়ের কামড়ে নরক যন্ত্রণা সহ্য করে মরেছে প্রহরাজ। রাবণের এই নিষ্ঠুরতা, জিঘাংসা মনোভাব ভোগবিলাসী শোষক সত্তার তীব্রতাকে প্রকাশ করেছে। এখানেই লেখক এই বৃত্তটি সম্পন্ন করেছেন। যেখানে ভোগী শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি রাবণ এককালে যে নিজেও শোষিত হয়েছিল এবং শোষিত প্রহরাজ বেজ। গল্পের দুটি বৃত্তের সংযোগসূত্রের মাধ্যম হল শোষণ – যা গল্পটিকে পূর্ণ করেছে। ভগীরথের ‘রাবণ’ গল্পটির বিষয়নির্মাণের স্বতন্ত্র এইখানেই, শোষক সত্তা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, সময়ের ভেদে কেউ শোষক আর কেউ শোষিত। শোষক-শোষিতের এই জটিল দ্বান্দ্বিক সহাবস্থানই ‘রাবণ’ গল্পটিকে একটা অন্য মাত্রা দান করেছে। ‘রাবণ’ গল্প সম্পর্কে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক তপোধীর ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে –

> “অবস্থার পরিবর্তনে শোষিত জনও নিষ্ঠুর শোষকে রূপান্তরিত হতে পারে।.... গ্রামীণ সামন্ততন্ত্রের বিষগুল্মে কীভাবে মানুষের পরিসর দানবিকতায় রূপান্তরিত হয়ে যায়, রাবণ তার অসামান্য পাঠকৃতি। এমন সার্থক ছোটগল্প সাম্প্রতিককালে খুব কমই লেখা হয়েছে।”[৪]

‘পাঁঠার চোখ’ (১৮৮২, বর্তিকা) গল্পের হরেন যেন রাবণেরই প্রতিরূপ। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কসাই হরেন তার নিজস্ব পেশা ছেড়ে সামাজিক সম্মান অর্জন করে ভদ্র সমাজে স্থান পেতে চেয়েছে। রাজনৈতিক পদমর্যদা অধিকারের জন্য পঞ্চায়েতের মেম্বার হতে চেয়েছেন। এসবের মধ্য দিয়ে সে ভদ্র সমাজে মান্যগণ্য ব্যক্তির মতো মর্যাদা প্রত্যাশা করেছে। সেই সঙ্গে ভুলে গেছে নিজের অতীত জীবনকে, নিজের স্বজাতি, স্বধর্মকে। তাই খুদু কসাই তাকে হরাদা বলে সম্বোধন করলে সে বিরক্ত হয়েছে। খুদু তার কসাইখানারই কসাই। একসময় তারা একসাথে পাঁঠা কেটেছে। তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল একই রকম। সেই হরেন অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শোষকের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়েছে। খুদুকে সে নানাভাবে শোষণ করেছে। মাংস দোকানের শ্রমিক থেকে তাকে মালিক হবার লোভ দেখিয়ে তার মেয়ে কমলিকে সে ভোগ করেছে। খুদুও সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি লোভে কমলিকে হরণের হাতে সঁপে দিয়েছে। দারিদ্রতা ও ক্ষুধার কাছে পরাস্ত হয়েছে বাবার মমতা চিরাগত মূল্যবোধ। কিন্তু যখন তার সম্বিত ফিরেছে সেই মুহূর্তেই খুদু মেয়ের উপর হরেনের অধিকার খর্ব করতে চেয়েছে। আর তখনই কসাইয়ের নিষ্ঠুরতা ও পৈশাচিকতায় হরেন

নির্মমভাবে খুদুকে খুন করেছে - যেভাবে প্রত্যেকদিন কসাইখানায় খুদু পাঁঠা কাটে ঠিক সেইভাবে।

এই গল্পে কসাইখানায় খুদুর পাঁঠা কাটার দৃশ্য এবং হরেন কর্তৃক খুদুর হত্যাদৃশ্যের বর্ণনাকে সমান্তরালে রেখে লেখক তাদের একই পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। সমাজের নিম্নবৃত্তির মানুষদের মনুষ্যত্তর প্রাণী পাঁঠার সমগোত্রী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। পাঁঠা অবলা জীব। মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য, তাকে যখন খুশি বিক্রি করা যায়। কসাইরা অবলীলায় তাকে হত্যা করে। তার মাংসে মানুষের রসনা তৃপ্ত হয়। পাঁঠা কাটার সময় মুক এই প্রাণীটি কসাই খুদুর দিকে তাকিয়ে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে অব্যক্ত ভাষায় তার যন্ত্রণা নির্যাতন ও অসহায়তা প্রকাশ করে। গল্পের সমাপ্তিতে হরেন কর্তৃক খুদুর হত্যার দৃশ্যেও লেখকের সেই একই বয়ানের পুনচ্চারণ ঘটেছে। নিম্নবিত্ত প্রান্তিক মানুষরা অভিজাত উচ্চবিত্তদের দ্বারা সবসময় শোষিত নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়। কিন্তু এই গল্পে লেখক তার বিকল্প সন্দর্ভ নির্মাণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কেবল উচ্চবিত্ত নয় একদা নিম্নবিত্ত অন্তেবাসী মানুষও অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বজাতি তথা তার চেয়ে নিম্নবৃত্তির মানুষদের শোষণ করে। ক্ষমতার দম্ভে নারীদের যৌন নিপীড়ন করে এবং স্বার্থচরিতার্থে বাঁধা পেলে নির্মমভাবে খুনও করে।

'বিষকপ্পুর' (১৯৯০, সাপ্তাহিক বর্তমান) গল্পটিও শোষক-শোষিতের সম্পর্কের আরেকটি সার্থক পাঠকৃতি। কর্পূরের সুগন্ধ কীভাবে অসহ্য বিষবৎ হয়ে যায় – এই গল্পের আখ্যান তারই সাক্ষ্য বহন করে। গল্পের কাহিনিতে দেখি - বাবা মাকে হারিয়ে শৈশব থেকেই বাসনা ও করুণা দুইবোন রাজাকাঁটা গাঁয়ে ঠাকুমার কাছে বড় হয়েছে। ফলত বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে ঠাকুরমা তড়িঘড়ি বাসনার বিয়ে দেয় দরিদ্র অথচ কর্মঠ সুপুরুষ রানীবাঁধের রঘু দাসের সঙ্গে। সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও রঘু-বাসনার দাম্পত্য জীবন ছিল মধুর। কিন্তু বাসনার একমাত্র সন্তান মন্টুর জন্মের পর থেকে বাসনা ও রঘুর মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। আচমকা একদিন করুণার হাসপাতালে সন্তান জন্মানো প্রসঙ্গে বাসনা জানতে পারে রঘু ও করুণার অবৈধ সম্পর্কের কথা। করুণা নাবালিকা থাকায় রঘু হাসপাতালে বাসনার নামে করুনাকে ভর্তি করে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে রঘু করুণাকে অন্যত্র বিয়ে দেবার পরিকল্পনা করে। কিন্তু আকস্মিক ঠাকুমার মৃত্যুর পর রঘু বাসনাকে ছেড়ে করুণাকে নিয়ে আলাদা সংসার বাঁধে। ফলে একমাত্র সন্তানকে নিয়ে বাসনা অনাহারে অর্ধাহারে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। কালক্রমে স্বামীর মৃত্যুর পর বাসনার অবস্থা আরো করুণ হয়ে ওঠে। দরিদ্র অসহায় সহায় সম্বলহীন বাসনা স্থানীয় ব্লক অফিসে সাহায্যের আর্জি জানায়। বাসনার অনাহারক্লিষ্ট করুণ অবস্থা দেখে সহানুভূতিশীল বি.ডি.ও সাহেব তাকে বাসস্থানের জন্য সরকারি দশকাঠা জমির পাট্টা দেয়, একটি দেশি গাই গরুসহ বাড়ি তৈরির জন্য ব্যাঙ্ক লোনের ব্যবস্থা করে দেয়। সরকারি সহযোগিতায় এবং নিজের উদ্যম ও পরিশ্রমে বাসনার অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি

ঘটে। ফলে কৃতজ্ঞতা জানাতে বাসনা বিডিও সাহেবকে তার বাড়িতে নিমন্তন্ন করে। ব্লক অফিসে নিমন্ত্রন্ন করতে আসা বাসনার শাড়ি থেকে বি. ডি. ও সাহেব একটা কর্পূর মিশ্রিত সুগন্ধ পায়, যা তাঁর শৈশবের মায়ের স্মৃতিকে উসকে দেয়। এ পর্যন্ত গল্পটি একমুখী। এরপর গল্পটি আর সরলীকরণের পথে য়ায়নি। বাসনার পরিহিত শাড়ি থেকে আসা সস্তা ন্যাপথলিনের সুগন্ধ ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে বি.ডি.ও বিকাশের কাছে। সরকারি নিয়মানুসারে ইন্সেপেকশনের সূত্র ধরে বাসনার বাড়িতে গিয়ে তার অবস্থার পরিবর্তন ও আতিথেয়তায় মুগ্ধ হলেও বেশি দুধ পাওয়ার জন্য সে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তা দেখে বিকাশ বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। বিষয়টি সামগ্রিক অনুধাবনের জন্য গল্প থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে তুলে ধরা হল –

> "বিকাশ বাছুরটাকে লক্ষ করছিল। বারবার মায়ের বাঁটে মুখ ছোঁয়াছে বটে, কিন্তু দুধ না খেয়ে ফিরিয়ে নিচ্ছে মুখ। চোখ দুটি দেখে ভারি মায়া জাগে। বড় করুণ ছলোছলো চোখ। সহসা গাইটার বাঁটের দিকে নজর পড়ে বিকাশের। কালোপানা কিছু রয়েছে বাঁটের গায়ে কাদাজাতীয়। এখন, এই বর্ষাকালে মাঠময় কাদা। কখনো যদি শুয়ে থাকে কাদাভরা মাঠে, তবে বাঁটে কাদা লেগে যাওয়া অসম্ভব নয়। বাসনাকে বলতেই সে মুখটিপে হাসে। সাহেবের অজ্ঞতায় কৌতুক বোধ করে। বলে, 'কাদা লয়। সক্কালব্যালায় দুধ দুইবার পর বাঁটে পুরো কইরে গোবর লেপা আছে।'
>
> 'কেন?
>
> 'লচেৎ বাছুরতো দুধ খেইয়ে লিব্যাক। গোবরের গন্ধে উ বাঁটে মুখ দিতে লারে।'
>
> শুনতে শুনতে ঈষৎ কেঁপে ওঠে বিকাশ। কথাগুলো যেন খুচরো পয়সার মতো ঠং ঠং আওয়াজ তুলতে থাকে মগজে। বাছুরটার পেটের ভেতর অবধি চোখ চারায় সে। এবং দেখে, পেটে একবিন্দু রস নেই।
>
> গাইটার চোখদু'টোকে আরো করুণ লাগছিল। ছলোছলো চোখের কোনে যেন বিন্দু বিন্দু জল দেখতে পায় বিকাশ। এ যেন দু'বছর আগে বাসনার সেদিনের সেই চোখদু'টি। যেদিন একমাত্র কঙ্কালসার সন্তানকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর আকুতি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল এক হার-জিরজিরে মা।"[৫]

দুর্বলের উপর সবলের শোষণ নয় এ যেন শোষণের আরো বিভীষিকাময় রূপ। মনুষ্যতর প্রাণীর উপর মানুষের অমানবিক শোষণ, যেখানে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অভুক্ত রাখে একমাসের বাছুরকে। মুক প্রাণী বলে তারা প্রতিবাদ করতে পারে না এবং একসময় একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও বাসনা সে যন্ত্রনা অনুভব করতে পারে না। বরং সেই-ই পীড়নকারী হয়ে ওঠে। তার এই আচরণ মাতৃত্বের কোমলতাকে ছিন্নভিন্ন করে নিষ্ঠুর হৃদয়হীন অমানবিকতাকে প্রকাশ করে। শুধু তাই নয় আর্থিক স্বচ্ছলতা ও

প্রতিপত্তি মানুষের মধ্যে শোষণ করার যে প্রবৃত্তির জাগরণ ঘটায় বাসনার অন্তর মননেও সেই পরিবর্তন ঘটে। প্রতিশোধস্পৃহায় অন্ধ হয়ে স্বার্থপর মানুষ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে কতখানি পাশবিক ও অমানবিক হয়ে ওঠে বাসনা তারই প্রতিমূর্তি। নাবালিকা অবস্থায় করুণার সন্তান জন্মের সময় আইনি জটিলতা এড়ানোর জন্য হাসপাতালে করুণার পরিবর্তে বাসনার নাম ব্যবহার করে রঘু। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বার্থান্বেষী বাসনা সৎ মেয়ের অধিকার আদায়ে আইনি পথ বেছে নেয়, আদালতে মামলা করে। উদ্দেশ্য বিনা পারিশ্রমিকে একটা কাজের লোক পাওয়া। বাসনা নিজেই স্বগর্বে বিডিও সাহেবের কাছে তার সেই উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেছে –

> “সনসারে কাজকর্মের অভাব? রান্নাবান্না, ঝাঁপ-পাট, খেতখামারের কাজ, গাই-বাছুরের লাড়াঘাঁটা ... তা বাদে, কিছো টাকা রেখেছি বহুৎ কষ্টে। ভাদ্দর-আশ্বিনে মানুষ অভাবে গরু-বাছুর বিকে দেয় কম দরে। উই টাইমে আরো একটা গাই কিনবো। ইতোসব ঝঞ্ঝাট কে সামলাবেক হুজুর? মন্টু ত’ ইস্কুলে যায়। প্রাইভেট পড়ে দু’বেলা। একটা লোক নাইলে আর চলবেক নাই।”[৬]

এরপর কৌতূহল বশত এতদিন মামলা না করার বিষয়ে বিকাশের প্রশ্নের জবাবে বাসনা নিজের অবস্থার উন্নতির কথা বলে – “অ্যাদ্দিন ত ভাসছিল্যম অকুল সায়রে।”[৭] গল্পের সমাপ্তিতে এই বাক্যটি বিকাশসহ পাঠককেও জোরে ধাক্কা দেয়। বাক্যের বক্তব্য তার অর্থকে ছাপিয়ে যায়, যা শোষণের ইতিহাসের চলমানতার সাথে অবস্থা ভেদে শোষক ও ভোগীসত্ত্বার জাগরণের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে। একই সঙ্গে শোষক-শোষিতের সম্পর্কের ঐতিহাসিক সত্যরূপটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। স্বভাবত সেই কারণেই বাসনার শাড়ি থেকে আসা কর্পূরের গন্ধ তার নিষ্ঠুরতা ও কদর্যতার মিশ্রণে অস্বস্তিকর বিষাক্ত হয়ে ওঠে বিকাশের নাকে।

‘বাড়িউলি’ (২০০১, অনুষ্টুপ) গল্পেও একই চিত্র দেখি। সীতেশ আর করবী দীর্ঘদিন যাযাবরদের মতো একটার পর একটা ভাড়া বাড়ি পরিবর্তন করেছে, বাড়িউলির বিভিন্ন অপ্রীতিকর শর্ত, ভাড়াটে হওয়ার জন্য অকারণ তাচ্ছিল্য, কুরুচিকর মন্তব্যসহ বিভিন্ন আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে। বাড়িউলির অত্যাচারে মরিয়া হয়ে তাই শহর থেকে কিছু দূরে লোন নিয়ে শীতেশ একটি একতলা ছিমছাম বাড়ি বানিয়ে চলে আসে। নিজেদের স্বপ্নের বাড়িতে এসে নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিপূর্ণ শান্ত পরিবেশে তাদের দিনগুলি স্বপ্নের মতো অতিবাহিত হতে থাকে। যেহেতু তারা ভাড়াটে হিসাবে বাড়িউলির অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছে তাই নিজের বাড়ি ভাড়া দেওয়ার পরিকল্পনা তাদের অদূর ভবিষ্যতেও ছিল না। কিন্তু তাদের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে করবীর উদ্ভট ইচ্ছা অশান্তির চারা রোপন করে। বাড়ির একটা অংশ সে ভাড়া দিতে চায়। প্রাথমিকভাবে ভাড়া দেওয়ার কারণ হিসাবে নিজের মন এবং সীতেশকে বাড়ির অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য অর্থ উপার্জনের উপায় বলে যুক্তি দাঁড় করায়। বাড়িতে ভাড়াটের উপস্থিতিতে অপ্রীতিকর পরিবেশ তৈরি ও শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার

আশঙ্কায় সীতেশ করবীর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। যে করবী বাড়িউলিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একপ্রকার জেদের করে বাড়ি নির্মাণ করেছে তাঁর বাড়ি ভাড়া দেওয়ার অকল্পনীয় ইচ্ছার ভিত্তিমূল সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য একান্ত অন্তরঙ্গ মুহূর্তে সীতেশ করবীর কাছে তার এই উদ্ভট ইচ্ছার কারণ জানতে চায়। এ প্রসঙ্গে করবী তার মনের সুপ্ত ইচ্ছার কথা স্বামীর কাছে ব্যক্ত করে –

> “করবী জবাব দেয় না। অন্ধকারে কেবল সীতেশের বুকে মুখ ঘষতে থাকে নিঃশব্দে। একবার খুব অস্ফুট গলায় বলে ওঠে, আমার আরও একটা স্বপ্ন রয়েছে।
>
> -কী? সীতেশ আধো অন্ধকারে করবীর মুখটাকে পড়বার চেষ্টা করে।
>
> খুক খুক করে গলাটা একটুখানি সাফ করে নেয় করবী। মৃদু গলায় বলে, আমি বাড়িউলি হতে চাই। অন্তত ছ’মাসের জন্য হলেও চাই।” [৮]

ভগীরথ এক আলাপচারিতায় বলেছেন শোষণ মানুষের জীবনের একটা প্রয়োজনীয় প্রবৃত্তি শোষণ না করে মানুষ বাঁচতে পারে না। ‘বাড়িউলি’ গল্পে করবী তাঁর সেই ভাবনারই ফসল। ভাড়াটে থাকার সময় বাড়িউলিদের যে অত্যাচার, নির্যাতন তাকে সহ্য করতে হয়েছে বাড়ি নির্মাণ করে সেও বাড়িউলি হয়ে ভাড়াটের নিয়ন্ত্রক হতে চেয়েছে। ভাড়াটেদের উপর অকারণ অত্যাচার করে দাম্ভিকতা ও ক্ষমতা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে প্রভুত্বের সুখানুভূতি অনুভব করতে চেয়েছে – যা বিকৃত মানসিকতার পরিচায়ক। অন্যকে পীড়নের মধ্যে দিয়ে করবী পৈশাচিক আনন্দ ও তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করতে চেয়েছে। করবীর অবচেতন মনের সেই সত্যটিকে লেখক উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন তার অন্তর্লোকে আলোকসম্পাত করে।

‘শিকার ও শিকারি’ গল্পটি শোষণ প্রক্রিয়ার এক অভিনব ধারাভাষ্য। ‘বুকের খাঁচায় বিশ্বাসের মুমূর্ষ পাখিটিকে নিয়ে’ নামক একটি ব্যক্তিগত গদ্য প্রবন্ধে ধনী-দরিদ্র, অভিজাত-অনভিজাত, আধিপত্যবাদী-দুর্বল, উর্ধ্বস্তন-অধস্তন নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের শোষণ করার মানসিকতা যে সমমাত্রা সম্পূর্ণরূপে বর্তমান থাকে - তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ নিজের ব্যক্তিগত জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার কয়েকটি টুকরো ঘটনার কথা বলেছেন –

> “বছর কয়েক আগে এক রিক্সোওয়ালা আমাকে বেকায়দায় পেয়ে তিনগুণ ভাড়া আদায় করেছিল। এক মাছওয়ালি মওকা পেয়ে চুনো মাছের দাম হেঁকেছিল তিনগুণ। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। তবু মনে প্রশ্ন জাগে এদের সঙ্গে লোভী মুনাফাবাজ ব্যবসায়ীদের ফারাক কোথায়, কতটকু? [৯]

শিকার ও শিকারি গল্পে ডাহুক শিকারি নিতাই লেখকের বাস্তব জগতে দেখা অনামা মুনাফাবাজ রিক্সাওয়ালা মাছওয়ালিদেরই প্রতিনিধি। এই গল্পে নিম্নবৃত্তির নিতাই কৌশলে সহানুভূতিশীল পরিবেশপ্রেমী অমলেশকে শোষণ করেছে তার আবেগকে

হাতিয়ার করে। মহানগরী কলকাতার কংক্রিটের জঞ্জাল ছেড়ে শান্ত পরিবেশের নির্জনতাকে ভালোবেসে অমলেশ শহর থেকে দূরে বাড়ি করে চলে এসেছে। যেখানে এখনো ঘনবসতি গড়ে ওঠেনি। শহরতলীর এই অঞ্চলটির গ্রামীণতার বর্ণনা দিয়ে গল্পের সূচনা। জনবসতির ঘনত্ব কম হওয়ার ফলে প্লট আকারে চিহ্নিত করা ভবিষ্যতে বাড়ি তৈরির জমিগুলি ঝোপ-ঝাড় আগাছায় পূর্ণ হয়ে এক নৈসর্গিক নিস্তব্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। যা অমলেশের অত্যন্ত প্রিয়। তার বাড়ির পাঁচিল ঘেঁষা আগাছায় পূর্ণ ফাঁকা জমিটি বিভিন্ন বন্য পাখি-পাখালের আস্তানা। সেখানেই একদিন শিকারিজীবী নিতাই ডাহুক শিকার করতে আসে। যদিও সেই জঙ্গলে অমলেশ কখনো ডাহুকের ডাক শুনতে পায়নি। কিন্তু প্রথম দিনই নিতাই সেখান থেকে একটা ডাহুক শিকার করে। পাখিটির করুণ চোখের দিকে তাকিয়ে দশ টাকার বিনিময়ে অমলেশ পাখিটিকে পুনরায় জঙ্গলে ছেড়ে দেয় এবং শিকারি লোকটিকে ওই জঙ্গলে শিকার করতে নিষেধ করে। এই আচরণে নিতাই বিস্মিত হয়। পরদিন নিতাই পুনরায় সেই জঙ্গল থেকে ডাহুক শিকার করে। অমলেশ ক্রুদ্ধ হলে নিতাই তার দৈন্যতা ও জীবিকা নির্বাহের কারণে পাখি শিকারের কথা বলে। ফলে পুনরায় অমলেশ দশ টাকায় ডাহুকটিকে কিনে জঙ্গলে ছেড়ে দেয়। এরপর প্রকৃতিপ্রেমী অমলেশ অবাধ পাখি শিকারের প্রতিকারের জন্য থানায় ও মিউনিসিপালিটিতে অভিযোগ করে, পরিবেশের ভারসাম্য ও পরিবেশ দপ্তরের দায়িত্বের কথা স্মরণ করায়। কিন্তু তাতে কোন সুরাহা হয় না। বরং মস্তিষ্কের বিকৃতি আছে বিবেচনায় অমলেশকে উপহাস করে। ফলে নিরুপায় অমলেশ পরদিন নিতাই ডাহুক শিকারে এলে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়, কিন্তু পারে না বরং পাখিটির উপর নিতাইয়ের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বেশি দামে ডাহুকটিকে কিনতে বাধ্য হয়। অমলেশ প্রত্যেকদিন টাকার বিনিময়ে ডাহুক পাখিটিকে মুক্ত করেছে, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু শেষ দিন তাঁর মনে হয় পাখিটিকে নয়, নিতাই অমলেশকেই প্রত্যেকদিন শিকার করেছে – ডাহুক পাখিটিকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। কারণ অমলেশের সংশয় জন্মেছে ডাহুক পাখিটি হয়তো নিতাইয়ের পোষা কারণ দলবদ্ধ ভাবে থাকতে অভ্যস্ত ডাহুক পাখি যে অঞ্চলে থাকে, সেই অঞ্চল সবসময় তাদের কলরবে মুখরিত হয়ে থাকে। কিন্তু অমলেশ তার বাড়ির সংলগ্ন জঙ্গল থেকে কোনদিন ডাহুকের ডাক শুনতে পায়নি। আর তার এই সংশয় বিশ্বাসে পর্যবসিত হয়েছে।

নিম্নবৃত্তির মানুষরা জীবন ধারণের জন্য অজস্র বিচিত্র পেশা গ্রহণ করে। মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে পাখমারা সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে।'পাখি শিকার' যাদের প্রধান পেশা। তবে শিকার ও শিকারি গল্পে নিতাইয়ের সম্প্রদায়ের কোনো উল্লেখ না থাকলেও পাখি শিকার যে তার পেশা তা গল্পের কাহিনি থেকে জানা যায়। কিন্তু পাখি শিকার নয়, পাখির আড়ালে মানুষ শিকারিই এই গল্পের অন্তর বাস্তবতা। এই গল্পে ভগীরথ শোষণের এক ব্যতিক্রমী চিত্র তুলে ধরেছেন – অমলেশের পাখির প্রতি দুর্বলতাকে

কাজে লাগিয়ে নিতাই তার সাথে প্রতারণা করেছে, প্রত্যেকদিন মিথ্যাচার করে টাকা আদায় করেছে, নিতাইয়ের এই সুকৌশলে প্রতারণা শোষণের এক অন্য রূপ। কেবল ধনী-দরিদ্র কিংবা অবস্থা পরিবর্তনে দুর্বল সবল হয়ে ওঠে অথবা দুর্বল তার চেয়ে বেশি দুর্বলকেই শোষণ করে না, সুযোগ পেলে দরিদ্র নিম্নবৃত্তির মানুষও মধ্যবিত্ত বা ধনী শ্রেণিকেও শোষণ করতে ছাড়ে না। ব্যতিক্রম এই গল্প আখ্যান তারই বাস্তব রূপায়ণ।

ভগীরথের 'চেকভের অন্যদিন' (১৯৯০, দেশ) গল্পে চেখভের বিখ্যাত গল্প 'কেরানির মৃত্যু' (the death of a clerk) গল্পের কাহিনির বিপ্রতীপ ছায়া রয়েছে। 'কেরানির মৃত্যু' গল্পে সামান্য কারণে ঊর্ধ্বতনের প্রতি অত্যাধিক ভয় এবং আনুগত্যবোধের বাহুল্যতা থেকেই চেরভিয়াকভ নামক কেরানির জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে এবং অবশেষে তার মৃত্যু হয়। 'চেকভের অন্যদিন' গল্পের বিষয়ও একই। কেবল অবস্থানটি পাল্টে গেছে, এখানে অধস্তনের কারণে উর্ধ্বস্তনের মৃত্যু হয়েছে। এই বিপ্রতীপতা এবং পরিবর্তনশীল সময় প্রবাহকে তুলে ধরতেই বোধহয় লেখক গল্পের শিরোনামে সাংকেতিকভাবে 'অন্যদিন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

'চেখভের অন্যদিন' গল্পের কাহিনি বয়ানে লেখক শ্রেণিদ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর অর্থে শোষিতের সম্পর্কের একটা অন্য সত্যরূপকে প্রকাশ করেছেন। উচ্চপদস্থ অফিসার কমলেশ সকালে বাজার করতে গিয়ে প্রমাণ সাইজের চিতল মাছ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু হিসাবের কথা চিন্তা করে সে চিতল মাছ কিনতে পারেনা। একই সময় তারই আর্দালি পিয়ন বাদল দাস ভিড়ের মধ্যে ভুলবশত সাহেবের পা মাড়িয়ে দিয়ে আধসের চিতল মাছ কিনে বাড়ি ফেরে। পা মাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুশোচনায় বাদল বাজারের মধ্যেই কমলেশের কাছে ক্ষমা চায়। কমলেসও বিষয়টিকে সামান্য জ্ঞানে নিশ্চুপ থাকে। আর তার এই নিশ্চুপ থাকাটাকে বাদল সুপ্ত ক্ষোভ ভেবে অফিসে গিয়েও সাহেবের কাছে বারবার ক্ষমা চায়। সাহেবের নির্বিকার মনোভাব তাকে আরো ভীত করে তোলে। ফলে বাদল ইউনিয়নের নেতা প্রভঞ্জনকে সমগ্র বিষয়টা জানায়। প্রভঞ্জনসহ ইউনিয়নের লোকজন এসে কমলেশকে বিষয়টি মিটিয়ে নিতে বলে–

> "দেখুন, দপ্তরে যাতে পারস্পারিক সম্পর্ক মধুর থাকে, তা কি আপনি চান না ?'
>
> 'কেন চাইব না ?
>
> ' তাহলে ওইদিনের ব্যাপারটা আপনি ভুলে যান। বাদলও ভুলে যা'।
>
> 'আমরা তাহলে আজ উঠছি স্যার। দেখবেন, এ নিয়ে আমাদের যেন আবার না আসতে হয়'।
>
> 'হাজার হোক একসাথে কাজ করতে হয় দু'জনকেই। ঝগড়াঝাঁটি কি ভালো ?'

ওরা চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ পাথরের মতো বসে রইলেন কমলেশ।

মাথাটা ঝিমঝিম করছে। বড় অসহায় লাগছে নিজেকে।”[১০]

কিন্তু এতেও সমস্যার নিস্পত্তি হয় না। মেদিনীপুরে বাদলের দেশের বাড়িতে জমি-জমা দেখা শোনার সুবিধার্থে প্রত্যেক মাসে সাহেব মেদিনীপুর শাখার রিপোর্ট আনতে তাকেই পাঠায়। কাকতালীয় ভাবে ওই মাসে সাহেব তাকে পাঠানোর আগেই মেদিনীপুর শাখা ডাকযোগে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেয়। এতে বাদলের ধারণা আরো দৃঢ় হয় সাহেব পা মাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশোধ নিতে কৌশলে তার গ্রামের বাড়ি যাওয়ার ট্যুর বন্ধ করেছে। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি আরো জটিল আকার ধারণ করে, সমগ্র অফিসের চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে। সামান্য বিষয়কে জটিল করার জন্য কমলেশ উর্দ্ধস্তনের দ্বারা তিরস্কৃত হয়। পারিবারিক চাপের সাথে মানসিক চাপ সৃষ্টির ফলে শারীরিকভাবে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এখানেই শেষ নয় বাদল দাসের উদ্যোগে ইউনিয়নের নেতা প্রভঞ্জন দলবল নিয়ে হাজির হয় কমলেশের দপ্তরে, ঝাঁঝালো স্বরে তাকে শাসাতে থাকে বাদলকে ক্ষমা করে দেবার জন্য। প্রভঞ্জন ও কমলেশের কথোপকথনের খন্ডচিত্র নিম্নে তুলে ধরা হল-

“প্রভঞ্জন বলল, বাদলের ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের আবার আসতে হলো স্যার। আপনি ব্যাপারটা কিছুতেই মেটাবেন না ঠিক করেছেন?

কমলেশ গলায় অধৈর্য ফুটিয়ে বললেন, 'আপনাদের কেন মনে হচ্ছে এমন কথা? কেন?

‘তাহলে ওকে কিছুতেই মাপ করছেন না কেন?

‘কি আশ্চর্য!’কমলেশ কিঞ্চিৎ উত্তেজিত, ‘বাজারের মধ্যে সামান্য একটা ব্যাপার। এ নিয়ে মাফ করবার আছেই বা কি?

প্রভঞ্জনের চোখ মুখ শক্ত হল, ‘আমরা স্যার, আপনার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে এসেছি। আমাদের সঙ্গে খেলবেন না আশা করি।’

কমলেশের চোখমুখ অপমানে লাল হয়ে উঠল। তাও কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন,’ আপনারা শুধু শুধু আমাকে অপমান করছেন। আমি খোলাখুলি বলছি, বাদলের ওপর আমার কোনও রাগ নেই।’.....

‘ওইটাই তো আপনার ট্যাকটিকস্ স্যার। পাগল হলে কুকুর দু’ধরনের আচরণ করে। এক ধরনের আছে, তারা দাপাদাপি জুড়ে দেয়। চেন ছেঁড়ে। কামড়ায়। আর এক ধরনের আছে, তারা শুধু ঘোলাটে চোখে শুয়ে শুয়ে মুখ দিয়ে লালা ঝরায়। বিশ্বাস করে তাদের সংস্পর্শে এলেই ওই বিষাক্ত লালা লেগে মৃত্যু অনিবার্য'।”[১১]

অপমানে কমলেশ অসহায় ভাবে সকলকে বোঝাতে চায় প্রকৃত অর্থে সে বাদলের উপর রেগে নেই কিন্তু কেউই তার কথা বিশ্বাস করে না। মানসিকভাবে নির্যাতিত, নিপীড়িত কমলেশ আকস্মিকভাবে জ্ঞান হারায় এবং মারা যায়। মাছ কেনার অনুষঙ্গে বাদলের

জীবনে অতর্কিত বিপর্যয়ের ঘটনা দিয়ে যে গল্পের সূচনা তা কমলেশের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। এখানে অধস্তনের কারণে ইউনিয়নের চাপে ঊর্ধ্বতন অফিসারের মৃত্যু হয়েছে। যা শোষিতের সম্পর্কের আর এক ধরণ। এই গল্পটি প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক সোহারাব হোসেন মন্তব্য করেছেন –

> "আসলে ওপরঅলা-অধঃস্তন সম্পর্কের, ধনী-দরিদ্র সম্পর্কের, একটু বৃহৎ প্রেক্ষিতে শোষক-শোষিত সম্পর্কের সম্পূর্ণ নতুন চিত্র তুলে ধরে এই গল্প। আর এই অন্য চিত্র প্রমাণ করে অবহেলা করার, লাঞ্ছনা করার, অত্যাচার করার, ভয় দেখানোর একতরফা ক্ষমতা বা অধিকার শুধু শোষকের-ওপরওঅলার হাত নেই তা সব শ্রেণির অন্তঃপ্রকৃতিতে বর্তমান।"[১২]

'ভগীরথ মিশ্রের ছোটগল্প' নামক গ্রন্থের ভূমিকাংশে লেখক নিজের গল্প সম্পর্কে জানিয়েছেন, তাঁর গল্পের ভাঁজে ভাঁজে আপাত সরল পটভূমিকে বহিরঙ্গে রেখে অন্তরঙ্গে বিছিয়ে দেন তাঁর নিজস্ব দর্শন – যা কাহিনিকে অতিক্রম করে আর এক দিগন্তকে স্পর্শ করে। ভগীরথের শোষক-শোষিতের তত্ত্বনির্ভর গল্পগুলিতে তাঁর সেই স্বীকারোক্তির সার্থক প্রতিফলন দেখতে পাই। গ্রামীণ সমাজের প্রেক্ষাপটে সহজ সরল নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানুষের জীবনের কাহিনি গল্পের আধার হলেও গল্পের অন্তরঙ্গে রয়েছে এক কঠিন জীবন সত্য – তা হল মানুষের অন্তর্গত শোষক সত্তা। যা মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি, স্বাভাবিক প্রবণতা এটি জন্মগত এবং চিরাচরিত।

তথ্যসূত্র:

১। সমীরণ মজুমদার (সম্পাদিত), অমৃতলোক (১০৬), আলাপচারিতাঃ ভগীরথ মিশ্র, ফেব্রুয়ারি ২০০৬ পৃষ্ঠা - ৩৫১।
২। ভগীরথ মিশ্র, শ্রেষ্ঠ গল্প, দেজ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৭, পৃষ্ঠা - ১৪৮।
৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৬১।
৪। তপোধীর ভট্টাচার্য, পড়ুয়ার ছোটগল্প, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা -১০৩।
৫। ভগীরথ মিশ্র, শ্রেষ্ঠ গল্প, দেজ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৭, পৃষ্ঠা - ২০২।
৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ২০২।
৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ২০৩।
৮। ভগীরথ মিশ্র, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দেজ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃষ্ঠা – ২৯৩।
৯। সমীরণ মজুমদার (সম্পাদিত), অমৃতলোক (১০৬), 'বুকের খাঁচায় বিশ্বাসের মুমূর্ষু পাখি টিকে নিয়ে', ভগীরথ মিশ্র, ফেব্রুয়ারি ২০০৬ পৃষ্ঠা - ৩৬৫।

১০। ভগীরথ মিশ্র, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দেজ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃষ্ঠা – ১৩৯।
১১। ভগীরথ মিশ্র, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দেজ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃষ্ঠা – ১৪৪।
১২। সোহারাব হোসেন, বাংলা ছোটগল্প : তত্ত্ব ও গতি-প্রকৃতি(২য়), করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা- ২৬০।

সমকালীন প্রেক্ষাপটে মন্মথ রায়ের পূর্ণাঙ্গ নাটক (নির্বাচিত)

উজ্জ্বল দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: মন্মথ রায় আধুনিক কালের একজন বলিষ্ঠ নাট্যকার। তাঁর প্রথম পর্বের নাটকগুলি পরাধীন ভারতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। নাটকগুলির মধ্যে নির্বাচিত তিনটি পৌরাণিক নাটকের মধ্য দিয়ে আমি সমকালীন প্রেক্ষাপট দেখানোর চেষ্টা করবো এবং এই নাটকগুলি সমকালে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাও দেখানোর চেষ্টা করবো।

সূচক শব্দ: বিদ্যুৎ, সুমেরু, বিদ্রোহ, শিবভক্ত, পাষাণাগারে, ভোজ।

নাটকের ইতিহাসে শুধু পৌরাণিক নাটক নয়, সর্বপ্রকার নাটকের ধারাতে খ্যাতিত্ব লাভ করেছেন নাট্যকার মন্মথ রায়। বিশ শতকের পুরোভাগের নাট্যক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান। ১৯২৩ থেকে শুরু করে দীর্ঘ ৬০ বছর নাটক নিয়ে তাঁর সাধনা। তাই এই বিপুল সময়ের নাট্যসাধনায় নাটকের বিভিন্ন দিক যেমন লক্ষ্য করা গেছে, ঠিক একইভাবে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ধারাতে সময়ের প্রেক্ষিত দেখা গিয়েছে। 'নাট্য-ভগীরথ মন্মথ রায়' শীর্ষক প্রবন্ধে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মন্মথ রায় সম্পর্কে বলেছেন - "কোনো শিল্পস্রষ্টাকে বিচার করতে হয় তাঁর সমকালীনতার পরিপ্রেক্ষিতে। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে এ দেশে জাতীয় মুক্তির যে একটা প্রবল আবেগ এসেছিল, নাট্যকার মন্মথ রায়ের মানসিকতা তা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেনি। তাঁর পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি সেই আবেগ ধরতে চেয়েছিলেন। 'দেবাসুর'-এ বিদেশি শাসকদের ক্ষমতাদম্ভকে ধিক্কার, 'কারাগার'-এ গণ-অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত, 'চাঁদ সদাগর'-এ চাঁদের পৌরুষ আর ' মীরকাশিম'-এ মীরকাশিমের দেশপ্রেম বিদ্যুৎ ঝলকের মতোই মনকে উচ্চকিত করে।"[১]

১৯২৩ সালে 'মুক্তির ডাক' একাঙ্ক নাটকের মধ্য দিয়ে প্রকৃতভাবে নাট্যক্ষেত্রে মন্মথ রায়ের আবির্ভাব। কিন্তু সেইসময় একাঙ্ক নাটক বলে দর্শকরা কিছু জানত না, একাঙ্ক নাটকের অভিনয় দেখতে অভ্যস্ত হয়নি দর্শকেরা, তাই অভিনয় ক্ষেত্রে সফল না হওয়ায় একাঙ্ক নাটক রচনা করতে থাকলেন ঠিকই কিন্তু একাঙ্কের পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করলেন। সৃষ্টি হল প্রথম সার্থক পূর্ণাঙ্গ নাটক 'চাঁদ সদাগর'। নাট্যসাহিত্যে তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রবহমানতা শুরু হলো। ১৯২৩ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত প্রথম পর্বে পৌরাণিক নাটক তাঁর নাট্যসাধনার অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল। এই সময় পরাধীন ভারতবর্ষের কারাবদ্ধ অবস্থা, জনগণ মুক্তিযুদ্ধে নেমে পড়েছে, মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিকামনার

আন্দোলনে সে-কালটি ছিল উত্তাল উন্মাদনার যুগ। এইসব অবস্থার কথা পৌরাণিক নাটকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার ফুটিয়ে তুললেন,প্রত্যক্ষভাবে নয় রূপকের আড়ালে। নাটকের জগতে তাঁর অমরত্ব যে জন্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত সেই একাঙ্ক নাটকের যাত্রা শুরু কিন্তু সেই পৌরাণিক কাহিনির মধ্য দিয়েই। এছাড়াও তিনি অন্য শ্রেণীর নাটকও রচনা করেছেন, তা স্বাধীনতার পূর্বে যেমন, ঠিক তেমনি স্বাধীনতা উত্তরেও। স্বাধীনতা পূর্ববর্তীতে যেমন পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে নাট্যকারের বিশেষত্ব, ঠিক স্বাধীনতা পরবর্তীতে সামাজিক, দেশাত্মবোধক নাটকের ক্ষেত্রে বিশেষত্ব দেখা গেছে। প্রথম পর্বের নাটক হল যেমন- ‘চাঁদ সদাগর', 'দেবাসুর', ‘কারাগার' প্রভৃতি নাটক। দ্বিতীয় পর্বের নাটক হল যেমন-‘মহাভারতী', 'সাঁওতাল বিদ্রোহ,' ধর্মঘট' প্রভৃতি।

আমার এই প্রবন্ধে 'চাঁদ সদাগর', 'দেবাসুর' ও 'কারাগার' নিয়ে আমি আলোচনা করবো।

প্রথম পর্বে নাট্যকারের যৌবন বয়সে দেশচেতনার যে বহিঃপ্রকাশ তাঁর প্রতিফলন ঘটেছে। আবার দ্বিতীয় পর্বেও দেখা গিয়েছে তৎকালীন সমাজের অবস্থার কথা। তাই তিনি নাট্যজগতে অন্যতম ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিল। নাটক ও নাট্যকার গ্রন্থে অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন – “সুমেরু শৃঙ্গের মত অটল ও দীর্ঘ প্রশস্ত বক্ষ যেন বিস্তৃত একখানা কপাট, কণ্ঠস্বরে ভয়জাগানো হুঙ্কার চোখের দৃষ্টিতে কপত রোষ কিন্তু তার সঙ্গে মিশে আছে প্রচ্ছন্ন কৌতুকের দীপ্তি। এই ছিলেন মন্মথ রায়- বাঙালীদের মধ্যে এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব।”[২]

নাট্যকার নির্ভয়ভাবে নাটক রচনা করেছেন। যা বোঝা যায়, সময়ে সময়ে কিছু নাটকে তৎকালীন সরকারের আপত্তিতে। যেমন- মন্মথ রায়ের ‘কারাগার' নাটকের অভিনয়ে নিষেধাজ্ঞা। এককথায় নাট্যজগতে মন্মথ রায়ের আত্মপ্রকাশ সমাজ তথা মানুষের মধ্যে নতুন জীবন জিজ্ঞাসার জন্ম নিল । আমাদের মনে রাখা উচিত নাট্যকারের আত্মপ্রকাশের সময় কল্লোলের যুগ। নাট্যকারও একজন কল্লোলের নাট্যকার। তাই কল্লোল যুগের সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রেখে নাট্যকার সমকালীন সমাজের জরাজীর্ণ অবস্থার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

একাঙ্ক নাটকের দিয়ে তাঁর নাট্যজীবন শুরু। 'মুক্তির ডাক' নাটকের মধ্য দিয়ে। কিন্তু একাঙ্ক নাটক সেইসময় জনজীবনে ঠিক ভাবে প্রতিফলিত না হওয়ায় নাট্যকার মন্মথ রায় পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনায় হাত দিলেন। রচনা করলেন 'চাঁদ সদাগর' নাটক। নাট্যকার বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সর্বাধিক সংগ্রামি চরিত্রকে আনলেন তাঁর এই নাটকে। বিংশ শতাব্দীর পরাধীন বাঙালি চিত্তে সংগ্রামি ভাবের প্রবেশ ঘটানোর আদর্শে। সেই আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে চাঁদ সদাগর ও বেহুলা চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্য কাহিনির আধুনিক মনোভাবের প্রকাশ ঘটালেন নাট্যকার।

শিবভক্ত চাঁদসদাগর চেঙ্গমুড়ি কানী মনসার অনুগত হতে চায় না। বন্ধু ধন্বন্তরি ওঝাকে হারিয়েছে। সপ্তডিঙ্গা মধুকর জলে ডুবেছে, ছয় পুত্রের মৃত্যু ঘটেছে। অবশেষে লক্ষীন্দরকেও হারিয়েছে। পুত্র ও পুত্রবধূ বেহুলাকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। তবুও চাঁদ অটল, অকম্পিত দৃঢ়তা। অবশেষে স্নেহের কাছে তার নিজের কঠোর সংকল্পের পরাজয় ঘটল। চাঁদ সদাগরের সংগ্রাম যেন ভারতবাসীর সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। নাটকটি হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের একটি অন্যতম মাধ্যম।

অন্যদিকে সংলাপের ব্যবহার নাটকটিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলেছেন। নাট্যকার নাটকে চাঁদের দেবদ্রোহিতা এবং বেহুলার প্রচলিত বিধি নিয়মকে না মেনে চলা নাটকের প্রেক্ষিতটিকে রচনাতে সাহায্য করে। নাট্যকারের নিজের কথায় - "...সুরটা বদলাতে ইচ্ছা হল। লৌকিক পুরাণ মনসামঙ্গল থেকে চাঁদ সদাগর ও বেহুলা আখ্যানটি বেছে নিয়ে চাঁদ সদাগরকে এক বিদ্রোহী বাঙালীরূপে চিত্রিত করার সাধনা চলল।"[৩] নাটকে চাঁদ হয়ে উঠল সমকালীন বাঙালি বিদ্রোহী চরিত্রে , যা একদিকে যেমন পৌরাণিক ভক্তিরসের প্রাবল্যতা প্রতিহত হয়েছে অন্যদিকে মানুষের মনে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এবং তা সমকালীন প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বাঙালি মনদীপ্ত মনসামঙ্গলের কাহিনী নিয়ে লেখার পর তিনি বৈদিক কাহিনি নিয়ে অন্যতম একটি নাটক রচনা করলেন 'দেবাসুর' নামে। এই নাটকটি বাংলা নাটকের ইতিহাসে 'বৈদিক কাহিনি' নিয়ে রচিত প্রথম নাটক। নাটকটিতে বৈদিক কাহিনি (পৌরাণিক) নাটকে দেশাত্মবোধক ভাবনার আভাস পাওয়া যায়। নাট্যকারের নিজের কথায় - "আমি প্রথমে ঐতিহাসিক নাটকের পথে না গিয়ে পৌরাণিক আবরণে সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রকাশ করবার ব্রত গ্রহণ করলাম। আমার প্রথম দেশাত্মবোধক নাটক 'দেবাসুর', ঋগ্বেদে দেবাসুর-সংগ্রামের যে সুপ্রচুর ইঙ্গিত রয়েছে তারই ভিত্তিতে পরিকল্পিত।"[৪] নাটকে বৃত্রাসুরের হাতে দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয়, অসুরপতির স্বর্গরাজ্য অধিকার, শেষ পর্যন্ত ঋষি দধীচির দেহাস্থ নির্মিত বজ্রে বৃত্রাসুরের মৃত্যু এবং দেবতাদের পুনরাধিকার প্রতিষ্ঠা এই কাহিনিতে নাটকটি বিস্তৃত। নাটকটির বেশ কয়েকটি সংলাপে নাটকের রূপক-লক্ষ্মণটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেবকুলনারী সূর্যাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে অসুরেরা। বহু চেষ্টায় দেবতারা তাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। এরপর বৃহৎ সংগ্রামের জন্য তাদের প্রস্তুত হতে বলেছেন দধীচি। তার কথায়:-" জয়োহস্তু জয় চায়, জয় চাই....চাই শুধু জয়...দস্যুর হাত থেকে ওই সূর্যাকে যেমন করে আজ উদ্ধার করে নিয়ে এলে, জীবন তুচ্ছ করে মৃত্যুপণ রেখে, তেমনি-তেমনি করে উদ্ধার কর দস্যু-অধিকৃত তোমার আমার সকল দেবতার এই দেবভূমি।"[৫] এই উক্তিটি মধ্যে স্পষ্ট ভাবে লক্ষিত হচ্ছে দেবতাদের যে পরাধীনতা তা প্রকৃতই ভারতের পরাধীনতা। দেবতার উপর অসুরদের যে আধিপত্যতা তা স্বভাবতই ভারতে ইংরেজদের আধিপত্যতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। আবার দধীচির এই উক্তিতে

স্বাধীনতার জন্য জনগনকে সংগ্রামি হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আবার নাটকের মধ্যভাগে দেবতাদের নিরাপদে নদী পার হয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে তিনি জলে ডুব দিলেন, আর উঠলেন না। সেই সময় তার উক্তি - "আমি ডুব দিলাম শচী, তুমি নাম উচ্চারণ কর। আজ না হয়, এক যুগ পরে সেই এক দেবতার বংশধর অসুরের অত্যাচার হতে দেবভূমিকে রক্ষা করে দেবভূমির শৃঙ্খলপাশ ছিন্ন করবে...সেই আশাতে...সেই আশাতেই ডুব দিলুম। আমার জাতি অক্ষয় হোক, আমার জাতি অমর হোক, আমার জাতি জয়লাভ করুক।"[৬] এই জয়লাভের আহ্বান যেন পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা জয়লাভের আহ্বান। আবার দধীচির উক্তিতে যেমন দধীচি জাতীর অক্ষয়, অমর চেয়েছেন ঠিক একইভাবে নাট্যকার বাঙালি তথা সমগ্র জাতীর জয় চেয়েছেন, মুক্ত ভারত চেয়েছেন। আবার দধীচির দেহাস্থির প্রয়োজন হয়েছে বৃত্রাসুরকে নিধনের জন্য, সে সময় দধীচি এগিয়ে এসেছে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে শাসকশক্তির নিষ্ঠুর অত্যাচার ও বর্বর পীড়নের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতিকে নির্ভয়ে দাঁড়াতে যে কোনো ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে, তবেই স্বাধীনতা একদিন অর্জিত হবে- তা নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন। এককথায় নাট্যকার এই ত্যাগস্বীকার, জয়ের জন্য এগিয়ে আসা, পরাধীনাকে মুছে জয়ের আশা জনগনকে দেখাতে চেয়েছেন। এককথায় নাটকের বিষয় সমকালের যে বিশিষ্টভাবনা, সমকালের প্রেক্ষাপটকে সুন্দরভাবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে।

'কারাগার' নাটক যা তাঁর অমর সৃষ্টির এক অসামান্য নিদর্শন। নাটকটি পৌরাণিক নাটকের আবরণে রচিত। 'কারাগার' নাটকে যে বিদ্রোহী-ভাবনা তা অন্যান্য নাটক থেকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ। তা বোঝা যায় সরকারি আদেশে 'কারাগার' নাটক প্রকাশ্য অভিনয় নিষিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে। কিন্তু সরকারের নিষেধাজ্ঞা মানা হয়নি। এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ চলেছিল। নাট্যকারের কথায়:- "কারাগার মহাসমারোহে সগৌরবে মনোমহন থিয়েটার অভিনীত হইতেছিল। গত ১লা ফেব্রুয়ারি রবিবার তথায় অষ্টাদশ অভিনয়ের পর বাঙলা সরকারের নিষেধাজ্ঞাক্রমে 'কারাগারে'র পুনরভিনয় রহিত হয়। কলা রসিকগন তজ্জন্য বিশেষ প্রতিবাদ হইয়াছিল, অভিনয় যে শুধু অভিনয় নয়, বাঙলার নাড়ীর সঙ্গে তাহারও যোগ রহিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট বোঝা গিয়াহিল.....

আমার পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য ডা. নরেশ সেনগুপ্ত 'কারাগারে'র পুনরভিনয় ব্যবস্থাকল্পে বঙ্গীয় আইনসভায় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিল।"[৭]

কাহিনীতে রয়েছে - ভাগবতে বর্ণিত কংস-বাসুদেব-দেবকীর রচনাংশটি অনুসরণ করা হয়েছে। ভোজ বংশের রাজা উগ্রসেনের পুত্র কংস রাজা হয়ে নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়ে যাদবকুলকে নিপীড়িত করে। দাসত্ব মোচন করে যাদবদের সঙ্গে যুক্ত হন কঙ্কন। ইতিমধ্যে পিতাকে বন্দি করে কংস রাজসিংহাসনে বসেছে। অন্যদিকে যাদব বংশকে অহিংসার প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন বাসুদেব। তার নির্দেশে তরুণেরা অস্ত্র ত্যাগ করেছে যুবকেরা। এরপর চন্দনা কাহিনীর মূলে এসেছে। চন্দনার

জন্য কংসের প্রেমার্তীর মধ্যেও অত্যাচারী নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীতে কংসের অন্তর্দ্বন্দ্ব, কংসের প্রভুত্ব না মানায় বিদূরথের স্ত্রী ও পুত্রকে পাষাণাগারে দরজা বন্ধ করে দেওয়া, কীর্তিমানকে হত্যা, কঙ্কা ও কঙ্কণের মৃত্যু, অবশেষে কংসের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে কংসের কারাগারে জন্ম হয় কংস হন্তারক কৃষ্ণের। স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় কংসের কারাগার এখানে পরাধীন ভারতের কারারুদ্ধতার ইঙ্গিত দিয়েছেন নাট্যকার। পরাধীন ভারতকে মুক্ত করতে পরাধীন ভারতে জন্ম নিয়েছে ইংরেজদের বিনাশক। যা রূপকের আড়ালে বোঝাতে চেয়েছেন নাট্যকার। নাটকে সংলাপ যেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে, গানগুলিও অত্যন্ত সুসংবদ্ধ ভাবে ফুটে উঠেছে। গানগুলি তীব্র আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে ধরিত্রীর গানগুলি। যা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ ধরিত্রীর গানগুলো রচনা করেছেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

তৎকালীন সরকার বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন নাটকটির আসল মর্ম, তাই অভিনয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন চলছে তখন একটি পর্যায়ে সরকারের তরফ থেকে বলা হয় যে, 'কারাগার' নাটকটি বাহ্যত পৌরাণিক এবং আপাতদৃষ্টিতে সমকালীন রাজনীতি-কেন্দ্রীক নয়। ৩রা মার্চ ১৯৩১-এর Bengal Concil-এ বলা হয়:-" while admitting that the bengali drama; ' karagar' or prison...was a mythological one..."[৮]

আবার সরকার নিশ্চিত যে প্রকৃতভাবে একালের রাজনীতির সঙ্গে এ নাটকের যোগ রয়েছে। ৩রা মার্চ ১৯৩১-এর সেই bengal council-এ তাও জানিয়েছেন। সেটি হল:-"The home member added that ostensibly the play did not relate to present-day politics, but actually, its bearing on preset-day politics beyond doubt."[৯]

উপরের আলোচনা ও একথা বলা যেতে পারে যে, নাটকে তৎকালীন রাজনীতির কথা রয়েছে প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে। তাই হয়তো নাটকটি সেই সময় ইংরেজ সরকারের মাথা-ব্যথার কারণ হয়েছিল।

নাট্যকার মনোজ বসু 'আমাদের মন্মথদা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন:-" ইংরেজদের বিরুদ্ধে সোজাসুজি যা বলার উপায় ছিল না, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক মুখোশ পরিয়ে নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাই বলা হত। 'কারাগার' এমনই এক নাটক-নামের মধ্যেই বক্তব্যের ইঙ্গিত রয়েছে। দেশই কারাগার-বসুদেবেরা কারান্ধকারের মধ্যে আলোর উদ্ভাসের প্রতীক্ষায় আছে। শ্রোতারা ইঙ্গিতধর্মী বক্তব্য ঠিক ঠিক বুঝে নিত।"[১০]
'দেবাসুর' নাটকের মধ্য দিয়ে সমকালীন নাট্যসাহিত্যে তৎকালীন রাজনীতির কথা উঠে এসেছিল, তা 'কারাগার' নাটকে পূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

অবশেষে বলা যেতে পারে যে কোনো সাহিত্যিক যেমন তার সমকালীন প্রেক্ষিতকে বাদ দেয়নি, ঠিক একইভাবে আমরা মন্মথ রায়ও তাঁর নাটকে সমকাল তুলে ধরলেন। উপরোক্ত তিনটি পৌরাণিক নাটকে দেখতে পায় সমকালীন সমাজ,

সমাজকালীন প্রেক্ষিত। যা এককথায় পৌরাণিক নাটক পৌরাণিক না থেকে তা জনজাগরণের মাধ্যমে পরিণত হয়ে উঠেছে। এবং জাতীয়তাবোধ উন্মেষে সমকালীন সমাজকে আশার আলো দেখিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:-

১) বন্দ্যোপাধ্যায় দিগিন্দ্রচন্দ্র, 'নাট্য-ভগীরথ মন্মথ রায়', প্রসঙ্গ নাট্যকার মন্মথ রায়, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি,প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০২, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১৫৮

২) ঘোষ অজিতকুমার, নাটক ও নাট্যকার, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০০, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১৯৪

৩) রায় মন্মথ, ' বাঙলার সাধারণ মঞ্চ ও আমি', মন্মথ রায় নাট্যগ্রন্থাবলী,২য় খণ্ড, মনমথন প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৪৬২

৪) রায় মন্মথ, ' বাঙলার সাধারণ মঞ্চ ও আমি', মন্মথ রায় নাট্যগ্রন্থাবলী,২য় খণ্ড, মনমথন প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৪৬৪

৫) মন্মথ রায় নাট্যগ্রন্থাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, মনমথন প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, জগদ্ধাত্রী পুজা ১৩৬৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১৬৩

৬) মন্মথ রায় নাট্যগ্রন্থাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, মনমথন প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, জগদ্ধাত্রী পুজা ১৩৬৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১৭৪

৭) দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের কথা, কারাগার, ষষ্ঠ সংস্করণ

৮) An extract from advance, bengal council, কারাগার, ষষ্ঠ সংস্করণ

৯) তদেব

১০) বসু মনোজ, 'আমাদের মন্মথদা' প্রসঙ্গ নাট্যকার মন্মথ রায়, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি,প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০২, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১৫৫

রজনীকান্ত বরদলৈ : অসমের বঙ্কিমচন্দ্র

নির্মল বেরা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ (Abstract) : অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যের স্থপতি রজনীকান্ত বরদলৈ আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের একজন অগ্রগণ্য কথাসাহিত্যিক। বাংলার নবজাগরণ সঞ্জাত সাহিত্য ধারায় ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য ভারতের গৌরবময় ইতিহাস, দেশীয় সংস্কৃতি ও জনজীবন পরিপূর্ণ রূপে উনিশ শতকের নবজাগরণের আলোকে অভিষিক্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিত সর্বভারতীয় সাহিত্যের মতো অসমীয়া সাহিত্যে রজনীকান্ত বরদলৈ অসমের গৌরবময় ইতিহাস, সামাজিক রীতিনীতি, জনজীবন, সংস্কৃতি, জনজাতি প্রভৃতির উপস্থাপন করেছেন তার উপন্যাসগুলিতে। অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যে ধারাপথটিতে তার উপন্যাসে লিপিবদ্ধ অসমের অতীতের গৌরব ও সমকালের সমাজ। এই দুইকে মিশিয়ে আধুনিক অসমকে তিনি সাহিত্যের রূপ দিয়েছেন ইতিহাস, রোমান্স ও কল্পনার অযুতবন্ধনে। সাহিত্যের ঐতিহাসিক মানদন্ডে রজনীকান্ত বরদলৈ অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যে যে স্থানটি দখল করে আছেন, তা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তুল্য। বর্তমানে আলোচনা অংশে রজনীকান্ত বরদলৈ রচিত অসমীয়া ঐতিহাসিক উপন্যাস সমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসে তার ঐতিহাসিক স্থানটি নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

সূচক শব্দ (Key Word): অসমীয়া উপন্যাস, অতীত গৌরব, ঐতিহাসিক গুরুত্ব, ঔপন্যাসিক বিশেষত্ব।

মূল আলোচনা (Discussion)

ভূমিকা

ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরে অসম প্রদেশে বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিসর পরিবর্তিত হলেও উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতের রাজধানী কলকাতায় ছিল একমাত্র অবলম্বন। ফলত, মেধাবী অসমীয়া ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, কলকাতায় অবস্থান এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিমণ্ডলের সান্নিধ্য তাদের মনের মধ্যে অসমীয়া সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের আকাঙ্ক্ষা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এমনিভাবে উনিশ শতকের সত্তর-আশির দশকে অসমীয়া শিক্ষিত যুবকদের কাছে ইংরেজি সাহিত্যের সুবিশাল ভাণ্ডার খুলে গেল এবং নবজাগরণ সঞ্জাত বাংলা সাহিত্যের বিকাশধারায় অবগাহন করতে থাকে। সমকালীন ভারতীয় অপরাপর সাহিত্যের আদলে 'অরুণোদয়' ও 'জোনাকি' পত্রিকাকে

কেন্দ্র করে সেকালের নব্য শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের গোড়া পত্তন সম্ভব হয়েছিল। এই পর্বে চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা (১৮৬৭-১৯৩৮), পদ্মনাথ গোঁহাঞিবরুয়া (১৮৭১-১৯৪৬), লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৮৬৪-১৯৩৮) প্রমুখ অগ্রসর লেখকদের হাতে অসমীয়া সাহিত্যের আধুনিক রূপটি প্রকাশিত হতে থাকে। বলাভালো আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের প্রায় সবকটি শাখার সূচনা এইসময়ে হয়েছে। বিশেষত অসমীয়া উপন্যাসের ধারায় রজনীকান্ত বরদলৈ (১৮৬৭-১৯৪০) বাংলা উপন্যাসের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮–১৮৯৪) সদৃশ্য ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিরাজমান।

অসমীয়া উপন্যাসের উদ্ভব

উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভারতীয়দের দ্বারা রচিত প্রথম উপন্যাসের শিরোপা পেতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ইংরাজী ভাষায় লেখা 'Rajmohan's Wife' (১৮৬৪) উপন্যাসটি। কালের বিচারে প্রথম হলেও ভারতীয় ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক উপন্যাস বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) উপন্যাসটি। তার পূর্বে সলতে পাকানো পর্বে সকল ভারতীয় ভাষাসমূহে উপন্যাস আবির্ভাবের পূর্বে সকল ভারতীয় ভাষার গদ্য ভাষারূপে কাহিনী রচনার একটি পরম্পরা লক্ষ্য করা যায়। একই সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিস্তারের কারণে ইংরেজি উপন্যাসের আদলে প্রতি ভাষায় উপন্যাস রচনার পরম্পরা লক্ষিত হয়। কোথাও বিদেশি গ্রন্থের অনুবাদের চেষ্টা হয়েছে নানান সময়ে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' বাংলা, অসমিয়া, ওড়িআ সহ বহু ভারতীয় ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

ভারতীয় ভাষাসমূহে বাংলার পরই উপন্যাসের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায় গুজরাটি, মারাঠী এবং উর্দু সাহিত্যে। গুজরাটি ভাষার নন্দশংকর মেহেতার লেখা 'কিরণ ঘেটো' প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সালে। মহারাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে মারাঠী সাহিত্যের নবজোয়ার আসে এবং রোমান্টিক উপন্যাসের ধরা শুরু হয়। নানা প্রচেষ্টার পরে ১৮৬৮ সালে সাহিত্যিক নারায়ণরাও রিসবাদের 'মঞ্জুঘোষা' রোমান্টিক উপন্যাসটি প্রকাশ পায় । অন্যদিকে উর্দু গদ্যের উদ্ভব অনেক পূর্বে হলেও ১৮৬৯ সালে সাহিত্যিক নাজির আহমেদ ডেলভির লেখা 'মিরাত্-উল-উরুস' উপন্যাসটি প্রকাশ পায়। পরে উনিশ শতকের মধ্যেই ওড়িআ, অসমিয়া, সিন্ধি সহ অপরাপর ভারতীয় ভাষাতে উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটে।

অসমীয়া গদ্যের সূচনা খ্রিস্টান মিশনারিদের হাতে। বিদ্যালয় শিক্ষা বিস্তারের পর থেকে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও বিবিধ ভাষা থেকে অনুবাদমূলক গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে আধুনিক অসমীয়া গদ্যের জয়যাত্রা শুরু হয়। 'অরুণোদয়' (১৮৪৬) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই যাত্রা আরও গতিশীল হতে থাকে। ১৮৫০-৫১ সালে 'অরুণোদয়' পত্রিকায় প্রকাশ পায় প্রথম অনুবাদমূলক গ্রন্থ 'যাত্রিকের যাত্রা'। অনুবাদকের নাম না থাকলেও, এটি ব্রাউন সাহেবের রচনা বলে অনুমান করা হয়। অবশ্য কিছু আগে পরে মিশনারীরা

বেশ কিছু অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। যেমন ‘কামিনীকান্ত’, ‘এলোকেশী বেশ্যার কথা’, ‘ফুলমণি ও করুণা’ প্রভৃতি। এই গ্রন্থগুলি রেভারেণ্ড গার্ণিয়ে সাহেবের তত্ত্বাবধানে রচিত ও প্রকাশিত। সম্ভবত শ্রীমতি গার্ণিয়ে এর তথা অনুবাদক। অন্যদিকে ব্যঙ্গমূলক রচনার আদলে হেমচন্দ্র বরুয়ার লেখা ‘কোরাভাতুরি’ (১৮৭৬) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অতঃপর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল পদ্মাবতী দেবী ফুকননীর রচিত ‘সুধর্ম্মার উপন্যাস’। ৪২ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় প্রকাশ পায় ১৮৮৪ সালে। এই সময় ‘জোনাকী’ (১৮৮৯) ও ‘বিজুলি’ (১৮৯০) পত্রিকা দুটি অসমীয়া সাহিত্যের বিকাশে প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। ‘বিজুলি’ পত্রিকায় পদ্মনাথ গোঁহাঞিবরুয়ার ‘ভানুমতী’ এবং ‘জোনাকী’ পত্রিকায় লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার ‘পদুম কুমারী’ উপন্যাস প্রকাশ পায়। এখান থেকে অসমীয়া উপন্যাসের যথাযথ পথচলা।

উপন্যাস পরিচয়

মিরি সমাজের চিত্র অবলম্বন করে রজনীকান্ত বরদলৈয়ের ‘মিরি জীয়রী’ (১৮৯৪) উপন্যাসটি রচিত। একে ঐতিহাসিক উপন্যাস না বলে সামাজিক উপন্যাস বলতে হয়। প্রকৃতির সীমাহীন সৌন্দর্য, উৎসবময়তা, প্রণয় কাহিনী প্রভৃতি উপন্যাসটিকে মিরি জনজাতির মানুষের জীবন কাহিনীর সঙ্গে অন্বিষ্ট করে তুলেছে। এখানকার প্রণয়ের মূল কথা যেন পিতৃমাতৃ সহমতে মিলন ও অমতে বিষফল। জনজাতীয় চরিত্রের প্রতি উপন্যাসে এই আধুনিক দৃষ্টিপাত ‘মিরি জীয়রী’ উপন্যাসটিতে প্রথম। পরবর্তীকালে অসমীয়া উপন্যাসিকদের মধ্যে পদ্মনাথ গোঁহাঞিবরুয়া, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, কমলানন্দ ভট্টাচার্য, সুরেশ গোস্বামী প্রমুখ এ বিষয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

‘মনোমতী’ (১৯০০) উপন্যাসকে কেন্দ্র করে ঔপন্যাসিক রজনীকান্ত বরদলৈ সমকালীন অসমের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার চিত্ররূপ বর্ণনা করতে চেয়েছেন। একদিকে পারস্পরিক বিবাদ ও সামাজিক অবনতির চিত্র যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি অসমের বৈষ্ণব ধর্মের ও কীর্তনের মাহাত্ম্য প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু অসমের বলবীর্য, বুদ্ধিসাহস ও কৌশলে কোন প্রকার অবনমিত ছিল না। এমন অতীত গৌরব কথাও উপন্যাসকার তুলে আনতে সচেষ্ট। অপরপক্ষে ‘মনোমতী’ উপন্যাসে মনোমতীকে কেন্দ্র করে যে প্রণয় কাহিনী উপস্থিত হয়েছে তাতে ইতিহাস ও কল্পনা, বাস্তব ও রোমান্স পরস্পর সমাপতিত হয়েছে।

একদিকে ইতিহাস ও অন্যদিকে মুখে মুখে প্রচলিত লোককথা উপর নির্ভর করে ‘দুন্দুরা দ্রোহ’ (১৯০৯) উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। অনেকের মতে একে উপন্যাস না বলে ঐতিহাসিক কাহিনী বলা ভালো। কামরূপের প্রজার উপর অত্যাচারের যোগ্য প্রতিবাদ এই উপন্যাসে স্পষ্ট প্রতিফলিত। উপন্যাসের বিষয় হলো প্রজাবিদ্রোহ বীরদত্ত ও হরদত্ত-এর বিদ্রোহ তথা সংগ্রাম স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অভিমুখ বলে পরিচিত। পদ্মকুমারীর প্রণয়, হরদত্তের শাস্তি, কুমেদান যুদ্ধ, পদ্মকুমারীর অস্বাভাবিক অবস্থা এবং ব্রহ্মপুত্রের জলে আত্মবিসর্জন- এক নাটকীয় পরিমণ্ডল রচনা করে। এর

সঙ্গে অসমের পৌরাণিক রীতিনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ, সামাজিক ব্যবস্থা, আচার-আচরণ, ধর্ম, আমোদ প্রমোদ, খেলাধুলো প্রভৃতি মিলেমিশে উপন্যাসটি অসমের জীবন বেদরূপে উপস্থিত হয়েছে। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার লেখা 'পদুম কুমারী' উপন্যাসের বিষয়বস্তু একই হলেও 'দুন্দুরা দ্রোহ'-এর সঙ্গে তার মূলগত পার্থক্য আছে। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার কাছে পদ্মকুমারীর প্রণয় ছিল মূল কথা কিন্তু রজনীকান্ত বরদলৈয়ের কাছে ইতিহাস ও মৌখিক কাহিনী পরম্পরা নির্ভর ইতিহাসকে আনয়ন করা ছিল উদ্দেশ্য, যা জাতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সাহিত্যিক উপস্থাপনা এবং এখানে পদ্মকুমারীর ঘটনাকেন্দ্রিক কাহিনী ছিল অবলম্বন মাত্র।

রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহের সমকালীন কাহিনী 'রঙ্গিলী' (১৯২৫) উপন্যাসের উপজীব্য। 'রঙ্গিলী' হলো ইতিহাসের কাহিনী আশ্রিত প্রণয় উপাখ্যান। উপন্যাসে রঙ্গিলী, জয়রাম, শান্তিরাম, মনাই প্রভৃতি চরিত্রগুলি স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হয়েছে অসমের সমাজ ও জীবনের নির্ভেজাল পটভূমিকায়। অসমীয়া নৃত্য, গীত, স্বাস্থ্য, গৃহকার্য, সামাজিক রীতিনীতি, বিহু প্রসঙ্গ প্রভৃতি এই উপন্যাসটিকে ইতিহাস ছাড়িয়ে সমকালে প্রতিস্থাপিত করেছে। ক্ষমতাপ্রিয়তা ও ক্ষমতার অধঃপতন উভয়ের মাঝখানে জীবনের জয়গান হয়ে উঠেছে উপন্যাসের মুখ্য বিষয়।

বামাচারী তান্ত্রিকদের অভিসন্ধি এবং অন্যদিকে বৈষ্ণব ধর্মীয় প্রসঙ্গ 'তাম্রেশ্বরীর মন্দির' (১৯২৬) উপন্যাসের অন্যতম বিষয়। উত্তর লক্ষীমপুর অঞ্চলের তাম্রেশ্বরীর মন্দিরকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের পটভূমি রচিত হয়েছে। মিথ্যা বলি প্রথার অসারত্ব এই উপন্যাসে প্রতিপন্ন হয়েছে কাহিনী পরম্পরার মাধ্যমে। ঘটনার মধ্যে রাজ্য শাসন, সেনাপতির আক্রমণ প্রভৃতি ইতিহাসের বিষয় থাকলেও চিরাচরিত অসমের শক্তি সাধনা ও বৈষ্ণব সাধনার পরম্পরা- উভয়তই এই উপন্যাসটিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

অসমের রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহের সমকালীন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ 'নির্ম্মল ভকত' (১৯২৭) উপন্যাসের বিষয়। যুদ্ধে অসমীয়া সৈন্যদের বন্দী হওয়া, চন্দ্রকান্তের অপমান, অত্যাচারীদের হাতে অসমের মানুষের দুর্দশা এবং ময়মনসিংহ, তিব্বত, ভুটান প্রভৃতি অঞ্চলে মানুষের পলায়ন ইত্যাদি ঐতিহাসিক চিত্রটি অতীব নিপুণভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অবশেষে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অসম অধিগ্রহণ করে এবং পলায়নগ্রস্থ মানুষদের অসমে ফিরে আসার সুযোগ হয়। এই উপন্যাসের নায়ক নির্ম্মল চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমকালীন অসমবাসীর সার্বিক দেশপ্রেম ও জীবনকথা ঝংকৃত হয়েছে।

'রহদৈ লিগিরী' (১৯৩০) উপন্যাসের মধ্যে দয়ারাম ও লিগিরীর প্রণয় কাহিনী মুখ্য বিষয়। উপন্যাসের মধ্যে বিহু নাচের প্রসঙ্গ, দুর্গোৎসব প্রসঙ্গ, জাতি ভ্রষ্ট হওয়া প্রসঙ্গ, গোঁসাই এবং মহন্ত প্রসঙ্গ, যুগ প্রভাব কিংবা যুদ্ধবিপর্যয়ের মধ্যে কোথাও যেন বৈষ্ণবীয় অধ্যাত্মমার্গ প্রশান্তি এনেছে। এই উপন্যাসে মঙ্গলদৈ, তেজপুর, মাধব, কেদার,

উত্তর গুয়াহাটি প্রভৃতি দর্শনের প্রসঙ্গ অতি সুন্দরভাবে উপভোগ্য হয়েছে। সর্বোপরি কামাখ্যা দেবী দর্শন যেন অসমের জাতীয় বাসনার মুগ্ধ রূপ।

ঔপন্যাসিক বিশিষ্টতা

কলকাতায় অবস্থানকালে যুবক রজনীকান্ত বরদলৈ ইংরেজি সাহিত্যের স্যার ওয়াল্টার স্কটের ঐতিহাসিক নভেলগুলি এবং বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে প্রকাশিত ইতিহাস আশ্রিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত উপন্যাসগুলি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং সেখান থেকে অসমীয়া ইতিহাস ও জাতীয় কৃতির প্রেক্ষাপটে উপন্যাস রচনার প্রবণতা তার মধ্যে জাগ্রত হয়। 'দুন্দুরা দ্রোহ' উপন্যাসের ভূমিকাতে ঔপন্যাসিক রজনীকান্ত বরদলৈ স্পষ্টতই লিখেছেন,

> "কলেজে থাকতে স্যার ওয়াল্টার স্কটের নভেলগুলি, বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জির উপন্যাসগুলি পড়েছিলাম। . . . ওয়াল্টার স্কটের সেই High land (উচু স্থান) Low land (নিচু স্থান) ইত্যাদি মাঠে মন পড়েছিল। ভাব হয়েছিল- হায় মোর অসম-জননী তুমি কোনো প্রকৃতির কাম্য কানন, তোমার কোলেতে স্কটল্যান্ডের মতো High land, Low land, Hill, Dales, Lakes সকলই আছে, তোমার অতীত কালের ইতিহাস নানা ঘটনাতে পরিপূর্ণ; কিন্তু তোমার এই সমস্ত স্বাভাবিক সৌন্দর্য বাড়িয়ে অতীতের ইতিহাসের উপন্যাস লিখবে স্যার ওয়াল্টার স্কটের মতো বা বঙ্কিম চ্যাটার্জির মতো উপন্যাসকার প্রভাবশালী সাহিত্যিক কোথায়?"

রোমান্সের প্রবণতা বরদলৈয়ের উপন্যাসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। চরিত্রকে ইতিহাসের সীমানায় রাখলেও কল্পনার বহরের বহুলতা চরিত্রগুলিকে অধিকতর সজীব করে তুলেছে। তার সৃষ্ট মনোমতী, শান্তিরাম, রঙ্গিলী, দয়ারাম, প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যদিও চন্দ্রকান্ত সিংহ, হরদত্ত, বীরদত্ত প্রভৃতি বেশ কিছু চরিত্র ইতিহাসের সীমানায় গতিশীল কিন্তু কাহিনীর প্রয়োজন অনুসারে 'মনোমতী' উপন্যাসে মনোমতী-লক্ষীকান্ত, 'নির্ম্মল ভকত' উপন্যাসে নির্ম্মল-রূপহী, 'রঙ্গিলী' উপন্যাসে সৎরাম-রঙ্গিলী প্রণয় কাহিনীগুলি উপন্যাসিককে ইতিহাসের সীমানায় আবদ্ধ রাখেনি বরং অনেক বেশি মানবীয় করে তুলেছে।

উপন্যাসের মধ্যে এই ইতিহাস-প্রীতি ও সমাজকে মিলিয়ে সাহিত্যের প্রেরণা তিনি বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পেয়ে থাকবেন। 'অসমীয়া সাহিত্য সেবক রজনীকান্ত বরদলৈ' গ্রন্থে উপেন্দ্রচন্দ্র লেখারু এই পরম্পরা অধ্যয়ন করে যথার্থ সিদ্ধান্ত করছেন,

> ". . . ঔপন্যাসিক বরদলৈয়ের উপরে স্কটের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। ইহার উপরে বঙ্গীয় ঔপন্যাসিক বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলি পড়েও তাতে প্রেরণা পেয়েছিল। ইংরাজী 'রোমান্স'-এর আদলে রচিত বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখেন এবং একে আদর্শ করে 'মৃণালিনী',

> 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারানী'ও লেখেন। তার রচিত উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। সমাজ সমস্যা এবং চরিত্রনীতির প্রেরণাতে 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লেখা হয়। দেশাত্মবোধের মূলে 'আনন্দমঠ', 'রাজসিংহ'; মনস্তত্ত্বের মূলে 'রজনী' লেখা হয়। এই গ্রন্থ সকলের রোমান্স, ভাব, ভাষা এবং কল্পনার প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্যই পাঠকের চিত্র আকৃষ্ট করে। বরদলৈ স্কট ও বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থগুলির বিশেষ রূপে অধ্যয়ন করেছিল এবং মুগ্ধ হয়েছিল"।(পৃ.-৪)

অসমের সাবেকী নিয়ম-কানুন, উৎসব, ঐতিহ্য, পূজা-পদ্ধতি ইত্যাদি জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং গভীর অনুরাগ তার উপন্যাসকে মহনীয় করে তুলেছে। 'রঙ্গিলী', 'মিরি জীয়রী' প্রভৃতি উপন্যাসে অসমীয়া বিহু প্রসঙ্গ, 'তাম্রেশ্বরীর মন্দির' উপন্যাসে নরবলি প্রথার প্রসঙ্গ, 'রহদৈ লিগিরী' উপন্যাসের দুর্গোৎসব প্রসঙ্গ, সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি সামাজিক শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। 'নির্ম্মল ভকত' উপন্যাসে বৈষ্ণব সাধনার প্রণালী, তাম্রেশ্বর মন্দির কৃষ্ণ মাহাত্ম্য এবং বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা, 'রহদৈ লিগিরী' উপন্যাসের বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যা, আগমানন্দ স্বামী ও প্রননানন্দ স্বামীর কথা, 'তাম্রেশ্বরীর মন্দির' উপন্যাসে বামাচারী সাধনার দিকগুলি সুন্দরভাবে উপস্থিত হয়েছে। 'রজনীকান্ত বরদলৈ : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে ড. মন্দিরা গোস্বামী সুন্দরভাবে ধর্মীয় দিকটি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন,

> "ধর্মের বিশেষ স্থান বরদলৈয়ের উপন্যাসে অন্য একটা উল্লেখযোগ্য দিক। বৈষ্ণব ধর্মই প্রায় সবগুলিতে প্রাধান্য লাভ করেছে। নায়ক, নায়িকা বা অন্য চরিত্র বিপদগ্রস্ত কিংবা হতাশাগ্রস্ত হলে অথবা জীবন যুদ্ধতে ব্যর্থ হলে ঈশ্বরের ওপরে আত্মসমর্পণ করে জীবনের শান্তি কামনা করেছে"। (পৃ.-৭৮)

উপসংহার

প্রকৃত অর্থে অসমীয়া উপন্যাসের ভিত্তি স্থাপিত হল রজনীকান্ত বরদলৈয়ের হাত ধরে। সেই যুগে প্রতিশ্রুতিমান উপন্যাস লেখকদের মধ্যে বরদলৈয়ের একটি বিশিষ্ট আসন স্থাপিত হয়েছে। বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে তাকে 'অসমের বঙ্কিমচন্দ্র' বলা হয়। আবার অপরপক্ষে অসমীয়া উপন্যাসের যথাযথ স্থপতি হিসাবে কেউ কেউ তাকে 'অসমীয়া উপন্যাসের জনক'ও বলে থাকেন। আবার ব্রিটিশ উপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের চিন্তনের সঙ্গে তার উপন্যাস চিন্তনের প্রসঙ্গটির তুলনা করেন। 'দুন্দুরা দ্রোহ' উপন্যাসের ভূমিকাতে ঔপন্যাসিক রজনীকান্ত বরদলৈ সেই প্রাসঙ্গিক কথা লিখেছেন। তাই স্কটের সঙ্গে তার রচনা মিলিয়ে কেউ কেউ আবার তাকে 'অসমের স্কট' বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন।

ফলত, অসমের অতীত গৌরবময় ইতিহাস, অসমীয়া জাতিসত্তা, অসমীয়া জীবন ও সংস্কৃতির রাগ অনুরাগ আধুনিক যুগে প্রথম রজনীকান্ত বরদলৈয়ের উপন্যাসেই ঝংকৃত হয়েছিল। বলাভালো, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের নবজাগরণের উৎসদ্বারে বঙ্গীয়

উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসমালাতে বাংলার চেতনার প্রতিমূর্তি লাভ করেছিল। অপরপক্ষে অনুজপ্রতিম অসমীয়া উপন্যাসিক রজনীকান্ত বরদলৈও প্রায় অনুরূপ সাহিত্য গরিমায় অসমীয়া সাহিত্য ও জনজীবনের রূপকার রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। 'অসমীয়া সাহিত্যের পূর্ণ ইতিহাস' গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাসকার হরিনাথ শর্মাদলৈ সঙ্গতভাবে ঔপন্যাসিক রজনীকান্ত বরদলৈয়ের রচনার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করে লিখেছেন,

> "অতীত প্রেমিক বরদলৈ ইংরেজ রাজত্বের পূর্ববর্তী কালের অর্থাৎ অহোম রাজত্বের শেষাংশের অসমের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক প্রভৃতি দিকের বিচিত্র স্বরূপ প্রয়োজনের উপরেও বহু সময়ে অপ্রয়োজনেও প্রায় সমগ্র রচনার মাঝে অঙ্কন করেছেন। গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তার উপন্যাসগুলিতে মাতৃভূমির অবনতির কারণসমূহ প্রাসঙ্গিক বর্ণনার প্রকাশ করার জন্য প্রকারান্তরে তার মাঝে অসমীয়া জাতির গৌরবের কথা শোনাইবার সাধু চেষ্টা দেখা যায়"। (পৃ.-৩৮২)

সহায়ক গ্রন্থ (References)

১) গগৈ, লীলা (সম্পা.): আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের পরিচয়, বনলতা, ডিব্রুগড়, অসম, ২০০২

২) গোস্বামী, মন্দিরা: রজনীকান্ত বরদলৈ : জীবন ও সাহিত্য, বনলতা, ডিব্রুগড়, অসম, ১৯৯২

৩) গোঁহাঞিবরুয়া, পদ্মনাথ(সম্পা.): জীবনী-সংগ্রহ, অসম প্রকাশন পরিষদ, গুয়াহাটি, অসম, ১৯৬৯

৪) নেওগ, মহেশ্বর: অসমীয়া সাহিত্যের রূপরেখা, চন্দ্র প্রকাশ, গুয়াহাটি, অসম, ২০০৮

৫) ভরালি, শৈলেন : আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস, চন্দ্র প্রকাশ, গুয়াহাটি, অসম, ১৯৯২

৬) লেখারু, উপেন্দ্রচন্দ্র: অসমীয়া সাহিত্য সেবক রজনীকান্ত বরদলৈ, দত্তবারুয়া এণ্ড কোং, গুয়াহাটি, অসম, ১৯৫৮

৭) শর্মা, সত্যেন্দ্রনাথ: অসমীয়া উপন্যাসের ভূমিকা, সৌমার প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং (প্রা) লি., গুয়াহাটি, অসম, ১৯৮২

৮) শর্মাদলৈ, হরিনাথ: অসমীয়া সাহিত্যের পূর্ণ ইতিহাস, শান্তিপুর, নলবাড়ি, অসম, ২০০০

(প্রবন্ধে উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলি মূল অসমীয়া থেকে প্রবন্ধকার কর্তৃক বাংলায় অনুদিত)

উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' : একটি পরাধীন জাতির বিদ্রোহের মুখপত্র

মৌসুমী পাল
অতিথি অধ্যাপক, বি.বি.এম কলেজ
আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

সারসংক্ষেপ : 'টিনের তলোয়ার' নাটকটির স্থান ১৮৭৬-এর মোকাম কলিকাতা চিৎপুর, বৌবাজার এবং শোভাবাজারস্থ নাটাশালার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ-পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে কোনো থিয়েটার ব্রিটিশদের সমালোচনা তো অনেক দূরে, যদি সাহেবদের নিয়ে সামান্য ঠাট্টাও করা হয়, তা হলেই কলাকুশলীদের গ্রেপ্তার করা হতো। এই ধরনের ঔপনিবেশিক শাসন, পুঁজিবাদ, বাবু সম্প্রদায় ও তাদের উশৃঙ্খল সংস্কৃতি, নবজাগরণ এবং স্বদেশ-চেতনার প্রেক্ষিতে শ্রেণি ও ব্যক্তির স্বপ্নের পাশাপাশি তৎকালীন সমাজের কিছু রূঢ় বাস্তব চিত্র ও বাস্তবতার দ্বাত্বিক সংশ্লেষ এই নাটকের বিষয়বস্তু। নাট্যকার উৎপল দত্ত কখনোই শিল্পের আঙ্গিকের সঙ্গে আপোষ করেননি বরং এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন বরাবর। তিনি থিয়েটারের আঙ্গিক হিসেবে আদি সংস্কৃতি বা লোকনাট্যের মধ্যে থেকেও নাট্য উপকরণ যেমন সন্ধান করেছেন, তেমনি তিনি যাত্রাপালার উপাদানগুলিকেও থিয়েটারের মঞ্চে নিয়ে এসেছিলেন। 'টিনের তরোয়াল' নাটকটির আঙ্গিকের মধ্যে ও যেন একটি ব্যঞ্জনা রয়েছে এর নামকরণের মধ্যে কোথাও একটা কোমলতা বা খেলনা খেলনা ভাবের উপস্থিতি যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনি নাটকটির মধ্যে একটি বিস্ফোরক শক্তি, একটা তিব্রতর বিদ্রোহ ভাব যেন সর্বত্রই প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান। আর নাটকের একেবারে শেষে গিয়ে সেই বিদ্রোহ প্রচ্ছন্নতার আড়াল ভেঙে প্রত্যক্ষ রূপে ধরা দেয় দর্শকের সামনে। টিনের তলোয়ারের ব্যঞ্জনায় নাট্যকার উৎপল দত্ত যে ধারালো ইস্পাতের তলোয়ার সৃষ্টি করেছেন, বর্তমান সময়েও সাম্রাজ্য লোভী শ্রেণি শিল্প সাহিত্যের ওপর যে মুর্খতার বা তার পেশিশক্তির আঘাত নিয়ে আসে, তার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া সেই তলোয়ার তাই আজও মরিচাবিহীন ধারালো।
সূচক শব্দ : জীবন, ভালোবাসা, প্রতিবাদ, বিদ্বষ, আলোকিত।

নাট্যকার ও অভিনেতা উৎপল দত্তের রচিত ও পরিচালিত বিখ্যাত নাটক 'টিনের তলোয়ার' 'পিপলস্ লিটন থিয়েটার'-এর প্রযোজনায় প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১২ আগস্ট ১৯৭১ সালে কলকাতা শহরের রবীন্দ্রসদন মঞ্চে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে। পরবর্তী সময় ১৯৭৩-এর জুন মাসে জাতীয় সাহিত্য পরিষদ নাটকটিকে প্রথম প্রকাশ করে। ১৮৭৬ সালের নাট্য নিয়ন্ত্রন বিল ও ব্রিটিশ সরকারের নাটক

নিয়ন্ত্রনের ঘৃণ্য প্রয়াসের বিরুদ্ধে কণ্ঠরোধ হয়ে যাওয়া শিল্পীদের হয়ে থিয়েটারের নিজস্ব প্রতিবাদকেই উৎপল দত্ত 'টিনের তলোয়ার' নাটকে দেখাতে চেয়েছেন। আসলে ব্রিটিশ বিরোধী বাংলা নাটকের ভয়ঙ্কর জনপ্রিয়তা দেখে ব্রিটিশ সরকার বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল বলেই থিয়েটারের জোড়ালো কণ্ঠকে রোধ করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকারের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে অশ্লীলতার অজুহাতে কুখ্যাত 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ' আইন প্রবর্তন করেছিলেন। শিল্পীদের স্বাধীন সত্ত্বাকে নষ্ট করে তাঁদের কণ্ঠকে রোধ করাই ছিল এই আইন চালু করার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই নাটকটির মুখবন্ধে নাট্যকার লিখেছিলেন "বাংলা সাধারণ রংগালয়ের শতবার্ষিকীতে প্রণাম করি সেই আশ্চর্য মানুষগুলিকে - যাঁহারা কুষ্ঠগ্রস্ত সমাজের কোনো নিয়ম মানেন নাই, সমাজও যাঁহাদের দিয়াছিল অপমান ও লাঞ্ছনা।। যাঁহারা মুৎসুদ্দিদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকিয়া ও ধনীর মুখোস টানিয়া খুলিয়া দিতে ছাড়েন নাই। যাঁহারা পশুশক্তির ব্যাদিত মুখগহ্বরের সম্মুখে টিনের তলোয়ার নাড়িয়া পরাধীন জাতির হৃদয়-বেদনাকে দিয়াছিলেন বিদ্রোহ মূর্তি"।[১]

'টিনের তলোয়ার' নাটকটির স্থান ১৮৭৬-এর মোকাম কলিকাতা চিৎপুর, বৌবাজার এবং শোভাবাজারস্থ নাট্যশালার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ-পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে কোনো থিয়েটার ব্রিটিশদের সমালোচনা তো অনেক দুরে, যদি সাহেবদের নিয়ে সামান্য ঠাট্টাও করা হয়, তা হলেই কলাকুশলীদের গ্রেপ্তার করা হতো। এই ধরনের ঔপনিবেশিক শাসন, পুঁজিবাদ, বাবু সম্প্রদায় ও তাদের উশৃঙ্খল সংস্কৃতি, নবজাগরণ এবং স্বদেশ-চেতনার প্রেক্ষিতে শ্রেণি ও ব্যক্তির স্বপ্নের পাশাপাশি তৎকালীন সমাজের কিছু রূঢ় বাস্তব চিত্র ও বাস্তবতার দ্বান্দ্বিক সংশ্লেষ এই নাটকের বিষয়বস্তু। নাটকের কলাকুশীলবেরা মূলত একটি পেশাদারি থিয়েটারের দল (গ্রেট বেঙ্গল থিয়েটার)- কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। সুদের কারবার, দালালি এবং ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে অংশীদারী ব্যবসায়ের উপার্জন থেকেই ধনী ব্যবসায়ী বা মুৎসুদ্দি হয়ে ওঠার পাশাপাশি সমাজে হঠাৎ ধনী হয়ে যাওয়া এই মূর্খ বাবুরাই হয়ে উঠলেন বিভিন্ন রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষক বা মালিক; যাদের ধারনায়, বহু রক্ষিতার বাবু হওয়াতেই সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায় বলে বিশ্বাস ছিল। এই ঘোরতর অন্ধকার, সামাজিক মর্মান্তিক অবনতির ইতিহাসই প্রতিবিম্বিত হয়েছে 'টিনের তরোয়াল' নাটকের প্রতিটি অংশে।

নাটকের সূচনাতেই বেণীমাধব ওরফে কাপ্তেনবাবুও মেথরের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার গভীর ব্যঞ্জসাময় সেই যুগের ইতিহাস ও সমকালীন মানুষের মানসিকতার দিকে আলোকপাত করার প্রয়াস নিয়েছেন। নাটকটিতে প্রথমেই একটি বড় পোস্টারে দেখানো হল -

"হৈ হৈ ব্যাপার! রৈ রৈ কাণ্ড!"

দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরা

শোভাবাজার
গ্রান্ড প্রদর্শন: Attention Please
আসিতেছে: Coming
রোহীন্দ্র চৌধুরীর
"ময়ূরবাহন নাটক"[২]

এই অপেরা কোম্পানি (শোভাবাজার দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরা)-র মালিক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ একজন ধনী ব্যবসায়ী হলেও শিক্ষা-দীক্ষা কিংবা আদর্শ, তার কাছে এসবই গুরুত্বহীন। এই অশিক্ষিত মুৎসুদ্দি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দাঁ বাংলা নাট্যশালায় ভালো নাটকের অভাববোধ করেন ভীষণ ভাবে। তাই তিনি নিজেই এক সময় নাটক লিখতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন- "আমি লিখবোখন। আজকাল সাহিত্যই করছি দিনরাত।"[৩] বীরেন্দ্রকৃষ্ণ নিজের প্রয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে পর্যন্ত ভাড়া করা নাট্যকার হিসেবে রাখতে চান-

"বীর।। সে কত নেবে মনে হয়?
হর।। উনি বঙ্কিমচন্দ্রকে মাইনে করে রাখবেন! বেণি।। দেখবেন লোকটা আবার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তো, গুলি টুলি না করে বসে?"[৪]

এছাড়াও এই ধনী মুৎসুদ্দির এতটাই প্রখর জ্ঞানের আলো যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত আর কালিদাসে কোনো প্রভেদ না রেখেই তিনি 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর নাট্যকার ভাবেন মাইকেল মধুসূদন দত্তকে। শুধু তাই নয় দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'-কে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতেও তিনি পিছুপা না হয়ে বলেন- এই নাটকটি আসলে "চূড়ান্ত রকমের অশ্লীল। পাশে রাঁড় নিয়ে বসে দেখা যায় না।"[৫]

'কলকাতার তলায়' থাকা মেথর মাথুরের কাছে মুৎসুদ্দি বীরকৃষ্ণ দাঁ এবং থিয়েটারওয়ালা বেণিমাধবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; দুর্বোধ্য মধুসূদনের কাব্যের চেয়ে 'বাইজির খ্যামটা' তার কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। অন্যদিকে, এই নাটকে উচ্চশিক্ষিত, আদর্শবাদী, সংস্কারপন্থীদের প্রতিনিধিত্ব করছে বাবু বংশোদ্ভূত কিন্তু ডিরোজিও পন্থী প্রিয়নাথ। নারীদেহ লোলুপ পুঁজিপতি বাবাকে পর্যন্ত প্রিয়নাথ ঘৃণা করে "কাল বাড়ি ফিরেছি, হাতে ছিল বার্ডসাই। বাপ বলে, গুরুজনদের সামনে ধূমপান করতে লজ্জা হয় না? তার মুখে ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, ছেলের সামনে উপপত্নী নিয়ে ঢলাঢলি করতে লজ্জা হয় না?"[৬]

প্রতিবাদ স্পৃহা ও সুন্দর একটি স্বদেশী হৃদয়কে সে বিলেতি পোষাক ও ইংরেজী বাক্যের আড়ালে স্বযত্নে লুকিয়ে রেখেছে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তার 'পলাসীর যুদ্ধ' ও 'তিতুমীর' নাটক দুটির মধ্যে। বেণীর উক্তিতে 'শালা! রক্তের মধ্যে ঢুকে যায় এমন সব চোখা চোখা কথা!"[৭] প্রিয়নাথ অনেকটাই স্পষ্টবাদী। তার প্রতিবাদী সাহসী ভাবনাগুলি প্রকাশে কখনোই সে দ্বিধাগ্রস্ত নয়। কথার ছলে ময়নাকে বাংলায় ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের আসল কারণ অদ্ভুত সুন্দর জ্বালাময় সংলাপের মাধ্যমে

প্রকাশ করেছে প্রিয়নাথ- "আমাদের খাদ্য-চাল, গম, চিনি সব রপ্তানি হয়ে যাচ্ছে। রেশম শিল্প ধ্বংস করেছে, তাঁতীদের উচ্ছন্নে দিয়েছে, কারিগরদের রুধিরে হস্ত প্রক্ষালন করেছে। এইবার খাদ্য-অন্ন কেড়ে নিয়ে চালান করে দিচ্ছে বিদেশে তাই দুর্ভিক্ষ!"[৮] এমন আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকারী চরিত্রটিও কিন্তু প্রশ্নাতীত নয়, বরং সেও সাধারণ মানুষের মতোই বিশ্বাস করে নারীর সতীত্বে।'

'চিনের তলোয়াল' নাটকের সব থেকে জটিল চরিত্র মনে হয় বেণিমাধব চরিত্রটি। উনিশ শতকের গিরিশ ঘোষ প্রমুখ নাট্য ব্যক্তিত্বের আদলে গড়ে তোলা এই চরিত্রটিকে আসলে কোনো নির্দিষ্ট্য আদলে বা আদর্শে রাখা সম্ভব নয়, কারণ চরিত্রটি উনিশ শতকের আদর্শ ও আদর্শহীনতার সংঘর্ষে গড়ে উঠা চরম এক স্পর্শকাতর কালের বিবর্তন, অথবা কালের বিবর্তিত ধারায় নিজেকেটিকিয়ে রাখার যে প্রয়াস বহু যুগ মানব সভ্যতায় বিরাজ করছে সেই প্রবহমানতার প্রতিনিধিইহল বেণিমাধব চরিত্রটি। সে 'বামুন' হলেও 'বাবু' নয়, 'ক্যাপ্তেনবাবু' অর্থাৎ সে একজন নাবিক।সে বাবুদের পদলেহনকারী হয়েও আসলে সে বাবু-বিদ্বেষী। থিয়েটার বা-শিল্পের জন্য সেযেকোন ধরনের স্বার্থ ত্যাগ করে যেকোনো আপোস করতে রাজি। নিজের হাতে গড়ে তোলাঅভিনেত্রী শঙ্করী দেবীকে পর্যন্ত সে বাঁধা দিয়ে দেয় বীরেন্দ্র কৃষ্ণের কাছে। "থিয়েটারের জন্যসব করতে পারি, করে এসেছি, করে যাবো।" এক সাধারণ সব্জি বিক্রেতা ময়নাকেশিক্ষায়-দীক্ষায়-রুচিতে বিখ্যাত অভিনেত্রী শঙ্করী দেবীতে রূপান্তরিত করতে কম ঘাটতে হয়নিবেণিমাধবকে, ময়নাকে সে নিজের মেয়ের থেকেও বেশি কিছু বলে মনে করতেন। বেণিমাধবচরিত্রটির আধুনিক মনের, সুন্দর একটি পরচিয়ও এখানে পাওয়া যায়। তথাকথিত হিন্দুয়ানিরমুখে ঝামা ঘষে সে বলেছে-"সতীত্ব? সেটা একটা কুসংস্কার।[১০] তবে এত কিছুর পরওবলতেই হয়, আসলে চরিত্রটি বড় অসহায়। যে অসহায়তার আড়ালে স্বযত্নে লালিত করেরেখেছে তার বিদ্রোহী মনোভাবকে। যে বেণিমাধব 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন'-এর ভয়ে 'তিতুমীর'নাটকের বদলে 'সধবার একাদশী' নাটকটি মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নেয়-- দেশ প্রেমিকরাযেন ঐ গ্রেট নেশনেলের ভাঙা হাটে গিয়ে প্রসরা সাজান। এখানে দেশ সেবকের ঠাঁই নেই।দেশ প্রেম! ইঃ! টিনের তলোয়ার নিয়ে গোরা সৈন্যের সঙ্গে লড়বেন।"[১১] সেই বেণীমাধবইমদ্যপ অবস্থায় গোড়া সৈন্যের উপস্থিতিতে থিয়েটারে 'সধবার একাদশী'-র সংলাপ বলতেগিয়ে স্বতস্ফূর্ত ভাবে 'তিতুমীর'-এর সংলাপ বলে ওঠে-"যতক্ষণ এক থিরিংগি শয়তান দেশেরপবিত্র বুকে পা রেইখে দাঁড়গে থাকবে, ততক্ষণ এই ওয়াহাবি তিতুমীরের তলোয়ার কোষবদ্ধহবে নে কখনো।"[১২] এই সংলাপটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে টিনের তরোয়াল যেন ইস্পাতেরতলোয়ারে পরিণত হয়ে যায়, এর সঙ্গে বেনিমাধব চরিত্রটিও এক মুহূর্তে যেন পরিণত হয়ে যায়একটি আপোষহীন প্রতিবাদী চরিত্রে।

নাট্যকার উৎপল দত্ত কখনোই শিল্পের আঙ্গিকের সঙ্গে আপোষ করেননি বরং এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন বরাবর। তিনি থিয়েটারের আঙ্গিক হিসেবে আদি

সংস্কৃতি বা লোকনাট্যের মধ্যে থেকেও নাট্য উপকরণ যেমন সন্ধান করেছেন, তেমনি তিনি যাত্রাপালার উপাদানগুলিকেও থিয়েটারের মঞ্চে নিয়ে এসেছিলেন। 'টিনের তরোয়াল' নাটকটির আঙ্গিকের মধ্যে ও যেন একটি ব্যঞ্জনা রয়েছে; এর নামকরণের মধ্যে কোথাও একটা কোমলতা বা খেলনা খেলনা ভাবের উপস্থিতি যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনি নাটকটির মধ্যে একটি বিশেষ শক্তি, একটা তিব্রতর বিদ্রোহ ভাব যেন সর্বত্রই প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান। আর নাটকের একেবারে শেষে গিয়ে সেই বিদ্রোহ প্রচ্ছন্নতার আড়াল ভেঙে প্রত্যক্ষ রূপে ধরা দেয় দর্শকের সামনে। টিনের তলোয়ারের ব্যঞ্জনায় নাট্যকার উৎপল দত্ত যে ধারালো ইস্পাতের তলোয়ার সৃষ্টি করেছেন, বর্তমান সময়েও সাম্রাজ্য লোভী শ্রেণি শিল্প সাহিত্যের ওপর যে মুর্খতার বা তার পেশিশক্তির আঘাত নিয়ে আসে, তার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া সেই তলোয়ার তাই আজও মরিচাবিহীন ধারালো।

তথ্যসূত্র:

১) 'টিনের তলোয়ার', উৎপল দত্ত, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬৩, কলকাতা, মুখবন্ধঅংশ।
২) ঐ, পৃ-৯
৩) ঐ, পৃ-৫১
৪) ঐ, পৃ- ৫৩
৫) ঐ, পৃ- ৫১
৬) ঐ, পৃ-৮৬-৮৭
৭) ঐ, পৃ- ১২১
৮) ঐ, পৃ-৮৮
৯) ঐ, পৃ-১০৩
১০) ঐ, পৃ-১০২
১১) ঐ, পৃ-১১৮
১২) ঐ, পৃ- ১২৯

গ্রন্থপঞ্জি:

১) 'টিনের তলোয়ার', উৎপল দত্ত, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬৩, কলকাতা।
২) 'টিনের তলোয়ার', উৎপল দত্ত, সম্পাদক ড. বাকী বিল্লাহ বিকুল, ঝিনুক প্রকাশনী, ২০১৫, ঢাকা।
৩) 'টিনের তলোয়ার: ইস্পাতের তলোয়ার', ড. অপূর্ব দে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১।

কমলকুমার মজুমদারের মল্লিকাবাহার : বাংলা ছোটোগল্পে এক স্বাতন্ত্রের দিশারী

ভগীরথ নন্দী
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: কমলকুমার মজুমদারকে প্রায় সকলেই মনে-প্রাণে বাংলা সাহিত্যে বহুমুখী প্রতিভাধর শিল্পী হিসেবেই চেনেন,জানেন ও মনে করেন। তবে তাঁর সাহিত্য শুধুমাত্র ব্যাতিক্রমী শিল্পীসত্তা, অভিনব ভাষাশৈলী বা বহুমুখীতার উপর নির্ভর করে না। তাঁর সাহিত্য রচনার অসাধারণত্ব অনেকটা নির্ভর করে সাহিত্যের বিষয় নির্বাচনে ও প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বাইরে নতুন কিছু সৃষ্টি করার প্রয়াসের মধ্যে। বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাসে তাঁর রচিত 'মল্লিকাবাহার' ছোটোগল্পটি নিঃসন্দেহে এক প্রথাগত গতানুগতিকতার বাইরে যে বিচরণ করেছে তা বলাই বাহুল্য। তিনি যে সময়ে দাঁড়িয়ে আলোচ্য গল্পটির ভাবনা ভেবেছেন তা কোনো নেহাত কল্পণার বশবর্তী হয়ে রচনা তা বলা যেতেই পারেনা। এর মধ্যে রয়েছে সাংঘাতিক দূরদর্শীতা ও ভাবি কালের আধুনিক চেতনা মনস্কতা। মল্লিকা আর পাঁচজন সাধারণ মেয়ের মতোই সমাজে নিজেকে ভাবতে চেয়েছিল। কিন্তু যখনই সে নিজেকে আয়নার সামনে উপস্থিত করে নিজেকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে তখনই তার বিবেকের কাছে নিজেকে আর খুঁজে পায়না। তার অবিবাহিত জীবনে অসহায়তার রূপ স্পষ্ট। তার কদাকার রূপের মধ্যেও সে সাজসজ্জা করে নিজেকে কোনোভাবেই খুঁজে পায়না, সবকিছুই যেন এক ব্যর্থতা। সে একাধিক পুরুষের সান্নিধ্যে এসেছে তবে তাদের সঙ্গে কোনোরূপ স্থায়িত্ব লক্ষ্য করা যায় না। রক্তমাংসের মল্লিকা নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে ঠিকই, তবে এক আর্তনাদ, হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে গল্পটি জুড়ে। গল্পের শুরু থেকে লেখক একথা স্পষ্ট করে জানালেও গল্পের সমাপ্তি হয়েছে তারই মতো আর এক সামাজিক ভাবে ব্যর্থ নারী শোভনার সঙ্গে তার প্রেমের খেলা ও সমকামিতার মধ্যে, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক উপস্থাপিত। যে ভাবনা আমরা একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসেও অনায়াসে ভাবতে পারিনা বা ভাবনায় আসে না তা কমলকুমার 'মল্লিকাবাহার' গল্পটিতে দুই নারীর এই নতুন সমীকরন কিভাবে সাহিত্যে উপস্থাপন করে এক স্বতন্ত্র ধারার সূচনা করেছেন তা আলোচনার মাধ্যমে বিশ্লেষণই প্রবন্ধটির লক্ষ্য।

সূচক শব্দ: মল্লিকাবাহার, কমলকুমার, ছোটোগল্পে সমকামিতা, স্বাতন্ত্রের দিশারী।

মূল আলোচনা:

কথাসাহিত্যের চালচিত্রে কমলকুমার মজুমদার ছোটোগল্পের যে দিগন্ত আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত করেছেন তাতে তাঁর আবির্ভাবের কালপর্ব যে সুখের ছিল তা কিন্তু নয়। দেশীয় পরিস্থিতি, সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে শুরু করে দেশ স্বাধীনের উন্মাদনা ও বিভিন্ন প্রকার আন্দোলন একপ্রকার অস্থির পরিবেশ-পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেই হয়েছিল। তাঁর পুর্ববর্তী সাহিত্যিক ও সাহিত্য ধারা থেকে তিনি নিজেকে একটু সরিয়ে এনে এক নতুনত্বের আস্বাদ দিতে চেয়েছেন পাঠককুলকে। তবে তিনি যে নিজেকে একটু গুটিয়ে রাখতে বেশী পছন্দ করতেন তা অনেকেরই জানা। ১৩৫৮ সালে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় বৈশাখ-আশ্বীন সংখ্যায় তাঁর বিখ্যাত গল্প 'মল্লিকাবাহার' আত্মপ্রকাশ করে। এর পুর্ববর্তী গল্পগুলিতে প্রচলিত ভাষাশৈলী ও প্রকাশরীতির মধ্যে কিছুটা মিল পাওয়া গেলেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে গল্পটির মধ্যে যে এক দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন তা প্রত্যেক সাহিত্যপ্রেমিকেই স্বীকার করতে হয়। গল্পের শুরুটা হয়েছে ঠিক এমনি ভাবেই-

> "আয়নায় এখন; আঁচল দিয়েই মুখ সে মুছে, এবার যথাযথ প্রতিফলিত, এবং অতীব স্পষ্ট। যদিও যে ছোট এ আয়না; তৎসত্ত্বেও আবক্ষ দেখা যায়, যখনই যেখানেই ঈষৎ ফাঁক সেখানে সেখানে দীন ঘরের, স্যাঁতসেঁতে ঘরের এটা-সেটা।"[১]

মল্লিকার নিজেকে এই দেখা থেকেই গল্পটির সূচনা যা থেকে নিজেকে এক ভবিষ্যৎ থেকে আজ যেন প্রত্যক্ষ করে। তার মুখোশ্রীতে প্রত্যক্ষ করেছে এক পুরুষোচিত ক্লান্তি। স্বাভাবিক লাবণ্য তার মধ্যে নেই, সে যেন এক শ্রীহীন মেয়ে। তার জীবনসংগ্রামের কাহিনী প্রতিনিয়ত মনের মধ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে। নিজেকে আর পাঁচজন মেয়ের মতো সমাজের কাছে উপস্থাপিত করার কনো ত্রুটি সে রাখেনি। সে আয়নার দিকে তাকিয়ে তার 'উরল বক্ষদ্বয়', 'কেশসম্ভার' খুঁজেই পায় না। মনের মধ্যে যে তুফান একসময় ছিল তা তার পারিবারিক কারণে তথা মা-বাবার অকাল বার্ধক্য, দৈন্যদশা, বালিখসা দেওয়াল, ঝুলমাখা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে সবকিছু গোলমেলে হয়ে গেল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাই সে আর কোনোদিনই মল্লিকাকে খুঁজে পায়নি। ভবিষ্যতেও আর পাবেনা লেখক তা যেন এই এক মল্লিকার মধ্য দিয়েই আমাদের জানিয়েছেন। রক্তমাংসের মল্লিকা তার সুদিন কল্পনা করে ঠিকই তবে তা ক্ষণস্থায়ী। কমলকুমারের ভাষায়-

> "যৌবনের জীবনের অনেক যা-কিছু ওই সকলের হাতেই সে জমা করে দিয়েছিল, ওখানেই হেতুহীন গোপনতার মধ্যেই ব্যাঙের আধুলী।"[২]

তার রক্তে রসে কোনো ঊর্ধ্ব আকাশ, কোনো বাগান বা কোনো বৃষ্টি ভেজা বাগানের দৃশ্য মিশে গিয়ে তা যৌবনের প্রতীক হয়ে উঠেছে অথছ লেখক তার মনের প্রেমের

কথাটিকে বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেননি। মল্লিকা নিজেকে এই দুনিয়াতে অচেনা করে তোলে। আমরা সকলেই সে শৈশবের স্মৃতিচারণ করেই আনন্দ পাই। মল্লিকার মনের কথা বলতে গিয়ে সমালোচক জানিয়েছেন-

> "মল্লিকা যুবতী, তবু তার স্মৃতি ও অনুভবে একটা দেশহীন ভাব যে আমরা দেখি, সে তো কল্পনার দেশ পেতে চায় বলেই। সমূহ বিনাশ, এক সম্পূর্ণ ক্ষয় সে দেখতে পাচ্ছে।"[৩]

নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্কের এক বাঁক থেকেই যেন মল্লিকাবাহারের জন্ম। আর্থিক সংকটই মল্লিকাকে চাকরির দিকে নিয়ে গেছে। যে রীতিতে আমরা অভ্যস্ত নই তারই নিদর্শন লেখক তুলে ধরেছেন আমাদের মধ্যে। বাঙালি পরিবারের মেয়েরা চাকরি করবে এ ভাবনা আমাদের চিন্তার মধ্যে যখন নেই তখনই মেয়েরা যে শুধুমাত্র গৃহবধূ নয় তারাও পুরুষের মতো চাকুরে হতে পারে এটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন। তাই তিনি গল্পে সামাজিক অবস্থার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে জানিয়েছেন-

> "গ্রাম্যরা যে চোখে পাথরে কোঁদা যক্ষিণী দেখে থাকে, এ দেখা হয় সেই দেখা।"[৪]

পুরুষেরা গৃহবধুদের দিকে হা পিত্তেশ করে যদিও তাকায় তবুও তারা ভুলক্রমে চাকুরে স্ত্রী লোকেদের প্রতি বিন্দুমাত্র তাকানোর সময় যেন পায় না। পুরুষের প্রেম, যৌনতার মধ্যে আধিপত্য বহুদিনের পুরানো। তাই বলে যে মেয়েটি এম. এ, বি.এ পাশ করে চাকুরির জন্য চেষ্টা করতে করতে চোখে মুখে বলি রেখার ছাপ স্পষ্ট, কঠোরতা বিদ্যমান সে কি সমাজে ফেলনা? প্রায় একশত বছর পূর্বে রচিত গল্পটি আজও যেন সাম্প্রতিক কালে ঘটা কোনো ঘটনা। চাকুরে মেয়ের গল্প কোনো নতুন বিষয় নয় তবে কমলকুমার যে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন তা কিন্তু একেবারে শূণ্যতা, স্বপ্ন-যন্ত্রণা ও জগৎকে বদলে দেওয়ার কাহিনি খুব কমই দেখা যায়। নারী জীবনের প্রগতির কথা আধুনিক জীবনে খুবই সাধারণ বিষয় তবুও মেয়েদের মনে কোথাও একটা গোপন টানাপোড়েন থাকে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। মল্লিকার মনের মধ্যে এক বিপ্লবের সূচনা হয়েছে যার মধ্যে আপাত অর্থে জয় থাকলেও হারের ইঙ্গিত স্পষ্ট করেছেন লেখক-

> "কুমারী বলে তাকে গ্রাহ্য করবে না, একথা প্রতিবার মনে হয় অথচ মন মানতে চায় না, কত ছেলেই তাকে ভালোবাসতে পারত সেও পারত- কিন্তু কোনো ক্রমেই হয় লজ্জা কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে তা ঘটে উঠেনি।"[৫]

কিন্তু পুরুষের সান্নিধ্য সে চেয়েছে বারে বারে। গল্পের মধ্যে যে দুটি স্পষ্ট বিভাগ রয়েছে তার দ্বিতীয় বিভাগে দেখা যায় মল্লিকা প্রেম চেয়েছে জীবনে। তাই দেখা যায় তাকে অনেক পুরুষ যৌবন ভরে উপভোগ করেছে ঠিকই তবে কোথাও পুর্ণতা পায়নি। শিশির, অঞ্জন, ব্রজদা, আনন্দ এককালে তার খুব কাছের ছিল তবু তারা আজ অন্য

সঙ্গিনী নিয়ে দিব্যি আছে। অথচ মল্লিকার চাই কোনো ব্যক্তিকে। তাদের সকলের মধ্যে এক উদাসীনতা প্রত্যক্ষ করে মল্লিকা হতাশাগ্রস্ত। যদিও শিশির মল্লিকাকে হয়তো মনে মনে চেয়েছিল বিবাহের আগে মল্লিকা বড় হবে এবং তার মধ্যে প্রেম ভাবটা আসবে। তবে বিবাহের আগে প্রেম যখন আমাদের সমাজে একপ্রকার নিষিদ্ধ ছিল আর বিবাহপূর্ব যৌনতা তো নৈব নৈব চ। মল্লিকার মনের গভীরে নিয়ত ঘটে চলা দ্বন্দ্ব এক নতুন উপলব্ধির জন্ম দিয়েছে। তাই সনাতন পৃথিবীর সঙ্গে যেন সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করতে চেয়েছে। পেশাগত কারণে তার সাজসজ্জার পরিবর্তন হবার সাথে সাথে জীবনবোধের ও যে পরিবর্তন হবে তা স্বাভাবিক। তবে পুরুষের তুলনায় নারীমনে তা দ্রুত। তাই এযাবৎকাল এক পুরুষের মধ্যে যে পুরুষালী দীপ্তি মনে মনে অন্বেষণ করছিল তা সে খুঁজে পেয়েছে শোভনা নামের এক নারীর মধ্যে।

আমরা জানি এই গল্পটির মধ্যে রয়েছে সমকামিতা। তারই পথ চলা শুরু হয়েছে এখান থেকেই। যদিও তা গল্পের একবারে শেষের দিকে। যখন মল্লিকার হতাশাগ্রস্ত জীবন হাহাকারে পরিণত তখন একটি মেয়ের অন্তরের মর্মবেদনা যে তারই সমগোত্রীয়া কোনো মেয়ে বুঝবে তা স্বাভাবিক। দীর্ঘদিন ধরে যে সব পুরুষের কাছে বঞ্চিত হয়েছে তাতে মনের মধ্যে নানান ব্যর্থতা আর গ্লানি এসে ভীড় করেছিল তাই নিজেকে যখন প্রায় আর খুঁজে পাচ্ছিল না তখনই শোভনাদিকে দেখে এক ভীন্নভাবের সঞ্চার হয়েছে। কমলকুমার শোভনার উপস্থাপনা করতে গিয়ে লিখেছেন-

> "শোভনার চোখে অন্য এক আলো এসে পড়েছে, তার চোখেমুখে দেখা যাবে পুরুষালি দীপ্তি, যে দীপ্তি, যে কোন রমণী যে সে ঘাটের পথে বাটের পথে চিকের আড়াল হতে দেখুক, ভাল এ দৃষ্টি লাগবেই।"[৬]

সমালোচকের ভাষায়-

> "ভগ্ন মনোরথ এবং চাপা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে পথে বেরিয়ে যে শোভনাদির সঙ্গে মল্লিকার দেখা হয় তার মধ্যে রয়েছে একধরণের পুরুষালি দীপ্তি। মল্লিকা আর শোভনা যেন ভেঙেচুরে যাওয়া জীবনের রুক্ষ পথে নিঃসঙ্গ এবং একাকী। বীতস্বপ্নের পোড়ো জমিতে দাঁড়িয়ে দুজনেই খুঁজছে বেঁচে থাকার অন্য ডাঙা।"[৭]

শোভনার 'পুরুষালি দীপ্তির' মধ্যে মল্লিকা সহজেই নিজেকে ধরা দিয়েছে। মনের মধ্যে পুঞ্জিত আকাংক্ষা যেন সার্থক রূপ পেতে চেয়েছে তাই উল্লেখ করতে হয়-

> "শোভনার স্পর্শের মধ্যে কেমন এক দিব্য উষ্ণতা, এ উষ্ণতা বহুকাল বয়সী বহুজনপ্রিয়। মল্লিকার এ উষ্ণতা ভাল লেগেছিল ভারী ভাল লেগেছিল।"[৮]

এখানে বলা যেতে পারে সখিতত্ত্বের ইতিহাসের আধুনিক রূপ যেন সমকামিতায় রূপান্তরিত হয়েছে। কেননা বর্তমানে পুরুষে-পুরুষে বা নারীর সাথে নারীর বন্ধুত্ব থেকে

বিবাহের মত ঘটনা নতুন কোনো বিষয়ই নয়। গল্পে মল্লিকা ও শোভনার মধ্যে বন্ধুত্বের থেকে সমকামিতার দিকে মোড় নেওয়া তারই প্রমান দেয়। শোভনার ভূমিকা ঘটেছে এক পুরুষ হিসেবে এবং মল্লিকা এক অতৃপ্ত নারী। যে প্রেম চেয়ে বহুবার পুরুষের থেকে বঞ্চিতা। তাদের দুজনে চাকরি করলেও তাদের কোন প্রেমিক নেই, তাদের শরীরের এবং মনের চাহিদাও দুজনের মধ্যে বিদ্যমান। চরম অসহায়তাই আজকে তাদের মধ্যে সমকামিতার বার্তা বহন করেছে। আসলে তারা জীবনকে উপভোগ করে যেকোন ভাবে বাঁচতে চেয়েছে। আজ শোভনাকে দেখে বহুকালের পরিচিতা বলে মনে হয়েছে এখানে তারও জানতে মন চায় শোভনার জীবনশৈলী সম্পর্কে। লেখকের কথায়-

> "মল্লিকা, আজ কেমন হয় যে সে শোভনার জীবন জানার প্রয়োজন বোধ করে। এখন শোভনা দরজায়, দেখা যায়, তার হাতদুটি পিছনেই, আবদ্ধ সম্ভবত। গায় তার ব্লাউজ নেই-শাড়ীটা হাওয়া হাওয়া,"[৯]

এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় পরিবেশ মূহুর্তের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন গল্পটিতে। ফুলের গন্ধ, আকাশ-নক্ষত্র, ফুলের উপর চাঁদের আলো সবকিছু মিলেমিশে এক যুবতী নারীর সম্মুখে নিজেকে যেন উজাড় করে ধরেছে, 'এখন মল্লিকা এ ফুলের মায়ায় থ, বেবাক্।'[১০]ধীরে ধীরে সে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে শোভনার চোখে। পরক্ষনেই দুজনের মনের মধ্যে এক অজানা ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হয়েছে। মনের মধ্যে ভিড় করেছে হাজার প্রশ্ন। এখানে লেখক যেভাবে ঘটনা প্রবাহ উল্লেখ করেছেন তাতে তাঁর সৃষ্টিশীলতা ও নান্দনিকতা যে কতটা গভীর এবং দৃঢ় ছিল তা বোঝা যায়। লিখেছেন-

> "মল্লিকা, শোভনা তার হাত দুটো ধরে টেনে আপনার কাছে আনল, কাঁচের চুড়ি ভেঙে টুকরো, ভাঙার শব্দ এতই অল্প যে লোক জড় করলে না অথচ বিঞ্জরা বলবেন প্রয়োজন ছিল। শোভনা আপনার মধ্যে মল্লিকাকে এনেছে, সোহাগ করে মালা পরিয়ে দিয়েছে, সে মালা তার কণ্ঠে বিলম্বিত, চুম্বনে চুম্বনে চুম্বনে শোক ভুলিয়ে দিয়েছে।"[১১]

এ থেকে আমরা অনুমান করতেই পারি এরা তো কেউই পাশ্চাত্য ভাবধারায় বেড়ে ওঠেনি। তবু ও তাদের আচরণ কেন এমন হল। আর ঠিক এইখানেই কমলকুমারের গল্পের নতুনত্ব। সাধারণ পাঠক এ গল্প পড়ে চমকে তো উঠবেনই। আরও অবাক হতে হয় লেখক যখন জানান-

> "এবার শোভনা খাদের গলায়, 'কই তুমি তো আমায় খেলে না? তুমি আমায় ভালবাসো না?'"[১২]

উত্তরে মল্লিকা ভালোবাসার কথা জানিয়েছে এবং পরস্পরের মধ্যে 'স্বামী' ও 'বউ' হিসেবে উপস্থিত করাতে যেন কোন বিস্ময় নেই। আসলে গল্পটিতে মল্লিকা-শোভনার

জীবনের ভালো লাগা না লাগা অন্যের অপর যে নির্ভর করে না তাই পরিস্ফুট। সমাজের দেখানো পথেই যে সবাই সবসময় চলবে এবং বাধ্য থাকবে তা হতে পারে না। লেখক এখানে ছোটোগল্পের সাধারণ এক মুখীনতার নীতিকে সম্পুর্ণ বিসর্জন দিয়ে আঁকাবাঁকা মন্থর গতিতে আর্থ-সামাজিক সংকটের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত জীবনকে সংকট কাল থেকে মুক্তির দিশা দেখিয়েছেন। মল্লিকার মধ্যে সমস্ত অতীত মুছে গিয়ে নতুন ভাবে সবকিছু শুরু করার বাসনা জাগ্রত হয়েছে। বাস্তব সমাজ –সংসারের সাধ সে পায়নি বটে তবে দুজনে পারস্পরিক চুম্বনের মধ্য দিয়ে তাদের অপুর্ণ বাসনা চরিতার্থ করেছে। তবে গল্পটিতে কোনো বিকৃত যৌনাচার বা সমকামিতার পরিচয় সে অর্থে পাওয়া যায়নি। এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যা কিছু ঘটেছে তা দুই ব্যর্থ নারীর জীবনকে মানবীয় উপলব্ধির মধ্য দিয়ে উপভোগ করেছে। তাই মল্লিকার মুখে 'বউ' শব্দটা শুনে শোভনা আবার চুম্বন করেছে এবং তার মুখ নিঃসৃত লালা মল্লিকার গালে লেগেছে।

এ ধরনের কাহিনী বিন্যাস ও বিষয়বস্তু যে বাংলা সাহিত্যে অল্পই আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কমলকুমার তাঁর ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের স্বাক্ষর এখানে সুন্দর ভাবে রেখেছেন বলতেই হয়। সাহিত্যের বিপরীত স্রোতে হাঁটার যে দুঃসাহস দেখিয়েছেন তা স্পষ্ট। শুধু এই গল্পটিতে নয় তিনি তাঁর বহু গল্পে মানব শরীরের অবতারণার সাথে সাথে নিজস্ব শৈল্পিক স্বাতন্ত্রতায় সফল হয়েছেন যা বাংলা কথাসাহিত্যে এক স্বতন্ত্র পথের দিশা দেখিয়েছে বলা যায়। সবশেষে বিশিষ্ট সমালোচক হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের মতামত উল্লেখ করে বলা যায়-

> "...মল্লিকা ক্রমাগত লড়াই করতে করতে জীবনের 'তুফান'কে উপভোগ করতে পারেনি। গল্পের শুরুতেই তার আয়না নিয়ে সাজসজ্জার যে বর্ণনা দেন লেখক, সে তার ব্যর্থ সাজসজ্জা, ব্যর্থ অভিসারের প্রস্তুতি সেটুকু শুরুতেই জানিয়ে দেন। গল্পের সবশেষে দেখা যায়, সমস্ত দিকে তার সাজ সজ্জাকে, তার স্বপ্ন কল্পনাকে ব্যর্থ দেখে তারই মতো আর এক ব্যর্থ নারী শোভনার সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলায়, স্বামী-স্ত্রীর অভিনয়ে সে জীবনের স্বাদ নেয়।"[১৩]

তথ্যসূত্র

১) 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়', সম্পাদিত, 'গল্পসমগ্র : কমলকুমার মজুমদার', প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯০, একাদশ মুদ্রণ মার্চ ২০১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃঃ ৫৭

২) তদেব, পৃঃ ৫৯

৩) বন্দ্যোপাধ্যায় রাঘব, ‘কমলকুমার, কলকাতা পিছুটানের ইতিহাস’, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৫, তৃতীয় মুদ্রণ দিসেম্বর ২০১৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃঃ১৯২

৪) ‘সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়’, সম্পাদিত, ‘গল্পসমগ্র : কমলকুমার মজুমদার’, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯০, একাদশ মুদ্রণ মার্চ ২০১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃঃ ৫৯

৫) তদেব

৬) তদেব, পৃঃ ৬৪

৭) চঞ্চল কুমার ঘোষ, ‘কমলকুমারের গল্প : জীবনজ্যোতির উদ্ভাস’, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১৬, সুচয়নী পাবলিশার্স, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, পৃঃ ১১৭

৮) ‘সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়’, সম্পাদিত, ‘গল্পসমগ্র : কমলকুমার মজুমদার’, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯০, একাদশ মুদ্রণ মার্চ ২০১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃঃ ৬৪

৯) তদেব, পৃঃ ৬৫

১০) তদেব

১১) তদেব

১২) তদেব, পৃঃ ৬৬

১৩) হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, ‘কমলকুমার মজুমদার : জীবন ও সাহিত্য’, প্রথম সংস্করন ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১ জানুয়ারি,২০২৩, লিবার ফিয়ারি, দেবনাথ হাউস, কবি সুকান্ত রোড, নবপল্লী, বারাসাত, কলকাতা-৭০০১২৬, পৃঃ ১৩৬

ঊনবিংশ শতকে বাংলার বাবু ভদ্র সমাজ : একটি পর্যালোচনা

স্বপন দোলই
গবেষক, সেন্টার ফর আদিবাসী স্টাডিস এন্ড মিউজিয়াম,
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ঔপনিবেশিক শাসনের সংস্পর্শে আসবার পর থেকেই বাঙলার সমাজের একটা রূপান্তর ঘটছিল। এটা বিশেষ করে ঘটে, ইংরেজরা যখন কলকাতায় তাদের কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে, এবং এদেশীয় লোকেরা তাদের সংস্পর্শে আসে। তাদের সংস্পর্শে এসে কলকাতায় যে সকল বড়লোক প্রসূত হল, তাদের প্রভাবে কলকাতায় এক নতুন সমাজ গড়ে উঠল। এ সমাজের চেহারা গ্রামীণ সমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। সেজন্য গ্রামের লোকের কাছে এ সমাজের নাম ছিল 'বাবু সমাজ'। বাবু সমাজের আচারব্যবহার, চিত্তবৃত্তি, বাককৌশল, বেশভূষা, পোশাক-আশাক ও জীবনযাত্রা প্রণালী চমক লাগিয়েছিল গ্রামের লোকের চোখের সামনে। ধনপ্রাচুর্যের অভিমান ও অহঙ্কারের ওপরই এ সমাজের ওপরতলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত এই শ্রেণী পশ্চিমের উদারনৈতিক, মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী নবান ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এই শ্রেণী দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে করছে এক বিশেষ ভাব্যধারা বা আদর্শ গড়ে তুলতে সক্ষম হয় এবং স্বাভাবিকভাবে গোঁড়া ও সনাতনপন্থীদের আনার কাছে এই শ্রেণী উপস্থিত হয় এক চ্যালেঞ্জ হিসাবে।

শব্দসূচক: ঊনবিংশ শতক, কলকাতা, উপনিবেশিক শাসন, বাবুসমাজ, ভদ্রসমাজ।

ভারতের ইতিহাস ঊনবিংশ শতক চিন্তা চেতনা ও সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি আলাদা মাত্রা অর্জন করেছিল। বাংলাও এর ব্যতিক্রম নয়, বরং বাংলা থেকেই প্রথাগত ধ্যান ধারণার পরিবর্তে ভারতে আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল বলা চলে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলায় প্রথম আধুনিক বুদ্ধিজীবী সমাজের উদ্ভব হয়। এক কথায় বলা যায় যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য উৎপাদন ব্যবস্থা এদেশে যে নতুন জীবন যাপন প্রণালীর সৃষ্টি করেছিল, বহুকাল ধরে বাঙালী হিন্দুসমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা সেটার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়েছিল। ঊনিশ শতকের বাঙালী হিন্দুর সমাজ জীবনে ওইভাবেই এক নীরব বিপ্লব ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়েছিল। প্রাথমিক অবস্থায় প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও শিক্ষার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং প্রথমদিকের প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত। ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরে পাশ্চাত্যের শিক্ষা সংস্কৃতি

ও জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তার বাংলার শিক্ষিত জনমানসে নিয়ে এসেছিল সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন। পাশ্চাত্য শিক্ষার ধারা যে আর্থসামাজিক শক্তির বিকাশ ঘটিয়েছিল তাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র বাংলায় সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

ভদ্রলোক গড়ে ওঠার দুটো বৃহত্তর কারণই ছিল ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গঙ্গা অববাহিকায় বাণিজ্য ও পশ্চিমা ধারার শিক্ষার সাহচর্যে (ঔপনিবেশিক শাসক এবং মিশনারিদের হাত ধরে) অনেক বাণিজ্য সংস্থার ব্যাপক ভাগ্য ফেরা এবং উত্থান। কলকাতায় ভূসম্পত্তির দামের তীব্র বৃদ্ধির ফলে এই অঞ্চলে কিছু সামান্য জমিদার রাতারাতি সম্পদশালী হয়ে ওঠেন। প্রথম শনাক্তযোগ্য ভদ্রলোকের প্রতীক হলেন নিঃসন্দেহে রামমোহন রায়, যিনি বাংলায় সুলতানি যুগের পারস্যীয় আভিজাত্য এবং নতুন, পাশ্চাত্য-শিক্ষিত, নব্য ধনী সমৃদ্ধশ্রেণীর শ্রেণির মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়েছিলেন।

বাংলার নবজাগরণে প্রধানত অংশ নিয়েছিল ভদ্রলোকেরা এবং তাদের দ্বারাই এটা পরিচালিত হয়েছিল। এছাড়াও, ব্রাহ্মসমাজ এবং অন্যান্য বিভিন্ন সমাজের উদ্ভবও ('সমাজ' এবং 'সম্প্রদায়' এই দুয়ের মাঝখানে একটা বিভাগ) ছিল এক ভদ্রলোক ঘটিত ব্যাপার। ভদ্রলোক হওয়াটা ছিল কিছু পশ্চিমি এবং উত্তর ইউরোপীয় মূল্যবোধকে সাগ্রহে গ্রহণ করা (যদিও প্রত্যেক বিষয় সব সময় একই থাকেনা); সামান্যতম শিক্ষা থাকতে হবে এবং আনুকূল্য পাওয়ার হকদার (এবং ফলস্বরূপ বিরুদ্ধে অভিযোগ) হওয়ার বোধ অথবা ঔপনিবেশিক সরকারের পক্ষ থেকে চাকরি পাওয়া। যখন ভদ্রলোকরা পশ্চিম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন (তাদের নৈতিকতা, পোশাক এবং খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির দিক থেকে), তারাও ছিলেন সেই জনতা যাঁরা পশ্চিমের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন, এবং ভদ্রলোক লেখক দ্বারা সবচেয়ে কঠোর সমালোচনা করার পাশাপাশি পশ্চিমিকরণের বিরুদ্ধে খুব প্রবল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বাবু শব্দের অর্থ একজন ব্যক্তির পদমর্যাদা এবং সম্মান। এটা অত্যন্ত সাধারণভাবে এক ভদ্রজনকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এটা এমন কোনো এক ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যিনি সরাসরি সামাজিক বৃত্তে তার কর্তৃত্বের অবস্থান উপভোগ করেন। ভারতের একজন জমিদার এবং উচ্চতর সরকারি কর্মী সদস্যকে বাবু হিসেবে উল্লেখ করা হোত। আগেকার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, মূলত বাংলা ও বিহারে ভূস্বামীদের মধ্যে একজন বাবু ছিলেন সাধারণভাবে ঠাকুর বা মির্জার সমপর্যায়ভুক্ত ও অত্যন্ত সম্পদশালী জমিদার এবং একজন রাজার নিচে তার অবস্থান ছিল। বাবু শব্দটা ঐতিহাসিকভাবে শাসক শ্রেণি সমেত ভারতীয় সমাজের উচ্চ বর্গে থাকা ব্যক্তিদের বোঝাতে ব্যবহৃত হোত।

আঠারো শতকের মধ্যভাগ অবধি কলকাতা ছিল বানিয়া, দেওয়ান, ব্যবসায়ীদের শহর। কোম্পানি এবং ভারতীয় সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে এরা ব্যবসা করত। সামাজিক দিক থেকে কলকাতা শহরে যে পরিবর্তন হয়েছিল তার পিছনে শহরের বাঙালি হিন্দুদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আঠারো শতকে তাঁতী এবং কাপড় ব্যবসায়ী

শেঠ এবং বসাকরা কলকাতার সমাজে গুরুত্ব পেলেও ১৭৫৩ সালের পর থেকে তাদের প্রাধান্য কমে যেতে থাকে। উনিশ শতক থেকে কলকাতার শহুরে সমাজে পরিবর্তন আসতে থাকে। নানা পারস্পরিক জটিল ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কলকাতার নগরায়ণ ঘটেছিল। কর্ণওয়ালিসের নীতি এবং এজেন্সি হাউসের উত্থানের ফলে পূর্বেকার বাণিয়া এবং দেওয়ানদের প্রভাব কমতে থাকে। তবে ইউরোপীয়দের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন চলতে থাকে যেমন ১৭৯৭ এবং ১৮১৫ সালের মধ্যে অর্থ লেনদেনের ব্যবসায় রামমোহন প্রচুর সম্পত্তি করেছিলেন এবং জমিদারি ক্রয় করেছিলেন।

ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত হয়েও রাধাকান্ত দেব এবং রামকমল সেন কলকাতার শহুরে পরিবেশে যথেষ্ট পরিবর্তন এনেছিলেন। শুধুমাত্র অন্ধ গোঁড়ামির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে তারা ভারতীয় সনাতনী ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে একটি ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করেছিলেন। রাধাকান্তদেব কলকাতার হিন্দু সমাজের নেতা ছিলেন। ইউরোপীয় শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। স্ত্রী শিক্ষার প্রচারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি, হর্টিকালচারাল সোসাইটি, এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। রামমোহনের সহযোগী প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সঙ্গে তিনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে জমিদার সভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং জমিদারি স্বার্থ রক্ষার তাগিদে তিনি বৃটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু রক্ষণশীল সংগঠনের প্রতিভূ হিসাবে চিহ্নিত হলেও তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভা করেন যার ফলে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়েছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে বাঙালী সমাজে বাণিজ্য এবং পুঁজি যে সুযোগ সৃষ্টি করেছিল তার ফলে সামাজিক পরিবর্তন আসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। এই নতুন গোষ্ঠীর সদস্যরা প্রায় সকলেই ছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং কোম্পানির নানা কাজকর্মের সঙ্গে তাঁরা জড়িয়ে পড়েছিলেন। ঐতিহাসিকেরা এঁদের “ভদ্রলোক” বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থায় চাকুরীজীবী অথবা আইনব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রসময় দত্ত, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ। উনিশ শতকের বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার প্রভাবে সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে পরিবর্তন হয়, এঁরা অনেকেই তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

উনিশ শতকের কলকাতায় দেশীয় মানুষদের তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে - ১। অভিজাত ভদ্রলোক, বড় জমিদার ব্যবসায়ী এবং বৃটিশ প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত উচ্চপদের অধিকারী এবং এঁদের প্রচুর জমি ও সম্পদ ছিল। ইউরোপীয়দের সঙ্গে এঁরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন। ২। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ভদ্রলোক যারা ছিলেন প্রধানত বৃত্তিজীবী এবং অর্থ ও সাংস্কৃতিক চেতনার দিক থেকে এঁরা অভিজাতদের পরেই ছিলেন। ৩। সমাজের প্রান্তে ছিলেন বন্দর শ্রমিক, মজুর, ভৃত্য, পালকি বাহক ইত্যাদি নিম্নবর্গের মানুষ যারা উচ্চবর্গীয়দের নানাভাবে পরিষেবা দিত।

কলকাতায় নবগঠিত অভিজাত সম্প্রদায় নিজেদের একটি বিশিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে দেখত। তাদের স্বতন্ত্র সামাজিক অবস্থানকে তারা সর্বদাই গুরুত্ব দিত। **১৮২৩** সালের **১৬ই** ফেব্রুয়ারি হিন্দু কলেজে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য যারা সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা নিজেদের সমাজকে গৌড়দেশীয় ভদ্রলোকের সভা বলে চিহ্নিত করেছিলেন। উনিশ শতকে অবশ্য বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজকে ভদ্রলোক ও অভদ্রলোক বা ইতরলোক এই দুটি ভাগে ভাগ করত। ভদ্রলোকের মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা অভিজাতরা ছিল।

"ভদ্রলোক" আখ্যা বংশানুক্রমিক না হওয়ার ফলে সহজেই অর্জন করা যেত। তবে সাধারণত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ অথাৎ উচ্চবর্ণের মানুষদের ভদ্রলোক বলে চিহ্নিত করা হত। তবে অন্য বর্ণের মানুষও ধনসম্পদ ও শিক্ষা অর্জন করে 'ভদ্রলোক' সম্প্রদায়ভুক্ত হতে পারতেন। যেমন **১৮২৩** সালে গৌড়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে বীরেশ্বর মল্লিক ও কাশীনাথ মল্লিক নামে দুজন সুবর্ণবণিক ছিলেন। এছাড়াও এই সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি এবং তন্তুবায় পরিবারের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও ভদ্রলোক সম্প্রদায় তাদের হিন্দু উচ্চবর্ণীয় রীতিনীতিকে বজায় রেখেছিল। কিন্তু জীবনযাত্রায় তারা ইংরেজ কর্মচারী ও মুঘল অভিজাতদের অনুকরণ করত। সুবর্ণবণিক বা তন্তুবায় শ্রেণীর মানুষ উচ্চবর্ণ এবং উচ্চবিত্তের জীবনধারাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করত। বিবাহ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু উচ্চবর্ণীয় অথচ অশিক্ষিত দরিদ্র কিন্তু ভদ্রলোক শ্রেণীভুক্ত হতে পারতনা।

'বাবু' কারা? বাবুরা ছিলেন এক অদ্ভুত জাত। "এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, পায়রা উড়াইয়া, বুলবুলের লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণা ইত্যাদি বাজাইয়া, কবি হাফ-আখরাই, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত এবং খড়দহের মেলা, মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময় কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকোযোগে আমোদ করিয়া আসিত।" তাঁদের বাপ-ঠাকুরদারা নানারূপ অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জন করে কলকাতার অভিজাত পরিবারসমূহের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের বংশধররাই 'বাবু' হয়ে সে টাকার অপব্যয় করতেন। এমনকি 'পুতুলের বিয়ে'তে, 'বিড়ালের বিয়ে'তে তাঁরা হাজার হাজার টাকা খরচ করতেন। আর মদ ও মেয়ে মানুষের পেছনে টাকা ব্যয় করেই তাঁরা নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন।

একালের কলকাতায় 'বুলবুলির লড়াই' দেখা যায় না। অথচ পুরনো কলকাতার বাবুদের আমোদের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল এই 'বুলবুলির লড়াই'। প্রকৃতিতে 'বুলবুলি' আছে তিন জাতের - 'লাল বুলবুলি', 'শা বুলবুলি' আর 'সিপাই বুলবুলি'। সেগুলোর মধ্যে লড়াকু হচ্ছে 'সিপাই বুলবুলি'। 'সিপাই বুলবুলি'র গায়ের রঙ বিচিত্র। এদের মাথায় আছে ঝুঁটি। ঝুঁটির রঙ কুচকুচে কালো। এদের ডানার রঙ খয়েরি। কিন্তু পেটের রঙ সাদা। এদের ঝুঁটি বাদে মাথার বাকি অংশ লাল। বুলবুলির লড়াইয়ে

কেবলমাত্র এই 'সিপাই বুলবুলি'রাই অংশ নিত। বুলবুলির লড়াই ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল, সঠিকভাবে বলা যায় না। সম্ভবতঃ মোঘল আমলে এর শুরু হয়েছিল। নবাবরা তাতে মদত দিয়ে থাকতে পারেন। 'ছাতুবাবুর মাঠ'টি ছিল বুলবুলির প্রধান রণাঙ্গন। সেই লড়াইয়ের প্রধান উদ্যোক্তা আর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মাঠের মালিক নিজেই। 'ছাতুবাবু' আজও তাঁর ডাকনামেই প্রসিদ্ধ। তাঁর ভালো নাম ছিল 'আশুতোষ দে'। তাঁর বাবার নাম ছিল 'রামদুলাল দে সরকার'। 'ছাতুবাবু'রা ছিলেন দু-ভাই পাঁচ-বোন। 'ছাতুবাবু' ছিলেন বড়ো। তাঁর ছোট ভাইয়ের নাম ছিল 'প্রমথনাথ'। 'প্রমথনাথ'ও তাঁর ডাকনামে আজও বিখ্যাত। তাঁর ডাকনাম 'লাটুবাবু'। 'ছাতুবাবু' ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয়, সেতারী। আর 'লাটুবাবু' ছিলেন ব্যায়ামবীর। অর্থব্যয়ে তাঁরা ছিলেন মুক্তহস্ত। বাবার শ্রাদ্ধে তাঁরা তখনকার বাজারে খরচ করেছিলেন পাঁচ লাখ টাকা। 'ছাতুবাবুর মাঠ' ছিল এখনকার 'মিনার্ভা থিয়েটারের' জায়গায়। সেখানে শীতকালে জমে উঠতো 'বুলবুলির লড়াই'। সেটা বেলা এগারোটায় শুরু হয়ে শেষ হতো বিকেল চারটেয়। 'সলিসী'র ওপর থাকতো খেলা পরিচালনার ভার। লড়াইয়ের পাখিদের প্রশিক্ষণ দিতেন 'খলিফারা'। সমঝদার দর্শকদের মাঠের ভাষায় বলা হতো 'সোয়াকীন'। ১৮৩৪ সালে 'ছাতুবাবু'র বুলবুলির সঙ্গে লড়াই হয়েছিল 'হরনাথ মল্লিকের' বুলবুলির। 'সলিসী' ছিলেন 'বৈদ্যনাথ রায়'। লড়াই বেশ জমে উঠেছিল। 'হরনাথের' পাখিরা শুরু করেছিল ভালো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েছিল দীর্ঘ সময় লড়ার পরে। 'নরসিংহ রায়' আর 'ছাতুবাবু'র বুলবুলিদের লড়াই ছিল সবচেয়ে চমকদার। প্রায় প্রতিবছর দুজনেই মাঠে আসতেন প্রায় দেড়শো করে শিক্ষিত বুলবুলি নিয়ে। ১৮৫৩ সালে 'দয়ালচাঁদ মিত্র'র বুলবুলিদের সঙ্গে লড়াই হয়েছিল 'রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের' বুলবুলিদের। 'দয়ালচাঁদের' বুলবুলিরা জয়লাভ করেছিল। ৩৭ জোড়া পাখির লড়াইয়ের মধ্যে 'দয়ালচাঁদের' ২৭ জোড়া পাখি জিতেছিল। 'সলিসী' ছিলেন 'হরিনারায়ণ গোস্বামী'। বেলা দশটায় লড়াই শুরু হয়েছিল। শেষ হয়েছিল বেলা আড়াইটেয়। কবি 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত'র কবিতায় লড়াইটি এখনো জীবন্ত হয়ে আছে। আজ 'ছাতুবাবুর মাঠ'ও নেই, 'বুলবুলির লড়াই'ও নেই! তবে সুখবর এই, বুলবুলিরা আজও আছে! কলকাতাতেই! কেউ বা আছে বাবুর বাড়ির খাঁচায়, আবার কেউ আছে লেক-ময়দানের গাছে!

ধর্মীয় সামাজিক উৎসবে আনন্দ প্রকাশের জন্য বাজির ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে। অতীতে 'কালীপূজার দিন' এর ব্যবহার তুঙ্গে উঠত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এর ব্যবহার খুবই বেড়ে গিয়েছিল। তার কারণ ইংরেজরা আমোদ-প্রমোদের জন্য যখন তখন 'আতসবাজি' ব্যবহার করতেন। বাবুরা 'কালীপূজা'র সময় আতসবাজি নিয়ে হই-হুল্লোড় করবার জন্য 'বারাঙ্গনাদের গৃহে' সমবেত হতেন। সারা বছরে যেসব মেয়ে মানুষদের বাবু জুটতো না, 'কালীপূজার দিন' তাঁদের ঘরেও লোক আসতো। তখন তাঁরা দুটো ভালোমন্দ জিনিস পেটভরে খেতে পেতেন। মাংস রান্না হতো, ভালো

ভালো মদ আসতো - ভালো জামাকাপড় কেনা হত। ‘স্নানযাত্রা’, ‘রাসযাত্রা’, ‘কালীপূজা’, ‘কার্তিক পূজা’ - এই সময়গুলোই ছিল তাঁদের মরসুম।

ঘুড়ি ওড়ানো ছিল কলকাতার বাবুদের বিনোদনের একটি প্রধান অঙ্গ। এজন্যে তাঁরা বেহিসেবীর মতন অর্থ, শ্রম আর সময় খরচ করতেন। একেক বাবুর একেক রঙের একেক সাইজের ঘুড়ির দিকে ঝোঁক ছিল। কেউ পছন্দ করতেন কালো-সাদা, কেউ লাল-নীল, আবার কেউ বা শুধু কালো বা শুধু হলুদ পছন্দ করতেন। লাটাই আর সুতোর ব্যাপারেও ছিল তাঁদের খুঁতখুঁতুনি। সুতো যদি মনের মতন তৈরি না হতো, তাহলে তাঁদের মাথা খারাপ হয়ে যেতো! সাধারণতঃ বর্ষাকালেই বাবুরা ঘুড়ি ওড়াতেন বেশি। আর ‘বিশ্বকর্মা পুজো’র দিন আকাশ ঢাকা পড়ে যেতো ঘুড়িতে ঘুড়িতে। সেকালে ঘুড়ি ওড়ানো জমে উঠতো কাটাকাটির দরুন। কে কার কত ঘুড়ি কাটতে পারে, সেটা নিয়ে চলতো পাল্লাপাল্লি। তা থেকে সৃষ্টি হতো মনকষাকষি, ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি। কেন না,ঘুড়ির সঙ্গে তাঁরা জড়িয়ে ফেলতেন নিজেদের মানসম্মান। কাটা ঘুড়ি কুড়িয়ে বেড়াতো ছেলেছোকরার দল। পুরনো কলকাতায় যেসব ‘পেশাদার নর্তকী’ - ‘গায়িকা বাঈজি’র জীবনযাপন করতেন, চলতি কথায় তাঁদের বলা হয় ‘বিবি’। কলকাতার বাবুদের কাছে পত্নীর চেয়ে ‘উপপত্নী’ ছিল বেশি আদরের। ‘বাঈজিরা’ই ছিলেন ‘বাবুদের উপপত্নী’। সেকালের কয়েকজন নামকরা ‘বাঈজি’র নাম হল - ‘আনার বিবি’, ‘বুনু বিবি’, ‘নিকি বিবি’, ‘পিয়ারী বিবি’, ‘কমললতা’, ‘রোশনী বিবি’, ‘হীরা বুলবুল’, ‘এম্‌মা বিবি’, ‘বেগমজান’, ‘হিঙ্গুল বিবি’, ‘সুপনজান’, ‘নান্নিজান’, ‘আশরুম বিবি’, ‘ফইজ বক্স’, ‘সৌদামিনী’ এবং ‘মাদাম চিয়াঙ’। নারী যে পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষের ভোগ্যপণ্য, পুরনো কলকাতার বাবুরা তা নির্লজ্জভাবে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন নিজেদের আচরণ দিয়ে। একদিকে নিজেদের বিবাহিতা স্ত্রীদের তাঁরা অন্দরে ‘সতী’ করে রাখতে চাইতেন, ‘সীতা-সাবিত্রী-বেহুলা’র মতন পতিপ্রাণা করে, অন্যদিকে তাঁরা বাইরে নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করতেন নিজেদেরই তৈরি বাজারী ‘অসতী’দের নিয়ে! অন্দরে যদি পান থেকে একটু চুন খসতো, তাহলে আর রক্ষে থাকতো না! অথচ তাঁরা নিজেরা নিজেদের লাম্পট্যের জন্যে কারোর কাছে জবাবদিহি করতেন না! ‘আনার বিবি’কে নিয়ে কলকাতার বাবুরা কী বেলেল্লাপনাই না করেছিলেন। তিনি ছিলেন ‘চূড়ামণি দত্ত’র ছেলে ‘কালীপ্রসাদ দত্ত’র ‘রক্ষিতা’। নিজের ঘরসংসার ছেড়ে এসে সেই ‘রক্ষিতা বাঈজি’কে নিয়ে পড়ে থাকতেন ‘কালীপ্রসাদ’। সেই ‘বিবি’র ওপর অন্য বাবুদেরও লোভ ছিল। কিন্তু ‘কালীপ্রসাদ’ ‘বিবি’কে সবসময় ডানা মেলে ঢেকে রাখায় অন্যেরা ঠোকর মারার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। ফলে তাঁদের রাগ বাড়ছিল ‘কালীপ্রসাদের’ ওপর। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে তাঁরা জোটবদ্ধ হচ্ছিলেন। ‘কালীপ্রসাদের বাবা’ ‘চূড়ামণি’ মারা যেতেই তাঁরা প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন। ‘কালীপ্রসাদ’ যেহেতু ‘হাপ হিন্দু-হাপ মুসলমানের’ জীবনযাপন করতেন, ‘মুসলমান

উপপত্নী'কে নিয়ে, সেহেতু তাঁর প্রতিপক্ষরা রব তুলেছিলেন, ''কালীপ্রসাদের জাত গিয়েছে। আমাদের দলের কোনো পুরোহিত ওকে শ্রাদ্ধ পড়াবে না ।

নৈতিক শৈথিল্য ও স্বৈরাচার ছিল এই বাবু সমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নিজেদের অন্দর মহলের মেয়েদের তারা রাখত অসূর্যস্পশ্যা করে, আর নিজের। রাত্রি কাটাতো বারাঙ্গনাদের বাড়ীতে। অনেকের আবার যবনী রক্ষিতাও থাকত। রাত্রিকালে বাড়ীতে না থেকে বেশ্যালয়ে থাকাটাই সে যুগের আভিজাত্যের লক্ষণ ছিল। হিন্দুমতে বাবার শ্রাদ্ধ করার অধিকার ওর নেই।'' মজার ব্যাপার হল, সেই প্রতিপক্ষ দলে ছিলেন 'শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেবের' ছেলেরাও। অথচ 'নবকৃষ্ণের ছেলে রাজকৃষ্ণ'ও এক 'মুসলমান বাঈজি'কে 'উপপত্নী' করে রেখেছিলেন। তিনিও নিজের জীবনযাপনে ছিলেন 'আধা হিন্দু-আধা মুসলমান'! কাজেই যে-অপরাধে 'কালীপ্রসাদ' অপরাধী ঘোষিত হয়েছিলেন, সেই অপরাধে 'রাজকৃষ্ণ' রেহাই পান কী করে? তাই 'কালীপ্রসাদের' দলেও লোক জুটে গিয়েছিল। 'বড়িশা'র জমিদার 'সন্তোষ রায়' নিজের জমিদারি থেকে পুরোহিত এনে 'কালীপ্রসাদের' বাবার শ্রাদ্ধ করিয়েছিলেন। 'কালীপ্রসাদ' তাঁর সাহায্যে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে পরম খুশি হয়েছিলেন। 'সন্তোষ রায়'কে এবং তাঁর আনা পুরোহিতকে তিনি দক্ষিণা বাবদ দান করেছিলেন নগদ পঁচিশ হাজার টাকা। 'সন্তোষ রায়' সেই টাকায় 'কালীঘাটের' কালীর বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ-গল্প বর্তমানে অনেকেরই জানা, তবুও পুনরাবৃত্তি করার লোভ সামলানো গেল না। 'নিকি বিবি'কে নিয়েও কলকাতার বাবুদের মধ্যে চলতো দর কষাকষি। 'দুর্গাপুজো' উপলক্ষে তাঁর দর বাড়তো নীলামের মতন হু হু করে। তাঁকে যাঁরা নাচাতে পারতেন, তাঁরা নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করতেন। ১৮১৯ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখের একটি দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল - ''কলকাতায় ছিল নিকি নামে একটি নর্তকী মেয়ে। তার নাচগানে বহুৎ খুশি হয়ে একজন ভাগ্যবান ভদ্রলোক তাঁকে মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে রেখে দিয়েছেন নিজের কাছে।'' ১৮১৯ সালে একজন বাঈজির মাসিক বেতন এক হাজার টাকা! নিজেরাই হিসেব করে নিন এখনকার টাকার মূল্যে। 'নবকৃষ্ণ দেবের দত্তকপুত্র' 'গোপীমোহন দেব' তো নাচের আসরে চমক সৃষ্টি করেছিলেন সুদূর 'ব্রহ্মদেশ' থেকে পরীর মতন একঝাঁক সুন্দরী নর্তকী এনে। তাঁদের রানী ছিলেন 'মাদাম চিয়াঙ'। সেটা ছিল ১৮২৬ সালের ঘটনা।

বাবু সংস্কৃতি কলকাতার একটা বর্ণ ময় দিক, এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাবু কালচার শব্দটা সবাই শুনেছি, পড়েছি, দেখেছি। বাংলা নাটক, সিনেমা, যাত্রায় এবং সাহিত্যে এই সংস্কৃতি ধরা পড়েছে না রূপে বার বার। বাবু কালচারের সূচনা হয় আজ থেকে আড়াইশ বছর আগে, নবাবী আমলে। কিন্তু তার উৎপত্তি ও বিস্তার জানতে হলে আরো পিছিয়ে যেতে হবে, জানতে হবে তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা তার অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট। সাল 1756 মসনদে নবাব আলীবর্দীর নাতি সিরাজ উদ দৌলা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে বিরোধ বাধে তরুণ নবাবের। শেষে মীরজাফর এর

বিশ্বাস ঘাতকতা য় পলাশীর যুদ্ধে 1757সালে পরাজয় হয় নবাবের। পরবর্তীতে নবাব রা ছিলো কোম্পানির হাতের পুতুল আসল শাসন ক্ষমতা ছিলো ব্রিটিশ দের হাতেই। এই ক্ষমতা হস্তান্তর প্রভাব ফেলে ছিলো বাংলার সর্বত্র। ধীরে ধীরে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা হয়ে গেলো বাংলার রাজ ধানী। কলকাতা জৌলুস বাড়তে থাকলো দ্রুত গতি তে। অন্ধকার এ ডুবতে থাকলো মুর্শিদাবাদ।

নবাবী আমলে "বাবু" ছিলো একটি বিশেষ উপাধি, নবাবের অনুমতি ছাড়া বাবু শব্দ টা নামের আগে ব্যবহার করা যেতোনা। সাধারণত নবাবের অনুগত শিক্ষিত অভিজাত ধনী রা এই উপাধি লাভ করতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতায় এসে বুঝে ছিলো বাংলার এই বাবু সমাজ কে অনুগত করে রাখতে পারলে তাদের শাসন করতে সুবিধা হবে তাই ব্রিটিশ রা বাবু কালচার কে উৎসাহ দেয়। তাদের প্রভাব ও খমতা বৃদ্ধি করে। আরো নতুন নতুন উপাধি তৈরী হয় যেমন রাজা, রায়, রায় চৌধুরী, রায় বাহাদুর ইত্যাদি। ব্রিটিশ আমলে এক নতুন অভিজাত শ্রেণীর তৈরী হলো। শিক্ষা ও বংশ পরিচয় কে ছাপিয়ে গেলো অর্থ। কেউ বা ব্যবসা করে কেউ আবার রাজ কর্মচারী হয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে রাত রাতি হয়ে গেলো বাবু। কলকাতার বাবু কালচারের তখন স্বর্ণ যুগ বলা যায়। বাবুয়ানা ও সৌখিনতা প্রায় সমার্থক শব্দ। এর কারণ বাবু হওয়ার প্রধান শর্ত ছিলো ওই সৌখিনতা। শুধু অর্থ উপার্জন নয় অর্থ ব্যয়ের প্রতিযোগিতা এ নামতে হবে। তবেই বাবু উপাধি স্বার্থক হবে এই ছিলো মানসিকতা। ব্রিটিশ রা চেয়েছিল সম্পদ শালী এক চাটুকার এর দল তৈরী করতে। তাই হয়েছিল। দামি গাড়ি, লক্ষ টাকার বাইজি, বিশাল বিশাল বাড়ি, পায়রা ওড়ানো, রক্ষিতা কে নিয়ে গান বাজনা করে আর মদ খেয়ে রাতের পর রাত কাটানো ছিলো এই ধনী বাবু সমাজের প্রতিদিন এর জীবন।

কালী প্রসন্ন সিংহের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি সেকালের বাবুদের স্ত্রী রা কোনো রাতেই তাদের স্বামী দের মুখ দেখতো না। কারন বাবুদের প্রতিটা রাত কাটতো বাইজি বা রক্ষিতা র সাথে নাচ মহলে। বঙ্কিম চন্দ্র তার বাবু নামক রম্য রচনায় লিখে ছিলেন যিনি দূর্গা উৎসব এর উদ্দেশ্য দূর্গা পুজা করবেন, গৃহিণীর অনুরোধে লক্ষী পুজো করবেন, উপপত্নী র অনুরোধ এ স্বরূস্বতী পুজো করবেন এবং মাংস খাওয়ার লোভে পাঠা বলী দেবেন তিনি ই বাবু। শিক্ষা বিদ, ঐতিহাসিক , সাহিত্যিক শিবনাথ শাস্ত্রী ‘বাবু’ দের সম্পর্কে লিখেছেন,”বাবু মহাশয়েরা দিনে ঘুমাইয়া,ঘুড়ি উড়াইয়া,বুলবুলির লড়াই দেখিয়া,সেতার, এসরাজ,বীণা প্রভৃতি বাজাইয়া,কবি,ফুল আখড়াই,হাফ আখড়াই,পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রি কালে বারাঙ্গানাদিগের গৃহে গৃহে গীত বাদ্য ও আমোদ প্রমোদ করিয়া কাল কাটাইত এবং খড় দহের ও ঘোষপাড়ার মেলা এবং মাহেশর স্নান যাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গানা দিগ কে সঙ্গে লইয়া দলে দলে নৌকা যোগে আমোদ করিতে যাইতেন।” কলকাতার বিখ্যাত আট বাবু ছিলেন। নীলমনি হালদার, রামতানু দত্ত, গোকুলচন্দ্র মিত্র, রাজা রাজকৃষ্ণ, কালীপ্রসন্ন

সিংহের পূর্বপুরুষ ছাতু সিংহ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, রাজা সুখময় রায় এবং চোরাবাগান মিত্র বংশের এক বাবু। এরা ছিলেন প্রধান, তাছাড়া আরো অনেক বাবু গজিয়ে উঠেছিলো রাতারাতি। জোড়া সাঁকো ঠাকুর বাড়ির সদস্য রাও বাবুয়ানা তে খুব একটা পিছিয়ে ছিলোনা। দ্বারকা নাথ ঠাকুর তার বিলাসিতা ও সৌখিনতার জন্য বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন।

কিছু প্রতিভা সম্পন্ন,ব্যতিক্রমী চরিত্রের বাবুও ছিলো সে সময় যেমন আশুতোষ ও প্রমথনাথ। এঁরা যথাক্রমে সাতু (ছাতু) বাবু ও লাটু বাবু নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। আশুতোষ বাবু ছিলেন তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ সেতারিদের মধ্যে অন্যতম। লাটু বাবু যেমন ছিলেন দানশীল, তেমন ছিলেন বিলাসী। এই ছাতু বাবুর নামেই কিন্তু ছাতু বাবুর বাজার। বাবুদের বিলাসিতা বা সৌখিনতা কখনো কখনো হাস্য কর পর্যায় পৌছাতো। কেউ কুকুরের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচ করছে তো কেউ পোষা বেড়ালের বিয়েতে 10 টা গ্রামের লোক নিমন্ত্রণ করে খাওয়াচ্ছে। কেউ পায়রার পেছনে লক্ষ টাকা উড়িয়ে দিচ্ছে। সোনা যায় কিছু ধনী বাবু জুতোর ডগায় হিরে বসিয়ে রাখতেন। সোনা যায় রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র তার পোষা বাঁদরের বিয়েতে এক লক্ষের বেশি টাকা খরচ করে তাক লাগিয়ে দিয়ে ছিলেন। বানরের মাথায় ছিলো হিরে মুক্ত খচিত মুকুট। সঙ্গে বিলাস বহুল পালকি ও শোভাযাত্রা।

রাজা ইন্দ্র নারায়ণ রায় তার বিড়ালের বিয়েতে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন বলে সোনা যায়। নিমাই চাঁদ মল্লিক এর নাতি রাম রতন মল্লিক এর বিয়েতে চিৎ পুরের দুমাইল রাস্তা ভেজানো হয়েছিলো খাঁটি গোলাপ জল দিয়ে |ঘোড়া গাড়িতে বাবুরা হাজার হাজার টাকা উড়িয়ে দিতো। কত রকম বাহারের গাড়ি ছিলো সেকালে, ফিটন, বগি,বৃতস কাস, পালকি ও হতো মহা মূল্য বান, সৌখিন, জমকালো। পড়ে মোটর গাড়ি উঠলে বাবুরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিদেশ থেকে তা আনাতে শুরু করে। মদ ছাড়াও বাবুরা সাহেব দের থেকে আরেকটা জিনিস শিখেছি লেন তা হলো নাট্য চর্চা। আশুতোষ দেব বা ছাতু বাবু, শোভাবাজার রাজ বাড়ির বাবুরা এবং ঠাকুর বাড়ির বাবুরা নাটকে অর্থাৎ ব্যয় করলেন। এই ভাবে বাংলা থিয়েটারের ভিত্তি স্থাপন হলো। পড়ে গিরিশ ঘোষ এর হাত ধরে তা আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল। শুধু নাটক কেনো, বাংলা গান, যাত্রা এবং পরবর্তীতে চলচ্চিত্র বাবুদের অর্থ সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সম্ভব ছিলোনা। সেদিক দিয়ে বাংলা শিল্প ও সংস্কৃতি জগৎ বাবুদের কাছে অনেক টা ঋণী।

আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের গোড়ায় ঔপনিবেশিক সময়কালে এই বাবু শব্দটা ক্ষতিকরভাবে দেশীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের, বিশেষ করে আইনি বিচারালয় ও রাজস্ব সংস্থায় ব্যবহার করা হয়েছিল, যে সমস্ত জায়গায় অধিকাংশ সদস্যকে সম্মাননীয় পরিবার অথবা জমিদার বড়ি থেকে মুন্সেফ হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটা ব্যঙ্গাত্মক বই লিখলেন, নাম

'কলিকাতা কমলালয়'। সেই বইয়ে তিনি কলকাতার লোকের পয়সা উপায়ের নানা রকম পন্থার উল্লেখ করেছেন। কলকাতার আভিজাত্য অভিমানী লোকদের সম্বন্ধে তিনি লিখলেন- 'এরা বনিয়াদী বড় মানুষ নয়, ঠিকাদারী, জুয়াচুরি, পোদ্দারী, পরকীয়া রমণী সংঘটন ইত্যাদি' পন্থা অবলম্বন করে বড়লোক হয়েছেন। মুখ্যতঃ দেওয়ানী ও বেনিয়ান-গিরিই এদের পেশা ছিল। দেওয়ানী ছিল চাকরী বা গোলামী করা। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দেওয়ান ছিলেন বিশ্বস্ত কর্মচারী। মনিবের হয়ে তিনি তার ব্যবসা দেখতেন, জমিদারীর তদারকী করতেন, এবং ক্ষেত্রবিশেষে রাজকর্মের দায়িত্ব পালন করতেন।

ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে এঁরা আচারভ্রষ্ট হয়েছিলেন বটে, কিন্তু গোড়া থেকেই এরা এমন একটা কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, যাতে এঁদের ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে নিষ্ঠাবান সমাজের কেউ কিছু না বলতেপারে। এরা বড় বড় পণ্ডিতদের কলকাতায় এনে নিজেদের পুরু পোষকতায় তাদের দিয়ে ঢোল ও চতুষ্পাঠ স্থাপন করিয়োছিলেন। এই সকল অধ্যাপকদের বিধানের একটা নিদর্শন ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জুলাই তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এর স্তম্ভে ছাপা হয়েছিল। 'বাবু জিজ্ঞাসা করেন, ভট্টাচার্য মহাশয় সুরাপানে কি পাপ হয়। উত্তর: ইহাতে পাপ হয় যে বলে, তাহার পাপ হয়। ইহার প্রমাণ আপম ও তন্ত্রের দুইটা বচন অভ্যাস দিলেন, পাঠ করিলেন এবং কহিলেন মন্ত ব্যাতিরেকে উপাসনাই হয়না। বলরাম ঠাকুরও মস্তপান করিয়াছিলেন বাবু তুষ্ট হইয়া ভট্টাচার্যকে টোল করিয়া দিলেন। ‘নববাবুবিলাস’-এর চারটি খণ্ডে প্রমথনাথ যে উনিশ শতকীয় বাংলা তথা কলকাতার এক জ্যান্ত ছবি আঁকছেন, সরিয়ে দিচ্ছেন মুখ আর মুখোশের আড়াল, তা বুঝতে দেরি হয় না। তাঁর কলমে কলকাতার বাবু কালচার ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল আর প্রমথনাথের ছদ্মনাম ভেঙে জেগে উঠছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বছরদুয়েক আগে ১৮২৩ সালে ‘কলিকাতা কমলালয়’-এর ‘বিষয়ি ভদ্রলোকের ধারা’ শীর্ষক রচনায় যিনি প্রথম আলো ফেলেছিলেন বাবুদের ওপর। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ আর কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’-র কথা। বাবু সমাজ সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন- “তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাহীন হইয়া ভোগে সুখেই দিন কাটাত।

বাংলা গদ্যের প্রকাশ এবং যথার্থ বিকাশ ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল উনিশ শতকের শুরু থেকে। শ্রীরামপুর মিশনে গদ্যের আঁতুড়ঘরেই জন্ম হয়েছিল বাংলার প্রথম সাময়িকপত্র ‘দিগ্‌দর্শন’-এর। কলকাতা অবশ্য এর কিছু আগে সংবাদপত্র দেখেছিল। শ্বেতাঙ্গ সমাজে ছিল ইংরেজি সাময়িকের প্রচলন। স্পষ্টবক্তা ও প্রতিবাদী হিকি সাহেব শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষদের কেচ্ছা ও কোম্পানির অনাচারের কথা প্রচার করে কী ভয়ানক রোষানলে পড়েছিলেন, কলকাতা জানত তাও। বাবু-সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত অধ্যাপক গার্গী সরকারের কথায়, “এটা এখন আর

অনুমান নয়, নিশ্চিত যে, সমাচার দর্পণে 'বাবুর উপাখ্যান'-এর লেখক হিসেবে কথিত সেই 'প্রচ্ছন্নরূপে অজ্ঞাত লোকটি' আসলে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।" উনিশ শতকের নকশাগুলি লেখা ভঙ্গিসর্বস্ব বাবুদের নিয়ে। প্রাবন্ধিক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর 'বাংলা উপন্যাস : দ্বান্দ্বিক দর্পণ' বইয়ে লিখেছেন, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাবু আর ভদ্রলোক, এই দুটি শব্দের শ্রেণিগত তাৎপর্য এবং সামাজিক ভূমিকা স্পষ্ট হতে শুরু করল— 'বাবু একটা ভঙ্গি, ভদ্রলোক একটা সত্যাভিপ্রায়ী ব্যক্তি।... 'বাবু' কথাটি মাত্র পরিচয়জ্ঞাপক, 'ভদ্রলোক' চরিত্রজ্ঞাপক।' উনিশ শতকের শিক্ষিত ভদ্রলোকরা বাবুদের অন্তঃসারশূন্য হঠাৎ-নবাবির চরিত্র তুলে এনেছেন সাহিত্যের পাতায়। বিশ শতকে সমর সেন 'বাবু' অর্থে বোঝান মধ্যবিত্ত বাঙালিকে। ১৮২১-পরবর্তী ২০০ বছরে আরও অনেকেই বাবু-কথা লিখেছেন।

পরিশেষে জানিয়ে রাখা দরকার যে, 'কলকাতার বাবু সংস্কৃতি' আর এখানকার 'গণ-সংস্কৃতি' এক নয়। কলকাতার প্রকৃত সংস্কৃতি হচ্ছে 'কলকাতার গণ-সংস্কৃতি', যেটার বিকাশে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন 'রাজা রামমোহন রায়', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' প্রমুখ মনীষীরা। যদিও উচ্চ শিক্ষিত হয়ে এই সমাজই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে বিংশ শতাব্দীর বর্তমান সময় পর্যন্ত সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, আইনজীবী, রাজনীতিক ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী তৈরী করেছিল। এদেশে বিত্ত ও বিচার সমন্বয় এরাই ঘটিয়েছে। দেশের উন্নতি এদের ওপরই নির্ভর করেছে। এরাই শেষ পর্যন্ত সাধিত করেছিল এদেশ থেকে ইংরেজের মহাপ্রস্থান।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ, বিনয় --কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, প্রকাশ ভবন ,২০১২,

২. সুর, ডঃ, অতুল- কলকাতা: চার্ণক থেকে সি. এম. ডি. এ. পর্যন্ত এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সাহিত্যলোক,৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্কলেন, কলকাতা ৭০০০০৬

৩. শাস্ত্রী. শিবনাথ --রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি.

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ-- নববাবুবিলাস ও নববিবিবিলাস, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা ১৩৪৪

৫. সুর, ডঃ, অতুল --৩০০ বছরের কলকাতা: পটভূমি ও ইতিকথা, সাহিত্যলোক, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্কলেন, কলকাতা ৭০০০০৬

৬. রায়, বিনয়ভূষণ--বাংলায় সতীদাহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন, সাহিত্যশ্রী ৭৩ মহাত্মা গান্ধিরোড কলকাতা- ৯

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতা --আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী

৮. চৌধুরী, অমিতাভ -অচেনা শহর কলকাতা, ১৯৬৪

৯. মিত্র, প্রসাদ, ইন্দু --প্রাচীন কলিকাতার খুচরা খবর, ১৩৪০

১০. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ --কালীঘাট ইতিবৃত্ত, ১৯২৫
১১. কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ১৯৬১।
১২. ঠাকুর. ক্ষিতীন্দ্রনাথ -কলিকাতায় চলাফেরা, সেকালে আর একালে, ১৩৩৭
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুপ্রসন্ন -কলিকাতার হাট হদ্দ, ১২৭৫
১৫. বসু, স্বপন- বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস
১৮. বাগল, শ্রী, যোগেশ --স্ত্রী শিক্ষার কথা

সত্তর দশকের দেশ-এ ভিন্ন যুবমানস : দুটি গল্পের অন্য অনন্য স্বর

বর্ণালী পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ : সত্তর দশকের বাংলা ছোটগল্প মানেই তা নকশাল আন্দোলনের প্রভাবসঞ্জাত, যুবমানস সেখানে হয় প্রতিবাদী, প্রবল আক্রোশে ক্ষুব্ধ কিংবা হতাশায় জর্জরিত; এর বাইরে আলোচ্য দশকে রচিত গল্পগুলি গ্রামজীবনকেন্দ্রিক—সত্তর দশকভিত্তিক বাংলা ছোটগল্পের অধিকাংশ সমালোচনা পড়ে এমন ধারণাই বদ্ধমূল হয়। আসলে দশকওয়ারি সমালোচনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট দশকের বিশেষ কয়েকটি প্রবণতার নিরিখে গল্প নির্বাচিত হওয়ায় উদ্দিষ্ট দশকে রচিত ভিন্ন ধারার গল্পগুলি উপেক্ষিতই থেকে যায়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা সত্তরের দশকে লেখা এবং 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত এমনই দুটি অনালোচিত গল্প(যথাক্রমে অভ্র রায়ের 'শীত বসন্তের দিন' এবং চিত্ররথ দত্তর 'ফর্‌টি ফোর ডাউন') আলোচনার মাধ্যমে এই দশকের ভিন্ন স্বর, অনন্য যুবমানসকে বুঝে নেব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অভ্র রায় এবং চিত্ররথ দত্ত বাংলা ছোটগল্প চর্চার জগতে সুপরিচিত নাম নয়। তাই এই প্রবন্ধে পূর্বোক্ত দুই লেখক সম্পর্কে যথাসম্ভব তথ্য-পরিচিতিও উল্লিখিত হয়েছে।
সূচক শব্দ : সত্তর দশক, ছোটগল্প, 'দেশ' পত্রিকা, ভিন্ন স্বর, অনন্য যুবমানস।

মূল আলোচনা :

বিশেষ দৈশিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির কারণে সাহিত্যে এক একটি দশকে এক একরকম চরিত্র ও প্রবণতা ('trend') মুখ্য হয়ে ওঠে। এবং এর ফলস্বরূপ সেই প্রবণতাগুলিই অধিকাংশক্ষেত্রে মান্যতা পায় বিশিষ্ট দশকের সাহিত্য সমালোচনার প্রধান নিরিখ বা মানদণ্ড হিসাবে। কিন্তু পূর্বনির্ধারিত কোনও মানদণ্ডের ভিত্তিতে কোনও সাহিত্য সমালোচনা করা হলে আলোচনাকে সুসংবদ্ধ ও সংহত রূপ দেওয়ার প্রয়োজনে যেমন নির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়ে, তেমনি সাহিত্যের এই দশকওয়ারি সমালোচনার মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়ে যায়। যেমন সত্তরের দশকের বাংলা ছোটগল্প বা গল্পে সত্তর দশক সংক্রান্ত আলোচনাগুলিকেই যদি ধরি, তাহলে দেখতে পাব সেখানে অব্যবহিত পূর্ববর্তী দশকে সংঘটিত নকশাল আন্দোলন ('১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯—এই আন্দোলনের প্রসারের কাল, ১৯৭০ থেকে ১৯৭২—এই আন্দোলন ভেঙে যাবার কাল।')[১]–এর প্রভাবকে গুরুত্ব দিয়েছেন সমালোচকরা। স্বনামধন্য একজন আলোচক এমনও বলেছেন যে, '...বাংলা ছোটগল্পের সত্তরের দশকের ফসল কোনো-না-কোনোভাবে এই আন্দোলনটির আলোড়নজাত সমাজদৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত।'[২] আলোচ্য

দশকের ছোটগল্পের প্রকৃতি সম্পর্কে সমালোচকেরা গ্রামজীবননির্ভরতার কথাও বলে থাকেন। বস্তুত 'বাংলাদেশের গ্রাম আর গ্রামের মানুষই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার ক্ষয়াটে ধ্বস্ত চেহারা নিয়ে উঠে এসেছে এই পর্বের গল্পে, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার কাজ তখন সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই যেন আরেকভাবে শুরু হয়ে গেছে।'[৩] অর্থাৎ সত্তরের দশকের ছোটগল্প মুখ্যত নকশাল আন্দোলনের প্রভাবসঞ্জাত এবং তা গ্রামজীবনকেন্দ্রিক—এই প্যারামিটার থেকে সত্তরের ছোটগল্পকে আলোচনা করার ফলে আলোচকদের নির্বাচনে পূর্বোক্ত দুই ধরনের ছোটগল্পগুলিই কেবল গুরুত্ব পায় তা নয়; বরং তাঁদের নির্বাচনে অধিকাংশ গল্পের পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। ফলে এই দশকে লেখা ভিন্ন ধারার গল্পগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আলোচনার অভাবে সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় আবদ্ধ থেকে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে বলা যায়। একই কারণে আমরা বিস্মৃত হয়েছি বহু সম্ভাবনাময় ছোটগল্পকারদেরও। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা এমনই স্বল্পপরিচিত বা অধুনা বিস্মৃতপ্রায় দুজন ছোটগল্পকার—অভ্র রায় এবং চিত্ররথ দত্তের 'দেশ' পত্রিকায় নির্দিষ্ট সময়পর্ব(১৩৮২)-এ লেখা একটি করে গল্প (যথাক্রমে 'শীত বসন্তের দিন', 'ফর্‌টি ফোর ডাউন') আলোচনার মাধ্যমে সত্তরের ছোটগল্পে বহুচর্চিত পূর্বোক্ত দুই প্রবণতার বাইরে ভিন্ন কোনও স্বর শোনা যায় কিংবা যুবমানসের পৃথক কোনও ছবি পাওয়া যায় কিনা তা-ই অন্বেষণের চেষ্টা করব। এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম আলোচ্য গল্প অভ্র রায়ের 'শীত বসন্তের দিন' ('দেশ' ৬ চৈত্র ১৩৮২)।

> ...লেখার ব্যাপারে শুরু থেকে একটা লক্ষ্য মনে মনে রাখতে চেয়েছি, একই গল্প দুবার নয়।...কেন গোড়া থেকেই একটা গণ্ডী কেটে নেব? কেন বিভিন্ন ধরনের বিষয়, চরিত্র, পরিবেশ বর্ণনা বা মানসিকতা ধরতে চেষ্টা করবো না? মনে মনে এমন অনেক কিছু ভেবে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যাতে একটা লেখার সঙ্গে আর একটা লেখা এক না হয়ে যায়। ...বিভিন্ন মেজাজে লেখার চেষ্টা হয়তো আর একটা কারণেও এসে থাকতে পারে। এভাবেই নিজেকে যাচাই করতে চেয়েছি আমি। ভিন্নধর্মী রচনার মধ্যে নিজের সাধ্য ও সামর্থ্যের।[৪]

'একই গল্প দুবার' লিখতে কিংবা নিজেকে কোনও গণ্ডিতে আবদ্ধ করতে না চাওয়া, 'বিভিন্ন মেজাজে'র গল্প রচনার মাধ্যমে নিজের 'সাধ্য' ও 'সামর্থ্যের' পরীক্ষায় মগ্ন, বৈচিত্র সন্ধানী এই ছোটগল্পকারের নাম বিভূতি রায় (জন্ম: ১২ নভেম্বর ১৯৩৬, বাংলাদেশের খুলনার আজগড়ায়)[৫], লেখালেখির জগতে যিনি অভ্র রায় নামে পরিচিত। বস্তুতপক্ষে পেশায় অধ্যাপক (প্রথমে সেন্ট পল্‌স কলেজে বাংলা পড়াতেন, পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে) এই লেখকের 'দেশ' পত্রিকায় প্রথমবার 'তারকজীবন লাহিড়ীর আত্মদর্শন' (১৭ মে ১৯৬৯ সালে) নামক একটি গল্প প্রকাশিত হলে সেটি সাগরময় ঘোষ এবং বিমল করের মতো স্বনামধন্য ব্যক্তিদের দ্বারা প্রশংসিত হয়।[৬] কিন্তু 'আশাতীত'ভাবে প্রাপ্ত এই প্রশংসাও লেখককে একই ভঙ্গিতে দ্বিতীয়বার গল্প লিখতে

প্রলুব্ধ করতে পারেনি। পরবর্তী দুবছরে ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘এখন হৃষিকেশ’ (১৯৭০; লেখকের মতে গল্পটির আবেদন ‘লিরিক্যাল’ধর্মী)[৭], এবং ‘প্রহরী’ (১৯৭১; লেখকের ভাষায় এটি ‘দুরন্ত যৌবনের গল্প’)[৮] নামে দুটি স্বতন্ত্র মেজাজের গল্প লিখেছিলেন তিনি, যা ছোটগল্পকার হিসেবে অভ্র রায়ের বৈচিত্র-পিয়াসী প্রতিস্পর্ধী অভিপ্রায়কে অভিব্যক্ত করতে পেরেছিল পাঠকের কাছে। ‘হৃদয়ের শব্দ’, ‘দত্তভিলায় এক আগন্তুক’, ‘আর এক জীবনে’ প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক অভ্র রায়ের ছোটগল্পের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তবে বাংলা ছোটগল্প চর্চার জগতে অভ্র রায় এখনও প্রায় অপরিচিত একটি নাম। আমরা অভ্র রায়ের তিনটি গল্পগ্রন্থের কথা জানতে পেরেছি, যেগুলি হল—‘শামখোল’ (এটি লেখকের প্রথম গল্পগ্রন্থ)[৯], ‘একটু দেখবেন, স্যার’(‘মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ’, প্রথম প্রকাশ: ১ জানুয়ারি ২০০৪) এবং ‘গল্প সমগ্র (১ম)’। গ্রন্থিত এবং অগ্রন্থিত দু’ধরনের গল্প মিলিয়ে আমরা এখনও পর্যন্ত অভ্র রায়ের ঊনপঞ্চাশটি ছোটগল্পের সন্ধান পেয়েছি। প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটির নাম পূর্বে বলা হয়েছে, এখানে আরও কয়েকটি গল্পের নাম তাদের প্রকাশতথ্য সহ উল্লেখ করা হল—‘হঠাৎ বৃষ্টিতে’ (‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, শারদীয়া ১৩৮৩), ‘জীবন বাহার’ (‘দেশ’, শারদীয় ১৩৮৩), ‘সোনালী ঈগল’ (‘দেশ’, শারদীয় ১৩৮৭), ‘সবুজ মুখ’ (‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৮৯), ‘কাটি মাহাতো’ (‘যুগান্তর’, শারদীয় ১৩৯০), ‘মান্না নিবাস’ (‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, শারদীয়া ১৩৯২), ‘ইন্দ্রবাবুর বাগানে বনভোজন’ (‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৯৫), ‘ইছামতীর গল্প’ (‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, শারদীয়া ১৪০০), ‘বিলুয়া’ (‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, শারদীয়া ১৪০৪), ‘ছেলেবেলার দিন’ (‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, শারদীয়া ১৪০৬), ‘বিন্তিকে দেখতে এল’ (‘কথাসাহিত্য’ ৫৫ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক ১৪১০/ অক্টোবর ২০০৩) ইত্যাদি। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের বিশেষ নিরিখ থেকে অভ্র রায়ের পূর্বোক্ত গল্পগুলির মধ্যে ‘শীত বসন্তের দিন’ গল্পটি আমাদের আলোচ্য।

নামকরণ থেকেই এই গল্পের কাহিনিগত সময়কাল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বস্তুতপক্ষে শেষ শীত এবং আসন্ন বসন্তের একটি সকাল(যখন ‘বরফ থেকে ধোঁয়া ওঠার মতো একটা হিলহিলে কুয়াশার স্রোত উঠে আসছে পুকুর থেকে। রাস্তার ধারে ঝুপসি মাথার কয়েকটা আম জাম বকুল। কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে কেমন নিষ্প্রাণ, জুবুথুবু...টুপটাপ শিশির পড়ার শব্দ...দুগ্‌গা টুনটুনি ডাকে গাছের মাথায়, টুম্‌প...টুম্‌প...টুম্‌প...)[১০] থেকে আরম্ভ হয়ে সেদিনেরই সন্ধেবেলায়(যখন ‘চারদিকে জোনাকি জ্বলছে রাস্তায়।’)[১১] আলোচ্য গল্পের কাহিনি শেষ হয়েছে। সেদিক থেকে আক্ষরিকার্থেই এটি ‘শীত বসন্তের দিন’-এর কাহিনি। একটি মফস্‌সল গল্পটির পটভূমি, যেখান থেকে এই গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র নলিনী উচ্চশিক্ষার জন্য শহরের কলেজে যায়। নলিনীর শহুরে সহপাঠী বন্ধুদের(ভাস্কর, বোধন, মাধুরী, শুভ্রা, বনানী, ইলা) ছুটির দিনে কাছেপিঠে কোনও গ্রামে বেড়িয়ে আসার শখ আলোচ্য গল্পের প্রতীতির উৎস। প্রথম পুরুষ তথা সর্বজ্ঞ কথক(‘omniscient narrator’)-এর

দৃষ্টিকোণ (‘point of view’)-এ বিবৃত এই গল্প থেকে জানতে পারি, নলিনী ‘মুখচোরা’ এবং লাজুক স্বভাবের। সংকোচ ও দ্বিধা যেন তার প্রকৃতির অঙ্গ। সে সচরাচর তার শহুরে বন্ধুদের কথাবার্তার মধ্যে থাকে না। ‘বরাবর এক কোণে চুপচাপ বসে থাকে।’[১২] সহপাঠীদের সঙ্গে নিজের অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বৈষম্যের কারণে একধরনের হীনমন্যতাবোধ নলিনীর স্বভাবের দ্বিধা ও সংকোচের সম্ভাব্য একটি কারণ হতে পারে। মূলত বন্ধুদের পীড়াপীড়ী এবং ‘দিলি এবার তোরা নলিনীর পড়াটা ছাড়িয়ে; কাল থেকে আর আসবে না বেচারা দেখিস’[১৩] ইত্যাদি টিপ্পনীতে প্রথমে ‘মুষড়ে’ পড়ে, শেষে ‘মরিয়া’ হয়ে নলিনী বন্ধুদের প্রস্তাবে রাজি হয়। কিন্তু নিমরাজি হওয়া এই প্রস্তাব এবং তার গ্রামে বন্ধুদের একদিনের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা কীভাবে দ্বিধাগ্রস্ত ও সংকুচিত নলিনীর স্বভাবে আমূল পরিবর্তন ঘটায় তা আলোচ্য গল্পের অনুসরণে লক্ষ করব আমরা।

গল্পের শুরুতে বন্ধুরা আসবে বলে সকাল থেকে রাস্তার ধারে ‘একটা চাপা অস্থিরতা নিয়ে’[১৪] নলিনীকে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। আসলে মফস্‌সলের ‘হিলহিলে ঠান্ডা! বনবাদার, মরাহাজা পানাপুকুরের গন্ধ’[১৫]—এসবের মধ্যে কি কেউ সাধ করে আসে? এলেও তাদের ভালো লাগবে? বা শেষপর্যন্ত এসে তারা ‘আফসোস’ করবে কিনা ইত্যাদি সংশয়ে উদ্বেলিত হতে থাকে নলিনীর মন। একদিকে এই অস্থিরতা ও সংশয়, অন্যদিকে তার গ্রামে প্রথমবার বন্ধুদের বেড়াতে আসার জন্য উত্তেজনাবোধের কারণে আগের রাত্রে ভালো করে ঘুমতে পারে না সে। অবশেষে যখন ‘গাছগাছালির গা ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে’[১৬] রোদ ছড়িয়ে পড়ে তখন একটা বাস থেকে নেমে ভাস্কর, ইলা, মাধুরী এবং শুভ্রা নলিনীর সামনে এসে দাঁড়ায়। এরপর থেকেই মুখ্যত নলিনীকে কেন্দ্র করে তার চার বন্ধুকে বা আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে তিন নারী—ইলা, মাধুরী ও শুভ্রাকে নিয়ে কাহিনি আবর্তিত হয়ে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। কথক সর্বপ্রথম প্রথমবারের জন্য গ্রামে আসা ইলার মুগ্ধতা বিবৃত করেছেন। নলিনীর গ্রামের আম-কাঠালের ঘন জঙ্গল, কাঠবেড়ালির দৌড়াদৌড়ি, পুকুর পাড়ের সরু পথ, (যা বাঁক নিয়ে বাঁশবনের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে), সেইসঙ্গে ঠান্ডা হওয়ায় বুনো ফুলের গন্ধের সংশ্লেষ আর পাখির ডাক ইলাকে অভিভূত করে। গ্রামের প্রকৃতি যেখানে ইলাকে মোহিত করেছে, সেখানে ‘লালপেড়ে ঘি রঙের শাড়ি, লাল টিপ, ধবধবে সাদা শাল’-এ সজ্জিত ‘পিঠ জুড়ে ঝাঁপিয়ে’ পড়া ‘ফাঁপানো এলো চুল’-এর ইলা নলিনীকে মুগ্ধ করে। কিন্তু ইলার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই স্বভাবগত সংকোচে চোখ ফিরিয়ে নেয় সে। ইলার পর মাধুরীর ওপর আলো ফেলেছেন কথক—‘মাধুরী কোথায় নূপুর-টুপুর কিছু একটা বেঁধেছে। পা ফেললেই মৃদু ঝিনিক ঝিনিক শব্দ উঠছে। শাড়িতে রঙ বেরঙের ফুলপাতার নকশা। কালো সোয়েটার। পাথর বসানো নাকছাবি নাকে।’[১৭] এই মাধুরীই আচমকা নলিনীর হাত টেনে তাকে জিগ্যেস করে তারা এভাবে নলিনীর বাড়িতে ‘চড়াও’ হওয়ায় সে কিছু মনে করেছে কিনা। মাধুরীর কথার সঙ্গে আলো ঝলসায় তার

নাকছাবিতে। দেখা যায়, নলিনী মাধুরীর কথার একটি 'জুতসই জবাব' দিতে চাইলেও সংক্ষেপে 'যাঃ!' ছাড়া কিছুই বলতে পারে না। মাধুরীর আচরণ এখানে স্বতঃস্ফূর্ত ও দ্বিধাহীন; কিন্তু নলিনী এখনও সংকুচিত এবং দ্বিধাগ্রস্ত। অন্যদিকে কথকের বর্ণনা থেকে জানতে পারি, অসুখের পর 'ছিপছিপে' চেহারার শুভ্রার স্বাস্থ্য 'ইদানীং' ভালো হয়ে একটা ভারিক্কী ভাব এসেছে।

গল্পে দেখি, রাস্তার ধারের অসংখ্য 'কৌতূহলী চোখ' পেরিয়ে সকলে নলিনীর বাড়ির অভিমুখে যাত্রা করে। যাত্রাপথে গ্রামের আপাতসাধারণ, প্রাত্যহিক জীবন-পরিবেশকে 'ছেলেমানুষী কৌতূহল' নিয়ে উপভোগ করেছে নলিনীর বন্ধুরা। এই সময়ই পুকুর থেকে সদ্য স্নান সেরে ওঠা এক তরুণী বধূর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে মূলত ইলা ও মাধুরী এই গ্রামের কোনও ছেলেকে বিয়ে করে থেকে যাবে কিনা বলে পরস্পরের পিছনে লাগে। পরক্ষণেই তাদের দুজনের নিশানা হয় নলিনী। মাধুরী তো হাসির সঙ্গে স্পষ্টতই বলে বসে, 'খুঁজতে আবার কোথায় যাব, হাতের কাছেই তো রয়েছে। কী রে নলিনী, পারবি না তুই?'[১৮] এখানেই শেষ নয়। 'ঘন গাছগাছালি ঘেরা এক খণ্ড উঁচু জমির' মধ্যে নলিনীদের চালার বাড়ি দেখে বিমুগ্ধ শুভ্রাও ইলা ও মাধুরীর পূর্বের কথার জের টেনে ঠাট্টার ছলে বলে, 'ফাইন! ফাইন! নলিনী, আমিও রাজী।'[১৯] মজার মনোভাব থেকে হলেও দেখা যাচ্ছে, নলিনী ক্রমশ তিনজন নারীর মনোযোগ এবং আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে। নলিনী নিজের ঘরেই তার বন্ধুদের বসানোর ব্যবস্থা করে। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো মাটির সরায় নলিনীর আঁকা একটি ছবি, মাঠের মধ্যে পিছন ফিরে একটি মেয়ে সূর্যাস্ত দেখছে যার বিষয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইতিমধ্যে নলিনীর মায়ের সঙ্গে তার চার বন্ধুর পরিচয়-পর্ব এবং তারপর নলেন গুড়ের পায়েস, পাটিসাপটা আর ঘরে ভাজা কুচো নিমকি সহযোগে খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ হলে পুনরায় দেওয়ালের ছবিটি তাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। মূলত ছবিটির, বিশেষত ছবির মেয়েটির প্রেরণা কে? মেয়েটি ইলা, মাধুরী না শুভ্রা তাই নিয়ে রীতিমতো তিনজনের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। সকলেই একে অন্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেও সচেতন পাঠক বুঝতে পারেন যে তারা প্রত্যেকেই মনে মনে নিজেদের নলিনীর প্রেরণার নারী বলে কল্পনা করতে চেয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভাস্করের মন্তব্য—'এ তুইও না, শুভ্রাও না। বরং মাধুরীর সঙ্গে মেলে। ওপরের অংশটা তো হুবহু'[২০] শুনে 'ঝিকমিক' করে ওঠা মাধুরীর মুখ আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করছে বলা যায়। তার আঁকা ছবি নিয়ে তিনজন নারীর এই ঝগড়া শ্রোতার ভূমিকায় থাকা নলিনী বেশ উপভোগ করেছে দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে ভাস্করের হিউমারপূর্ণ টিপ্পনীটি অত্যন্ত যথোপযুক্ত—'এক ঢিলে দুই পাখি মারার কথা শুনেছি, তুই যে শালা তিনটেকে গেঁথেছিস। একটু পায়ের ধুলো দে গুরু।'[২১] বর্তমান অবস্থার নিরিখে ভাস্কর কেবল যথাযথ মন্তব্যই করেনি; সমস্ত পরিস্থিতি জরিপ করে সে নলিনীর ছবির একটি 'ক্যাপশান' তথা নামকরণ— (প্রথমে 'সূর্যাস্ত : ইলা মধুরী শুভ্রা',

পরে) 'ইলা মাধুরী শুভ্রা'-ও করেছে, যা আলোচ্য গল্পের সমাপ্তি বা প্রতীতির সংবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে আমরা ফিরব, আপাতাত এখানে উল্লেখ করছি যে, অভ্র রায়ের 'শীত বসন্তের দিন' গল্পটি পরবর্তীকালে 'মিত্র ও ঘোষ প্রাঃ লিঃ' থেকে প্রকাশিত 'একটু দেখবেন, স্যার' (প্রথম প্রকাশ : ১ জানুয়ারি ২০০৪) গল্পগ্রন্থে 'ইলা মাধুরী শুভ্রা' নামেই সংকলিত হয়।

খাওয়া-দাওয়ার পর নলিনীর ঘরেই বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে এবার সকলে ঘুরতে বেরোয়। 'শীত বসন্তের মেশামেশি হা হা হাওয়া' মেখে ধান আর নানান মরশুমি সবজির ক্ষেত দেখে ভাস্কর 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয়রে চলে আয়...।'[২২] গানটি গায়। 'রেওয়াজ করা মিষ্টি গলা'-য় তাতে যোগ দেয় মাধুরীও। চারদিকে কোথাও পাকা ফসল না থাকলেও এই আবহ বা পরিবেশে বহুশ্রুত পূর্বোক্ত গানটিকে নতুন করে ভালো লাগে নলিনীর। মুগ্ধ নলিনীরও তাদের সঙ্গে গলা মেলাতে ইচ্ছে করে; কিন্তু পারে না সে। বুকের মধ্যে 'রিনরিন' করা এক অস্থিরতা নিয়ে পথ চলতে থাকে নলিনী। কিছুক্ষণ পর তারা কচুরিপানার ফুলে ভরা একটা পুকুরের সামনে এসে উপস্থিত হয়। বেগুনি রঙের ফুলগুলি তিন রমণীকে আকৃষ্ট করে। শুভ্রা হাত বাড়িয়ে কাছের দু-তিনটি ফুল তুলতে পারলেও, অন্যেরা ব্যর্থ হয়। ভাস্কর তাদের ইচ্ছে পূরণের জন্য প্রথমে উদ্যোগী হয়ে জলে নামার চেষ্টা করতে গেলেও গ্রামীণ পরিবেশে অনভ্যস্ততা এবং সাপের ভয়ের কারণে শেষপর্যন্ত পিছিয়ে গিয়ে ইলা ও শুভ্রার দ্বারা ভর্ৎসিত হয়। এবার নলিনীর দিকে তাকিয়ে মাধুরী যেন নিঃশব্দ আহ্বান জানায়। আর নলিনীও তৎক্ষণাৎ কাপড় গুটিয়ে জলে নেমে তিন নারীর জন্য তিনটি ফুলের তোড়া বানিয়ে তাদের দেয়। দেখা যাচ্ছে শহরের ছেলে ভাস্কর যে কাজ পারেনি; বন্ধুদের কথাবার্তার মধ্যে 'বরাবর চুপচাপ এক কোণে' বসে থাকা গ্রামের ছেলে নলিনী তা অবলীলায় করে দেখিয়েছে। এই প্রথম নলিনীর আচরণের সংকোচ ও জড়তা কেটে গিয়ে তাকে সপ্রতিভ মনে হয়। আজন্ম পরিচিত নিজস্ব প্রতিবেশ এক্ষেত্রে নলিনীর সহায়ক হয়েছে। আরও উল্লেখ্য, প্রথমদিকে গ্রামের 'মরাহাজা পানাপুকুর' বন্ধুদের ভালো লাগবে কিনা ভেবে যে সংশয় নলিনীর ছিল, ফুলে ভর্তি সেই পানাপুকুরই এক্ষেত্রে তার আনুকূল্য করেছে বলা যায়। যাই হোক ইলা, মাধুরী এবং শুভ্রা নিজেদের মতো করে নলিনীর তুলে দেওয়া ফুলগুলোকে তাদের শরীরের সঙ্গে সংলগ্ন করে 'আদর' করেছে, আঘ্রাণ নিয়েছে কখনো। এবং তাদের কারোর ঠোঁট টিপে হাসিতে, কারোর চোখের 'রহস্যময় কটাক্ষ'-এ আবেগে রোমাঞ্চিত হয়েছে নলিনী।

দিনভ'র ঘুরে বেড়ানোর পর দুপুরে খাওয়ার সময় নলিনীদের বাড়ি ফিরে খাওয়া শেষে আবারও বেড়িয়ে পরে তারা। এবার বন্ধুদের পুকুর পাড়ের একটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ডাব খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে নলিনী। শহরের ছেলে-মেয়ে, নলিনীর বন্ধুদের ডাবে মুখ লাগিয়ে খাওয়ার অভ্যেস না থাকায় বিব্রত হয় তারা। বিশেষত ইলা এবং মাধুরীর করুণ অবস্থা(চুমুক দিয়ে ডাব খেতে গিয়ে বুকের কাপড় ভিজিয়ে ফেলে ইলা আর

মাধুরী নিজের কাপড় বাঁচাতে গিয়ে অর্ধেক জল বাইরেই ফেলে বসে) দেখে নলিনী কলাপাতা মুড়ে একটা পাইপ বানিয়ে দেয় শুভ্রাকে। নলিনীর তৎপরতা এবং তার আচরণের স্বতঃস্ফূর্ততা এখানে লক্ষ করবার মতো।

মাঠের মধ্যে একটা বটগাছের ছায়ায় বসে থাকতে থাকতে একসময় যখন বেলা গড়িয়ে আসে, যখন সকলের দৃষ্টি উদাস এবং দূরে নিমগ্ন, ঠিক তখন আরও দূরের একটি মাঠের মধ্যে এক স্থানে দ্বীপের মতো জঙ্গল তাদের চোখে পড়ে। নলিনীর কথা থেকে জানা যায়, উদ্দিষ্ট স্থানটি 'কবরখানার মাঠ' নামে পরিচিত। ভুতুরে জায়গা বলে কথিত, সেখানে এক সময় এক পাগল ফকিরের আস্তানা থাকলেও, বর্তমানে জায়গাটি ফাঁকাই রয়েছে। বস্তুত নলিনীর বর্ণনায় জায়গাটি সম্পর্কে ভাস্করের 'ইন্টারেস্ট' জাগলে সবাইকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরের ওই স্থানে যেতে রাজি করায় সে। গন্তব্যের পথে ভাস্কর এবং শুভ্রা সবার প্রথমে। তাদের থেকে একটু পিছিয়ে থাকা মাধুরীর পিছনে আবার নলিনী, যেখান থেকে মাধুরীর হেঁটে যাওয়ার সুন্দর ভঙ্গি('ধেউয়ের মতো উঠছে, নামছে, ভেঙে যাচ্ছে। সঙ্গে সেই ঝিনিক ঝিনিক শব্দটা।')[২৩]-কে লক্ষ করে সে। অন্যদিকে মেঠো পথে নিজের জুতোটিকে বাগ মানাতে না পেরে অনেকখানি দূরে পিছিয়ে পড়ে ইলা। ইলাকে ধরার জন্য চলার গতি কমিয়ে নলিনী প্রায় পায়চারি করতে থাকলে, ইলা যখন তার কাছে এসে পৌঁছায়, জানা যায় তার পায়ে জোঁক লেগেছে। গল্পে দেখি অপ্রত্যাশিত এই ঘটনার আকস্মিকতায় বিভ্রান্ত ইলা চোখে জল নিয়ে ছটফট করতে থাকলে নলিনী তার সমস্ত আড়ষ্টতা এবং ইতস্ততভাব কাটিয়ে উঠে শক্ত হাতে সটান ইলার পা চেপে ধরে টেনে ছাড়িয়ে দেয় জোঁকটা। শুধু তাই নয়, ক্ষতস্থান থেকে নিসৃত রক্ত নিজের হাতের তেলোয় চেপে অবলীলায় মুছে দেয় সে। এখানেও শেষ নয়। নলিনী কয়েকটা নরম ঘাস হাতে করে পিষে ইলার ক্ষতের ওপর চেপে ধরে তাকে আশ্বস্ত করে এভাবে—'যা, ঠিক হয়ে গেছে। জোঁক দেখে কেউ এভাবে ভয় পায় নাকি?'[২৪] এই ঘটনার সমান্তরালে রক্তের ধারায় ভিজে আরও অপরূপ হয়ে ওঠা ইলার পায়ের রং এবং তার শরীর থেকে বেরিয়ে আসা এক 'অবিশ্বাস্য সুঘ্রাণ' নলিনীকে অভিভূত করে। নলিনীর কাছে এ এক অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা। বস্তুতপক্ষে(মজার ছলে) এই গ্রামের কোনও ছেলেকে বিয়ে করে এখানে থেকে যাওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ থেকে শুরু করে সরায় আঁকা মেয়ের ছবিটিকে কেন্দ্র করে ইলা, মাধুরী ও শুভ্রার কৌতূহলের লক্ষ্য হয়ে ওঠা, পানাপুকুরে নেমে তিন নারীকে ফুল তুলে দেওয়া, শুভ্রার সুষ্ঠুভাবে ডাব খাওয়ার জন্য অভিনব উপায় উদ্ভাবন, 'শক্ত হাতে' 'অবলীলায়' জোঁকের কামড়ে বিভ্রান্ত ইলার যন্ত্রণার উপশমের মাধ্যমে নলিনী তার মুখচোরা, দ্বিধাগ্রস্ত, লাজুক ইমেজকে ক্রমশ অতিক্রম করে যেন নায়কোচিত বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বলা যায়।

পূর্বোক্ত ঘটনায় ইলা এবং নলিনী অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়লে ইলা কবরখানার মাঠে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। এবং এই প্রথম একান্তভাবে পাশাপাশি বসে তারা। উভয়ের মধ্যে 'অস্বস্তিকর এক নীরবতা' থাকলেও বোঝা যায় এই

নৈঃশব্দের অবকাশে আজকের দিনের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত গভীর অনুভবকে তারা নিজেদের মনের গহীনে বিশ্লেষণ করেছে। কিছুক্ষণ পর বাকিরা ফিরে এলে রাত্রি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় বাড়ি ফেরার ধুম পড়ে যায় সকলের মধ্যে। সন্ধ্যার সময় বাসের জন্য অপেক্ষমাণ অবস্থায় প্রত্যেকে তাদের ভালো লাগার কথা নলিনীকে জানায়। মাধুরী কাছে এসে বিশেষভাবে আবার তারা নলিনীর গ্রামে আসতে পারে কিনা জিগ্যেস করলে এবার 'নিশ্চয়ই' বলে দ্বিধাহীন আন্তরিক উত্তর দেয় নলিনী। একরাশ ভালোলাগা নিয়ে বন্ধুরা ফিরে গেলে নলিনীর চোখের সামনে সমস্ত দিনটা ছবির মতো ঘুরপাক খেতে থাকে। সেই ছবির নাম 'ইলা মাধুরী শুভ্রা'। বলার অপেক্ষা রাখে না নলিনীর আঁকা ছবি দেখে ভাস্করের দেওয়া এই নাম আলোচ্য গল্পের ক্ষেত্রে কতখানি অর্থবহ, পরবর্তীকালে যা লেখকের দ্বারাও স্বীকৃতি পায়। বস্তুতপক্ষে 'ইলা মাধুরী শুভ্রা' নামক ছবির মতো শীত বসন্তের এই একটি দিনের অভিজ্ঞতা দ্বিধাগ্রস্ত, সংকুচিত স্বভাবের নলিনীকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। একটি মফস্‌সলের পটভূমিকায় লেখা এই গল্প আসলে নলিনীর উত্তরণের কাহিনি।

কবি ও অধ্যাপক অজিত দত্তর পুত্র চিত্ররথ দত্ত (জন্ম: ১৯৩৭, অজিত দত্তকে লেখা সমসাময়িক কৃতী সাহিত্যিকদের পত্রগুচ্ছ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে)[২৫]-এর 'ফর্‌টি ফোর ডাউন' (১৩ চৈত্র ১৩৮২) আমাদের পরবর্তী আলোচ্য গল্প। 'দার্জিলিং মেল', ডাউনের সময় যার ক্রমিক নম্বর ১২৩৪৪ সংক্ষেপিত হয়ে 'ফোর্‌টি ফোর ডাউন' নামে পরিচিত হয়েছে, বেআইনিভাবে সেই ট্রেনের সিট দখল নিয়ে স্থানীয় কুলি, 'মাস্তান' এবং প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে লড়াই এই গল্পের মূল বিষয়বস্তু। গল্পের পটভূমি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। কাহিনির শুরুতেই আমরা তৎকালীন জলপাইগুড়ির বর্ণনা পাই এভাবে—'বিরলবৃক্ষ দিগন্তবিস্তৃত মাঠে নির্মীয়মান কতকগুলো পলেস্তারাহীন বাঁশ-বাঁধা বাড়ি জনবসতি গড়ে ওঠার ইঙ্গিত দিচ্ছিল শুধু।'[২৬] আজকের যে জনবহুল জলপাইগুড়ি শহরকে আমরা দেখি, এই গল্পের কাহিনিকালে তার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছিল বলা যায়। পাহাড় ফিরতি, ভ্রমণ পিপাসু তিন যুবক(কথক, নিমাই এবং আলো)-এর একটি দলের এক নামহীন সদস্যের জবানিতে বক্ষ্যমাণ গল্পের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। ন্যারেটলজির পরিভাষায় এই ধরনের কথককে 'অন্তঃস্থ কথক' বলা হয়(যেহেতু নিরীক্ষকের অবস্থান থাকে কাহিনিতলে এবং সেই নিরীক্ষক কাহিনিরই কোনও ভূমিকা)[২৭]। একটি শীতের দিনের 'ঝিমঝিমে গড়িয়ে চলা বেলার' সকাল এগারোটা থেকে রাত্রি আটটা চল্লিশ পর্যন্ত এই গল্পের কাহিনিকাল। এর মধ্যবর্তী প্রায় ন'ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট ধরে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে কথক, নিমাই এবং আলোর অবস্থানকালে সংঘটিত যাবতীয় ঘটনাবলি উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে বর্ণিত হয়েছে। এবং সেই সূত্রেই গল্পে উঠে এসেছে ট্রেনে সিট দখলের রাজনীতি ও তার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষ তথা যাত্রীদের বিপন্নতার ছবি এবং এর বিরুদ্ধে বিশেষভাবে গল্পের কথক ও নিমাইয়ের প্রতিরোধের বৃত্তান্ত। বাস্তবিক 'দার্জিলিং মেল'-

এ সিট দখলের লড়াইকে কেন্দ্র করে গল্পে প্রায় প্রথম থেকেই একটা চাপা 'টেনশন' তৈরি হতে থাকে, নানা ঘটনার আবর্তে যা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চূড়ান্ত রূপ পায়। প্রকৃতপ্রস্তাবে ক্রমবর্ধমান এই 'টেনশন'-ই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ আয়তনের এবং মুখ্যত বিবরণধর্মী গল্প 'ফর্‌টি ফোর ডাউন'-এর চালিকা শক্তি বলা যায়, কারণ গল্পের শেষ পর্যন্ত পাঠকের মনোযোগ ও আগ্রহকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত 'টেনশন' ও তার ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট অ্যাকশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। বিষয়টি আলোচনাসাপেক্ষ।

গল্পে দেখি, স্টেশনে পৌঁছানো মাত্রই কথকসহ তার ছোট্ট দলটি কুলিদের কবলে পড়ে (কথকের মন্তব্য— 'স্টেশনে নামতেই কুলিগুলো ভয় দেখাল।'[২৮] এখানে স্মরণীয়)। বস্তুত তাদের জিনিসপত্র প্ল্যাটফরম কিংবা ওয়েটিং রুম অব্দি পৌঁছে দিয়ে ট্রেনে তাদের ভালো জায়গায় বসিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত বাবদ মাথাপিছু পাঁচ টাকা করে রেট দাবি করে 'অপেক্ষাকৃত মাস্তান চেহারার স্বাস্থ্যবান' কুলিটি। শুধু তাই নয়, বাঙ্ক চাইলে অতিরিক্ত দু'টাকার বিনিময়ে তারও ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় সে। বোঝা যায় অসৎভাবে এবং বলপূর্বক ট্রেনের সিট দখল করে সাধারণ যাত্রীদের কাছে সেগুলি চড়া দামে বিক্রি করা এদের উপরি উপার্জনের একটি মাধ্যম। পূর্বোক্ত কুলিটির উদ্দেশে করা কথকের মন্তব্য—'এই লোকটির রোজগারের বহরটা বেশ বিপুল এবং তার বেশীর ভাগটাই আমাদের মতো বেকায়দায় পড়া লোকদের কাছ থেকে চাপ দিয়ে আদায় করা।'[২৯] থেকেও এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। গল্প আরও অগ্রসর হলে জানা যায়, শুধুমাত্র স্থানীয় কুলিদেরই নয়, বেআইনিভাবে যাত্রীদের কাছে সিট বিক্রি করা এখানকার অল্পবয়সী ছেলে থেকে বহু মানুষেরই পেশা। এবং এর মধ্যেও যথেষ্ট প্রতিযোগিতা লক্ষিত হয়। এই পেশার সঙ্গে সংযুক্ত একটি ছেলের সঙ্গে কথক ও নিমাইয়ের কথোপকথন থেকেও এর প্রমাণ মেলে:

> স্টেশনের মধ্যে না যেতে পারায় বিজনেসটা খারাপ হয়ে গেছে।...কুলিদের সঙ্গে সিটের বখরা নিয়ে খুব জোর ঝাড়পিট হয়েছিল। মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল আমাদের তিনটে ছেলের। তারপর শালা গ্যাং নিয়ে এসে ঝাড় ঝাড়। সেই থেকে আমরাও স্টেশনে যাই না, ওরাও সাইডিংয়ে আসে না। মিটমাট চলছে—কথাবার্তা হয়েছে, রোববার মিটিং। আমরা এখানে প্রায় একশ ছেলে কারবার করি। ওদিকে আবার শালা কুলিগুলো আছে, ভাগে কী পড়ে বলুন![৩০]

অজ্ঞাতনামা পূর্বোক্ত ছেলেটির বক্তব্য থেকে এই বিচিত্র পেশাটির বেশ কিছু দিক উঠে এসেছে আমাদের সামনে। যেমন, ১. তৎকালীন সময়ে ঠিক কতো সংখ্যক মানুষ এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এখান থেকে সেই সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

২. অন্তত দুটি ভিন্ন দলের কথা আমরা পাচ্ছি, যার মধ্যে স্টেশন চত্বর কুলিদের এবং সাইডিংয়ের অংশ বাকিদের এক্তিয়ারে বলে জানা যাচ্ছে।

৩. শুধু এই নয়, এলাকার অধিকার নিয়ে পূর্বোক্ত দুই দলের মধ্যেকার রেষারেষির কথাও জানা যায়, যা শেষপর্যন্ত মারামারির পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

৪. আর এই সবকিছু থেকে প্রতিভাত হয় সিটের অধিকার নিয়ে যুগপৎ এদের বিপক্ষ দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এবং অন্তর্দলীয় লড়াইয়ের দিকটি।

তৎকালীন সময়ে 'দার্জিলিং মেল'-এ বেআইনিভাবে সিট দখলের মাধ্যমে উপার্জনের কথা সর্বজনবিদিত অথচ অনুচ্চারিত এক সত্য। চিত্ররথ দত্ত মানুষের বিচিত্রধর্মী উপার্জনের একটি অনালোকিত দিককে এই গল্পে অত্যন্ত বাস্তবোচিতভাবে তুলে ধরেছেন।

আলোচ্য গল্পে কথক, নিমাই এবং আলো— এই তিন যুবকের চরিত্রায়ন বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাদের পাহাড় থেকে ফেরার বর্ণনা এদের ভ্রমণ পিপাসু মনকে চিনিয়ে দেয়। আবার হিমালয়ের সাড়ে বারো হাজার ফুট উঁচু ধূসর জমি থেকে ইকাবানা ('Japanese art of flower arrangement.')-র জন্য গল্প কথকের 'অর্ধস্ফুট গোলাপের মতো অপরিচিত শুকনো ফুলের গোছা' সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে তার পরিণত সুকুমার প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এরই পাশাপাশি 'রূপ-যৌবন সমৃদ্ধ' 'ঝকঝকে পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে উঠে আসা' নারীদের প্রতি কিংবা এক বিদেশী তরুণীর অপ্রসাধিত মুখমণ্ডলের সজীবতায় অথবা 'গাঢ় রঙ সিল্কের শাড়িতে আচ্ছাদিত' রমণী-শরীরের প্রতি আর পাঁচটা সাধারণ যুবকের মতো তাদেরও বিমুগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। নারীর প্রতি এই সহজাত মুগ্ধতাই গল্পের সমাপ্তিকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলে। সেই প্রসঙ্গে আমরা আসব; কিন্তু তার পূর্বে উল্লেখ করতে হয় প্রতিকূল পরিস্থিতির বিপরীতে কথক এবং নিমাইয়ের প্রথমে প্রতিরোধ তারপর প্রতিআক্রমণের প্রসঙ্গটিকে। গল্পের প্রায় সূচনার দিকে দুজন রিকশাওয়ালা(যারা কথক ও তার দুই সঙ্গীকে স্টেশনে পৌঁছে দেয়) কথক ও তার দলের কাছে ন্যায্য ভাড়ার থেকে অতিরিক্ত আট আনা করে পয়সা দাবি করলে তাদের এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখি আমরা। চা খাওয়ার জন্য রিকশাওয়ালা দুজনের অতিরিক্ত টাকা চাওয়ার অন্যায় আবদার কথক সোজাসুজি 'তোমরা চা খাবে বলে আমরা পয়সা দেব কেন! আর দিলেও আমাদের ভিক্ষে দেওয়া পয়সায় হঠাৎ চা খাবেই বা কেন, লজ্জা করবে না!—যাকগে জ্ঞানের কথা, এই পথের যা প্রকৃত ভাড়া তা-ই দিয়েছি, অতিরিক্ত চায়ের পয়সা-টয়সা হবে না'[৩১] বলে নাকচ করে দেন, যেখান থেকে তার অনমনীয় ও আপোষহীন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কথক এবং সেইসঙ্গে নিমাইয়ের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও নির্ভীক স্বভাবের পরিচয় এরপরও আমরা পাই, তাদের 'দার্জিলিং মেল'-এ সিট অধিকারের মতো জটিল আবর্তে পড়ে তার মোকাবিলার মধ্য দিয়ে। গল্পে দেখি, অন্যদের মতো স্থানীয় কুলি এবং বেআইনিভাবে অন্যান্য সিট দখলকারীদের অন্যায় আধিপত্যের কারণে কথকের দলটিকে ট্রেনের টিকিট থাকা সত্ত্বেও বসবার জায়গা সুনিশ্চিত করার জন্য এদেরই শরণাপন্ন হতে হয়। গুহ পদবিধারী এক ব্যক্তির সঙ্গে তিনটে বাঙ্কের বন্দোবস্ত করে

কথক এবং নিমাই 'দার্জিলিং মেল' ছাড়ার অনেক আগে থেকে সাইডিংয়ে এসে সিট দখল করতে সক্ষম হয় ঠিকই; কিন্তু সেই সিট নিয়েই পরে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে কথকের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে ওঠে! আসলে সিটের কারবারের সঙ্গে যুক্ত একজন ছেলে কথক এবং নিমাইকে তাদের অধিকৃত সিট দুটি ছেড়ে বাঙ্কে উঠে বসতে বললে কথক আপত্তি জানায় এভাবে:

> ...টিকিট কেটে কষ্ট করে সাইডিংয়ে এসে সেই কখন থেকে ট্রেনে উঠে বসে আছি। ভদ্রলোককে টাকা দিয়েছি। আপনি তখনও আসেননি। ভদ্রলোকের বেকার ছেলে দু'পয়সা করে খাচ্ছেন বলে জায়গা দখল রেখে আপনাকে সাহায্যও করলাম, এখন বলছেন সীট ছেড়ে দিন!—কে আপনি? ট্রেনটা কি আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি?[৩২]

কথকের এই স্পষ্টভাষণ ছেলেটির আত্মসম্মানকে ঘা দিয়ে আক্রোশের জন্ম দেয়। তখনকার মতো ছেলেটি সেখান থেকে দু-একটি মৌখিক প্রত্যুত্তর করে('আপনি দেখছি উলটা-পালটা ডায়লগ দিচ্ছেন।...তার মানে ভালো কথায় কাজ হবে না, আপনারা গোলমাল চান।')[৩৩] চলে গেলেও পরে কথকের ওপর নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সদলবলে ফিরে আসে। এবং কথক একটু হালকা হওয়ার জন্য ট্রেন থেকে নেমে লাইন ধরে পায়চারি করতে থাকলে তাকে একা পেয়ে 'তিন-চারটে ছায়ামূর্তি' ঘিরে ফেলে। আত্মরক্ষার জন্য কথক যাত্রীবাহী যে কোনও একটি কামরায় ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে দেখে, দরজা-জানলায় চাবি বন্ধ! ইতিমধ্যে একজন কথকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে 'এবার শুয়োরের বাচ্চা?—রঙবাজি!'[৩৪] বলে চিৎকার করলে 'অজান্তেই ধনুকের ছিলার মতো টান পড়ে তার স্নায়ুতন্ত্রে'। পূর্বোক্ত ছেলেটির দ্বিতীয় কোনও শব্দ উচ্চারণের পূর্বেই কথক প্রথমে সরাসরি তার চোয়ালের ওপর ঘুষি চালায় এবং পরে সে গুছিয়ে ওঠার আগেই অসম্ভব শারীরিক ক্ষিপ্রতায় 'হপ-স্টেপ অ্যাণ্ড জাম্পের' মতো লাফিয়ে চকিতে লাথি মারে ছেলেটির চিবুকে। অসম সাহসের সঙ্গে কথক একজনের আক্রমণ 'ট্যাকল' করতে পারলেও অন্য দুটি 'হিংস্র ছায়াশরীর' তাকে উলটে ফেলে দেয়। আর ঠিক তারপরই তাদের মধ্যে একজনের দ্বারা রডের আঘাতের শিকার হতে চলা কথককে আড়াল করে দাঁড়ায় তার চেনা একটা 'দীর্ঘ কালো শরীর'। নিমাইয়ের বিদ্যুৎগতি শরীর চালনায় আক্রমণকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। বস্তুত ধারালো ভোজালি হাতে নিমাইয়ের 'ঠাণ্ডা' অথচ নির্ভীক উচ্চারণ—'ল্যাজে পা দিলে আই বিকাম ম্যানইটার—একদম খেয়ে ফেলে দেব'[৩৫] পূর্বোক্ত দলটির ভিত নাড়িয়ে দেয়, যার ফলে পালাতে বাধ্য হয় তারা। সিটের অধিকার নিয়ে এই লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত জয় হয় কথক ও নিমাইয়েরই। তবে এখানেই গল্প শেষ হয় না; এরপরও পাঠকের জন্য অপেক্ষা করে একটি চমক। ঘড়িতে যখন আটটা চল্লিশ, কথকের শরীর চালনার 'ভয়ঙ্কর' উত্তেজনা যখন স্বস্তিতে পরিবর্তিত হচ্ছিল আর সেইসঙ্গে "বাইরের বিশৃঙ্খল ছবিটা পেছনে ফেলে 'ফোর্‌টি ফোর ডাউন'"[৩৬] ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করে, তখন

কথক নিজের সিট (যে সিট নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করে অর্জন করা)-এ বসতে গিয়ে সেখানে 'হলদে পাড়, খয়েরি তাঁতের শাড়ির আঁচল আলতো ভাবে জড়িয়ে আসনপিঁড়ি হয়ে'[৩৭] একটি 'ঝকঝকে' মেয়েকে বসে থাকতে দেখে। মেয়েটি কথকের ইতস্ততভাব লক্ষ করে তার জায়গায় বসে পড়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলে মদের গন্ধ না পায় এমন দূরত্ব রেখে কথক মুখটা অন্যদিকে কাত করে মেয়েটিকে বলে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি বসুন; ওপরে আমার জায়গা আছে।'[৩৮] কথকের এই কথায় নিমাই এবং আলো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, যার অর্থ সচেতন পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না। বাস্তবিক এক দুঃসাহসিক লড়াইয়ের মাধ্যমে অধিকার করা নিজের সিট অবলীয়ায় পূর্বোক্ত নারীকে ছেড়ে দিয়ে কথক বলেন, ' আমি বাঙ্কের ওপর উঠে ব্যাগে মাথা দিয়ে টানটান শুয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম ঘুম আসবে।'[৩৯] এভাবেই ব্যঞ্জনার মাধ্যমে গল্প শেষ করেছেন চিত্ররথ দত্ত।

আলোচনার পরিশেষে বলতেই হয়, সত্তরের দশকের অধিকাংশ বাংলা ছোটগল্পে যেখানে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে সংলগ্ন করে যুবকদের প্রতিবাদী, উগ্র অথবা হতাশ ছবি চিত্রিত হয়েছে, সেখানে সমসময়ে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত অভ্র রায়ের 'শীত বসন্তের দিন' এবং চিত্ররথ দত্তের 'ফোর্‌টি ফোর ডাউন' গল্প দুটি সত্তরের নিরিখে তাদের বিষয়বস্তু এবং সেখানে প্রতিফলিত যুবমানসের অনন্যতায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১. সুমিতা চক্রবর্তী, ছোটগল্প: সত্তর-আশির দশক, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, তৃতীয় মুদ্রণ: আগস্ট, ২০১৬, পৃ. ৭৭।

২. তদেব।

৩. শ্রাবণী পাল, বাংলা ছোটগল্পের ধারা: বিশ শতক শীর্ষক ভূমিকা, শ্রাবণী পাল সম্পাদিত বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: মে ২০০৮, পৃ. পঁচিশ।

৪. অভ্র রায়, নিজের লেখা না-লেখা, সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৪, পৃ. ১২২।

৫. দ্র. লেখক পরিচিতি, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও সমরেশ বসু সম্পাদিত (সহযোগী সম্পাদক: সমরেন্দ্র দাস) স্ব-নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প, দ্বিতীয় খণ্ড, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃ. ৬৩৬।

৬. ''বেশ মনে আছে। সম্পাদক সাগরময় ঘোষ সেদিন নবীন লেখককে ডেকে খুবই উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তোমার লেখাটা পড়েছি, খুব ভালো! আরও লেখো—' প্রশ্রয় পেয়েছিলাম শ্রীবিমল করের কাছেও। এক সন্ধেয়

আমাকে আলাদা ডেকে দীর্ঘ সময় ধরে, বিমলদার সেই লেখাটার আদ্যন্ত বিশ্লেষণ ও সমালোচনা আজও ভুলতে পারি না। হয়তো কোনওদিনই পারব না। নতুন একজন লিখিয়ের কাছে এর চেয়ে উত্তেজনাকর এবং চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা আর কী হতে পারে!", অভ্র রায়, গল্প লেখার সুখ দুঃখ, তাপস ভৌমিক সম্পাদিত করোক সাহিত্য পত্রিকা, শারদীয় ১৪১২, পৃ. ১৮৯।

৭. অভ্র রায়, পূর্বোক্ত দেশ সাহিত্য সংখ্যা, পৃ. ১২৩।
৮. তদেব।
৯. দ্র. লেখক পরিচিতি, পূর্বোক্ত স্ব-নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প, পৃ. ৬৩৬।
১০. অভ্র রায়, শীত বসন্তের দিন, দেশ পত্রিকা, ৬ চৈত্র ১৩৮২, পৃ. ৫৩৯।
১১. তদেব, পৃ. ৫৪৮।
১২. তদেব, পৃ. ৫৪০।
১৩. তদেব।
১৪. তদেব, পৃ. ৫৩৯।
১৫. তদেব।
১৬. তদেব, পৃ. ৫৪০।
১৭. তদেব।
১৮. তদেব, পৃ. ৫৪২।
১৯. তদেব, পৃ. ৫৪৩।
২০. তদেব, পৃ. ৫৪৪।
২১. তদেব।
২২. তদেব, পৃ. ৫৪৫।
২৩. তদেব, পৃ. ৫৪৬।
২৪. তদেব, পৃ. ৫৪৮।
২৫. দ্র. প্রভাতকুমার দাস সম্পাদিত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ১৪১০, পৃ. ৪৬১।
২৬. চিত্ররথ দত্ত, ফর্‌টি ফোর ডাউন, দেশ পত্রিকা, ১৩ চৈত্র ১৩৮২, পৃ. ৬১১।
২৭. অমিতাভ দাস, আখ্যানতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ: মার্চ ২০১৪, পৃ. ৭৫।
২৮. চিত্ররথ দত্ত, ফর্‌টি ফোর ডাউন, পূর্বোক্ত, দেশ পত্রিকা, পৃ. ৬১১।
২৯. তদেব, পৃ. ৬১২।
৩০. তদেব, পৃ. ৬২১।
৩১. চিত্ররথ দত্ত, ফর্‌টি ফোর ডাউন, পূর্বোক্ত, দেশ পত্রিকা, পৃ. ৬১১।
৩২. তদেব, পৃ. ৬২৪।
৩৩. তদেব।

৩৪. তদেব, পৃ. ৬২৫।
৩৫. তদেব।
৩৬. তদেব।
৩৭. তদেব।
৩৮. তদেব।
৩৯. তদেব।

কবিতার অস্তিত্বে জীবনের খোঁজ

দীপক কুন্ডু
সহকারী অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ
বঙ্কিম সর্দার কলেজ

এদেশেতে কেউ নয় আপনার
সকলি তোমার অচেনা
ধীরে ধীরে বেয়ে যাও তরী
তীরে বেঁধ না

শিলাজিৎ তাঁর একটি গানে আমাদের এমনটাই শোনালেন। নিজের অস্তিত্বের খোঁজে নিজেকেই সামিল হতে হয়। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকার বাসনা কার না থাকে, কিন্তু যদি পূরণ না হয় তাহলে কি হাল ছেড়ে দিয়ে তরীটাকে ঘাটে বেঁধে দেব। এটি মনে হয় ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়। নিজের তাল লয় ছন্দে ধীরে ধীরে বয়ে যাওয়াটাই জীবন। কবি সুবল কুমার মাইতি তাঁর "একই বীণায় বহু সুর' কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতাতে পিছিয়ে পড়া মানুষদের শক্তি জোগালেন। তিনি 'সওলা' কবিতায় বলছেন-

হাটের শেষে হাটুয়ারা ঘরে ফেরে-

লোনা মাটির বাঁধের ওপর বাবলা গাছের সারি
তারই নিচ দিয়ে, এক পশলা বৃষ্টির পর
পড়ন্ত বিকেলে আকাশ পরিচ্ছন্ন, অস্তমিত সূর্যের
রক্তিম আভা ফুলের উপর; লোনা মাটির
সোঁদা সোঁদা গন্ধ, বাবলা ফুলের মৃদু সুবাস।

কবি সুবল কুমার প্রথম লাইনে জটিল একটি দিকের কথা বললেন। হাটের শেষ বলতে তিনিএই পৃথিবীতে এসে নানা রকম কাজকর্ম করাকে হাটের কথা বলছেন। একদিন সবাই ঘরেফেরে মানে মৃত্যুবরণ করে। তবে পরমুহূর্তেই তিনি আবার প্রকৃতির কাছে ফিরে এলেন।পরের পাঁচটি লাইনে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে মিশতে চাইলেন। মাটির কাছাকাছি গেলেন। কোনও

অবস্থায় কবির পিছু ছাড়ে না জটিল তত্ত্বের হিসাব। প্রকৃতির কাছে ফিরতে চেয়েও থাকতেপারলেন না সেখানে।

মাথায় ঘুরপাক খায় সংসারের অর্থনীতির জটিল পরিসংখ্যান। চিন্তার জট খুলতে না খুলতেই উঠোনে হাজির- সেখানে প্রতীক্ষারত কিছু জীবন কবি বুঝতে পারছেন না তিনি কি ভাবে সংসার চালাবেন। কেমন করে চলবে তার পরিবার। এমন সময় নিজের উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছেন। কবি সম্বিৎ ফিরে দেখেন সকলেই তার সামনে। তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না, কেননা-

তাদের চাই অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা
মাথা গোঁজার ঠাঁই, কিঞ্চিৎসুখ
সঙ্গে কিছু স্বপ্ন।

এসব পুরন করার সাধ্য কবির নেই। তিনি চেষ্টা করেছেন সেগুলো মেটানোর। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। ভাবছেন পৃথিবীর এই হাটে তিনি কতদিন টিকবেন। টিকে থাকতে পারবে কি তার পরিবার। তাই কবি সুবল কুমার একটি প্রশ্ন রেখে কবিতার শেষ করেছেন-

কিন্তু সব হাটুয়ারা কি
পারবে, পৃথিবীর হাট থেকে এসব সওদা করতে?

এমন প্রশ্ন যখন উঠে আসে কবির মনে তখন যন্ত্রণা তীব্র আকার ধারন করে। 'জ্বালা' কবিতায় দুঃখ নিয়ে বলছেন-

বুকের ভেতর আগুন আছে
সেই আগুনের ভাষা নেই
দহন আছে প্রতিক্ষণে
বোঝার কোন উপায় নেই

কবি প্রতি মুহূর্তেই দগ্ধিত হচ্ছেন, কিন্তু দহনের ধিকি ধিকি জ্বলার যন্ত্রণা কবি কাউকে বোঝাতে পারছেন না। নিজেও যে সব সময় বুঝতে পারছেন এমন নয়। আগুনে প্রতিমুহূর্তেই তিনি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছেন। সাগরের সব জল ঢেলে দিলেও এ আগুন নেভে না। বুক চাপা কষ্ট নিয়ে বললেন-

উজাড় করে সাগর পানি
ঢাললে তবু নেভে না যে
জীবন নিয়ে শান্ত হবে
না হলে আশা মিটবে না যে

আগুন তো জীবন নেয়, এটা আমাদের সবার জানা। কবি বলতে চাইছেন আগুন জীবন নিয়ে শান্ত হবে, সেটা তো সম্ভব নয়। এখানে বুঝতে পারি কবি এতটাই দগ্ধিত হচ্ছেন, অসহনীয় যন্ত্রণায় তিনি ভাবছেন সে যেন আমার জীবনটা নিয়েই শান্ত হবে।

সবই ছিল হৃদয় মাঝে
ঝরলে বারি একটুখানি
মিটত যেমন মনের আশা
নিভেও যেত আগুন খানি

সকলের সঙ্গে থাকার যে সুখ আহ্লাদ, সেটা ক'জনের জীবনে জোটে? কবি পরিবার থেকে আলাদা হয়ে কখনও থাকতে চাননি। যখনই সকলে কবিকে আলাদা করে দিয়েছে তখনইদুঃখে তিনি ভেঙে পড়েছেন। তিনি বলছেন -

সবই ছিল হৃদয় মাঝে

ঝরলে বারি একটুখানি
মিটত যেমন মনের আশা
নিভেও যেত আগুনখানি

এই পর্যন্ত এসে বুঝতে পারি কবির পরিবার কবিকে ভালোভাবে নেয়নি। যদি নিতেন তাহলে তিনি বলতেন না, সাগরের সব জল দিলেও আমার আগুন নেভে না। কিন্তু পরিবারে কেউ যদি একটু কবির জন্য দুঃখ বোধ করত, কাঁদত তবেই সব যন্ত্রণা মুছে হাসি দেখা দিত চোখে মুখে। কবি সুবল কুমার এজন্যই বলেন হৃদয়ের মাঝে তিনি সকলকে রেখেছিলেন। সবাইকে নিজের এবং আপনার ভাবতেন। কিন্তু যারা কবির হৃদয় মাঝে ছিল তাদের হৃদয় মাঝে কবি ছিলেন কি? মনে হয় না। যদি থাকতেন তাহলে কবি এগুলো বলতেন না-

সব মানুষের হৃদয় আছে
বোঝার কোন উপায় নেই
মন্দ-ভালোর দুনিয়াতে
চোখের জলের শেষ যে নেই

সব মানুষের হৃদয়ের সজাগ অনুভূতি থাকে কি না বোঝার উপায় নেই। ভালোমন্দের দুনিয়াতে সব মানুষের হৃদয় থাকে না। তাই যাদের চোখের জলের জন্য কবির হৃদয় জুড়াতো বলে মনে হয়, তাদের হৃদয় ও চোখের জল শুকনো। কবির কাছে তাদের হৃদয় আজ মৃতপ্রায়। সেজন্য কবিকেই আজ চোখের জল ফেলতে হয়। এ চোখের জলের শেষ নেই। কবির দুঃখ যেন অন্তহীন। কবি সুবল কুমার সকলের সাথে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছেন। বন্ধু হতে চেয়েছেনসবার। 'বন্ধু' কবিতায় তাঁর বক্তব্য-

বন্ধুর পথে চলতে চলতে বন্ধু হতে
চেয়েছিলাম, শত্রু ভেবে নিলে
হৃদয়-কমলের শুভ্র কুঁড়িতে রক্ত দিয়ে
ভালোবাসার গান লিখেছিলাম,
কীটদংষ্ট্রা ভেবে ছিঁড়ে ফেলে দিলে

বন্ধু করে নেওয়ার পথটা কবির কাছে সোজা ছিল না। কিন্তু সেই দুরূহ পথের মধ্যে বন্ধু হতে চেয়েছিলেন। তবে কবিকে তারা বন্ধু ভেবে নেয়নি, নিয়েছে শত্রু ভেবে। সকলকে নিয়ে একসাথে বাঁচার জন্য ভালোবাসার একটা গান লিখেছিলেন, সে গানটাও তাদের মনঃপুত হল না। সেটাও ছিঁড়ে ফেলে দিল। কবি যেন কোনওভাবেই সকলের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিতে পারছেন না। প্রতি পদক্ষেপেই হেরে যাচ্ছেন। বাস্তবের কঠিনতা কবির পিছু ছাড়ে না। বলে ওঠেন-

জীবনটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে বাস্তবের কঠিনতা
থামে না ঋতুচক্রের আসা-যাওয়া
জ্ঞানেন্দ্রিয়ে অনুভূত হয় মৃত্যুর গভীরতা।

মৃত্যুর গভীরতাকে তিনি যেমন আহ্বান করেছেন তেমনই আবার মৃত্যু থেকেও দূরে থাকতে চেয়েছেন। সারা জীবন বেঁচে থাকতে চেয়েছেন প্রিয়তমার বুকে। 'আত্মার আত্মীয়' কবিতায় তিনি বলছেন পৃথিবী থেকে চলে গেলেও তিনি দুঃখ পাবেন যদি সারা সময় তাঁর অন্তরের মানুষের কাছে বেঁচে থাকেন। আবার 'আপনজন' কবিতায় তিনি ঘুমাতে ভয় পাচ্ছেন কেননা ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে প্রিয়তমাও যদি অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ভোরের পাখিরা ডাক দিয়ে যায়
আমি একা জেগে রই-
যদি তুমি কোন এক ক্ষণে এসে
ঘুমন্ত দেখে ফিরে যাও অভিমানে

কবির ভয় তিনি কারও মনে জায়গা করে নিতে পারেননি। প্রতি মুহূর্তেই ভেবেছেন সকলে যেন তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। মনের মাঝে ঝড় ওঠে, রক্ত আর মাংসের মধ্যে গরম প্রবাহ প্রবাহিত হয়। কল্পনার জালে অনেক স্মৃতি হাতড়ে বেড়ান কিন্তু তল খুঁজে পান না। কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায় তিনি শুধু দুঃখ বোধ করেছেন। বিষাদে মন ভারাক্রান্ত করেছেন এই পৃথিবী ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে বলে।

হারিয়ে গেছে জীবন আমার
সব স্বপ্ন ভালোবাসাও
ছুটির ঘণ্টা পড়বে এবার।

কবি সুবল কুমার মাইতি নিজেকে খুঁজে বেড়িয়েছেন তার কবিতার মধ্যে। কোথাও যেন তিনি নিজে স্থিত হতে পারেননি। তিনি বেঁচে থাকতে চেয়েছেন তার আপনজনদের কাছে, এই পৃথিবীর কাছে। শিলাজিৎ একটি গানে বলছেন- "জানি না সাঁতার, কি উপায় আমার"। এই উপায় মনে হয় কারোর জানা থাকে না, তাই 'বুনো ফুল' কবিতায় কবি বলেন-

একদিন অলক্ষ্যে গেল ঝরে
পড়লও না কারুর চোখের জল।

কবি অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে প্রিয়জনদের কাজকে দেখেছেন এবং নিজেকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। নিজের অস্তিত্বের খোঁজে নিমজ্জিত থেকেছেন তাঁর বেশিরভাগ কবিতায়।

বিংশ শতকে ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে টেস্ট টিউব বেবির উদ্ভব ও বিকাশ

কৌশিক কুন্ডু
স্নাতকোত্তর, ইতিহাস বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে চিকিৎসা শাস্ত্রেও বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে বিংশ শতকে। সমসাময়িক পর্বে স্বাধীনতার পর এমনই এক আবিস্কার গোটা বিশ্বে আলোরন ফেলেছিল, আর এই আবিষ্কারটি ছিল ‘টেস্ট টিউব বেবি’ বা ‘আই ভি এফ’ পদ্ধতি। ১৯৭৮ সালে বিশ্বের প্রথম সফল টেস্ট টিউব বেবি লুইস ব্রাউনের জন্মের ঠিক ৬৭ দিন পর বিশ্বের দ্বিতীয় তথা ভারতের প্রথম টেস্ট টিউব বেবির জন্ম হয়েছিল। ভারতে এই সাফল্য এসেছিল যার হাত ধরে তিনি হলেন – ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সেই সময়ে দারিয়ে পাশ্চাত্য দেশ গুলির মত চিকিৎসা পরিকাঠামো না হওয়া সত্ত্বেও এই আবিস্কার বহু নিঃসন্তান মায়ের মুখে হাসির কারন হয়ে দারিয়েছিল। টেস্ট টিউব কথাটি সংক্ষিপ্ত হলেও এই গোটা পদ্ধতিটা তেমনটা ছিল না। এই আবিস্কার সেই সময়ের সমাজে ও চিকিৎসা মহলে এক বিতর্কিত বিষয় হয়ে দারিয়েছিল, ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের এই সাধনাকে ভারতের নামিদামি ডাক্তারদের দল ভোকাস, অবাস্তব বলে আখ্যায়িতি করেছিল। এই রুপ চিন্তা ও মন্তব্যের অন্যতম কারন হল তাদের ব্যর্থতা, অবশেষে এই আবিস্কারের পরিনতি ও প্রাপ্তি হিসাবে বিশ্ববাসী পেয়েছিল এক যুগান্তকারী উদ্ভবকের মৃত্যু।

মূলশব্দ: চিকিৎসা বিজ্ঞান, টেস্ট টিউব বেবি, আই ভি এফ, ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

সত্তরের দশকে স্বাধীন ভারত তথা এশিয়ার প্রথম সফল টেস্ট টিউব বেবির জন্ম হয়েছিল। আধুনিক সময়কালের পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার দ্বারা ১৯৭৮ সালে ২৫শে জুলাই ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার শহরের ওল্ডহাম জেনারেল হাসপাতালে মধ্যরাতে সিজারিয়ান সেকশনের সাহায্যে জন্ম হয়েছিল ৫ পাউন্ড ১২ আউন্স ওজনের এক শিশুর, তিনি হলেন বিশ্বের প্রথম টেস্ট টিউব বেবি লুইস ব্রাউন।[১] বিশ্বের এই প্রথম টেস্ট টিউব বেবির সংবাদ ইংল্যান্ডের সমস্ত সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে এবং সেখানে বলা হয় যে অন্যান্য স্বাভাবিক বাচ্চাদের মতো ছিল লুইস।[২] ঠিক একই পদ্ধতিতে ভারতে তথা এশিয়ার মধ্যে প্রথম টেস্ট টিউব বেবির জন্মের কথা জানা যায় বিশ্বের প্রথম টেস্ট টিউব বেবির জন্মের ঠিক ৬৭ দিন পর, এবং এই

খবর প্রথম প্রকাশ করে 'Calcutta Doordarshan'।[৩] যা গোটা দেশে হইচই ফেলে দিয়েছিল, তৎকালীন সময়ে দাড়িয়ে ভারতের সমাজে এই রুপ আবিস্কার সকলকেই অবাক করেছিল।

IVF বা টেস্ট টিউব হল - একটি আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি যেটার সাহায্যে কোন দম্পতির শারীরিক অক্ষমতার কারণে বা অন্য কোনো কারণে স্বাভাবিকভাবে গর্ভধারণ সম্ভব হয় না এবং সে ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির মাধ্যমে শরীরের বাইরে কৃত্রিম পদ্ধতিতে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু নিষিক্তকরণ করে তা সর্বশেষে আবার মাতৃজঠরে প্রবেশ করানো হয়।[৪] স্ত্রী জননাঙ্গের অন্যতম প্রধান অংশ হল ডিম্বাশয় (ovary) এখান থেকেই ডিম্বাণুর নিঃসরণ হয়। আমাদের মস্তিষ্কের ঠিক নীচে এবং চোখের পেছনে আছে পিটুইটারী গ্রন্থি। এখান থেকে উৎপন্ন হয় ফলিকেল স্টিমুলেটিং হর্মোন ও ফিউটেনাইজিং (Leutanizing Hormone), এদের প্রভাবে ডিম্বাণু তৈরি ও পরিণত হয়। মাসিকের মোটামুটি মাঝামাঝি সময়ে সাধারণত যে কোন ডিম্বাশয় থেকে মাত্র একটি ডিম্বাণু নিঃসরণ হয়। ঐ ডিম্বাণু ফ্যালোপিয়ান নল বেয়ে চলে আসতে থাকে ইউটেরাস (Uterus) বা জরায়ুর দিকে। এই সময়ে যদি শুক্রাণুর সঙ্গে ঐ ডিম্বাণুর মিলন হয় তবেই সৃষ্টি হয় – ভ্রূণকোষ (Zygote)। এই ভ্রূণকোষ এরপর আশ্রয় নেয় গর্ভাশয়ে। এখানে চলে তার পুষ্টি ও বৃদ্ধি। পূর্নাঙ্গ শিশু জন্ম নেয় এর প্রায় চল্লিশ সপ্তাহ পরে।[৫] কিন্তু বাস্তবে বিষয়টা এতোটাও সহজ ছিল না, কারন বিংশ শতকে দারিয়ে পাশ্চাত্য দেশ গুলির ন্যায় ভারতের সমাজে শিক্ষার হার ছিল অনেক পার্থক্য, চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়ে উন্নত সামগ্রি, ওষুধ ও প্রযুক্তি কোনটাই সেইভাবে ছিল না।[৬] আগেকার দিনে সন্তান প্রসব অনেক সহজ ও সরল ছিল। কারন বিশ বছর আগেও কলিকাতা শহরে সন্তান প্রসবে সাহায্যের জন্যে অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত ধাইয়ের প্রচলন ছিল। মাত্র দুই বা চার টাকায় এদের পাওয়া যেত। একথা ঠিক যে, সে যুগে শিশু মৃত্যুর হার ও প্রসবের সময়ে মায়েদের মৃত্যুর হার বেশী ছিল।[৭]

একথা মনে রাখতে হবে যে, সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত সমাজে সিজারিয়ান শিশুর সংখ্যা অতি দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল। হয়তো কিছুকাল পরে দেখা যাবে, মেয়েদের সন্তান প্রসব উদরের অস্ত্রোপচার ছাড়া সম্ভব নয় পূর্বসূরি সিজারিয়ানের অসুবিধা ও ভয়ে তখন হয়তো মেয়েরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পরিমিত ক্ষুদ্র সংসারের জন্যে সর্ব্বে চেষ্টা করবে। এই সকল দিক ভেবে দেখলে মনে হয় মানব সভ্যতার প্রগতির ফলে একদিন টেস্ট টিউব বেবির বিশেষ প্রয়োজন হবে।[৮] বন্ধ্যাত্বের অনেক কারণ হতে পারে,তবে কয়েকটা অসুখে যদি ফ্যালোপিয়ান নল একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, তবে সুস্থ ও স্বাভাবিক ডিম্বাশয় বা গর্ভাশয় থাকা সত্ত্বেও মহিলারা সন্তান ধারণে অক্ষম হন এমন সম্ভাবনা সকল বন্ধ্যাদের প্রায় পনেরো থেকে বিশ শতাংশ দেখা যায়। শল্যচিকিৎসায় ফ্যালোপিয়ান নলের অংশটুকু কেটে বাদ দিয়ে দু-পাশের সহিত অংশ দুটো পাশাপাশি

জুড়ে (side to side anastomosis) দেবার চেষ্টা করা হয় আশা থাকে ফ্যালোপিয়ান নল স্বাভাবিক হবে। কিন্তু বাস্তবে এমন অপারেশানে সাফল্যের হার খুব একটা বেশী হয় না। আবার কখনো কখনো অনেকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ফ্যালোপিয়ান নলটি বন্ধ থাকে। বিজ্ঞানীরা আশা রাখে ফ্যালেপিয়ান নল প্রতিস্থাপনে এই সমস্যা সমাধান করা যাবে (Fallopian Tube Transplantation) এ কাজে এখনো সফলতা আসেনি। অবশ্য তেমন আশানুরূপ অনেক দিন ধরেই বন্ধ ফ্যালোপিয়ান ভালো করার জন্য সৃষ্ট বন্ধ্যাত্বের সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীরা ভেবে আসছিলেন। যদি ডিম্বাণুকে শরীরের বাইরে শুক্রাণুর সঙ্গে মিলন ঘটানো যায় (Fertilization) আর তা আবার মাতৃজঠরে স্থাপন করা হয় তবে ফ্যালোপিয়ান নলের এই বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হবে।[৯] শরীরের বাইরে নিষেক ও প্রাণকোষ স্থানান্তরকরণে (in vitro fertilization embryo transfer) সর্বপ্রথম সফল হন ইংলাণ্ডের দুই ডাক্তার - ডাঃ প্যাট্রিক স্টেপটো ও ডাঃ রবার্ট এওয়ার্ডস। বিশ্বের প্রথম নলোজাতকের জন্ম হয় ২৫ শে জুলাই ১৯৭৮ লন্ডন শহর থেকে দেড়শো মাইল দূরে ওলহাম হাসপাতালে। শিশুটির নাম হল লুইস ব্রাউন। মা লেসলী ব্রাউনের দুটো ফ্যালোপিয়ান নালি ছিল সম্পূর্ণ ছিদ্রহীন। ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণুর গর্ভাশয়ের দিকে যাবার রাস্তা ছিল সম্পূর্ণ রুদ্ধ। মাতৃজঠের বাইরে গবেষণাগারের কৃত্রিম পরিবেশে গর্ভাধান ঘটানো হল ১৯৭৭ সালে নভেম্বর মাসের দশ তারিখে। স্বাভাবিক হিসাব মত শিশুটির জন্ম হবার কথা ছিল ১৯৭৮ সালে আগস্ট মাসের ৪ তারিখে কিন্তু শেষমুহূর্তে অনাবশ্যক ঝুঁকি নিতে রাজী ছিলেন না এই দুই চিকিৎসা বিজ্ঞানী। তাই সিজারিয়ান সেকশনের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল।[১০]

ডাঃ মুখোপাধ্যাইয়ের কাছে যে অবাঙালি দম্পতির চিকিৎসারত ছিল তারাই টেস্ট টিউব বেবির জন্ম দিয়েছিলেন, তাদেরও দু-একটি সমস্যা ছিল। বিয়ের পনেরো বছর পর নিঃসন্তান থাকার পরেও এই দম্পতি সেই সুরাহা পেয়েছিলেন সন্তান লাভ করে। টেস্ট টিউব বেবির ক্ষেত্রে ডাঃ মুখোপাধ্যায় অবলম্বন করেছিলেন ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন, অর্থাৎ ডিম্বাণু ও শুক্রাণুকে শরীরে বাইরে কৃত্রিম পদ্ধতিতে নিষিক্ত করে, তা মাইনাস টেম্পারেচারের ঠান্ডায় রাখার বেশ কিছুদিন পরে মাতৃজঠরে প্রবেশ করানো হয়েছিল। তবে যতটা সহজে বললাম, ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ ততটা সহজ ছিল না। এর জন্য প্রয়োজন ছিল কঠোর অধ্যবসায় আর দীর্ঘদিনের পরিশ্রম।[১১] এই ক্ষেত্রে রোগিণীর ফ্যালোপিয়ান টিউব ব্লক থাকায় স্বাভাবিক পদ্ধতিতে মা হওয়া অসম্ভব ছিল। ১৯৭৮ সালে কন্যা সন্তান জন্মনোর বহু আগে থেকেই ১৯৭৪ সাল থেকে চলছিল তাঁর চিকিৎসা, ডাঃ মুখোপাধ্যায়েরই তত্ত্বাবধানে চিকিৎসার মোটামুটি মূল পর্যায়ে এসে গরথমে তাঁকে এইচএমজি (হিউম্যান মেনোপোজাল গোনাডোট্রপিন) হরমোনের ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। অর্থাৎ হিউম্যান গোনাডোট্রপিন হরমোন ওভারিয়ান স্টিম্যুলেশনের জন্য। যা আজকালকার দিনে খুবই সাধারণ, কিন্তু সত্তরের দশকের

কলকাতায় বসে তা ছিল রীতি মতো কল্পনাতীত। মাসিক ঋতুচক্রের তিন থেকে ন'দিনের মধ্যে একদিন অন্তর এএমজি দেওয়া হয় তারপর এগারো দিনের দিন দেওয়া হয় এইচসিজি (হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন) হরমোন। তখনকার দিনে আইভিএফের মাধ্যমে ওভাম (ডিম্বাণু) সংগ্রহ করাও ছিল যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। না ছিল কোনও স্বীকৃত পদ্ধতি, না ছিল সেরকম কোনও যন্ত্র, তাও আমাদের এই তৃতীয় বিশ্বের দেশে।[১৩]

ডাঃ মুখোপাধ্যায় সেক্ষেত্রে কয়েক মিনিটের একটি ছোট্ট অপারেশনের মাধ্যমে ওভারি থেকে খুব সহজে এই পদ্ধতিতে (যা ইতিপূর্বে করা হয়নি) ফ্লুয়িড সমেত পাঁচটি ডিম্বাণু সংগ্রহ করেন। পাঁচটি ডিম্বাণু (আদপে ফলিকল, কারণ ডিম্বাণু তো আর খালি চোখে দেখা বা বোঝা যায় না, ফলিকলের ভিতরেই ডিম্বানু থাকে) একসঙ্গে সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য কোনও কারণে যদি একটি নিষিক্ত করা না যায়, তবে হতাশ হতে হবে না। এরপর নিমেন সংগ্রহ করে তা ভালো করে দুবার পরিছন্ন করা হয়। ইতিপূর্বে গৃহীত ফলিকিউলর ফ্লুয়িড সমেত ফলিকলের সংগ্রহটি স্পার্মাটোজোয়াল সাসপেনশন (সংগৃহীত সিমেন) এর মধ্যে মিশিয়ে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ইনকিউটেরে রাখা হয়। এরপর বেশ কিছু বিশেষ কেমিক্যাল ব্যবহারের পর তিনদিন ধরে ইনকিউবেটরে ৩৭ ডিগ্রি ব্যবহারের পর তিনদিন ধরে ইনকিউবেটরে ৩৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রাখা হয়। এরপর মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করে দেখা হয় জাইগোট গুলি থেকে (অর্থাৎ ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর নিষিক্তির পর তৈরি হওয়া জাইগোট) আর্টটি আকার বা তার বেশি ক্লিভেজ সেল বা কোষের তৈরি হয়েছে কিনা। ক্লিভেজ সেল মানে জাইগোট গুলি মাঝখান থেকে খোঁজ বরাবর সমানভাবে ভেঙে দুটি আলাদা কোষ তৈরি করে। অর্থাৎ এর থেকে বোঝা গেল ফার্টিলাইজেশন প্রক্রিয়া সফল। এরপর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে নামানো হয়। তারপরও কিছু বিশেষ কেমিক্যালের ব্যবহারের পর ফ্রোজেন ভ্রূণটি অ্যাম্পুলে ভরে অতি-হিমায়ন পদ্ধতিতে ৫৩ দিন পর্যন্ত রাখা হয় লিক্যুইড নাইট্রোজেনের মধ্যে। তারপর আরও কয়েকটি ধাপে তিনটি ভ্রূণ নিয়ে (সার্ভাইকাল ফ্লুয়িড সহ) মাইক্রোসিরিজ দিয়ে তা ইউটেরাসে সংস্থাপিত করা হয়। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় নিয়ে আসার পর। এরপর করা হয় পর্যবেক্ষণ, প্রথম ধাপেই আসেনি সাফল্য। শেষ ভ্রূণটি স্থাপিত করা হয় ১৯৭৮ সালের ২০ জানুয়ারি এরপরেই আসে বহু প্রতীক্ষিত গর্ভাবস্থা।[১৫] এবং সঠিক সময়ে সেই অবাঙালি মহিলা অর্থাৎ শ্রীমতী বেলা আগরওয়াল কন্যাসন্তান জন্ম দেন, ১৯৭৮ সালের ৩ অক্টোবর এ। দুর্গা ভারতের প্রথম নলজাতক শিশু সে সময়ে অনেকে মিডিয়াতে প্রশ্ন তুলেছিলেন ৫৩ দিন freeze করে রাখলে ভ্রূণ ৮ ইঞ্চি লম্বা হয়, তখন তা কী করে ইউটেরাসে implant হবে? কিংবা কলকাতার ঘন ঘন লোডশেডিং - এ রেফ্রিজারেটারে কী করে রাখা হল ? কেউ কেউ বললেন freeze করলে জেনেটিক

বদল হয়ে বিপদের সম্ভাবনা আছে। অথচ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত freeze করলে geneticchange বন্ধ হয়ে যায়।[১৪]

ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় একসঙ্গে পাঁচটি ফলিকল সংগ্রহ করেন এবং বায়োপ্রিজারভেশনে রাখেন অর্থাৎ মানবভ্রুণকে ইনকিউবেটরে (অতি - হিমায়ন পদ্ধতিতে) ৫৩ দিন পর্যন্ত রাখা হয়েছিল। ইতিপূর্বের টেস্ট টিউব বেবি লুইস ব্রাউনের জনক ডাঃ এডওয়ার্ডস ও স্টেপটোর সঙ্গে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের পার্থক্য ছিল ওঁরা কাচের টিউবের মধ্যেই শুক্রাণু দিয়েই ডিম্বাণু নিষিক্ত করেছিলেন, তার অল্প পরে তা ইউটেরাসে সংস্থাপিত করা হয়। কিন্তু ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের পদ্ধতি ছিল আলাদা, অর্থাৎ ৫৩ দিনের তরল নাইট্রোজেন ফ্লাস্কে রাখার পর নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মানবভ্রগকে সংরক্ষণ করে তাঁকে আবার স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এনে মাতৃজঠরে প্রবেশ করালে সন্তানহীনতার সমস্যা মিটবে। সেদিক থেকে দেখলে আমাদের বঙ্গসন্তান শুধু ভারতে কেন, সারা দুনিয়াতেই এই বিশেষ পদ্ধতিটি সর্বপ্রথম রণ ও প্রয়োগ করেছিলেন। সুতরাং এই পদ্ধতির নতুনত্ব ও অভিনবত্বগুলো পর পর সাজালে দাড়ায় - (১) সুপারওভিলিউশন অর্থাৎ একই ঋতুচক্রে অনেকগুলি ডিম্বাণু সৃষ্টি করা হরমোন এইচএমজি (হিউম্যান মেনোপজাল গোনাডোট্রপিন) ব্যবহার করা, (২) যোনিপথ দিয়ে ডিম্বাণু নিষ্কাশন করার সহজ ও নিরাপদ পদ্ধতির আবিষ্কার, (৩) ভ্রণকে হিমায়িত করে পরের খতুচক্রে সংস্থাপন করা। এই পদ্ধতিতে সাফল্যের হার অনেক বেশি।[১৫] বন্ধ্যাত্বের প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে বন্ধ্যাত্ব দু ধরনের। ১. প্রাথমিক (Primary), অর্থাৎ মহিলাটি আগে কখনও গর্ভধারণ করেননি, ২. গৌণ (Secondary) আগে হয়তো গর্ভধারণ করেছেন, বর্তমানে বন্ধ্যাত্ব দেখা দিয়েছে। দেখা গেছে মেয়েদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ্যাত্ব বাড়ে। পঁয়ত্রিশে গর্ভধারণ ক্ষমতা মোটামুটি কমে যায় সাঁইত্রিশে পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং চল্লিশের পর নাটকীয় ভাবে কমে। কারণ, বয়স বাড়লে ডিম্বাণুর প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে।[১৬] মানব প্রজনন গবেষণা সর্বদা বৈজ্ঞানিক এবং নৈতিক উভয় চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ ছিল যা প্রাথমিকভাবে বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছিল। যাইহোক, ১৯৬০ এবং ১৯৭০ - এর দশকে মানুষের oocyte fertilization - এর ঘটনা সম্পর্কে গবেষণা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে মানুষের pocytes - এর in vitro fertilization (IVF) সম্ভব হয়েছে।[১৭]

উপরোক্ত বিভিন্ন তথ্য আলোচনা মধ্যে দিয়ে আমরা দেখিছি যে নিঃসন্তান দম্পতির সন্তান লাভের জন্যে IVF চিকিৎসার পদ্ধতির কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস কে দেখলে অগ্রগতি যেমন লক্ষ্য করা যায়, ঠিক সময়ের সাথে সাথে সম্প্রতি অনেক নারীর মধ্যে বন্ধ্যাত্বের সমস্যা বেড়েছে তাও বিভিন্ন মেডিক্যাল রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায়। জীবনযাত্রার পরিবর্তনসহ অসংক্রামক রোগব্যাধি ও পরিবেশগত পরিবর্তনে বন্ধ্যাত্বের হার বাড়ছে।[১৮] সারা বিশ্বে এই হার ১০

থেকে ১৫ শতাংশ। বন্ধ্যত্বের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অনেক দম্পতি টেস্ট টিউব বেবি নিয়ে থাকেন। তবে সত্তরের দশক থেকে আজও অনেকেরই টেস্ট টিউব বেবি নিয়ে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। সাধারণ যেসব দম্পতির অনেক চেষ্টার পরেও সন্তান নিতে ব্যর্থ হন।[১৯] তাদের প্রথামিক অবস্থায় ওষুধের মাধমে চিকিৎসা দেয়া হবে। তারপর যদি না হয় তবে তাদের জন্য টেস্ট টিউবে বেবি নেয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকে চিকিৎসকেরা।[২০]

টেস্ট টিউব বেবি নিয়ে সমাজে অনেকের মনেই রয়েছে নানা রকম কুসংস্কার ও ভুল ধারণা রয়েছে। অনেকেই মনে করেন টেস্ট টিউব বেবির জন্ম হয় টেস্ট টিউবের মধ্যে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও অবাস্তব। টেস্ট টিউব বেবি কৃত্রিম উপায়ে জন্ম দেওয়া কোনো শিশু নয়। টেস্ট টিউব মূলত একটি চিকিৎসা পদ্ধতি, টেস্ট টিউব বেবির জন্ম হয় মূল্যবান একটি চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যম দ্বারা কাজেই কৃত্রিম উপায়ে এভাবে সন্তানলাভে ধর্মীয় বাধা থাকলেও এই ক্ষেত্রে কিন্তু টেস্ট টিউব বেবির বিষয়টিতে মোটেই তার কোনো ভূমিকা নেই, কারণ একজন স্বাভাবিক গর্ভধারিণীর জরায়ুতে বেড়ে ওঠা শিশুর জীবন প্রণালির ও টেস্ট টিউব বেবির জীবন প্রণালি একই।[২১] অনেকের মনে হতে পারে বা ধারণা -হতে পারে টেস্ট টিউব বেবিদের পরবর্তীকালে নানা রকম শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়, কিন্তু না চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, এমন হাজারো ভ্রান্ত ধারণা ছড়িয়ে রয়েছে বন্ধ্যত্ব চিকিৎসা নিয়ে। কলকাতার অন্যতম বন্ধ্যত্ব চিকিৎসা কেন্দ্র 'বার্থ' আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে চিকিৎসক গৌতম খাস্তগীর তিনি বললেন যে বন্ধ্যত্ব বিষয়টা একেবারেই জটিল নয় আর এটা যত না শরীরের রোগ তার থেকে বেশি মনের।[২২] বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার ক্ষেত্রে IVF সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি, এবং তা এতটাই যে অস্ট্রেলিয়ার সরকার বাকি পদ্ধতিগুলোকে তুলে দিয়েছে, শুধুমাত্র এটা রেখে। আইভিএফ ছ'বার পর্যন্ত চেষ্টা করা যেতে পারে। ডাঃ গৌতম খাস্তগীর জানিয়েছেন যে আমার কাছে নয়-দশবার এই চিকিৎসাপদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে এমন রোগীও রয়েছেন, আর এতে কোনও শারীরিক ক্ষতি হয় না। কিন্তু বয়স যত বাড়ে, তত প্রতিকূলতা বাড়ে, আই ভি এফ এর সাফল্যের হার ৫০-৬০ শতাংশ, আর IUI এর ক্ষেত্রে ১৫-২০ শতাংশ। মেয়েদের দেরি করে বিয়ে, স্বামী-স্ত্রীর চাকরির শিডিউলের ফারাক, ওভিলিউশনের সময়ে সহবাস না হওয়ায় সমাজ ক্রমশ এমন জায়গায় যাচ্ছে, আর এমন ভাবেই যদি চলতে থাকে তাহলে আগামী প্রজন্মের বাচ্চারা যে কৃথিম পদ্ধতি জন্মাবে এটা ভাবা ভুল হবে না, এবং এই বিষয়ের প্রতি সমাজের ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে প্রয়োজন এক মাত্র শিক্ষা ও সচেতনতা।[২৩]

স্বাধীনোত্তর ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যুগান্তকারী সৃষ্টি এক অমূল্য দান। তৎকালীন সময়ে ভারতের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি

ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অসামান্য কীর্তির স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছিল। তবে আধুনিক চিকিৎসার সরঞ্জাম ছাড়াই ইংল্যান্ডের সমতুল্য ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে টেস্ট টিউব বেবি বা আই ভি এফ পদ্ধতির যে আবির্ভাব তিনি ঘটিয়েছিলেন তা ছিল আরও আধুনিক। আলোচ্য সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা ডা. মুখোপাধ্যায়ের গবেষণাকে অবৈজ্ঞানিক ও ভিত্তিহীন বলা হলেও, পরবর্তীকালের ডা. টি. সি. আনন্দ কুমার, তাঁর গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, ভারতের প্রথম বৈজ্ঞানিক টেস্ট টিউব বেবির জনক ডা. সুভাষ মুখোপাধ্যায়। একটি কনফারেন্সে সর্বপ্রথম তিনি এটি প্রকাশ্যে বলেছিলেন এবং পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটিকে বৈধ বলে ঘোষণা করে। যা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন পথের দিশা এনে দিয়েছিল।

তথ্যসূত্র:

১. Katharine Dow, 'Looking into the Test Tube: The Birth of IVF on British Television', National Library of Medicine, Cambridge University Press, Vol-63(2), 2019, P-190

২. First 'Test Tube Baby' Louise Brown Turns 40: A Look Back| TODAY, https://youtu.be/xW5-CrIAwjs (Accessed on 4 June 2022)

৩. Dr. Mukherjee Subhas, Architect of Indian's First Test Tube Baby, edited by Prof. Sumit Mukherjee, Dr. S.C. Lodh, Dr. Subhas Mukherjee Memorial Repodctive Biology Research Centre, 2001, p. 104-105

8. Aditya Bharadwaj, 'The Indian IVF saga: a contested history', National Library of Medicine, Elsevier Ltd, Vol-2(2016), p.54-61.

৫. নিত্যগোপাল বসু, 'ভারতীয় সাফল্ : টেস্ট টিউব বেবি', *জ্ঞান ও বিজ্ঞান*, ৪০তম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৮৭, পৃ: ১৪৪

৬. ঐ, পৃ: ১৪৪-১৪৫

৭. রামনারায়ণ চক্রবর্তী, 'টেস্ট টিউব বেবি', *জ্ঞান ও বিজ্ঞান*, ২৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন, ১৯৭০, পৃ: ৩৪৬-৩৪৭

৮. ঐ, পৃ: ৩৪৬-৩৪৭

৯. Dow, *Ibid.*, P.192

১০. দোয়েল দত্ত, *টেস্ট টিউব বেবির উদ্ভাবক বিস্মৃতপ্রায় ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়,* কোলকাতা, গিরিজা লাইব্রেরী, ২০১৮, পৃ: ২৮-২৯

১১. Discussion with Dr. Alok Kumar Moulik , [MBBS, D.GO.M.S., FellowM.A.S(INDIA), Faculty – DNB(Gen. Surgery)] , Barasat : 14 July 2022.

১২. Dr. Srabani Mukherjee, Dr. Rajvi H. Mehta, 'Dr. Subhas Mukherjee A visionary and pioneer ofIVE' ICMR – National Institute for Research in Reproductive Health, p.1-5.

১৩. Avlikant J. Dhawale, 'Dr. Subhas Mukherjee and India's First Test Tube Baby', Pharma Tutor Magazine, Vol- 2 (2012), P-101-103.

১৪. Mukherjee, *Ibid.*, p.104-109

১৫. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC61140213/ Accessed on 17 July 2022.

১৬. Mukherjee, Lodh, *Ibid.*, p.107

১৭. Bharadwaj, *Ibid.*, P.58-59 ২০.

১৮. *Amrita Bazar Patrika*, 7Oct, 1978, P.5-7

১৯. https://youtu.be/00sMj2D3YuQ Accessed on 23 July 2022.

২০. Moulik, *Ibid.*

২১. https://www.jugantor.com/lifestyle/134027/%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%AC-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%A4-%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE Accessed on 27 July 2022.

২২. ICMR – NIRRCH, *Ibid.*

কারুবাসনার অন্য নাম : মিলন মুখোপাধ্যায়ের 'মুখ চাই মুখ' উপন্যাস

ব্রজ সৌরভ চট্টোপাধ্যায়
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : জীবনানন্দ সেই কবেই বলেছিলেন, কারুবাসনায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা, সৃষ্টির অপরিসীম আনন্দ সত্যিই কি সবসময় পূর্ণতা দেয় সৃষ্টিশ্বরকে? সৃষ্টিকর, কারিগর কি আপামর পাঁচজনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা? শিল্পীমন আর সামাজিক মনের দ্বন্দ্ব কীভাবে সামলান একজন সাহিত্যিক, দার্শনিক, ভাস্কর কিংবা চিত্রকর? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুব সম্প্রতি খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেছি মিলন মুখোপাধ্যায়ের 'মুখ চাই মুখ' উপন্যাসটি থেকে।

শিল্পী বলতেই আমাদের চোখে ভাসে আপাত অগোছালো, বোহেনিয়ান, খাপছাড়া এক দৈনন্দিনতার ছবি। আগোছালো, কারণ আমরা পাগলামি আর প্রতিভার বিভেদ বুঝতে পারিনা। বোহেমিয়ান, কারণ আমরা যাকে স্থির বলে জানি, যাকে ছবি বলে বুঝি, শিল্পী তার মধ্যে খুঁজে পান গতিজাড্যের উন্মাদনা। আর খাপছাড়া? উপরোক্ত দুই বিশেষণের পরিণতি ছাড়া আর কীই বা বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো মিলন মুখোপাধ্যায় একজন শিল্পী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রকর। রেখা ও রং তাঁর জগৎ। দৃষ্টি তাঁর অনুভব আর অভিজ্ঞতা তাঁর ক্যানভাস।

সূচক শব্দ : মিলন মুখোপাধ্যায়, মুখ চাই মুখ, দেশ ও বিদেশ, শিল্পী, প্রেম, বিচ্ছেদ, ছবি।

মূল আলোচনা :

"যে শহরে অভিরাম দেবদেবীর পট আঁকে, সেখানে কারো কাছে তার পূর্বপরিচয় নেই।"[১] —চিত্রকরের কাছে প্যারিস হলো স্বর্গের নন্দনকানন, শুধুমাত্র চিত্রকরই বা কেন? যে কোনো শিল্পীর কাছেই প্যারিস আসলে তাই। 'মুখ চাই মুখ' আসলে স্বপ্নসন্ধানী এক বাঙালি যুবকের সেই প্যারিস বৃত্তান্ত। কপর্দকহীন ও প্রায় বন্ধুহীন, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পৃথিবী সম্বল করে লেখক-শিল্পী চড়ে বসেছেন উড়োজাহাজে— "বোম্বাই থেকে হাজার হাজার মাইল দূর উড়ে উড়ে চলে গেল একেবারে ইটালী। রোমে, সামান্য ভয়। ছাপিয়ে উত্তেজনাও।"[২]

উপন্যাসের কাহিনি মোটামুটি এখান থেকেই শুরু। তার গতি সরলরৈখিক নয়। ছবির রেখাগুলি যে বাঁকের সৃষ্টি করে, শিল্পীর আঁচড় যেভাবে ফুটিয়ে তোলে অভিব্যক্তিগুলি এই কাহিনিও তাই। স্মৃতিপটে ভিড় করে আসা উজান ভাঁটার কোলাজ।

'ক্যানভাস' যার নাম। ভূমিকা অংশে লেখকের তাই স্বীকারোক্তি—"উত্তাল নদীর মতো সেই শিল্পী কবিদের বহমান স্রোত থেকে কয়েকটি প্রতিভূকে তুলে আপন কল্পনার রংয়ে এঁকেছিলুম দশক দুই আগে।"[৩]

তাই কখনো রোজমারি, কখনো অর্চনা বিশ্বাস, জেরী, যিশু, অ্যানি, জর্জ জ্ঞানী কখনো দিগেনদা, দার্শনিক, ইভলীন, কখনো কলকাতার কফিশপ, দেশি মদ, সিগারেট, কখনো প্যারিস, প্যারিসের মোঁমাত্র শ্যাম্পেন, তেলরং, জলরং প্যাস্টেল, ক্রেয়ন—সুর, অ-সুর আর বেসুর মিলিয়ে এক লম্বা চিঠি, যার একপ্রান্তে লেখক, স্বয়ং, অন্যপ্রান্তে তাঁর স্ত্রী। মধ্যিখান জুড়ে সংগ্রাম—"শুধু আঁকব, অন্য কিছুই করব না। ঝাঁপিয়ে পড়ব অনন্ত জলস্রোতে, ভাসতে ভাসতে হয় কোনো নতুন তীরে পৌঁছব, নয়তো লাশ খুঁজে পাওয়া যাবেনা আমার।"[৪] জীবনকে উনি এমনটাই কথা দিয়েছিলেন।

আমরা তাই শুনি—"ক'দিন থাকবে প্যারিসে কিছু ঠিক করে এসেছো?" —"না, তবে মাস ছয়েক তো বটেই, প্রদর্শনী না করে যাব না।"[৫] বোম্বাইতে লেখকের শিল্পীর প্রথম ছবির প্রদর্শনী। আলাপ হয় জেরীর সঙ্গে, আদি নিবাস মার্কিন রাজ্যে হলেও কর্মসূত্রে সুইডেনে যার আস্তানা, জেরীর কথা—"তোমার চিন্তা এবং ছবি ওদেশের লোককে স্তম্ভিত করে দেবে।"[৬] কিছুটা প্রাণ দেয় শিল্পীকে। জেরীর পাঠানো এয়ার ইন্ডিয়ার টিকিট খুলে দেয় নতুন দরজা। একটি 'বাহিরের দরজা' অন্যটি 'আন্দরের দরজা'। চরিত্রের পর চরিত্রের যাওয়া-আসা চলতেই থাকে অবিরাম। তবে আশ্চর্য, প্রতিটি চরিত্রই শিল্পময়, শিল্প-সংবেদী হৃদয়সম্পন্ন অন্তত। তাই, দূরদেশী ইন্ডিয়ান, কখন যেন 'দোস্ত' হয়ে যায় প্যারিসের শিল্পীকূলে। উৎসবে-ব্যসনে এমনকী রাজদ্বার-শ্মশানেও কখনো সঙ্গিহীন হয়না আগন্তুক শিল্পীটি। নিজের জীবনের অপরিপাট্যতা মিলে যায় চরিত্রগুলির সঙ্গে। রং-পেনসিল ধার নেওয়া থেকে, ঠোঁটের স্বাদ-বিস্বাদ পর্যন্ত আনাগোনা করে অকপট স্বীকারোক্তিতে। রোজমারী সেই প্রথম মুখ। রোজমারীর প্রত্যাখ্যান সেই প্রথম ভাঙাচোরা একটি ছবি। শিল্পীর মস্তিষ্কে থাকা 'শরীরময়' গুবরে পোকার উল্টে পড়া।

আসলে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির থেকে যার দূরত্ব মিলিমিটারের সম্পর্কে যুক্ত, সেখানে পা হড়কে পড়া পাপ কিংবা দোষের চেয়েও স্বাভাবিক ঘটনামাত্র। ক্যানভাসের ছবিতে বিষাদময়তার প্রলেপ, নির্জনতার কণামাত্র। লেখক সেখানে বিষহীন কিন্তু উদ্ধত—"ঝনঝন করে বিশাল এক কাঁচের দেওয়াল ভেঙে গেল অনেক দূরে কোথায়!"[৭] রোজমারী হারিয়ে গেল।

এগিয়ে এল যিশু। প্যারিসের মোঁমাত্রে পোর্ট্রেট আঁকিয়ে এক শিল্পী। উপন্যাসের অনেকটা অংশ জুড়ে যার ছবি। এগিয়ে এল শুভলীন, সদাহাস্যময় এই বান্ধবীর হৃদয়ের অনেকটা জুড়েই ক্যানভাসের মানুষগুলির প্রতি অদম্য টান আশ্চর্য করে তোলে। যিশুর পাশাপাশি ঈভলীনও হাজির লেখকের উত্থান-পতনের ভূগোলে সমানভাবে। যিশুর শিল্পীদলের সঙ্গে মিশে যায় ভারতীয় শিল্পীটিও। পূর্ণ উদ্যমে

পেশাদার পোট্রেট আঁকিয়ে হওয়ার ইচ্ছা যদিও ছিলনা কোনোদিন, তবুও পকেটের স্বার্থে প্যারিসের মোঁমাত্রে মুখ আঁকতে শুরু করে সে। সাফল্যও আসে দিগ্বিদিক জ্ঞান না করেই। বঞ্চনা-লাঞ্ছনার পাশাপাশি শিল্পীমন গড়ে তোলে স্বপ্ন—প্রদর্শনীর স্বপ্ন। ঈভলীনের দেওয়া তেরোটা সাদা ক্যানভাস হয়ে ওঠে পিকাসোর পায়রা। আয়োজন পুরোদমে চলতে থাকে প্রদর্শনীর। কিন্তু এ তো শুধুমাত্র উত্থান, গল্পের উত্থান, শিল্পীর উত্থান, পিকাসোর সেই অমোঘ উচ্চারণ—Every act of creation is first of all an act of destruction—কোথায়?

আমরা দেখতে পাই—"ঈশ্বরের মৃত্যুর পর নিদারুণ পরাজয়ে স্বর্গরাজ্য ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।"[৮] একমাত্র সত্য বলে দর্শনে যদি কিছু স্বীকার করা হয় তা মৃত্যু। কিন্তু এই মৃত্যু কেবলমাত্র শরীরী নয়, মৃত্যু মনেরও হতে পারে। শিল্পী সেই মনের মৃত্যুকেই ভয় পান। শিল্পী তার সত্তার বিনাশকেই ভয় পান। কলকাতার দিগেন্দ্রনাথ পাল সেই মৃত্যুর শিকার উপন্যাসে। কলকাতার দিগেন কখন যেন দিঁগে হয়ে গেছে প্যারিসে এসে—লেখকের বিস্ময়ের সীমা নেই সেখানে। মধুকবির অস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় এই দিঁগের মধ্যে। বাংলা ছেড়ে উনি ফরাসী ভাষায় চেষ্টা করেন কবিতা লিখতে। বাঙালিয়ানা ছেড়ে কেতাদুরস্ত ফরাসী হওয়ার অনুসরণ করেন। কিন্তু মানতে পারেন না নিজের কাছেই নিজেকে।

অসংগতি আমাদের হাস্যের কারণ, কিন্তু চূড়ান্ত অসংগতিই আবার জন্ম দেয় ট্র্যাজেডির। কবি দিগেন্দ্রনাথও আমাদের কাছে তাই। স্ত্রী দমিনিকের পয়সায় গ্রাসোচ্ছাদন করা দিঁগে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন। একপ্রকার মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। প্যারিসের দেওয়ালে দেওয়ালে লিখে বেড়ান ঘরের কথা, মনের কথা, রূপসী বাংলার সেই চিরাচরিত সত্যের কথা—"আবার আসিব ফিরে এই বাংলায়। হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে—"[৯]

বিশুও চলে যায় শেষপর্যন্ত। পৃথিবীর কাছে, প্রেমিকা অ্যানির কাছে, দোস্ত ইন্ডিয়ানটির কাছে সমস্ত ঋণ মিটিয়ে খুন হয় বিশু। বন্ধুত্বের নিদর্শন রেখে যায় মোঁমাত্রের শিল্পীটি। বিশুহীন প্রদর্শনীতে শিল্পীর কানে কানে তাই বাজতে থাকে কোনো ঈশ্বরের সংলাপ—"আমি তো রয়েছি ইন্ডিয়ান।"[১০]

আসলে ঈশ্বরের মৃত্যু হয়না কোনোসময়। আত্মার হয় কি? দেহ থেকে দেহান্তরে ভ্রমণ চলতেই থাকে। অনির্দেশ্য যাত্রাপথের গন্তব্য হয়না কোনো। রাণাঘাটের গোবিন্দ, প্যারিসের মিশেল, কলকাতার করুণাময়—পরাজিত, বিধ্বস্ত এই মানুষগুলি সত্যিই কি মনে পড়ায়, আমাদেরই পাশে থাকা কোনো নাম না জানা অখ্যাত শিল্পীকে, ভ্যান গগ কে, পিকাসো কে? কারণ আমরা জানি Art is a lie that makes us relize the truth.

"জীবন পুড়িয়া যায়; আমরাও মরে পুড়ে যাই!/আকাশে নক্ষত্র হয়ে জ্বলিবার মতো শক্তি - তবু শক্তি চাই।"[১১] 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'জীবন' কবিতার উদ্ধৃতি এই

উপন্যাসের প্রবেশক। উপন্যাসের আত্মপ্রত্যয়ী বাঙালি শিল্পীটি শেষে এসে হতোদ্যম। অবসন্নতা তাকে গ্রাস করেছে। নিজের চোখের সামনে দেখেছেন শিল্পীদের নির্মম পরিণতি। চূড়ান্ত বাস্তবের কাছে ক্যানভাসের রং, ভাস্করের সিমেন্ট বিসদৃশ। উত্তর খুঁজে পেয়েছেন ভাস্কর জর্জ আর তাঁর স্ত্রী জানী কোন আশংকায় তাদের ছেলে ফিলিপকে চিত্রকর বানাতে চায়না। ভারতবর্ষ থেকে পেয়েছেন টেলিগ্রাম—এক মৃত সন্তানের বাবা তিনি—"জীপলী রিগ্রেট ইওর ওয়াইফ গেভ বাথ টু এ স্টিল বন্ বেবি।"[১২] পিকাসোর শান্তির পায়রারা কখন যেন চিল শকুন হয়ে গেছে, ছেয়ে ফেলেছে শিল্পীর আকাশ।

স্বপ্নফেরির দিন শেষ। সান্তাক্লজের ঝুলিও শূন্য। বলা হয়ে গেছে প্যারিসের সমস্ত কথা। মোঁমাত্রে ঘুরতে আসা কৌতূহলী নাগরিক সমাজের কাছে শিল্পীর যে নিবেদন—" 'মুখ চাই, মুখ?' আপনার পোত্রেত?"[১৩] তা কখন যেন নিজের কাছেই নিজের ঘোষণা, একমাত্র চাহিদা হয়ে উঠেছে। আত্মানুসন্ধানের পর নিজেকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা কোথাও। নিজের অস্তিত্বই মৃত। রইল পড়ে দলিল—"মোঁমাত্রে টিলাটি এখন আগ্নেয়গিরি হয়ে গেছে। বমি করছে তপ্ত লাভা-স্রোত। মেলা ভেঙে গেছে কবে। প্রলয় ঝড়ের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই পৃথিবীতে!"[১৪]

আমরা তাই শুনতে পাই নির্মম উচ্চারণ—"ঊনবিংশ, অষ্টাদশ, আরও আরও পিছিয়ে যাও, দেখবে একই ইতিহাস। শিল্পী, কবির জ্বালা-যন্ত্রণা-পরাজয়ের ইতিহাস।"[১৫] শিল্পী মিলন মুখোপাধ্যায় এর সঙ্গে যোগ করেছেন একবিংশ শতাব্দীকেও। মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন সহজ, সবল গদ্যকে। অবলম্বন করেছেন চিঠির, ব্যক্তিগত চিঠির সহজ কাঠামোকে শিল্পী এনে বসিয়েছেন আপামরের মতোই। নিখাদ নির্ভেজাল স্বীকারোক্তিমূলক বয়ানে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে সৃষ্টি করেছেন কথার কোলাজ, ঘটনার ছবি। নামীর পাশে অনামীরাও তাই চোখ টেনেছে সমানভাবে। বস্তুত সর্বতোভাবেই কারুবাসনার এক অন্য ফসল 'মুখ চাই মুখ'।

তথ্যসূত্র :

১. 'গল্পসমগ্র'; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; সম্পাদনা—প্রশান্তকুমার পাল; লালমাটি প্রকাশন; বইমেলা ২০১৪; বইয়ের 'লিপিকা' অংশের 'পট' রচনাংশ থেকে আবৃত; পৃষ্ঠা-৭৪৯।

২. 'মুখ চাই মুখ'; মিলন মুখোপাধ্যায়; প্রথম সাহিত্যম সংস্করণ-বইমেলা ১৪০৫; পৃষ্ঠা-১৯। (অতঃপর বইটি 'মু.চা.মু' বলে উল্লেখ করা হয়েছে)।

৩. তদেব; পৃষ্ঠা-৫।

৪. 'তরুণ কবিদের প্রেমের গল্প'; পরম্পরা প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ২০০৬; বইয়ের বিভাস রায়চৌধুরীর লেখা গল্প 'তোতাপাখি' থেকে আহূত; পৃষ্ঠা-৫৭।

৫. মু.চা.মু; পৃষ্ঠা-৪৮।

৬. তদেব; পৃষ্ঠা-৩৪।

৭. তদেব; পৃষ্ঠা-৬৫।

৮. তদেব; পৃষ্ঠা-৩৮৪।

৯. তদেব; পৃষ্ঠা ৩৬৬।

১০. তদেব; পৃষ্ঠা ৩৭২।

১১. তদেব; পৃষ্ঠা-৭।

১২. তদেব; পৃষ্ঠা-৩৭

১৩. তদেব; পৃষ্ঠা-৯।

১৪. তদেব; পৃষ্ঠা-৩৮৪।

১৫. তদেব; পৃষ্ঠা-৪০২।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার বিস্মৃত মহিলাদের কথা

গুরুশংকর বারিক
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিলাদের অংশগ্রহণ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের পর বোম্বে, মাদ্রাজ এবং কলকাতার উচ্চবিত্ত পরিবারের মহিলাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। অসহযোগের সময় থেকে শুধু কলকাতা নয় জেলার মহিলারাও জাতীয় আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মহিলাদের অংশগ্রহণে মেদিনীপুর জেলায় আন্দোলন ব্যপক আকার লাভ করে। সামাজিক বাধা অতিক্রম করে গ্রামের সাধারণ মহিলারা এগিয়ে এসেছিলেন। বিধবা এবং পতিতারাও পিছিয়ে ছিলেন না। শুধু সত্যাগ্রহী হিসেবে নয়, আন্দোলনের নেতৃত্বও তাঁরা কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। মেদিনীপুরের মহিলারা প্রকৃতই পুরুষদের সহকর্মী হয়ে উঠেছিলেন।
সূচকশব্দ: মহাত্মা গান্ধী, লবণ সত্যাগ্রহ, ভগিনী সেনা, পতিতা, বিধবা ইত্যাদি।

"না জাগিলে ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না"[১]

বাংলার জনৈক কবি এভাবেই জাতীয় আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিলেন। উপনিবেশিক ভারতের গোড়া থেকেই মহিলারা ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। তমলুকের রানি কৃষ্ণপ্রিয়া (১৭৮২ খ্রিঃ),[২] কর্ণগড়ের রানি শিরোমণি (১৭৯৮-৯৯ খ্রিঃ), দক্ষিণ ভারতের চিন্নাম্মা (১৮২৪ খ্রিঃ) কিংবা মহাবিদ্রোহের সময় রানি লক্ষ্মীবাঈ, বেগম হজরত মহল কোম্পানীর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পর মূলত উচ্চবিত্ত পরিবারে মহিলারা বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগদিতে শুরু করে। তবে অসহযোগের সময় থেকে শুধু শহরের সম্পন্ন পরিবারের নয় আপামর সাধারণ বাড়ির মহিলারাও জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার মহিলাদের অংশগ্রহণ সারা দেশে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। মেদিনীপুর বলতে প্রথমেই মাথায় আসে মাতঙ্গিনী হাজরার কথা। বাহাত্তর বর্ষীয়া বৃদ্ধার আত্মত্যাগ তাঁকে চিরস্মরনীয় করে রেখেছে। তবে শুধু মাতঙ্গিনী হাজরা একা নন। সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় যে শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠার পিছনে ছিল বহু মহিলার আত্মত্যাগ।

উনবিংশ শতকের শেষ থেকেই বাংলায় মহিলাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে দেখা যায়। জাতীয় কংগ্রেসের বোম্বে অধিবেশনে (১৮৮৯) প্রথম মহিলা প্রতিনিধি হিসাবে স্বর্ণকুমারী দেবী ও কাদম্বিনী গাঙ্গুলী যোগদান করেন। এরপর স্বদেশী আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই কারনে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী জাতীয় আন্দোলনে বাংলার মহিলাদের ভূমিকা অনুসরণযোগ্য বলে মনে করতেন।[৩] কলকাতা অধিবেশনে (১৯১৭) অ্যানি বেশান্ত প্রথম মহিলা হিসাবে কংগ্রেসের সভাপতি হয়। তবুও মহিলাদের সম্পর্কে কংগ্রেসের কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি ছিল না। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসার পর এই অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। এখন থেকে মহিলাদের শিক্ষা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পর্দাপ্রথা এবং বৈধব্যের মতো সামাজিক সমস্যা গুলিও কংগ্রেসের রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়।[৪] মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় মহিলাদের সীতা আর ব্রিটিশরাজকে রাবণের সঙ্গে তুলনা করে, রাক্ষসরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জননী সীতার ভূমিকাকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি মনে করতেন রাক্ষস বিরোধী এই সংগ্রাম সীতাদের অনুপস্থিতিতে কখনো পূর্ণতা লাভ করতে পারেনা।[৫] তাই জাতীয় আন্দোলনে মহিলাদের সামিল করতে তিনি উদ্যোগী হন। গুজরাটের ‘ভগিনী সমাজ’-র বার্ষিক অধিবেশনে (২০-শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮) গান্ধীজী বলেন – আমাদের নারী সমাজের হীন অবস্থার জন্যই আমাদের অনেক আন্দোলনের গতি মাঝ পথে থেমে যায়। অনেক আন্দোলন ফলপ্রসূ হয়না।[৬] তাই জাতীয় আন্দোলনে পুরুষের সহকর্মী হিসেবে নারীকে তুলে ধরা প্রয়োজন। তবেই দেশ প্রকৃত স্বরাজের পথে অগ্রসর হবে। আর এই স্বরাজ অর্জনের পথ হবে অহিংস। কেননা তবেই নারীরা পুরুষের সমান অংশীদার হবে।[৭] তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মহিলাদের অংশগ্রহণই পারে জাতীয় আন্দোলনকে অহিংস পথে পরিচালিত করতে।[৮] অন্যদিকে মহিলাদের কাছে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, এমনকি দেবতা স্বরূপ। জাতীয় আন্দোলন ধর্মাচারণেরই অংশ হয়ে ওঠে।[৯] মাতঙ্গিনী হাজরা বাতরোগে যখন খুব কষ্ট পেতেন তখন তিনি ‘গান্ধীজী’, ‘গান্ধীজী’, ‘গান্ধীজী’ বলে তিনবার জল খেয়ে নিতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল ব্যাথার উপশম হবে।[১০] মহাত্মা গান্ধীর প্রতি এই বিশ্বাসই অন্তঃপুরের বন্ধ দরজা খুলে দিয়েছিল।

অসহযোগ আন্দোলনে বাসন্তী দেবী এবং উর্মিলা দেবীর কারাবরণ সারা বাংলাকে প্রাভাবিত করে। চিত্তরঞ্জন দাশ বাংলার মহিলাদের সংঘবদ্ধ করতে ‘নারী কর্ম মন্দির’ (১৯২১) প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে মহিলাদের জাতীয় আন্দোলনে সামিল করতে জেলায় জেলায় প্রচার শুরু করেন। বিভিন্ন শহর বা পল্লীতে অনুষ্ঠিত এই রাজনৈতিক সভা গুলিতে মহিলারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যোগদান করে।[১১] মেদিনীপুরেও সভা সমিতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণে জোর দেওয়া হয়। মহিলাদের জন্য বিশেষ সভারও আয়োজন করা হয়। এইভাবে বিভিন্ন সময়ে মেদিনীপুরে আসেন জোর্তীময়ী গাঙ্গুলী, শান্তিলতা দাস, বাসন্তী দেবী, আশালতা দাস,

সরলাদেবী চৌধুরানী প্রমুখেরা। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী মেদিনীপুরে দুইবার আসেন (১৯২১ এবং ১৯২৫)। এই বিশিষ্টজনদের বক্তৃতা মেদিনীপুরের মহিলাদের বিশেষ প্রাভাবিত করে। ১৯২১-র মহাত্মা গান্ধীর সভায় মেদিনীপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী অতুল চন্দ্র বসুর সহধর্মিণী শোভনা বসু তাঁর যাবতীয় সোনার গহণা 'তিলক স্বরাজ' তহবিলে দান করেন।[১২] স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ কাঁথি মহকুমায় সভার মাধ্যমে মহিলাদের জাতীয়তাবাদে উদবুদ্ধ করতে উদ্যোগী হন। বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের সভাপতিত্বে কাঁথির সরস্বতী তলায় এইরূপ একটি সভা হয়। এই সভায় শৈলবালা দিন্ডা, পরমেশ্বরী লালা, মোক্ষদায়িনী, প্রভাবতী প্রমুখরা তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারে সোনার অলংকার দান করেন।[১৩] এই সমস্ত সভা সমিতির খবর স্বেচ্ছাসেবকরা বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দিতেন।[১৪] পুরুলিয়ার বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা নিবারণ দাশগুপ্ত কাঁথিতে 'নারী কর্মী শিক্ষা মন্দির' স্থাপন করে মহিলাদের জাতীয় আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করতে থাকেন।[১৫] সুখদাময়ী রায়চৌধুরী, কুসুম কুমারী মন্ডল, বিন্দুবালা দাস, সৌদামিনি পাহাড়ী, ধিরা দাস, তরঙ্গিনী দাস, ব্রজেশ্বরী মাইতি প্রমুখেরা এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৩০-এ খেজুরী থানার মৌহাটীতে অনুরূপ একটি প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে ওঠে। খেজুরীর নিকুঞ্জ বাবু এর পরিচালক ছিলেন।[১৬] গঠনমূলক কাজ, চরকার উদ্যোগ এবং কাটুনী সংঘের মাধ্যমেও কংগ্রেস বৃহৎ পরিসরে মহিলাদের সংস্পর্শে আসে। এছাড়া চারণ কবি মুকুন্দ দাসের দেশাত্মবোধক গান গ্রামের মহিলাদের মধ্যেও জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করে।[১৭] '*স্বরাজে বঙ্গ মহিলার কর্তব্য* গ্রন্থে মহিলাদের আহ্বান জানানো হয় –

> ". . . মহাত্মা গান্ধীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আপনারা প্রত্যেকে কংগ্রেসের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হউন, পতি ও অনান্য সকলকে অনুরোধ করিয়া সভ্য শ্রেণীভুক্ত করুন এবং সকলের দেয় চাঁদা, যত শীঘ্র সম্ভব প্রদান করুন . . . যাঁহার শক্তি আছে, তিনি ইচ্ছা করিলে ইহা অপেক্ষা বেশী টাকা কিম্বা অলংকার প্রদান করিতে পারেন।"[১৮]

জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদবুদ্ধ হয়ে তাঁরা জেলার সমস্ত মহিলাদের সংগঠিত করতে উদ্যোগী হয়। চারুশীলা দেবী 'মহিলা সমিতি' গঠন করে গ্রামে গ্রামে জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রচার করেন। সমগ্র কাঁথি মহকুমায় গঠনমূলক কাজ শুরু করেন কুসুম কুমারী মন্ডল। খেজুরী, পটাশপুর, ভগবানপুরের মহিলাদের সংঠিত করতে শুরু করেন সুখদাময়ী রায়চৌধুরী। ডেবরার ননীবালা দেবী গঠনমূলক কাজের জন্য 'আলোক কেন্দ্র' গড়ে তোলেন। পাঁশকুড়া বাজারে কংগ্রেসের প্রচার পত্র বিলি করতেন বিভারানী চক্রবর্তী। বিন্দুবালা দাস কুড়িজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে চৌকিদারী কর না দিতে, বিদেশী দ্রব্য বর্জন করতে ও দেশকে বিদেশী শাসন মুক্ত করার আহ্বান জানায়।[১৯] নর্মদা পালও এইরূপ একটি পদযাত্রার আয়োজন করেন। গ্রামের মধ্য দিয়ে

যাওয়ার সময় আপামর জনসাধারণ তাঁদের শঙ্খধ্বনি, ফুলের মালা ও চন্দন দিয়ে স্বাগত জানায়।[২০] ভগবানপুরে এইধরনের পদযাত্রায় অংশ নেয় ধীরা দাস। সুরমা হোতা 'চরণ দল' গড়ে তোলেন, যাঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেশাত্মবোধক গান ও নাটকের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের প্রসার ঘটান। মহিষাদল রথের মেলায় চরকা প্রদর্শনী ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহে জোরদেন লক্ষীমণি হাজরা। সুবোধবালা কুইতি মহিষাদল রথের মেলায় বিদেশী দ্রব্য ও চৌকিদারি কর বর্জনের প্রচারপত্র বিলি করেন। পুলিশ লাঠি চার্জ ও গ্রেফতার করে। এর প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ রথের দড়ি না টানার প্রতিজ্ঞা করেন। গ্রামে গ্রামে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসারে এই মহিলাদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। '*কাঁথি কংগ্রেস বার্তা* লিখেছিল (০১.০৩.৩২) –

> "মাসাধিক কাল ভবানীচক কেন্দ্রে শ্রীযুক্তা মোক্ষদা কুমারী মাইতি . . . গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের নীতি প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। ফলে এতদ অঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে খুবই উৎসাহের ভাব লক্ষিত হইতেছে।"[২১]

অসহযোগ আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করে। মহিলাদের অংশগ্রহণ এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিল। কাঁথির ঝাড়েশ্বর মাঝি বাড়ির মহিলাদের ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।[২২] রামনগর থানার ফতেপুর গ্রামের মহিলারা ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্টকে জানান শাসমল বারণ করেছে, তাই তাঁরা ট্যাক্স দেবেন না। জোর করলে তাঁরা প্রেসিডেন্টকে ঝাঁটা দেখায়।[২৩] এরপর আইন অমান্য আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ অধিক বৈপ্লবিক রূপ ধারণ করে।[২৪] মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় আইন অমান্য আন্দোলন ব্যপক আকার ধারণ করেছিল। সত্যাগ্রহীদের পুলিশের অত্যাচার থেকে বাঁচাতে স্থানীয় মহিলারা লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনে যোগদেয়।[২৫] মহিলাদের সংগঠিত করতে চারুশীলা দেবী নরঘাটে ১৪৪ ধারা অমান্য করে সভা করেন। পুলিশ লাঠিচার্জ করেও সভা বন্ধ করতে পারেনি। প্রভাবতী দেবী ঘড়াবেড়িয়া খালে লবণ আইন অমান্য করেন। তিনি ময়না থানা সমর পরিষদের সভাপতি ছিলেন। নন্দীগ্রামে লবণ আইন ভঙ্গে মূখ্য ভুমিকা নেন শৈলবালা মাইতি, বাসন্তী দেবী, অহল্যা মাইতি। ধীরা দাস এবং তাঁর শাশুড়ি ১৯৩২-র ১২ মার্চ তাঁরা ডাহাগরা কেন্দ্রে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। ডেবরা থানার ননীবালা মাইতি, গিরিবালা ভূঞ্যা, যামিনীবালা সোম, নিভারাণী দাস প্রমুখরা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন।[২৬] মহিলারা শুধু আইন অমান্যকারী সত্যাগ্রহী হিসেবে নয় অন্দোলন পরিচালনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আজানবাড়ী কংগ্রেস শিবির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কুলবালা দাস। আন্দোলন পরিচালনার জন্য তমলুক মহকুমায় ক্রমানুসারে সুহাসিনী দেবী, ইন্দুমতী ভট্টাচার্য, লক্ষীমণি হাজরা, নিত্যবালা গোয়েল, সুবোধবালা কুইতি ডিক্টেটর পদে আসীন হলেন।[২৭] বেশিরভাগ পুরুষ কর্মী কারাগারে বন্দী থাকলেও

এই মহিলারা দক্ষ হাতে আন্দোলন পরিচালনা করেন।[২৮] আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি ছিল 'পতাকা অভিনন্দন দিবস' এবং 'বন্দী দিবস' উদযাপন। 'পতাকা অভিনন্দন দিবস'-এ বিভিন্ন সরকারী কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে কর্মসূচি নেওয়া হয়। এই কর্মসূচি রূপায়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন ননীবালা মাইতি, নিবারণী দাস, প্রভাবতী মাইতি প্রমূখরা। দাঁতনের কাননবালা পট্টনায়েকের সভাপতিত্বে চৌকিদারী করের বিরুদ্ধে সভা হয় রাণীসরাই হাটে (জুলাই, ১৯৩০)। দাঁতন কোর্টে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের দায়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। মেদিনীপুরের বিভিন্ন প্রান্তে বন্দী দিবস (৪ঠা জুলাই, ১৯৩২) উদযাপনে মূখ্য ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন সিন্ধুবালা মাইতি, মাতঙ্গিনী পাল, সৌদামিনী পাহাড়ী, ধীরা দাস প্রমুখরা।

ভারতছাড়ো আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ উচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। মেদিনীপুর জেলায় ব্রিটিশ শাসনকে অচল করে দেওয়ার জন্য কংগ্রেস সমস্ত সরকারি কার্যালয়, থানা, রেলওয়ে স্টেশন, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ অফিস, এমনকি ট্রেজারি অক্রমনের সিধান্ত নেয়। ২৯-শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ থানা দখলকে কেন্দ্র করে সারা মেদিনীপুর জুড়ে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। থানা দখলের অভিযানে মহিলারাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভগবানপুর থানা আক্রমণে ভগবতী শাসমল, পুতুলবালা দাসী, ধীরা দাস, শৈলবালা দাস, অন্নপূর্ণা দাস, তমলুক থানা - মাতঙ্গিনী হাজরা, চঞ্চলবালা ঘোষ, সিন্ধুবালা খাঁড়া, জয়ন্তী মাইতি, সত্যবালা মাইতি, শৈলবালা শী, সুতাহাটা থানা - প্রভাবতী সিংহ, কুমুদিনী ডাকুয়া, গিরিবালা দে, চারুশীলা জানা, সুশীলা বেরা, মাখনবালা দাস, রেণুকা পতি, সুবোধবালা কুইতি, পাঁশকুড়া থানা - বিভারানী চক্রবর্তী, মহিষাদল থানা - মেনকা ভৌমিক প্রমূখরা অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সকারের সময় কুমুদিনী ডাকুয়া বহু দুঃসাহসী কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পুলিশের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি মহিলাদের শিক্ষা দিতেন। জাতীয় সরকারের 'গরম দল'-র সদস্যা ছিলেন জ্যোৎস্না দাস।[২৯] সুশীল ধাড়ার ব্যক্তিগত সহকারীও ছিলেন তিনি। 'ভগিনী সেনা' ও 'বিদ্যুৎ বাহিনী'-র সক্রিয় সদস্যা ছিলেন মহিষাদলের লক্ষিমণি হাজরা। পরে তিনি মহিষাদল থানা সমর পরিষদের 'ডিক্টেটর' নির্বাচিত হয়েছিলেন। সুতাহাটা 'ভগিনী সেনা'-র কম্যান্ড অফিসার ছিলেন সুবোধবালা কুইতি। অদম্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে তিনি মাত্র আঠারো বছর বয়সে সুতাহাটা সমর পরিষদের 'ডিক্টেটর' পদে আসীন হন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের মধ্যে একটা বড়ো অংশ ছিল বিধবারা। বাল্য বিধবারা সমাজের রীতিনীতি আর অসহনীয় দুঃখের মাঝে হারিয়ে যাননি। তাঁরা বোধহয় নিজেদের মুক্তি খুঁজে নিয়েছিলেন দেশের মুক্তি সংগ্রামে। ডেবরা থানার বিন্দুবালা শাসমলের মুখে শোনা যায়, একটু একটু করে মরার চেয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরর মৃত্যু শ্রেয়। গঠন মূলক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন ননীবালা মাইতি।

'ভগিনী সেনা'-র গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন গিরিবালা দে। এছাড়াও পদ্মা পাল, মাতঙ্গিনী হাজরা, সোউদামিনী পাহাড়ী, নিত্যবালা গোয়েল, প্রভাবতী ব্যানার্জী এবং অজয় মুখার্জীর বোন সুহাসিনী ব্যানার্জী প্রমুখেরা অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। সুশীল ধাড়া সুহাসিনী ব্যানার্জী সম্পর্কে লিখেছেন –

> "তপ্ত কাঞ্চন বর্ণা এই তেজস্বিনী হিন্দু বিধবার পোষাকে যেখানে গিয়ে দাঁড়াতেন সেখানেই এক অপূর্ব প্রভাব পড়তো। ওরই অগ্রণী ভূমিকায় মহকুমার নারী সমাজে লবণ সত্যাগহের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল।"[৩০]

শুধু কংগ্রেসের আন্দোলনে নয় মণিকুন্তলা সেন কমিউনিষ্ট পার্টির প্রচারে এসেও মেদিনীপুরে বিধবাদের সংখাধিক্য লক্ষ করেছিলেন।[৩১] কমলা দাশগুপ্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা হয়ে (১৯৪১) জেলায় জেলায় ঘুরে সভা করেন, এই সমস্ত সভাতেও বিধবাদের উপস্থিতি তাঁর নজর কেড়েছিল।[৩২] বৈধব্যের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে তাঁরা দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের নিজের জেলায় বিধবাদের এই দুর্দশা বিধবা বিবাহের সফলতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে দেয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামে দেহপোজীবিনী মহিলাদের আত্মত্যাগও ভুলে যাবার নয়। তঁদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই বোধহয় তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের আশ্রয় দিয়েছেন, অন্ন জুগিয়েছে আবার আহতদের সেবা শুশ্রূষা করেছেন।[৩৩] আইন অমান্য আন্দোলনের সময় নরঘাটে পুলিশি আক্রমণ ঠেকিয়ে রেখে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী ও চারুশীলা দেবীকে সভা পরিচালনায় সাহায্য করেছিলেন তমলুকের সাবিত্রী দে।[৩৪] তমলুক থানা দখল করতে গিয়ে যাঁরা আহত হয়েছিলেন তাঁদের সেবায় তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমরা শুধু ওইদিনে মাতঙ্গিনী হাজরার আত্মত্যাগ জানি। পুলিশের বন্দুকের সামনে যে নিজের জীবন তুচ্ছ করে আহতদের বাঁচিয়েছিলেন তাঁকে আমরা মনেরাখিনি। সুশীল কুমার ধাড়া, গোপীনন্দন গোস্বামী প্রমুখরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন এই গানের মাধ্যমে –

"আহত সেবার তরে দৌড়ে আনে জল
বারাঙ্গনা সবিত্রী সে দৃঢ় মনোবল।।
পুলিশ দেখায় ভয় বন্দুক উঁচিয়ে
সংগে সংগে সেই নারী উঠে যে চেঁচিয়ে।।
জেহাদ জানায় তার, বঁটিটি ধরিয়া
সেবা সে করিবে বলে হয়েছে মরিয়া।।"[৩৫]

তেরপেখিয়া বাজারে থাকতেন সত্যবতী দেবী। তাঁর কাছে আসা পুলিশ অফিসারের থেকে খবর নিয়ে তিনি কংগ্রেস শিবিরে পাঠিয়ে দিতেন। পরে তিনি সরাসরি মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। নন্দীগ্রাম রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগদিয়ে

পুলিশের নির্যাতনে তাঁর মৃত্যু হয়।[৩৬] পুলিশের নির্মম অত্যাচার সবচেয়ে বেশি তাঁদের উপর নেমে এসেছিল।

জাতীয় আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ আটকাতে পুলিশের পাশবিক অত্যাচার, কটুক্তি, গ্রেফতার, লাঠি চার্জ থেকে শুরু করে গুলি চালানো কোনো কিছুই বাদ দেয়নি। তবুও মহিলাদের আটকানো যায়নি। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল যে হিজলী বন্দীশালার সাব জেলটিকেও নারী বন্দীশালায় পরিণত করতে হয়।[৩৭] আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদিয়ে তাঁদের অবর্ণনীয় পুলিশি অত্যাচারের স্বীকার হতে হয়েছিল। কেশপুরে আইন অমান্যের মিছিলে উর্মিবালা পয়ড়্যা পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। তিনি মেদিনীপুর জেলার প্রথম মহিলা শহীদ।[৩৮] নারীদের প্রতি কোন সভ্য সরকারের এইরূপ অত্যাচারে দিল্লীর কাউন্সিলে আর এন ব্যানার্জী বিস্ময় প্রকাশ করেন।[৩৯] **১৯৩৩**-র **৩১**-শে মার্চ এসপ্ল্যানেডে নেলি সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে যে সভা হয়, তাতে যোগ দিয়ে মেদিনীপুর থেকে সবথেকে বেশি মহিলা গ্রেফতার হয়। কাঁথির সিন্ধুবালা মাইতি জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস পালন করতে গিয়ে গ্রেফতার হন এবং পুলিশকে বাধ্য করেন তাঁদের মূল ফটক দিয়ে থানায় আনতে। সত্যাগ্রহ কেন্দ্রে সত্যবতীকে দেখলেই পুলিশ বলত, ‘এ শালী তো আবার এখানে এসেছে’।[৪০] পুলিশের কটুক্তির কড়া জবাব দিয়েছিলেন সৌদামিনী পাহাড়ী। বিদেশী বর্জনের ডাক দিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার আপরাধে তাঁকে গ্রেফতার করাহয়। বিচারকের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ঐতিহাসিক হয়ে আছে। তিনি বলেন –

> “আইন ভাঙলে আপনারা যাহাকে খুশী গ্রেফতার করিতে পারেন, মহিলাদের পুলিশ খারাপ কথা বলিতে পারে এমন আইন কি আছে? মহিলা হিসাবে আমি আপনার মাতৃতুল্য, আপনার ঘরে মা-বোন নেই?”[৪১]

শত কষ্ট স্বত্তেও মহিলারা কোনরকম আপোস করেননি। নিত্যবালা গোয়েল তাঁর শিশু কন্যাকে জেলে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলে, বিচারক শর্ত সাপেক্ষ বণ্ডে সই করতে বলেন যা তিনি মেনে নিতে পারেননি। মাতৃত্বও দেশ সেবায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তাঁদের কোনভাবেই ক্ষান্ত করা যায়নি। যতবার গ্রেফতার করা হয়েছে ততবারই মুক্ত হয়ে নতুন করে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আবার কারাগার ছিল মিলন ক্ষেত্র। জেলে বিখ্যাত নারী কর্মীদের সাহচর্য পেয়েছিলেন ভগবতী শাসমল ও মনোরমা দাস প্রমূখরা। শুধু গ্রামের মহিলারা জেলে গিয়ে জাতীয়তাবোধের নবচেতনায় উদবুদ্ধ হয়েছিলেন তা নয়, নেতৃস্থানীয় মহিলারাও তাঁদের দুঃখ, অভাব, যন্ত্রণা সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সাজিয়ে নিতে সাহায্য করেছিল।[৪২] ভারত ছাড়ো আন্দোলনে পুলিশি অত্যাচারের করুণ সাক্ষী হয়ে আছে তমলুক মহকুমা। এখানে মোট ৭৩ জন মহিলা ধর্ষিতা হন যা অত্যন্ত ব্যথিত করছিল মহাত্মা গান্ধীকে।[৪৩]

জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ মহিলাদের মধ্যে নবচেতনার উন্মেষ ঘটায়। সম্ভ্রান্ত বাড়ির মহিলা ইন্দুমতি ভট্টাচার্যের দৈনন্দিন জীবনেও পর্দা সঙ্গী ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগদিয়ে তিনি পর্দা ত্যাগ করেন। তবুও প্রথম কারাবাসের সময় তিনি বিভিন্ন জনের ছোঁয়া খাবার খেতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় কারাবাসের সময় এই সংকীর্ণতার বাঁধ ভেঙ্গে যায়। তিনি সবার সাথে মিশে কারাজীবন উপভোগ করতে শুরু করেন।[৪৪] ভগবানপুরের ভগবতী শাসমলও পর্দা ত্যাগ করে জাতীয় আন্দোলনে যোগদেয়। সুখদাময়ী রায়চৌধুরিকে জাতীয় আন্দোলনের যোগ দেওয়ার জন্য পরিবার থেকে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু একটা সময়ের পর তিনি শাশুড়ি কুলমনি রায়চৌধুরীকেও জাতীয় আন্দোলনে সামিল করতে সক্ষম হন।[৪৫] এইভাবে জাতীয়তাবোধের প্রসার পুরানো ধ্যান ধারণা ভেঙ্গে দিয়েছিল। লবণ তৈরির অপরাধে কাঁথির সম্পন্ন কৃষক ঝাড়েশ্বর মাঝির কারাদণ্ড হয়। পুলিশ তাঁর ক্ষেতের ফসল, বাড়ির আসবাব সব নষ্ট করে দেয়। তবুও ঝাড়েশ্বর মাঝির মা বলেন –

> "আমার আটশত মণ ধান নষ্ট করেছে; আবার ষোলশত মণ ধান হবে, এখনো দুটো ছেলে মা বলে ডাকে। লবণ আইন অমান্য তো আমি করবো"।[৪৬]

আবার কাঁথির পারুলিয়া গ্রামের মাতঙ্গিনী পালের কাছে জাতীয় আন্দোলন ছিল 'সৎকাজ'।[৪৭] মহিলাদের এই মনোভাব জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিল।

স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার মহিলাদের অবদান বাংলা তথা সমগ্র ভারতের কাছে সমীহ আদায় করে নেয়। মহিলারা জাতীয়তাবোধে উদবুদ্ধ হয়ে শুধু পারিবারিক বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসেননি, তাঁরা(সুখদাময়ী রায়চৌধুরি ও ধীরা দাস) তাঁদের শাশুড়িদেরও জাতীয় আন্দোলনে সামিল করতে পেরেছিলেন। এ এক অনন্য নজির। জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণের অপরাধে পুলিশ শস্য নষ্ট করেছে, বসতবাড়ি ভেঙ্গে দিয়েছে, আসবাব সামগ্রী বাজেয়প্ত করেছে, ধানের গোলায় আগুন দিয়েছে, লাঠি চালিয়েছে, গুলি চালিয়েছে, গ্রেফতার করেছে অসহনীয় দুঃখ সহ্য করেও মানুষ জাতীয় আন্দোলনে যোগদিয়েছে। মহিলারা পুরুষের পাশে না দাঁড়ালে পরিবারকে এত দুঃখ কষ্টের মধ্যে ফেলে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হত কিনা সন্দেহ হয়। মেদিনীপুরে মহিলারা প্রকৃত সহকর্মী হিসাবে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তাঁদের এই অবস্থান যে জাতীয় আন্দোলনের শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। কুমারচন্দ্র জানা তঁর স্ত্রীর (চারুশীলা জানা) সম্পর্কে বলতে গিয়ে যা বলেছিলেন তা এখানে খুব প্রাসঙ্গিক। তাঁর ভাষায় –

> "যদি আমার স্ত্রী আমার কাজ-কর্মে ও চলার পথে বাধা হতেন তা হলে আমার পক্ষে স্বদেশী আন্দোলনে এতখানি সময় ও শক্তি ব্যয় করা সম্ভব হত না। তিনি আমার কাজে বিরোধিতা তো করেন-ই-নি, বরং আমার পথ অনুসরণ করে

> দুঃখ-কষ্ট বরণ করেছেন এবং জেলও খেটেছেন। সেজন্য আমার স্ত্রীর কাছে ঋণও যথেষ্ট।"[৪৮]

গান্ধীজী স্বধীনতা সংগ্রামে নারীদের যে সহকর্মী হিসেবে তুলে ধরার কথা বলে ছিলেন তা এখানে সার্থক। নারীরা প্রকৃতই সহকর্মী হয়ে উঠেছিলেন। শুধু তাই নয় জাতীয় আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা নারী-পুরুষ সমানাধিকারের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে স্বাধীন চেতনা দেশবাসীকে স্বরাজের আন্দোলনে উদবুদ্ধ করেছিল আজ তা নারীর সমানাধিকারের আদর্শকে উৎসাহিত করেছে।[৪৯]

সূত্র নির্দেশ:

১। গুপ্ত, হেমন্তকুমার। *স্বরাজে বঙ্গ মহিলার কর্ত্তব্য*, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ।

২। মুখোপাধ্যায়, যদুগোপাল। *বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি*, কলকাতা, ১৯৮২। পৃ. ৯।

৩। Forbes, Geraldine. *Women in Modern India, Cambridge*, 1996. p. 127.

৪। Forbes, Geraldine. *Women in Colonial India: Essays on Politics, Medicine, and Historiography*, New Delhi, 2005. p. 28.

৫। Basu, Aparna. *The Role of Women in The Indian Struggle for Freedom.* On B. R. Nanda (Edt.) *Indian Women: From Purdah to Modernity*, New Delhi, 1986. p. 185.

৬। গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ। *গান্ধী রচনা সম্ভার খণ্ড-৩*, কলকাতা, ১৯৭০। পৃ. ২২৮।

৭। চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ। *গান্ধীজীর দৃষ্টিতে নারী*, কলকাতা, ১৯৮৪। পৃ. ১১।

৮। ঘোষাল, ধনঞ্জয়(সম্পা)। *নবচেতনায় বঙ্গনারী: প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব*, কলকাতা, ২০১৫। পৃ. ২৮৪।

৯। Sarkar, Tanika. *Politics and Women in Bengal: The Conditions and Meaning of Participation.* On Sekhar Bandyopadhyay (Edt.) *National Movement in India: A Reader.* New Delhi, 2021. p. 263.

১০। দাশগুপ্ত, কামলা। *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, কলকাতা, ১৯৬৩। পৃ. ২০৬।

১১। বাগল, যোগেশচন্দ্র। *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, কলকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ। পৃ. ২০।

১২। দাস, বসন্ত কুমার। *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর*, কলকাতা, ১৯৮৪। পৃ. ৩৩৪।

১৩। *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর*, পৃ. ৩৩১।

১৪। দাস, বসন্ত কুমার। *মেদিনীপুরে স্বাধীনতার গণসংগ্রামে খেজুরী থানা*, মেদিনীপুর, ১৯৭৫। পৃ. ৩৯।

১৫। দত্ত, সোনালী। *মুক্তি সংগ্রামে উপেক্ষিতা নারী*, কলকাতা, ২০১৫। পৃ. ২৬।

১৬। *মেদিনীপুরে স্বাধীনতার গণসংগ্রামে খেজুরী থানা*। পৃ. ৩৯।

১৭। *মণিকুন্তলা সেনঃ জনজাগরণে নারীজাগরণে*, কলকাতা, ২০১০। পৃ. ২২।

১৮। *স্বরাজে বঙ্গ মহিলার কর্ত্তব্য* । পৃ. ৮১।

১৯। *মুক্তি সংগ্রামে উপেক্ষিতা নারী*। পৃ. ৬০।

২০। Pal, Rina. *Women of Midnapore in Indian Freedom Struggle*, Kolkata, 1996. p. 60.

২১। *Women of Midnapore in Indian Freedom Struggle*. p. 146.

২২। Sarkar, Tanika, *Bengal: 1928 – 1934*, New Delhi, 1987. p. 88.

২৩। সান্যাল, হিতেশরঞ্জন, *স্বরাজের পথে*, কলকাতা, ১৯৯৪। পৃ. ১০৮।

২৪। Chatterjee, Srilata. *Congress Politics in Bengal 1919 – 1939*, London, 2002. p. 171.

২৫। *স্বরাজের পথে*। পৃ. ১৯।

২৬। হাজরা, বলাইচন্দ্র। *ডেবরা থানার ইতিকথা*, কলকাতা, ১৯৭৬। পৃ. ৫৪।

২৭। কুন্ডু, কমল কুমার। *জিলা মেদিনীপুরঃ স্বাধীনতার আন্দোলন*, তমলুক, ২০০১। পৃ. ৭০।

২৮। Kaur, Manmohan. *Women in India's Freedom Struggle*, new Delhi, 1968. p. 174.

২৯। *মুক্তি সংগ্রামে উপেক্ষিতা নারী*। পৃ. ৫৪।

৩০। Dhara, Sushil Kumar. *Prabaha, Vol. 1*, Mahisadal, 1389 B.S. p. 27.

৩১। *মণিকুন্তলা সেনঃ জনজাগরণে নারীজাগরণে*। পৃ. ১১৯।

৩২। দাশগুপ্ত, কমলা। *রক্তের অক্ষরে*, কলকাতা, ১৯৫৪। পৃ. ১২২।

৩৩। *Women of Midnapore in Indian Freedom Struggle*. p. 37.

৩৪। *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*। পৃ. ৮১।

৩৫। *Women of Midnapore in Indian Freedom Struggle*. p. 164.

৩৬। *Women of Midnapore in Indian Freedom Struggle*. p. 126.

৩৭। *Women of Midnapore in Indian Freedom Struggle*. p. 37.

৩৮। Sarkar, Tanika. *Politics and Women in Bengal: The Conditions and Meaning of Participation*. On Sekhar Bandyopadhyay (Edt.) *National Movement in India: A Reader*. New Delhi, 2021. p. 262.

৩৯। মিশ্র, অমলেশ (সম্পা)। *অবিভক্ত কাঁথি মহকুমার ইতিবৃত্ত,* কলকাতা, ২০১৪। পৃ. ১২২।

৪০। *স্বরাজের পথে*। পৃ. ২৭।

৪১। *Women of Midnapore in Indian Freedom Struggle.* p. 63.

৪২। দাস, বীণা। *শৃঙ্খল ঝঙ্কার,* কলকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ। পৃ. ৭৯।

৪৩। Samanta, Satish Chandra and others. *August Revolution and Two years' National Govt. In Midnapore Part – 1(Tamluk),* Kolkata, 1946. p. 62.

৪৪। নন্দী, অজয়কুমার ও অনান্য। আগ্নিযুগের অজানা কাহিনী, কলকাতা, ১৯৯২। পৃ. ৩৪।

৪৫। *Women of Midnapore in Indian Freedom Struggle.* p. 46.

৪৬। *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*। পৃ. ৮১।

৪৭। সান্যাল, হিতেশরঞ্জন, *স্বরাজের পথে,* কলকাতা, ১৯৯৪। পৃ. ৯।

৪৮। *সংগ্রামী পুরুষ কুমাচন্দ্র,* তমলুক, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ। পৃ. ৯৩।

৪৯। *আনন্দবাজার পত্রিকা,* শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ। পৃ. ৪১।

শিশুর সামাজিক প্রতিকূলতার নিরিখে তিনটি নির্বাচিত রবীন্দ্র ছোটগল্প

শ্রেয়া চৌধুরী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: শিশুর মানসিক বিকাশে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে সমাজ। সমাজকৃত রূপদানের মধ্যে দিয়ে একটি শিশু মানসিক ভাবে অপরিণত থেকে পরিণতবস্থায় পৌঁছায়। রবীন্দ্রজীবন তথা রবীন্দ্রসাহিত্যের দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায় বিদ্যালয়কৃত বিড়ম্বনা অথবা শিশুর বিদ্যা গ্রহণে সমস্যা নানাভাবে বারবার উঠে এসেছে তাঁর লেখার মধ্যে। 'গিন্নি' গল্পটি দেখা যায় আশু নামের একটি শিশু বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক দ্বারা উপহাসের পাত্র হয়েছে। 'খাতা' গল্পে উমা নামের এক শিশুর স্বাধীন ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে ওঠা তার ব্যক্তিগত খাতাটি পর্যন্ত সে নিজের কাছে রাখবার অনুমতি পায়না, এর প্রধান কারণ উমা মেয়ে। স্থানান্তরণের ফলে নতুন সহানুভূতিহীন পরিবেশে বারবার বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে থাকা এবং সেই পরিবেশে মানিয়ে না নিতে পারা ফটিকের করুণ পরিণতির চিত্র পাওয়া যায় 'ছুটি' গল্পটির মধ্যে।
সুচক শব্দ: রবীন্দ্রনাথ, ছোটগল্প, শিশু, সমাজ, শিক্ষা, সামাজিক বিড়ম্বনা, লিঙ্গ বৈষম্য।

মূল প্রবন্ধ :

রবীন্দ্র ছোটগল্পের অন্তরীক্ষটি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় মানব সমাজের সুখ-দুঃখে পরিপূর্ণ জীবনগাথাটি মূলত ভিত্তিভূমি রূপে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর গল্পগুলিতে। তাই নারী-পুরুষের যাপনের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা তথা সমাজের অবস্থার কথা। রবীন্দ্র ছোটগল্পে সমাজের প্রাপ্তবয়স্কদের পাশাপাশি উপেক্ষিত থাকেনি শিশুরা। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষরা যেমন সমাজ দ্বারা পরিচালিত হয়, তেমন শিশুরাও সামাজিক প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারে না। 'গিন্নি', 'খাতা' এবং 'ছুটি' এই তিনটি নির্বাচিত ছোটগল্পে সামাজিক পেষণে শিশুর জীবনে যে সংকটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা বীক্ষণের প্রচেষ্টা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়জীবন কোনভাবেই সুখকর অভিজ্ঞতা হয়ে উঠতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'-তে তিনি লিখেছেন—

> ক্রমশ নর্মাল স্কুলের স্মৃতিটা যেখানে ঝাপসা অবস্থায় পার হইয়া স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে সেখানে কোনো অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে।...অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব এমন অশুচি ও

> অপমানজনক ছিল যে, ছুটির সময় আমি চাকরকে লইয়া দোতলার রাস্তার দিকের এক জানলার কাছে একলা বসিয়া কাটাইয়া দিতাম। মনে মনে হিসাব করিতাম, এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর–আরো কত বৎসর এমন করিয়া কাটাইতে হইবে। শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না।[১]

রবীন্দ্রনাথ এই নর্মাল স্কুলের স্মৃতিতেই পরবর্তীকালে 'গিন্নি' গল্পটি লিখেছেন। 'গিন্নি' গল্পটির মধ্যে দেখা যায় বিদ্যালয়ের পরিবেশে শিশুর সামাজিক হেনস্থার চিত্র। গল্পে বর্ণিত চরিত্র শিবনাথ পণ্ডিত তৃতীয়শ্রেণির শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের কাছে দুর্বিষহ। উক্ত শিক্ষক মহাশয় হুল ও দাঁত উভয় দিয়েই ছাত্রদের আক্রমন করতে পারতেন, অর্থাৎ একদিকে যেমন ছাত্রদের প্রতি প্রহারে তার কোন কুণ্ঠা ছিল না অপরদিকে তীব্র বাক্যবাণে তিনি শিশুহৃদয় বিদীর্ণ করে দিতেও সক্ষম ছিলেন। যদিও তিনি ছাত্রদের থেকে দেবতার মতো ভক্তি আশা করতেন কিন্তু ছাত্ররা তাঁকে যম ভিন্ন অন্যকোনো দেবতা বলে মেনে নিতে পারত না। ছাত্রদের পীড়ন করবার জন্য এই শিক্ষকের মোক্ষম অস্ত্রটি ছিল ছাত্রদের নতুন নামকরণ করা। এ প্রসঙ্গে গল্পের বর্ণনা-

> ...সাধারণত লোকে আপনার চেয়ে আপনার নামটা বেশি ভালবাসে; নিজের নাম রাষ্ট্র করিবার জন্য লোকে কী কষ্টই না স্বীকার করে, এমন-কি, নামটিকে বাঁচাইবার জন্য লোকে আপনি মরিতে কুণ্ঠিত হয় না। এমন নামপ্রিয় মানবের নাম বিকৃত করিয়া দিলে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর স্থানে আঘাত করা হয়।[২]

এই নিয়মেই শিবনাথ পণ্ডিত আশু নামের এক বালকের নামকরণ করেন 'গিন্নি'। আশু ছাত্র হিসেবে সুশীল, লাজুক এবং পড়াশোনাতেও ভালো। আশুর চারিত্রিক দিক থেকে বিদ্যালয়ে নিজেকে একজন ছাত্রর থেকে সামান্য কিছু বেশি ভাবতেও লজ্জিত হয়। এক বৃষ্টিমুখর দিনে গ্রহণ উপলক্ষে ছুটি থাকায় আশু তার বোনের সাথে পুতুল খেলছিল, দুই শিশুর এই খেলা শিবনাথ পণ্ডিত দেখে ফেলায় পরদিন বিদ্যালয়ে তিনি আশুর 'গিন্নি' নামকরণ করে আশুকে সকলের সামনে অপদস্ত করেন। এক লজ্জাকাতর শিশুর পক্ষে সব ছাত্রদের থেকে এই নাম দ্বারা উপহাস সহ্য করা নিতান্তই ভীষণ যন্ত্রণার।

এই গল্পটি থেকে একটি শিশুর যে সামাজিক অবস্থান চিহ্নিত করা যায় তা একাধিক দিক থেকে সমস্যাক্রান্ত। প্রথমত বিদ্যালয়ে এই ধরনের পরিবেশ একটি শিশুর মানসিক বিকাশে কতটা স্বাস্থ্যকর সে নিয়ে সন্দেহর জায়গা থেকে যায়। শিবনাথ পণ্ডিতের মত শিক্ষকরা তৎকালীন সমাজে বিরল ছিলেন না, যারা সম্মান অর্জনের থেকে অনেক বেশি সম্মান দাবী করেন। ছাত্রদের কোনো দুর্বল স্থান চিহ্নিত করতে পারলে তারা সেখানে আঘাত করেই আত্মতৃপ্ত হন। যেমন শিবনাথ পণ্ডিত শশিশেখর

নামের এক বালককে তার চেহারার জন্য তার নামকরণ করেছেন ‘ভেটকি’ বা কখনো আশুর ক্লাসে আসতে সামান্য দেরি হলে তার জন্য সে যা শাস্তি পেত তা তার ভুলের তুলনায় বিষম। নিজের কল্পিত অপ্রাপ্তি তারা ছাত্রদের পীড়নের মাধ্যমে পূর্ণ করে নিতে চান। এই শিক্ষাদান পদ্ধতিতে ভয় ও উপহাসের প্রাধান্য এতোই বেশি থাকে যে শিশুর পক্ষে শিক্ষা ক্রমশই ভার হয়ে ওঠে।

অপরদিকে আশুর নামকরণ গিন্নি হওয়ারও আরেকটি কারণও লক্ষ করা যায়। সমাজ লিঙ্গভেদে বিভিন্ন বিষয় পৃথকীকরণ করে আসে, খেলার ক্ষেত্রেও এই ধারা অব্যাহত থাকে। তাই দেখা যায় ছোট ছেলেদের খেলা আর মেয়েদের খেলার মধ্যে পার্থক্য থাকে, এবং এই পার্থক্য মূলত সমাজের দ্বারাই আরোপিত হয়। শিশুরা নিজেদের লিঙ্গ পরিচয় সম্পর্কে অবগত থাকে না, সমাজ চিনিয়ে না দিলে তারা লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে অন্য শিশুকে শুধুমাত্র শিশু হিসেবেই দেখে থাকে। সমাজ লিঙ্গ পরিচয়, লিঙ্গ আধিপত্য, শ্রেণিগত অবস্থান ইত্যাদি শিশুদের শেখায়। সমাজ পুতুলখেলা বিষয়টিকে মেয়েদের সাথেই যুক্ত করে এসেছে। তাই বোনের সঙ্গীর অভাব পূর্ণ করতে আশুকে তার বোনের সাথে পুতুল খেলতে হয়েছিল, সেই ঘটনা দেখে শিবনাথ পণ্ডিত তার নাম রাখেন ‘গিন্নি’। অর্থাৎ ছেলে হয়েও আশু তথাকথিত মেয়েদের খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল, যার ফলস্বরূপ তার নামকরণের মধ্যে দিয়ে তাকে মেয়ে হিসেবে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা করা হয় উপহাসের মাধ্যমে। এই ধরনের ঘটনা পরিণত মানুষদের কাছে অপেক্ষাকৃত গৌণ উপহাসের বিষয় হলেও একটি শিশুর পক্ষে গুরতর কারণ আশু প্রথমিকভাবে খেলার মধ্যে লিঙ্গ বিভাজন করতে শেখেনি, কিন্তু সমাজদ্বারা তাকে বোঝান হয়েছে পুরুষের স্থান নারী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাই ‘গিন্নি’ নামটি তাকে ঘিরে তৈরি হওয়া সমস্ত উপহাসের কারণ।

লিঙ্গ-বৈষম্য ও শিশুর সামাজিক বিড়ম্বনার ওপর ভিত্তি করে রচিত আরেকটি রবীন্দ্র ছোটগল্প ‘খাতা’। ‘খাতা’ গল্পটির মূল বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় উমা নামের একটি শিশু সবেমাত্র লিখতে শিখে বাড়ির সর্বত্র ‘জল পড়ে, পাতা নড়ে’, ‘কালো জল, লাল ফুল’ জাতীয় লেখা লিখে ভর্তি করে। এই লেখার দৌরাত্ম প্রথম বাধার সম্মুখীন হয় যখন উমা তার দাদার প্রবন্ধ লেখার খাতায়ও এই ধরনের লেখা লেখে। শাসনের সমাপ্তি ঘটার পর উমা তার দাদার থেকে একটি লাইনটানা খাতা পেয়েছে এবং তারপর থেকে সেই খাতা তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে ওঠে। এই খাতায় প্রথমে যেমন চলত পাঠ্যবইয়ের পাঠ প্রতিলিপিকরণ তার পাশাপাশি পরে এই খাতায় থাকতো তার স্বতন্ত্র মনোভাবের প্রকাশ। উমার মাত্র নয় বছর বয়সে বিয়ে হওয়ার পর এই খাতাটিও উমার সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়িতে স্থান পেয়েছিল। কিন্তু এই খাতাটিকে কেন্দ্র করেই উমার বিবাহিত জীবনে নেমে আসতে থাকে একাধিক সংকট।

আলোচ্য গল্পটির বিশ্লেষণে দেখা যায় একজন শিশু কন্যার সামাজিক সংকটের চিত্র। উমার পিতৃপরিবার অপেক্ষাকৃত উদার-মনোভাবাপন্ন হওয়ার কারণে উমাকে

প্রথমিকভাবে শিক্ষা অর্জনে বিশেষ বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু পরিবার সামাজিক প্রথাকে অতিক্রম করে উঠতে পারে না, তাই মাত্র নয় বছর বয়সেই উমার বিয়ে হয়। বাল্যবিবাহ সমাজে নারী দুরবস্থার একটি বড় কারণ। একটি শিশুর শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক অবাস্থায় আসার পূর্বেই অর্থাৎ পূর্ণ বিকাশ ঘটার আগেই তার বিবাহ হয়ে যাওয়ায় তার না প্রথাগত শিক্ষা সম্পন্ন করার সুযোগ থাকে না সে সাংসারিক বিদ্যা অর্জন করতে পারে। তাই দেখা যায় বিবাহ মানেই শিশু কন্যার মধ্যে এক ভয়ের সঞ্চার ঘটায়। গল্পেও দেখা যায়-

> গোবিন্দলাল বলিয়া দিলেন, "দেখিস, সেখানে দেয়ালে আঁচড় কাটিয়া বেড়াস নে; সে তেমন বাড়ি নয়। আর প্যারীমোহনের কোনো লেখার উপরে খবরদার কলম চালাস নে।"
> বালিকার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তখন বুঝিতে পারল, সে যেখানে যাইতেছে, সেখানে কেহ তাহাকে মার্জনা করিবে না। এবং তাহারা কাহাকে দোষ বলে, অপরাধ বলে, ত্রুটি বলে, তাহা অনেক ভর্ৎসনার পর অনেকদিনে শিখিয়া লইতে হইবে।[৩]

উমার দাদা গোবিন্দলাল চরিত্রটি লক্ষণীয়, গল্পকার জানিয়েছেন এই চরিত্রটি নিরীহ, এবং কাগজে লেখালাখি করলেও তার মত সর্বদা সংখ্যাধিক্য পাঠককুলের দিকেই থাকে। অর্থাৎ সে কোনো অর্থেই চিন্তাশীল নয়, সমাজের মন রেখে চলাই তার পক্ষে সুবিধাজনক। চারিত্রিক দৃঢ়তা না থাকায় গোবিন্দলাল না সম্পূর্ণ ভাবে কঠোর রক্ষণশীল হয়ে উঠতে পেরেছে না তাকে উদারপন্থি বলা যায়। তাই উমার স্বামী প্যারীমোহন গোবিন্দলালের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। প্যারীমোহন প্রকৃত অর্থেই রক্ষণশীল। তার লেখা থেকে তার কাজ সর্বত্রই তার রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই উমার কষ্ট অনুমান করে তাকে বাপের বাড়ি আনার কথা উঠলেও গোবিন্দলাল প্যারীমোহনের সাথে যোগ দিয়ে তা প্রতিরোধ করেছে। অর্থাৎ গোবিন্দলালের কাছে বোনের কষ্ট তার সামাজিক স্বীকৃতির অন্তরায় হয়েছে।

কাহিনির অগ্রগতির সাথে সাথেই আমরা দেখতে পাই খাতাটি ক্রমশ উমার স্বাধীন ভাব প্রকাশের মাধ্যম হয়ে ওঠে। খাতাটি ডায়েরির মতই তার ব্যাক্তিগত ভাব প্রকাশের জায়গা। তাই "যশি বাড়ি চলে গেছে, আমিও মার কাছে যাব" বা "দাদা যদি একবার বাড়ি নিয়ে যায় তা হলে দাদার লেখা আর কখনো খারাপ করে দেব না" ইত্যাদি বাক্যের মধ্যে দিয়ে উমার বিয়ের পর পিতৃগৃহে ফিরে যাওয়ার আকুল আর্তি প্রকাশ পায় তার খাতার পাতায়। আগে মেয়েদের শিক্ষা অর্জনের বিবিধ বাধার সাথে একাধিক কুসংস্কারও প্রচলিত ছিল যেমন মেয়েদের শিক্ষা অর্জনে বৈধব্যযোগ দেখা যায়। উমার স্বামী প্যারীমোহন এজাতীয় তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এক শরৎকালের সকালে আগমনীর গান শুনে ব্যাকুল হয়ে সেই গান খাতায় তুলে নেওয়ার অপরাধে উমা চিরদিনের মত তার খাতাটি খুয়েছে। শুধু খাতা কেড়ে নেওয়াই নয় আসলে বিষয়টির

মধ্য দিয়ে একটি শিশুর স্বাধীন মনোভাব স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তৎকালীন সমাজে রক্ষণশীল পরিবারগুলিতে নারীর ন্যূনতম ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা পর্যন্ত ছিল না। শিশু তথা নারীদের ওপর এই অসাম্য ও অবিচারের নিরাময় হয়না। তাই গল্পকার শেষে জানিয়েছেন প্যারীমোহনের যে 'সূক্ষ্মতত্ত্বকন্টকিত বিবিধ প্রবন্ধপূর্ণ' খাতাটি ছিল সেটা কেড়ে নিয়ে ধ্বংস করতে পারে এমন 'মানবহিতৈষী' কেউ নেই। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য করেছেন-

> কত সহজ উপকরণের সাহায্যে কতখানি গভীরে যাওয়া যেতে পারে এই গল্পটি তার চমকপ্রদ উদাহরণ। উমার তুচ্ছ লেখার খাতাটি কেড়ে নেওয়ার মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা প্রকাশিত হয়েছে, তা যেন রক্ষণশীল বাঙালী পরিবারের একটা সর্বাঙ্গীণ শোষণকেই ফুটিয়ে তুলেছে, উমার মতো লক্ষ লক্ষ মেয়ের চাপা কান্নার অস্ফুট ধ্বনি গল্পটির মধ্যে ফেটে পড়েছে। আপাত দৃষ্টিতে কাহিনী ভারবর্জিত এবং সহজ, অথচ অন্তরঙ্গে একটি সুবৃহৎ বক্তব্য সংকেতিত— 'খাতা' ছোটগল্পের এই মৌলিক গুণে গুণান্বিত।[৪]

কৈশোরের স্বাভাবিক বিকাশ, স্থানান্তরণ এবং সেই কারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সামাজিক পেষণের এক করুণ চিত্র দেখা যায় 'ছুটি' গল্পে ফটিক চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে। ফটিক তার নামের মতই স্বচ্ছ ও নির্মল। সবেমাত্র শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণকারী ফটিকের মধ্যে কৈশোরের দুরন্ত স্বভাব বিদ্যমান। গল্পের শুরুতেই খেলার মধ্যে দিয়ে ফটিকের এই দুরন্ত স্বভাবটি লক্ষ করা যায় যেখানে বালকদের সর্দার ফটিক ও তার দল একটি প্রকাণ্ড শালকাঠকে গড়িয়ে নিয়ে যাবে মনস্থির করে এবং এর ফলে এই কাঠের মালিকের যে বিরক্তির উদ্রেক ঘটবে সেই ভাবনা তাদের খেলার আনন্দকে বর্ধিত করে। কিন্তু এই ভাবনায় অন্তরায় দেখা যায় যখন ফটিকের ভাই মাখনলাল এই কাঠে চেপে বসে এবং এই খেলায় আহত হয়। ফটিক ও মাখনের চরিত্রে বৈপরীত্য লক্ষ করা যায় ফটিক যেমন লেখাপড়ায় অমনোযোগী ও উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের মাখন তেমনই সুশীল ও বিদ্যানুরাগী। ঠিক এই কারণেই মাখন মিথ্যে অপবাদ দিলেও তাদের মা রায় দিয়েছে মাখনেরই পক্ষে আর ফটিকের কপালে জুটেছে চপেটাঘাত। এখানে তাদের মায়ের মধ্যে এক সূক্ষ্ম পক্ষপাতিত্ব লক্ষ করা যায়। তাই যখন ফটিকের মামা বিশম্ভর বাবু ফটিককে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছেন সেখানেও তাদের মা মূলত মাখনের হিতাহিত চিন্তাই করে ফটিককে কলকাতায় পাঠাতে সম্মত হয়েছেন।

ফটিকের মধ্যে কলকাতায় যাওয়ার যে প্রবল উৎসাহ ছিল কলকাতায় পৌছনোর পর সেই উৎসাহ হ্রাস পেতে পেতে কাহিনি ক্রমশ ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে এগিয়েছে। কলকাতায় পৌঁছনোর পরই ফটিকের পরিবেশের পাশাপাশি কাহিনির পটও পরিবর্তিত হয়েছে। গ্রামের মুক্ত বাতাসে বেড়ে ওঠা এই সতেজ প্রাণটির শহরে আসার পর

অবস্থা- "ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেওয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।"[৫] প্রবলভাবে গ্রামের, খেলার এবং সর্বোপরি মায়ের অভাব বোধ করে ফটিকের বিচলিত হওয়ার কারণ- অকস্মাৎ ফটিকের মামারবাড়ি আগমনে তার মামি মোটেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছায় থাকা যে কোন ভাবেই গর্বের বিষয় নয় ফটিককে তা পদে পদে অনুভব করতে হয়েছে। সমাজের কৈশোরের প্রতি যে স্নেহহীন ভাবমূর্তি তা লেখক বর্ণিত করেছেন ফটিকের মধ্য দিয়ে-

> বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মত পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা।...তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।[৬]

স্কুলে বই হারিয়ে ফেলায় অপমান, প্রহার তার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছিল। শরীর খারাপে সে মামীর কাছে আরো উপদ্রব হয়ে উঠবে এই আশঙ্কা করেই ফটিক একাই অসুস্থ শরীরে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল, কিন্তু সে যাত্রা তাকে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যায়নি। সাংসারিক সুখ-দুঃখ পেরিয়ে ফটিক যাত্রা করেছে অনন্তর পথে।

ফটিক তার গ্রামে তার দলের মধ্যে যে মর্যাদাসম্পন্ন স্থানে ছিল সেখান থেকে কলকাতায় আসার পর ফটিক পেয়েছে শুধু অসম্মান আর লাঞ্ছনা। অসম্মান শিশুর পক্ষেও সহ্য করা কঠিন। কলকাতায় আসবার পর দিনগুলো ফটিকের কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে কারণ সদ্য কৈশোরে অবতীর্ণ ছেলেটি ঘরে ও বাইরে স্নেহহীনতার ঘেরাটোপে বন্দি। তাই ফটিকের মৃত্যুর দিকে তাকালে দেখা যায় যে তার 'ছুটি হয়েছে', তার মৃত্যুটি তাকে এই অনাদরপূর্ণ পরিবেশ থেকে পরিত্রাণ দিচ্ছে। 'ছুটি' গল্পটি সম্পর্কে রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন-

> ফটিকও একশ্রেণির উদ্ভিদ্ এবং অধিকাংশ উদ্ভিদের মতোই পরিবেশচ্যুত হওয়াতে নিস্ফল হইয়া মারা গেল। খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান যে, শিশুর সুষ্ঠ বিকাশের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ আবশ্যক। শিশুর অনুকূল পরিবেশলাভই তাহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ শিক্ষালাভ, তাহার স্বভাব ও অভাব শিশুর পক্ষে জীবনমরণের কারণ হইতে পারে।[৭]

রবীন্দ্রনাথ শিশু হৃদয়কে যে লঘু চোখে দেখেননি তার দৃষ্টান্ত তাঁর সৃষ্টি সম্ভারের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়। শিশুর ঘরের পরিবেশের পাশাপাশি তার বাইরের পরিবেশেও একটি শিশুকে কী জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং সেই সমস্যা শিশু হৃদয়ে কী জাতীয় ভাবের উদ্রেক ঘটায় রবীন্দ্রসাহিত্যে সে জাতীয় চিন্তার সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। এমনকি তাঁর শিক্ষা চিন্তার সাথেও এ জাতীয় চিন্তাগুলি ভীষণ ভাবেই সম্পর্কযুক্ত। তাই শিশুর সামাজিক সমস্যা বা সমাজঘটিত কোনো বিষয় শিশু চরিত্রে কী প্রভাব ফেলে তার দৃষ্টান্ত বহন করছে আলোচ্য গল্পগুলি। বিদ্যালয়ে শিক্ষক দ্বারা উৎপীড়ন, লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হওয়া এক শিশু কন্যার মানসিক যন্ত্রণা এবং স্বপরিবেশচ্যুত এক মুক্ত শিশুর এক নতুন স্নেহশূন্য পরিবেশে সামঞ্জস্য রক্ষা না করতে পারা সবকিছুর মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিশু হৃদয়কে উপলব্ধি করার অসামান্য দক্ষতার পরিচয় মেলে।

তথ্যসূত্র:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, সুলভ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৯৬, পৃষ্ঠা ৪২২

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, সুলভ সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৯৫, পৃষ্ঠা ৫০২

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, সুলভ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৯৬, পৃষ্ঠা ৪০৩

৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ', বাক্-সাহিত্য, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৫৩ পৃষ্ঠা ২১-২২

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, সুলভ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৯৬, পৃষ্ঠা ৩৪৭

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, সুলভ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৯৬, পৃষ্ঠা ৩৪৬-৩৪৭

৭. প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৬১, পৃষ্ঠা ৬৫

দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার আদিবাসী সংস্কৃতি : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

সায়ন দেবনাথ
গবেষক, সেন্টার ফর আদিবাসী স্টাডিজ অ্যান্ড মিউজিয়াম,
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: অধুনা পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলা, যথাক্রমে- পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও বীরভূমে জেলার পশ্চিমাংশ সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার অন্তর্গত। এই অঞ্চলের উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে রয়েছে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা রাজ্যদ্বয়।ঔপনিবেশিক সময়কালে দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় প্রশাসনিক কার্যকলাপ পরিচালনার সুবিধার্থে জঙ্গলমহল নামক একটি পৃথক জেলা গড়ে তোলা হয়েছিল। মূলত অবিভক্ত মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূমের একত্রীকরণের মাধ্যমে জঙ্গলমহল জেলাটি গঠিত হয়েছিল। বর্তমানে জঙ্গলমহল নামে আর কোনও জেলার অস্তিত্ব নেই। তবে দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার পাহাড় ও জঙ্গলাকীর্ণ অংশ আজও লোকমুখে জঙ্গলমহল নামে পরিচিত।এই প্রবন্ধে মূলত ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও বীরভূমের বিভিন্ন আদিবাসী সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলির বিষয়ে আলোকপাত থাকবে।
সুচকশব্দ: আদিবাসী, সংস্কৃতি, গরাম থান, বোঙ্গা, পাহাড় পূজা, করম, বাঁদনা।

বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম অংশ আদিবাসী সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এক অঞ্চল। এখানে সাঁওতাল, মুন্ডা, ভূমিজ, হো, শবর, কোড়া, মাহালী, ওঁরাও ও বিরহড় ইত্যাদি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসতি রয়েছে। এসকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যায় এক প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতিফলন পাওয়া যায়। সাংস্কৃতিক অভিযোজনের ধারায় হিন্দুধর্ম আদিবাসী জীবনে প্রবল বিস্তার করতে সমর্থ হলেও বহুক্ষেত্রেই এই আদিবাসী সংস্কৃতির স্বকীয়তা আজও অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ রয়েছে।বিশেষত আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির ধর্মজীবনে প্রাচীন ধারার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের একাধিক গরাম থানগুলি আদিবাসী ধর্মের স্বকীয়তা ও প্রাচীনত্বের স্বপক্ষে অন্যতম প্রমাণ বহন করে। গ্রামের বসতি অঞ্চলের শেষপ্রান্তে সাধারণত গরাম থানগুলি গড়ে ওঠে। আবহমানকাল ধরে এই থানগুলি আদিবাসী ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।মূলত শাল গাছের নীচেই গরাম থানগুলির অস্তিত্ব দেখা যায়। এছাড়া মহুল বা মহুয়া, কেন্দু ও কুসুম গাছের নীচেও গরাম থান গড়ে ওঠার নিদর্শন কম নয়। আদিবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে শাল গাছের সবিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তাঁদের ধর্মীয় রীতি নীতিতে শাল গাছের শাখা-প্রশাখা, পাতা ও ফুল ব্যবহৃত হয়। চৈত্র মাসে উদযাপিত শারুল পরবে গরাম থানে শাল গাছের নতুন পাতা ও ফুল অর্পণ করতে হয়। শারুল হল আদতে দক্ষিণ

পশ্চিম বাংলার ভূমিজ, হো, কোড়া, শবর ও মাহালীদের বসন্তোৎসব। অন্যদিকে সাঁওতালদের মধ্যে এই পরবটি বাহা নামে পরিচিত। ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী থেকে বাহা পরবের সূচনা হয়। শারুল তথা বাহা পালন করা না পর্যন্ত শাল গাছের পাতা ও ফুল আদিবাসীরা ব্যবহার করতে পারেন না।

সাঁওতাল ও মুন্ডা জনজীবনের সাথে সম্পৃক্ত জাহের থান ও সারনা থান কার্যত গরাম থানেরই প্রতিরূপ। তবে সাঁওতালদের জাহের থান একমাত্র শাল গাছের নীচে গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয়। গরাম থানগুলিকে চেনার সবচেয়ে বড় উপায় হল গাছের নীচে হাতি ও ঘোড়ার মাটির মূর্তিস্তূপীকৃত অবস্থায় থাকে। গরাম থানের অধিষ্ঠিত সত্তা হলেন গরাম দেবতা বা গরাম বুড়ো ও তাঁর সঙ্গিনী হলেন গরাম বুড়ি। এই থানে সাধারণত কোনরূপ মূর্তি থাকে না। তবে অপরিশীলিত কিছু প্রস্তরখণ্ডের অস্তিত্ব থাকতে পারে এবং এগুলিকে বিভিন্ন বোঙ্গার রূপ হিসেবে গণ্য করা হয়। আদিবাসীদের ধর্ম জীবনে মূর্তি পূজার প্রচলন নেই। তাঁরা একাধিক বোঙ্গার উপাসনা করেন এবং অধিকাংশ বোঙ্গাই নিরাকার অথবা তাঁরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান সমূহ, যেমন- পাহাড়, শাল ও করম গাছ ও বিভিন্ন আকৃতির পাথরের মাধ্যমে উপস্থাপিত হন। আদিবাসীদের পাশাপাশি হিন্দু অধিবাসীদের কাছেওগরাম থানগুলি পবিত্র হিসেবে পরিগণিত হয়।দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার গ্রামগুলিতে আবার হিন্দুদের জন্য পৃথক গরাম থানের উপস্থিতিও রয়েছে। তবে আদিবাসী ও হিন্দু গরাম থানের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল যে আদিবাসীদের গরাম থানের যাবতীয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলি মূলত তাঁদের নিজস্ব পুরোহিত লায়া বা পাহান বা দেহরি পরিচালনা করেন।অন্যদিকে হিন্দু গরাম থানে ব্রাহ্মণ পুরোহিত যাবতীয় ধর্মীয় কার্যকলাপ সম্পাদন করেন। প্রতি মাসের বিশেষ তিথিগুলিতে গরাম থানে পূজার্চনা করা হয়। এছাড়া আদিবাসীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবগুলিতে গরাম থানে অবশ্যই বিশেষ পূজার্চনার আয়োজন করা হয়ে থাকে।সর্বোপরি জন্ম ও বিবাহ সংক্রান্ত আচারে গরাম থানের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। নবজাতকের মঙ্গল কামনায় মুখেভাতের দিন গরাম থানে বিশেষ পূজা দেওয়া হয়। বিবাহের পর নবদম্পতি একত্রে গরাম থানে উপস্থিত হয়ে গরাম দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার আদিবাসী ধর্মীয় উৎসবগুলির মধ্যে করম পরব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই পরবে করম গাছের ডাল বা শাখাকে দেবতা রূপে উপাসনা করা হয়। করম পূজা হল মাত্র একদিনের উৎসব এবং সারারাতব্যাপী করমের পূজা অনুষ্ঠিত হয়।সাধারণত ভাদ্র আসের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথিতে বা পার্শ্ব একাদশীর দিন দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে সম্মিলিত উদ্যোগে করম পরব পালিত হয়। তবে সাঁওতালরা নির্দিষ্ট কোন তিথিতে করম পরব পালন করেন না।মূলত আশ্বিন মাসের শেষদিন অথবা ডাক সংক্রান্তির দিন থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত সময়কালে সাঁওতালরা করমের আয়োজন করে থাকেন। করমের বিভিন্ন প্রকারভেদ

রয়েছে। করম দেবতার বহিঃপ্রকাশের কোনরূপ ইঙ্গিত পাওয়া গেলে পরিবারের বিশেষ উদ্যোগে করম পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। মাথার চুলে জটা পড়ে যাওয়া, আকস্মিকভাবে রোগের প্রাদুর্ভাব অথবা চাল সেদ্ধ হওয়ার সময় অঙ্কুরোদগম ইত্যাদি করম দেবতার আগমনের ইঙ্গিত বহন করে। এই রূপ পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে করম পরব আয়োজিত হয়।

ভাদ্র মাসে উদযাপিত করম পরব 'জাওয়া করম' নামে সমধিক পরিচিত এবং এটি হল দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার আদিবাসী ধর্মজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব। পার্শ্ব একাদশীর সাতদিন বা নয়দিন পূর্বে আদিবাসী কিশোরীরা জাওয়া ডালা প্রস্তুত করেন। বাঁশের তৈরি একটি ডালার মধ্যে গ্রাম সংলগ্ন নদী বা খাল থেকে মাটি সংগ্রহ করে নিয়ে আসার পর তার ওপরে ধান, কলাই ও সরিষার বীজ বপন ছড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে জাওয়া ডালার মধ্যে হলুদ মিশ্রিত জল দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। দিনেরবেলা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাওয়া ডালাকে বাড়ির উঠোনে সূর্যের আলোর মধ্যে রাখা হয় যাতে সহজেই বীজগুলির অঙ্কুরোদগম ঘটে। করম পরবের আগের দিন পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় জাওয়া ডালাকে উঠোনের মাঝে রেখে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়।পরবের আগের দিন সন্ধ্যায় জঙ্গল থেকে একটি করম ডাল কেটে এনে সেটিকে সারারাত পুকুরের জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখার নিয়ম রয়েছে। পরবের দিন আদিবাসী সমাজের নিজস্ব পুরোহিত করমের এই ডালটিকে উঁচু একটি বেদীর মধ্যে প্রোথিত করেন। আদিবাসী কিশোরীর দল যত্ন করে প্রস্তুত জাওয়া ডালাগুলি করম ডালের চারিদিকে মাটির ওপর সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখে। প্রতিটি জাওয়া ডালার পাশে ঝিঙে পাতার ওপরে একটি বোঁটাযুক্ত শসা রেখে দেওয়া হয়। পরবের যাবতীয় রীতিনীতি সম্পাদিত হওয়া না পর্যন্ত এই কিশোরীদের নিরম্বু উপবাসে থাকতে হয়। সারারাত ধরে লায়া করমপূজার বিভিন্ন রীতিনীতি পালন করেন ও আদিবাসী কিশোর-কিশোরীদের সমবেত নৃত্যগীত পরিবেশিত হয়। পরদিন সকালে সূর্য উদয়ের আগেই করমের ডালটিকে পুকুর অথবা নদীতে বিসর্জন দেওয়ার রীতি রয়েছে।

করম পরবের মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রাচীন কৃষিজীবনের এক অনন্য নিদর্শন। করম উপলক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত জাওয়া ডালার মধ্যে বিভিন্ন বীজ বপন ও তাতে নিয়মিত হলুদ জল প্রদানের মাধ্যমে আদতে হাতেকলমে কৃষিকার্যের শিক্ষা দেওয়া হয়।ভাদ্র মাস অর্থাৎ যে সময়ে করমের আয়োজন করা হয়ে থাকে তার সবিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে শস্যদানার বপন, আষাঢ় মাসে অঙ্কুরিত বীজের রোপণ ও অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ফসল বা ধান ঘরে তোলার পর্যায়ে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় কৃষিকর্মের নিরিখে ভাদ্র মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাল হিসেবে বিবেচিত হয়।ভাদ্র মাসে প্রখর রৌদ্র ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের দরুন মাঠেই ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা থাকে। তাই প্রকৃতিকে তুষ্ট করার মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসল লাভের উদ্দেশ্যে ভাদ্র মাসে সম্ভবত করম পরবের উদযাপন হয়।সম্প্রদায় ও গ্রামভেদে ভাদ্র

মাসে আয়োজিত করম পরব উদযাপনের রীতির ক্ষেত্রে বিবিধ পার্থক্য দেখা যায়। তবে করমের মধ্যে যে প্রাচীন কৃষি বিষয়ক বিশ্বাসের অভূতপূর্ব প্রতিফলন পাওয়া যায় সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

কার্তিক মাসের অমাবস্যায় হিন্দুরা যখন কালীপূজায় মেতে ওঠেন তখন দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলি বাঁদনা পরবের আনন্দে সামিল হন।করম পরব একদিনের উৎসব হলেও বাঁদনা পরব তিনদিন ধরে উদযাপিত হয়। বেশকিছু গ্রামে আবার পাঁচদিনব্যাপী বাঁদনা পরব রীতি বিদ্যমান। সাঁওতালদের মধ্যে এই পরবটি সহরাই নামে অধিক পরিচিত। কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ওমাঘ মাসের যেকোন এক শুভ তিথিতে সাঁওতালরা সহরাই উদযাপন করেন। কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত বাঁদনা পরবের মূলত তিনটি পর্যায় রয়েছে। পরবের প্রথম দিন হয় গরু জাগরণ, দ্বিতীয় দিনে গোয়াল পূজাবা গোরেয়া পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং তৃতীয় দিন বা শেষদিনে গরুখুঁটা বা কাঁড়াখুঁটা পালন করা হয়। বাঁদনা পরবের প্রস্তুতি হিসেবে সাতদিন আগে থেকে নিয়মিত গরু, মহিষ বা কাঁড়ার শিংয়ে কুজরী তেল অথবা মহুয়া তেল লেপন করার রীতি রয়েছে। বাঁদনা উপলক্ষ্যে আদিবাসী বাড়ির দেওয়ালগুলিকে বিভিন্ন রঙের প্রয়োগে ও বিবিধ নকশার অলঙ্করণে সুসজ্জিত করে তোলা হয়।

অমাবস্যার দিন সকালে গোয়াল ঘর পরিস্কারের মাধ্যমে বাঁদনা পরবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। গ্রামের পুকুরে অথবা নদীতে গবাদি পশুগুলিকে স্নান করানো হয়। এরপর কয়েকটি কাঁচা পেপে নানাবিধ আকৃতিতে কেটে নিয়ে সেগুলিকে বিভিন্ন রঙের মধ্যে ডুবিয়ে গরু, বাছুর ও কাঁড়ার গায়ে ছাপ দেওয়া হয়। এভাবে বিভিন্ন রঙের সমাহারে গবাদি পশুগুলি অপূর্ব সৌন্দর্যে সেজে ওঠে। সন্ধ্যাবেলাতে মেথি, আতপ চাল, দূর্বা ঘাস, চালের গুড়োর পিঠে ও মাটির প্রজ্বলিত প্রদীপ একটি কুলোর মধ্যে রেখে গরু, বাছুর ও কাঁড়াগুলিকে বরণ করা হয়। বরণের এই রীতি 'গরু চুমানো' নামে পরিচিত। বাঁদনা পরবের প্রথম রাতে 'জাগরণ' বা 'গরু জাগরণ'-এর রীতি রয়েছে অর্থাৎ সারারত গান-বাজনা ও নৃত্যের মাধ্যমে গবাদি পশুগুলোকে সারারাত জাগিয়ে রাখতে হয়। বাঁদনা পরবে গবাদি পশুদিগকে লবণবিহীন পিঠা খাওয়ানোর রেওয়াজ রয়েছে।দ্বিতীয়দিন অর্থাৎ প্রতিপদে সকালে গোয়াল পূজা তথা গোরেয়া পূজা সম্পাদিত হয়। গোয়াল পূজার ক্ষেত্রে শাল বা মহুয়া গাছের একটি শাখাকে ঠাকুর রূপে গোয়াল ঘরের মধ্যে পূজার্চনা করা হয়। পুকুর থেকে সংগৃহীত একতাল কাদার মধ্যে ডাঁটা সমেত শালুক ফুল পুঁতে দেওয়া হয় এবং এটিকে গোরেয়া দেবীর প্রতিরূপ হিসেবে পূজা করা হয়ে থাকে। যাদের গোয়ালে কাঁড়া বা মহিষ থাকে তাঁদের অবশ্যই বাঘুত দেবতার পূজা দিতে হয়। বাঘুতের পূজায় একটি কালো রঙের মোরগ বলি দিতে হয় এবং বলির মাংশ কেবলমাত্র বাড়ির পুরুষরা গোয়ালের মধ্যে বসে ভক্ষণ করতে পারেন। বাঁদনা পরবের দ্বিতীয় রাত্রেও প্রথম দিনের ন্যায় গরু জাগরণ অনুষ্ঠিত হয়। পরবের শেষদিনে বাড়ির উঠোনে একটি খোঁটা পুঁতে তার সাথে গরু অথবা মহিষ বেঁধে

গরুখুঁটা বা কাঁড়াখুঁটা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উচ্চস্বরে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। এভাবে পশুগুলোকে ক্রমাগত উত্তক্ত করার ফলে খোঁটার চারিদিকে ঘুরতে শুরু করে। করমের ন্যায় বাঁদনা পরবও হল একটি কৃষি বিষয়ক উৎসব। কৃষিকার্য দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার আদিবাসী জনজীবনের প্রধান চালিকাশক্তি। তাই বাঁদনার মাধ্যমে গবাদি পশুদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। অন্যদিকে গরুখুঁটা বা কাঁড়াখুঁটার অন্যতম উদ্দেশ্য হল যে আগামীদিনের কৃষিকর্মে সংশ্লিষ্ট গরু অথবা মহিষটি কতখানি কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে তার জন্য শক্তি যাচাই করা হয়।

ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় একাধিক ছোট টিলা বা পাহাড় রয়েছে। স্থানীয় ভাষায় এগুলি ডুংরি নামে পরিচিত।আদিবাসী ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী এসকল পাহাড়গুলি হল মারাং বুরু বা মারাং বোঙ্গার আবাসস্থল। দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার কয়েকটি বিখ্যাত পাহাড় পূজা হল- ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ির অন্তর্গত কানাইশর পাহাড়, গাডরাসিনী পাহাড়, ডুলুংসিনী পাহাড়, তামলিসিনী পাহাড়; বাঁকুড়ার রানীবাঁধের অন্তর্গত বামনিসিনী পাহাড় ইত্যাদি। প্রতিবছর আষাঢ় মাসের দ্বিতীয় শনিবার কানাইশর পাহাড়ের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কানাইশরের পাহাড় পূজার আগের সপ্তাহের শনিবার গাডরাসিনী পাহাড়ের পূজা হয়। কানাইশর পাহাড় পূজা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়। এই পূজায় ঝাড়গ্রামের পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি এমনকি প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকে অসংখ্য মানুষের আগমন ঘটে।মাঘ মাসের পয়লা তারিখে রানীবাঁধে বামনিসিনী পাহাড়ের পূজা আয়োজিত হয়। ১লা মাঘ নববর্ষ বা নামা সিরমা উপলক্ষ্যে ভূমিজ আদিবাসীরাই মূলত বামনিসিনী পাহাড়ের পূজা করে থাকেন। পাহাড় পূজার মধ্যেও আদতে কৃষিজীবনের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। মূলত পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কামনায় আষাঢ় মাসে অধিকাংশ ডুংরি বা পাহাড়গুলির পূজার্চনা সম্পাদিত হয়।

শিকার পরব হল দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার আদিবাসী জনজীবনের অপর এক অন্যতম ধর্মীয় উৎসব। সাঁওতালদের মধ্যে শিকার পরব মূলত সেঁদরা বা সেন্দরা নামে সুপরিচিত। প্রতিবছর বৈশাখী পূর্ণিমার দিন পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় বা আযোদিয়ী বুরুতে সাঁওতাল জাতির বার্ষিক শিকার উৎসব বা দিশুম সেঁদরা পালিত হয়। তবে দিশুম সেঁদরার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র শিকার নয়।সেঁদরা উপলক্ষ্যে সাঁওতালদের বার্ষিক অধিবেশন আয়োজিত হয় এবং তাতে আগামীদিনে সাঁওতাল সমাজ জীবনের সাথে সম্পৃক্ত একাধিক রীতিনীতি নির্ধারিত হয়।তবে শুধুমাত্র সাঁওতালরাই নয় শবর, বিরহড়, মাহালী ও কোড়া আদিবাসীদের মধ্যেও শিকার উৎসবের প্রচলন রয়েছে। ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর ১ ব্লকের অন্তর্গত আঁকরো গ্রামের মাহালী অধিবাসীরা প্রতিবছর মকর সংক্রান্তির দিন বিকেলে গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গলে দলবদ্ধভাবে শিকারে যান।বাঁকুড়ার রানীবাঁধ ব্লকের রাজাকাঁটা গ্রামের মাহালীরা প্রতিবছর মাঘ মাসে প্রতিবেশী সাঁওতালদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে শিকার পরবে সামিল হন।

দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার অধিবাসী বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির ধর্ম জীবনে আরও বেশকিছু উৎসব সম্পৃক্ত রয়েছে। এগুলির মধ্যে পৌষ বা মকর সংক্রান্তির পূণ্যলগ্নে টুসু পরব অন্যতম। তবে টুসু পরব শুধুমাত্র আদিবাসীদের উৎসব নয়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যেও টুসু পরব অত্যন্ত জনপ্রিয়। টুসু হলেন মূলত লৌকিক শস্যদেবী। বর্তমানে মূর্তির মাধ্যমে টুসু দেবীর উপাসনা করা হয়ে থাকে। তবে নিরাকারেও টুসু পূজার নিদর্শন রয়েছে। বেলপাহাড়ির বালিচুয়া গ্রামের ভূমিজ সম্প্রদায় ও বাঁকুড়ার রাইপুর ১ ব্লকের মল্লিকডাঙ্গা গ্রামের কোড়া আদিবাসীরা টুসু পরব পালন করলেও সেখানে কোনরূপ মূর্তির অস্তিত্ব থাকে না। মকর সংক্রান্তির দিন সাঁওতালরা সাকরাত পরব পালন করেন।এই পরব উপলক্ষ্যে মারাং বুরুর উদ্দেশ্যে চিঁড়া, মুড়ি ও পিঠে ভোগ হিসেবে নিবেদন করা হয়। বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম অংশে ভাদ্র মাসের আরেকটি বিখ্যাত লৌকিক উৎসব হল ভাদুপূজা। বর্তমানে বেশকিছু গ্রামের আদিবাসীরা ভাদুপূজার আয়োজন করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ভাদু ও টুসুর মূর্তির মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ নেই। সর্বোপরি বাড়ির মেয়েরাই মূলত ভাদু ও টুসু পূজার যাবতীয় রীতিনীতি পালন করেন। সারারাতব্যাপী ভাদু ও টুসুর পূজা হয় এবং পরদিন সকালে মূর্তির বিসর্জন দেওয়া হয়। এছাড়া এই অঞ্চলের বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজস্ব কিছু উৎসবের প্রচলন রয়েছে। এগুলির মধ্যে সাঁওতালদের এরক সিম, মাগ সিম; মাহালীদের জাতাল পূজা; কোড়াদের নাগপূজা অন্যতম। তবে শারুল বা বাহা, করম পরব, বাঁদনা পরব ও শিকার উৎসবের ন্যায় জনপ্রিয়তা ও সার্বজনীনতা আর কোনও পরব বা উৎসবের নেই।

সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এমনকি আদিবাসী সমাজেও বৈষ্ণব মতাদর্শের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। অনেক আদিবাসী গ্রামেই সম্মিলিত উদ্যোগে প্রতিবছর হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়ে থাকে। আদিবাসীদের বাড়ির উঠোনে হিন্দু বাড়ির আদলে দেবতার চিত্র সম্বলিত সুসজ্জিত তুলসী মঞ্চের উপস্থিতি রয়েছে। অনেকের গলায় তুলসীর মালা ও কপালে রসকলি দৃশ্যমান হয়।এই অঞ্চলে মারাং বুরু আজ কার্যত শিবের সাথে একাত্ম হয়ে গেছেন। বিবাহ ও শ্রাদ্ধ বিষয়ক সংস্কারে লায়ার বদলে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের উপস্থিতি দেখা যায়। তবে হিন্দু ধর্মের প্রভাব সত্ত্বেও আদিবাসী ধর্মজীবনের সাথে সম্পৃক্ত তাঁদের নিজস্ব উৎসবগুলির অধিকাংশই বহুলাংশে স্বকীয়তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। শারুল, করম ও বাঁদনাপরবে হিন্দু ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব গোস্বামী নয় বরং আদিবাসী সমাজের নিজস্ব পুরোহিত লায়াই যাবতীয় ধর্মীয় আচার ও রীতিনীতি সম্পাদন করেন। সর্বোপরি হাঁড়িয়া আদিবাসী ধর্মভাবনার প্রেক্ষিতে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আদিবাসীদের প্রতিটি পরবেই তাঁদের নিজস্ব দেব-দেবী বা বোঙ্গার উদ্দেশ্যে হাঁড়িয়া নিবেদন করতে হয়। এমনকি পূর্বপুরুষদের আত্মার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য পালিত আচারে হাঁড়িয়া আবশ্যিক উপাদান। করম পরব ব্যতীত বাকি উৎসবগুলোতে মোরগ বলি দিতে হয়। সম্প্রদায় ও

গ্রাম ভেদে মোরগের রং নির্ধারিত হয়। বস্তুতপক্ষে হিন্দু ধর্মের বিপুল প্রভাব সত্ত্বেও দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার আদিবাসীরা আজ পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে মূর্তি উপাসকগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হননি। এখনও পর্যন্ত এই অঞ্চলের আদিবাসী ধর্মজীবনে সামগ্রিকভাবে প্রকৃতি পূজার ধারা বিদ্যমান।

তথ্যসূত্র

১। পশুপতি প্রসাদ মাহাতো, *জঙ্গলমহল ও ঝাড়খণ্ডী লোকদর্শন,* কলকাতা, পূর্বালোক পাবলিকেশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১২।

২। শিবেন্দুশেখর মিশ্র, *সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম মুদ্রণ, ২০১৭।

৩। ড. বিনয় কুমার মাহাতা, *আমার করম ভাইয়ের ধরম,* ভাগলপুর, এষা, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ।

৪। দিলীপ কুমার গোস্বামী, *সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি,* পুরুলিয়া, পারিজাত প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৬।

৫। মেঘদূত ভুঁই, *কৃষিকেন্দ্রিক পালপার্বণ,* বাঁকুড়াঃ টেরাকোটা, প্রথম মুদ্রণ, ২০২১।

৬। যোগেশচন্দ্র বসু, *মেদিনীপুরের ইতিহাস,* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ।

৭। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, *আদিবাসী সমাজ ও পালপার্বণ,* তৃতীয় মুদ্রণ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭।

৮। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ,* প্রথম খণ্ড, সপ্তম প্রকাশ, বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৮।

৯। সুহৃদ কুমার ভৌমিক (সম্পাদিত), *ধর্মবিশ্বাস, বৃক্ষপূজা ও দেবদেবী,* দ্বিতীয় মুদ্রণ, টেরাকোটা, বাঁকুড়া, ২০২১।

১০। সুব্রতকুমার মুখোপাধ্যায়, *ঝাড়গ্রামের লোকসম্পদ ও সংস্কৃতি,* প্রথম প্রকাশ, মনফকিরা, কলকাতা, ২০২১।

১১। বাবুলাল মাহাতো, (সম্পা), *অরণ্যসুন্দরী ঝাড়গ্রাম,* প্রথম মুদ্রণ, মহকুমা শাসক: ঝাড়গ্রাম, ঝাড়গ্রাম সদর মহকুমা, ২০২২।

১২। ক্ষিতীশ মাহাতো, *ঝাড়গ্রাম ও জঙ্গলমহলের জনসংস্কৃতি পরিচয়,* প্রথম খণ্ড, প্রথম মুদ্রণ, রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা, ২০১৯।

নবনীতা দেবসেনের ছোটগল্পে নারী : সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে

সন্দীপা মুখার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে সমাজে ও পরিবারে নারীর স্থান অনেকটা বলদে গেছে। বাইরের জগৎ সম্পর্কে একটি অযাচিত ভীতি ও জড়তা ধীরে ধীরে মেয়েদের মন থেকে দূরীভূত হয়েছে। শিক্ষার হার বাড়তে থাকায় চাকুরীজীবী মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মেয়েরা প্রমাণ করে দিয়েছে পুরুষের মতো তারাও সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে সক্ষম। তাই বিশ শতকের শেষের দিকে সত্তর, আশির দশকের কথাসাহিত্যে নারীর উপস্থাপনরীতি কিছুটা ভিন্ন মাত্রা নিয়েছে, বিশেষ করে নবনীতা দেবসেনের গল্পে। তিনি যে নারী চরিত্রদের অঙ্কন করেছেন তারা সময়ের বিচারে অনেকটাই এগিয়ে গেছে, যা পাঠকের ভাবনার জগতে এনে দিয়েছে এক অভিনব স্বাদ।
সূচক: পুরাতন চিন্তাধারার বাইরে এসে নারীর স্বাধীন চিন্তার বিকাশ।

মূল আলোচনা

গণ্ডি পেরিয়ে সীতার যে কী করুণ পরিণতি হয়েছিল— সে মনগড়া কাহিনি রামায়ণ যুগ যুগ ধরে আমাদের শুনিয়ে আসছে। মানুষও তা শুনছে আর মনে মনে বিপদের এক অদৃশ্য জাল বুনে চলেছে। তবে বিপদের ভয়কে উপেক্ষা করে গণ্ডির বাইরে এসে পুনরায় গোড়া থেকে নারীশক্তির জাগরণ ঘটানো কম দুঃসাহসিক বিষয় নয়, বাংলা সাহিত্যের এমনই এক দুঃসাহসিক, বলিষ্ঠ নারীকণ্ঠ নবনীতা দেবসেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যিনি আজীবন স্বাধীনচেতা, ডানপিটে পরিচয়ে পরিচিত। 'রূপকথা সমগ্র' বইয়ের ভূমিকা অংশে তিনি বলেছেন তাঁর রূপকথায় একটু নারীশক্তির প্রকাশ আছে। রাজা, রাজপুত্রেরা আর নায়ক নন, ভুল ভ্রান্তিভরা সাধারণ মানুষ। রানিরা আর রাজকন্যারা দুর্বল নন, অসহায় নন, তাঁরাই সক্ষম। বিপন্ন হলে উদ্ধারের ব্যবস্থা নিজেরাই করতে পারেন। নিঃসন্দেহে তাঁরাই নায়ক। তিনি চেয়েছিলেন শৈশব থেকেই ছেলে-মেয়েদের মনে রূপকথার এই উলটপুরাণ গেঁথে দিতে— যাতে শৈশবেই মেয়েরা নিজেদের শক্তির আভাস পায়।

অন্তর থেকে নারী শক্তি জাগরণের এই রসদ তিনি পেয়েছিলেন মা রাধারাণী দেবীর কাছে। তেরো বছর বয়সে বৈধব্য নেমে আসে রাধারাণী দেবীর জীবনে। স্বামীর মৃত্যুর পর শাশুড়ির উৎসাহে তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন এবং নারী সাহিত্যিক রূপে রীতি মতো প্রতিষ্ঠিত হন। ঘটনাচক্রে সেই সময়ের বিখ্যাত সাহিত্যিক নরেন্দ্র দেব এর

সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। এই পরিচয় ধীরে ধীরে এতটাই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে বিধবা হওয়া সত্ত্বেও তিনি নরেন্দ্র দেবকে বিয়ে করবেন মনস্থির করেন। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে দাঁড়িয়ে একজন বিধবা নারীর নিজের ইচ্ছায় দ্বিতীয় বার বিয়ে করার মতো ঘটনা সমাজে ও সাহিত্যে যথেষ্ঠ আলোড়ন ফেলেছিল। ১৯৩৮ সালে সেই বিখ্যাত কবি দম্পতি নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নবনীতা। বিখ্যাত কবি দম্পতির ঘরে জন্মগ্রহণ করার সুবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, বুদ্ধদেব বসু, প্রমুখ কবি সাহিত্যিকদের সান্নিধ্য নবনীতা দেবসেনের ভাবনার জগতকে আরো সুদূর প্রসারিত করে দিয়েছে। বিশেষ করে মা রাধারাণী দেবীর মতো সাহসী, প্রগতিশীল নারীকে তিনি জন্ম থেকেই কাছে পেয়েছেন; যা তাঁর নারীবাদী সত্তাকে আরো দৃঢ় করে তুলেছে এবং তিনি ক্রমশ হয়ে উঠেছেন নারীর একান্ত ভাষ্যকার। নারীদের প্রতি মমত্ব ও নারীর মনকে পরিমিত আবেগ, যুক্তি, বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসামান্য। শুধু মেয়েদের লেখা, মেয়েদের বিষয়ে লেখা, মেয়েদের দ্বারা প্রকাশিত, আর মেয়েদের দ্বারা সম্পাদিত বই নিয়েই একটা গোটা বইমেলা— এই ছিল তাঁর উদ্যোগে তৈরি লেখিকা গোষ্ঠী ‘সই’-এর আয়োজিত বইমেলা, যার নাম ‘সইমেলা’। এই মেলার মূল মন্ত্র ছিল ক্রিয়েটিভ উইমেন ফর পিস, শান্তির স্বপক্ষে সৃজনশীল নারী।

শুধু কাজে-কর্মে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে নবনীতা দেবসেনের দুঃসাহসিক ভাবনা সীমাবদ্ধ থাকেনি, তাঁর রচিত সাহিত্যেও একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে নারী— কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনি সর্বত্রই। এমনকি তাঁর গবেষণার বিষয়ও মধ্যযুগের প্রথম বাঙালি কবি চন্দ্রাবতীর সীতার দৃষ্টিকোণ থেকে রামায়ণ অনুবাদের প্রসঙ্গ। চন্দ্রাবতীর চিন্তাধারাকে গুরুত্ব দিয়ে নবনীতা দেবসেন বিংশ শতকের শেষে এসে আবারও নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে রামায়ণ, মহাভারতের নবভাষ্য রচনা করেছেন। তাঁর দুটি গল্পগ্রন্থ ‘সীতা থেকে শুরু’, ও ‘সপ্তকাণ্ড’ সীতাকেন্দ্রিক রামকথার নব-পাঠ। শুধু পৌরাণিক নারীর নবরূপায়ণই নয়, তিনি গল্পে আধুনিক নারীর মনেও এঁকে দিয়েছেন নবভাবনার আলো। ‘সীতা থেকে শুরু’ গ্রন্থের তিনটি পর্ব—

পর্ব এক : পৌরাণিকী
পর্ব দুই : মাতৃয়ার্কি
পর্ব তিন : আধুনিকী

‘সীতা থেকে শুরু’ গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত গল্পগুলি ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লেখা। গ্রন্থের ভণিতা অংশে লেখিকার মনোভাব স্পষ্ট— “... মহাকাব্য পড়তে পড়তে আমার কেবলই মনে হতো, এই বীর্য-বাহুবলসর্বস্ব পুরুষমানুষের যুদ্ধকাব্যের জগতে নারীর ঠাঁই বড় করুণ। সে লক্ষ্মীই হোক বা অলক্ষ্মীই। সীতাই হোক বা দ্রৌপদীই, তাড়াকাই হোক বা শূর্পনখা, যেন দুঃখ পেতেই তাদের জন্ম। তাদের দুঃখের মূল্যেই মহাকাব্যের নায়কদের বীরোচিত গুণাবলী প্রমাণিত হয়। এভাবেই কয়েকটি গল্প লেখা

হয়ে গিয়েছিল (আরো হয়তো হবে) মহাকাব্যের মেয়েদের ঘিরে। ধ্রুপদী কাহিনীর অন্তর্গত কোন রদবদল হয়নি, কেবল কিছু কল্পিত ঘটনা যুক্ত হয়েছে। আবার কাহিনীর নিজগুণেই তা বিযুক্ত হয়ে গেছে। নতুবা মহাকাব্যের কাহিনীর গতিপ্রকৃতি বদলে যেতে পারতো। গল্পগুলি শুধু পাঠকের মনে এক-একটা বিকল্প সম্ভাবনার রং ধরিয়ে দেয় মাত্র।”[১] রামায়ণ ও মহাভারতে পুরুষ চরিত্রগুলিকে শৌর্য-বীর্য সম্পন্ন করতে গিয়ে নারীর গৌরবকে অনেকাংশে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। নবনীতার গল্পগুলি নারীদের সেই ন্যায্য গৌরব ফিরিয়ে দিয়েছ।

‘মুল রামায়ণ’ গল্পের শুরুতেই তিনি বলেছেন— “সেই সত্য, যা রচিবে তুমি।/ ঘটে যা, তা সব সত্য নহে।”[২] ব্যাস, বাল্মীকির পরিবর্তে নারী মহাকবি থাকলে হয়তো রামায়ণ, মহাভারতের মূল ঘটনা পাল্টে যেত। সে রামায়ণ সীতার গৌরব কাহিনি বর্ণনা করতো। বাল্মীকি যেন রামায়ণের সেই কাহিনিকে পাল্টে দিয়েছেন আর নবনীতার রামায়ণ সেই ছাই চাপা সত্যকেই পুনরায় আবিস্কার করেছে। বাল্মীকি রামায়ণে হনুমান লঙ্কায় প্রবেশ করে সীতার কাছে ফিরে যাওয়ার আর্জি জানায়, কিন্তু সীতা হনুমানের সঙ্গে ফিরে যেতে অস্বীকার করে। এর সম্পূর্ণ বিপরীতে নবনীতার সীতা নির্দ্বিধায় হনুমানের পিঠে চড়ে রামের কাছে এসে উপস্থিত হন। রামচন্দ্রও সীতাকে দেখে বেশ খুশিই হন, কিন্তু বাল্মীকি তা হতে দেবেন কেন? এত তাড়াতাড়ি সীতা উদ্ধার হলে যে যুদ্ধ, রাবণ বধ, ধর্ম সংস্থাপন কিছুই হবে না। রামচন্দ্রের কীর্তি, বীরগাথার প্রচার করে বাল্মীকিই বা বিখ্যাত হবেন কী করে ? তখন বাল্মীকি সীতাদেবীকে দোষারোপ করলেন— “...সুলক্ষণা রাজকন্যা হয়ে, একটা সামান্য মুখপোড়া হনুমানের গলা ধরে ঝুলে পড়তে আপনার লজ্জা-ঘেন্না হলো না ?”[৩] নবনীতার সীতাও ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নন, তিনি আগুনের মতো ফোঁস করে উঠে বললেন - “মুখ সামলে কথা বলবেন ঋষিমশাই! ... আজ উইপোকের কল্যাণে আপনি মুনিঋষি বনে গেলে কি হবে, ছিলেন তো সেই চোর-ডাকাতি – মনের মালিন্য আপনার কাটেনি মুনিবর।”[৪] আত্মসম্মান বাঁচাতে সীতার এই উত্তরটাই কাঙ্ক্ষিত। তবে, এই উত্তর মেনে নিতে পারেন নি বাল্মীকি। বাল্মীকি দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বলেচেন— “বড্ডো তেজী মেয়েমানুষ, না? আচ্ছাঃ, আমিও মহাকবি বাল্মীকি! দেখে নেবো !...তোমার কী হাল করি, তুমি দেখো !”[৫] বুঝতে বাকী থাকে না উচিত কথা বলার অপরাধে সীতার ভবিষ্যৎ জীবনে নেমে আসা অশনি সংকেত।

পরবর্তী ‘রাজকুমারী কামমল্লী’ গল্পে রাজকুমারী কামমল্লী আসলে রাক্ষস রাজকন্যা শূর্পণখা। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’-এ যে শূর্পণখার পরিচয় আমরা পেয়েছি, নবনীতা দেবসেনের শূর্পণখা তারই যোগ্য উত্তরসূরী। মধুসূদনের মতো নবনীতার কামমল্লী অর্থাৎ শূর্পণখাও নিজের প্রেম, দেহ-বাসনাকে অকপটে স্বীকার করেছে। কামজ্বরে পীড়িতা শূর্পণখা নিজের মনোবাঞ্ছা জানিয়ে রামচন্দ্রকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে। সব বুঝে শুনে রামচন্দ্র নিজের বিবাহিত পরিচয় গোপন করে শূর্পণখার

সঙ্গে শুধু তামাশা করে চলেছেন - "কামমল্লীর সঙ্গে কথা বলতে তাঁর খুব ভালো লাগছে। ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে সময়টা দিব্যি কাটছে।"[৬] অথচ শূর্পণখাকে দেখে রামচন্দ্রও যে কামতাড়িত হননি একথা বলা যায় না। শূর্পণখাকে দেখে বনবাসী শ্রীরামচন্দ্রের দেহে গোপন রোমাঞ্চ হয়েছে, তিনি কামনায় শিহরিত হয়েছেন। রামচন্দ্রের নিষ্ঠুর ছলনায় প্রতারিত শূর্পণখা এলেন লক্ষ্মণের কাছে প্রেম নিবেদন নিয়ে। কিন্তু লক্ষ্মণ শূর্পণখাকে 'রাক্ষসকুলের বারাঙ্গনা' বলে অপমান করেন। লক্ষ্মণের ধারণা প্রেম নিবেদন করার একচ্ছত্র অধিকার শুধুমাত্র পুরুষের। লক্ষ্মণ হলেন পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূ। তার কাছে নারী কেবল পুরুষের কামনা নিবারণ করার বস্তু। নারীরও যে যৌন চাহিদা থাকতে পারে তা মানতে নারাজ লক্ষ্মণ—"...হুঁ ! কামজ্বর ! স্ত্রীলোকের আবার কামজ্বর! ওটা কেবল পুরুষের অস্বাচ্ছন্দ্য বুঝলি, পৌরুষজনিত ব্যাধি।"[৭]

লক্ষ্মণের কাছে আবারও অপমানিত হন শূর্পণখা। নাসিকাছেদন অপেক্ষা বারবার এই অপমান তার মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। তাই ফিরে যাওয়ার পূর্বে সীতাকে তিনি এই দুই ঠক, প্রবঞ্চক ভাইয়ের থেকে সাবধান করে গেছেন— "এই স্বামী, এই দেবর, এরা কেউই নির্ভরযোগ্য নয়। এরা তোমাকে তোমার দুঃসময়ে পরিত্যাগ করবে। ...জীবনে যদি সুযোগ আসে, এই প্রতারক রামচচন্দ্রকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধা কোরো না। নতুবা নিজেই ঠকবে।"[৮] শূর্পণখার উক্তিতে সীতার ভবিষ্যত জীবনের ইঙ্গিত সহজেই স্পষ্ট হয়ে যায়। তবে নবনীতা গল্পে যে ভাবে রাম-লক্ষ্মণের চারিত্রিক পরিচয় দিয়েছেন তা লেখিকার আভিনব ভাবনা।

পরবর্তী 'সীতার পাতাল প্রবেশ' গল্পটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাল্মীকির আশ্রমে বসবাস করতে করতে সীতার অন্তর্দৃষ্টি খুলে গিয়েছে। সীতার মনে নিজের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে প্রশ্ন জেগেছে— "সীতা ক্ষেত্রজা— ক্ষেত্রে তাঁর জন্ম। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে, সত্যি কথাটা কেউ জানে না, একমাত্র জনকরাজা ছাড়া। সত্যি সত্যি তো ক্ষেত্রে মানুষ ফলে! ...সীতার মা বসুমতী দেবী কে? নিশ্চয় এমন কেউ, যাঁর সৌন্দর্য জনককে পাগল করেছিল? কিন্তু যাঁর নিম্নবর্ণ তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে দেয়নি। শূদ্রাণী, চণ্ডালনী, যে-কোনো কিছুই হওয়া সম্ভব।"[৯] জন্মের মতো সীতার মৃত্যু ভাবনাতেও নবনীতা অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। সীতার মৃত্যুর ষড়যন্ত্রকারী রূপে তিনি রামচন্দ্রকে উপস্থাপন করেছেন। সীতা প্রবঞ্চক, জনপ্রিয়তা লোলুপ, দুর্বল, অধার্মিক বলে রামচন্দ্রকে অপমান করেছেন। এমন প্রবঞ্চক স্বামীর গৃহে পুনরায় ফিরে যেতে অস্বীকার করেছেন। গল্পে নবনীতা দেখিয়েছেন সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে রামচন্দ্র সীতাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছেন। গৃহে ফিরে রামচন্দ্র রুদ্ধদ্বার কক্ষে দু'তিনজন ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টার সঙ্গে গোপনতম আলোচনায় বসলেন। এই গোপনতম আলোচনার আসল উদ্দেশ্য পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। এরপর যজ্ঞসভায় আবারও অগ্নিপরীক্ষা দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠলে ক্রোধে, অপমানে সীতা অযোধ্যাবাসীকে অভিসম্পাত দেন— "রামরাজ্য শেষ হয়ে যাবে অযোধ্যাপুরী জনশূন্য করে— আমি যদি প্রকৃতিমায়ের সন্তান হই, যদি সতী হই—

হে মা বসুন্ধরা"[১০] সীতার বাক্য শেষ হওয়ার পূর্বেই রামচন্দ্র বাঁদিকে রাখা বোতামটি টিপে দিলেন সিংহাসন সমেত সীতা সূড়ঙ্গ পথে সরয়ূর তীব্র ঘূর্ণ্যমান স্রোতের সঙ্গে মিশে গেলেন। সীতার এরূপ মৃত্যু, বাল্মীকি রামায়ণের মতো স্বেচ্ছায় সীতার পাতাল প্রবেশ নয়। এ যেন একপ্রকার চক্রান্ত। গল্পের শেষে যখন দেখা যায় রামচন্দ্র মৃদু হাসলেন দুজন পার্ষদের দিকে তাকিয়ে, তখন বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না সীতাকে হত্যার ষড়যন্ত্রটি আসলে কারা করেছে। রামায়ণে রামচন্দ্রের দ্বারা সীতার পাতাল প্রবেশ ঘটেছিল, সে কথা সকলের বিদিত, আধুনিক লেখিকা সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে বোধহয় রামচন্দ্রকে দোষারোপ করতে চেয়েছেন, তুলে ধরতে চেয়েছেন নারী সম্পর্কিত পুরুষের মনোভাবকে— নারীরা চিরকাল এইরূপ রামসম পুরুষের চক্রান্তের বলি হয়ে এসেছে— সভ্যতার ইতিহাসের অবক্ষয়িত এই দিকেরই সত্য উদঘাটন করতে চেয়েছেন তিনি।

'সীতা থেকে শুরু'-র গল্পগুলিতে নবনীতা রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও বাল্মীকি চরিত্রগুলিকে একেবারে বিবেকহীন, খলনায়কের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। বিশেষ করে 'সীতার পাতাল প্রবেশ' গল্পে সীতা-হত্যার বিষয়টি। 'সীতায়ন' উপন্যাসে মল্লিকা সেনগুপ্ত দেখিয়েছেন ধূলিঝড়ের মাঝে সীতা উধাও হয়ে যান। আর নবনীতা দেবসেন সীতার হত্যাকারী রূপে সরাসরি রামচন্দ্রের দিকে আঙুল তুলেছেন। এই নবরূপায়ণ লেখিকার দুঃসাহসিক মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

সীতা থেকে যাত্রা শুরু করে তিনি বিশ শতকের আধুনিক নারীর দোড়গোড়ায় এসে পৌঁছেছেন। যারা জিন্স-টপ পরে শ্বশুর বাড়ি যায়, একাই বিদেশ ভ্রমণ করে, স্বাধীন জীবনযাপনেই তারা অভ্যস্ত। তবে একথা ঠিক সত্তর, আশির দশকে ঘটে যাওয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন, ঘটনার ছাপ তাঁর গল্পে কোথাও তেমন চোখে পড়েনি। সমসাময়িক সুচিত্রা ভট্টাচার্য, কেতকী কুশারী, জয়া মিত্র, বাণী বসু প্রমূখ সাহিত্যিকদের একাধিক গল্পে, উপন্যাসেও পাওয়া যায় স্বাধীন, চাকুরীজীবী নারীদের কথা। কিন্তু নবনীতা দেবসেনের গল্পে এরূপ স্বাধীন চাকুরীজীবী নারীদের সংখ্যাই অধিক। এর পাশাপাশি আরও একটি বিশেষ দিক তাঁর গল্পে আছে— নিজের চেনা জগৎ ও নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতা। তাঁর গল্পের চরিত্ররা বেশিরভাগই তাঁর পরিচিত, বন্ধু বা প্রতিবেশী এমনকি তিনি নিজেও স্বপরিবারে গল্পে উপস্থিত, নাম পর্যন্ত পরিবর্তিত নয়। আর যেখানে তিনি নিজে উপস্থিত নন সেখানেও গল্পের মধ্যে তাঁর অদৃশ্য উপস্থিতি সহজেই বোঝা যায়। নিজেকে নিয়েও মজা করতে ভালোবাসতেন তিনি, তাই নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া একাধিক মজার ঘটনা গল্পের মধ্যে দিয়ে পাঠকের কাছে সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন। 'মাতৃয়ার্কি', 'মধ্যরাতের ভয়ঙ্কক', 'নাট্যারম্ভ', 'তামাশা', 'নিমন্ত্রণরক্ষা', 'জীবে দয়া', গল্পগুলি যার দৃষ্টান্ত। ভণিতা অংশে 'মাতৃয়ার্কি'-র গল্পগুলি সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন তাঁর মা গল্পগুলি পড়ে রাগ করতে পারেননি, যদিও তাঁকে নিয়েই সব ইয়ার্কি, কেননা গল্পে একটি চিত্রও কাল্পনিক নয়। লেখিকা গল্পের

সূচনাও করেছেন তাঁর মায়ের কথা উল্লেখ করে— "মেয়েরা দু'জাতের। একদল মাতৃতান্ত্রিক বাই নেচার, এঁরা সংখ্যালঘু কিন্তু শক্তিতে লঘু নন মোটেই। বাকিরা পিতৃতান্ত্রিক, অবলা। এঁদের কল্যাণেই জগতে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর আজ এই দুরবস্থা। প্রথম জাতের মেয়েতে জগৎ পরিপূর্ণ থাকলে 'উইমেন্স লিব মুভমেন্ট'-এর প্রয়োজন হত না। ...সুলতানা রিজিয়া, কি ঝাঁসীর লক্ষ্মীবাঈ, রানী রাসমণি, কি রানী ভবানী, বা আমার গর্ভধারিণী, এঁরা সব এই জাতের। আমাদের চেয়ে একেবারে অন্য মেটিরিয়ালে তৈরি।"[১১] আসলে 'মাতৃয়ার্কি'- গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি লেখিকা নবনীতার শয্যাশায়িতা মা ও দুই মেয়েকে নিয়ে এক মাতৃতান্ত্রিক সংসারের আনন্দপূর্ণ, মজাদার কাহিনি। 'নিমন্ত্রণরক্ষা' গল্পেও তাপ্তী, বন্দিতা, চামেলি একাধিক স্কুলশিক্ষিকা নারীর দেখা মেলে, যারা নিজের নিজের কোয়ার্টারে একাই থাকেন। 'জীবে দয়া' গল্পেও বিধবা মা, চাকুরীজীবী মেয়ে ও দুই স্কুল পড়ুয়া নাতনি—এই তিন প্রজন্মের নারীর এক মাতৃতান্ত্রিক সংসার। একক নারীর ঘর-সংসার মানেই যে বিবর্ণ, মলিন নয়, হাস্যোজ্জ্বল হতে পারে এই গল্পগুলি তারই প্রমাণ। 'বিমাতা' গল্পে তাপসী স্বামীর কাছে পরিত্যক্ত হওয়ার পরেও দ্বিতীয় বিয়ে করেনি। বরং শাশুড়িকে সঙ্গে নিয়ে নিজের বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে। শুধু শাশুড়িকেই নয়, স্বামীর জীবনে আসা দ্বিতীয় নারী টেরেসার সন্তানকে সে নিজের কাছে রেখে মানুষ করতে চেয়েছে। একথা শুনে টেরেসা আশ্চর্য হলে, তাপসী তাকে জানায়— "রাগের কী আছে? সব শিশুই তো পবিত্র। সব শিশুই তো শুভঙ্কর। অপাপবিদ্ধ। ওর ওপরে রাগ করব কেন?"[১২] নবনীতার গল্পে এমন নারীকেই আমরা দেখি। তারা হিংস্র নয়, পুরুষের প্রতি তাদের তীব্র প্রতিহিংসা বা অশ্রদ্ধা নেই। তাদের বিদ্রোহ পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে।

তবে চূড়ান্ত নির্যাতন, দুঃখ, যন্ত্রণার কাহিনি তিনি গল্পে খুব একটা শোনাননি। আসলে তিনি নিজেও ছিলেন পজিটিভ থিংকিংয়ে বিশ্বাসী। তবে একদমই নেই একথা বলা যায় না। 'শিশুকন্যা দশক' গল্পটি যার প্রমাণ। পরপর তিনটি কন্যা সন্তান জন্ম দেওযায় স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকের প্রহারের ভয়ে মা সদ্যজাত কন্যাকে হত্যা করেছে। কারণ গ্রামে ফিরে গেলে তাকে বেদম প্রহার করা হবে, তিন নম্বর কন্যাসন্তান তারা সহ্য করবে না। আজকের দিনেও এমন ঘটনা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এই অবস্থা তো আর চিরস্থায়ী হতে পারে না। সময় হয়ত আরো লাগবে তবে, আমাদের হাল ছেড়ে দিলে কিছুতেই চলবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে আধুনিকতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে বলেছিলেন— 'এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা।' নবনীতার ভাবনা কালের গণ্ডি অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। যার পরিচয় তাঁর সমগ্র সাহিত্য জুড়ে। বিশেষ করে তাঁর গল্পে নারীর মনন ঘুরে ফিরে এসেছে বারবার অথচ কি অসামান্য পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গি। নারীর মন তাঁর নিজের বুকেও ভীষণ সজাগ

কিন্তু বিচার-বিবেচনার বাইরে দাঁড়িয়ে নারীর প্রতি পক্ষপাত তাঁর নেই। তিনি যেন নিজেই হয়ে উঠেছেন আধুনিক নারীর সত্যকারের আয়না।

তথ্যসূত্র:

১। দেবসেন নবনীতা, 'গল্পসমগ্র ২', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৭, মাঘ ১৪০৩, পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১৯, অগ্রহায়ণ ১৪২৬, পৃষ্ঠা – ২০৯।

২। তদেব, পৃষ্ঠা – ২১১।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা – ২১৭।

৪। তদেব, পৃষ্ঠা – ২১৭।

৫। তদেব, পৃষ্ঠা – ২১৮।

৬। তদেব, পৃষ্ঠা – ২২২।

৭। তদেব, পৃষ্ঠা – ২২৬।

৮। তদেব, পৃষ্ঠা – ২২৯।

৯। তদেব, পৃষ্ঠা – ২৩৯।

১০। তদেব, পৃষ্ঠা – ২৪৬।

১১। তদেব, পৃষ্ঠা – ২৬৩।

১২। দেবসেন নবনীতা, 'গল্পসমগ্র ৪', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৫, বৈশাখ ১৪১২, তৃতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৯, মাঘ ১৪২৫, পৃষ্ঠা – ২১৭।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। ভট্টাচার্য সুতপা, 'মেয়েলি পাঠ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০।

২। সেনগুপ্ত মল্লিকা, 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ', বিকাশ গ্রন্থ ভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০২।

৩। চক্রবর্তী সুধীর(সম্পাদক), 'মেয়েদের কথাকল্প', অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১০।

৪। ভট্টাচার্য সুতপা, 'মেয়েলি আলাপ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১২।

ত্রিপুরার লংতরাই তের : ঐতিহ্যে ও সাহিত্যে

জীবনকৃষ্ণ পাত্র
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
বি.বি.এম. কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা

প্রকৃতির বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে রয়েছে এক একটি প্রাণময় সত্তা, এই বিশ্বাসে মানুষ সুদূর অতীতে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের আরাধনা করেছে, বিভিন্ন রূপকে পূজা নিবেদন করেছে এবং এই বিভিন্ন রূপের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে। তাই হয়তো সেসময়ের মানুষ সর্বপ্রাণবাদ (Animism)-এ বিশ্বাসী হয়ে তার সভ্যতাকে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে, সমৃদ্ধির পথে এবং অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। মানুষ প্রকৃতির সবকিছুকে বিশ্বাস করেছে তার যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে, কারণ—প্রকৃতি হল তার কাছে বাঁচার আশ্রয়, প্রকৃতির কোলে সে আশ্রিত, প্রকৃতির স্তন্যসুধা পান করে সে শিশুসন্তানের মতো লালিত হয়ে বড় হয়েছে, সুতরাং প্রকৃতিই তার প্রজন্মের পর প্রজন্মকে রক্ষা করবে—এই বিশ্বাসে মানুষ পূজা করেছে নদীকে, বৃক্ষকে, পাহাড়-পর্বতকে। নদী-বৃক্ষ-পাহাড় পর্বত তাই স্থান পেয়েছে মননশীল মানুষের শিল্পকর্মে, সাহিত্যকর্মে। পাহাড়-পর্বত মানুষের কাছে দেবতাস্বরূপ—এই কারণে হিমালয়কে বলা হয় দেবতাত্মা। শুধু ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীর সর্বত্র নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ ইত্যাদি পূজিত হয়। পাহাড়-কে বলা হয় 'মৌন-মুখর'। পাহাড় মৌন ধ্যানগম্ভীর ঋষির মতো অবস্থান করে। নিস্তব্ধতাই পাহাড়ের মূল সুর। আর মুখর বলার পেছনে রয়েছে আপাত নিস্তব্ধতার পেছনে থাকা তার বুকে লালিত-পালিত প্রাণীদের জীবন-সংগ্রাম অর্থাৎ বলা যেতে পারে তাদের জীবন প্রবাহের প্রাণময় উচ্ছলতার কথা। অসংখ্য পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ ছাড়া সভ্যতার পিলসুজ মানুষের অবস্থান পাহাড়কে মুখর করে রাখে। পাহাড়ের মুখরতার পেছনে রয়েছে তার সম্পদ—তার বুকের ভেতর আকরিক সম্পদ আর তার বুকের বাইরে বনজ সম্পদ—এই সম্পদের উপর নির্ভশীল প্রাণীকুল। ছোট্টপার্বতী ত্রিপুরার পাহাড়ী উপজাতি ও অ-উপজাতি মানুষজন ত্রিপুরার পাহাড়শ্রেণিকে দেবতা হিসেবে পূজা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রধান পাহাড়শ্রেণি রয়েছে পাঁচটি—জুম্পুইটাং, শাখাংটাং, লংতরাই, আঠারোমুড়া ও বড়মুড়া পাহাড়। এছাড়া দুটি পাহাড়ের পরিচয় পাই, যে দুটি পাহাড় ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরে ও দক্ষিণে রয়েছে, যে দুটি পাহাড়ের অস্তিত্ব উপরোক্ত পাঁচটির মধ্যে লংতরাই, আঠারোমুড়া ও বড়মুড়া

পাহাড়ের সাথে যুক্ত হয়ে আছে, সেই দুটি হল—উত্তরে ঊনকোটি পাহাড় যার পূর্বনাম ছিল রঘুনন্দন পর্বত এবং দক্ষিণে কালাঝারি পাহাড়।

লংতরাই পাহাড় সাতটি পাহাড়ের মধ্যে অনন্য, কারণ—তার সৌন্দর্য যেন তাকে একটি প্রাণময় সত্তা দান করেছে। লংতরাই যেন হিমালয় পর্বতমালার কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো রূপময়। দিনের বিভিন্ন সময়ে তার রূপের শোভা উপভোগ করার মতো। লংতরাই পাহাড়কে স্থানীয় মানুষ লংথরাই হিসেবে সম্বোধন করেন। তার বুকে রয়েছে ঘন বনভূমি ও উঁচু-নীচু উপত্যকা। ত্রিপুরার তিনটি বিখ্যাত নদীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎসভূমি হল লংতরাই। খোয়াই, গোমতী ও ধলাই এই তিন নদী যেন তিন বোন, লংতরাই পাহাড় তাদের পিতৃভূমি। লংতরাই ত্রিপুরার অন্যান্য পাহাড়ের তুলনায় অনেকটাই জনবহুল। সে একেবারে নির্জন নয়—তার বুকে আশ্রয় নিয়েছেন রিয়াং, কুকি, হালাম, ত্রিপুরী, চাকমা প্রভৃতি জনজাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা। তাছাড়া দেশভাগের পর প্রচুর সংখ্যক উদ্বাস্তু বাঙালি সম্প্রদায়ের মানুষ লংতরাই পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করছেন। উপজাতিদের ধর্ম বিশ্বাসে প্রাচীন সর্বপ্রাণবাদের অস্তিত্ব রয়েছে, তবে এঁরা হিন্দুধর্মের সংস্পর্শে এসে প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী। বর্তমানে এঁদের মধ্যে অনেকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। লংতরাই পাহাড় ত্রিপুরার দুটি জনপদ পূর্বে ধলাই বা আমবাসা এবং পশ্চিমে মনুর মাঝে অবস্থান করেছে। উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত এই পাহাড়ের দৈর্ঘ্য ৪৮ কিলোমিটার। এই পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ার নাম ফেংপুই (১৫৮১ ফুট)। লংতরাইর বুকে ও পাদদেশে বেশ কয়েকটি ছোটো-বড় জনপদ রয়েছে, যেমন—মনু, ছাওমনু, মাছলি, ছৈল্যাংটা, মানিকপুর, আমবাসা প্রভৃতি। লংতরাই পাহাড়ের বুকে জনজাতিদের উপজীবিকা হল জুমচাষ। জুমের ধানই প্রধান ফসল। এছাড়া তিল, কার্পাস, কুমড়ো, লাউ, সিম, বরবটি, বেগুন তো রয়েছে। বর্তমানে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক এবং আসাম হয়ে আগরতলা সহ সাব্রুম পর্যন্ত বিস্তৃত রেললাইন লংতরাই পাহাড়ের বুকের উপর চিরে এবং বুকের ভেতরে এফোঁড় ওফোঁড় করে ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করেছে। এই উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা আজ থেকে বিশ-ত্রিশ বছর আগে এতটা ছিল না।

উৎসব ও মেলাময় ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যতম একটি সংযোজন হল লংতরাই তের বা লংতরাই মেলা। লংতরাই পাহাড়ের বুকে বসবাসরত জনজাতি সম্প্রদায় লংথরাই বা লংতরাইকে দেবতাজ্ঞানে পূজা নিবেদন করেন। লংতরাই পাহাড়েই রয়েছে লংতরাই দেবতার মন্দির। সেই মন্দিরে রয়েছেন লংতরাই দেবতার স্ত্রী দেবী শঙ্খতাড়িনী

ও তাঁদের পুত্র কালাজীবন। হিন্দুদের দেবতা শিবের সাথে লংতরাই দেবতাকে এক করে দেখেন এখানকার জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা। তাই তাঁদের কাছে লংতরাই হলেন বাবা লংথরাই। কথিত আছে, ১৯৬৭ সালে ছাওমনু অঞ্চলে লংতরাই পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী কল্পমোহন রোয়াজা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে স্থানীয় মানুষদের সহযোগিতায় শিবচতুর্দশী উপলক্ষ্যে শ্রী শ্রী বাবা লংতরাই মেলা ও পূজার আয়োজন করেছিলেন। সেই হিসেবে ৫৩ বছরে পদার্পণ করল বাবা লংতরাই মেলা ও উৎসব। সেখানে বাবা লংতরাইর মন্দিরও স্থাপিত হয়েছে। সেখানে শিবচতুর্দশী উপলক্ষ্যে জাতি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের সমাগম হয়, এমনকি প্রতিবেশী আসাম, মেঘালয় এবং পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ থেকে বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আসেন পূজা নিবেদন করতে। শ্রী শ্রী বাবা লংতরাই মেলার সাথে স্থানীয় মানুষদের আবেগের অন্ত নেই। আমরা এই মেলা সম্পর্কে জানতে পেরেছি স্থানীয় অধিবাসী বিশিষ্ট সমাজসেবী ঝুলনবিকাশ বড়ুয়া, হংসকুমার ত্রিপুরা, পদ্মরঞ্জন চাকমা, মহত্ত্বরঞ্জন চাকমা, রতনজয় ত্রিপুরা, মাধব বড়ুয়া, রূপমোহন ত্রিপুরা প্রমুখের কাছ থেকে। এই মেলা সংঘটিত হয় স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং স্থানীয় মানুষদের আয়োজনে। ত্রিপুরা সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা আমরা এই মেলা বা উৎসব কমিটির প্রতি এ পর্যন্ত দেখিনা, কিন্তু ত্রিপুরা সরকারের আয়োজনে লংতাই তের অনুষ্ঠিত হয় লংতরাই পাহাড় সন্নিহিত উপজাতি অধ্যুষিত স্থানগুলিতে প্রতি বছর পর্যায়ক্রমিক ভাবে। ধুমাছড়া, মাছলি, ছৈল্যাংটা, মানিকপুর, ছাওমনু অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে উপজাতি অংশের মানুষজন রয়েছেন, তাঁদেরই আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে সেই সমস্ত স্থানে ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, স্থানীয় ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলাপরিষদ ও প্রশাসনের সহযোগিতায় বিগত প্রায় ১২ বছর ধরে লংতরাই তের অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এক দিনের জন্য এই মেলার আয়োজকগণ স্থানীয় মানুষদের এবং দূর থেকে আগত জনজাতিদের আনন্দ দানের জন্য বিন্দুমাত্র কার্পণ্য রাখেন না। সারারাত্রি ধরে মেলা বসে। সাংস্কৃতিক মঞ্চে নাচ-গান সহ নানান সাংস্কৃতিক পরিবেশনা লক্ষ করার মতো। তাছাড়া সহস্রাধিক মানুষের সমাগমে মেলা প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ অন্যরূপ। বিভিন্ন দোকানপাট নিয়ে দূর দূরান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা আসেন, ব্যবসা করেন, মেলার আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফেরেন। এই মেলা দেখলে বোঝা যায় জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ের বন্ধন কতটা দৃঢ় এবং কতটা প্রাণবন্ত। এক সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে ঘটে চলা উগ্রপন্থা যে জাতি-উপজাতির সম্প্রীতির আদর্শকে আহত করেছিল— এই মেলা তারই প্রতিবাদ। ত্রিপুরা সরকারের উদ্দেশ্য এই ধরনের

মেলা আয়োজন করে মানুষের মনে নঞর্থক দিক মুছে দেওয়া। মানুষের মনে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করতে হলে চাই এই ধরনের মেলা। আশ্চর্য লাগে—যে সমস্ত অঞ্চলের যুব সম্প্রদায় বিপরীত স্রোতে এক সময় গা-ভাসিয়ে ছিল, বিপথে পরিচালিত হয়েছিল, সেই সমস্ত অঞ্চলে পর্যায়ক্রমিক ভাবে বছরে লংতরাই তের অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আমরা বলার চেষ্টা করেছি যে লংতরাই তের আয়োজনের মধ্যে যেমন রয়েছে একটি সাংস্কৃতিক প্রয়াস, তেমনি রয়েছে জনজাতি সমাজের মধ্যে একটি ধর্মীয় ভাবাবেগকে মর্যাদা দেবার চেষ্টা। তাঁদের কাছে লংতরাই হলেন অরণ্য-পাহাড়ের দেবতা, যিনি হিন্দুদের শিবের সাথে অভিন্ন সত্তার অধিকারী। লংতরাইকে তাঁরা তাঁদের প্রধান দেবতা মতাইকতরের সাথেও কখনো কখনো মিলিয়ে ফেলেছেন। এই দেবতা সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক জানাচ্ছেন—

> "লোককথা অনুযায়ী লংথরাই নামক বনদেবতার নামে এই পাহাড়ের নাম এসেছে। লংথরাই পাহাড়শ্রেণির সমগ্র অঞ্চল জুড়ে লংথরাই দেবতার রাজত্ব ছিল। সমস্ত পশুপাখীর পরিত্রাতা বলে লংথরাই দেবতা সুবিদিত। একাই সে এই অঞ্চলের অধীশ্বর। লংথরাই খুব খেয়ালী দেবতা—নানা রূপ গ্রহণ করত—মানুষের রূপও নিত—তবে খুব দয়ালু। পশুপাখী, মনুষ্য, প্রাণী সকলের রক্ষক ছিল এই দেবতা।
>
> "সুতরাং প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং হিংস্র বন্যপ্রাণীর হাত থেকে রক্ষা পেতে লংথরাই দেবতাকে পূজা করতে হবে। জুমিয়াদের কাছে তাই লংথরাই দেবতা গৃহদেবতা বলে পরিগণিত এবং পূজিত। লংথরাই দেবতার আশীর্বাদ লাভ করলে কোনো জুমিয়া সুফসল থেকে বঞ্চিত হয় না।"[১]

গবেষক সুরেন দেববর্মণ লংথরাই পুরাণ আলোচনা প্রসঙ্গে লংথরাই দেবতা সম্পর্কে যেভাবে বিশ্লেষণ করলেন—তাতে এই দেবতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা যেমন পাওয়া যায়, তেমনি স্মৃতিপটে ভেসে আসে মহান সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসের কথা। 'আরণ্যক'-এ আমরা এই লংথরাইর মতো একজন লোকদেবতার পরিচয় পাই, যিনি শিকারির হাত থেকে বুনো মহিষগুলোকে রক্ষা করতেন, তিনি হলেন 'টাঁড়বারো'।

লংথরাই দেবতা সম্পর্কে উপজাতীয় সমাজে অনেক রকমের বিশ্বাস রয়েছে। এই বিশ্বাস সূত্রে কিম্বদন্তি বা লোককথার অস্তিত্ব আমরা পাই। প্রচলিত লোককথাটি

হল :

> “লংথরাই দেবতার সমসাময়িক কালে বুড়াসা দেবতার পত্নী হাচুকমা দেবী খেয়ালবশে এক রিয়াং রমণীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে, কন্যাটির নাম শঙ্খতাড়িণী। শঙ্খতাড়িণী রূপে গুণে অতুলনীয়া হয়ে যৌবনে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গে লংথরাই রিয়াং যুবকের ছদ্মবেশে রিয়াং দম্পতির গ্রামে হাজির হয়। লংথরাই ও শঙ্খতাড়িণী পরস্পর পরস্পরকে ভালবেসে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলো, অতঃপর একবছর শঙ্খতাড়িণীর মা-বাবার বাড়ীতে কাটিয়ে নিজ বাড়িতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। জামাই যাত্রার প্রাক্কালে রিয়াং দম্পতি অনেক সঙ্গী সাথী পাঠিয়ে যাত্রা করালো—কিছুক্ষণ যাবার পর দেবদেবী দম্পতি এমন দ্রুতবেগে পা- বাড়িয়ে দিতে লাগল যে, কারো পক্ষে পাল্লা দেবার সাধ্য ছিলনা। দেখতে দেখতে সবার চোখের সামনে লংথরাই ও শঙ্খতাড়িণী অদৃশ্য হয়ে গেল। তা প্রত্যক্ষ করে সবাই বুঝতে পারল ঐ দম্পতি দেবতা না হয়ে পারে না। বছর দুয়েক ব্যবধানে লংথরাই পুনরায় স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরালয়ে হাজির হলো। শঙ্খতাড়িণীর বাবা উভয়কে সাদরে অভ্যর্থনা জানালো।... কয়েক বছর বাদে তাদের এক সন্তান জন্মলাভ করে। সন্তানের নাম কালাজীবন রাখা হয়। একমাত্র পুত্র সন্তান কালাজীবনকে নিয়ে লংথরাই ও শঙ্খতাড়িণী পরমসুখে লংথরাই পর্বত অঞ্চলে বাস করতে লাগল।”[২]

ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিশ্বাস করেন এই লংথরাই দেবতা তাঁদের বুড়াসা দেবতারই অবতার। আবার তাঁরা মতাইকতরের সাথে লংথরাই দেবতাকে এক করে দেখেন। সুতরাং লংথরাই পাহাড়ের লংথরাই মন্দিরে বাবা লংথরাই, দেবী শঙ্খতাড়িণী এবং কালাজীবনের যে পুজো হয়—তা এই লোককথা নির্ভরতাকে স্পষ্ট করে।

এবার আসি লংথরাই পাহাড়কে অবলম্বন করে এবং পাহাড়ে বসবাসরত উপজাতি জনগোষ্ঠীর জুম জীবনকে অনুসরণ করে আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গে। প্রথমে উচ্চারণ করতে হয় ত্রিপুরা রাজ্যের একজন মহান কথাকার বিমল সিংহের ‘লংতরাই’ উপন্যাসের কথা। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে লেখা বিমল সিংহের ‘লংতরাই’ উপন্যাস ত্রিপুরা রাজ্যের সাহিত্যসাধনার জগতে একটি উজ্জ্বল সৃষ্টি বলতেই হয়। এই উপন্যাসে লেখক লংতরাই পাহাড়ে বসবাসকারী রিয়াং জনজাতি সমাজের জীবনসংগ্রাম, জীবনযাত্রা,

খাদ্যাভ্যাস, বিশ্বাস-সংস্কার, লোকাচার, লোকবিশ্বাস প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংবেদনশীল অনুভূতিতে নিপুণতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। লেখক 'লংতরাই' উপন্যাসের ভূমিকায় জানিয়েছেন—

> " বিচিত্র পাখীর গানে, বন্য জন্তুর কলরবে, মানুষের হাসিকান্নার আবেগে, দুঃখে, ছড়ার কল কলানীতে কৃষ্ণনীল বনের নিস্তব্ধতায় মুখরিত রহস্যময় লংতরাই পাহাড়।..." (৩)

লেখক এই লংতরাই পাহাড়কে অঙ্কন করেছেন প্রকৃতির একটি প্রাণময় সত্তা হিসেবে। লেখকের প্রাঞ্জল গদ্যভাষা, বাস্তব পর্যবেক্ষণশীলতা লংতরাই পাহাড়ের রূপ বর্ণনায় যথাযথভাবে ধরা পড়ে। উপন্যাসের একেবারে শুরুতে তিনি লিখেছেন—

> "লংতরাই পাহাড়ের উঁচু টিলার গায়ে বিস্তৃত জুম ক্ষেত। পাহাড়ের ঢালুতে সাদা কাপাস ফুল বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচে। কাপাস ক্ষেতের উপরে ভাসছে তিল গাছের থোকা থোকা ফল। আর একেবারে নীচু হয়ে জুমের লাল, সবুজ, হলুদ রঙ ধরা মরিচ। কাপাসের সাদা ওড়নার নীচে পাহাড়ী জামা, বিচিত্র রংয়ের বাহার। টিলার মাঝখানে অড়হর গাছ, উঁচু ডালগুলি বাতাসে নড়ছে। কোথাও আবার চিনার, খাকলু, কুমড়া, লতা থরে থরে।" (৪)

লেখক জনজাতি সমাজের জুম-জীবনের কঠোর পরিশ্রম, আশা-হতাশা, আনন্দ-বেদনার কথা যেমন বর্ণনা দিয়েছেন, তেমনি এক শ্রেণির মানুষের প্রতি শোষণ ও বঞ্চনার কথাও উল্লেখ করেছেন। এই সমস্ত কিছুর মাঝে প্রধান যে কাহিনিটি তরতর গতিতে এগিয়ে চলেছে, সেটি হল এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা জরকামুনি ও সাজেরুঙের প্রেম-পরিণয় ও তাদের পুত্র সন্তান রাংথাংহার জন্মলাভের কথা। লেখক সুকৌশলে নায়ক-নায়িকার সম্পর্কের বর্ণনা প্রসঙ্গে রিয়াং সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনকে যেমন আলোকিত করেছেন, তেমনি তাদের অশিক্ষা ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে উত্তরণের একটি আলোকপথ নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। তাই স্বাভাবিকভাবে দেখা গেছে জুমিয়া জীবনে এসেছে পরিবর্তনের জোয়ার। তাদের সমাজে স্বাস্থ্য-শিক্ষা-খাদ্য প্রকল্প চালু হয় সরকারের বিশেষ পরিকল্পনার কারণে। তাই আমরা এই উপন্যাসের শেষলগ্নে সাজেরুঙকে নিজের সন্তানের স্কুল শিক্ষা সম্পর্কে স্বপ্নালু হয়ে যেতে দেখি। লেখকের কথায়—

> "জরকামুনি, হাসমাই, সাজেরুঙ তখন গলাছড়া পাড়ার দিকে হেঁটে

যাচ্ছে। সাজেরুঙের কোলে আধো আধো কথা বলা শিশুটি। সাজেরুঙ তখনো ইস্কুলের উঠানে কচি কচি ছেলেদের কথা ভাবছে, কানে বাজছে দূর থেকে ইস্কুলের সেই ছেলে ভোলানো বাঁশির ডাক। পাহাড়ের উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত চির অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকা পাহাড়ের শিশুদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে। রঙ্গিন স্বপ্নের ঘোরে বিভোর তখন সাজেরুঙ। চোখে যেন দীপ্ত হয়ে আসছে অনাগত ভবিষ্যতের ছবি। কোলের ছেলেটা তার এমনি করে বাঁশির ডাকে ছুটে যাবে। ইস্কুলের ময়দানে কচি হাত দু'টি আকাশের দিকে তুলে থাকবে, পাথর ফুঁড়ে কচি ঘাস যেমন অপার বিস্ময়ে সূর্য্যের দিকে তাকায়।" (৫)

কথাকার বিমল সিংহের লংতরাই পাহাড়ের পটভূমিতে লেখা একটি বড়গল্প হল 'করাচি থেকে লংতরাই'। এই গল্পের মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রতি বঞ্চনা ও শোষণের কথা উল্লেখ আছে। এই বঞ্চনা ও শোষণের জন্য তারা যে কতকাংশে দায়ী সে বিষয়টিও তিনি আভাসিত করেছেন। গল্পটি রচিত হয়েছে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। প্রেক্ষাপটটির কথা লেখক প্রথমেই জানিয়েছেন—

"১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে করাচি থেকে আগত একটি বিমান ত্রিপুরার লংতরাই পাহাড়ে ভেঙে পড়ে। ধূসর অতীতের সেই কাহিনী খুঁজে আনা বড় কঠিন। আমার পিতৃদেবের মুখে শোনা সেই কাহিনীকেই জোড়া দিতে চেয়েছি—অন্যদের মুখে শোনা শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত ঘটনার সাথে। কোন সরকারি রেকর্ড দেখার সুযোগ হয়নি। ভুলভ্রান্তি থাকা খুবই স্বাভাবিক।" (৬)

১৯৮৯ সালে লেখা এই গল্পটির গর্ভে রয়েছে একটি ঐতিহাসিক সত্য, আর গল্পের কাহিনি বুননে রয়েছে লেখকের সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বাক্ষর—তবু গল্পটির মধ্যে বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন প্রতিফলিত করতে লেখক বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। এ গল্পে গরিব আদিবাসী যুবক কার্তিক তার সহজ-সরল-অভাবের জীবন থেকে হঠাৎ ছিটকে পড়ে অসংযত জীবনের পথে হাঁটতে শুরু করে। করাচি থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আসা একটি বিমান হঠাৎ ঘূর্ণিঝড়ের কোপে পড়ে অবতরণ করতে না পেরে সরাসরি ত্রিপুরার কৈলাসহরের আকাশ হয়ে লংতরাই পাহাড়ে দুটি গর্জন গাছে ধাক্কা মেরে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বিমানে থাকা ছেচল্লিশজন যাত্রীর মধ্যে একজন মহিলা কোনোক্রমে বাঁচে। সেই বিমানে থাকা তাল তাল সোনা কার্তিক কুড়িয়ে পেয়ে

হয়ে যায় 'সোনা কার্তিক'। যে ছিল প্রথমে জুমিয়া, পরে মাঝি সে হয়ে গেল সোনার মালিক। কিন্তু সে সোনার মূল্য বুঝে উঠতে পারেনি, তাই বাঙালি মহাজন, পুলিশ অফিসার, দালাল, ডাকাতদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারিয়ে একেবারে ভিখারি হয়ে যায়। কার্তিক পরশপাথরের পরশ পেয়েও তার মূল্য দিতে পারেনি, তাই তার জীবনে নেমে আসে দুঃখ। গল্পের অন্তিম লগ্নে গল্পকার জানাচ্ছেন—

> "নিষ্পাপ অরণ্য সন্তান, সোনার পাহাড় মাথায় এলেও শতাব্দী ধরে যে মানুষ ঘুমের ঘোরে পড়ে আছে, সে ঘুম ভাঙুক, তারা জেগে উঠুক, অগ্রসরতম মানুষেরা যদি তা না চায় হাজার কার্তিক যুগে যুগে পথে পথে এমন করেই ঘুরবে।" (৭)

লংতরাই পাহাড়কে পটভূমি করে ১৯৯৬ সালে ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী লিখলেন একটি উপন্যাস—'লংতরাই আমার ঘর'। উপন্যাসটির বহিঃ রঙ্গে লংতরাই পাহাড় যেমন রয়েছে তেমনি অন্তঃরঙ্গে রয়েছে একটি রাজনৈতিক চেতনা। তাই উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে লেখকের উদ্দেশ্যের এবং তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের বাহন। দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরা রাজ্যে চলে আসেন বহু উদ্বাস্তু বাঙালি, তাঁরা জনজাতিদের কাছাকাছি বসবাস করতে থাকেন জীবন ও জীবিকার তাগিদে। ফলে কিছু মানুষ ভুল ভাবনার বশবর্তী হয়ে ত্রিপুরী ও বাঙালিদের মধ্যে ব্যবধান তৈরি করে। তারা মনে করতে থাকে যে ত্রিপুরীদের অভাব-অনটনের পেছনে রয়েছে এই হাজার হাজার উদ্বাস্তু মানুষের হাত। এরা ত্রিপুরীদের শোষণ করছে, বঞ্চনা করছে, ফলে ত্রিপুরীরা কখনও কোন মতেই অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারবে না। এই ধারণাটা যে সত্য নয়, তা ঔপন্যাসিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এই উপন্যাসে বাদল, মধুতি, রণজিৎ, ক্ষোপেংরায়, কামিনী, নিতাই, নিখিল, বাণী, অভিরাম প্রভৃতি চরিত্র লেখকের লেখনীর স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। লেখক নৃপেন চক্রবর্তী উপন্যাসের শেষলগ্নে পাঠকের চোখে আঙুল দিয়ে স্পষ্ট করেছেন যে আদিবাসী ও বাঙালির মধ্যে কোনও শত্রুতা নেই, কিন্তু সমাজে শোষণকারী নামের একটি শ্রেণি রয়েছে—যে শ্রেণি আদিবাসী ও বাঙালি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে। তিনি শোষক-শোষিতের ব্যবধানটা স্পষ্ট করে দেবার চেষ্টা করলেন তাঁর 'লংতরাই আমার ঘর' উপন্যাসে।

লংতরাই পাহাড়কে অনুষঙ্গ করে একালের একজন বলিষ্ঠ কবি বিজয় দেববর্মা তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'লংতরায়ানি একলব্য' লিখলেন। এই কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা

'লংতরায়নি একলব্য' (লংতরায়ের একলব্য)-এর বিষয়বস্তুতে রয়েছে পৌরাণিক ঘটনা। পৌরাণিক ঘটনা এখানে একটি রূপকার্থে আভাসিত হয়েছে। একলব্যের সমূহ বীরধর্ম থাকা সত্ত্বেও তথাকথিত বর্ণবাদী সমাজের প্রতিনিধি দ্রোণাচার্য তাকে অস্বীকার করেন এবং তার ক্ষাত্রসুলভ বীরধর্ম চক্রান্ত করে হরণ করে নেন যাতে সে বীরের পরিচয় না পায়। তেমনি শোষিত নিপীড়িত জনজাতি সমাজে যদি কেউ আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রাখার জন্য সাফল্যের উচ্চচূড়ায় আরোহনের চেষ্টা করে তাহলে তার পক্ষে সম্ভব হবেনা সাফল্যের চূড়া স্পর্শ করা—কারণ সে লংতরাইর উচ্চচূড়া স্পর্শকারী অন্ত্যজ একলব্য হওয়ার কারণে অভিমন্যুর মতো সপ্তরথী বেষ্টিত হয়ে তাকে নিঃশেষিত হতে হবে। বর্ণবৈষম্য সমাজের নিদারুণ পরিণাম এই কবিতায় রূপকের ছলে কবি পৌরাণিক ঘটনা উল্লেখ করে লংতরাই পাহাড়কে অনুষঙ্গ করে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কবিতাটির কিছু কিছু অংশ উল্লেখ করার চেষ্টা করছি—

"একলব্য নৌঙবা অবিময়ন' সে
নন' কিতিঙগৗই চাকজাক থৗয়মানি খৗই
নৗঙবাই বাকসা বাতাইলাইথানি
দুরজুদন জুদিসথির পগলাইঅ কেনা
নন' ফাই করবনা বাগৗই চাকলাই দুক।
একলব্য তামনি মুচুঙলাং কাসান
লংতরায় বুচুক ....
বরগনি তঙ্গ' বুরং বুরুং রি-চুম
লামানি খনমা খনমা অ
বেবাক তারাফিক পয়েনত'
বেগর বুসর'
সঙফাঙগ' চেয়ার
নক কতর' ফিতা কৗচাগ'
অরজুন, দুরজুদন তাই দুরুণাচারজ' সঙ
তঙগ' মুরুকলাই
নৗঙ সগয় ফুরু লংতরায়নি বুচুক
বাসায়ৗই তালাংনাই নিনি য়াসিমা বুরা।"(৮)

(ভাবানুবাদ : একলব্য তুমি অভিমন্যুর মতো চক্রব্যূহে আটকে আছ। যুধিষ্ঠির

ও দুর্যোধনেরা কেবল শত্রুতা ভুলিয়ে তোমার জন্য বিছিয়ে রাখে মৃত্যুর জাল। তুমি একবার লংতরাইয়ের শিখরে উঠতে পারলে, সেখানে রাখা চোঙায় মদ পান করতে পারলে তোমার স্বপ্ন সফল হবে, দেখবে নতুন সূর্যোদয়। ... অর্জুনেরা বড়ই হিংসুক। তারা অলি-গলি-ট্রাফিক পয়েন্টে রয়েছে, টেবিল সহ চেয়ারে বসে আছে। অর্জুন, দ্রোণাচার্য ও দুর্যোধন সদা সতর্ক আছে। যখন তুমি লংতরাই পাহাড়ের চূড়া স্পর্শ করবে তখনই তারা কেটে নেবে তোমার বুড়ো আঙুল।)

লংতরাই পাহাড় যেন ত্রিপুরার জাতি-উপজাতির জীবন-সংস্কৃতিতে একেবারে পরিপূরক হয়ে আছে। পরিপূরক হয়ে আছে বলে লংতরাই পাহাড় হয়ে ওঠে কখনো দেবতা, কখনো জীবনের আশ্রয়, কখনো সাফল্য-ব্যর্থতার কেন্দ্রবিন্দু, আবার কখনো বা হয়ে যায় লংতরাই তের বা লংতরাই মেলা ও উৎসবের অঙ্গন। লংতরাই (লংথরাই) নামের মধ্যে যেমন লুকিয়ে রয়েছে রহস্যময়তা, তেমনি লংতরাইকে অবলম্বন করে ভূমিষ্ঠ হয়েছে বাংলা ও ককবরক সাহিত্যের মহান সৃষ্টিকর্ম। তাই লংতরাই যেন হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষ ও পাঠকসমাজের কাছে বিশেষ প্রাপ্তির প্রতীক প্রতিমা।

তথ্যসূত্র :

১. দেববর্মণ, সুরেন, ত্রিপুরার উপজাতি সংস্কৃতি, পৃ. ৪৮

২. তদেব, পৃ. ৪৮-৪৯

৩. সিংহ, বিমল, লংতরাই, পৃ.২

৪. সিংহ, বিমল, লংতরাই, পৃ.৭

৫. তদেব, পৃ.৭১

৬. সিংহ, শিশিরকুমার, বিমল সিংহের গল্প-উপন্যাস: কথাসাহিত্যে নতুনদিগন্ত, পৃ.৫০

৭. সিংহ, শিশিরকুমার, বিমল সিংহের গল্প-উপন্যাস: কথাসাহিত্যে নতুনদিগন্ত, পৃ.৫৩

৮. দেববর্মা, নরেশচন্দ্র, ককবরক ভাষা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, পৃ. ৮৭

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ত্রিপুরার উপজাতি সংস্কৃতি - সুরেন দেববর্মন, জ্ঞান বিচিত্রা, আগরতলা।

২. লংতরাই - বিমল সিংহ, নবচন্দনা প্রকাশনী, আগরতলা।

৩. বিমল সিংহের গল্প-উপন্যাস: কথাসাহিত্যে নবদিগন্ত, শিশিরকুমার সিংহ, নবচন্দনা প্রকাশনী, আগরতলা

৪. ককবরক সাহিত্যের ভাষাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ - নরেশচন্দ্র দেববর্মা, নবচন্দনা প্রকাশনী, আগরতলা।

বিপ্লবী আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ ও মহান বিপ্লবী নলিনী বাগচি

বিদ্যুৎ সরকার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজ

সংক্ষিপ্তসার : নলিনীকান্ত বাগচী ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন ব্যক্তিত্ব ও অগ্নিযুগের বিপ্লবী। নলিনীকান্তের আদি নিবাস ছিল নদীয়া জেলার শিকারপুরে। তিনি মুর্শিদাবাদের কাঞ্চনতলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার বাবার নাম ভুবনমোহন বাগচী। তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে লেখাপড়া করেন। পরে পাটনার বাঁকিপুর কলেজ এবং ভাগলপুর কলেজে পড়েন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ পড়াকালীন তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দেন। তিনি পুলিশের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য পাটনার বাঁকিপুর কলেজ এবং ভাগলপুর কলেজে পড়েন। তাকে আই. এ. পাস করার পর আত্মগোপন করতে হয়। তিনি দানাপুরের সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টা করেন। তিনি দলের নির্দেশে গৌহাটীর আটগাও গোপন আশ্রয়ে আত্মগোপন করেন। এখানে ১২ জানুয়ারি (মতান্তরে ৭ জানুয়ারি) ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে পুলিশের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধের পর তিনি এবং সতীশচন্দ্র পাকড়াশী পুলিশের বেষ্টনী পার হয়ে পাহাড় এলাকায় চলে যান। নবগ্রহ পাহাড়েও তিনি আর একটি আক্রমণ প্রতিহত করেন। সেখানে থেকে পরে ৬ দিন অনাহার, অনিদ্রায় পায়ে হেঁটে মুসলিম ছদ্মবেশে লামডিং স্টেশনে এসে পৌঁছেন। পরবর্তীতে কোনো রকমে তিনি বসন্ত রোগাক্রান্ত অবস্থায় কলকাতায় আসেন। তার একজন বিপ্লবী বন্ধু তাকে কলকাতা ময়দানে পড়ে থাকতে দেখে তার শুশ্রূষা করে তাকে সারিয়ে তোলেন। এরপরে তিনি ঢাকায় যান এবং সেখানকার কলতাবাজারের বিপ্লবী ঘাঁটি পুলিশ ১৫ জুন, ১৯১৮ তারিখে ঘিরে ফেললে তিনি গুলি বিনিময়ের ফলে মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে গ্রেপ্তার হন। নলিনীকান্ত সেই দিনই ঢাকা জেলে মারা যান।
সূচকশব্দ : সন্ত্রাসবাদ, মুক্তিসংগ্রাম, বিপ্লবী গুপ্তসমিতি, ঔপনিবেশিক শাসন, আত্মবলিদান, স্বাধীনতা আন্দোলন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ কথাটির ব্যবহার সম্পর্কে বিপ্লবীদের মধ্যেই অনেকে আপত্তি করেছেন।[১] অগ্নিযুগের বিপ্লবী বা বিপ্লবী যোদ্ধা এই নামটি ব্যবহার করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।[২] বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে বলেন, "বিপ্লবশক্তি ক্রমশ প্রচণ্ড সামর্থ্যে বহিদীপ্ত হয়ে বিংশ শতাব্দীর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশটি বৎসর ধরে ভারতবর্ষের আত্মশুদ্ধি ঘটিয়েছিল। তাই

এর রক্ত স্বাক্ষরকে ইতিহাস উপেক্ষা করেনি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে।[৩] বিপ্লবীদের আত্মবলিদান বিশেষ করে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকির আত্মত্যাগ তরুণদের প্রভাবিত করেছিল। স্বদেশি ডাকাতির সাফল্যও তরুণদের মধ্যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার জোয়ার নিয়ে আসে। বিপ্লবীরা পুরোপুরি আত্মবিলোপের, আত্মদানের পথ, ভারতের একান্ত নিজস্ব পথ গ্রহণ করেছিল।[৪] বিপ্লবী আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ জেলাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই মুর্শিদাবাদে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠতে শুরু করেছিল এবং মুর্শিদাবাদের তরুণ প্রজন্ম বিপ্লবী আন্দোলনে নিজেদের উৎসর্গীকৃত করেছিলেন। মুর্শিদাবাদেরই মহান বিপ্লবী নলিনীকুমার বাগচি মহাশয়ের লেখা থেকে জানা যায় যে, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই মুর্শিদাবাদে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। তিনি লিখেছেন, "আমি বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হই সেই বঙ্গভঙ্গের যুগে। তারপর অনুশীলন সমিতি"[৫]

মুর্শিদাবাদের বিপ্লবী আন্দোলন এবং নলিনী বাগচি মহাশয়ের কার্যকলাপ বিশ্লেষণের আগে উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনে মুর্শিদাবাদের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের বিষয়টি একনজরে দেখে নেওয়া প্রয়োজন। একথা প্রায় সকলেরই জানা যে, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রায় শুরু থেকে বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান ঘটেছিল যদিও সেগুলি নিতান্তই আঞ্চলিক স্তরে সীমিত ছিল কিন্তু তাহলেও ঐতিহাসিকেরা এগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।[৬] ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরপরই যে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ঘটেছিল তাতে মুর্শিদাবাদের মাদারি সম্প্রদায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মজনু শাহর দত্তকপুত্র চিরাগ আলিশাহ মুর্শিদাবাদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন।[৭] ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলনের সময়েও মুর্শিদাবাদের ওয়াহাবিরা বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রভাব মুর্শিদাবাদের ওপরও পড়েছিল।[৮] ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সূচনা বহরমপুর থেকেই শুরু হয়েছিল বলে সাম্প্রতিককালের বেশ কিছু গবেষক মনে করেন।[৯] রাজর্ষি বসু, শ্যামাপ্রসাদ বসু প্রমুখ গবেষক তথ্যের ভিত্তিতে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, মুর্শিদাবাদের জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি ছিল এবং মুর্শিদাবাদের নবাব সবুজ সংকেত দিলে মুর্শিদাবাদ বিদ্রোহের একটি কেন্দ্রে পরিণত হতে পারত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুর্শিদাবাদের নবাব কোনোরকম প্রচেষ্টা না নেওয়ায় একটি সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটে। তবে মহাবিদ্রোহের ঐতিহ্য নিশ্চিতভাবে পরবর্তী প্রজন্মকে সংগ্রামী চেতনা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের স্মৃতিকথা থেকে দেখা যায়, এরা ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ দ্বারা তাঁরা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। অনেকেই বিংশশতকের বিপ্লবী আন্দোলনকে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ ধারাবাহিক একটি রূপ হিসেবেই দেখেছিলেন।[১০]

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বহরমপুরে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ১৮৯৫-তেও এই কনফারেন্স বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯০৩-এর সম্মেলনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ভূপেন্দ্রনাথ

বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং আরও অনেকেই এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বহরমপুরে আসেন। এই সব নেতারা সম্ভবত 'বহরমপুরের তরুণ প্রজন্মকে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানের জন্য অনুপ্রাণিত করেন।[১১] বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে শরীরচর্চা ও শক্তি অর্জনের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই শরীরচর্চার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।[১২] ব্যায়ামচর্চার ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী প্রফেসর মোর্তাজা নামক জনৈক ব্যক্তিকে সরলাদেবী নিয়োগ করেন। ঢাকায় অনুশীলন সমিতি পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে গড়ে উঠলে সেখানেও মোর্তাজাকে প্রশিক্ষণের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।[১৩] বহরমপুরের সম্মেলনেও প্রফেসর মোর্তাজা তাঁর বাহিনী নিয়ে শরীরচর্চা, কুস্তি লাঠি খেলা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন।[১৪] এই বছরেই বহরমপুরের সায়দাবাদে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠে।[১৫] বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা আরও পুষ্ট হয়। সখারাম দেউস্করের দেশের কথা গ্রন্থটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯০৮-র ১৭ জুন মুর্শিদাবাদ হিতৈশী এই মর্মে বক্তব্য রাখে যে ক্ষুদিরামের অল্প বয়েসের কথা চিন্তা করে তার মৃত্যুদণ্ড রদ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া উচিত।[১৬] ১৯০৫-র পর থেকে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গায় বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। ১৯০৮-এ নিমতি তায় সনাতন সমিতি গড়ে ওঠে।[১৭]

কৃষ্ণনাথ কলেজ বিপ্লবী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং যুগান্তর, অনুশীলন ও আত্মোন্নতি সমিতির প্রতিনিধিরা কৃষ্ণনাথ কলেজ ভর্তি হয়ে ছাত্রদের মধ্যে থেকে বিপ্লবী সদস্য সংগ্রহের ব্যাপারে সক্রিয় হতেন। যোগেন্দ্রনাথ দে সরকার, কে বি রায়, নিরঞ্জন সেন প্রমুখ এই উদ্দেশ্য নিয়ে কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হন।[১৮] ক্রমশ কৃষ্ণনাথ কলেজ বিপ্লবী আন্দোলনের একটি মুখ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। অনেকেই বিপ্লবী প্রশিক্ষণের জন্য কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হতেন।[১৯] তবে বিপ্লবী সদস্য গ্রহণের ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হত। মুরারিপুকুরের বিপ্লবী "কেন্দ্রে পুলিশিহানা এবং অধিকাংশ বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের ফলে বিপ্লবী আন্দোলন খানিকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে।[২০] কিন্তু মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কৃষ্ণনাথ কলেজের বিপ্লবীদের প্রচেষ্টায় মুর্শিদাবাদে বিপ্লবী আন্দোলন পুনরায় জোরদার হয়ে ওঠে। যদিও এই কলেজের ওপর পুলিশের গুপ্তচর বিভাগের কঠোর নজরদারি ছিল কিন্তু তার মধ্যে থেকেই বিপ্লবী সদস্য গ্রহণের প্রক্রিয়া জারি থাকে। বিপ্লবী প্রচার পুস্তিকা প্রচারের কাজ অব্যাহত থাকে। শরীরচর্চা, লাঠিখেলা, ছোরা খেলা ইত্যাদিও চলতে থাকে। ভূপেশচন্দ্র নাগের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা জোরদার হয়ে ওঠে।[২১] ড. নলীনাক্ষ্য সান্ন্যাল পরবর্তীকালে লেখেন "Bhupesh. Babu attracted us to his asceticism and patriotic fervour and few of us used to get regularly in touch with him " প্রখ্যাত বিপ্লবী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ি মহাশয় তাঁর গ্রন্থে মুর্শিদাবাদের ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন যে, উত্তরবঙ্গের অর্থাৎ রাজশাহি বিভাগের জেলাগুলো ছাড়াও

মুর্শিদাবাদ জেলা সেই সময় অনুশীলন দলের রাজশাহি কেন্দ্রের অন্তর্গত ছিল এবং মুর্শিদাবাদেও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর ন্যায় দলের শক্তি খুব ভালোভাবে গড়ে ওঠে।[২২] আজকের দিনে বাংলার রাজনীতিক ক্ষেত্রে ওই জেলায় যাঁরা প্রসিদ্ধ নেতা তাঁদের অনেকেরই হাতেখড়ি' হয় তৎকালে অনুশীলন সমিতির মারফত, মুর্শিদাবাদ জেলাই বিপ্লবী বীর শহিদ নলিনী বাগচির জন্মস্থান এবং ওখানেই তিনি প্রথম দলে আসেন। অন্য কর্মীদের কথা বাদ দিলেও এক নলিনী বাগচির জন্যই মুর্শিদাবাদ জেলার গৌরব বোধ করার যথেষ্ট কারণ আছে।[২৩]

কাঞ্চনতলার বীর নলিনী বাগচি কেবল মহকুমার নন, সারা দেশের গৌরব।[২৪] ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে নলিনীকান্ত বাগচির জন্ম কাঞ্চনতলায়। কাঞ্চনতলা জগবন্ধু ডায়মন্ড জুবলি ইনস্টিটিউশন-এর মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯১৪-১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র ছিলেন। এখানেই ঢাকা অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন।[২৫] বিহারের বিপ্লবী আন্দোলনকে সংগঠিত করার ব্যাপারে রেবর্তী নাগের সঙ্গে নলিনী বাগচি মহাশয় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। রেবর্তীনাগ বহরমপুর কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশে তিনি ভাগলপুরের 'Divisional Organiser'-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ভাগলপুরের TNJ College-এ ভর্তি হন। তিনি সেখানে কানাই বংশী নামে পরিচিত হন।[২৬] নলিনী বাগচি রেবতী নাগের সঙ্গে যোগদান করেন। উভয়েই সতীশচন্দ্র ব্যানার্জির গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি TNJ কলেজ থেকে আইএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ওই বছর অক্টোবরে তাকে বাঁকিপুরে পাঠানো হয়। পুনরায় তাকে ভাগলপুরে নিয়ে আসা হয়। দানাপুরে সেনা ছাউনিতে বিপ্লবের কাজে ইন্ধন জোগান।[২৭] বারবার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করলে কলকাতা চলে আসেন। দলের কাজেই তাঁকে গৌহাটির গোপন ডেরায় পাঠানো হয়।[২৮] গৌহাটির বিপ্লবীদের ডেরায় পুলিশ হানা দিলে উভয় তরফে খণ্ডযুদ্ধ হয়। এর মধ্যে নলিনী বাগচি ও প্রবোধ দাশগুপ্ত পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে সরে যেতে পেরেছিলেন।[২৯] এরপর যে ধরনের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট স্বীকার করে নিয়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন তাঁর বিবরণ দিয়েছেন প্রখ্যাত বিপ্লবী সতীশচন্দ্র পাকড়াশি তাঁর স্মৃতিকথায়।[৩০] বিপ্লবী সতীশচন্দ্র পাকড়াশি মহাশয় নলিনী বাগচির সন্ধান পাওয়ার যে বিবরণ দিয়েছেন তা যথেষ্ট মর্মস্পর্শী। তিনি লিখেছেন, "আমার কাছে খবর এল বিহার থেকে কে একজন এসেছে দেখা করতে চায়। অসুস্থ হয়ে লোকটি গড়ের মাঠে শুয়ে আছে। আমি খবর শুনে বিস্মিত। মেসের একটি ছাত্রবন্ধু বলল, 'ওর বসন্ত হয়েছে মেসে আনতে সাহস পাচ্ছি না তাই আপনার কাছে এলাম। এখন কী করা যায়। তৎক্ষণাৎ গড়ের মাঠে ছুটলাম। মনুমেন্টের নীচে কম্বল মুড়ি দিয়ে রাতের অন্ধকারে একটা লোক পড়ে আছে, যেন একটা কুলি। নলিনী বিহার থেকে যে ছেলেটিকে সঙ্গে করে এনেছিল সে আমাকে বলল, এই সেই 'খোকা"। নলিনীকে আমরা খোকা নামেই ডাকতাম। আমি ডাক দিতেই সে জড়িত কণ্ঠে বলল, 'আমি

নলিনী'। বড় কষ্ট হল তার এ অবস্থা দেখে। সর্বাঙ্গে তার বসন্তের গোটা। গায়ে হাত দিয়ে জ্বরের উত্তাপ খুব বেশি মনে হল। বেঁহুশ হয়ে পড়ে আছে, রিভলবারটি হাতের মুঠোয় নিবন্ধ।[৩১] এরপর বহুকষ্টে নলিনী বাগচিকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভবপর হয়।[৩২] দুর্ভাগ্যবশত, এই সময় সতীশচন্দ্র পাকড়াশি মহাশয় ভারতরক্ষা আইনে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলে তাঁর পক্ষে নলিনীর কাছে আর ফেরা সম্ভবপর হয়নি। নলিনী বাগচি সেরে ওঠার পর তাঁকে পূর্ববঙ্গের সংগঠন পরিচালনার ভার দিয়ে পাঠানো হয়। জুন মাসে ঢাকা কলতা বাজারের এক বাসায় বিপ্লবীদের গোপন আবাসে পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের গুলি বিনিময় হয়। বিপ্লবী নলিনী সর্বশেষ শক্তি প্রয়োগ করে লড়াই চালিয়ে যান। সর্বাঙ্গে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পুলিশ তাঁকে হাসপাতালে- নিয়ে যায়। হাসপাতালে যখন অর্ধচেতন অবস্থায় নলিনীর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলি কাটছিল তখন আইবি পুলিশ কর্মচারী প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত নলিনী উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমাকে বিরক্ত করবেন না, শান্তিতে মরতে দিন'[৩৩] কয়েক মিনিটের মধ্যেই নলিনী বাগচির জীবনাবসান ঘটে। নলিনী বাগচির এই আত্মত্যাগের যে মূল্যায়ন অপর আর এক শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী করেছেন তা উল্লেখের দাবি রাখে, "বীর শহিদ নলিনী মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও আত্মপ্রকাশের এতটুকু আকাঙ্ক্ষা করেনি। গুপ্ত সমিতির গোপন কাজের মাঝে নিজেকে জাহির করার এতটুকু কামনা না করেই নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে গেল স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামে। ঢাকা কলতা বাজারে পুলিশের সঙ্গে লড়াই-এ যে যুবক-নেতা জীবন দিলেন তাঁরাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ শহিদ"।[৩৪]

বিপ্লবী আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ জেলার অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতায় যে সময় বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা প্রায় সেই সময় থেকেই মুর্শিদাবাদ জেলায় বিপ্লবী গুপ্তকেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে। বঙ্গভঙ্গের সময় বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় মুর্শিদাবাদেও বিপ্লবীরা বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিপ্লবী সদস্যদের মধ্যে শরীরচর্চার বিষয়টি যথোচিত গুরুত্ব লাভ করে। আরেকটি গরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বহরমপুর ও কলকাতা বিপ্লবীকেন্দ্রের নিয়মিত যোগাযোগ। পরবর্তী পর্যায়ে মুর্শিদাবাদ রাজশাহি, ঢাকা ও ভাগপুর কেন্দ্রের মধ্যে যোগসূত্রের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় এবং এক্ষেত্রে নলিনী বাগচির ভূমিকা বিশিষ্ট বিপ্লবীদের স্মৃতিকথায় শ্রদ্ধার সঙ্গেই উল্লিখিত হয়েছে।

সূত্রনির্দেশ:

১. গৌতম বসু, বিপ্লবীদের চোখে বাঙলার বিপ্লববাদ, ঢাকায় আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে প্রবন্ধটি পঠিত হয়। ঢাকা ইতিহাস অ্যাকাডেমি প্রকাশিত ইতিহাস প্রবন্ধমালা ২০১০-এ প্রকাশিত।

২. Manini Chatterjee, Do and Die Picador, 2010 P.285-87.

৩. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব, কলকাতা, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম নবভারত ১৯৮৩ সংস্করণ, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৫. জঙ্গিপুর মহকুমায় বিপ্লবীদের গুপ্ত কেন্দ্র, হরিলাল দাস, পৃ. ২৫।
৬. S.B. Choudhury, Civil Disturbances in Indian Mutinies.
৭. Md. Khairul Anam, Political Consciousness of the people of Murshidabad (WB) and the Great Revolt of 1857, in C Palit A Roy (ed) Excavating the Revolt of 1857 B R Publication Delhi p. 27.
৮. Ibid
৯. শ্যামাপ্রসাদ বসু, মহাবিদ্রোহের দেড়শো বছর, প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
১০. গৌতম বস, প্রসঙ্গ মহাবিদ্রোহ ফিরে দেখা, বি. বি. কুণ্ডু অ্যান্ড গ্র্যান্ড সনস, ২০১১।
১১. Md Khairul Anam. Indian Freedom movement and Murshidabad District 1905, 1947 KP Bagchi 2008, p. 50-51.
১২. Ibid p. 53. ১৩. Ibid
১৩. Ibid
১৪. Ibid
১৫. Ibid
১৬. Ibid
১৭. Ibid
১৮. Ibid p.149-50
১৯. Ibid p.150
২০. Ibid 151.
২১. Ibid
২২. Krishnanath Collegbe Centenary Commemoration Volume, 1853-1953 p.10, 11, 267 269.
২৩. প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ি, বিপ্লবী জীবন, কলকাতা, ১৩৬১ পৃ. ৭৬ ।
২৪. হরিলাল দাস, প্রাগুক্ত ।
২৫. ঐ
২৬. Raman Singh, Dacca Anusilan's Nationalists of Bhagalpur (1900-1920) in The Quarterly Review of Historical Studies vol. XLXI nos. 384 March, 2007.
২৭. হরিলাল দাস প্রাগুক্ত।
২৮. ঐ

২৯. সতীশ পাকড়াশি, অগ্নিযুগের কথা, নবজাতক প্রকাশন ১৩৭৮পৃ. ১০৭
৩০. ঐ পৃ. ১১১-১১৩।
৩১. ঐ পৃ. ১১০।
৩২. ঐ পৃ. ১১২।
৩৩. ঐ পৃ. ১১৩।
৩৪. ঐ পৃ. ১১৩।

অনিল ঘড়াইয়ের আদিবাসী নারী : মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও বেঁচে থাকার লড়াই নির্বাচিত ছোটগল্পের নিরিখে

মন্দিরা মর্ম্মু
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
মেদিনীপুর কলেজ (অটোনমাস)

সংক্ষিপ্তসার : আশির দশকের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পকার হলেন অনিল ঘড়াই।তিনি বাংলা সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেছিলেন প্রান্তিকদের প্রতিনিধি হয়ে । তার একাধিক লেখাতে উঠে এসেছে অন্ত্যজ মানুষদের সমাজ জীবন, কর্মজীবন, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক বিষয়- আশয়।এর পাশাপাশি সবচেয়ে আলোচিত দিক হলো প্রান্তিক নারীদের বৈচিত্র্যময় জীবনের অংশ । তার বহু গল্পে ধরা পড়েছে আদিবাসী নারীদের জীবনযাপন ও কার্যকলাপ। প্রতিনিয়ত সমাজে লড়াই করে বেঁচে থাকার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। চিরাচরিত ধারায় চলে আসা কঠোর সামাজিক শাসন বাঁধন-পাশ থেকে বেরিয়ে কীভাবে আধুনিকীকরণ হয়ে উঠছে, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে মনন চেতনার কতটা পরিবর্তন আসছে আদিবাসী নারী দের মধ্যে সেগুলোই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সূচক শব্দ : অনিল ঘড়াই, আদিবাসী নারী, প্রান্তিক নারী, অন্ত্যজ শ্রেণী, বাংলা ছোটগল্প, শক্তিশালী কথাকার, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, ডাইনী প্রথা,অন্ধবিশ্বাস, কু-সংস্কার, মনন চেতা নারী।

মূল আলোচনা:

বাংলা কথা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী কথাকার হলেন অনিল ঘড়াই।ছোট গল্প ও উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন।তবে ছোটগল্পের জগতেই অধিক সাড়া পেয়েছিলেন। তিনি যখন সাহিত্য জগতে পদার্পণ করছেন তখন পশ্চিমবঙ্গীয় রাজনীতিতে বেশ কিছু অস্থিরতা থাকলেও বামফ্রন্টের আধিপত্যে কিছুটা স্থিতিশীল ছিল। তবে গ্রাম বাংলার জোতদার কৃষকদের হাত থেকে তখনও রেহাই পায়নি ভাগ চাষীরা। বেশ কয়েক বছর পর ধীরে ধীরে এই সমস্যার সুরাহা করা হয়।ভূমি ব্যবস্থা তথা সরকারি খাসজমি বিতরণ, বর্গাজমি,জমি হস্তান্তর, মহাজনি কারবারির মতো বিষয় এই দশকের লেখকদের লেখার বিষয় হয়ে উঠেছিল। তিনি মূলত গ্রামের নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের জীবনযাপনের বাস্তব চিত্র বাংলা সাহিত্যে তুলে ধরেছিলেন। সেই চিত্রে ধরা পড়েছে বৈচিত্র্যময় শ্রমজীবী মানুষ যেমন-কামার, কুমোর, জেলে, হাড়ি, মেথর, নুনমারা, কাকমারা প্রভৃতি মানুষজন। প্রান্তিক মানুষেরা কীভাবে দারিদ্রের সাথে দিনের পর দিন জীবন অতিবাহিত করে তা অসংখ্য গল্পের বিষয় হয়ে

উঠেছে। অনিল ঘড়াইয়ের সমকালের লেখক বা বলা যায় সমগোষ্ঠীর লেখক ভগীরথ মিশ্রের বক্তব্যে—"...গ্রাম জীবনকে নিয়ে এত নিবিষ্টভাবে এত অনুপুঙ্খ সহকারে আমাদের মধ্যে আর কেউই বুঝি লেখেননি। গ্রামজীবন এমন অতলান্ত অবগাহন আর কারোর কলমেই আসেনি।"[১]

নোনাভূমির মরমী কথাকার অনিল ঘড়াই (১৯৫৭-২০১৪) পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার অন্তর্গত রুক্মিণীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রান্তিক সাহিত্যিক বাবার কর্মক্ষেত্রে বাল্য কৈশোর কাটিয়েছিলেন নদীয়া জেলার কালীগঞ্জে।অনিল ঘড়াই চিরাচরিত প্লট থেকে বেরিয়ে এসে যেন অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষদের আঁতের কথা বলতে লাগলেন। তিনি নিজে যা যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেই বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়েই সাহিত্য ভাণ্ডার ভরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি জীবনকে একটি ভাসমান নৌকার মতো করে দেখাতে শেখালেন।যেখানে মাঝি শুধু নামমাত্র নৌকা সেদিকেই গতিপথ বদলায় যেদিকে বাতাস বয়।মাঝির সেখানে কোনো হাত থাকে না, থাকে শুধু চেষ্টা টুকুই।তেমনি জীবন নিজ নিয়মে গড়িয়ে যায়, সময়ের মতো। প্রান্তিক, অন্ত্যজ, ব্রাত্য, সাবলটার্ন বলতে আমরা যাদের বুঝি, অনিল ঘড়াই স্বয়ং ছিলেন তাদের গোষ্ঠীরই একজন। তাই তিনি গ্রাম বাংলার জৈষ্ঠের মেঠো পথের ধূলা উড়ানির হিংস্র রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শুনেছিলেন সন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনির পরিবর্তে ভাগ চাষীদের উপর জোতদার চাষীদের গর্জন। বৈচিত্র্যময় মানুষদের পাশাপাশি তিনি বিশেষভাবে আলোকপাত করেছিলেন আদিবাসী নারী সমাজের উপর। সমাজ - সংস্কারের বেড়াজালে বাঁধা অসহায় নারীদের ক্রন্দন ধ্বনি শোনা যায় আটের দশকের প্রান্তিক লেখকদের লেখায়। অনিল ঘড়াই- এর অসংখ্য ছোটগল্পে এসেছে নিম্নবিত্ত মানুষদের জীবন সংগ্রাম। প্রত্যহ লড়াই করে বেঁচে থাকার গল্প বলেছেন তাঁর লেখায়। তিনি মূলত সেইসব মাটির মানুষদের কথা বলে গেছেন, যারা শত দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করেও ভিটে মাটি ত্যাগ করে পলায়ন করেনি। থেকে গেছে রুক্ষ, শুষ্ক মাটিকে আঁকড়ে ধরে।এক বক্তব্যের মাধ্যমে তার ভাবনা স্পষ্ট করা যেতে পারে,

"আমি সেই সব মানুষকেই আমার কলমে তুলে ধরার চেষ্টা করি, যারা সমাজে আরও নিচু তলার মানুষ হয়ে জন্মানোর অপরাধে অভিশপ্ত জীবন ভোগ করেছেন। খরায় পোড়া মাঠে আজও যারা পঞ্চায়েতের দরজায় ঘুরে বেড়ায় রিলিফের জন্য দুঃখ-দারিদ্র আজও যাদের নিত্য সঙ্গী, অথচ যারা আজও বিবেকি সৎ, মানবতার জয়গানে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পিছু ঘটে না -আমি তাদেরই গান গাই, ছবি আঁকি, গল্প শোনাই। গ্রাম বাংলার রূপ-বৈচিত্র্য, জীবন -সংস্কৃতি, সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত মানুষের বেঁচে থাকার হুবহু ডকুমেন্টনেশনই আমার উদ্দিষ্ট।"[২]

বাংলা সাহিত্য জগতে সমাজ-সংস্কার, রাজনীতি-অর্থনীতি,লোকসাংস্কৃতিক বিভিন্ন বিশেষ দিকের মতো নারী সমাজটিও বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। বৃহত্তর এই নারী সমাজকে পূর্ববর্তী বহু কথাকার নিজ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যে তাদের রূপদান

করেছেন। বহুস্তরীয় এই নারী সমাজের বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে আদিবাসী নারী সমাজ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় আদিবাসী নারীরা ছোঁয়া দিলেও, ধরা দেয় নি।তবে মহাশ্বেতা দেবী তার ব্যতিক্রমী। তিনি ছিলেন আদিবাসী নারী জীবনের প্রত্যক্ষদর্শী। প্রান্তিক অঞ্চলে গিয়ে অবলোকন করেছিলেন তাদের রূপ-নীতি ও শোষণ -শাসনের বাস্তব চিত্র । তাই তার রচনায় বহু আদিবাসী নারীকে জীবন্ত আঁকতে পেরেছিলেন। তাদের জীবনযাপন যন্ত্রণা ও বেঁচে থাকার লড়াইকে লেখায় মরমীস্পর্শী করে উপস্থাপন করেছিলেন। ছয়ের দশকের শেষ পর্ব থেকে দেখা যায় বহু প্রান্তিক লেখক লিটল ম্যাগাজিনের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোতের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন এবং তাদের সঙ্গে পা রাখছেন নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক সাবলটার্ন মানুষেরা। লেখা হচ্ছে একের পর এক আদিবাসী সমাজের গল্প। বিশেষত লক্ষ্য করা যায় আদিবাসী নারীকে। যারা এক হাতে সামাজিক সংস্কারকে দমন করে, অন্য হাতে সাংসারিক দায়ভার সামলায়। কর্তব্য নিষ্ঠ আদিবাসী নারী কঠোর পরিস্থিতি, শত দারিদ্র্য, জ্বালা -যন্ত্রণাতেও মূল্যবোধহীন হয়ে পড়েনি। আত্মজ্ঞান শূন্য হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েনি অন্য পন্থায়, সততা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে মন, প্রাণ ও দেহ।এই আদিবাসী নারীদের রক্তমাংসের ছিটেফোঁটা প্রলেপ দিয়ে নতুন ছাঁচে জীবন্ত করে গড়ে তুলেছিলেন, নোনাভূমির শক্তিশালী ছোট গল্পকার অনিল ঘড়াই । আর এখানেই তার স্বতন্ত্রতা ও বিশেষত্ব।এছাড়াও তিনি খুব সূক্ষ্মভাবে জটিল মনস্তাত্ত্বিক দিক নিরীক্ষণ করে বাংলা সাহিত্যে আদিবাসী নারীদের গহীন অন্তর্মানস দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন আমাদের । তাঁর লেখার গভীরতা পাঠককে অন্য মাত্রা এনে দেয় এবং এদের অন্যভাবে চিনতে শেখায়।

আলোচ্য প্রবন্ধে নির্বাচিত কয়েকটি গল্পের পর্যালোচনার মাধ্যমে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। 'রক্তবীজ' গল্পে অনিল ঘড়াই আদিবাসী নারীদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে অবগত করাতে চান পাঠকদের।বাংলার গ্রামগঞ্জে নিম্নবর্গীয় মানুষদেরকে অন্ধ কু-বিশ্বাস কিভাবে জড়িয়ে রয়েছে তা গল্পে স্পষ্ট চিত্রায়িত করা হয়েছে।এই অন্ধ কুসংস্কারের শিকার হয়ে ওঠে একমাত্র নারীরাই। ডাইনি প্রথা বিশেষত আদিবাসী সম্প্রদায়ে অধিক গ্রাহ্যতা লাভ করেছে। যুগে যুগে এই বীজ যেন তাদের মনের আভ্যন্তরে সুপ্ত অবস্থায় থাকে।তাই পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রকটিত হয়ে ওঠে। গল্পে দেখা যায় গোবরার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শুরু হয় জান গুরুর উৎপাত। তার মৃত্যুর কারণ হিসেবে বেণুবালা ও ভাইজি চায়না কে ডাইনি দোষারোপ করা হয়।কারণ গোব রার মৃত্যুতে ছেলে কানকু বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অনেকক্ষণ কাঁদলেও বেনু বালা ও চায়নার চোখে জল ছিল না। ১২ বছর বয়সী চায়নার পুইপাতা গড়ন শরীরের দিকে লোভী চোখে তাকিয়ে ছিল জান গুরু ,তবে সেই দৃষ্টিকে চায়না ভয় পায়নি।তাই চায়নার দুঃসাহস দেখে জান গুরু ভাবতে বাধ্য হয়েছিল,'গাঁ ঘরের একটা মেয়ে এত শক্তি পায় কোথা থেকে?'[৩] এই গূঢ় রহস্য ভেদ করার জন্য জান গুরুর উস্কানিতে

গ্রামের লোক তাদের গ্রাম ছাড়া করার হুমকি দেয়। এমনকি চায়নার বিবাহ সারা জীবনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।প্রসঙ্গত গল্পে এসেছে ভাকুর মেয়ে শনিচরির ডাইনি অপবাদের পরিণতি। সেই মেয়ে প্রতিবাদী হয়েও শেষ পর্যন্ত কঠোর সমাজের অন্ধবিশ্বাসের কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, এমনকি তার বাবাও তার সন্তানকে এই অপবাদ থেকে মুক্ত করতে পারেনি। তাই কেঁদে বলেছে, ‘‘আমি কুথাও যেতি পারবুনেরে, বিটি। তুর কপাল পুড়া। তুই মর...। আমি তুর জন্যি পুরো সনসার বানের জলে ভাসিয়ে দিতে পারব নাই।’’[৪] তবে ভাকু যা পারেনি, শনিচরি তা করে দেখায়। একদিন মহুল গাছে তার লাশ দেখে চমকে উঠছিল সকলে।সে মৃত্যুকে বরণ করে গ্রামবাসীর হাত থেকে মুক্তি নিয়েছিল। এছাড়াও গল্পে দেখানো হয়েছে বিন্দুর মতো সাহসী আদিবাসী নারীকে যে জান গুরু ও গ্রামের লোকের হুমকিকে তোয়াক্কা না করে বেণুবালা ও চায়না কে পালাতে সাহায্য করেছে।

গল্পে অঙ্কিত সবকটি আদিবাসী নারী চরিত্রকে আধুনিকতায়, মানবিকতায়, সাহসিকতায় ও মনন চেতনায় উজ্জ্বল করে তুলেছেন। বেনুবালার ভিটেমাটির প্রতি দরদ পাঠকের মনকে যেমন আকৃষ্ট করে, তেমনি চায়নার আত্মসম্মানবোধ, মূল্যবোধ পাঠকের মনন চেতনার গভীরে নাড়া দেয়।

‘হেঁসুয়া' গল্পে জমিদারি শোষণ ও নিপীড়নের বাস্তব চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে। আদিবাসী নারীরা শত দুঃখ দারিদ্রেও মানসিকভাবে থাকতে পারে অনেক শক্তিশালী। গল্পকারের কথায়, ‘‘শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঠুনকি যখন গুঁদলি খেতে দাঁড়ায় তখন তাকে মনে হয় পাহাড় দেশের রানী,তার কোন অভাব নেই, কষ্ট নেই।সে যেন পক্ষীস্বভাবনী কোন নারী।’’[৫] গর্ভবতী ঠুনকি সাহসী ও প্রতিবাদী।দারিদ্রতার কাছে হার মানলেও, মহাজন ভাকু সিং এর কাছে সে হার মানে নি।তাই প্রতিদিন মহাজনের ভয়ে পালিয়ে বাঁচার চেয়ে তাকে শায়েস্তা করার পথ ভেবেছে।স্বামী তথা পুরুষ সমাজের প্রতি বিদ্রুপ মিশ্রিত গলায় তাকে বলতে শোনা যায়--- ‘‘ছি তুমাদের মুখ দেখতেও লাজ লাগে। তুমরা বিটা ছেলে হয়েও মেয়ে মানুষের অধম একটা মানুষের ভয়ে পুরা বস্তি পালায় এটা ভাবতে আমার নাক- কান কাটা যায় গো।’’[৬]

‘শুখা নদী, উদাস বৃক্ষ 'গল্পটিতে খুব সূক্ষ্মভাবে দাম্পত্য জীবনের প্রেম,বিচ্ছেদ ও নারী-পুরুষ মনের জটিল দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন। মতিয়ার জীবনের টানাপোড়ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গল্পে। তার কথায় ‘‘মেয়ে মানুষ শুধু ভাত চায় না,টুকে সুখও চায়।’’[৭] তাই মতিয়া সুখের আশায় স্বামী পরশুরামকে ছেড়ে অন্য পুরুষের ঘর বাঁধতে চলে যায়। সেখানে সে সুখী জীবন যাপনও করে। তবে পরশুরাম মতিয়ার চলে যাওয়া মেনে নিতে পারে না বলে মানসিক অবসাদে ভুগতে থাকে। তাই তার আর দ্বিতীয় বার বিয়ে করা হয় না। একদিন হাটে চোয়াল উঠা, হাড় জাগা, পোড়াটে তামাটে ছাপ পড়া পরশুরামের সাথে মতিয়ার দেখা হলে, মায়ায় টনটন করে ওঠে তার বুক। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায়

তেতে উঠে প্রাণ, মনে মনে তাই তার প্রশ্ন জাগে--- "মেয়ে মানুষ তাহলে কি চায়?কোথায় তার স্থায়ী সুখের শিকড় বাঁধা?"[৮] কিছুই বুঝতে পারেনা মতিয়া। কালের স্রোতে বহমান জীবন কখনো কখনো দিকভ্রষ্ট হলেও মতিয়া আত্মচেতন আদিবাসী নারী। তাই সে পরশুরামকে বলেছে, "তার ছানাটা হা দেখ, আমার কাঁখে। ইটার গায়ে কোন পাপ লাগেনি, ইটাকে আমি পালব।"[৯]

'দোনা' গল্পে কুমারী মেয়ের অন্তঃসত্ত্বাকে কেন্দ্র করে কুসমার জীবনের অসহায়ত্বের দিক ধরা পড়েছে। গল্পটিতে লেখক কোথাও যেন পাঠকের ইমোশনে নাড়া দিয়ে গেছেন।বহু শহুরে শিক্ষিত পুরুষরা চিরকাল নিম্নবর্গীয় নারীদের ভোগের বস্তু হিসেবে মনে করেছেন এবং ভোগ করে গেছেন । কোন কোন ভোগ্য নারী নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখতে গিয়ে এই কুৎসিত মুহূর্তকে অন্ধকারে ঢাকাচাপা দিয়ে রেখে দেয়। জানোয়ার রুপী পুরুষদের শিকার হয়েও মুখ বুঝে সহ্য করে যায় এই অসহ্য যন্ত্রণা। সারাটা জীবন যন্ত্রণা নিয়েই দিন কাটায়। লোক চক্ষুর আড়ালে শুধু অশ্রুজল ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। প্রতিবাদ করার সাহস কিংবা মানসিক ইচ্ছেটা আর থাকে না। তেমনি এক আদিবাসী নারী কুসমার করুণ কাহিনীকে একটি বার্তা হিসেবে গল্পে উপস্থাপন করেছেন। এই কুসমারা আমাদের সামনে চোখের জল আড়াল করে, কঠিন জীবন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে চলেছে । আমাদের সমাজের এই কলঙ্কিত নারীদের প্রতি যুক্তিগত সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন এবং ভেঙে না পড়ে নতুন করে বাঁচার সাহস যুগিয়েছেন। আত্মবিশ্বাস তৈরি করেছেন এই গল্পের মাধ্যমে।আদিবাসী নারী কুসমা শহুরে কলেজ পড়ুয়া জনার্দনের ছেলে বাবলার সাথে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে।এর কিছুদিন পর কুসমা পেটের মধ্যে কচি শালপাতার শিহরণ অনুভব করে। বাবলা তার সরলতার সুযোগ নিয়ে তার শরীরে বিষ পুরে দিয়েছে।সে হোস্টেল থেকে ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা করলেও সে আর ফিরে আসে না। অপেক্ষারত অসহায় কুসমা তার সহেলির থেকে জানতে পারে বাবলা শহরের একটি মেয়েকে বিয়ে করে সংসার পেতেছে।প্রেমিক দ্বারা প্রতারিত হয়ে কুসুমা ভয়ে লজ্জায় কুঁকড়ে যায়, তার আত্মবিশ্বাস ভেঙে গেলে তা জাগ্রত করার জন্য শহরের দোকানি ছোকরা হারা বলে, "তুমি অমন ভেঙ্গে পড়লে বুড়ি মায়ের যে গর্ব করার কিছু থাকবে না।"[১০]

অন্য নারী চরিত্র কুসুমার মা বিধবা গুরুরবারির মধ্যে বেঁচে থাকার লড়াই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গল্পটিতে। স্বামী হারা স্ত্রী একাই কন্যাসন্তানকে পালন করছে দোনা বিক্রি করে। এবং সমাজের টিকে থাকার জন্য মেয়েকে সচেতনতা সতর্ক বার্তা দিয়েছে । কলুষিত এই সমাজে কলঙ্ক ছুঁড়ে দেওয়ার মানুষ অসংখ্য, তাতে জর্জরিত না হয়ে কলঙ্ক মুছে ফেলা আমাদের নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য। গল্পটিতে অনিল ঘড়াই একটি বার্তা ঘোষণা করে গেছেন।কুসমা যখন বলে, 'বাবু গো, আমি এখন এঁটো দোনা, আমাকে কেউ ছোঁবে না।'[১১] এই প্রসঙ্গে হারার উক্তি, 'দোনা এঁটো হয় ঠিকই, কিন্তু ভগবানের

দেওয়া এই শরীর তো কোনোদিন এঁটো হয় না।'[১২] এই উক্তি পাঠকের মনে আধুনিকতার ছোঁয়া দিয়ে যায়। এবং মানুষকে নতুনভাবে বাঁচতে শেখায়।

'উরাংগাড়া' গল্পটিতে বহমান নদীর মতো জীবনকে দেখিয়েছেন। যার বাঁকে বাঁকে থাকে ইতিহাস, রহস্য ও জটিলতা। তবে এই বহমানতায় যেন আমাদের হাত থাকে না, সে আপন গতিতে প্রকৃতির নিয়মে বয়ে চলে।গল্পে সাঁওতাল ভাকুয়ার মেয়ে বুদনীর জীবনের ওঠা নামা যেমন আছে,তেমনি আছে বিবেক দংশিত, অন্তর্দ্বন্দ্বে দ্বন্দিত স্নেহময়ের মতো শহুরে শিক্ষিত মানুষের টানাপোড়ন জীবন।

একদিন ভাকুয়ার কাতর অনুরোধে বুদনিকে বাড়ির কাজের দায়িত্ব দেয় স্নেহময়। তাদের পেট চালানোর জন্য।কিন্তু কয়েক মাস পরে ভাকুয়ার কান ভাঙ্গায় কলোনির লোক।তাই মন না চাইলেও বুদনিকে চলে যেতে হয় বাবার সাথে ।ওখানে ফিরে গিয়ে আবার চলে কঠিন জীবন সংগ্রাম।এক মুঠো ভাতের জন্য রোদে পুড়ে, ভারে পিষ্ট হয়ে খাবার সংগ্রহ করতে হয়।বলা হয়,আদিবাসী নারীরা কঠোর পরিশ্রমী ও শক্তিশালী গল্পে বুদনি তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। শুধু যে শারীরিকভাবে শক্তিশালী তা নয়, মানসিকভাবেও তারা অসীম শক্তির অধিকারিণী। ক্ষমা পরায়ণ, উচ্চমনের পরিচয় দিয়েছে বুদনি।জীবনের চরম অঘটনকে মেনে নিয়ে, ভুলে গিয়ে সে নতুন করে বাঁচার পথে পা বাড়িয়েছে। থতমতো চোখে স্নেহময় বুদনির দিকে তাকিয়ে ভেবেছে--- 'এত তাড়াতাড়ি মেয়েটা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে--এটা ভাবতেই যেন অবাক হচ্ছিল সে।এরা এত সরলতা উদারতা সহনশীলতা পায় কি করে?এত সহজে কি করে কাহিল করে দেয় শহুরে ফনাতোলা শিক্ষিত মাথা?[১৩]

আবার জর্জরিত বুদনি খুব নরম গলায় তীব্র প্রতিবাদের সুর তুলে বলেছিল --- 'ভাতের কিমত (দাম) এভাবে দিতে হবে আগে জানিনি বাবু। তাহলে জান থাকতে শের-ভাল্লুকের গুহায় পা দিতাম নি--'[১৪] বুদনির কথাটা স্নেহময়ের বর্শার মতো গেথেঁছিল তার বুকে।

'পুনশ্চ পরশুরাম' গল্পে আদিবাসী সমাজের বিশ্বাস- সংস্কার, দারিদ্রতা ও কঠিন জীবন সংগ্রাম যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি আঘাত হেনেছে মা ও সন্তানের আদিম সম্পর্কে। গল্পে একই রকম সম্পর্কের দুই রকম রূপ দেখতে পাওয়া যায়।একদিকে সুনার অক্লান্ত যত্ন, পরিচর্যা অসুস্থ ছেলেকে বাঁচানোর জন্য দুঃসহ কষ্টভোগ।অন্যদিকে নিজ ছেলেকে বাঁচাতে মা'কে খুন। দীর্ঘদিন ছেলে সুস্থ না হওয়ায় পিতৃ স্নেহে অন্ধ ভীষনাথ ওঝার পরামর্শে ও উস্কানিতে নিজের জন্মদাত্রীকে খুন করে বসে।

গল্পে বিশেষ লক্ষ্যণীয় দুই নারী চরিত্র । এরা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীর মানুষ হয়েও আধুনিকতার স্পর্শ পেয়েছে। বিজ্ঞানকে ভরসা করে চিরাচরিত কঠোর সংস্কার কে বর্জন করতে পেরেছে। তাই অসুস্থ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সুনার নিচু স্বরে অনুরোধ করেছিল ---'... ওগো, কালই তুমি ছেলেরে নিয়ে হাসপাতালে চলো। আর গুনিন কবরেজ দেখানো ঠিক হবে না।'[১৫]

অন্য চরিত্র ভীষনাথের মা অর্থাৎ বুড়িটি; যাকে কেন্দ্র করে এত কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা হয়েছে, তিনদিন পর মাধোর জ্বরের মাত্রা অতিরিক্ত হলে ভীষনাথ হম্বিতম্বি মঙ্গলা গুনিন কে ডাকার জন্য যায়। কিন্তু বুড়িটা তার পথ আগলে দাঁড়ায় ।মাথার দিব্যি দিয়ে বলে, "যাসনে বাপ এখনো সময় আচে-- ছেলেটারে নিয়ে হাসপাতালে দেখা। না হলে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে!"[১৬] এই বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝা যায় সমাজের পুরানো সংস্কারের খোলস বর্জন করে আদিবাসী নারীরা নব্য সভ্যতার মূল স্রোতে এসে মিলছে।

প্রসঙ্গত, এই ডাইনি প্রথা কে সামাজিক নির্মিত কঠোর শাসন বলা যেতে পারে। এমন বহু উদাহরণ দেখা যায়, যেখানে মানুষ স্বার্থ ও ঈর্ষা জনিত কারণে ডাইনি তকমা বিপক্ষের গায়ে ছিঁটিয়ে দেয়। আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই ডাইনি প্রথার শিকার হয় একমাত্র নিম্ন সমাজের অবলা অসহায় নারীরাই। আর এই তকমা প্রদানকারী হয় স্বয়ং পুরুষতান্ত্রিক সমাজ অর্থাৎ ওঝারা ।

তথ্যসূত্র :

১. ভগিরথ মিশ্র, আমি ও আমার সময়ের গল্পকার বন্ধুরা কোরক, শারদীয় ১৪১২,পৃষ্ঠা সংখ্যা -২১৯-২০

২. শ্রাবণী পাল, 'অনিল ঘড়াইয়ের উপন্যাস: ব্রাত্যজীবনের রুদ্ধ সংগীত',কোরক, প্রাক শারদ সংখ্যা ১৪১৫,পৃষ্ঠা সংখ্যা -২০২

৩. অনিল ঘড়াই,'একান্নটি গল্প ',ভাষাও সাহিত্য, বইমেলা ২০০৯, কলকাতা -৭০০ ০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৬

৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা -২৮

৫. তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা -৭৪

৬. তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা -৭৭

৭. তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা -২৭৭

৮. তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা -২৭৮

৯. তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা -২৮০

১০. তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা -৩৯০

১১. তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা -৩৯০

১২. তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা -৩৯০

১৩. অনিল ঘড়াই,' শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা পুস্তক মেলা জানুয়ারি ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা -৮৫

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা -৮৩

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা -২৫৯

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা -২৬২

সহায়ক গ্রন্থ :

১. শ্রাবণী পাল,'বাংলা ছোট গল্প পর্যালোচনা বিশ শতক', অক্ষর প্রকাশনী, মে ২০০৮, কলকাতা -৬

২. তপোধীর ভট্টাচার্য, 'ছোট গল্পের সুলুক সন্ধান (উত্তরার্ধ)', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১৭

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের লোকায়ত শিক্ষারীতি - প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র

চৈতালী কাঞ্জিলাল
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,
রামসদয় মহাবিদ্যালয়, আমতা

সারসংক্ষেপ : সত্যসাক্ষাৎকার ও তত্ত্বোপলব্ধিই দর্শন। আস্তিক ও নাস্তিকভেদে ভারতীয় দর্শন প্রধানতঃ দ্বিবিধ। বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী ষড়্দর্শন স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বহু প্রাচীন সেই দর্শনশাস্ত্র তথা শাস্ত্রোক্ত বিবিধ দার্শনিক চিন্তন কালের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। দর্শনশাস্ত্র স্বভাবগম্ভীর। তথাপি সুগভীর সেই দর্শনচিন্তা সাধারণের জীবনে পরিচিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন যে সব মহামানব তাঁদের মধ্যে ঊনবিংশ শতকের বঙ্গের দার্শনিক শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম। সংস্কৃতভাষায় রচিত দুর্গম, সুগভীর দর্শনশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব তথা অন্তর্নিহিত অর্থকে তাঁরা শিক্ষা দিলেন সহজ সরল বাংলাভাষায়। ষড়্দর্শনের পারিভাষিক শব্দ, সুগভীর চিন্তন, সাধনপদ্ধতি, উপলব্ধি- এই সবই সাধারণের বোধগম্য হল বিবিধ উপমা, উদাহরণ, কথোপকথন, বাণীর মাধ্যমে, যা গড়ে তুলল সাধারণ মানুষের জীবনদর্শন। বর্তমান শোধপত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রদত্ত লোকশিক্ষায় সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন ও অদ্বৈতবেদান্তদর্শনের কিছু পারিভাষিক ও তাত্ত্বিক বিষয়ের প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ : সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন, অদ্বৈতবেদান্তদর্শন, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, সম্বন্ধ-বার্ত্তিক, শঙ্করাচার্য, সুরেশ্বরাচার্য।

মূল আলোচনা :

ভূমিকা : সংস্কৃতভাষা শুধু ভারতীয় নয়, পৃথিবীর প্রেক্ষিতেও অন্যতম প্রাচীন ভাষা। সভ্যতার উষালগ্ন থেকে সুপ্রাচীন এই ভাষায় রচিত হয়েছে অতুলনীয় শাস্ত্রাদি, সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র অনুপমেয় সেই রচনাসম্ভারেরই এক অত্যুজ্জ্বল দিক। দৃশ্ ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয় করে 'দর্শন' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। সত্যসাক্ষাৎকার ও তত্ত্বোপলব্ধিই দর্শন। দর্শনশাস্ত্র স্বভাবগম্ভীর। দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা মোক্ষার্থীর জন্য; যিনি লাভ করতে চান অপবর্গ, কৈবল্য, মোক্ষ বা মুক্তি। সুগভীর, তাত্ত্বিক সেই আলোচনা উত্তম অধিকারীর পক্ষে বোধগম্য নিশ্চয়, কিন্তু মধ্য ও মন্দাধিকারীর পক্ষে তত সহজবোধ্য নয়। তথাপি জিজ্ঞাসু, মোক্ষার্থী অথচ তত্ত্বাবধারণে অসমর্থ সাধারণজনের জন্য দর্শনশাস্ত্রের অভিলষিত তত্ত্বকে সহজবোধ্য করেছেন যাঁরা, তাঁদের

মধ্যে অন্যতম হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-১৮৮৬) ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)।

ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের পুরোধা এই দুই ব্যক্তিত্ব বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় দর্শনশাস্ত্রসমূহের দুর্গম, সুভীর তত্ত্ব সহজ সরলভাবে পৌঁছে দিয়েছেন বিবিধ উপায়ে; কখনো উপমা, উদাহরণের দ্বারা, কখনো বা গল্পের মাধ্যমে অথবা নিছক কথোপকথনকালে। এইভাবে সংস্কৃতভাষায় রচিত দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্ব লোকায়ত হয়েছে তাঁদের মাধ্যমে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং বলেছেন যে লোকশিক্ষা দেওয়া কঠিন,- "... যে লোকশিক্ষা দেবে তার শক্তি ঈশ্বরের কাছ থেকে থেকে আসবে। আর ত্যাগী না হলে লোকশিক্ষা হয় না।"[১]

তাই লোকজীবনে শিক্ষাদান তো এই ত্যাগীদ্বয়ের পক্ষেই সম্ভব। তাঁরা শিক্ষাদান করেছেন কথ্যভাষায় যা সকলের কাছে পৌঁছে যায় অনায়াসে। আবার, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে নিষ্ণাত এবং বিবিধ ভাষায় পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দের উপলব্ধি,- "সরলতাই রহস্য। আমার গুরুদেবের কথ্য অথচ গভীরভাবপ্রকাশক ভাষাই আমার আদর্শ।"[২]

ভারতীয় দর্শনে 'লোকায়ত' শব্দটি চার্বাকদর্শনকে বুঝিয়ে থাকে। এই দর্শনসম্প্রদায় 'নাস্তিক শিরোমণি' বলে পরিচিত। চার্বাকের ভোগসর্বস্ব, জড়বাদী মতবাদ অতি প্রাচীনকাল থেকেই জনপ্রিয়, লোকজীবনে বিস্তৃত, সেই অর্থেই তা লোকায়ত। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে শব্দটি বিশেষতঃ 'লোক' অর্থাৎ জনসাধারণের জীবনে 'আয়ত' অর্থাৎ ব্যাপ্ত অর্থেই গৃহীত।

আলোচনায় আস্তিক দর্শন :

ভারতীয় দর্শন আস্তিক ও নাস্তিক, এই দুইভাগে বিভক্ত-**'অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ'**।[৩] বেদের প্রমাণ্যে বিশ্বাসী যারা, তারা আস্তিক ('অস্তি ইতি মতির্যস্য স আস্তিকঃ')। অপরদিকে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না যারা, তারা নাস্তিক ('নাস্তি ইতি মতির্যস্য স নাস্তিকঃ')। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা ও বেদান্তদর্শন আস্তিক-দর্শন-সম্প্রদায়। অপরদিকে চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন-নাস্তিক-দর্শন সম্প্রদায়। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়- সাংখ্য, যোগ এবং অদ্বৈত-বেদান্ত-দর্শন। প্রশ্ন হতে পারে, কেবলমাত্র আস্তিক-দর্শন-সম্প্রদায়গুলির আলোচনা কেন। এর উত্তরে প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রর (স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম) প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। ঈশ্বর নরেন্দ্রকে কেন এখনও দয়া করছেন না, তা নিয়ে চিন্তিত গুরুর জিজ্ঞাসায় নরেন্দ্রর বক্তব্য- 'আমি নাস্তিক মত পড়ছি'। তা শুনে গুরুর উপদেশ,- "দুটো আছে অস্তি আর নাস্তি, অস্তিটাই নাও না কেন?"[৪] পরবর্তীকালে সেই নরেন্দ্রর দৃষ্টিভঙ্গী নাস্তিক চার্বাকদর্শনের প্রতি সমালোচনাত্মক,- "লোকের সম্মুখে দুইটি পথ আছে। একটি পথ সকলেই জানেন, তাহা এই : জগতে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে – সব সত্য, কিন্তু ও সম্বন্ধে মোটেই ভাবিও না। 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'। দুঃখ আছে বটে কিন্তু ওদিকে

নজর দিও না। যা একটু আধটু সুখ পাও তাহা ভোগ করিয়া লও ; এই সংসারের অন্ধকার দিকটা লক্ষ্য করিও না – কেবল উজ্জ্বল দিকটাই লক্ষ্য করিও। এই মতে কিছু সত্য আছে বটে, কিন্তু ইহাতে ভয়ানক বিপদের আশঙ্কাও আছে।"[৫]

শ্রীরামকৃষ্ণের গল্পে সাংখ্য ও যোগদর্শনের গুণত্রয় তত্ত্ব :

ষড়দর্শনের মধ্যে অন্যতম হল সাংখ্য ও যোগদর্শন। এই দর্শনদ্বয় 'সমানতন্ত্র'। এই দুই দর্শনে গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে ত্রিগুণের তত্ত্ব। সাংখ্যদর্শনের প্রধান দুই তত্ত্ব হল– পুরুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণের একত্রিত রূপ। এই গুণত্রয়ের স্বভাব, কার্য ও বৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন। সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রীতি, রজোগুণের স্বভাব অপ্রীতি এবং তমোগুণের স্বভাব বিষাদ। সত্ত্বগুণের কার্য প্রকাশ, রজোগুণের কার্য প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের কার্য আবরণ। এই তিনগুণের বৃত্তি এই যে, এরা পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে, পরস্পর পরস্পরের কার্যে সহকারী এবং পরস্পররের নিত্য সহচর।

"প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ ।
অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ।।"

(সাংখ্যকারিকা– ১২)

প্রকৃতির যে উপাদান সুখস্বরূপ তাকেই বলে সত্ত্ব। সত্ত্ব লঘু ও প্রকাশক। রজঃ স্বয়ং চল অর্থাৎ ক্রিয়াশীল এবং অপরের চালক। তমঃ জাড্যের কারণ। গুরু এবং আবরক বলে তমঃ সত্ত্বের বিপরীতধর্মী।

"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলং চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ।।"

(সাংখ্যকারিকা– ১৩)

যোগদর্শনের প্রেক্ষিতেও সত্ত্বাদি গুণত্রয় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। চিত্তের বৃত্তিসমূহের নিরোধই হল যোগ–'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'[৬]। চিত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণের সৃষ্টি। এই সত্ত্বাদি গুণের প্রাধান্য ও কার্যকারিতা অনুসারে চিত্তের স্তরভেদ করা হয়েছে। এদের চিত্তভূমি বলে। চিত্তভূমি পাঁচ প্রকার। এই পঞ্চবিধ চিত্তভূমি যথাক্রমে–

১। **ক্ষিপ্ত**- ক্ষিপ্ত অবস্থায় চিত্ত রজঃ ও তমোগুণের প্রভাবে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়।

২। **মূঢ়**- মূঢ় অবস্থায় চিত্তে তমোগুণের প্রাধান্যহেতু মূঢ় অবস্থার সৃষ্টি হয়।

৩। **বিক্ষিপ্ত**-বিক্ষিপ্ত অবস্থায় চিত্ত তমঃ প্রভাব থেকে মুক্ত হলেও রজঃ প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় না, পরিণামে সাময়িকভাবে চিত্ত নিবিষ্ট হয়।

৪। **একাগ্র**- এই অবস্থায় সত্ত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

৫। **নিরুদ্ধ**- চিত্তের সমস্ত বৃত্তি রুদ্ধ হয়।

সাংখ্য ও যোগদর্শনে বর্ণিত এই গুণত্রয়কে জীবনোপযোগী করে শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত করলেন তিন ডাকাতের গল্পের মাধ্যমে –

"সত্ত্বরজস্তমঃ তিনগুণই চোর। একটা গল্প বলি শুন –'একটি লোক বনের পথে যাচ্ছিল। এমন সময়ে তিন জন ডাকাত এসে ধরলে। তারা তার সর্বস্ব কেড়ে নিল। একজন চোর বললে আর এ লোকটাকে রেখে কি হবে? এই কথা বলে খাঁড়া দিয়ে কাটতে এল। তখন আর একজন চোর বললে, না হে কেটে কি হবে? একে হাত পা বেঁধে এখানে ফেলে যাও। তখন তাকে হাত-পা বেঁধে ওইখানে রেখে চোরেরা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বললে, 'আহা, তোমার কি লেগেছে ?' এস, আমি তোমার বন্ধন খুলে দিই'। তার বন্ধন খুলে দিয়ে চোরটি বললে, 'আমার সঙ্গে সঙ্গে এস, তোমায় সদর রাস্তায় তুলে দিচ্ছি'। অনেকক্ষণ পরে সদর রাস্তায় এসে বললে, 'এই রাস্তা ধরে যাও, ঐ তোমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে'। তখন লোকটি চোরকে বললে, 'মশাই, আমার অনেক উপকার করলেন, এখন আপনিও আসুন, আমার বাড়ি পর্যন্ত যাবেন'। চোর বললে, 'না, আমার ওখানে যাবার জো নাই, পুলিশে টের পাবে।'

'সংসারই অরণ্য। এই বনে সত্ত্বরজস্তমঃ তিনগুণ ডাকাত, জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে লয়। তমোগুণ জীবের বিনাশ করতে যায়। রজোগুণ সংসারে বদ্ধ করে। কিন্তু সত্ত্বগুণ, রজস্তমঃ থেকে বাঁচায়। সত্ত্বগুণের আশ্রয় পেলে কাম-ক্রোধ এইসব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয়। সত্ত্বগুণও আবার জীবের সংসারবন্ধন মোচন করে। কিন্তু সত্ত্বগুণও চোর, তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না। কিন্তু সেই পরম ধামে যাবার পথে তুলে দেয়। দিয়ে বলে, ওই দেখ, তোমার বাড়ি ওই দেখা যায়। যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান সেখান থেকে সত্ত্বগুণও অনেক দূরে'।"[৭]

সাংখ্য ও যোগদর্শনের পারিভাষিক গুণত্রয় এইভাবে রূপকে গল্পচ্ছলে উপস্থাপিত হয়েছে। আরও একটু বিচার প্রবৃত্ত হলে দেখা যাবে যে সত্ত্বগুণ যতই প্রকাশ স্বভাব হোক না কেন, যোগের নিরুদ্ধ চিত্তভূমিতে সত্ত্বগুণেরও রোধ হয়; অর্থাৎ দয়ালু ডাকাতের প্রবেশও সেখানে নিষিদ্ধ। গুণত্রয়ের লয় হয় কারণ ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত।

স্বামী বিবেকানন্দ গুণত্রয়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন,- "সাংখ্যদর্শনমতে প্রকৃতি তিনটি উপাদানে গঠিত- সংস্কৃতভাষায় ঐ উপাদানত্রয়ের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। বাহ্যজগতে ইহাদের প্রকাশকে আমরা সমতা, ক্রিয়াশীলতা ও জড়তা বলতে পারি। তমোগুণের লক্ষণ অন্ধকার বা কর্মশূন্যতা, রজঃ কর্মশীলতা, আকর্ষণ ও বিকর্ষণরূপে প্রকাশিত, আর সত্ত্ব এই দুইগুণের সাম্যবস্থা।"[৮]

বেদের জ্ঞানকান্ড ও কর্মকান্ডের সম্বন্ধ ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য-সুরেশ্বররাচার্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ :

বেদের দুই কান্ড- কর্মকান্ড ও জ্ঞানকান্ড। বেদের কর্মকান্ডকে অবলম্বন করে পূর্বমীমাংসা-দর্শনসম্প্রদায়ের সৃষ্টি এবং বেদের জ্ঞানকান্ড অর্থাৎ উপনিষদকে আশ্রয়

করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেদান্তদর্শন। অর্থাৎ বেদের কর্ম ও জ্ঞানকান্ডকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে দুই দর্শনসম্প্রদায়। কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ কীরূপ? তারা কী পরস্পরবিরোধী অথবা পরস্পরের সহায়ক? জ্ঞানে মুক্তি না কর্মে? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তের রূপকার আচার্য শঙ্কর ও তাঁর শিষ্য আচার্য সুরেশ্বরের (খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক) বৃহদারণ্যকোপনিষদের উপরে ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ প্রধান উপনিষদগুলির মধ্যে অন্যতম। আকৃতি তথা প্রকৃতিতেও বৃহৎ এই উপনিষদের অবস্থান শুক্লযজুর্বেদের আরণ্যকমধ্যে এবং উপনিষদটির সূচনা হয়েছে যজ্ঞীয় অশ্বের বর্ণনায় মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ কর্মের মধ্যে দিয়ে। তাই উপনিষদের প্রধান ব্যাখ্যাকার জ্ঞানকান্ডবাদী আচার্যশঙ্করকে এই উপনিষদের ভাষ্যভূমিকাতে প্রথমেই কর্মের সাথে জ্ঞানের সম্বন্ধ উল্লেখ করতে হয়েছে,-
"সেয়ং ষড়ধ্যায়ী অরণ্যে অনূচ্যমানত্বাৎ আরণ্যকম্, বৃহত্ত্বাৎ পরিমাণতো বৃহদারণ্যকম্। তস্যাস্য কর্মকান্ডেন সম্বন্ধোঽভিধীয়তে"।[৯] জ্ঞান ও কর্মের সম্বন্ধ নির্ণায়ক প্রারম্ভিক এই ভাষ্য 'সম্বন্ধভাষ্য' নামে খ্যাত। এই সম্বন্ধ-ভাষ্যের উপর শঙ্করাচার্যের অন্যতম প্রধান শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য বার্তিক রচনা করলেন, যা 'সম্বন্ধ-বার্তিক' নামে পরিচিত। কর্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুরেশ্বরাচার্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কর্ম জ্ঞানের প্রতি আরাদুপকারক, অর্থাৎ পরম্পরায় উপযোগী। নিষ্কাম ও নিত্যকর্মসকলের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হলে, সেই শুদ্ধচিত্তে জ্ঞানের প্রকাশ হয়,-

"আরাদেবোপকুর্বন্তি নিত্যান্যাত্মবিশুদ্ধিতঃ।
আত্মজ্ঞানাবিরোধিত্বাৎ সাক্ষান্নত্বাত্মবোধবৎ।

(সম্বন্ধ-বার্তিক ১১৩৩)

খ্রীঃ অষ্টম শতকের এই দুই অদ্বৈতাচার্যের দ্বারা ব্যাখ্যাত কর্ম-জ্ঞানের সম্বন্ধ পরবর্তীকালে আনন্দপূর্ণমুনীন্দ্র (খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতক), আনন্দগিরি (খ্রীঃ চতুর্দশ শতক) প্রমুখ আচার্যদের দ্বারাও ব্যাখাত হয়েছে। এবং ঊনবিংশ শতকে আরেক আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব ও তদীয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যাতেও অনিবার্যভাবে এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "সংসারে কর্মক্ষেত্রে, কর্ম করতে করতে তবে জ্ঞান হয়। গুরু বলেছেন, এই সব কর্ম করো, আর এই সব কর্ম করো না। আবার তিনি নিষ্কামকর্মের উপদেশ দেন (কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলে কদাচন, গীতা ২।৪৭)। কর্ম করতে করতে মনের ময়লা কেটে যায়। ভাল ডাক্তারের হাতে পড়লে ঔষধ খেতে খেতে যেমন রোগ সেরে যায়"।[১০]

শঙ্করাচার্য, সুরেশ্বররাচার্য কর্তৃক উল্লিখিত 'চিত্তশুদ্ধি' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় 'মনের কয়লা কেটে যাওয়া'। 'কর্মরহস্য' বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বামীজি বলছেন,-
"নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু নিজেকে বন্ধনে ফেলিও না; বন্ধন বড় ভয়ানক। এজগৎ আমাদের বাসভূমি নয়, নানা অবস্থার ভিতর দিয়া আমরা চলিয়াছি, এই সংসার-এ পৃথিবী সেগুলিরই একটি। সাংখ্যের সেই মহাবাক্য স্মরণ রাখিও 'সমুদয় প্রকৃতি আত্মার

জন্য, আত্মা প্রকৃতির জন্য নয়। (সংহতানাং পরার্থত্বাৎ)। আত্মার শিক্ষার জন্যই প্রকৃতির প্রয়োজন। ইহার জন্য কোন আর্থ নাই। আত্মা যাহাতে জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং জ্ঞানের দ্বারাই আত্মা নিজেকে মুক্ত করিতে পারে ইহাই প্রয়োজন"।[১১]

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যেতে পারে, ঊনবিংশ শতকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন শাস্ত্রের যে সুগভীর তত্ত্বকে লোকসমাজে লোকশিক্ষার্থে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, আজও তাঁদের রচনা পড়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসু দর্শনশাস্ত্রের পরমতত্ত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়। শাস্ত্রের তত্ত্বলাভ করে এঁরা তা দান করেছিলেন মানুষের মুক্তির জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, পরমহংসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, "পরমহংস দুইপ্রকার। জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী তিনি আপ্তসার – 'আমার হলেই হল'। যিনি প্রেমী যেমন শুকদেবাদি ঈশ্বরকে লাভ করে আবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ পাতকুয়া খুঁড়বার সময় ঝুড়ি কোদাল আনে খোঁড়া হয়ে গেলে ঝুড়ি কোদাল ঐ পাতকোতেই ফেলে দেয়। কেউ ঝুড়ি কোদাল রেখে দেয় যদি পাড়ার কারুর দরকার লাগে। শুকদেবাদি পরের জন্য ঝুড়ি কোদাল তুলে রেখেছিলেন"।[১২]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ লোকশিক্ষার্থে নিয়োজিত হয়েছিলেন। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দে ভগবান বুদ্ধ 'বোধি' লাভ করে জনসাধারণের জন্য তাদের বোধগম্য করে কথ্যভাষায় যেমন শিক্ষাদান করেছিলেন, সেইভাবেই ঊনবিংশ শতকের এই দুই যোগী, দার্শনিকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনে দর্শনের পরমতত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে, লোকায়ত হয়েছে এবং গড়ে তুলেছে সাধারণ মানুষের জীবনদর্শন।

তথ্যসূত্র :

১. *শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত,* রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৬০ ।

২. *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা,* উদ্বোধন কার্যালয়। দশম খণ্ড, পৃষ্ঠাসংখ্যা-২০২।

৩. পাণিনীয় সূত্র ৪।৪।৬০।

৪. *শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত,* রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাসংখ্যা-৬৪৪ ।

৫. *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা,* উদ্বোধন কার্যালয়। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬২।

৬. যোগসূত্র, সমাধিপাদ-২।

৭. *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (*শ্রীম-কথিত*), উদ্বোধন কার্যালয়। প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাসংখ্যা-২৪৩।

৮. *স্বামী বিবেকান্দের বাণী ও রচনা,* দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৭।

৯. *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্*। দূর্গাচরণ-সাংখ্যবেদান্ত-তীর্থ। দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩।

১০ *শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত,* রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, প্রথমখন্ড, পৃষ্ঠাসংখ্যা-২২৩।

১১. *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা,* উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথমখন্ড, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৩।

১১. *শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত,* রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১৫৩।

সহায়ক গ্রন্থ:

শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, ২০১২।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (*শ্রীম-কথিত*), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৪।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১২।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, দূর্গাচরণ-সাংখ্য বেদান্ত তীর্থ (সম্পা), দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১।

ভট্টাচার্য্য দীনেশচন্দ্র, *আচার্য্য সুরেশ্বরাচার্য্য বিরচিত সম্বন্ধ-বার্ত্তিক* (*বেদান্ত-দর্শন*), শক্তিপ্রেস, কলকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।

সাংখ্যকারিকা, পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু-সাংখ্যভূষণ-সাহিত্যাচার্য্য (সঙ্কলিত), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৭ ।

পাতঞ্জল দর্শন, পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু-সাংখ্যভূষণ-সাহিত্যাচার্য্য (সঙ্কলিত), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৫।

পাতঞ্জল যোগসূত্র, স্বামী প্রেমেশানন্দ (ব্যাখ্যাতা), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৫।

গোস্বামী সীতানাথ, *অদ্বৈতবেদান্তের সারকথা,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৬।

বসুসুমিতা, *ভারতীয় দর্শনসমীক্ষা,* সদেশ কলকাতা, ২০১১।

'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় উল্লিখিত পিঠে-পুলি, মিষ্টান্ন ও ব্যঞ্জন শিল্প – একটি সমাজতাত্ত্বিক অন্বেষণ

অজয় কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়
চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর

||এক||

বাঙালির জীবনচর্যায় পিঠে-পুলি, মিষ্টান্ন ও ব্যঞ্জনশিল্প এক সুগভীর বিস্ময়। বাঙালি যে এক পরিশীলিত জাতি, সে প্রমাণ বহমান থেকেছে তাঁর খাদ্যশিল্পের মধ্যে। একদিনে এমন পরিশীলন ঘটে নি। ঐতিহ্য আশ্রিত কোন জাতির মধ্যেই বহু বিচিত্র বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ খাদ্যাভাসের বহুমুখী পরিচয় মেলে। একথা ঠিক, বাঙালি জাতি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পূর্বেই হাজার বছর অতিক্রম করেছে। এই বিষয় তার গৌরববোধক পরিচয়ের ক্ষেত্রে, কখনোই যথেষ্ট নয়। বাঙালি সামগ্রিকভাবে এক উন্নততর সংস্কৃতি যেমন পিঠে-পুলি, মিষ্টান্ন ও ব্যঞ্জনশিল্পের অধিকারী। সেই পরিচয় নিশ্চয়ই সামগ্রিকভাবে তার স্বতন্ত্র জাতিসত্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার বাঙালির লোকশিল্পকলার ধারক, বলিষ্ঠ অভিজ্ঞান। পিঠে-পুলি, মিষ্টান্ন ও ব্যঞ্জন শিল্প, এগুলি লোকশিল্প। এই শিল্পকলায় বাংলার ঘরে ঘরে, পল্লীর কুটিরে কুটিরে রমণীর অংশগ্রহণই মুখ্য। বাঙালি রমণীর নিজস্ব শিল্পকলা এগুলি। বাঙালির গৃহকোণকে আলো করে রেখেছে এমন পল্লি-রমণীরা। রন্ধনশিল্পে বাঙালি রমণীর আঙুল এমন সুচারু, পরিপক্ক ও রূপময় যে, সমগ্র বাঙালি জাতিকে তাঁরা যথার্থ ভোজন রসিক করে তুলেছেন। খাদ্য গ্রহণ শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তি বা ভোগ সর্বস্ব নয়, তা আস্বাদের বস্তু। তা হৃদয় মন এবং রসবোধের পরিচয় দেয়। শিল্পরসিক বাঙালি তারিয়ে তারিয়ে আহার্য গ্রহণ করেন। রসনা বিচিত্র আস্বাদে ভরপুর হয়ে খাদ্য-রন্ধনশালা এবং আহার্য গ্রহণের স্থান ও পরিবেশকে অপরূপ করে তোলে। রমণীর আঙুল জানে পিঠে-পুলি ও ব্যঞ্জনের কত রূপ, কত রঙ ও কত রস। এক নান্দনিক আবহ সেকালের বাঙালির খাদ্যগ্রহণের পরিবেশকে মেদুর স্বপ্ননীল রঙিন ধূসরতায় কল্যাণী করস্পর্শে স্নিগ্ধ সুন্দর করেছে। কবিরা, বিশেষত মধ্যযুগের স্রষ্টারা এই ব্যঞ্জনশিল্প এবং পিঠে-পুলিকে আশ্চর্যজনক ভাবে ব্যবহার করে বহুক্ষেত্রে চমৎকার কাব্যসৃষ্টির ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছেন। রন্ধন পটীয়সী রমণীর মধ্যে নায়িকাসুলভ সমস্ত গুণ দেখিয়েছেন তারা। মনসামঙ্গলের বেহুলা, চণ্ডীমঙ্গলের খুল্লনা প্রভৃতি চরিত্র ব্যঞ্জনশিল্পে আশ্চর্য চমতকারিত্ব দেখিয়েছেন। কবিরা তাঁদের কাব্যে বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ পিঠে-পুলি, মিষ্টান্ন ও ব্যঞ্জনকে সর্বকালের সাধারণ পাঠককে উপহার দিয়েছেন। শুধু নায়িকাদের কথাই নয়, বাংলার লক্ষ লক্ষ পল্লি-কুটিরের প্রতিটি ঘরের কোনায় কোনায়

রয়েছে ব্রাত্য-নিম্নবর্গীয়-অপাঙক্তেয় ব্যঞ্জনশিল্পী। তাঁদের পণের আনাই শিল্প রস রমণী। এঁদের সৃষ্টিই ভরপুর করে রেখেছে মধ্যযুগের বাণীশিল্পের রসময় বাতায়নটিকে। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র মলুয়া এবং 'কাজলরেখা' পালায় ব্যঞ্জনশিল্পের চমৎকারিত্ব পাঠককুলকে মুগ্ধ করে।

'মৈমনসিংহ গীতিকা' – ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। আজ শতবর্ষ পরে গীতিকাটির পুনর্বিচার সম্ভব। হয়েছেও। আবিষ্কারক শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন গীতিকাটির মধ্যে 'অনাবিষ্কৃত রত্নখনির সন্ধান' পাবেন বলে, যে আশা ব্যক্ত করেছিলেন, তা ব্যর্থ হয় নি। গ্রাম্য পল্লীজীবন অধ্যুষিত নিম্নবর্গীয় মানুষের সদ্য শিশির ধৌত এই সৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বের ফসল', 'ধানের মঞ্জরী' এবং 'আত্ম-বিস্মৃত রসসৃষ্টি' বলে উল্লেখ করেছেন। একথা ঠিক, বাংলা সাহিত্যে এমনতর সোঁদা গন্ধের টাটকা ফসল বড্ড দুর্লভ নিশ্চয়ই।

'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় পিঠে পুলির উল্লেখ রয়েছে। শীতের মাখো মাখো রোদে পিঠে-পুলির আস্বাদ নিতে নিতে বাঙালি আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে। শীতকাল পিঠে-পুলির আদর্শ সময়। এসময় সবুজ শাক-সবজি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। সে সব তো আছেই, কিন্তু এসময় বাঙালিকে আপ্লুত করে শীতের খেজুর গুড়। চাঁচলে ঝরে শীতের খেজুর – যার তুলনা মেলা ভার। এছাড়া ক্ষীর, সর, ননী, সন্দেশ, দই, মেওয়া, মিসরি, পিঠা, পায়েস, মিঠাই এগুলি বাঙালির সম্বৎসরের পিঠে-পুলির সুবৃহৎ পরিসরটিকে টইটম্বুর করে রেখেছে। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র আবিষ্কৃত পালাগুলিতে এসব পিঠে-পুলির উল্লেখ রয়েছে। পিঠে! কতরকমের পিঠে। পিঠে তৈরির প্রধান উপকরণ চাল। চাল ভিজিয়ে, ফুলিয়ে নরম করে, শিল নোড়াতে পেসাই করে গুড়, নারকেল, চিনি প্রভৃতি উপকরণ সহযোগে পিঠে তৈরি করা হয়। কিন্তু গ্রামবাংলায় বর্ষাকালে লোভনীয় একটি পিঠা হল 'তালের পিঠা'। বর্ষাকালে তাল পাকে, এই পাকা তাল চেঁছে তার 'লোদ' বের করে তালের বড়া, পোড়া পিঠা প্রভৃতি তৈরি করা হয়। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় 'দেওয়ানা মদিনা পালা'য় তালের পিঠার উল্লেখ রয়েছে।

||দুই||

পিঠে-পুলি:

বাঙালি শুধু শুষ্ক ভোজনরসিক নন, এককালে বাঙালির পিঠে-পুলি এবং মিষ্টান্ন শিল্পে শুভ কল্যাণবোধের ধারণা জীবন্ত ছিল। সেগুলি আজ হারিয়ে গেছে। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'নিমন্ত্রণ সভা' প্রবন্ধে লিখেছেন - "আমাদের নিমন্ত্রণব্যাপারে অন্ততঃ মিষ্টান্নেও তাঁহাদের রচনাকলার পরিচয় পাওয়া যাইত। তাম্বুলরচনা তো অন্তঃপুরিকাগণের বাঁধা কাজ বলিলেই হয়। এবং শসার চাটনি, আদার কুচির সহিত কালো জীরা ও নেবুর রস দিয়া চাটনিবৎ একটা কিছু, দধির লুড়কি, ক্ষীরকমলা কিম্বা অভিনব দু একটা কিছুতে না কিছুতে তাঁহাদের সিদ্ধ হস্ত প্রকাশ পাইতই।" (১)

বাঙালির পিঠে পুলি সর্বজনবিদিত। বাঙালির পিঠে পুলি শুধু রসনাই তৃপ্ত করেনি, পিঠে পুলিতে মাঙ্গলিকবোধ এবং সৌন্দর্য যুক্ত রয়েছে। বাঙালির লোকায়ত

জীবনের নানা মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পিঠে তৈরি করা হয়। পিঠে পূজার উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়। পৌষ মাস পিঠে তৈরির সর্বোৎকৃষ্ট সময়। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে রন্ধন শিল্পের ব্যাপকতা লক্ষ করা গেলেও 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র পালাগুলিতে পিঠে-পুলির বর্ণনা বিশেষভাবে নজর কাড়ে। এমনকি তালের পিঠের উল্লেখও 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র পালাগুলিতে লক্ষ করা যায়।

'মহুয়া' পালায় মহিষের দইয়ের উল্লেখ আছে -

"ঘরে আছে মইষের দইরে বন্ধু খাইবা তিনো বেলা।
আইজের দেখা শেষ দেখারে বন্ধু আর না হবে দেখা"।।[২]

মৃত্যু যেখানে অনিবার্য, সেখানে জীবনে ক্ষতির ক্ষতি। সবচেয়ে ক্ষতি হল বিচ্ছেদ। শেষ সাক্ষাৎ মহামূল্যবান হয়ে ওঠে ব্যক্তির জীবনে। বিদায় মুহূর্তে মহুয়ার চক্ষু অশ্রু সজল।

'মলুয়া' পালায় নানা রকমের পিঠে পুলির উল্লেখ রয়েছে। সেকালের পিঠে পুলিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -

i) পুলি পিঠা (ii) পাত পিঠা (iii) বরা পিঠা (iv) চিত (আসকে পিঠা) (v) পোয়া চই (মালপো) প্রভৃতি। সেকালের গ্রাম বাংলায় অতিথি অভ্যর্থনার সাধারণ রীতি মলুয়া পালায় লক্ষ করা যাচ্ছে। মলুয়ার পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে পিঁড়িতে বসে চাঁদ বিনোদ খেতে বসেছেন। পাঁচ ভাইয়ের স্ত্রী চাঁদ বিনোদকে খাওয়াচ্ছেন। মধ্যযুগের একান্নবর্তী পরিবারের ছবি এখানে স্পষ্ট। পিঠে তৈরির পর পিঠেকে গরম দুধে চুবিয়ে রাখা হত। রসনায় এই পিঠের স্বাদ লেগে থাকত। পিঠে উপভোগ্য আস্বাদের বস্তু হয়ে উঠত। চাঁদ বিনোদকে এমন পিঠে দিয়েই আপ্যায়ন করা হয়েছে।

"শুকত খাইল বেনুন খাইল আর ভাজা বরা।
পুলি পিঠা খাইল বিনোদ দুধের শিস্যায় ভরা।।
পাত পিঠা বরা পিঠা চিত চন্দ্রপুলি।
পোয়া চই খাইল কত রসে ঢলঢলি"।। [৩]

'মলুয়া' পালায় সেকালে বিবাহ উপলক্ষে পিঠে তৈরির প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। পিঠে তৈরির জন্য কিছু মাঙ্গলিক সংস্কার 'মলুয়া' পালায় পাওয়া যাচ্ছে। লক্ষ্মীর কুলাকে আঁচল দিয়ে ঘিরে কন্যার মা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সোহাগ প্রার্থনা করেন। ভাল 'সাইলের' চালে পিঠে তৈরি করেন। দরজার মাটি কেটে তুলে 'আবা' 'আবা' শব্দ করে দেবী বন্দনা করেন

"উত্তম সাইলের চাউলে পিঠালী বাটিয়া।
বন্দনা করিল আগে তিন আবা দিয়া"।। [৪]

নিম্নোক্ত চরণগুলিতে মেওয়া, মিসরির উল্লেখ আছে। এখানে লোককবি আশ্চর্য কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। লোককবি মিসরির মধ্য দিয়ে মানব জীবনের সুখ দুঃখ বিরহ বেদনার ছবিকে অসাধারণ কাব্য তাৎপর্যে উন্নীত করেছেন। মিসরির থেকে কি

কি ভাল – দুঃখের পরে সুখ, হারানো সম্পদ এবং হারানো সন্তানকে ফিরে পাওয়া। আর বিরহের পরে মিলন অনেক বেশি সুখকর-

"মেওয়া মিশ্রি সকল মিঠা মিঠা গঙ্গাজল।
তার থাক্যা মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল।।
তার থাক্যা মিঠা দেখ দুঃখের পরে সুখ।
তার থাক্যা মিঠা যখন ভরে খালি বুক।।
তার থাক্যা মিঠা যদি পায় হারানো ধন।
সকল থাক্যা অধিক মিঠা বিরহে মিলন"।। (৫)

রবীন্দ্রনাথ 'রঙ্গ' কবিতায় লিখেছেন -

"বরফি মিঠে, জিলাবি মিঠে, মিঠে শোন-পাপড়ি।
তাহার অধিক মিঠে, কন্যা, কোমল হাতের চাপড়ি"।(৬)

রবীন্দ্রনাথের 'রঙ্গ' কবিতার পূর্বরূপ যেন লোককবির ছত্রগুলিতে ধরা পড়েছে। অবশ্য লোককবির কবিতায় মূল সুর বিরহ মিলনের সুতোয় বোনা।

'কঙ্ক ও লীলা' পালায় গর্গের পত্নী গায়ত্রীদেবী কঙ্কের নাম রেখেছে গোপাল। বৈষ্ণবীয় প্রভাব এখানে আছে। যশোদার মত গায়ত্রীদেবীও গোপালকে ক্ষীর, সর ও ননী খাইয়েছে -

"গোপাল রাখিল নাম গায়ত্রী জননী।
স্নেহভরে খাওয়ায় কঙ্কে ক্ষীর-সর-ননী"।। (৭)

'কঙ্ক ও লীলা' পালায় মন্ত্রের প্রভাব আছে। মন্ত্রের সাহায্যে মেওয়া তৈরির কথা উল্লিখিত হয়েছে। যবন পীর মন্ত্রবলে মাটি দিয়ে মেওয়া তৈরি করে শিশুর হাতে তুলে দিয়েছে -

"মাটী দিয়া বানায় মেওয়া কিবা মন্ত্র বলে।
শিশুগণে ডাকি তবে হস্তে দেয় তুলে"।। (৮)

আর পৌষের মোয়া যে বাঙালির কত আদরের তা জয়নগরের মোয়ার আস্বাদ নিলেই বোঝা যায়।, 'কাজলরেখা' পালায় সেকালের পিঠে-পুলির চমৎকার বর্ণনা আছে। পিঠেপুলি তৈরির সময়ে মাঙ্গলিক সংস্কারেরও উল্লেখ করেছেন পালাকার। সূর্যের আলো ফোটার আগে কাজলরেখা স্নান সেরে রন্ধনশালায় গিয়ে নানা ধরনের পিঠে তৈরি করেছেন। সেই পিঠে-পুলি নিম্নরূপ –

'মশল্লা পিটালি' (মসলার পাটালি), পায়েস, চন্দ্রপুলি পিঠে, চপড়ি (চিতে পিঠে), ক্ষীরপুলি, পোয়া (মালপোয়া) প্রভৃতি। লোককবি লিখেছেন -

"মশল্লা পিটালি লইল পাটাতে বাটিয়া।"

....

পায়েস পরমান্ন রান্ধে সুন্দর যুবতী।।
নানা জাতি পিঠা করে গন্ধে আমোদিত।

চন্দ্রপুলি করে কন্যা চন্দ্রের আকিরত।
চই চপড়ি পোয়া সুরস রসাল।
তা' দিয়া সাজাইল কন্যা সুবর্ণের থাল।।
ক্ষীরপুলি করে কন্যা ক্ষীরেতে ভরিয়া।
রসাল করিল তায় চিনির ভাজ দিয়া।।" [৯]

নানা জাতির পিঠে প্রস্তুত করেছেন কাজলরেখা। পিঠের সুগন্ধীতে ভরপুর থাকত সান্ধ্য পরিবেশ। চারদিক ম-ম করতো যেন। পিঠে তৈরির পদ্ধতিও উল্লেখ করেছেন লোককবি। ক্ষীরে ভরে ক্ষীরপুলি তৈরি হত। রসস্থ সেই ক্ষীরপুলিতে চিনির ভাজ দেওয়া হত।

এছাড়া 'কাজলরেখা' পালায় ক্ষীর ননীরও উল্লেখ রয়েছে -

"এই ঘরে থাকিয়া মায় দিছে ক্ষীরননী।
সেই মায় হারাইছি আমি জন্ম অভাগিনী"।। [১০]

'কমলা' পালায় পল্লিজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রিয় পিঠের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, তা হল তালের পিঠে। ভাদ্র মাসে তাল পাকে, সেই পাকা তালের 'লোদ' দিয়ে বড়া পিঠে, পোড়া পিঠে প্রভৃতি নানা ধরনের আস্বাদিত পিঠে তৈরি করেন পল্লি-রমণীরা। দরিদ্র পল্লীর ঘরে ঘরে বালক-বালিকার চোখে মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠে -

"ভাদ্র মাসে তালের পিঠা খাইতে মিষ্ট লাগে।
দরদি মায়ের মুখ সদা মনে জাগে"।। [১১]

অগ্রহায়ণ মাস। পাকা ধানে এবং সরু শস্যে পৃথিবী ভরে যায়। প্রতি ঘরে ঘরে জয় জয় শব্দ ওঠে। ঘরে ঘরে আসন পেতে লক্ষ্মীপূজা হয়। নতুন ধানে, নতুন চালের অন্নে চিড়ে পিঠে হয়। দুধ-চাল-চিনি এবং ঘি সহযোগে পায়স প্রস্তুত হয় এছাড়া চাল ও মসলা সহযোগে খেচুড়ি প্রস্তুত হয়। লক্ষ্মীপূজোর ভোগ প্রস্তুত হয় -

"জয়াদি জুকার পড়ে প্রতি ঘরে ঘরে।
নয়া ধানের নয়া অন্নে চিড়া পিঠা করে।।
পায়েস খিচুরী রান্ধে দেবের পারণ।
লক্ষ্মীপূজা করে লোকে লক্ষ্মীর কারণ"।। [১২]

'কমলার বিবাহ' অংশে গোয়ালা সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। গোয়ালারা দুধ জমিয়ে দই প্রস্তুত করে। এছাড়া ময়রা সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। ময়রা মিষ্টি বানায় -

"চারি ভইরা ময়রা মিঠাই বানায়।
হাজারে বিজারে গোয়াল দই জমায়"।। [১৩]
[ভাইরা অর্থাৎ বৃহৎ মাটির পাত্র]

'দেওয়ানা মদিনা' বা 'আলালের দুলালের পালা'য় তালের পিঠের উল্লেখ রয়েছে। মুসলমান কন্যা মদিনার পবিত্রতা, তাঁর সংসার যাপনের চিত্ররূপ অসাধারণ

রূপে অঙ্কন করেছেন লোককবি। তালের পিঠে এবং খৈ বানিয়ে তিনি স্বামীর জন্য হাঁড়িতে তুলে রাখেন। ছোট্ট জীবন। এ জীবনকে বর্জন করা যায় না। মৃত্যুর থেকেও বড় হয়ে ওঠে বিচ্ছেদ এবং অপ্রেম। মদিনার জীবনেও মর্মান্তিক বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। লোকজীবন অন্বেষণের পক্ষে পালাটি অসাধারণ -

"আইজ বানায় তালের পিডা কাইল বানায় খৈ।
ছিক্কাতে তুলিয়া রাখে গামছা-বান্ধা দৈ"।। [১৪]

তালের পিঠে আজকাল আর তেমন প্রস্তুত হয় না। তালের পিঠের সেই সুবাস আজ আর তেমন মেলে না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তালনবমী' গল্পে সেই স্মৃতির সুবাস পাঠক কখনো কখনো অনুভব করেন। তালের বড়া, তালের পিঠা, তালের পোড়া পিঠা, তালের গুড় পিঠা, তাল রুটি – এগুলি শ্রাবণের শেষ থেকে গোটা ভাদ্র মাস জুড়ে পল্লীর ঘরে ঘরে আমোদিত গন্ধ ছড়াতো। প্রবল বর্ষণের মাঝে কৃষিকাজ সেরে বাড়ি ফিরতেন কৃষক। আর টইটম্বুর ডুবডুবে জলে মইয়ে চেপে বাড়ি ফিরতেন পল্লী বালকেরা। তখন তালের পোড়া পিঠার গন্ধে ম-ম-করত সারাটা বাড়ি। আর কড়াই থেকে পোড়া পিঠা ভাঙার সময় উৎসাহী বালকেরা কড়াইয়ের চারপাশে বসে গোল হয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাত। তারা দেখতো উদগ্রীব চোখে। পিঠের গন্ধ চোখে মুখে মেখে নিত তারা। সেই সেকাল। সেকালের তালের পিঠের ম-ম-গন্ধ একালে প্রায় গেছে হারিয়ে। একথা স্মরণ করে, একালের প্রবীণ মানুষেরাও স্মৃতিভারাতুর হয়ে পড়েন। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র কয়েকটি পালায় রয়েছে সেকালের পিঠে পুলির সরল বর্ণনা।

||তিন||

ব্যঞ্জন শিল্প:

ব্যঞ্জনশিল্প শিল্প কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয় তাঁর 'প্রাচীন-শিল্প পরিচয়' (প্রথম প্রকাশ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ)-গ্রন্থে ব্যঞ্জনশিল্পকে খাদ্যশিল্প বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থের 'খাদ্যশিল্প' প্রবন্ধের শুরুতেই লিখেছেন – "পূর্বকালে বড় বড় ভোজে ব্যবহার্য নৈপুণ্যোদভাবিত খাদ্য-বিশেষ 'খাদ্যশিল্প' নামে অভিহিত হইতে পারে, অতএব আমরা এই শ্রেণীর শিল্পকে 'খাদ্যশিল্প' নামেই নির্দেশ করিলাম"।[১৫] ব্যঞ্জন শিল্পিদের শিল্প প্রস্তুতের পটুতা এমনই বিস্ময়কর ছিল যে, খাদ্যবস্তু আস্বাদের সময় তারা অন্য ঋতুর ফল শাক অর্থাৎ 'আকালিক বস্তু' মনে করতেন। অতিথিরা ভুল করতেন এবং তারা বিস্মিত হতেন অর্থাৎ খাদ্যবস্তুর আসু প্রক্রিয়াকরণ এবং রূপান্তর সম্পর্কে শিল্পিদের সম্যক ধারণা ছিল।

মধ্যযুগের কাব্য ব্যঞ্জন শিল্পে টইটম্বুর। মঙ্গলকাব্যে রন্ধনশিল্পের সমধিক পরিচয় আছে। খাদ্যপ্রিয় বাঙালি রন্ধনকে অসাধারণ শিল্পিত উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য বাঙালির খাদ্যরুচির পরিবর্তন হয়েছে। সেকালের সেই রন্ধনশিল্পের অনেককিছুই আজ প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। ফাস্ট ফুড, প্যাকেটজাত খাদ্য সামগ্রীর প্রচলন হয়েছে।

দেশীয় মাছ, দেশীয় শাক সবজির স্বল্পতা, বিশেষত শিক্ষাদীক্ষার প্রসারের ফলে রন্ধনের কাজে সারাক্ষণ ব্যাপৃত অন্তঃপুর রমণীরা একালে প্রায় হারিয়ে গেছেন। চাকুরি বা অন্যান্য জীবিকায় রমণীরা নিযুক্ত। ফলত মধ্যযুগের রন্ধনশালার সেই স্বাদগন্ধ একালে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্যঞ্জন বা রন্ধন বেশিদিন সংরক্ষণ শালায় সংগ্রহ করে রাখার বস্তু নয়। সেকালের ব্যঞ্জনের স্বাদ পেতে হলে মধ্যযুগের সাহিত্য গ্রন্থের সাহায্য ছাড়া অন্য কোন উপায় প্রায় নেই। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র 'মলুয়া' পালা এবং 'কাজলরেখা' পালায় লোককবি ব্যঞ্জনশিল্পের পরিচয় রেখে গেছেন।

'মৈমনসিংহ গীতিকা'র 'মলুয়া' -পালাতে মূলত ব্যঞ্জনশিল্পের উল্লেখ এসেছে। বাঙালির আতিথেয়তা সর্বজনবিদিত। বাঙালির এই আতিথেয়তা ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত। শুধু রান্নাবান্না নয়, সেকালের অতিথি-প্রিয় বাঙালির একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি পাওয়া যাচ্ছে 'মলুয়া' পালায়। অতিথি বাড়িতে এলে হাত পা মুখ ধোয়ার জন্য লোটায় করে শীতল জল তুলে রাখা হয়। খাওয়া হয়ে গেলে বাটায় ভরে পান সুপুরি এগিয়ে দেওয়া হয়। গৃহবধূরা পান সাজিয়ে দেন, বিছানা সাজিয়ে দেন শীতলপাটি দিয়ে। আর গরমের হাত থেকে অব্যাহতির জন্য পাখা দিয়ে দেন। 'মলুয়া' পালায় অতিথি অভ্যর্থনার জন্য যে সব রান্নাবান্না হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ-

মানকচু ভাজা, 'চালিতার অম্বল' (চালতার অম্বল), মাছের সরুয়া (মাছের ঝোলযুক্ত ব্যঞ্জন), কৈ মাছের চচ্চড়ি, শুকনা মাছের পোড়া, শুকতা, বড়া ভাজা প্রভৃতি। মধ্যযুগের রন্ধনের সেই স্বাদ একালে আর সেভাবে হয়তো ফিরে আসবে না। লোককবি লিখেছেন-

"মানকচু ভাজা আর অম্বল চালিতার।
মাছের সরুয়া রান্ধে জিরার সম্বার।।
কাইট্টা লইছে কই মাছ চরচরি খারা।
ভালা কইরে রান্ধে বেনুন দিয়্যা কাল্যাজিরা।।
একে একে রান্ধে সব বেনুন ছত্রিশ জাতি।
শুকনা মাছ পুইড়া রান্ধে আগল বেসাতি ।।

....
শুকত খাইল বেনুন খাইল আর ভাজা বরা।
পুলি পিঠা খাইল বিনোদ দুধের শিস্যায় ভরা"।। [১৬]

সেকালে রন্ধনশালায় প্রবেশের পূর্বে রমণীরা কিছু রীতিনীতি পালন করে শুদ্ধ এবং পবিত্র হতেন। এগুলি হল মাঙ্গলিক সংস্কার। রমণীরা রন্ধনের পূর্বে শুচিতা পালন করতেন। ভোরে উঠে স্নান করতেন। শুদ্ধ, শান্ত মনে রন্ধনশালার ঘরে প্রবেশ করতেন। চুল বাঁধতেন এবং শক্ত করে কাপড় পরতেন। জল দিয়ে রান্নাঘর ধৌত করতেন। কাজলরেখা মানকচুর তরকারী এবং নানা মাছের বিভিন্ন পদ রান্না করেছেন। বাঙালির অতিথিপ্রিয়তার বিশেষ রীতি কাজলরেখা পালাতেও লক্ষণীয়। অতিথিকে

অভ্যর্থনা করার জন্য জলের ছিটা দিয়ে ঘর পরিষ্কার করেছেন। বসতে দিয়েছেন কাঁঠালের পিঁড়ি। 'চিক্কন সাইলের ভাত' দিয়েছেন। আর তাতে দিয়েছেন পাতিলেবু। বাঙালির রন্ধন শিল্পকলার অতীত স্মৃতি ধরা আছে 'কাজলরেখা' পালায় -

"ভোরেত উঠিয়া কন্যা ভোরের সিনান করে।
শুদ্ধ শান্তে যায় কন্যা রন্ধনশালার ঘরে।।
উবু কইরা বান্ধ্যা কেশ আইট্যা বসন পরে।
গাঙ্গের না পানি দিয়া ঘর মাজন করে।।
মশল্লা পিটালি লইল পাটাতে বাটিয়া।
মানকচু লইল কন্যা কাটিয়া কুটিয়া।।
জোরা কইতর রান্ধে আর মাছ নানা জাতি।
পায়েস পরমান্ন রান্ধে সুন্দর যুবতী।।
চই চপড়ি পোয়া সুরস রসাল।
তা' দিয়া সাজাইল কন্যা সুবর্ণের থাল"।।[১৭]
['চই' এক প্রকার শাকের রান্না]

বাঙালির সেকালের রান্নাঘর আজ একান্তই প্রায় হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিকথায় পর্যবসিত হয়েছে। মাটির বাড়ি একালে কমে এসেছে। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন -

"যে গৃহসজ্জার পরিপাট্যে গৃহিণীর শুচিতা প্রকাশ পায়, যে ব্যঞ্জনরন্ধনে তাঁহার কোনরূপ প্রযত্ন উপদেশ থাকে, যে তাম্বুলরচনায় তাঁহার শুভ অঙ্গুলিস্পর্শ মধু সঞ্চার করে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তহারী এবং তাহাতেই আমাদের সার্থকতা। আমাদের মনে এই সকল বাহিরের জিনিসের মধ্য দিয়া সেই যুবতিপরিবৃত তাম্বুলরচনাশালা, সেই নিরন্তরগল্পগুঞ্জনহাস্য পরিহাসধ্বনিত পাকগৃহ, সম্মার্জনীসংক্ষুব্ধ গৃহপরিষ্করণশব্দ, উৎসাহ-আনন্দ-গতিবিধি- উদ্যমসজীব উদ্যোগপর্ব্ব কেমন যেন সহজ অবলীলাভরে নানা চিত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।"[১৮]

১। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, নিমন্ত্রণসভা –প্রবন্ধ, বলেন্দ্র-রচনাবলী, সম্পাদক - ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, চতুর্থ সংস্করণ, মাঘ - ১৪২২ পৃঃ ৪৩১
২। সেন দীনেশচন্দ্র, মৈমনসিংহ গীতিকা, মহুয়া পালা (শেষ বিদায়-মহুয়ার উক্তি), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃঃ ১৬
৩। পূর্বোক্ত, মলুয়া পালা (অতিথির অভ্যর্থনা), পৃঃ ৬১
৪। পূর্বোক্ত, মলুয়া পালা (বিবাহ), পৃঃ ৬৭
৫। পূর্বোক্ত, মলুয়া পালা (অদৃষ্টের ফের), পৃঃ ৮৪

৬। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'রঙ্গ' কবিতা, কাব্যগ্রন্থ-প্রহাসিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, বিশ্বভারতী, ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, পৌষ-১৪০২, পৃ: ১২

৭। সেন দীনেশচন্দ্র, মৈমনসিংহ গীতিকা, কঙ্ক ও লীলা পালা (গর্গের আলয়ে), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃঃ ২৬৯

৮। পূর্বোক্ত, কঙ্ক ও লীলা পালা (লীলার যৌবনে পদার্পণ) পৃঃ ২৭৪

৯। পূর্বোক্ত, কাজলরেখা পালা, পৃঃ ৩৩১

১০। পূর্বোক্ত, কাজলরেখা পালা, পৃঃ ৩৩০

১১। পূর্বোক্ত, কমলা পালা (প্রদীপকুমার ও কমলা), পৃঃ ১৬২

১২। পূর্বোক্ত, কমলা পালা (প্রদীপকুমার ও কমলা), পৃঃ ১৬২

১৩। পূর্বোক্ত, কমলা পালা (কমলার বিবাহ), পৃঃ ১৬৬

১৪। পূর্বোক্ত, দেওয়ানা মদিনা পালা, পৃঃ ৩৭৭

১৫। বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প-পরিচয়, খাদ্যশিল্প, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৪২৫, (প্রথম প্রকাশ – ১৩২৯ বঙ্গাব্দ), পৃঃ- ১৭১

১৬। সেন দীনেশচন্দ্র, মৈমনসিংহ গীতিকা, মলুয়া পালা (অতিথির অভ্যর্থনা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃঃ ৬১

১৭। পূর্বোক্ত, কাজলরেখা পালা, পৃঃ ৩৩১

১৮। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, গৃহকোণ – প্রবন্ধ, বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, সম্পাদক-ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৪২২, পৃঃ ৪২৬

সুবোধ ঘোষের ‘শতকিয়া’ : একটি আদিবাসী গোষ্ঠীর ভাঙনের ইতিকথা

দীপ্তি রায়
সহকারী শিক্ষক, বাংলা বিভাগ,
অক্ষয় বিদ্যাপীঠ গার্লস হাই স্কুল, কৃষ্ণনগর, নদিয়া

সারসংক্ষেপ : সুবোধ ঘোষের ‘শতকিয়া’ উপন্যাসটি বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের মধুকুপি গ্রামকেন্দ্রিক আদিবাসী কৃষক সমাজের পটভূমিকায় রচিত। ডরানি নদী, ছোটকালু- বড়কালু পাহাড়, কপালবাবার থান, গোষ্ঠীসত্তার প্রতিরূপ বাঘিনী কানারানিকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের আঞ্চলিক আবহ নির্মিত। নির্দিষ্ট কোন জাতির জাতিসত্তার পরিচয় না উল্লেখিত হলেও ভূমিজ আদিবাসী গোষ্ঠীর গোষ্ঠীসত্তাই যেন প্রতীকায়িত। গোষ্ঠীর মুখ দাশু — উপন্যাস জুড়ে তার প্রবল উপস্থিতি। কপালবাবা, সিনবোঙায় বিশ্বাসী দাশু ও তার গোষ্ঠীর পারিপার্শ্বিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় চাপে গভীর সংকটের সম্মুখীন হওয়া - অবশেষে গোষ্ঠীর ভাঙ্গন এবং দাশুর মৃত্যু - সব প্রতিরোধের অবসান এভাবেই ঘটে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। গোষ্ঠীভাঙনের পাশাপাশি ভাঙ্গন ধরে দাশুর ব্যক্তিগত জীবনেও। জমি থেকে উৎখাত হওয়া দাশুর জীবন থেকেও অন্তর্হিত হয় মুরলী।
সূচক শব্দ : ভূমিজ আদিবাসী গোষ্ঠী, গোষ্ঠীসত্তা, লোকবিশ্বাস, লোকদেবতা, গোষ্ঠী বিরোধীসত্তা।

পঞ্চাশের দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০) বহুবিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান রেখে যান তাঁর কথাসাহিত্যের নানা কৃতির মধ্যে। তাঁর ‘শতকিয়া’ (১৯৫৮) উপন্যাসের মূল ভিত্তি মধুকুপি গ্রাম ও সেই গ্রামে বসবাসকারী আদিবাসী সমাজ। এই উপন্যাসের বিস্তীর্ণ পরিসরে আদিবাসী সমাজজীবনের ব্যাপ্তি প্রতিভাত হয়। এই উপন্যাসে তথাকথিত উপজাতীয় গোষ্ঠী ভূমিজদের সমাজজীবনের চিত্র সুস্পষ্ট।

‘শতকিয়া’ (১৯৫৮) উপন্যাসে মধুকুপির দাশু ছাড়া আর কারোর নিজস্ব জমি নেই, সব জমি ঈশান মোক্তারের। তাই ‘ঈশানবাবু সদরে বসে মোক্তারি করে, আর গাঁয়ে এসে জমি মারে।’[১] অর্থনৈতিক দিক থেকে অরণ্যচারী আদিবাসীদের জীবনমান অতি নগণ্য। অরণ্যের কাঠ বিক্রি করে আদিবাসীদের সংসার চলে না। তাদের ঠিকাদার, পুলিশকে উৎকোচ দিতে হয়। দাশু ঘরামি ভূমিজ আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত একজন অতি সাধারণ শ্রমিক। এই উপন্যাসে লেখক বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে আদিবাসী কৃষিজীবী আদিম অসংস্কৃত মানুষের সমষ্টিকেই উপস্থিত করেছেন।

'মধুকুপি জনমজুরের গাঁ, যে গাঁয়ের মানুষেরা সবাই মনিষ। পরের মাটি কাটে, পরের জমি চষে, পরের গো-গাড়ি হাঁকায়, পরের ঘরের চালা ছায় আর পরের পালকিতে বেহারা খাটে।

জঙ্গলকে একেবারে পর ভাবে না, কিন্তু ক্ষেতের মাটিকে বেশি ভালবাসে, কাঁড় টাঙ্গি ছেড়ে দেয়নি, কিন্তু লাঙ্গল কোদাল হাতে তুলে নিয়েছে। কর্মঠ ভূমিজ জীবনের ছোট্ট একটি উপনিবেশ এই মধুকুপি। জাতের পেশা নামে ধরাবাঁধা কোন পেশা নেই। ... দাশু তাই দাশু ঘরামি। দাশুর বাবা ছিল কাঠুরিয়া, বাবার বাবা মাটিয়াল।'[২]

পেশায় স্বতন্ত্র হলেও মধুকুপি গ্রামের মানুষ নির্দিষ্ট গোষ্ঠীসত্তায় বিশ্বাসী। আর এই গোষ্ঠীচেতনা সম্পৃক্ত রীতি নিয়ম নির্ণায়ক ও নির্ধারক ছিল জাতপঞ্চ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় থেকে এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট স্বাধীন ভারতবর্ষের নির্বাচনের প্রাথমিক প্রস্তুতিপর্বে বিধৃত। আর কালপর্বকে লেখক সুবোধ ঘোষ অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে কয়েকটি চরিত্র নির্মাণ ও তার পরিণতির মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। ভরতের স্ত্রী, বাতাসী যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে 'সলজার ভাতারী', 'পল্টনী দিদি' হয়ে যায় তার বাস্তবোচিত বর্ণনা রয়েছে । '...পল্টনের গাড়ি সড়কের উপর থামলেই ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে ফিক করে হেসে উঠত পল্টন দিদি। তিনটে বছর যেতে না যেতেই দুটো ছেলে হল পল্টনী দিদির। সোনা রঙের চুল, ধবধবে ফরসা, আর কটা চোখ – দুটো ছেলে।'[৩] উপার্জনহীন, খঞ্জ স্বামীর ভরণপোষণের জন্য ফুলকি মাসির ঈশান মোক্তারের 'রাখনি' হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। মিঠুয়া ঘাসির বিধবা, তেতরি জীবনের তাগিদে অস্তিত্ব রক্ষার্থে হয়ে ওঠে দেহোপজীবিনী।

এইভাবেই আরণ্যক এই আদিবাসী মানুষদের ওপর অর্থনৈতিক নানা পীড়নের চিত্র ফুটে ওঠে। এই উপন্যাসে ঈশান মোক্তার সামন্ত প্রভুর প্রতিভূ।

'ঈশান মোক্তারের একটা কুঠি আছে মধুকুপিতে, সেই কুঠির কাছে পঞ্চাশ জোড়া বলদের একটা খাটাল আছে। এটাও ঈশান মোক্তারের সম্পত্তি। সেই খাটালের চারদিকে সারি সারি খড়ের মাচান, মাচানের ফাঁকে ফাঁকে এদিকে-ওদিকে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে থাকে যেসব গো-গাড়ি, সেগুলিও ঈশান মোক্তারের সম্পত্তি। যেমন ঈশান মোক্তারের জমিতে, তেমনি ঈশান মোক্তারের এই সব গো-গাড়িতে মধুকুপির গাঁয়ের মানুষ মনিষ খাটে। অনেকে আবার আধিয়া থাকে।'[৪]

জমিদারের এই সর্বগ্রাসী লোভের সামনে দাশু একক প্রতিবাদ চালিয়ে যায়। দাশুকে তার 'চাকরান জমি' থেকে উৎখাত করতে নানা প্রয়াস চলে অবিরত।

জেলখাটা কয়েদি দাশু কর্মহীন হয়ে পড়লে আরণ্যক মা ও ডরানি নদী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। দাশু গোষ্ঠীচেতনায় পুরানো সংস্কারকেই আঁকড়ে ধরতে চায়। কানারানি যেন সেই গোষ্ঠী চেতনারই প্রতীক হয়ে ওঠে। কানারানিকে দাশু বাঘিন ভাবে না।

'-বনমাতা বটে। বরাকরের সেই মাতা বুড়ি, এক রাতের মধ্যেই যে বুড়ির ছেইলা, ছেইলার মাগ আর নাতি মরে গেল। বুড়িও গাঁ ছেড়ে দিয়ে সেই যে জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকলে, আর বুড়িকে কেউ দেখতে পায় নাই।'[৫]

দাশু বিশ্বাস করে কানারানিকে। আর বিশ্বাস করে কপালবাবাকে।

'কপালবাবার সেই বেলগাছের পাতাই যথেষ্ট, মধুকুপির সব রোগের ওষুধ, সব ভয়ের কবচ, আর সব মানতের আশ্বাস।'[৬]

উপন্যাসে নদী, পাহাড়, জঙ্গল সমেত এই আদিবাসী সমাজকে একাত্ম করে চিত্রিত করেছেন সুবোধ ঘোষ। তাই দাশুর আবাল্যলালিত সংস্কার বিশ্বাসের সঙ্গে যেন মিশে যায় অরণ্য প্রকৃতি ও মধুকুপি।

'সকালবেলার আলোতে ঝলমল করে মধুকুপির পাঁচ বছর আগের সেই চেহারা। শালবনের সেই সবুজ, কাঁকুরে ডাঙ্গার সেই লাল, বেলে ঢালুর সেই সাদা, পলিমাখা দো-আঁশের সেই ভেজা-ভেজা কালো। বড়কালুর বুকের সেই ঝরনার জলো দাগটাও চিকচিক করে, শুকিয়ে একেবারে খটখটে হয়ে যায় নি। পাথুরে টিলাগুলিও ঠিক সেই পাঁচ বছর আগের মতই ছড়িয়ে গড়িয়ে, বাবলার আর খেজুরের ঝোপঝাপ গায়ে জড়িয়ে, মধুকুপির পুবের আকাশ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। সাবাই ঘাসের জঙ্গলটাও বাতাসে দুলছে।'[৭]

এইরকম নিশ্চিন্ত আরণ্যক জীবনের ওপর নেমে আসে কখনো বহিরাগতদের অর্থনৈতিক নিগ্রহ, কখনো শারীরিক পীড়ন। মহেশ রাখালের কন্যা গর্ভিণী কুসুম জঙ্গলের প্রহরী কর্তৃক ধর্ষিত হয়, আর কালিন্দী ঠিকাদারের ব্যর্থ কামনার তাড়নায় খুন হয়ে যায়। এইভাবেই পীড়নের সীমা মাত্রাতীত হয়ে ওঠে বর্ণহিন্দু প্রভাবিত সামন্তপ্রভুর শোষণে। সেই শোষণে সামিল হয় গোষ্ঠীর জনৈক দুখন সিংহ – যে গোষ্ঠীর অংশ হয়েও গোষ্ঠী-বর্হিমুখী। 'জাতের মানুষ হয়েও জাতের দুঃখ থেকে বেশ একটু দূরে সরে গিয়েছে যে, আর জাতের মানের চেয়ে নিজের মান উঁচু করে দিয়েছে...'[৮] বর্ণহিন্দু সমাজের অন্তর্বাহী প্রভাবের প্রতিনিধি সে। তাই সে দশ বছরের মেয়ের ঘটা করে বিবাহ দিয়েছে। মধুকুপির ইতিহাসে তা অভিনব। বিয়েতে মন্ত্র পড়ে ভুবনপুরের এক চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ। এইভাবে নিঃশব্দে বর্ণ হিন্দু ও মিশনারি সমাজের আগ্রাসনে মধুকুপির বিশ্বাস সংস্কার থেকে অন্তর্হিত হতে থাকে 'কপালবাবা', 'বোঙা', 'বড় পাহাড়ী', 'জাহির বুরু'।

উপুর্যপরি পীড়নের সঙ্গে যুক্ত হয় প্রশাসনিক পীড়ন ও পুঁজিবাদী শিল্প সভ্যতার শোষণ। মধুকুপির প্রান্তিক প্রাকৃতিক পরিবেশে বীভৎস বেমানান দেখায় রায়বাবুর ইঁট খোলার শ্মশান। তার সঙ্গে যুক্ত হয় বড় বড় পোখরিয়া খাদ ও এজরা ব্রাদার্সের আরও তিনটে কলিয়ারী – একটা পিট আর দুটো ইনক্লাইন।

'বুম্ বুম্ বুম্! উত্তর দিকের আকাশটা যেন গম্ভীর আক্রোশের তিনটে শব্দ গড়িয়ে দিয়ে মধুকুপির বাতাস কাঁপিয়ে দিল।... বড়কালুর পশ্চিমে সেই ঘন শালবনের

ভিড়কে প্রকাণ্ড এক-একটা খাবলার জোরে উপড়ে আর সরিয়ে দিয়ে বড় বড় কয়লার খাদ তৈরি হয়ে গিয়েছে।... গাঁইতা শাবল হাতে নিয়ে কাজ করে মালকাটার দল। কয়লার নিরেট চাপের গায়ে বিঁধ দিয়ে বারুদ ঠাসছে সর্দার, জ্বলছে ফিউজ, আর তারপরেই বুম্ করে একটা প্রচণ্ড আওয়াজের বিস্ফোরণ।'[৯]

আসলে বিস্ফোরণ ঘটে গোষ্ঠীর দৃঢ় বাঁধনে। আলগা হয়ে যায় বিশ্বাসের অর্গল। ধর্মীয় আচার সংস্কারে জীবনযাপনের অভিন্নতায় একসময় মুষ্টিবদ্ধ ঐক্যে বাঁধা ছিল যে গোষ্ঠীচেতনা, দুখনবাবুদের মতো গোষ্ঠীবিমুখী শক্তি তাতে ঘূণ ধরিয়ে দেয়। মিশ্ররীতি প্রবর্তন করতে চায় সে –

'-কুঁকড়া খাবে না, কুঁকড়া বলি দিবে না, করমে ঘরের বেটি বহিন বহুড়ি নাচবে না, আর বেটি বহিনের বিয়ার বয়স বারো বছরের বেশিটি হবে না।'[১০]

দুখনবাবুর অভিনব জাতপঞ্চে জাতিয়া, খাদিয়া, কুঁকড়াশী তিন ধরনের নবীকরণ হয়। দাশু তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে এই নব্য ব্যবস্থার। '...কপালবাবা কি নাই? জাহির বুরু কি নাই? সিনবোঙা কি দেখছে না?'[১১]

কিন্তু দাশুর নিজের ঘরের বাঁধনই যে শিথিল হয়ে যায়। দাশুর কিষাণী মুরলী তাকে খ্রিষ্টান হতে বা কলে কাজ করতে প্ররোচিত করে। সিস্টার মাদলিন ভুখা পেটের, রুখা চুলের মুরলীর চোখে স্বপ্নের মোহাঞ্জন এঁকে দেয় – 'হ্যাঁ, সিস্টার দিদি সত্যিই যে অদ্ভুত দয়ার জাদুকরী। মাটিকাটা হালদারকে একেবারে একটি নতুন মানুষ করে সাজিয়ে যেন মুরলীর জীবনের কাছে উপহার পাঠিয়ে দিয়েছে। পলুস হালদারের জীবনটাও পাঁচ বছর ধরে লিখা-পড়া শিখে, খিরিস্তান হয়ে আর কলঘরে চাকরি করে যেন মধুকুপির কিষাণী মুরলীকেই ডাক দিয়ে নতুন ঘরে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে।'[১২]

একক প্রতিরোধ ও গোষ্ঠীমুখী ভাবনার নিরিখে দাশু আপোষহীন মনুষ্যত্বের প্রতীক হিসাবে উপন্যাসের উপসংহার অংশে রয়ে যায়। এবং শেষ পর্যায়ে এসে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত দাশু ডরানিস্রোতে নিজেকে সঁপে দেয়।

উপন্যাসের অন্তিমপর্বে লেখক নির্বাচনী প্রহসন, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ যৌথ মালিকানার প্রসঙ্গ এনে সমবায়ভিত্তিক সমাজজীবনের ইঙ্গিত দিলেও তা কার্যকর করার প্রক্রিয়া, বা কোন কৃষক আন্দোলনের কোনো সম্ভাবনার রেশ রেখে যান না। তাই 'শতকিয়া' উপন্যাসে যে সংকট প্রকট হয়ে দেখা দেয়, তার উত্তরণের পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবুও 'যথার্থই ব্যাপ্তিতে, গভীরতায় এবং শৈল্পিক নৈপুণ্যে এ উপন্যাস সুবোধ ঘোষের অন্যতম শক্তিশালী উপন্যাস। আদিবাসী-তপশিলী কৃষক সমাজকে রূপায়িত করার জন্যে এ উপন্যাসে যে আয়োজন দেখা গেছে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা তুলনাহীন।'[১৩]

তথ্যসূত্র :

১) ঘোষ, সুবোধ, শতকিয়া দ্রঃ, সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র ৩, ঘোষ, উত্তম, নাথ, সমীরকুমার (সম্পাঃ), নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ: ১২২

২) তদেব, পৃ: ১১৮

৩) তদেব, পৃ: ১২৭, ১২৮

৪) তদেব, পৃ: ১৩০

৫) তদেব, পৃ: ২০৮

৬) তদেব, পৃ: ১১৮

৭) তদেব, পৃ: ১৪৩

৮) তদেব, পৃ: ১৮৯

৯) তদেব, পৃ: ১৪৩, ১৪৪

১০) তদেব, পৃ: ১৯১

১১) তদেব, পৃ: ১৯১

১২) তদেব, পৃ: ১৬৩

১৩) চক্রবর্তী, বারিদবরণ, বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের লোকজীবন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ: ৩৯৯

নব ধর্মের অভ্যুদয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

অভিজিত মণ্ডল
স্টেট এডেড কলেজ টিচার
দর্শন বিভাগ, গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ

সংক্ষিপ্তসার : ‘ধর্ম’ নামক ধারণাটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জন্মের পূর্ব থেকে ছিল। তাই ধর্ম আগেও ছিল এখনও আছে পরেও থাকবে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে নব ধর্মের অভ্যুদয় মানে কি ? অতীত কালে এবং বর্তমান কালে ধর্ম বলতে বোঝানো হয় – দেশাচার, লোকাচার, পারিবারিক আচার বিচার, ছোঁয়াছুঁয়ি, খাদ্যাখাদ্য বিচার, জাতি বিচার, সমাজ সংস্কার, বাহ্যিক আড়ম্বর বা কতগুলো প্রাণহীন নিয়মানুষ্ঠান, মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি। আবার ধর্মের মতবাদ নিয়ে তত পার্থক্য বা বিরোধ নয়, যতটা ধর্মের বহিরাবরণ নিয়ে। বিরোধের এই মুলসুত্রটির আবিষ্কারক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এই সকল বিষয়গুলিকে অতিক্রম করে ধর্মের এক নতুন ধারণার উন্মোচন করেছেন, যে ধর্মের কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থান করে রয়েছে মানুষ এবং মানুষের কল্যাণ। এখানে তাঁরা জীবকে শিব জ্ঞানে ভাবেছেন এবং বাস্তব জীবনে তা প্রকাশিত করতে পেরেছেন। ধর্ম ও ঈশ্বরের মানবীকরণ করেছেন। যার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে ধর্মের নতুন রূপ- ‘মানব ঈশ্বরের ধর্ম’। আর এই বিষয়টি এখানে আলোচনার চেষ্টা করেছি।

বিষয় সূচক শব্দ: ধর্ম, ঈশ্বর, জীব সেবা, মানবঈশ্বর, মানবীকরণ।

প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

পৃথিবীতে ‘ধর্ম’ শব্দটিকে ঘিরে যত না শান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, তার চেয়ে বরং হাজার অশান্তির আবহাওয়া তৈরি হয়েছে – একথা অস্বীকার করা যায় না। সেক্ষেত্রে বলা যায় শান্তির গঙ্গা জল প্রবাহের পরিবর্তে অশান্তির আগুন বেশি জ্বলে উঠেছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে ধর্ম কি বিরোধ সৃষ্টি করে? যদি সেটা হয় তাহলে ধর্মে ধর্মে বিরোধের জন্য কি ধর্ম দায়ী ? মানুষ যদি মান এবং হুঁশ সম্পর্কে সতর্ক হয় তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরে বলবেন ধর্ম বিরোধ সৃষ্টি করে না। আর ধর্মের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হয় তার জন্য দায়ী ধর্ম নয়। তাহলে সমস্যাটি কোথায় ঘোট পাকাচ্ছে ? এর উত্তরে বলা যায় এই ঘোটের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে আছে মানুষ। মানুষের ঝগড়া বা বিরোধ ধর্মের জন্য নয়, কাম-কাঞ্চনের জন্য। মানুষের সংকীর্ণ মনোভাব অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়। তাই মানুষ এই বিরোধের হেতু। আমাদের দেশে ধর্মের নামে বুজরুকি, প্রবঞ্চনা কম চলে না। এরজন্য মানুষের মধ্যে অন্ধ ধর্মীয় ভাব সৃষ্টি করে ধর্মীয় ডাঙ্গা, মারামারি, হানাহানি, রক্তাত্ব প্রভৃতি বর্বরতার

ঘটনা ঘটায়। আবার ধর্মকে হাতিয়ার করে আমরা প্রতিনিয়ত ক্ষমতার দম্ভ মানুষকে দেখিয়ে থাকি, যাকে তাকে, যখন তখন মন্দ দু-চার কথা শুনিয়ে দিয়ে মনের মধ্যে আত্মতুষ্টি করে থাকি। অন্যের ভালোতে বুকের মধ্যে ঈর্ষার বা হিংসার আগুন জ্বেলে মরি। আর নিজেকে 'আমি' জ্ঞানের অহংকার করি। এগুলি কিন্তু ধর্মের মূল কথা নয়। ধর্ম কখনো বলে না তুমি অন্যের প্রতি অসুরাপূর্ণ আচারণ কর। কাউকে মই দিয়ে গাছে তুলে দিয়ে সুযোগ বুঝে মইটা সরিয়ে নাও, কিংবা অন্যকে সুখী দেখে বারবার শনি ঠাকুরের কাছে তার অমঙ্গল প্রার্থনা কর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল প্রতিদিন প্রতিনিয়ত এমনই সব ঘটনা দেখা যায়। আর এগুলি রক্ত বীজের মত বাড়ছে তো বাড়ছেই কমার কোনো ছিন্নমাত্র নেই। তাহলে আমরা একথা বলতে পারি, ইদানিংকালে নিশ্চয়ই ধর্মের অপব্যাখ্যা ভূতের মত গ্রাস করেছে আমাদের সুবুদ্ধি ও মানবিক বিবেককে। এর ফলে আমাদের মনের আয়নায় আমাদের নিজের আসল ছবি না দেখিয়ে আমাদের প্রেত আত্মাটিকে দেখাচ্ছে। বিবেকানন্দ তাই বলেছেন যে, "তিনি আমূল সংস্কারক; তিনি মানবের প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করিয়া ক্রমে তাহাকে দেবত্বে লইয়া যাইতে চাহেন। শ্রীরামকৃষ্ণন কহিলেন যে, কাম-কাঞ্চনের দাসত্ব না ছাড়িলে মানবের পরিত্রাণ নাই।"

ভারতবর্ষ অধ্যাত্মবাদী দেশ রূপে পরিচিত। ফলে আমাদের আধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষের মানুষের রান্নার হাঁড়িতে ভালোভাবে প্রবেশ করে আছে ধর্ম। তাই ধর্ম ভারতবর্ষের মানুষের বেঁচে থাকার একটা অন্যতম অবলম্বন। কিন্তু অতীতের দিকে একটু চোখ মেলে তাকালে সমাজের বুকে একটি নিখুঁত প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। যেখানে দিনে রাতে চলছে ধর্ম নিয়ে দলাদলি, হানাহানি। অথচ মজার কথা হল এই যে, ধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞা কি, ধর্মের সত্যতা কি? এসব নিয়ে কারও তেমন মাথা ব্যাথা করে না। ধর্ম কি - এই বিষয়টি মুখে বলে সহজে বোঝানো যায় না, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়। কিন্তু আমাদের হাইটেক দুনিয়ায় প্রবেশ করা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল আমরা ধর্মকে অনুভব করতে চাই না। কেবলমাত্র ধর্মের তত্ত্বগত দিকটি মানুষের কাছে বোঝাতে চাই। অথচ কামারপুকুরের শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব, আর সিমলাপাড়ার বিবেকানন্দ এই জায়গায় কি শুনিয়েছেন সেটি আমাদের জানার প্রয়োজন। দুটি অসাধারণ কথা বা মত আমাদেরকে ধর্ম বিষয়ের সত্যতা উদঘাটন করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। প্রথমত রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে সত্যকে ধরে থাকতে হবে।" দ্বিতীয়ত স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "মানুষ চাই, মানুষ চাই; আর সব হইয়া যাইব।" এই দুই দিব্যদৃষ্টি সম্পূর্ন মহান মানুষের দুই মত এক করলে তা থেকে জন্ম নেয় এমন একটি শক্তি তত্ত্ব যা ধর্ম বিষয়ে আমাদের চিরাচরিত ধ্যান ধারণার একটি নতুনত্বের মাত্রা এনে দেয়। দুই আদর্শ একত্রিত হয়ে জন্ম দেয় সেই মহান আদর্শের, যা তত্ত্বকথা না শুনিয়ে কান পেতে শুনতে শেখায় আমাদের অন্তরের সেই মন্ত্র ধ্বনিটিকে, যে ধ্বনি ইদানিং আমরা সকলে হারাতে বসেছিলাম আমাদের হৃদয়ে স্পন্দন থেকে। আর হারাতে বসেছিলাম আমাদের মানব জীবন চর্চা থেকে। সেক্ষেত্রে আমরা

বলতে পারি, লুপ্ত ধন উদ্ধার করার মতোই তাঁরা আমাদের ক্ষুদ্র আমিকে হঠাৎ দাঁড় করালেন বৃহৎ আমির সামনে, যে আমির সামনে দাঁড়ালে নিজেদের প্রেত শরীর নয়, নিজেদের সুপ্ত দেব শরীর সহস্র সূর্যের দীপ্ত নিয়ে আলোকিত হয়ে ওঠে।

বাংলার সেই অখ্যাত গ্রাম কামারপুকুর আলো করে যিনি এসেছিলেন তার মধ্যে পরম অদ্বয় জ্ঞানের ঝলক লক্ষ্য করা যায়। অদ্বয় জ্ঞান কি ? আমাদের সবচেয়ে বড় বা মহান পরিচিতি আমরা ‘মানুষ’। আর আমরা ঈশ্বরের সন্তান ও স্বয়ং ঈশ্বর। তাই আমার মত তোমার মত আমার পথ, তোমার পথ ভাবার আগে তারা মানুষকে শুনিয়েছেন সেই মহান মূল্যবান বাণী - ওহে ঈশ্বরপুত্র মানব, একবার তাকাও তো নিজের দিকে দেখতো নিজের স্বরূপ রামে রহিমে কোথাও ভেদ পাচ্ছো কি ? যদি পাওয় সেটি বহি রঙ্গের। কিন্তু অন্তরে, হ্যাঁ সে ক্ষেত্রে সব সমান। এর নামই অদ্বয় জ্ঞান। তাহলে মানুষের অন্তরে মৃতদেবত্বের পুনরুদ্ধার গল্পে রামকৃষ্ণদেব আমাদের কি বলেছেন দেখা যাক। ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু। যে অজ্ঞান সেই বলে ঈশ্বর সেথায় সেথায়। যে জ্ঞানী সে জানে ঈশ্বর হেথায় হেথায়। আমি কর্তা এটি অজ্ঞান। আর ঈশ্বর কর্তা আমি অকর্তা এটির নাম জ্ঞান। আমার মতই ঠিক, আর সব বেঠিক এর নাম মতুয়া বুদ্ধি। রামকৃষ্ণদেব বৈদিক ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম, পুরাণ তন্ত্রোক্ত ধর্ম সবই সাধনা করেছেন। এছাড়া মুসলমান ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম সাধনা করেছেন। শিখদের সাথে আলাপ আলোচনা করেছেন। ব্রাহ্মাণদের সাথে মিলেমিশে ও বৌদ্ধদের মত শুনে তিনি এক মহান সত্যে পৌঁয়েছেন- ‘যত মত তত পথ’। সত্য কথাই কলির তপস্যা। একমাত্র শ্রদ্ধায় ভগবান লাভ করা যায়। হিন্দু সাধনার যা যা ধারা আবার মুসলমান খ্রিষ্টান এ যাবত মুনি মহর্ষি মানুষকে যে মধুর কথাগুলি শুনিয়ে এসেছেন, সেই মধুর কথাগুলিকে তিনি আরও অমৃত করে শুনিয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন আমার মতই ঠিক আর অন্যের মত বেঠিক এটা অন্ধের হাতি দর্শন। সত্য লাভ করার কেবলমাত্র একটি পন্থা নেই, হাজার পন্থা আছে। তাই নিজের মতের উপর নিষ্ঠার সাথে সাথে অন্যের মতকে সমান শ্রদ্ধা করতে হবে। আর মনের গভীরে ডুব দিয়ে তুলে আনতে হবে অরূপ রতন। যার ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল সত্যটি সহস্র সূর্যের আলো নিয়ে মানুষের ভিতরে প্রকাশিত হবে। গীতার সেই অপূর্ব বাণী, “মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চি দস্তি ধনঞ্জয়/ মায় সর্ব বিদং প্রোতাং সূত্রে মণিগন ইব।” - হে ধনঞ্জয় এ ব্রহ্মাণ্ডে আমার থেকে ভিন্ন কিছু মাত্র নেই, সম্পূর্ণ জগৎ সূত্রে মনি সমূহের মত আমাতেই গ্রথিত আছে। কাজেই যে পথেই মানুষ স্বরণ করুক না কেন সে তো সেই তার কাছেই যাওয়া হল। যার মূল কথা হল যত ‘মত তত পথ’। তারমানে ধর্ম লাভের পথ একটি নয়। অনন্ত মতের মত অনন্ত তার পথ। যার যে পথে রুচি, সে সেই পথ অবলম্বন করে এগোলেই তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। অর্থাৎ আমরা নিজেদের মতো করে পথ নির্বাচন করতে পারব। তবে নিজের মতো পথ নির্বাচন করার মানে এই নয় আমরা অসৎ পথ নির্বাচন করতে পারি। এটা ভাবা মানে রামকৃষ্ণদেবের সাদা মনে কাদা দেওয়া। আবার অপরের মতের

প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, তবেই সকল বিরোধের সমাধান হবে এবং অদ্বয় ভাব সৃষ্টি হবে।

এবার আসা যাক সিমলা পাড়ার নরেন তথা স্বামী বিবেকানন্দের কথাতে, সমস্ত বিশ্বকে যিনি প্রবল ভাবে আলোড়িত করে দিয়ে মানুষের অন্তরে আটকে থাকা বিষ ফলগুলো এক এক করে মাটিতে নামিয়ে দিয়েছেন সন্ন্যাসীর দীপ্ততে। তাঁর মত হল মানুষ চাই, আর সব হয়ে যাবে। এসো মানুষ হও। মনে কোরো না তোমরা দুর্বল, সব শক্তি তোমাদের ভিতর রয়েছে। উঠে দাঁড়াও এবং ভেতরের সুপ্ত দেবত্বকে প্রকাশ করো। পরোপকারী ধর্ম, পরপীড়ন পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও কাপুরুষতা পাপ। টাকায় কিছু হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালোবাসায় সব হয়। চরিত্রই বাধাবিঘ্নের ভদ্র দৃঢ় প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিতে পারে। তারমানে লক্ষণ বদলে গেছে মনুষ্যত্বের, দেবত্বের, ধর্মের। অন্তরের বক রাক্ষস অশান্তির মগ ডালটি মট করে ভেঙে দিয়ে পাড়ি দিয়েছে চৈতন্য লোকের লক্ষ্যে।

বিবেকানন্দ কারো চোখে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, কারো চোখে নবযুগের বুদ্ধ ও শঙ্কর, কারো চোখে সমাজ বিপ্লবী, কারো চোখে যুবশক্তির মূর্তবিগ্রহ। বিভিন্ন মানুষের চোখের এই নানা দৃষ্টিভঙ্গির কোনোটি একেবারে ভ্রান্ত নয়। কারণ তাঁকে যে যে দৃষ্টিতেই দেখবেন সেই ভাবেই ফল অর্জন করবেন। যাইহোক বিবেকানন্দের যথার্থ পরিচয় তিনি মানব প্রেমিক। তার কারণ হল তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ সাধন করা। সব মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং মানুষের কল্যাণ সাধনই হল তাঁর ঈশ্বর সাধনার লক্ষ্য। আর বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মানব কল্যাণ মানে কেবল পার্থীব জীবনের কল্যাণ নয়, এর সাথে সাথে অন্তর জীবন তথা আর্থিক জীবনেরও কল্যাণ সাধন করা। যার জন্য তিনি ধর্ম বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে বলেছেন, যে ধর্ম সাধনার সাথে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানব কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, সে ধর্ম নয়, অধর্ম এবং তা পাপ। মানুষ যখন অশিক্ষা অজ্ঞতার ভয়াবহ অন্ধকারে ডুবে থাকে ক্ষুধার্তের জ্বালায় ছটফট করে, রোগ যন্ত্রণার ব্যাধিতে আর্তনাদ করে, শোষণে অস্থির অবস্থা তখন ব্যক্তিগত মোক্ষ বা মুক্তির কামনা করা কেবল স্বার্থপরতা নয়, পাপাচারও বটে। তাহলে আমরা বলতে পারি, ধর্ম কেবলমাত্র জগত বিমুখ নেতিবাচক বিষয় নয়। ধর্ম সকলের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করে। সেবা এবং সকলের প্রতি প্রেম প্রকাশ করে। তাঁদের অন্তর নিহিত শক্তির প্রকাশে সাহায্য করে তাকে কার্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সমগ্র বিশ্বে নবীন আধ্যাত্মিক চেতনা জাগায় এবং নতুন সংস্কৃতি প্রতিষ্টার আশা পোষণ করে। সুতরাং ধর্ম সমাজ ও সংগঠনমুখী। বিবেকানন্দের মত হল ধর্ম ক্ষুধার্তের মুখে রুটি তুলে দিতে পারে। দুঃখীর মুখে হাসি ফোটাতে পারে। মুখরের কণ্ঠে বেদান্তের ধ্বনি উচ্চারণের সামর্থ রাখে।

আবার এখানে একটু রামকৃষ্ণদেবের কথা বলা যাক - খালি পেটে ধর্ম হয় না। রামকৃষ্ণদেবের শ্রেষ্ঠ উত্তর সাধক বিবেকানন্দ বারে বারে এই কথাই ব্যক্ত করেছেন-

জীবে দয়া নয় শিব জ্ঞানে জীব সেবাই হল একমাত্র ধর্ম। তাই তাঁর মতে মন্দিরের পাষান মূর্তি বা বিগ্রের মধ্যে ভগবান বা ঈশ্বর নেই। ঈশ্বর আছে মানুষের মধ্যে। ঈশ্বরকে পেতে গেলে মানুষকে সেবা করতে হবে। নরের মধ্যে নারায়ণ অধিষ্ঠান করে আছে। সেই কারণে দরিদ্র নারায়ণের সেবা করতে হবে। অন্নহীনকে অন্ন দিতে হবে, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিতে হবে। এখানে সেবার ভিত্তি হল অদ্বৈতবাদ সেটি প্রকাশিত হয়। আর যে নৈতিকতত্ত্ব এখানে প্রকাশিত হয় সেটি হল সর্ব জীবে সেবা। এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি, মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ ও মানবপ্রেমী বিবেকানন্দের মধ্যে একই ধর্ম চেতনার প্রতিফলন হয়েছে - 'মানবধর্ম'। রবীন্দ্রনাথের ধুলো মন্দির, দীনদান, দেবতার বিদায় প্রভৃতি কবিতা ও গানের মধ্যে মানব প্রেমের এইসব বাণী বেজে উঠেছে। যাইহোক বিবেকানন্দের ধর্ম সম্পর্কিত সর্বজন পরিচিত প্রবাদপ্রতিম ভাষা হল "বহুরূপে সম্মুখে তোমায় ছাড়ি কোথা খুঁজেছি ঈশ্বর/ জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" তারমানে গণদেবতার সেবা করা মানবতাবাদী বিবেকানন্দের কাছে একমাত্র ধর্ম এটাই প্রমাণিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সমাজের ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার আর্তনাদ বিবেকানন্দের ধ্যানের আসন টলিয়ে দিয়েছে। আবার মানুষের দরিদ্রের অন্ন বস্ত্রের সমস্যা তাকে ভীষণভাবে বিচলিত করেছে। তিনি শুনেছেন লক্ষ লক্ষ মায়ের কোলে অন্নহীন মানুষের কান্না, যারা প্রকৃতপক্ষে ভগবান। দরিদ্রের এই কান্না তাঁর অন্তরকে কাঁদিয়েছে। তাকে বলতে দেখা গিয়েছে মানুষের অন্তরস্থে উপস্থিত দেবতা আমার একমাত্র উপাস্য। যদি সেই দেবতার পূজা করতে না পারি কোনো মন্দিরেই তাকে লাগবে না। তারমানে তিনি কবি চণ্ডী দাসের মতোই বলতে চেয়েছেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। তাই বিবেকানন্দের অন্তর অভিধানে ঈশ্বর সেবা এবং মানব সেবা এক ও অভিন্ন। তাই তিনি বলেছেন "মানবরুপী ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে অন্য কোন ঈশ্বরের পূজা করার কোন অর্থ হয় না।" তারমানে নরনারায়ণের সেবার মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ ভগবান বা ঈশ্বরকে লাভ করার পথ দেখিয়েছেন।

বিবেকানন্দের চেতনায় ঈশ্বর ও ধর্মের দুঃসাহসিক মানবীকরণ বিশ্বের ধর্মের ইতিহাসে এক অন্যতম বিরল দৃশ্য। তিনি বনের বেদান্তকে মানুষের ঘরে এনেছেন। তাঁর বেদান্ত প্রয়োগিক বেদান্ত নামে পরিচিত। মানুষের অনির্বাচনীয় দুঃখ দুর্দশা আর্তনাদ কখনো কখনো তাঁকে করে তুলেছে ঈশ্বর দ্রোহী। তিনি বলেছেন, যে ঈশ্বর আমাকে দু'মুঠো অন্ন দিতে পারে না তিনি আমাকে স্বর্গ দেখাবেন এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের কথা বলা যায়, চোখ বুঝলেই ভগবান আছেন আর চোখ খুললেই কি তিনি নেই। তিনি আরো বলেছেন প্রতিমা ঈশ্বরের পূজা হয়। আর জীবন্ত মানুষে কি হয় না? আমরা কাঠ ও মাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরি করে পুজা করতে পারি, তাহলে মানুষের হৃদয়ে যে ভগবান বা ঈশ্বর আছে প্রতিটি প্রাণীর হৃদয়ে যে ঈশ্বর আছে, সেই ঈশ্বরকেও তো আমরা পুজা করতে পারি! কথাটির মানে হল আমরা এই সংসারে যখন আছি, তখন এই সংসারের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তো রাখতেই

হবে। জগতের সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক আছে। তাই জগতকে আমাদের দূর ছাই করা সাজে না। আর বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণদেবের মহত্ত্ব উত্তরাধিকার। তাই সনাতন পন্থায় ধর্ম প্রচারের পথ ত্যাগ করে তিনি দরিদ্রের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। জগতের বাস্তবতা উপলব্ধি করেছেন। তাঁর মতে উপসী মানুষকে ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার মানে তাকে নির্মম পরিহাস করা। যার জন্য তিনি বলতে পেরেছেন "ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র শেখানো তাহাকে অপমান করা।"

বিবেকানন্দের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান হয়ে আছে মানুষ এবং মানুষের জীবনের সুখ শান্তি ও কল্যাণ। কারণ মানুষকে তিনি মহৎ থেকে মহতর করতে চেয়েছেন। আর মানুষ মহৎ হতে পারে ক্ষমা প্রেম উদারতা সহিষ্ণুতার পথ ধরে। তাই বলবান তার বল প্রয়োগ করুক সমাজ গঠনের পথে। সমাজ সংস্কারক তার কর্ম প্রেরণা নিয়োজিত করুক বৈষম্য দূরীকরণ ও সাম্য প্রতিষ্ঠার কাজে। এক কথায় বলা যায় অন্ধ জনের দেহ আলো মৃত জনের প্রাণ। আর এটাই হলে তবেই গঠিত হবে সুন্দর আনন্দময় ও কল্যাণময় সমাজ জীবন। বিবেকানন্দের ধর্ম চেতনায় এটাই হল মূল কথা। তিনি এভাবেই ঈশ্বর ও মানুষ আধ্যাত্মিকতা ও মানবিকতার সেতুবন্ধন করেছেন। হিন্দুধর্ম, বুদ্ধদেব, যীশু, হজরত, শ্রীচৈতন্য মহামানবগন যে মূল মন্ত্রের বাণী প্রচার করেছেন তারও মূল কথা হল মানবপ্রেম। আর শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বিবেকানন্দও সেই একই পথের পথিক। তাঁর মতে কারও ধর্ম কারও ধর্মের চেয়ে ছোট নয়। আর ছোট বড় বিচার করা ধর্মের লক্ষ্য নয়। ধর্মের লক্ষ্য সমাজের মঙ্গল সাধন করা। ধর্ম মানুষকে সত্য মুখী করে, সমৃদ্ধ করে, দেবত্বের বিকাশ ঘটায়। তবে তাঁর কণ্ঠে ঈশ্বর একটু ভিন্ন ভাবে বেজেছে। মানুষ তাঁর কাছে কেবল ঈশ্বর নয় স্বয়ং ঈশ্বর। মানুষের পূর্ণতার স্বার্থ সাধনাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু জীবনকে কখনো অস্বীকার করেনি। মানুষ প্রকৃতপক্ষে নারায়ণ এই সত্য তিনি বিস্মিত হয়নি, এটিই তাঁর ধর্মতত্ত্ব বা ধর্ম দর্শনের মূল কথা।

সবশেষে আমরা বলতে পারি, রামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দের মতে ধর্ম মানে নিজের ঈশ্বর চেতনার নিকাশ। তাই তাঁদের জীবন বেদে ধর্ম অংকের যে সমীকরণ গড়ে উঠেছে তাতে তাঁরা সিদ্ধান্ত হিসাবে পেয়েছেন ধর্ম মানে মানবসেবা, আর ঈশ্বর মানে মানুষ। কারণ ধর্মের ধারণা ঈশ্বরের চেতনার সঙ্গে সমবায় সম্পর্কে জড়িত। আবার ঈশ্বরতত্ত্ব এমন একটি তত্ত্ব যা মানুষ বিনা ধারণা করা যায় না। এই সমীকরণ সভ্যতার এক নতুন পথের দিশা দিতে পারে। ধর্ম নিয়ে হিংসা, লোভ, বঞ্চনা, হতাশা প্রতারণার যে ঘ্রন্য প্রবাহ আজ গোটা বিশ্বের মানব সভ্যতাকে দীর্ণ করে চলেছে তার সুন্দর সমাধান হতে পারে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম সমীকরণে। সুতরাং তাঁরা মানুষকে ভূল পথ থেকে সরিয়ে এনে সঠিক পথে নতুন ধর্মের দিশা দেখিয়েছেন। অর্থাৎ নূতন ধর্মের অভ্যুদয় করেছেন – 'মানব ঈশ্বরের ধর্ম'। তাই ধর্মের এই নতুন

দিশার মর্মবোধ যেদিন পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ অনুভব করতে পারবে, সেদিন এই পৃথিবী দেবভূমিতে পরিণত হবে।

সহায়ক গ্রন্থ

১. গম্ভীরানন্দ, স্বামী। *নবযুগধর্ম।* কোলকাতাঃ উদ্বোধন, ১৯৯৮।

২. ভদ্র, কালিদাস (সম্পাদনা)। *জানা অজানা বিবেকানন্দ।* কোলকাতাঃ হলি চাইল্ড, ১৪২৪।

৩. বিবেকানন্দ, স্বামী। *বানী ও রচনাঃ খণ্ড-৬।* কোলকাতাঃ উদ্বোধন, ২০১৩।

৪. বিবেকানন্দ, স্বামী। *বানী-সঞ্চয়ন।* কোলকাতাঃ উদ্বোধন, ১৯৯৬।

৫. নন্দী, শ্রী কুমার। *শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথাসার।* কোলকাতাঃ উদ্বোধন, ২০১৬।

৬. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী। *তব কথামৃত।* কোলকাতাঃ আনন্দ, ১৪২১।

৭. পূর্ণাত্মানন্দ, স্বামী। *যুগদিশারী বিবেকানন্দ।* কোলকাতাঃ উদ্বোধন, ২০১৫।

নিম্নবর্গের নারীর পেশাগত ভিন্নতার রূপান্তর : পশ্চিমবঙ্গের আলোকে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

অসীম বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম

সারসংক্ষেপ:- একদা ফ্যাসিস্ট হিটলার মন্তব্য করেছিলেন– 'নারীদের জন্য তিনটিই কাজ আছে- (১) সন্তান উৎপাদন ও পালন, (২) রান্নাঘরের কাজ এবং (৩) চার্চে প্রার্থনা করা (kinder, kirche, kueche)'। তাই তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নারীদের সম্পর্কে শ্লোগান রচনা করেছিলেন, 'রান্নাঘরে ফিরে যাও' (Go back to kitchen)। আর তখনই সারা বিশ্ব জুড়ে কোটি কোটি নারী হিটলারকে উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন। প্রবল ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তারপর কালের নিয়মে হিটলার সহ ফ্যাসিস্ট শক্তির পতন ঘটেছিল। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, সেদিন এবং আজকের দিনেও নারীর স্বাধীনতা ও পেশাগত ক্ষেত্রে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আজও পেশাগত ক্ষেত্রে নারী সঠিক মর্যাদা পায়নি। তবুও আশার কথা— দেরিতে হলেও আজ কিন্তু সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ এবং শ্রমিক ইতিহাস চর্চাকারীরা এই সত্যিটা মেনে নিয়েছেন এবং তদনুসারে তাঁরা চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন। শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কেন আমাদের এই বাংলা তথা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও একই কথা বিবেচ্য। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে এই অবস্থা ছিল আরো খারাপ। স্বাধীনতার পরেও একই ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। শ্রমভিত্তিক শিল্পক্ষেত্রে তাই দেখা যায় পুরুষের পাশাপাশি শিশু ও নারীদেরকেও শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। বাংলা তথা ভারতীয় নারীরা এবং শিশুরা শ্রমিক হিসেবে বিভিন্ন কলকারখানা নিযুক্ত হলেও পুরুষদের তুলনায় তাদের অনেক কম মজুরি দেওয়া হতো। মালিকশ্রেণীর সর্বদা চেষ্টা ছিল নারী এবং শিশুদেরকে কম পারিশ্রমিক দেওয়া এবং তা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও তার তেমন কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে তারই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে নিম্নবর্গের নারীর পেশাগত ভিন্নতা এবং শ্রমজীবী সম্প্রদায় হিসাবে তাদের রূপান্তরের ও আধুনিক শ্রমজীবনের উদ্ভাবনের দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচকশব্দ: নিম্নবর্গ, শ্রমিক, শ্রমজীবী, ফ্যাক্টরি, ঔপনিবেশিক, শিল্পাঞ্চল, নারীশ্রমিক, শিশুশ্রমিক, আদমসুমারি, বৃত্তি বা পেশা।

মূল আলোচনা

উনিশ শতকের অন্তিম লগ্নে কলকাতার চটকল ও বম্বে এবং আমেদাবাদের সুতোকলগুলিতে প্রচুর সংখ্যক সর্বহারা শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষ নিযুক্ত ছিলেন। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও বিশ্রী পরিবেশে তারা বসবাস করতেন। তাদের বসতির পরিবেশ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। দিনে ১৫-১৮ ঘন্টা তাদের কাজ করতে হত। ১৮৮১ ও ১৮৯১ সালের ফ্যাক্টরি আইনে শ্রম শিল্পে নারী ও শিশু শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। ভারতীয় শ্রমিকদের দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের লোকহিতৈষী প্রয়াস শুরু হয় ১৮৭০-এর দশকে। বাংলায় অন্যতম শ্রমিক দরদী শশীপদ ব্যানার্জী নামে এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্কারক ১৮৭০ সালে বাঙালি চটকল শ্রমিকদের নিয়ে বরানগরে 'শ্রমজীবী সংঘ' নামে একটি সংগঠন স্থাপন করেন।[১] এই সংগঠনের প্রধান কর্মসূচির মধ্যে ছিল শ্রমিকদের নিয়ে নৈশ বিদ্যালয় চালানো, মজলিস, সুরাপান নিবারণী সভা ইত্যাদি পরিচালনা করা। এ সমস্তই ছিল শ্রমিকদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, মদ্যপান বন্ধ ও আত্মনির্ভরশীলতা বিষয়ে শ্রমিকদের সচেতন করার প্রয়াস। শ্রমিকদের শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে শশীপদ ব্যানার্জী 'ভারত শ্রমজীবী' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। বরানগরের 'বোর্নিও জুট কোম্পানি'র ম্যানেজার আলেকজান্ডার এ বিষয়ে নানাভাবে শশীবাবুকে সাহায্য করেছিলেন। একই ধরনের মানবহিতৈষী প্রয়াস পশ্চিম ভারতেও লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭৮ সালে সোরাবজি শাপুরজি শ্রমিকদের কাজের সময় হ্রাস করার জন্য বম্বে আইন সভায় একটি বিল আনতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি অবশ্য সফল হননি। এরপর বম্বেতে নারায়ণ মেধাজি লোখান্ডে শ্রমিকদের সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ১৮৮০ সালে 'দীনবন্ধু' নামে একটি ইঙ্গ-মারাঠী দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।[২] একই রকম মানবহিতৈষী কাজকর্মের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় একদা ডিরোজিয়ান দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির মতো বুদ্ধিজীবীর মধ্যে। তিনি চা বাগানের দাস শ্রমিকদের উন্নতিকল্পে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন করেছিলেন ১৮৮০-র দশকে। এই শতকেই শিল্পক্ষেত্রে প্রচুর নারী-পুরুষসহ শিশু শ্রমিকও নিযুক্ত হয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের একটি মোটামুটি পরিসংখ্যান থেকে জানা করা যায়— ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ৪১৫ টি ফ্যাক্টরিতে দৈনিক শ্রমিক ছিল ৩,৪৯,৮১০ জন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ১৫৩৭ টি ফ্যাক্টরিতে দৈনিক শ্রমিক ছিল ৩,৪১,৬৩৪ জন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ৩৪৩৬ টি ফ্যাক্টরিতে দৈনিক শ্রমিক ছিল ১১,২২,৯১২ জন।[৩]

উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত পাট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ছিল-

খ্রিস্টাব্দ	শ্রমিক সংখ্যা
১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ	৭৮,১১৪ জন
১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ	১,১৮,৯০৪ জন
১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ	১,৫৪,৯৬২ জন

অপরদিকে কয়লা ও চা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ছিল-

শিল্প	খ্রিস্টাব্দ	শ্রমিক সংখ্যা
কয়লা	১৮৯৪	৩০,৭৭৩ জন
কয়লা	১৯০৪	৭৫,০৪৯ জন
চা	১৮৯০	৪,০৬,০৮৯ জন
চা	১৯০০	৬৬,৪৮,৯৭১ জন

ওপরের পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে, বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কিভাবে দিন দিন ক্রমশঃ দ্রুত গতিতে বাড়ছিল।[৪]

উনিশ শতকের শেষভাগে শ্রমিকদের বিভিন্ন শিল্পে দৈনিক ১৫ থেকে ১৬ ঘন্টা কাজ করতে হত। কখনও কখনও ১৮ ঘন্টা কাজ করতে হত। ফ্যাক্টরিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ আরম্ভ হলে আলোর ব্যবস্থা থাকায় শ্রমিকদের কাজের সময় আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। শিশু শ্রমিকদেরও দীর্ঘ সময় কাজ করতে বাধ্য করা হত। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে 'Labour Commission-এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বিদ্যুতায়িত কারখানায় দিনে গড়ে কাজের সময় ছিল ১৪ ঘণ্টা। বোম্বাই-এ ১২ ঘন্টা থেকে ১৫ ঘন্টা। তুলা থেকে তুলা বীজ বহিষ্কারের কারখানায় বছরে ৫ মাস সকাল ৫টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত কাজ চলত। এখানে শ্রমিকরা ছিল প্রায় সকলেই স্ত্রীলোক। ১৯০৮-এর লেবার কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে, কারখানাগুলিতে ৩০ থেকে ৪০ ভাগ ছিল শিশু শ্রমিক। ১৮৮১ ও ১৮৯১ -এর আইনে কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ করে যে আইনগুলি পাশ হয়েছিল, মালিকরা সেগুলিকে আমল দিত না।[৫]

ভারতের আধুনিক শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষনের মধ্য দিয়ে। তাই ভারতের শ্রমিক শ্রেণী যে শোষণ ও অসহনীয় অবস্থার শিকার হয়েছিল তা ইংল্যান্ডের শ্রমিকদের শোষণের চেয়ে অনেক বেশি তীব্র ও ভয়াবহ

ছিল। এই সময় ভারতীয় শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল। যে জায়গায় তারা কাজ করত সেখানে বাইরের আলো-বাতাস ঢুকতে পারত না। পরিবেশ একেবারে বিষাক্ত ছিল। কলকারখানায় যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার সময় প্রায়ই শ্রমিকেরা দুর্ঘটনার শিকার হত; এমনকি প্রাণ পর্যন্ত হারাত। এর মধ্যে অধিকাংশই ছিল নারী ও শিশু শ্রমিক।[৬] শ্রমিকদের কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল না। নিয়ম লঙ্ঘন করে তাদের একটানা দিনে ১৫-১৬ ঘন্টা কাজ কারনো হত, এর হাত থেকে নারী ও শিশু শ্রমিকরা পর্যন্ত রেহাই পেত না। রাতেও মহিলাদের দিয়ে কাজ করানো হত। নারী ও শিশু শ্রমিকদের পুরুষদের সমান কাজ করিয়ে নামমাত্র মজুরি দেওয়া হত। বাড়তি কাজের জন্য কোনো মজুরি দেওয়া হত না। শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। তাদের মজুরির হার অত্যন্ত নিম্নস্তরের ছিল। গোটা ঔপনিবেশিক যুগ ধরেই শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে সংকট থেকে গিয়েছিল। D.H. Buchanan তাঁর 'The Development of Capitalistic Enterprise in India' নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ১৮৬০-৯০ সাল পর্যন্ত শ্রমিকদের বেতনের কোনরকম বৃদ্ধি ঘটেনি। এর ফলে এই অল্প মজুরিতে শ্রমিকরা দু-বেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারত না।[৭]

ভারতের অধিকাংশ শিল্পাঞ্চলেই শ্রমিকদের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ ঋণে জর্জরিত ছিল। অস্বাভাবিক নিম্ন মজুরি ও ভয়াবহ আর্থিক অবস্থার কারণে শ্রমিকদের জীবনযাপন অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ছিল আকাশ ছোঁয়া। বর্তমানে একুশ শতকেও সে অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয় নি। শ্রমিকদের বাসস্থানগুলি ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, ঘিঞ্জি এবং নোংরা। যে বস্তিতে তারা থাকত তা সবদিক থেকে বসবাসের অযোগ্য ছিল।[৮] শ্রমিকদের এই নরকবাস তাদের স্বাস্থ্যের চরম ক্ষতি করেছিল এবং তারা নানা মারাত্মক ব্যাধির কবলে পড়েছিল। পানীয় জলের কোনো রকম ব্যবস্থা না থাকায় আশেপাশের পুকুরের দুষিত জল পান করে অসংখ্য শ্রমিক কলেরা, টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে মারা যেত। বহু শ্রমিক উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় খাদ্য না পেয়ে অপুষ্টি জনিত রোগে ভুগত। আর্থিক জীবনের ন্যায় ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক জীবন সুখের ছিল না। বুর্জোয়া সমাজ তাদের ঘৃণার চোখে দেখত। তারা ছিল সমাজের প্রান্তিক শ্রেণী।[৯] তাদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা ছিল না; আমোদ-প্রমোদের কোনো সুযোগ-সুবিধা ছিল না। সামাজিক দিক দিয়ে তারা ছিল অসহায়। স্বাস্থ্য, বীমা, চিকিৎসা ইত্যাদির কোনো সুযোগই তারা পায়নি। দাসত্ব, আধা দাসত্ব এবং বঞ্চনার শিকার হয়েছিল তারা। ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণী এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য মালিকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনে যেতে বাধ্য হয়েছিল। নারী ও শিশু শ্রমিকদের অবস্থা ছিল আরও সংকটজনক। পুরুষের সমপরিমাণ কাজ করেও সমমর্যাদা ও সম-পারিশ্রমিক তারা

আজও পায় না। সংগঠিত শ্রমক্ষেত্রে পেলেও অসংগঠিত ক্ষেত্রে তারা চিরদিনই বঞ্চিত থেকেছে।

নারী এবং শ্রমের আন্তঃসম্পর্ক সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইদানিংকালে একটি চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিও এখনো এই চর্চার গণ্ডী অনেকটাই ধোঁয়াটে। এর প্রাথমিক কারণ হল পিতৃতান্ত্রিক সমাজে লিঙ্গ ভিত্তিক শ্রমবিভাজনের বৈষম্যের কারণে মেয়েদের শ্রম প্রক্রিয়ায় অংশিদারীত্ব অনেকটাই ঢাকা পড়ে যায়। এমনকি জনগণনার আধুনিক প্রকরণেও এই বৈষম্য সম্পূর্ণ দুর হয়নি। অর্থনৈতিক তথ্য ও পরিসংখ্যানে যে মেয়েদের শ্রমিক হিসাবে গন্য করা হয়নি তার একটা বড় কারণ হল শ্রমিকদের শ্রম সম্পর্কে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা থাকলেও লিঙ্গ ভিত্তিক শ্রমবিভাজনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় মেয়েদের এই বাছবিচারের সুযোগটাই থাকে না।[১০] অধিকাংশ সমাজেই ঘরের কাজের প্রাথমিক দায়িত্ব- রান্না করা, ঘরদোর পরিস্কার করা, বাচ্চা তথা অসুস্থদের দেখাশোনা বা পরিবারের বৃদ্ধের সেবা করা ইত্যাদি মেয়েরাই পালন করে থাকেন। মেয়েদের এই কাজগুলোকে ছেলেদের কাজের চাইতে ছোট করে দেখা হয়। তাই মেয়েদের কাজের ধরনগুলির পেশাদারী স্বীকৃতি কম হয় বা এই কারণে মেয়েরা ছেলেদের থেকে কম মাইনে পায়।

কোনো একটি অঞ্চলে জনসংখ্যার মধ্যে শ্রমপ্রক্রিয়ায় অংশিদারীত্বের হার (Work Participation rates) বিভিন্ন পেশায় কে কতটা অংশগ্রহণ করল এগুলি সবই আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে।[১১] এই বিষয়ে ইদানিং বহু চর্চা হলেও এর খামতি হল— সাধারনতঃ এগুলি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কিছু কথা বললেও অঞ্চল ভিত্তিক বিশেষত্বগুলি অনেক ক্ষেত্রেই দৃষ্টিগোচর হয় না। নারীশ্রমের আঞ্চলিক চর্চার গুরুত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না কারণ জেন্ডারিং (Gendering, লিঙ্গ নির্মাণ) একটি সামাজিক প্রক্রিয়া বা অঞ্চল ও সময়ভেদে আলাদা।[১২]

ঔপনিবেশিক আমলেই ভারতে আধুনিক শিল্পের বিস্তার ঘটেছে। আধুনিক শিল্প আবার গ্রামীণ হস্তশিল্পের অবশিল্পায়ন, গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে ভাঙন ইত্যাদির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ওই সমস্ত কুটির শিল্পের অবক্ষয় হওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে ধাক্কা এল সেগুলি গরিব পরিবারগুলির সদস্য হিসাবে মহিলাদেরকেও ভুগতে হল। তথাপি কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন চা, পাট বা কয়লা উত্তোলনের মতো শিল্পে, কিছুটা হলেও মহিলারা কাজ পেলেন। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল যে মহিলাদেরকে এই সমস্ত কাজ থেকেও সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কারখানা এবং অনেক বস্তিতে অকল্পনীয় রকমের অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি, নিরাপত্তার অভাব নারীদেরকে শ্রমপ্রক্রিয়ায় ব্রাত্য করে তুলল। অন্যদিকে আধুনিক শিল্প যেমন- চালকলগুলি কিছু মেয়েলি কাজ যেমন ঢেঁকিতে ধান ভাঙ্গার কাজ মেয়েদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে লাগলো। কয়লা শিল্পে কয়লা খনিগুলির অভ্যন্তরে নারীদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ হল।[১৩] এরকম অবস্থায়

যখন অন্যান্য পেশায় মেয়েরা পিছু হটছে সেই সময় জনগণনার নিরিখে বাড়িতে কাজের লোক হিসাবে মেয়েদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক পরিবারের নারী সমাজের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষক পরিবারের মেয়েদের কাজের পরিধি:

পশ্চিমবঙ্গে কৃষক পরিবারের মেয়েদের নানা ধরনের ভিন্নমুখী কাজ করতে হয়। প্রাক-স্বাধীনতা পর্ব থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা একইভাবে লক্ষ্য করা যায়।[১৪]

কৃষি সংক্রান্ত কাজ:

ফসল উৎপাদন (ধান)	অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ	পশুপালন
১) বীজ বোনা	১) খড় কাটা	১) হাঁস পালন
২) ধান রোয়া	২) পশু খাদ্য সংগ্রহ বা ঘাস কাটা	২) মুরগি পালন
৩) আগাছা তোলা	৩) বাড়ির লাগোয়া বাগান দেখাশোনা	৩) ছাগল পালন
৪) ধান কাটা	৪) চিঁড়ে, মুড়ি, গুড় তৈরি করা ও খাদ্য সংরক্ষণ করা	৪) গরু-বাছুর পালন
৫) ধান ঝাড়া	৫) মাছ ধরার জাল মেরামত করা ইত্যাদি	৫) মহিষ পালন
৬) ধান পরিষ্কার করা		৬) মাছ চাষ
৭) ধান শুকানো		৭) সবজি চাষ ইত্যাদি
৮) ধান সেদ্ধ করা		
৯) ধান ভাঙ্গা		
১০) ধান, চাল গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি।		

কৃষি বহির্ভূত কাজ:

গৃহস্থালির কাজ	গৃহের বাইরে অন্যান্য কাজ
১) রান্নাবান্না	১) বাঁশের ও বেতের কাজ
২) শিশু পালন	২) তাঁত বোনা
৩) বয়স্ক ও অসুস্থদের দেখাশোনা	৩) গৃহে তৈরি বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করা ইত্যাদি।
৪) ঘরদোর পরিষ্কার করা	
৫) জ্বালানি সংগ্রহ করা	
৬) পানীয় জল সংগ্রহ করা	
৭) ঘুঁটে দেওয়া	
৮) বাড়িঘর যত্ন করে ঠিক করে রাখা ইত্যাদি।	

অপরদিকে সে সময়ে বড়ো বড়ো শহরগুলিতে ইংরেজ শাসনাধীনে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের ফলে নতুন নতুন আধুনিক পেশায় মহিলাদের যোগদানের সুযোগ তৈরি হয়। গ্রাম ছেড়ে তাই কাজ না থাকা মহিলারা দলে দলে শহরগুলিতে এলেন নতুন কাজ পাওয়ার জন্য।[১৫] ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে আদমসুমারির পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, সে সময়কার ভারতে ৩৯ মিলিয়ন মহিলা বিভিন্ন ধরনের আধুনিক পেশার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। এর মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিতা মহিলারা চিকিৎসা, শিক্ষা, আইন এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভাগগুলির সাথে যুক্ত ছিলেন। যার মধ্যে ৬ হাজার মহিলা আইন পেশায়, ৬৮ হাজার মহিলা চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিজ্ঞানসংক্রান্ত বিভাগগুলিতে এবং অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত ছিলেন।[১৬]

নিম্নবর্গের মহিলারা শহরগুলিতে আসার পর বেশ ভালো সংখ্যায় উৎপাদন শিল্পে কাজ নিয়েছিলেন। এই মহিলাদের মধ্যে সিংহভাগই কাজ করতেন বড়ো অথবা মাঝারি ধরনের ফ্যাক্টরি বা কারখানাগুলিতে। চা, চট, কয়লা বা খনি শিল্পের মতো বৃহদায়তন শিল্পগুলিতে মহিলারা ও শিশুরা অস্থায়ীভাবে অদক্ষ শ্রমিকের ন্যায় কাজ করতেন। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শিল্পগুলিতেও বিপুল সংখ্যক মহিলা কর্মরত ছিলেন। বিড়ি, তাঁত, চালকল, নির্মাণ শিল্পে প্রচুর সংখ্যক মহিলা শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন।[১৭] উনিশ ও বিশ শতকে এমনকি একুশ শতকেও ভারতের বিভিন্ন শহরে তথাকথিত নিচজাতের এবং দরিদ্র মুসলিম পরিবারের মহিলারা বিত্তশালী পরিবারগুলিতে গৃহ পরিচারিকার কাজ বেছে নিয়েছেন। ১৯২১ সালের আদমসুমারি অনুসারে এদের সংখ্যা ৭০৩৭। এছাড়া আরও কিছু পেশা যেমন- ঝাড়ুদারনি ও জমাদারনি, ধাই, নার্স, আয়া এবং বেশ্যাবৃত্তি (যৌনকর্ম) পেশা হিসাবে নারীরা বেছে নেয়। এই পর্বে কলকাতা, বোম্বে, পুনে, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে পেশা হিসাবে দেহব্যবসা বা যৌনকর্ম বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করেছিল।[১৮] 'Bombay Prostitution Committee' -র প্রতিবেদন অনুসারে, ১৯২১ সালে বোম্বাইতে বেশ্যাবৃত্তির (যৌনকর্মী) সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ হাজারের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কলকাতা শহরেও এদের সংখ্যা যথেষ্টই ছিল বলা যায়। মহিলারা অধিকাংশই শহরের আধুনিক পেশায় কাজ নিয়েছিলেন পরিবার ও সমাজের নানা বাধা টপকে; নানা লাঞ্ছনা কটূক্তি সহ্য করেই। উনিশ শতকে নারী সংগঠনগুলি সমাজের উঁচুতলার মহিলাদের কাজের ব্যাপারে যতখানি সরব ছিল ততটা কিন্তু নিচতলার মহিলাদের ক্ষেত্রে ছিল না।[১৯] বিশ ও একুশ শতকে তার পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে সামাজিক ব্যাধি হিসাবে ধর্ষনের বিরুদ্ধে সমাজ, রাষ্ট্র, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষ একযোগে প্রতিবাদ করলেও নারীর সম্ভ্রম ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে যা আমাদের কাছে চিন্তার বিষয়।

সংগঠিত শিল্পে নারী শ্রমিক উনিশ শতকের শেষ পর্বে এবং বিশ শতকের সূচনায় প্রভূত বৃদ্ধি পায়। ১৯১১ -এর আদমসুমারি অনুসারে ৩০০ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে সংগঠিত শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২.১ মিলিয়ন। ১৯১১ থেকে ১৯২১ -এর

মধ্যে আরও যুক্ত হয়েছিল ৫,৭৫,৫০০ জন শ্রমিক। পাট, সুতিবস্ত্র, চট শিল্প, চা-বাগিচা শিল্পে, খনি শিল্পে, খাদান কামিন-ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের বৈষম্যের শিকার হতে হয়। আর এদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই ছিলেন অভিবাসী শ্রমিক। বোম্বাই-এর কলকারখানাগুলিতে ৪ জন শ্রমিকের মধ্যে ১ জন এবং কলকাতায় প্রতি ৫ জন শ্রমিকের মধ্যে ১ জন ছিলেন মহিলা। মজুরির ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।[২০] বিশ শতকের গোড়ার দিকে পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুদের চা-বাগিচাতে যে মজুরি দেওয়া হত তার একটা হিসাব দেওয়া হল-

	বর্ষ: ১৯১১-১৪	**বর্ষ: ১৯১৮-১৯**
শ্রমিক	**টাকা আনা পাই**	**টাকা আনা পাই**
পুরুষ	৬ টাকা ১ আনা ৩ পাই	৬ টাকা ৫ আনা ৯ পাই
মহিলা	৪ টাকা ১১ আনা ৫ পাই	৫ টাকা ১ আনা ৫ পাই
শিশু	২ টাকা ১৩ আনা ৭ পাই	৩ টাকা ১ আনা ৫ পাই

Rege Committee-র দেওয়া পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৪৭ সালে চা-বাগিচা শিল্পে পুরুষ, মহিলা ও শিশু শ্রমিকদের মজুরির একটা হিসাব দেওয়া হল-

শ্রমিক	**পারিশ্রমিক**	**বাড়তি কাজের জন্য ভাতা**	**দৈনিক সমগ্র মজুরি**
পুরুষ	৬ আনা	৬ আনা	১২ আনা
মহিলা	৫ আনা	৫ আনা	১০ আনা
শিশু	৩ আনা	৩ আনা	৬ আনা

এর থেকে বোঝা যায় যে স্বাধীনতার পরও শ্রমিকদের বিশেষ করে মহিলা ও শিশু শ্রমিকের দুর্দশা ও বৈষম্য থেকে খুব একটা অব্যাহতি মেলেনি। ন্যায্য মজুরি, স্বাস্থ্য-পরিসেবা, কাজের অবস্থার উন্নতি, খাদ্যদ্রব্য, বাসস্থান, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা, তাদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া ও খেলাধূলার সুযোগ-সুবিধা ও অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্য যা তাদের পাওয়া উচিত ছিল তা যে তারা পাচ্ছে না তা বলাই বাহুল্য।

তাই একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভারতের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ৯০ শতাংশের বেশি অসংগঠিত ক্ষেত্রের কাজগুলির সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে অধিকাংশই হলেন মহিলারা। এদের মধ্যে একটি সামান্য অংশ স্থায়ী, বাকিরা অস্থায়ী ধরনের কর্মী। আবার অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরতা মহিলাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গ্রামে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। আবার এমন অনেক মহিলা আছেন যারা গৃহভিত্তিক শিল্পকাজও করে থাকেন। এর মধ্যে স্ব-নিযুক্ত কাজও করে। বাঁশ বা বেতের কাজ তারা নিজেরাই করে থাকেন। ১৯৯১ সালের আদমশুমারির পরিসংখ্যান অনুসারে পুরুষ ও নারী কর্মীদের মধ্যে যথাক্রমে ৩.৩৭ শতাংশ ও ৪.৬২ শতাংশ গৃহ ভিত্তিক শিল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন।

ওই বছরের আদমসুমারি থেকে আরও জানা যায়, ভারতের কর্মরত জনসংখ্যার ৯০.৬৬ শতাংশ অর্থাৎ ২৫.৯২ কোটি জনসংখ্যা অসংগঠিত ক্ষেত্রের পেশাগুলিতে কাজ করে চলেছেন। এর মধ্যে আবার ৯ কোটি কৃষক, ৭ কোটি মজদুর, ৪ কোটি স্বরোজগারী এবং ২ কোটি নির্মাণ শিল্পে কর্মরত।[২১]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসে কামার, কুমোর, ছুঁতোর, চামার, তাঁতি প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ আছে। আধুনিক কালে মহিলারা যেসব পেশার সঙ্গে বেশি করে যুক্ত হয়েছিলেন সেগুলি হল, বিড়ি শিল্প, তাঁত শিল্প, পোশাক তৈরি শিল্প, এমব্রয়ডারি ও জরির কাজ, নির্মান শিল্প, মুড়ি তৈরি, এমনকি ইট ভাটায় শ্রমিকের কাজ।[২২] এই মহিলারা অধিকাংশই তপশিলি জাতি-উপজাতি-জনজাতি অথবা অন্যান্য অনগ্রসহ শ্রেণীভুক্ত। এছাড়াও সংখ্যালঘু অসংখ্য নিম্ন পরিবারের এবং নিম্ন আয় সম্পন্ন মহিলারা শ্রমিক হিসাবে এই কাজে যথেষ্ট পরিমাণে নিযুক্ত ছিল।

তথ্যসূত্র:

১. সুকোমল সেন, ‘ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০–১৯৯০, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ.১৫৮-১৬৪।

২. তদেব, পৃ.১৭২-১৭৪।

৩. তদেব।

৪. Nirban Basu, The working Class Movement: A study of Jute Mills of Bengal:1937-1947, K. P. Bagchi & Co., Calcutta, 1994, pp. 127-133.

৫. Ibid.

৬. R.P. Dutta, India Today, People’s Publication House, Bombay, 1949, pp.202- 205.

৭. D.H. Buchanan, The Development of Capitalistic Enterprise in India, McMillian Co., 1934. pp.187-208.

৮. নির্বান বসু, দীপিকা বসু, অমল দাশ ও অন্যান্য (সম্পা.), সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সাতদশক, সুধীপ্রধান স্মারক রচনা সম্ভার, কলকাতা, ২০০২, পৃ.৬৩-৬৮।

৯. R. P. Dutta, op.cit.

১০. Mukul Mukhopadhyay, Women and Work in India, Oxford University Press, 1990, pp.211-216.

১১. Ibid.

১২. loc.cit.

১৩. অমল দাশ, ভারত ইতিহাসে নিম্নবর্গের নারীশ্রমিক: উনিশ থেকে বিশ শতক, প্রগতিশীল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ.৬২-১২৬।

১৪. নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবার, কাজ ও মেয়েরা, কলকাতা, ২০০৭, পৃ.৭৮-৮১।

১৫. তদেব।

১৬. সুকোমল সেন, পূর্বোক্ত।

১৭. অমল দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪৫-১৬৮।

১৮. তদেব, পৃ.১৮৩।

১৯. কনক মুখোপাধ্যায়, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ.৯৫-৯৭।

২০. সুকোমল সেন, পূর্বোক্ত।

২১. অমল দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৮৯-১৯৭।

২২. তদেব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসে নায়কের নিঃসঙ্গতা

অর্পিতা দেবনাথ
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া

সংক্ষিপ্তসার: বর্তমান মানবসভ্যতায় নিঃসঙ্গতা শব্দটি তো আমাদের জীবনযাত্রার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। বর্তমান সময়ে তথ্য-প্রযুক্তির যুগে আমরা বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি সাধন করেছি। ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যকে ভালোভাবে জানার জন্য আমরা যেমন মহাকাশে স্পেসস্টেশন পাঠিয়েছি, তেমনি বিশ্বের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম - যে কোন জায়গায় আমরা কয়েক ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যেতে পারি। পৃথিবীর যে কোন জায়গার খবর আমরা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পেয়ে যাই। তথাপি আমাদের মনের এই নিঃসঙ্গতাকে আমরা আজও যেমন বুঝতে পারিনি তেমনি এর থেকে বেরিয়ে আসতেও পারিনি। তাই বর্তমান সমাজে এই নিঃসঙ্গতা নিয়ে আলোচনা ভীষণ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। নিঃসঙ্গতা নিয়ে পাশ্চাত্য দর্শন ও সাহিত্যে অনেক লেখালেখি হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নিঃসঙ্গতা নিয়ে লেখালেখি হলেও তাঁর আগেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু উপন্যাসে আমারা নিঃসঙ্গতার প্রসঙ্গ উঠে আসতে দেখি। এই রকমই এক উপন্যাস ‘চতুরঙ্গ’। যেখানে শচীশ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে নিঃসঙ্গতাকে তুলে ধরা হয়েছে।

সূচক শব্দ: নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব, আত্মানুসন্ধান।

মূলপ্রবন্ধ:

> “মানুষের মধ্যে দুটো দিক আছে এক দিকে সে স্বতন্ত্র আর একদিকে সে সকলের সঙ্গে যুক্ত। এর একটাকে বাদ দিলে যেটা বাকি থাকে সেটা অবাস্তব।”[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রাশিয়ার চিঠি’তে আমরা এই কথাটি পাই। কথাটি সত্য। আমাদের মধ্যে যেমন সত্যিই একটা স্বতন্ত্রতা আছে, যেটা সম্পূর্ণ নিজস্ব। তেমনি, সকলের সঙ্গে আমরা গভীরভাবে যুক্ত। কারণ আমরা সামাজিক জীব। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গতা নিয়ে আমাদের সমাজে যে ধারণা তা ভীষণ কৌতূহলী ও ভীতিপদ। আমাদের সমাজ এটিকে নেতিবাচক দিক থেকে বিচার করা হয়। নিঃসঙ্গতা বলতে মূলত বোঝানো হয় সামাজিক বিচ্ছিন্নতা - যা আমাদের ভীষণ অপ্রিয় জিনিস। আর সেই কারণে আমরা যাতে নিঃসঙ্গ কখনো না হই, তার জন্য সোশ্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আমরা সবসময়

একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে চাই। প্রচলিত গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেদেরকে সবসময় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাই। একা থাকতে আমরা যেন কেমন ভয় পাই। নিঃসঙ্গতা বা একাকিত্বের এই স্তরটিকে আমরা মূলত 'মনোফোবিয়া' বলতে পারি। কিন্তু আমরা নিঃসঙ্গতাকে এইভাবে না দেখে একটু অন্যভাবেও দেখতে পারি। আসলে নির্জনে একা থাকাটা কেবলমাত্র বেদনাদায়ক নয়। কোনো কোনো সময় এটি আমাদের মনোবলকে বাড়িয়ে তোলে। এটি আমাদের ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি করতে অনুঘটকের মত কাজ করে। আমাদের সৃজনশীলতাকে বৃদ্ধি করে। আমাদের অন্তরে শান্তির পথ দেখায়।

এবার নিঃসঙ্গতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের প্রথমে জানতে হবে, নিঃসঙ্গতা শব্দটির অর্থ কি? ইংরেজিতে নিঃসঙ্গতা শব্দটির দুটি রূপ আছে, solitude ও loneliness. মানুষ যখন নিজে, নিজের সঙ্গে একা থাকতে পছন্দ করে বা এই একা থাকার মধ্যে সে যখন একটা মানসিক শান্তি পায়, তখন তাকে solitude বলে। আর মানুষ যখন কোন কিছুর দ্বারা কষ্ট পায় অথবা জীবনের অর্থ খুঁজে পায়না, তখন মানুষের মধ্যে যে মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে loneliness বলে। Solitude অবস্থাতে মানুষ পূর্ণতা অনুভব করে। কিন্তু loneliness অবস্থাতে মানুষের মধ্যে অপূর্ণতা বা দুঃখের অনুভব হয়। ভয় কাজ করে। সাধারণত আমরা কেউ এই অবস্থার মধ্যে থাকতে চাই না। কারন এটি আমাদের মনে ও শরীরে খারাপ প্রভাব ফেলে। এই অবস্থাতে অনেক সময় মানুষ আত্মহত্যা করতে চায়, কোনো আনন্দদায়ক কাজে তাদের মন থাকে না, তাদের ঘুম ঠিকমতো হয় না, এমনকি দৈনন্দিন জীবনে তারা খুশি হতে পারেনা। এটা আসলে একটা দুঃখপূর্ণ বেদনা। কোনো কিছু না পাওয়া থেকে এই অনুভব আসে। এখানে মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলে। আর Solitude একটা সিদ্ধান্ত। এখানে মানুষ নিজেকে খুঁজে পায়। এই ধরনের নিঃসঙ্গতা আমাদের আত্ম-আবিষ্কারের সহায়ক হয়। আমাদের চিন্তাভাবনার মধ্যে স্বচ্ছতা আনে। এটা একটা সুন্দর মুহূর্ত। এখানে আমরা মূলত নিজেদের অন্বেষণ করি। নিজেদের সমৃদ্ধ করি। এটি আমাদের আধ্যাত্মিক ও আত্ম-জ্ঞান, অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং প্রশান্তি, সুখ ও সত্যের পথে যাওয়ার পথ তৈরি করে দেয়।

আসলে solitude, lonliness এর থেকে অনেক বড় কিছু। এটি জীবনে বেঁচে থাকার এমন একটি অভিজ্ঞতা যেখানে কেউ নিজেকে নিয়ে আনন্দে থাকতে পারে। বাইরের জগতের সমস্ত কোলাহল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের আত্মদর্শনের বা আত্মআবিষ্কারের পথে সে নিজেকে নিমগ্ন রাখতে পারে। lonliness-কে আমরা FOMO (fear of missing out) এবং solitude-কে আমরা ROMO (relife of missing out) বলতে পারি। আমাদের জীবন আসলে lonliness থেকে solitude এর দিকে যাত্রা করে। 'শ্রীমদ্ভাগবদগীতা'র 'ধ্যানযোগ' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন,

> "যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
> একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীর পরিগ্রহঃ।।১০।।
> (ষষ্ঠ অধ্যায়/ ধ্যানযোগ)
>
> অনুবাদ : যোগারূঢ় ব্যক্তি সর্বদা পরব্রহ্মে সংযুক্ত হয়ে তাঁর দেহ, মন ও আত্মাকে নিয়োজিত করবেন; তিনি একাকী নির্জন স্থানে বসবাস করবেন এবং সর্বদা সতর্কভাবে তাঁর মনকে বশীভূত করবেন। তিনি বাসনামুক্ত ও পরিগ্রহ রহিত হবেন।"[২]

সুতরাং এখানেও আমরা দেখছি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সর্বদা তাঁর মনকে নিয়ন্ত্রণ করে একাকী নির্জন স্থানে অবস্থান করে। অর্থাৎ একাকী নির্জন স্থানে অবস্থান করে মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব নির্মাণ করতে পারে।

Solitude নিয়ে পাশ্চাত্যে বিভিন্ন দার্শনিক তাঁদের মতামত দিয়েছেন। বিভিন্ন লেখক তাঁদের রচনাতে solitude এর অনুভব প্রকাশ করেছেন। হেনরি ডেভিড থোরো তাঁর 'Walden' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে solitude নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। লেখক কখনো দার্শনিকভাবে solitude এর ব্যাখ্যা করেননি। তিনি আসলে solitude এর মধ্যেই থেকেছে এবং সেখানে থেকে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তিনি solitude-কে আসলে আয়নার মতো দেখতে চেয়েছেন। যেখানে মানুষ তার নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। এটা আসলে আমাদের শক্তির উৎস। আমাদের অন্তরের ভেতরে পরিচ্ছন্নতা আনে। আমাদের আত্মার উন্নতি করে। লেখক কখনোই নিঃসঙ্গতাকে একটি অপ্রীতিকর অবস্থা মনে করেন না। তিনি মনে করেন এটি নিজেকে পুনর্নির্মাণের একটি উপায়।

নীটশেও তাঁর দর্শনে নিঃসঙ্গতার ইতিবাচক দিকটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। নীটশে শোপেনহাওয়ারের দর্শনের দ্বারাও ভীষণ প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি শোপেনহাওয়ারের নিরাশাবাদকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি মনে করতেন জীবন সম্পূর্ণ নিরাশার নয়। জীবনের কোনো না কোনো অর্থ অবশ্যই থাকবে। আর এই অর্থ খোঁজার প্রয়াসেই নীটশের দর্শন গড়ে উঠেছিল। নীটশের দর্শন ভীষণ জটিল। তাই সবাই নীটশেকে ভালো করে বুঝতে পারে না। মৃত্যুর দশ বছর আগে তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিল। তিনি কখনো বিবাহ করেননি। একজন মহিলাকে তিনবার বিবাহ প্রস্তাব দেবার পরেও সেখান থেকে তিনি প্রত্যাখিত হয়েছিলেন। ফলে ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ভীষণ নিঃসঙ্গ ছিলেন। তবে এই নিঃসঙ্গতাকে তিনি সবসময় আত্মোন্নতির সহায়ক হিসেবে মনে করেছেন। তিনি তাঁর "Beyond Good And Evil" গ্রন্থে solitude সম্পর্কে বলেছেন,

> “Choose the good solitude, the free, wanton, lightsome solitude, which also gives you the right still to remain good in any sense whatsoever !”[৩]

তিনি মনে করতেন, নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে, নিঃসঙ্গতা জীবনের একটি অন্যতম উপকরণ। তিনি আরও মনে করতেন নিজের উন্নতির জন্য ভিড়ের মধ্যে থেকে সরে একা থাকা অবশ্যই জরুরী। নিজের ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনের জন্য একা থাকা ভীষণ জরুরী। কেউ যখন নিঃসঙ্গ বা একা থাকে তখনই সে নিজেকে নিজের অস্তিত্বের সম্পর্ক প্রশ্ন করতে পারে। এটা আমাদের মহানুভবতার দিকে যাত্রা করতে সাহায্য করে।

এই প্রসঙ্গে উনিশ শতকের ডেনমার্কের মহান দার্শনিক ও চিন্তাবিদ কিয়েরকেগার্ডের কথা বলতে হয়। তাঁকে মূলত অস্তিত্ববাদের পিতা বা “দা ফাদার অফ এক্সেসটেলিজম” বলা হয়। কিন্তু অস্তিত্ববাদের দর্শনের সঙ্গে যেহেতু নিঃসঙ্গতার এক নিবিড় সম্পর্ক আছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দর্শনেও নিঃসঙ্গতার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ছোটবেলা থেকেই কিয়েরকেগার্ডের জীবন একাকীত্বের মধ্যে কেটেছে। তাঁরা সাত ভাই-বোন ছিলেন কিন্তু এক এক করে সবাই মারা গিয়েছিল। কেবল সে আর তাঁর এক ভাই বেঁচে ছিল। এসব কিছু তাঁর মনে ভীষণ প্রভাব ফেলেছিল। ফলে তাঁর দর্শনেও এর প্রতিফলন ঘটেছে।

তিনি বলতেন, যে মানুষ আন্তরিকভাবে স্বাধীন সেই একমাত্র অস্তিত্ববাদী হতে পারে। নিজের ইচ্ছে মতন জীবন চালানো উচিত। পরিবার বা সমাজের চাপে পড়ে জীবনে কোন সিদ্ধান্তে নেওয়া উচিত নয়। অর্থহীন জীবনের জন্য হতাশ হলে চলবে না। নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজতে হবে। স্বাধীনভাবে নিজের চিন্তা-ভাবনা নেওয়ার ক্ষমতাই অস্তিত্ববাদের মূল মন্ত্র। স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা নিতে গিয়ে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেননি। তিনি একজন আস্তিক অস্তিত্ববাদী ছিলেন, তাই চিন্তা, শোক ও নিরাশায় তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখতে বলেছিলেন। তিনি তাঁর “And in The Sickness Unto Death” নামক গ্রন্থে solitude নিয়ে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন,

> “Generally the need of solitude is a sign that there is spirit in a man after all, and it is a measure for what spirit there is .”[৪]

এই spirit কে তিনি মূলত অধ্যাত্মিক শক্তি হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। solitude -কে তিনি নিজের আত্ম আবিস্কার এবং নিজেকে বোঝার এক অন্যতম হাতিয়ার মনে

করতেন। অস্তিত্ববাদে যে অস্থিরতা, সেটাকে একমাত্র solitude ঠিক করতে পারে। আসলে আমরা আমাদের জীবনকে, আমাদের নিঃসঙ্গতাকে, আমাদের পরিস্থিতিকে কিভাবে দেখব, সেটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের ওপর নির্ভর করছে। আর অস্তিবাদও আমাদের এই স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেবার কথা বলে।

এবার দেখা যাক নিঃসঙ্গতা মূলক উপন্যাসে নায়ক চরিত্রের মধ্যে কি ধরণের বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের উপন্যাসে, চরিত্রগুলি আত্ম সমীক্ষা, পাপবোধ, অনুতাপ, স্বীকারোক্তি আর অন্বেষণের মাধ্যমে জীবন সম্পর্কে সত্য উপলব্ধিতে পৌঁছতে চায়। এখানে মানুষের মানসিক ভারসাম্যহীনতা, মূল্যবোধের বিনষ্টি, সুস্থ জীবনবোধের অবসান, অবক্ষয়ের প্রতিষ্ঠা, বিপর্যয়ের বিজয় লক্ষ্য করা যায়। নায়ক এখানে কবিতার নায়কের মতো দুঃখ ক্রেশ গ্লানির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারে না, আমার স্বপ্ন অপরিসীম, আমার মনে কোনো ক্লান্তি নেই।

এই সমস্ত সাহিত্যে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণার প্রতিক্রিয়া নয়, যন্ত্রণার উৎসকে মূলত দেখানো হয়েছে। এখানে আবেগকে প্রশয় দিয়ে সেন্টিমেণ্টাল মুহূর্ত সৃষ্টি করা হয়নি। মনন, সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ, গভীর জীবনবোধ এই ধরণের উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। আসলে ব্যক্তির অন্তরমুখীনতা, বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতাবোধ, বিষাদ, গ্লানি ও মৃত্যুর অনুভূতি উপন্যাসের চরিত্র বদলে সাহায্য করেছে। জীবন সত্যের অন্বেষণ চরিত্রগুলির মূল লক্ষ্য। তবে পাশ্চাত্য উপন্যাসে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ, অসহায়তা, শঙ্কাতুরতা, বিষাদ ও নিঃসঙ্গতাবোধের যেমন নিপুণ বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, বাংলা সাহিত্যে নিঃসঙ্গতার সেইরূপ সেইভাবে উঠে আসেনি। বাংলা উপন্যাসে নিঃসঙ্গতার ভাবনা ব্যাপক অর্থে ঘনীভূত হয়েছিল, বিশ শতকে। বিশেষ করে ১৯৪৩ সালের পরবর্তীকালে। সেইসময় বাঙালি লেখকদের প্রেরণাস্থল হয়ে ওঠেছিল সার্ত্র, কামু, কাফকার উপন্যাসগুলি। কামুর 'দি প্লেগ', 'দি রেবেল', 'দি ফল'; সার্ত্রর 'নসিয়া', 'দি এজ অফ রিজন' ইত্যাদি উপন্যাসগুলিতে নিঃসঙ্গতার সমস্যা মূর্ত হয়েছে। 'নসিয়া'র নায়ক রোকেতঁ অস্তিত্বের সংকট থেকে আত্মহননকামী হয়ে উঠেছে। আর 'এজ অফ রিজনে'র নায়ক ম্যাথু প্রণয়িনী ও তাদের সন্তানের হাত থেকে মুক্তি পেতে গর্ভপাত চায়। কাফকার 'দি ট্রায়াল', 'দি ক্যাসল' বা 'মেটামরফসিসে'-ও অস্তিত্বের সংকট ও নিঃসঙ্গতার প্রজ্জ্বলন্ত সমস্যা সার্থক শিক্ষারূপ লাভ করেছে ।

বাংলা উপন্যাসের কথা বলতে গেলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র শশী চরিত্রে নিঃসঙ্গতার সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। শশী অনেকটা সার্ত্র-র 'নসিয়া'র রোকেতঁ অথবা 'রোড টু ফ্রীডমে'-এর ম্যাথুর মতো অস্তিত্বের সংকটে হতাশ হয়েছে। 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের রাজকুমারও নিঃসঙ্গতার সমস্যায় আক্রান্ত। তার স্বীকারোক্তি, 'কারো সঙ্গে আমার বনে না, সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না।' সতীনাথ ভাদুড়ীর 'অচিন রাগিণী', 'সংকট', 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসে নিঃসঙ্গতার রূপায়ণ

আরো সার্থকভাবে দেখা গেছে। 'সংকট'-এর কর্তব্যসচেতন বিশ্বাসজী যেভাবে অযৌক্তিক অনির্দেশ্য অমোঘ প্রবাহে ভেসে গেলেন তাতে অস্তিত্বের সংকট যথাযথভাবে ধরা পড়েছে। সমরেশ বসুর 'বিবর' ও 'পাতক' উপন্যাস দুটিও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এপ্রসঙ্গে আরও কিছু উপন্যাসের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেগুলিতে কখনো প্রত্যক্ষ ভাবে, কখনো প্রচ্ছন্নভাবে এই সমস্যার রূপায়ণ ঘটেছে। যেমন-- জগদীশ গুপ্তের 'অসাধু সিদ্ধার্থ'; বুদ্ধদেব বসুর 'গোলাপ কেন কালো', 'শেষ পাণ্ডুলিপি'; জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মীরার দুপুর', 'প্রেমের চেয়ে বড়'; বিমল করের 'জীবিত ও মৃত', 'পূর্ণ অপূর্ণ', 'ফানুসের আয়ু'; সন্তোষ কুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি', 'মুখের রেখা'; সমরেশ বসুর 'মানুষ'; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যার সুর'; লোকনাথ ভট্টাচার্যের 'যত দ্বার তত অরণ্য'; বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নিশীথ ফেরী'; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাচের দরোজা'; শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা', 'পারাপার' ইত্যাদি। সমকালীন আরো অনেকের লেখায় নিঃসঙ্গতার এই সংকট ক্রমবিস্তারী ছায়া ফেলেছে।

তবে একথাও ঠিক, নিঃসঙ্গতা মানব প্রকৃতির মৌল লক্ষন। তাই বাঙালি সাহিত্যিকরাও এই ভাবনায় অনেকদিন আগেই ভাবিত হয়েছিলেন। উনিশ শতকেই বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের 'অনন্ত জনস্রোত মধ্যে আমি একা' কিংবা 'রজনী' উপন্যাসে 'এ জীবন লইয়া কি করিব' উক্তিতে নিঃসঙ্গতার আর্তি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের শচীশ চরিত্রটির মধ্যে আমরা এই ধরনের নিঃসঙ্গতার রূপ দেখতে পাই। উপন্যাসটির চারটি অংশ- জ্যাঠামশাই, লীলানন্দ, দামিনী ও শ্রীবিলাস। এই চারটি অংশে শচীশের জীবনের চারটি পর্ব (নাস্তিক্য, গুরুবাদ, রসবাদ ও আত্ম-আবিষ্কার) দেখানো হয়েছে। চার পর্বে শচীশের গুরু চারজন- জ্যাঠামশাই, লীলানন্দ, দামিনী ও শচীশ নিজেই। প্রথম পর্বের শচীশের গুরু জ্যাঠামশাই জগমোহন। তিনি চরম নাস্তিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ঈশ্বরবিশ্বাসীদের সঙ্গে তাঁর তর্কপদ্ধতিটি ছিল এই রূপ,

> "ঈশ্বর যদি থাকেন তবে আমার বুদ্ধি তারই দেওয়া;
> সেই বুদ্ধি বলিতেছে যে, ঈশ্বর নাই;
> অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে, ঈশ্বর নাই।"[৫]

আসলে শচীশকে তিনি নাস্তিকতা ও মানবতাবাদের দীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর শচীশ লীলানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। লীলানন্দ তাকে ভক্তিরসের সমুদ্রে মুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু দামিনী সংস্পর্শে এসে শচীশের ভক্তিমদের বিহ্বলতাও একদিন কেটে গেল। আসলে দামিনীর কাছে শচীশ জীবনরস সাধনার দীক্ষা নিয়েছিল। দামিনীর বঞ্চিত নারী জীবনের প্রতি শচীশের সকরুণ মমতা ছিল। আর এই মমতাই একসময় প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখি শচীশের যাত্রা দামিনীতেই আটকে

যায়নি। শ্রীবিলাস পর্বে আমরা দেখি শচীশ আত্ম আবিষ্কারের পথে যাত্রা করেছে। এই পথে শচীশ একা নিঃসঙ্গ পথিক। এই পর্বে তাঁর জীবনসাধনা পূর্ণতা পেয়েছে। তাইতো সে দামিনীকে বলেছিল,

> "যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার- আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।"[৬]

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস নিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন,

> "শচীশ ও তার অসীমের সাধনার মাঝে আর কেউ নেই। আধুনিক ভাষায় বলা যায়, শচীশের আত্ম-আবিষ্কার ও আত্ম উদ্ঘাটনের সাধনায় সে একা। তার নিঃসঙ্গ সাধনার পথে শচীশ একে একে সব ছেড়েছে, পরীক্ষা করতে করতে এগিয়েছে। প্রচলিত নাস্তিকতা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসে, যুক্তিনির্ভর পজিটিভিসম্ থেকে ভক্তি নির্ভর বৈষ্ণবতার পথে পথিক শচীশ। কিন্তু সেখানেই থেমে যায়নি। জীবনসাধনায় রসের মূল্য স্বীকার করেছে, দামিনীকে গুরু বলে মেনেছে। এখানেও সে স্থিত হল না, আরো এগিয়েছে, জীবনের সত্যকে দেখার জন্য সে অন্তর পথে দুরূহের পথে, নিঃসঙ্গ একাকিত্বের পথে আত্মনির্ভর হয়ে এগিয়েছে।"[৭]

সুতরাং উপন্যাসে আত্ম আবিষ্কারের জন্য শচীশ যে নিঃসঙ্গতা থেকে গ্রহণ করেছে তাকে আমরা ইংরেজিতে 'solitude' বলতে পারি। এই ধরনের একাকীত্ব মানুষ নিজেই নির্ধারণ করে। সাধারণভাবে 'এক্সট্রোভার্ট' বা বহিঃপ্রকাশগামী ব্যক্তিদের নিঃসঙ্গতার প্রয়োজন হয় না। বরং নিঃসঙ্গ হলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। যেমন 'লাভ-বার্ড' নামক এক প্রজাতির পাখি আছে, যারা একা থাকলে কিছুদিন বাদে মারা যায়। ছোট শিশুকে যেমন ঘুমপাড়ানীর গান গেয়ে ঘুম পাড়াতে হয়, তেমনি কিছু মানুষেরও জীবনে সর্বদা হৈ-চৈয়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমরা যদি সবসময় বাহ্যিক পরিস্থিতির সঙ্গে চেঁচামেচি করি, তবে আমরা কখনোই সমস্যার সমাধান করতে পারব না। কিন্তু যখন আমরা সম্পূর্ণ ফাঁকা থাকি বা অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকি, তখন যদি আমরা আমাদের জীবনযাত্রার কিছু সময় নিঃসঙ্গতার মধ্যে থাকি তাহলে আমরা আমাদের ক্ষমতা, শক্তি, সৃজনশীলতার উন্নতি করতে পারবো।

তথ্যসূত্র:

১। রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী দশম খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৭ ফাল্গুন ১৪২২, পৃষ্ঠা- ৬০০

২। শ্রীমদ্ভাগবদগীতা যথাযথ, ভক্তি বেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মুম্বাই ৪০০০৪৯, পৃষ্ঠা-২৮০

৩। Friedrich Nietzsche, Beyond Good And Evil (Translated by Helen Zimmern), The Modern Library, New York, United States of America by H. Wolff. পৃষ্ঠা- ৩০

৪। S. Kierkegaard, The Sickness Unto Death, translated with an introduction by Walter Lowrie, Princeton university Press, Princeton, New Jersey, United States of America, 1941. পৃষ্ঠা-১০২

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪২২। পৃষ্ঠা-৪২৬

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী(চতুর্থ খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪২২। পৃষ্ঠা- ৪৬২

৭। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছরঃ১৯২৩-১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬। পৃষ্ঠা-১৮

গ্রন্থপঞ্জী

আকর গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৭, পুণর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪২২।

সহায়ক গ্রন্থ

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছরঃ১৯২৩-১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬। পৃষ্ঠা-১৮

কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, কথাসাহিত্যের নতুন পাঠ, সাহিত্যলোক, কলকাতা- ৬, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৮।

অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুনা প্রকাশনী, কলকাতা-৬, চতুর্থ সংস্করণ নভেম্বর ২০১৮।

রবিন পাল, উপন্যাসের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিচ্ছিন্নতা ও বর্তমান বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ (দ্বিতীয় খন্ড), অ্যাকাডেমি পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৮।

বাংলার পৌণ্ড্র সমাজ ও পাশ্চাত্য শিক্ষা

সমীর মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
ময়না কলেজ

মহাভারতের আদি পর্ব শ্রীমদ্ভাগবদ হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, মৎসপুরাণ, রামায়ণ, বৃহৎসংহিতা ভবিষ্যৎপুরাণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, কলহনের রাজতরঙ্গিণী, প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে বলা যায় যে, পৌণ্ড্রগণ বাংলাদেশে মোটামুটিভাবে আর্যপূর্ব যুগ থেকেই বসবাস করছে।[১] মহাভারত থেকে জানা যায় যে মহারাজ বলীর পুত্রগণ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুক্ষ নামে পূর্ব ভারতের এই পাঁচটি স্থানের শাসনকর্তা ছিলেন।[২] বাংলার প্রথম সার্বভৌম শাসক শশাঙ্কের মৃত্যুর কিছুকাল পরে 643 খ্রী: পুণ্ড্রবর্ধন কামরূপের শাসনের আওতায় এসেছিল।[৩]

ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায় তার বাঙালির ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে বাঙালীর ধর্মকর্মের গোড়ার ইতিহাস হইতেছে রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ প্রভৃতি জনপদের অসংখ্য জন ও কৌমের, এক কথায় বাংলার আদিবাসীদেরই পূজা, আচার-অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস।[৪] তবে ভারতে আর্যদের আগমন, বিভিন্নস্থানে তাদের বিস্তারলাভ এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভিঘাতে এই পুণ্ড্র-জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়েছিল।

পৌণ্ড্রজাতির আদি বাসভূমি ছিল প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন। যদিও একসময় তারা এই পুণ্ড্রবর্ধন থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন এবং জীবন ও জীবিকা রক্ষার তাগিদে ছড়িয়ে পড়েন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। ফলে আর্থিক অনটন ও অনগ্রসরতার অভিশাপ তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে পড়ে এবং সমাজে পতিত জাতিরূপে পরিচিত পায়। জীবিকা হিসাবে তারা বেছে নেয় মাছধরা, নৌচালনা ও কৃষিকাজ। শুধু প্রাচীন নয় আদি মধ্যযুগেও তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। বরং আরো ননান সামাজিক অশচিতার বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ে।

ইসলামের আবির্ভাবের পর বিশেষতঃ মধ্যযুগে ইসলামের উদারতায় পুণ্ড্রজাতি শুধু ইসলামের প্রতি নয় ঔপনিবেশিক শাসনে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাবে খ্রীষ্টধর্মের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিল। বস্তুত বলা বাহুল্য একমাত্র শিক্ষাই এই প্রতিকুল অবস্থা থেকে এই পৌণ্ড্র সমাজকে রক্ষা করতে পারে। কারন শিক্ষা আনে চেতনা আর চেতনা আনে মুক্তি। শিক্ষার মাধ্যমেই প্রতিটি জাতি তার অস্তিত্ব ও গৌরব বাড়াতে সক্ষম হয়। ঔপনিবেশিক শাসনকালে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের পৌণ্ড্র সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পৌণ্ড্রসমাজের মধ্যে শিক্ষার যে প্রসার ঘটেছিল তা 1882 খ্রী: ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ পাওয়া যায়। Progress of Education Bengal 1912-13 to 1916-17, First Quinwennial Review by W. W. Harvel, Calcutta University Commission Report 1917-18 প্রভৃতি থেকে জানা যায় যে ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশশতকের প্রথমার্ধে পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিশেষ প্রসার ঘটেছিল। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত শ্রীমন্ত কাব্যতীর্থ সিদ্ধান্ত বাগীশ, বিপিনবিহারী মনি কাব্যসাগর, রাইচরণ সরদার, গৌরমোহন মণ্ডল,

বেনীমাধবদেব হালদার, রাজেন্দ্রনাথ সরকার, অক্ষয় কুমার কয়াল, ধ্রুবচাঁদ হালদার, মহেন্দ্রনাথ করণ, ভূষণচন্দ্র নস্কর প্রমুখ ছিলেন বিশেষ উল্লেখ্য। 1921 খ্রী: সেন্সাস বিবরণী থেকে জানা যায় যে হাজার প্রতি পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল 138 জন।[৫]

পণ্ডিত বিপিনবিহারী মনি কাব্যসাগর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জাগরনে নিজের সারাটা জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। 1906 সালে তিনি Vernacular Mastership Examinationপাশ করেছিলেন। বিপিনবাবু নিজ কর্মজীবন শুরু করেন 1908 খ্রী: থেকে। বিপিনবাবু জালিমপুর গ্রামের বিখ্যাত জমিদার বাড়ির জে. এম. ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষক হিসাবে কাজ করার পর একটি সরকারী প্রাইমারী স্কুলের ইন্সপেক্টর পদ গ্রহণ করেন। পরে অন্য আরেকটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। অতপর 1920-1924 খ্রী: পর্যন্ত তিনি দক্ষিণ বারাসার বিদ্যালয়ে হেড পণ্ডিতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। 1925 খ্রী. তিনি নিজগ্রাম মনিপুর বাঁশতলার একটি মধ্য ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যার উদ্দেশ্য ছিল স্বজাতিকে শিক্ষিত ও আধুনিক মনস্ক করে গড়ে তোলা। এসময় নিজে আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ার সত্ত্বেও বিদ্যালয় স্থাপনের তাগিদে বহু নিকটবর্তী গ্রাম পরিভ্রমন করে তিনি অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন।[৬] এক্ষেত্রে তাকে বিশেষভাবে সহযোগীতা করেছিলেন তার ভাগ্নে পণ্ডিত মানিকচন্দ্র হালদার ও ভাইপো দীনতারণ মনি। এই বিদ্যালয়ের প্রথম দিককার কৃতী ছাত্ররা ছিলেন পণ্ডিত গৌরহরি বিদ্যাবিনোদ, পণ্ডিত হরিপদ গায়েন, পণ্ডিত দিগম্বর সহিত্যরত্ন, মুরতী মোহন নস্কর, রতনচন্দ্র সরদার, কাশীনাথ মণ্ডল প্রমুখ। সুতরাং এই বিদ্যালয়ের প্রথমযুগর ছাত্রদের সাফল্যের ভিত্তিতে এক বলা চলে যে বিপিনবাবু নিজ জাতিকে শিক্ষিত ও আধুনিক মনস্ক করে গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন সেক্ষেত্রে তিনি অনেকটাই সফল হয়েছিলেন। 1936 খ্রী. মনিপুর বাঁশতলা গ্রামে সরকারী সহযোগিতায় বিপিনবাবু শিক্ষা দীক্ষায় পিছিয়ে থাকা পৌণ্ড্রজাতি যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে প্রতিষ্ঠা করেন নৈশ বিদ্যালয় যেখানে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির বয়ষ্ক ছাত্ররা ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষালাভের সুযোগ পায়।

রাইচরণ সরদার ছিলেন পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয় সমাজের প্রথম গ্র্যাজুয়েট ও প্রথম বি. এল.। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে শিক্ষার জোয়ার এনে তাকে আধুনিক ও সাংস্কৃতিক মনস্কা করার প্রথম প্রয়াস নিয়েছিলেন এই রাইচরণ সরদার। রাইচরণ সরদার ছিলেন শিক্ষিত ও আধুনিক মনস্ক পরিবারের সন্তান। মাত্র ১২ বছর বয়সে রাইচরণ সরদার নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং 1895 খ্রী. নানান প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ভর্ত্তি হন কলকাতার আর্য মিশন ইনস্টিটিউশনে এবং এম. এ. পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়শুনার বন্দ্যোবস্ত করে দেন এক স্বহৃদয় ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ তাকে শোভাবাজারের রাজা বিনয় কৃষ্ণদেব বাহাদুরের বাসভবনে 'বোনেজেলেন্ট সমিতি' থেকে বহু বইপত্রের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। 1900 খ্রী. মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে বি.এ. পাশ করেন রাইচরণ সরদার।

পৌণ্ড্রজাতির জাগরণে ও শিক্ষাচেতন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাইচরণ সরদার তার গ্রামে একটি বিদ্যালয় এবং এক নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৯০৯ খ্রী. মধুসূদন সরদার, নন্দলাল মণ্ডল, রামচারণ নস্কর প্রমুখের সহযোগীতায় গড়ে তোলেন 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমিতি।[৭]

1910 খ্রী. 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় বান্ধব' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন ডয়মণ্ডহারবার থেকে। তিনি আলোচ্য সময়ে আরও পাঁচটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী কালীচরণ বাবু তারই অনুপ্রেরনায় তিনশবিঘা জমিতে ছাত্রাবাসসহ একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। রাইচরণ সরদারের অন্যতম কীর্তি হল মন্দিরবাজারের জগদীশপুর গ্রামে সিতিকণ্ঠ ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা। 1919 খ্রী. আমহার্স্ট স্ট্রীটে প্রতিষ্ঠা করেন 'আর্যপৌণ্ড্রক ব্রহ্মাচর্য আশ্রম' নামক একটি ছাত্রাবাস।[৮] পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আর্থিক ও হার্দিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বেণীমাধবদেব হালদার ছিলেন অসাধারণ চারিত্রিক মাধুর্যের মানুষ। তার প্রতিষ্ঠিত 'জাতি বিবেক', 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় পরিচয়', 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমিতি', পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে শিক্ষার জাগরণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। স্কুল শিক্ষা শেষ করে কলকাতার একটি স্কুলে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তার কর্মজীবনের সূত্রপাত। পরে তিনি উলুবেড়িয়া ও রঙ্গীলাবাদ বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিতের দায়িত্ব পালন করেন। মাঝে বলাগড়িয়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে বদলি হন। শেষে হাতুড়ি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে (প্রায় 34 বছর শিক্ষকতার পর) তার দীর্ঘ কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শ্রমন্ত কাব্যতীর্থ সিদ্ধান্ত বাগীশ ছিলেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রথম এন্ট্রান্স পাশ ব্যক্তি। জাতিবিবেক, জাতি চন্দ্রিকা, ব্রাত্যক্ষত্রিয় পরিচয় প্রণয়ন করে স্বজাতির গৌরব অন্বেষনের চেষ্টা করেন তেমনি সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে পৌণ্ড্রসমাজের সার্বিক উন্নয়নে উদ্যোগী হন।

পৌণ্ড্রজাতির শিক্ষার চেতনা বৃদ্ধিতে মহেন্দ্রনাথ করণের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখ্য। অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদান হল 'খেজুরি সাধারণ পাঠাগার' প্রতিষ্ঠা। তিনি বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন যেমন- A short History and Ethnology of the Cultivating Pods, খেজুরী বন্দর, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ। গ্রন্থগুলি পৌণ্ড্র সমাজের শিক্ষার জাগরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

রাজেন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন বাংলাদেশের খুলনা জেলার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রথম গ্র্যাজুয়েট। 1922 খ্রী. রাজেন্দ্রনাথ সরকার গঠন করেন 'খুলনা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ছাত্রসংঘ'। তিনি ছিলেন এই সমিতির সম্পাদক। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে শিক্ষা, কুসংস্কার দুরীকরণ, সংহতি জনসেবা এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এই ছাত্রসংঘ। 1926 খ্রী. রাজেন্দ্রনাথ সরকার ভবানীপুর সাউথ সুবারবন স্কুলে প্রতিষ্ঠা করেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ছাত্র-যুব পরিষদ। খুলনাজেলা বোডের প্রতিনিধি থাকাবস্থায় তিনি আরো পাঁচটি প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

গৌমোহন মণ্ডল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে শিক্ষার জাগরণে ও বিকাশে আরেক উল্লেখযোগ্য নাম। গৌরমোহন মণ্ডল ব্যক্তিজীবনে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে উপযুক্ত ও উন্নতমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব আছে। ঘাটেশ্বর বিশ্বাস পরিবারের সহযোগীতায় এবং গৌরমোহন মণ্ডলের প্রেরণায় ও উৎসাহে 'ঘাটেশ্বর বিজয় কিষেণ বিদ্যামন্দির'। জীবনে তিনি একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন এবং কলেজ প্রতিষ্ঠার

জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। জীবনদশায় না হলেও তার তিরোধানের স্বল্পকালের মধ্যেই বীরেশ্বরপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় গৌরমোহন শচীন মণ্ডল মহাবিদ্যালয় (১৯৬৮)।[৯]

ধ্রুবচাঁদ হালদার পেশায় ছিলেন একজন ডাক্তার। মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যায়ণ আরম্ভ করেন। 1924 সাল থেকে। ডাক্তারী পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোডে 'হালদার ফার্মেসী' খুলে চিকিৎসা শুরু করেন। প্রবল শিক্ষানুরাগী ড. হালদার সুধাংশুশেখর গায়েনের অনুরোধ ও অনুপ্রেরণায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশে, উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তৎউপলক্ষে একলক্ষ টাকা দান করেন।[১০] স্বাধীনতার পর 1965 খ্রী. প্রতিষ্ঠিত হয় ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ। কলেজটি পিছিয়ে পড়া পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার অগ্রগতিতে আজও বিরাট অবদান রেখে চলেছে।

ভূষণচন্দ্র নস্কর M.Sc. ডিগ্রী লাভ করে সমাজসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে। তারই চেষ্টায় জগদীশপুরের সিতিকণ্ঠ ইনস্টিটিউশনের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। অক্ষয়কুমার কয়াল ছিলেন একজন পুঁথি প্রত্নপণ্ডিত। প্রায় তিন হাজার পুঁথি তার সংগ্রহে ছিল। যার মধ্যে দেড়হাজার পুঁথি দান করেন বিশ্বভারতী সংগ্রহশালায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বর্ধমান সাহিত্যসভা লাইব্রেরীতেও বহু পুঁথি সংরক্ষিত আছে। অক্ষয়কুমার কয়ালের গবেষণামূলক গ্রন্থ 'পট ও পটুয়া' থেকে তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় মেলে। অনুকূলচন্দ্র দাস B.A., B.L. ও M.A. পাশ করেন। এরা সকলেই শিক্ষানুরাগী এবং পশ্চাৎপদ পৌণ্ড্রসমাজের শিক্ষা চেতনার জাগরণে বিশেষ উদ্যোগী। এদের প্রচেষ্টায় বাংলার পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয় সমাজে শিক্ষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ জাগ্রত হয়েছিল।

তথ্যসূত্র:

১. শ্যামল কুমার প্রামানিক, পুণ্ড্রদেশ ও জাতির ইতিহাস, কলকাতা ২০১০, পৃ-৩৩।
২. পৃ-২৯
৩. সুকুমার দাস, উত্তরবঙ্গে ইতিহাস, পৃ-৬৫
৪. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব, কলকাতা, ১৪১৪য
৫. শ্যামল কুমার প্রামানিক, পুণ্ড্রদেশ ও জাতির ইতিহাস, কলকাত ২০১০, পৃ-১৯২
৬. তদেব, পৃ-১৬৭
৭. ধূর্জটি নস্কর, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কলতিলক, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ। দ: ২৪ পরগনা, ২০০৮, পৃ-৪৭
৮. শ্যামল কুমার প্রামানিক, পুণ্ড্রদেশ ও জাতির ইতিহাস, কলকাতা, ২০১০, পৃ-১৭৫
৯. তদেব, পৃ-২৬৯
১০. ধূর্জটি নস্কর, প্রাগুক্ত, পৃ-৭২

Yoga and Positive Psychology - a personal experience

Shaona Sengupta
Assistant Professor, Dept. of Psychology
Dr. A. P. J. Abdul Kalam Government College

Abstract: Yoga is a spiritual discipline which is based on subtle science. It focuses on the balance between mind and body.Positive Psychology is the scientific study of what makes life most worth living or the scientific study of positive human functioning and flourishing on multiple levels that include the biological, personal, relational, institutional, cultural and global dimensions of life. My introduction to principles of Positive Psychology and Yoga, has changed my perception and way of life. I have grown a sense of gratefulness towards my life and it has become easy to accept my strengths and shortcomings. It is a personal journey of few years where I have felt changes within me both physically and mentally.
Keywords: Positive Psychology, Yoga, Autoethnography.

Discussion:

Yoga is a spiritual discipline which is based on subtle science. It focuses on the balance between mind and body. It is an art and science of healthy living. Yoga uplifts the consciousness to a higher level and helps connect with the Divine.(1) It is a way of life and it helps us to get connected to our inner self and also with outer world at large.

Positive Psychology is the scientific study of what makes life most worth living or the scientific study of positive human functioning and flourishing on multiple levels that include the biological, personal, relational, institutional, cultural and global dimensions of life.(2) According to Martin Seligman, the five core elements of Positive Psychology are Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaning in life and Accomplishments. (3)It is a holistic approach to life and focuses on strength building, ability enhancement and engagement in a meaningful and happy life. It emphasizes the need for positive subjective

experience, positive individual characteristics and positive social organization and communities.

Both yoga and positive psychology, takes a holistic approach and focuses on the relationship between body and mind. They focus on the process of building strengths and inner happiness and wellbeing. They talk about our connection with society and the environment around. As our growth and accomplishments are not individualistic in nature, they are related to our wellbeing and our relationship with others.

Yogic tradition advocates about various practices which help us to lead a disciplined life and move towards self-actualization like Yama (moral code), Niyama (self-discipline), Asanas (postures or poses), Pranayama (mindfulness of breathing), Pratyahara (detachment from senses), Dharana (concentration), Dhyanna (meditation or positive, mindful focus on the present), Savasana (state of rest) and Samadhi (ecstasy). (4) So does Positive Psychology, with the concepts like self-control, self-discipline and self-awareness and could be viewed as related to the positive psychology concept of flow, i.e., of being entirely engaged and involved in the moment.(5)Practices like mindfulness (Positive Psychology) and meditation (Yoga) promote both physical and psychological wellbeing, thus leading to a path of positive emotions and achievements.Ashtanga yoga not only purifies the mind, but also helps in experiencing the state of deepest absorption or samadhi.Use of mindfulness in yoga helps to be fully present in "what is," instead of "what should be." This allows the practice of Yoga to be fluid, respectful and non-violent, as it nurtures well-being in the practitioner.

During yoga practice, individuals are able to increase awareness and attention (6), it leads to an increase in empathy and to connect awareness with higher levels of compassion, gratitude, and respect toward both human and nonhuman relationships, ideas and beliefs (7). Similarly positive psychology, with focus on increase in mindfulness helps to enhance wellbeing and awareness of self and environment, along with disciplining the mind and emotions (8).

According to Ken Wilber the notion of Panchakoshain yogic literature is actually the different layers mind. He points out that different therapies arising from different schools of psychology are actually

efficient in treating at some level of mind or some level of kosha. Yoga, being holistic in nature, offers a comprehensive means to enhance the Psychology of wellbeing, by achieving mastery at all levels of human personality. (9)

So yoga and positive Psychology walks in similar paths, carving the road of wellbeing and happiness for human beings. They emphasize the need of discipline in body and mind and also the importance of emotions, relationships and forming connection between the inner soul and the outer world or the greater unified soul.

Me being a student of clinical psychology, was fascinated by the functions and most importantly the malfunctions of mind. The underlying factors that operate to produce hallucinations or delusions or compulsive acts or depressive cognitions have always attracted my attention. However my introduction to Positive Psychology had opened a new door, where I found people focussing on the normal functions of the mind and emphasizing on ways to enhance them. So this branch of Psychology was dealing with the adaptivethinking, feeling and behaviour. I found Positive Psychology entrancing and wanted to know more about it. It stressed upon positive subjective experience as well as positive collective experience as a community or organization. It further emphasized on emotions and relationships. The core concepts of resilience, mental flow, authentic happiness, gratitude and self-efficacy made it more relatable with our daily experiences. These are the qualities that help us to deal with our daily life hassles. It is not the disordered state that bothers us on daily basis (unless we are suffering from one), it is the hurdles of daily life that we find difficult to deal with. However if we can follow the core concepts and can strengthen ourselves accordingly, it becomes easier to deal with the daily challenges. At times when we have low mood due to the feeling of unworthiness (not a diagnosed depression), then our strength of self-efficacy, our power of resilience, our sense of gratitude might help us to fight back and finally find authentic happiness. My understanding of Positive Psychology led me to introduce it to my life. I had both explicit and implicit learning about the way of life, Positive Psychology was advocating. I started practising ‘gratitude visit’ which gave me hope and happiness as I could see beyond my problems. I started

to focus more on the positive aspects of relationships. My acceptance increased towards the not so easy and maladaptive behaviours of people around me. My acceptance of my short comings had helped in dealing with low self-esteem and also find scope for improvement. I started to give more importance to the positive experiences I had throughout each day, rather than focussing on the distresses, which I used to do earlier. The learnings of positive psychology, gave me scope in improve my happiness and my strengths.

I was introduced to Ashtangayoga about a year and a half ago. Initially it was an alternative form of exercise to me, to deal with my health issues. However as my practice of yoga continued I gradually experienced changes not only in my body but also mentally. The changes were slow and gradual. I found that I was more relaxed and had more clarity in my thoughts. My concentration ability which was lower after my depressive episode was improving gradually. My perception about life was changing as I was able to connect to things beyond me. I slowly learnt the art of letting go and experience emotions in its true form. My body started responding in a calmer and relaxed way when faced stressful situations. My travel to mountains made me realize the difference, as hiking was a lot easier than my earlier trips.So my body and mind started to respond in ways which were new to me. I started to lead a disciplined life (in comparison to my pervious erratic schedules), so I practiced Niyama, Asanasand Pranayama, this improved my Dharanaand Dhyanna. My perceptiveness about life experiences changed as I felt more grateful and started to become less judgemental about my emotions and was more open to my abilities and shortcomings. But there are days when I find it difficult to fight back and I lose my path. I feel weak and lack my strengths. But my resilience to overcome these days have improved. I keep choosing the path of indiscipline now and then, but I try hard to go back and have control over my senses. I have found a way to look up to and move forward, even if I lose my path and run out of practice, I know what my goal is and in which direction I need to move.

REFERENCE:

1. Lakshmi, R. R. R., Oinam, E., &Gazalaxmi Devi, K. (2023). Yogic Spirituality and Positive Psychology vis-à-vis the Mental Health of Adolescents During COVID-19. *Pastoral Psychology*, 1-7.
2. Seligman, M. E., &Csikszentmihalyi, M. (2000). *Positive psychology: An introduction* (Vol. 55, No. 1, p. 5). American Psychological Association.
3. Seligman, M. E. (2002). Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. Handbook of positive psychology, 2(2002), 3-12.
4. Bhavanani, A.B., 2011. Understanding the science of yoga. Int. Yoga Scientif. J. SENSE 1, 334e344
5. Ivtzan, I., &Papantoniou, A. (2014). Yoga meets positive psychology: Examining the integration of hedonic (gratitude) and eudaimonic (meaning) wellbeing in relation to the extent of yoga practice. *Journal of bodywork and movement therapies*, *18*(2), 183-189.
6. Germer, C.K., Siegel, R.D., Fulton, P.R., 2005. Mindfulness and Psychotherapy. The Guilford Press, New York.
7. Radford, M.A., 2000. Turning the heart inside-out: the vision of reality according to Kashmir aivism and Vajrayana. Human. Soc. Sci. 61 (5-A), 1899.
8. Levine, M., 2000. The Positive Psychology of Buddhism and Yoga: Paths to a Mature Happiness. Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ.
9. Salagame, K. K. (2014). Positive psychology and Indian psychology: Birds of the same feather. Psychological Studies, 59(2), 116-118.

UNVEILED VOICES OF WOMEN : THE EVOLUTION OF WOMEN'S RIGHT IN COLONIAL BENGAL

Rudrani Bhattacharya
Assistant Professor, Department of History
A B N Seal College (Govt.)
Cooch Behar, West Bengal

Abstract: The debate over the remarriage of widows serves as an appropriate entry-pointto the women's question which agitated the public mind in the nineteenth century and the early part of twentieth-century Bengal. In colonial Bengal,the dedicated efforts of Raja Ram Mohan Roy, Iswar Chandra Vidyasagar, Keshub Chandra Sen, etc. raised awareness among the womenfolk. The emergence of upper-class Hindu Brahmo women from the seclusion of the antahpur or zenana necessitated the mediation of their male patrons in the design of a new lifestyle and new image of womanhood envisaged by the reformers of nineteenth and early part of twentieth-century Bengal. But only a small elite group of women actually could break away the chains from the traditional life patterns to take advantage of the new opportunities that were made open to them. The majority of them, however, guided by the values, attitudes, and practices they had internalized, continued to accept the conventional pattern of life and behavior for Hindu women. However, the reversal of the liberal movement for the upliftment could neither go back into the purdah nor commit themselves totally to domestic roles. They were also unable to give up theirautonomy, the taste of which they had already enjoyed. As a result, these women became increasingly conscious of their rights. These women received some educationthat they were ready to accept new ideas, began to express their opinions, develop some degree of personal autonomy and individuality, and that they began to participate in social, political, and economic activities, which undoubtedly shows that they were exposed to the process of modernization, irrespective of its degree. With this background here is ahumble attempt to study some issues of women who spoke about themselves and showed examples of

how their effective attempt to protest against the age-long beliefs and customs suppressing the status and dignity of a woman.

Keywords: *Purdah, Bhadramahila, Bhadralok, Antahpur, Zenana.*

In the late 1800s, changes began to occur within the purdah system. However, these changes predominantly aligned with the process of embracing Western practices, which was linked to increased social standing during British governance. Among the bhadramahila, particularly those belonging to groups such as Christian and Brahmo women, the most progressive individuals sought to completely abandon purdah as a means of affirming their unique group identities.A combination of external pressure and responses from Bengali society brought about changes in *purdah.* During the nineteenth century, the pattern of women's lives began to change. In reality, the concept of the 'perfect wife' was being redefined. First, there were modifications in the appropriate activities for a female at different stages of her life. Second, the appropriate arena for female action was expanded. And third, there was a new and growing approval of individualism. As a consequence of changes set in motion by the British conquest of India, by the end of the nineteenth century,several women were educated, articulate, mobile, and In the late 1800s, changes began to occur within the purdah system. However, these changes predominantly aligned with the process of embracing Western practices, which was linked to increased social standing during British governance. Among the bhadramahila, particularly those belonging to groups such as Christian and Brahmo women, the most progressive individuals sought to completely abandon purdah as a means of affirming their unique group identities. Increasingly involved in public activities. In the rural setting, life was dominated by the householdfor both men and women. As families moved from their village homes to the cities, they increased their contact with "foreigners" and witnessed the erosion of traditional household activity. Like boys of an earlier generation, some of these girls attended educational institutions, social gatherings unrelated to family affairs, and new religious ceremonies. These "new women", as they were called, were part of a modernizing movement that sought to modify gender relations in the

direction of greater equality between men and women. The awareness of high-caste or higher-class women who were oppressed resulted in various groups making efforts to redefine the role of women in the family, community, and the broader domains of public and political engagement. Although the issues of early marriage or widowhood primarily affected privileged women, the endeavour to redefine their position held significance for women as a whole. The politicians and social reformers had expected that the example of elite women, either in breaking away or in adopting new roles would filter down and be emulated by women of other castes and classes (Jha and Pujari 1996, 15-16). But only a small elite group of women broke away from the traditional life pattern to take advantage of the new opportunities that were being made available to them. The majority of them, however, guided by the values, attitudes, and practices they had internalized, continued to accept the conventional pattern of life and behaviour for Hindu women. The important fact is not in the number of women who deviated from the norm, but that the alternative was acceptable to society, particularly among the upper echelons.

Despite many hazards, travel was advocated as a way of broadening the mind beyond a narrow provincial outlook. It was regarded as an educational experience providing a means of learning about other regions and customs. Travel gave women a much wider sphere of interest, as well as an opportunity to observe the living conditions of women in other regions and to compare them with their own. In the face of increasing modernization among the “progressive” section of educated Bengali women, traditional values were crumbling. Bengali women who were, only a decade ago, expected not to leave their husband’s homes for any place other than their paternal homes, started to go abroad in the late 1860s. This first happened in 1869, when Govinda Chandra Dutt, a native Christian of a conservative, but well-known Hindu family of Calcutta, took his wife and two daughters to Europe (Bamabodhini 1869, 400-02). Brahmo women were among the first to realize the educational benefits of travel. In 1871, SoudaminiMazumder, and MahamayaBasu visited North West and Western India. Towards the end of the nineteenth century the puja holiday of 1900 which she looked forward to as an escape from

the normal conventions of the '*antahpur*' (Roy 1900, 3,9). Only a very few *'bhadramahila'* was able to travel beyond Indian borders, but this minority had significance beyond its number. While SatyandraNath Tagore was a student in London in 1863, he had hoped that his wife Jnanadanandini would be the one to take that 'first great step'. He had written, asking his father's permission to let her go to England, but DebendraNath (his father) refused to permitit on that occasion. However, Satyandranath eventually succeeded in taking her out of the *antahpur* and away with him when he returned to India as an I.C.S. officer. He also fulfilled his dream of sending her to England. In 1877 Jnanadanandini went to England with her three children. Her stay in England seems to have been of less benefit to her countrywomen than Satyandranath had hoped earlier. After her return, her main innovation was to introduce the celebration of 'birthday parties in the Tagore family and other Brahmo homes. Jnanada's visit was not as controversial as that of Rajkumari Banerjee in1871. The ground had already been broken, so orthodox indignation over the issue may have been dissipated. However, her freedom to go to England showed that within the Tagore family the strict purdah enforced by Debendranath in the early 1860s had been substantially modified (Sarala Devi 1975, 49-53). The examples of women visiting Europe were not limited to the Brahmos and Christians alone. Traditional Hindu women too followed. A striking example was that of W.C.Banerjee's wife Hemangini Debi, who went to England and later turned into an 'accomplished' lady (Sanyal 1889, 24). A small but growing number of Bengali women continued to visit England for studies as well as for social purposes. The expense of such a journey restricted it to the wealthy *bhadralok* elite. Suniti Devi first visited England with her husband in 1887. Ramesh Chandra Dutta's wife accompanied him to England in 1886. Through travel, they gained a broader experience of life and enhanced confidence in their ability to deal with the world outside the "*antahpur*". On the level of ideals, travel to other regions and other countries gave *bhadramahila* a wider perspective on their own lives by fostering a consciousness of nationhood and exposing them to alternative ways of life in which purdah was less central.

The socio-political consciousness of this century prepared the massesto think seriously and effectively bout the emancipation of Indian women from their social bondages. The life of Hindu women was influenced decisively by early marriage,austerity,and widowhood. Although these issues were an immediate concern to elite women, the deal and its consequences were of importance to the women's community as a whole. Women were made aware of the possibility of a different structure and pattern of life which could be equally sanctioned by the *smritis*in their personal life. The new women, educated and politically active, would demonstrate to the Indian western public that new and alternative role models were an acceptable form of activity for respectable women. Women the world over constitute a vast potential human resource. A conservative attitude prefers to draw a dividing line between the interests and occupation of the man and the women- but what the women can effectively do at home, given the opportunity they can also suitably do for the community. "Emancipation of Women" the term may seem now somewhat anachronistic, but this emancipation has come only after long years of bitter struggle. The middle-class women, comprising a good population of the society have stepped out of their privacy and got into the fray of public competition for wage earning. This indeed is a new phenomenon and middle-class women have changed the social pattern of modern India. Most women, modern, medieval or ancient, s the case may be, look for a comfortable home, a living, devoted husband, and a few children tottering around the little snug nest that she builds for herself. But women's lib does not connote it. She wants to be recognized as a fullbeing, intellectually emotionally, and culturally. If there is any challenge from the modern woman, from the woman of today, it is this, a challenge for recognition. If the wife is cognized as 'the wife' certainly there is no problem from the man's fair partner. If she is relegated to the status of a second-class citizen in the household, she revolts, she cries for legal separation living. Her challenge to modern society has been that of her unique status in the household and her social status as a working partner in the social surroundings. Where she works and when she works, she works independently of her husband and she looks for the recognition of her status, as much, as in her sphere of work

in a bigger social context. All the difference that is there between her and her older counterpart is that the granny could give undivided attention to the family whereas the modern woman has her attention divided between the home and the place of work, along with a different world attached to it.(Dasgupta 1978, 86) Changes in the domestic and political spheres were closely connected with the spread of female formal education. Political participation by women, reforms in berthing, and changing marital relations resulted in the implications of *purdah* being re-negotiated to give women more control over their lives. Education was not always a pre-condition for these developments, but it enabled women to gain self-confidence and argue their case against male opposition which until then had profited from being moreeloquent and better informed. They were slowly but surely overcome by a sense of dissatisfaction relating to the fulfilment of their own lives within the context of the zenana or the family. Once they had some education, they could no longer think in the same way as the women of the preceding generation. Moreover, the ones who had tasted life outside the zenana found it impossible to shut themselves again inside it. They, therefore, started to look beyond domestic chores for the realization of their hopes and aspirations. They for the first time came to nurture the idea that like all men women were also born free and equal and that it was a traditional male-defined society that had kept them chained. Indeed, they not only conceived of women's rights but soon developed their concept of freedom as well. Educated young daughter-in-law had a stronger leg to stand on against their mother-in-law and others of their in-law's families, which explains resistance by older women to formalized female education.

Bengali women's concept of freedom or emancipation is rather a modern phenomenon. Although they were totally secluded and even abused, early nineteenth-century sources suggest that they were quite content with their position in the family as well as in society. Possibly the example of European women and the teaching of the modernized Bengali young men made them conscious of the world outside the four walls of their zenana and of the minimum social and legal rights they were entitled to as human beings. The first woman who indicated women's

rights was Kailasbasini Debi. In her two books on the degraded social position of Bengali women and on female education, she claimed that God had created men and women as equal and that men had put women in chains. She further claimed that it was to perpetuate women's slavery that men kept them uneducated(Kailasbasini 1865,11-12). In this way Sarada Debi also argued, she says, 'men regarded women as low as animals. Men, she claimed, believed that women would become unchaste and consequently bring disgrace on their families unless they were kept in a cage.' She called this contention baseless and ridiculous and demanded that women should be given their rightful position in society(Sarada 1866, 9-10). Many women accused men of being responsible for the deterioration of women's social status through their speeches and writings women emerged among the womenfolk against the institutionalized oppression of their sex and they claim equal status, rights, and power as to men (Bharati 1997.204).

Nevertheless, one must not overlook the tremendous changes in women's perceptions that occurred during this period. They did step out from the cloisters of their homes into the male preserve of politics and power. The ethos of housework as a woman's only work and wifehood/motherhood as the supreme fulfilment of her life underwent an alteration since it was proclaimed that women also had important obligations to the motherland, outside the parameter of the home. Moreover, the age-old notion of women's total inferiority to men began to be slowly eroded. Women had proved that they were capable of fighting alongside men. While the political struggle was on, women leaders as well as the rank and file political workers became increasingly aware of their disabilities as women and were eager to be free from them. K.N. Panikkar, observes, that because of women's involvement in social and political areas,'women did become increasingly conscious of their subordination and attempted to liberate themselves from the patriarchal ideology which they had internalized through the exclusive domestic experience of sexual and nurturing functions'(Panikkar 1987, 7). As noted earlier, the awareness produced by the anti-colonial struggle was reflected in the world of women. Perception of the need to organize emerged, and this was reflected in the creation of women's associations.

In the nineteenth century, men organized women's associations on their behalf. Only one or two women, like Swarna Kumari Debi of Calcutta and Pandita Ramabai of Poona, had initiated a women's association. Sakhi Samity was established in 1885 and Sharda Sadan in1892. The women's movement in India was both a necessary antecedent and a consequence of the changing social and political environment. Educational and social reforms for women formed an integral part of modernizing the country and society. Women organized themselves in a variety of ways to improve their position within Hindu society. As the freedom movement progressed, and women participated in it, they thought of organizing their network. From the early twentieth century, women political leaders determinedly attempted this task. They received an increasing response from other women, who were becoming progressively aware of the devaluation of women in society. Most of these organizations were concerned primarily with issues of gender. The pioneering women's organization at the all-India level, the Bharat Stri Mahamandal (All India Women's Organization) was initiated in 1910 by Sarala Debi Choudhurani. It was the first organization run by women to be committed to augmenting women's power. To achieve this objective, the Bharat Stri Mahamandal attempted to establish links between women intellectuals and activists. It strove to spread education among women and to fight against the institutions of *purdah* and child marriage. The Bengal branch was looked after by Krishnabhabani Das. While Sarala Debi was away in Lahore, in fact, socially speaking, the women were becoming more and more active and at the same time were enlarging the sphere of their activities. They realized that they certainly had some roles to play outside the sphere of their families, without which their lives would remain unfulfilled. It was at this stage that some women were politicized. This first began during the Ilbert Bill agitation in 1883. For the more sensitive women, however, participation in the freedom movement meant a protracted struggle against two deferent badges of servility: colonialism and patriarchy.

During the late nineteenth century,some women questioned the validity of the popular belief that breaking seclusion or talking to men would mean that women would become unchaste. They claimed that it

was a baseless allegation. They pointed out, that even though European women did not abide by the custom of female seclusion, not all of them were unchaste. Krishnabhabini Das, who lived for quite a few years in England, moreover,claimed that most Englishwomen could truly be called chaste. She argued in favour of freeing women from the zenana. Krishnabhabini Das said that breaking female seclusion or allowing women to mix with men would not make them unchaste. She asked the countrymen to free their women. She then called Bengali women to rise (Krishnabhabini 1885, 152). The women who were previously at ease at the social gathering were becoming more and more comfortable in such situations. These women realized that attending such functions was one of the ways to become civilized. The modernized women argued that the upliftment of women was synonymous with civilization. However, Bengali women's concept of freedom was quite superficial in that they questioned their perpetual subordination but regarded the breaking of seclusion as their main way to freedom. The more important issues, like bearing a large number of children, endless housework from dawn to midnight, participation in social activities, and complete economic dependence on husband or other male relations, remained unquestioned until recently. However, some development in this regard took place during later decades when so men became more conscious of their economic roles. This possibly started Begum Rokeya. The question of equality, nevertheless, attracted their attention. Although most of them conceded that men and women should not be regarded as men's toys. The more "progressive" women, however, were not as apologetic. They claimed that women should be treated as equal to men in every respect and given all rights that men enjoyed. They questioned the propriety of seclusion, which had kept them behind the walls of the zenana and was immediately apparent. They also noticed the economic dependence which had kept both their body and soul in perpetual fetters. A self-consciousness and enhanced importance were imparted to traditional roles, as befitted the rising expectations of the educated women who had to fill them. They willingly accepted the burdens and responsibilities inherent in reshaping familiar roles in their gladness at being released from many of the spread of female education and of the overall social

change that was taking place in the nineteenthcentury including increased economic pressure on families, women started to accept jobs in the last two decades of that country. Especially, with the expansion of female education among women, they started to think as individuals. Their desire to enhance their well-being and their4 consciousness regarding their right to self-determination was growing as well.

In 1877 Miss ChandramukhiBasu, a pupil of the Native Christian Girl's School at Dehradun applied to the University of Calcutta for permission to appear in the Entrance Examination of the University. The pressure of D.Ganguly and others on the Government for full recognition resulted in a set of rules governing the admission of women to examination for the degree in Arts in 1878. The requirements for the Entrance Arts Examination were to be the same as for men. It was in the year 1882, that two women candidates- ChandramukhiBasu and KadambiniGanguly – passed the B.A.degree at the annual convocation of 1883. Chandramukhi went on with further study, to become the first woman M.A. in 1884 and Kadambini went on to Medical College (Ray 1955, 35). By the end of the century, twenty-seven girls had B.A. degrees. The best-educated women at this stage, the 1850s, and 1860s were the ones who had their education privately at home from either their husbands or, in some cases, from their parents. The name of Kailasbasini Debi can be mentioned here. Before her marriage, she did not know how to read or write. But, at the instance of her Brahmo husband, she learned how to read or write (Kailasbasini Debi 1863, 1-11). Similar were the cases of Kumudini, Nistarini Debi, Saudamini Debi, Jnanadanandini Debi, Swarnalata Ghosh, Hemangini Debi etc. They were all illiterate before their marriage and were educated by their husbands. Although women of Bengali *bhadralok*families had widely accepted female education by the end of the last century, their ideal of education was quite different from that of modern feminists. They still adhered to traditional values established by men and only wanted to become the kind of women that educated men were trying to find. They considered that they had no other option but to have an education and to become "modern" wives and better mothers in a male-defined world. Even during the last two decades of the nineteenth century, though a handful of women, like

Chandramukhi, KaminiSen, and Kumudini Das, had accepted salaried, Bengali women still did not contend that education would give them economic independence. It was not unique to Bengal alone. In many other countries, women wanted education with no economic objectives. Despite much opposition and problem from so many directions, women realized the value of education, and by 1880 many *bhadramahila*were literate, especially in the cities. Census figures show a steady rise in the number and percentage of female literates for Calcutta over the period 1871-1901. It pointed out that there was a gradual extension of female education during the latter half of the nineteenth century although the total percentage of the female population receiving an education was still extremely small. Raja RadhakantaDevBahadur, in his report, said- "several native girls educated by the female society were examined, whose proficiency in reading and spelling gave great pleasure." In 1842, there were fifty female schools in the different parts of Calcutta with nearly 800 pupils on their rolls. In his "StriSikshaVidhayaka", he attempted to show, that female education had been customary with the Hindus for a long time, and that even recently many Hindu females of higher classes had won much celebrity for their attainments and accomplishments. Among these, he named Rani Bhavani of Murshidabad, like other eminent scholars of the male sects she appeared at the meetings of *pundits* and discussed *Shastric* matters. He also mentioned a third Brahman lady, named Shyamasundari, who had attained great proficiency in the "*Nyaya* philosophy" (Mitra 1902, 222-223) But despite this, there was no organized movement on their part to educate the female population of Bengal and to elevate their position in the society by new enactments, like the Married Women's Property Act or divorce action. On the contrary, they still prayed to men to give them the light of learning and thereby raise them to men's level. They were quite content with and eager to receive the kind of education that men arranged for them to turn them into better wives and better mothers, or,in other words, to play their traditional roles and to be exploited as wives and mothers by men. Finally, it may be noted that female education was hardly accepted by anyone in the 1850s, even though the Bethune School was established in 1849. During the 1860s and 1870s, the number of

girls' schools and the number of girls receiving education increased. The standard of female education was still very low. However, the Brahmo women who received education either from their respective husbands or from the *zenana*education program organized by the BamabodhiniSabha attained a better standard.

After the Vedic period, unmarried women could not live in society in a respectable and socially approved way. But now women are feeling that marriage is not the only goal in life. The effect of liberal education, the value attached to the development of personality, and the urge for economic independence are some of the main causes which are responsible for generating this new outlook(Jha & Pujari 1996,246). Moreover, they had been unorthodox concerning social customs like female seclusion, female illiteracy, and early marriage. it became difficult for them to find a husband. They possibly choose to take up jobs until they were married. One might mention the name of such highly educated women in this category as Chandramukhi Bose, Kamini Sen, Kumudini Khastagir, and Sarala Debi who accepted teaching positions, and Bidhumukhi Bose and Jamini Sen who began to practice medicine. Among the above-mentioned, none of these women succeeded in finding a husband before the age of thirty. Chandramukhi was still unmarried at the age of Forty-one, while her younger sister, Bidhumukhi, who was one of the first women M B, remained so throughout her life. Kamini Sen, married when she was thirty. Her younger sister Jamini Sen remained unmarried. Hemaprabha Bose, Lajjabati Bose, Radharani Lahiri and Saralabala Ghosh also seemed to have remained unmarried. They encouraged several hundred educated women of Bengal to work by the turn of the century. The fact that now many women can afford to live an unmarried life itself proves the change that has come about both in their subjective and objective environment.Those women, who suffer from ill-treatment from husbands and their relations-in-law, are slowly becoming aware of this solution. The struggle between the daughter-in-law and mother-in-law in collaboration with the sister-in-law is the theme on which a considerable amount of vernacular literature is based. Today a new contradiction has appeared. On the one hand, ideologically the educated strata support the separate individual family while due to

economic difficulties they would like to stay in a joint family. Further middle-class women who are constrained to go out for earning face the domestic problems of looking after the child and the strains of household work. She wants to aid in this difficulty and naturally, joint family life appears as a veritable boon. Now it was revealed that though many women yet did not turn to earn still most of them felt this was a necessity. It must be noted in a society where the birth of a daughter itself was regarded as a curse, where her only activity was domestic work and childbearing. Where she was married to a stranger in whose selection, she had outgrown childhood and where her personality was tied to the apron string of somebody, she could naturally have no aim except that of marriage. But with the spread of education, the increasing opportunities opened up for economic independence and with the spread of new ideas of equality and self-respect, women for the first time are acquiring the freedom to choose their aim in life. This progressive trend may be absent in the rural setting where most of the Indian population resides. There are still millions of families where a woman does not enjoy the same freedom as a man. Even today socially a woman is merely a vehicle for the continuing of the race. The modern women are slowly breaking through the shell of a narrow domestic existence and are beginning to participate in the larger life of the nation and even humanity.

References:

1. BamabodhiniPatrika, Oct-Nov,1869, notes on Govinda Chandra Dutt, Calcutta Review, Vol CXV(1902)
2. Das Krishnabhabini, Englande Banga Mahila, S.P. Sarbadhikari, Calcutta, 1885
3. Dasgupta Manashi, etc., Role and Status of Women in Indian Society, Firma KLM Pvt. Ltd, Calcutta, 1978
4. Debi, Kailashbasini. *Hindu MahilarHinabastha*, Gupta Press, Calcutta,1863.
5. Debi Sarada, Bangadeshye Lokdiger Ki Ki Bishoye Kusanskar Achhe, Bama Bodhini Patrika, Oct-Nov, 1866
6. Debi, Sarala. *JibanerJharapata*(Bengali), Calcutta, 1975.

7. Forbes, Geraldine. *Women in Modern India*, Cambridge University Press, 1998.
8. Jha,Uma Shankar and Pujari, Premlata.(ed). *Indian Women Today*, Vol. I, Kanishka Publishers, New Delhi, 1996
9. Mitra, Subal Chandra. *Ishwar Chandra Vidyasagar, Story of His Life and Work*, Ashish Publishing House, New Delhi, 1902
10. Panikkar K N, 'Introductions', Studies in History, Vol-3, No.1,1987
11. Ray, Bharati(ed). *From the Seams of History Essays on Indian Women*, Oxford University Press, 1997
12. Ray,Chhabi. *BanglarNariAndolon* (Bengali), Calcutta, 1955.
13. Roy, Rakhal Chandra.*JibanBindu*(Bengali), Calcutta,1880.
14. Roy, Sarasibala. "*MurshidabadBhraman*", Antahpur, Chinsura, 1900.
15. Sanyal, R.G. *A General Biography of Bengal Celebrities Both Living and Dead,* Calcutta,1889

GLOBALIZATION AND THE PREPARATION OF SKILLED, QUALITY TEACHERS : NEED OF THE HOUR

Shree Chatterjee
Assistant Professor, Department of Education
Netaji Satabarshiki Mahavidyalaya

Abstract: Teachers are the architect of a nation. According to Dr. S. Radhakrishnan, "the quality of nations depends upon the quality of its citizens quality of citizens depends upon the quality of their education and the quality of their education depends on the quality of teachers." No nation can rise above the level of its teachers. Education is a key to enlighten the civilization. It is the source of the growth and development of any country's social, economic, and political institutions. Globalization is a new term that influences all aspects of society including education. No country can live in isolation without seeking impact of global trends. The age of globalization has brought in revolutionary changes before the teachers, students and society. Like all other professions, globalization is also affecting teacher education. Teacher education plays a pivotal role in constructing and reconstructing the society and determining quality of life of the nation.

Objectives:Therefore the objectives of the study are to discuss the challenges of teacher education and also focus the skills and qualities of teachers to meet the challenges of globalization.

Methodologies: In this paper researcher has attempted to focus on challenges before teachers in the era of globalization and also points out the skills & qualities that a competent teacher might have. For the purpose of the study researcher has used secondary data from internet, journals and reference book etc.

Implication: In this globalized world the young generations have to compare worldwide and the teachers having the responsibility to prepare the young generation. For that teacher's skill, quality is the key point for ensuring the quality of education. Preparing skilled, quality

teachers has become a global challenge to all nations. Therefore there is a dire need to find out the skillful and qualified teachers.

Key words: Globalization, challenges of teacher education, skilled teacher, quality teacher.

INTRODUCTION:

The contemporary era is characterized by globalization, knowledge explosion, and technological advancements, transforming the world into a global village. In this interconnected landscape, no country can exist in isolation, necessitating an embrace of global trends across all aspects of life. Education, as a pivotal tool in global development, bears significant influence in the age of knowledge explosion (Misra & Bajpai, 2011). The ongoing processes of liberalization and globalization present both opportunities and challenges, emphasizing the importance of education in the 21st century.

Amidst rapid global changes, knowledge and skills have emerged as essential elements for human development. The quality of education hinges on the competence of teachers, who play a central role in the educational process. Positioned as catalysts for change, teachers are expected to act as conservators ensuring continuity and social transformers driving individual and national progress. The National Policy on Education (1986) underscores the need for a highly educated and motivated manpower to address challenges in modernization and globalization.

In the pursuit of national progress, the education system must produce citizens equipped with global perspectives. The universal currency of quality holds paramount significance in education. The effectiveness of educational efforts relies on the competence of teachers; thus, investing in quality teacher education is imperative for the enhancement of teaching and learning.

Teacher education serves as the core of all educational disciplines, shaping prospective teachers. Teachers, considered the backbone of the education system, hold the key to transmitting knowledge, skills, and values. It is crucial to recruit capable individuals into the teaching

profession, providing them with high-quality pre-service teacher education and opportunities for continuous development.

Recognizing the influence of teachers on education, the Education Commission of India (1964-66) asserts, "No system can rise above the status of its teacher." This sentiment aligns with the Delors report (1996), emphasizing the indispensable link between teacher quality and overall education and learning outcomes. In light of these considerations, this study aims to explore the challenges in teacher education and underscore the skills and qualities necessary for teachers to navigate the demands of globalization.

GLOBALIZATION AND IMPACT OF TEACHER EDUCATION:

Globalization is the process of integrating nation-states by eliminating restrictions on the movement of material and financial resources, labor, technology, knowledge, and ideas. It involves outward-oriented policies aimed at benefiting all countries globally, fostering economic growth, prosperity, and democratic freedom. This interconnectedness spans economic, political, and cultural systems worldwide, promoting closer contact, personal exchange, mutual understanding, and the creation of a global civilization.

Education, a crucial sector in any economy, is not immune to the implications of globalization. The goal of education is overall development, enlightenment of the mind, broadening vision, and character-building for the benefit of individuals, society, and the nation. Like other professions, globalization is impacting teacher education, necessitating a paradigm shift. The teacher's role becomes pivotal in this globalized environment, requiring them to think globally and act locally in education matters.

Teacher education must adapt to the changing role of teachers, emphasizing constant upgrading and modernization of knowledge and skills. The content and methodology of teacher education need reform to incorporate various skills, qualities, and competencies, ensuring the preparation of ideal teachers. The ideal teacher in a globalized world must be an expert in a subject area and adept in using Information Technology in teaching-learning situations.

As education undergoes constant changes due to internationalization and technological advancements, teacher education should reflect this global outlook. The internationalization of higher education aligns with changes in the international system, calling for reforms in the aims of teacher education to equip young teachers to cope effectively with global challenges.

Quality and excellence are paramount in the new millennium, emphasizing the selection of the best human material and providing them with the highest quality education. Quality teacher education is crucial, focusing on competent teachers, an ideal student-teacher ratio, and adequate infrastructure. In India, despite significant expansion in higher education, the quality has deteriorated, requiring a renewed emphasis on professional preparation for teacher educators.

Maintaining quality in teacher performance depends on the professional competencies of teacher educators. Teacher education in the age of globalization needs to be innovative and future-oriented to meet evolving societal demands. Emphasis should be on building confidence through competence, interlinking theory and application, and fostering multi-skills among teachers, enabling them to use technology in teaching-learning processes and participate in creating new knowledge. Effective teacher education should prepare new teachers for the complex and demanding role of accomplished teaching, encompassing subject matter mastery and effective teaching strategies for diverse students.

Strategies for Quality Assurance in Teacher Education:

- ***Addressing Challenges and Fostering Excellence***

In the landscape of education, particularly in teacher education, ensuring quality is paramount to meet the demands of a rapidly evolving global environment. As private institutions increasingly participate in this domain, the need for robust quality assurance strategies becomes imperative. Quality in education is often described in terms of expense, goodness, beauty, truth, idealness, and, rarely, status and positional advantage.

- ***Attracting Talent***

One of the foremost challenges is attracting talented individuals to the teaching profession. Currently, there is a scarcity of merit holders opting

for teaching careers. It is crucial to appeal to self-motivated and inspired individuals who possess the qualities necessary for effective teaching.

- ***Research in Teacher Education***

The expanding scope of teacher education calls for extensive research and studies. This research should envision the role of teacher education in the context of globalization. Addressing policy issues, curriculum development, evaluation systems, and incorporating technological advancements are vital components of research in this field.

- ***Adaptability***

Teachers must be adaptable to the socio-economic and cultural diversities of students, preparing them to compete at the international level. Flexibility and cultural awareness are essential qualities to succeed in the global sphere.

- ***Use of Integrated Technology***

Incorporating technology into teaching practices is a growing challenge. Establishing effective strategies to develop teachers' skills in using technology as an instructional tool is imperative for enhancing the learning experience.

- ***Technology and Competency-Based Curriculum***

The introduction of Information and Communication Technology (ICT) in teacher education is crucial. A competency-based curriculum, emphasizing the application of knowledge through observable tasks, should guide teacher training programs.

- ***Professionalism***

Elevating the education standard necessitates teachers with a global perspective, well-prepared, provided with ongoing professional development, and appropriate support. Professionalism is key to achieving excellence in education.

- ***Improvement in the Quality of Course Content***

Revamping the teacher education curriculum to align with current needs is essential. Emphasizing practical activities, innovative teaching methods, and integrating various skills, competencies, and abilities are crucial for effective teacher training.

- ***Infrastructural Facilities***

Teacher education institutions must provide infrastructure of international standards. This includes well-equipped buildings, classrooms, laboratories, and other facilities necessary for a conducive learning environment.

- ***Admission Modalities***

Admission processes should be based on merit, either through marks obtained in qualifying examinations or entrance examinations conducted by universities or state governments. Ensuring transparency and fairness in the selection process is critical.

- ***Organization of Effective Student Support Services***

Developing effective student support services is essential to cater to the diverse needs of students. Providing counseling, mentorship, and guidance contributes to a holistic learning experience.

- ***Provision of Educational Administration***

Efficient educational administration is pivotal to achieving educational goals. Effective administrative practices ensure the smooth functioning of teacher education programs.

- ***Restructuring the Teacher Education Programme***

Categorizing teacher education into pre-primary, primary, secondary, and higher stages allows for tailored programs that meet the specific requirements of each stage. Continuity and flexibility in curriculum design are crucial considerations.

- ***Selection of Candidates for Teacher Education***

Selecting candidates based on academic qualifications, written tests, and interviews is vital. Assessing teaching aptitudes, knowledge of child psychology, and reasoning power ensures the selection of competent individuals committed to the teaching profession.

- ***Incorporation of Information Technology in Teacher Education***

Embracing e-education and integrating ICT into teacher education programs is imperative. Developing techno-pedagogical skills among trainees ensures proficiency in using technology for interactive and effective teaching-learning methods.

- ***Value-Orientation to Teacher Education***

Reorienting teacher education to incorporate values is crucial. A value-oriented system prepares teachers to respond to emerging societal needs and instills ethical values in education.

- ***Reorganization of Curriculum***

Quality teacher education demands a relevant, interdisciplinary, and up-to-date curriculum. Stressing practical activities, innovative teaching methods, and incorporating art, health, and physical education contribute to a comprehensive learning experience.

- ***Improvement in Evaluation System***

A uniform, comprehensive, and participative evaluation system is essential for assessing teacher trainees effectively. Incorporating multiple criteria and tools ensures a balanced evaluation that provides timely feedback for performance improvement.

- ***In-Service Education of Teachers***

In-service programs play a pivotal role in keeping teachers up-to-date with advancements in knowledge and teaching skills. Offering periodic refresher courses, professional enrichment, and orientation in emerging areas ensures teachers can effectively meet new challenges.

- ***Standard of Teacher Education Institutes***

Regulatory bodies like NCTE, UGC, and NAAC establish quality affiliation norms and supervisory standards for teacher education institutions. Ensuring adherence to these norms is essential to maintain and elevate the standards of teacher education.

SUGGESTION FOR QUALITY MAINTENANCE:

- There should be a unified system of teacher education in the country,
- There should be a regulatory body which must be autonomous and non discriminatory in nature.
- There should be gender equity in teacher education
- There should be continuous in-service programmes for the teachers in order to make the teachers in order to make the teachers cope with the latest development.
- The curriculum of teacher education should be prepared by NCTE for all institutions with inbuilt flexibility suiting to the regional requirements.

- There should be intensive and extensive practice teaching programs in the schools.
- There should be uniform pattern of evaluative procedure for the country.
- Computer literacy should be made compulsory for teacher educators and trainees.
- Various academic programmes should be organized for teacher education.
- The teacher educators should use the recent teaching methodology.
- Personality development and body language training programmes should be given to the student teachers.
- Teacher education should be vocationalized.
- Greater emphasis should be given on research.
- The teacher should be trained to use the technology.
- Teachers have to face the new features like accountability, performance appraisal, evaluation of teachers by the students etc.
- Teacher should have up to date knowledge, new methods, and techniques. The duty of the teacher is to work for the betterment of the society.

CONCLUSION:

Education is instrumental in addressing global challenges and maintaining peace. The rapid development of science and technology has led to inevitable global challenges, necessitating high-quality human resources. The key to ensuring education quality lies in the competence of teachers. Swami Vivekananda highlighted the importance of a teacher's character and purity of heart. A true teacher connects with students on a deep level, understanding through their eyes and ears. Teacher education faces challenges, requiring teachers to acquire professional competencies, commitment, and empowerment. The International Commission on Education for the 21st Century stresses the need to rethink teacher education, emphasizing qualities that facilitate a fresh teaching approach. In the era of knowledge explosion, teachers must continually learn, staying updated on trends, ideas, and practices to

effectively meet the advanced intellect and curiosity of modern students. Rabindranath Tagore's words emphasize the perpetual learning journey for teachers. Teacher education should be tailored to equip teachers for 21st-century challenges, ensuring they are skilled, qualified, and competent.

REFERENCE:

Bhalerao, P., Kasture, B. (2012). Globalization and Teacher Education. An International peer reviewed, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary studies.

Chaurasia, G., Roy Choudhury, N. (Eds). (2006). **Teacher Education for Twenty First**. Century Bhopal: Council for Teacher Education.

Devecioglu, Y. Kurt, I. (2013). Educating Teachers for the Global World. International Journal of Humanities and Social Science Vol, 3.N019.

Gandhe, S. K. (2005). **Globalizing Education – perception and processes**. Behar, S. C.: (Ed.).Pune Indian Institute of Education.

Kaur, S. (Oct 2010). **Edutracks**. Hyderabad: Neelkamal Publications Pvt. Ltd.

Misra, S. &Bajpai, A. (2011).Implication of Globalization on Education. Retrieved on December 15, from http://ssrn.com/abstract=1800740.

Pratham, R. (2006). ASER 2005 - Annual Status of Education Report., Pratham, New Delhi, February 2006.

Pratham, R. (2007). ASER 2006-Annual Status of Education Report., Pratham, New Delhi, January 2007.

Singh, M. S. (Ed.) (2007). **Challenges in Teacher Education**. New Delhi: Adhyayan Publishers & Distributors.

Vartak, L. R. (2004). **Role of teacher education in the context of LPG**. 24th Annual Conference on challenges of 21st century. Nashik: Y.C.M.O.U.

Women issues in the 19th century India

Abinash Sengupta
Assistant Professor, Department of History,
Kharagpur College

Abstract: Historical investigation of women's position reveals that women have always enjoyed little freedom in patriarchal social systems and are considered as second gender in the society. Gender has been central to India's experience of colonialism. A historical observation of the attempt to change the social position and status of Indian women in the 19th century reveals the influence of many reactionary ideas along with progressive forces. The 19th century witnessed the defining of the position of women in Indian society. The intention of British was to highlight the plight and depressing condition of women to justify their rule in India. Through the reform movements the colonialists aimed to civilize Indians by criticizing Indian traditions. The women's question was a struggle between the colonial state and the traditional India society. Reformers tried to eradicate the bad customs with the help of colonialists and an orthodox group of people always protest against the reforms activities. Women's freedom and emancipation were arranged within the patriarchal society. Women were a symbol of purity and the nationalist perceived Indian women as greatest means of preserving Indian heritage and cultural identity.
Key words: Reformer, Colonialist, Women, Tradition, India.

Since 18th century, Indians have developed an interrelationship with the colonial rulers to change the attitudes towards women. In the early 19th century it took a much clearer shape through several reform movements. The colonialists aimed to civilize them by criticizing Indian traditions. However, there was much debate over how the project would be implemented. The women's question was a struggle between the colonial state and the traditions of the defeated people of the country. Nationalism is not just a political struggle for power, it is associated with the political independence of the country or nation and is associated with virtually every aspect of material and spiritual life.Throughout the 19th century,

Indian social reformers and newly established organizations made efforts for legal measures and set up educational programmes to remove the evils. One of the straight consequences of British rule in India was possibly the emergence of social reform movements in the nineteenth century which were spearheaded by a freshly evolved, colonised middle class.[1] At this time, Indian reformers were in touch with the European idea of liberty and equality through the English education and this ideas extended to the women's question and converted into a social movement.[2]

Partha Chatterjee believes that India's nationalist ideology was based on two conflicting ideas, which were material and spiritual. The 19th century nationalists believed that imitation of the West in all respects was not only unnecessary but also undesirable because the East was superior to the West in the spiritual world.[3] In material life the West may be accepted but in spiritual terms it will preserve its own Eastern culture. This material and spiritual ideas can again be divided into inner and outer world and practically it was indoor and outdoor. As a result, SanatanDharma was protected in the 19th century by the protection of privacyof house to keep the patriarchal system alive. Indians never allowed colonialist to enter in the inner space that was the native's very own and woman was a necessary part of this "inside".[4]

Women were supposed to preserve indigenous culture, purity and rituals. A tendency to show the Hindu women as an ideal of morality is observed, and she is held up as one of the ideals of preserving indigenous culture by keeping her confined to the home and free from all Western influences. HimaniBannerji felt that the Bengali nationalists did not fully succeed in doing this. They partially accepted civil society and engaged in a type of politics that Gramsci called transformism, and which provided a passive movement. But they had a political achievement of their own in creating moral and cultural orders, which shaped and regulated their personal lives and asserted themselves against submission to colonial modernity and claimed cultural supremacy, albeit limited at home.[5]

The European peoples had many mysteries about Indian culture and religious practices. To characterize the country's heritage as barbaric

and depraved, colonial critics cited a long list of atrocities committed by men against Indian women.[7] The colonialists felt that India's position was lower than the higher civilizations of the world because of the miserable condition of its women.[8] A central element in the ideological justification of British rule in India was anarchy, lawlessness and a degraded native social order. They treated it as a civilizing mission. The condemnation and criticism of many of our traditional customs like child marriage, sati, the rejection of education to women, were felt to be disgraceful for our society and it pointed out by the colonialists very correctly. The first generations of the reformers were anxious to remove those traditional systems. ''Very few reformers had gone beyond the need to copy the west, and initiate to address some of the other instruments that were used to dominate and oppress women.''[9]

Utilitarian like James Mill believed that Indian women were oppressed by religion and men and women's position is rooted in religion. He wrote that women's were not considered worthy of freedom in Indian society.[10] In a male dominated society, women were forced to follow the rules and male society maintained its dominance regarding the traditional practices like child marriage, caste system, illiteracy, widowhood etc. [11] As a result, any issue of women's emancipation was a challenge to a male-dominated society and a cause for the destruction of social peace, such as the practice of sati-immolation.[12] Indian reformers also wanted to strengthen the position of women by abandoning various bad practices like Sati, child marriage etc. In the nineteenth century, all the intellectuals, social reformers, administrators, writers were aware of the importance of changing the status of women andvarious efforts were made to strengthen the position of India women. "A variety of social cultural, politico-economical revolutionary changes were brought about by the British."[13] But neither the colonists nor the Indian reformers had the means to go outside the religious traditions. Women's willingness and unwillingness did not get any value there.[14]

When the British arrived in India, the practice of sati-immolation was one of the parts of the Hindu society and culture of India. According to the European tourists, this practice was the ultimate cruel treatment of the society towards the women. Colonial ruler abolished the practice of

Sati.Feminist historian Lata Mani has shown in her research that it was the colonial discourse or precept that accepted the authority of the Brahmanical religious texts and was subservient to all Hindu texts. That system was banned as there were no instructions found in the texts in favor of sati-daha. According to Lata Mani, British feared a public outcry in abolishing it. On the one hand, they want to abolish it, on the other hand, they were very reluctant to raise their noses in the native society. Many contemporary sources reveals that, it was also a motive to get the property of the widow by the relatives of the sati.[15] Very consciously Hindus called it religious because people will follow religious instructions without hesitation.

Ram Mohan Roy's first book on sati was published in 1818 and he wrote many important essays on Sati between 1818 and 1832. Ram Mohan believed that forcing a widow to be thrown on the funeral pyre was anti-scriptural. However, according toLata Mani, Ram Mohan did not give as much importance to the brutal burning of sati as he give to the scripture in his writings for the abolishing of Sati.[16] Actually, as an argument, Ram Mohan considered the explanation of scriptures more reasonable than the humanitarian appeal to the orthodox native society. However, some of Ram Mohan's early writings were voiced humanitarian pleas and expressions for improving the status and dignity of oppressed Indian women.[17] Like Ram Mohan many nationalists supported the abolition of sati-immolation such as Mrityunjay Vidyalankar, who was a liberal reformer, opposed the burning of widows. Rather, he opined on the dignified widowhood of high caste Hindu women.[18] But in these arguments, no importance was given to women as individuals and women's views were not even taken into account in this discussion. The main focus was on tradition, not to the women.

Widow marriage was one of the most important issue in the women's liberation movement. The reformers arranged widow marriage to relieve the suffering of widows in the family. Many Indian intellectuals used the press and stage to campaign in its support. They cited the validity of scriptures in favor of widow marriage. Vidyasagar played a crucial role in this regard and his interest and efforts were equally active in ideals and practical.[19] Vidyasagar petitioned the government to legalize

thewidow remarriage. The early colonialists did not regard widow marriage as seriously as sati and they left it up to native society. Vidyasagar campaigned for the introduction of widow marriage, but many other educated Bengalis like Bhudev Banerjee opposed it. In his essays,'Samajik Prabandha', and 'ParibarikPrabandha', Bhudev opposed the widow remarriage. Many others followed Bhudev, but by introducing the law in 1856, the government convinced the public that the law was framed in accordance with the rules and regulations of the Shastras.

Bankim Chandra Chattopadhyay commented in his essay 'Samya' that widow marriage should be prevalent, but he could not accept it from the point of view of mind as stated by Professor Tapan Roy Chowdhury. His bold reaction to widow marriage was at odds with his rational mind. His personality was multifaceted. Due to the complexity of his personality, it can be said that there was a lack of continuity in his mindset. He had a strict attitude towards the discrimination between men and women till the publication of 'Samya'. But the treatment of women in Hindu society disturbed him.In this regard, he mentioned the doctrine of equality and insulted the countrymen. He also criticized Dharmashashtras and raised the question that, 'if this is Dharmashashtra, then what is non-Dharmashashtra?[20]

Bhudev Mukhopadhyay was a supporter of child marriage. Bhudev said that child marriage is not an integral part of Hinduism, and not applicable in all cases, but it is essential for India's agrarian society.[21] As an orthodox Hindu Bengali, he wanted to confine the girls to the native traditions for preserving the dignity of the house.Historian Dipesh Chakraborty talks about the concept of Lakshmi and A-Lakshmi where Lakshmi is the symbol of power and opulence and A-Lakshmi is treated as opposite of it. It was also believed that if the girls did not do the housework properly or if they did not follow the family rituals properly, the family would be destroyed, even girls thought so.[22] In traditional Hinduism, women's education was considered dangerous and immoral. There was even a superstition among women that education would bring widowhood in her life.[23] It was believed that women's education will bring them out of the home and for that reasons a paid attendant was deployed at that place. As a result, in the middle of the 19th century,

Bengali families did not able to educate the girls properly. As a result no girls were able to search a job for her and had to depend on her guardian.[24] In the late 19th century, the Ladies' Missionary Society recruited British missionary women to educate Indian women and Missionary women came forward to educate the women confined in the Zenana.[25]

Keshab Chandra Sen thought and tried best for the betterment of women. He emphasized on the necessity of women education and planned to set up an institution to eliminate their suffering. Keshab Sen was a strong critic of child marriage and polygamy. In 1862, he formed the Brahmo-Bandhu Sabha for the advancement of women, when women did not have the opportunity to socialize in male society and only a few upper class women had the opportunity to take education. Sen wrote that if women are educated, they will understand the value of truth, religion and science. As a result, India will be truly restructured.[26]

From the mid-nineteenth century, various periodicals and books began to be written in favor of women's freedom and women's education.Social scientist Partha Chatterjee has argued that one of the most important reasons for the growing demand for women's education in the nineteenth century was the educational literature and availability of Bengali sources that suitable to educate women in Bengal.[27] Many institutions were established in Bengal during this time for the purpose of women emancipation. For example, Bamabodhini Sabha was established in 1863 under the leadership of Umesh Chandra Dutta and Vijay Krishna Goswami of BrahmoSamaj. [28] By the end of the 19th century, Bengali had started to publish many magazines that featured women-centric issues.

Indians did not want toenter modern western consciousness in their society. Because old values, patterns of caste discrimination were collapsing one by one under the influence of Western ideas. They wanted to maintain the old religious practices, the influence of Brahmanical religion. As a result, the position of women was subordinate. Various social practices and religious traditions have always degraded women and forced them to be subordinate to men in all matters. So women were not aware of their freedom due to illiteracy, ignorance and economic

subjugation. The colonial rulers, representatives of progressive Indians, thought enough to emancipate Indian women, but they could not completely oppose the anti-reformers. Women had to adhere to the boundary line between home and outside while participating in the mass movement. Efforts to improve the status of women were also so weak till the middle of the 20th century.

References:

1. Guha, A. (2016). The ‘Masculine’ Female: The Rise of Women Doctors in Colonial India, c. 1870- 1940.*Social Scientist*, 44(6), 49.
2. Pande, R.(2018) The History of Feminism and Doing Gender in India. *EstudosFeministas,* 26(3) 1-17
3. Chatterjee, P.(1989) Colonialism, Nationalism, and Colonialized Women: The Contest in India. *American Ethnologist,* 16(4), 623-625
4. Ibid., 623-625
5. Bannerji, H. (2000) Projects of Hegemony: Towards a Critique of Subaltern Studies Resolution of the Women’s Question.*Economic and Political Weekly*, 35(11), 910
6. Said, E. (1979)*Orientalism*. New York: Vintage Books, 1979, 78
7. Chatterjee, P. (1989) Colonialism, Nationalism, and Colonialized Women: The Contest in India. *American Ethnologist,* 16(4), 622
8. Chakrabarty, D. (1993)The Difference: Deferral of (A) Colonial Modernity: Public Debates on Domesticity in British Bengal.*History Work Shop, Oxford Journal*, *Colonial and Post-Colonial History* (Autumn) 36,54
9. Mazumdar, V. (2009). Emergence of the women’s question in India and the role of women’s studies. *Centre for Women's Development Studies,*1https://www.cwds.ac.in › uploads › 2016/09)
10. Chatterjee, P. (1989): 622-623
11. Sangari, K and Vaid, S. (ed). (1989)*Recasting Women: Essays in Indian Colonial History*.New Delhi: Kali for Women, 118

12. Mani, L. (1987) Contentious Tradition, The Debate on Sati in Colonial India.*Cultural Critique*, *The Nature and Context of Minority Discourse II* (Autumn) 7, 2

13. Sharma, P. (1980). Status of Women in India: An Annotated bibliography. A Dissertation. Aligarh:AligarhMuslim University. (https://core.ac.uk/download/pdf/144520591.pdf)

14. Banerjee, S. (2006). *Palashi to Partition*, New Delhi: Orient Longman, 2006, 190

15. Mani, L. (1987):125

16. Ibid: 136

17. Sarkar, S. (2000). Orientalism revisited: Saidian Frameworks in the Writing of modern Indian history, In Chaturvedi, V (Ed.)*Mapping Subaltern studies and the Post-Colonial*(P.248). New York: Verso.

18. Bagchi, J. (1993).Socialising the Girl Child in Colonial Bengal. *EPW*, (28) 41, 214

19. Tripathi, A. (1998). *Vidyasagar: The Traditional Modernizer.* Calcutta: Punascha, 85

20. Roy Chowdhury, T. (1995).*Europe Punardarshan.* Kolkata: Ananda, 131

21. Roy Chowdhury, T. (1995), 131

22. Chakrabarty, D. (1993), 61

23. Forbes, G. (1996).*The New Cambridge History of India, IV-2, Women in Modem India. London:* Cambridge,33

24. Borthwick, M. (1984). *The Changing Role of Women in Bengal: 1849-1905*. Princeton: Princeton University Press, 61

25. Forbes, G. (1986).In Search of the Pure Heathen' Missionary Women in Nineteenth Century India.*EPW*, (21) 17, 2

26. Sen, K. (2004) Lessons in Self-Fashioning: BamabodhiniPatrika and the Education of Women in Colonial Bengal. *Victorian Periodicals Review*, (37) 2, 177-178

27. Chatterjee, P. (1989). The Nationalist Resolution of the Women's Question, InSangari, K andVaid, S (Ed.), *Recasting Women:*

Essays in Indian Colonial History(P.245). New Delhi: Kali for Women

28. Sen, K. (2004). Lessons in Self-Fashioning: BamabodhiniPatrika and the Education of Women in Colonial Bengal, *Victorian Periodicals Review*. (37)2, 177

IMPACT OF COVID-19 ON EDUCATION SYSTEM-EVIDENCE FROM A SURVEY ON UNDERGRADUATE AND POST GRADUATE STUDENTS IN KOLKATA

Sourav Das
Assistant Professor, Department of Geography,
Asutosh College, Kolkata

1. ABSTRACT: The spread of pandemic COVID-19 has drastically disrupted every aspect of human life including education. In many educational institutions around the world, campuses are closed and teaching-learning has moved online.In order to understand the impact of the COVID-19 pandemic on higher education 177 students of different colleges and universities in Kolkata, West Bengal has been surveyed using structured questionnaire based survey schedule in online mode to recover the causal impact of the pandemic on students' current and expected outcomes. Due to the pandemic, all school, colleges and universities are declared to be closed. This is disrupting the whole education system. Policy makers are facing many problems in making the policy related to the education system. Teaching is taking place from offline to online. During the lockdown period, around 70 percent of learners wear involved in e-learning. Most of the learners were used Android mobile for attending e-learning. Students have been facing various problems related to depression anxiety, poor internet connectivity, and unfavourable study environment in at home. Students from remote areas and marginalized sections mainly face enormous challenges for the study during this pandemic. The study suggests targeted interventions to create a positive space for study among students from the vulnerable section of society. Strategies are urgently needed to build a resilient education system in the state that will ensure to develop the skill for employability and the productivity of the young minds. Due to this transformation in teaching methodology, students, teachers and

parents are facing many problems. The present paper addresses the various consequences of the COVID-19 in education system.

2. KEYWORDS: Covid 19, Education System, Online Classes, E-Learning, Online Tools, Social Media

3. INTRODUCTION:

The novel corona virus disease (covid-19) first appeared in Wuhan city China in 2020. Spreading of covid 19, WHO declared It as ‘pandemic' on March 2020. Most of the governments around the world have initiated by imposing lockdown social physical distancing avoiding face to face teaching learning and restrictions on immigration. UNESCO 2020 has reported that around 320 million learners are affected in India. The first covid-19 positive case has been reported in India Kerala on 30 January 2020 as of 18 June 2020 India has reported 160384 active cases.194324 recovered cases. And 12237 death cases. The shutdown of universities has also affected the student’s learning in universities. In order to ensure the continuity in institutes and universities, one immediate measure is essential. To conduct the class smoothly, online teaching methodology is adopted. Learning management software and open-source digital learning solutions are adopted by the universities to run online classes. The Government of India along with various state government have initiated different strategies to control the spread of disease. The educational institution due to the impact on education during the lockdown teachers are instructed to teach online learning platforms. During this lock down period the closing of educational institution hampered the education system and the teaching learning process. The present study aims to identify the learning status mode of learning and problems related to study during the lockdown amongst the covid-19 pandemic.

4. THE STUDY AREA:

Kolkata is one of the most diverse cities based on the infrastructure. The main study area covers in Kolkata. The Kolkata district having the latitudes and longitudes of 22°33’ N and 88°20’E respectively. Kolkata is a city of intellectuals, there have nine universities and most of the colleges in Kolkata are affiliated to the university of Calcutta which

wasestablished in the year 1857, and other important universities are Jadavpur University, Rabindra Bharati University, presidency University etc.

5. OBJECTIVES:

The main objective is to find out the perception of undergraduate and post graduate students on the impact of covid-19 pandemic. The specific objectives are: -

1. To find out if online education is the alternative measures for conventional class teaching and learning for future appearances on any pandemic.
2. To find out impact of covid 19 pandemic on the undergraduate and post graduates' students of Kolkata.
3. How the positive impact helpful to student, parents and teachers in the scenario of the online education.
4. How to reduce the negative impact of COVID-19 on students for their smooth education.

6. RESEARCH METHODOLOGY:

In this research paper the data for the present study is collected mainly through primary sourcesbased on online survey using properly formulated google form send to various students across Kolkata through whatsapp and email andhave collected 178 responsesfrom the students mainly studied undergraduate and post graduate studies in different colleges and universities in Kolkata(West Bengal) and analysed using descriptive statistics method and interpreted to come to the conclusion.

7. LITERATURE REVIEW:

Covid-19 responsive teaching of undergraduate architecture programs in India. Learnings for post pandemic education, Varma, A and Jafri, SM. (2020) this paper focus on online teaching learning of architecture program in pandemic situation. How the students dealing with the situation, the online review of education. Perception of undergraduate students on the impact of covid-19 pandemic on higher institution development in federal capital territory Abuja, Nigeria, Jegede D. (2020) according to this paper he selects the study by survey type prepared a questionnaire into two parts a and b. He discussed the demography the online data collect. Hamadan H. S, Modal Lal A. H Tanasha M, Mansour

H A, (2021) this research paper talks about students' mental health anxiety, depression in the pandemic situation. Chouhan P, Das P, Barman B, Mallick R, Zaveri A, shah J, Roy A, Paul P, Kapadia N, (2020) these paper focus on impact on the learning status during pandemic situation. They prepared a questionnaire and discussed about which part of students suffers most. They said from remote areas and marginalized sections mainly faced the major problem during pandemic situation. Covid-19 pandemic – A review and assessing higher education institution undergraduate students' mental health, James S, Pang P TN, Kasim M A M (2020) according to this paper undergraduate students are face mental health symptoms point, psychological and social factors, impatient and outpatient psychiatric settings.

Raju (2020) argued that there is a need to adopt innovative teaching for continuing education and to overcome mental stress and anxieties during the Lockdown. The outbreak of Covid-19 results in the digital revolution in the higher education system through online lectures, teleconferencing, digital open books. Online examination and interaction at virtual environments. Copeland W.E (2021) discussed that students are much worried about the final semester examination. If the examination is to be taken in offline mode, then it will be creating a fear in the minds of students as there are accustomed with the online mode of examination. The findings show that the pandemic affected the mental health of the entire sample and self-reports showed students of Colour in particular were disproportionately affected by financial stressors.Kapadia. N .et all (2020) said during lockdown period, around 70 percent of learners were involved in e-learning. Most of the learners were used Android mobile for attending e-learning. Students have been facing various problems related to depression anxiety, poor internet connection, and un favourable study environment at home. Students from remote areas and marginalized sections mainly face enormous challenges for the study during this pandemic which created a mental stress among them. Sai Karthik. J et all (2020) said pandemic is increasing demand for mental health services. Bereavement isolation, loss of income and fear are triggering mental health conditions or exacerbating existing ones. Many people may be facing increased levels of alcohol and drug use, insomnia and anxiety.

Meanwhile, covid-19 itself can lead to neurological and mental complications. Such as delirium agitation and stroke, people with pre-existing mental, neurological or substance use disorders are also more vulnerable to SARS-COV-2 infection they may stand a higher risk of severe outcomes and even it effects on education.

8. RESULTS AND DISCUSSION:

The profile of the study participants of 178 students, almost two thirds of them were aged below 22 years with a median age of 21 years. The number of male and female students was not equal in the sample. It is evidence that 84.18 percent female and 15.8 percent male responded the survey. The majority of them were affiliated to the Hindu religion. Most of the students wear from the arts academy background.

From online survey it is evident that 53.37 percent students use Google meet, 37.08 percent students are using Webex, 4.49 percent students are using Google classroom, 2.81 percentstudents are used Cisco meeting, 1.12 percent students are used zoom devices for study. Finally, it can be concluded that student prefer Google meet, WebEx meeting over zoom. Cisco meeting as the mode of study device.

From online survey it is evident that 84.8% female and 15.82% male responded the survey. The number of male and female students was not equal in the sample. Among the surveyed students, most of the respondent's 90.68 percent used Android mobile for attending e-Learning and another 9.32% of students used their laptops for classes.

From online survey it is evident that most of the respondents, 47. 19 percentwere faced technical issues, out of 177, 78 students reported that their economic condition will be affected by the covid-19 pandemic and 47 students reported that low family income was impact on their education. Out of 177, 120 students are not agreed for this suicidal tendency. And 51 students are agreed for the suicidal tendency caused by extra expenditure.

In this lockdown period it was reported that learners were mostly suffering from stress depression and anxiety. The students were also facing the problems related to poor Internet connection at home. Also, students (60.67percent) were faced helplessness and hopelessness. Out of 177, most of the respondents(46.07percent) were prefer for online mode

classes and 25.84 percent responding were not preferred for online mode classes.

In this locked down period it was reported that learners were mostly suffering from stress depression and anxiety. The students were also facing the problems related to poor Internet connection at home. Also, students (60.67percent) were faced helplessness and hopelessness.

In this lockdown period, it was reported that learners were mostly suffering from stress, depression, and anxiety (42 percent). The students were also facing problems related to poor internet connectivity (32.4 percent), followed by the absence of a favourable environment to study at home (12.6 percent). Students residing in rural and remote areas may face poor internet connectivity. Moreover, poor economic conditions might be a reason for the unfavourable environment and lack of separate room for their study.It should be mentioned that the online learning process is often discriminatory. Our study also found that many students face enormous challenges in e-learning and a substantial proportion of students could not attend online classes. Students from remote areas and marginalized sections mainly denied online learning due to the lack of electricity and poor internet connectivity. Poverty further exacerbates the problem of the digital learning process in this unwanted crisis period.

Among the surveyed students who were attending online classes 120, only 26 (14.1 percent) students were attending online classes daily, while 54 percent of them were attending online classes less than 3 days per week. Most of the respondents (85.8 percent) used android mobile for attending e-learning and another 14.2 percent of students used their laptops or computer for e-learning purposes. Although 73.7 percent of students used their android mobile for e-learning and 5.3 percent of students hired gadgets from family members to attend classes at the time of their learning. Fewer (0.9 percent) students had enriched the subjective knowledge by hiring e-learning gadgets from neighbours. The initiation or conducting digital teaching by teachers using various digital platforms during this lockdown period due to COVID-19 indicates the continuation of the teaching-learning process in this critical situation. University Grant Commission (UGC) and the Higher Education Department of West Bengal instructed to the academic institutions to continue the teaching

learning process through digital platforms. In such a situation, teachers are informing their students to participate in digital classes. In the present study, about 13.4 percent of students reported that their home tutors contacted them for digital learning. Another 15.5 percent of students are interested to involve in digital learning by a conversation with their friends. It is also reported that most of the learners (73.7 percent) were not involved in any digital platforms for the study before the COVID-19 outbreak.

Positive impact on education system: Though the outbreak of COVID-19 has created many negative impacts on education, educational institutions of India have accepted the challenges and trying their best to provide seamless support services to the students during the pandemic. Indian education system got the opportunity for transformation from traditional system to a new era. The following points may be considered as the positive impacts.

➢ Develop the use of soft copy of learning material- In lockdown situation, students were not able to collect the hard copies of study materials and hence most of the students used soft copy materials for reference.

➢ Improvement in collaborative work- There is a new opportunity where collaborative teaching and learning can take on new forms.

➢ Rise in online meetings- The pandemic has created a massive rise in teleconferencing, virtual meetings, webinars and e-conferencing opportunities.

➢ Enhanced digital literacy- The pandemic situation induced people to learn and use digital technology and resulted in increasing the digital literacy.

➢ Improved the use of electronic media for sharing information- Learning materials are shared among the students easily and the related queries are resolved through e-mail, SMS, phone calls and using different social medias like WhatsApp or Facebook.

➢ Worldwide exposure- Educators and learners are getting opportunities to interact with peers from around the world. Learners adapted to an international community.

➢ Better time management- Students are able to manage their time more efficiently in online education during pandemics.

➢ Demand for Open and Distance Learning- During the pandemic situation, most of the students preferred Open and Distance Learning mode as it encourages self- learning providing opportunities to learn from diverse resources and customized learning as per their needs.

Negative impact on education system: Indian education system has suffered a lot due to the outbreak of COVID-19. It has created many negative impacts on education and some of them are as pointed below:

➢ Educational activity hampered- Schools are closed and classes have been suspended. Different boards have already postponed the annual examinations and entrance tests across India.

➢ Unpreparedness of teachers and students - Teachers and students are unprepared for online education; they were not ready for this sudden transition from face-to-face learning to online learning.

➢ Parents' role- In urban area some educated parents are able to guide but some may not have the adequate level of education needed to teach children in the house.

➢ Digital gadgets: Especially in rural area many students have limited or no internet access and many students may not be able to afford computer, laptop or supporting mobile phones in their homes, online teaching-learning may create a digital divide among students. The lockdown has hit the poor students very hard in India as most of them are unable to explore online learning according to various reports.

➢ Create Difference: This online teaching-learning method creates a big gap between rich vs poor and urban vs rural students.

➢ Unprepared teachers/students for online education- Not all teachers/students are good at it or at least not all of them were ready for this sudden transition from face-to-face learning to online learning. Most of the teachers are just conducting lectures on video platforms such as Zoom; Google meet etc. which may not be real online learning without any dedicated online learning platform.

9. OBSERVATION AND FINDINGS:

a. Online classes constitute a new form of teaching and also represent a learning curve of teachers.

b. Students reported the suicidal tendency for economical problem during the pandemic.

c. Study reveals that out of 178 respondents 83.71percent respondents missed the usual class activities of offline mode like excursion, field work, study trip, laboratory exposure.

d. According the survey, respondents faced difficult to communicate with teachers without maintaining eye contact and physical presence of them.

e. In this lockdown period, most learners suffering from stress, depression, anxiety,poor internet connection, helplessness, hopelessness. In this online survey we find out students of undergraduate and post graduate, facing technical problems.

10. SUGGESTIONS:

a. India should accept the Full technology for development of education.

b. The Govt should enact sound laws for private schools so that there will be no exploitation with the teachers.

c. Internet is a fundamental right of citizen so it should be open for all without any discrimination.

d. Government must invest more and more on education.

11. CONCLUSION:

COVID-19 has impacted immensely to the education sector of India. Though it has created many challenges, various opportunities are also evolved. To do this, the paper uses primary survey data collected via a questionnaire from the students of various undergraduate and post graduate colleges belonging to university of Calcutta. the students are facing it is observed that out of 177 there 78 students reported the economic problem during pandemic. 90.68 percent students do not have a laptop or desktop to use for online classes. Online classes constitute a new form of teaching and also represent a learning curve for teachers. This pandemic has taught us that how to tackle the unwanted situation that's why education sector has been gaining a lot. The present study assessed the learning status of undergraduate and postgraduate students

during this pandemic. Although a substantial proportion of students are using digital platforms for learning, many of them face huge challenges in online study. Our study has suggested the following recommendation to the government, policymakers, and institutional authorities: There should be made a uniform academic plan for the universities and colleges and also initiate a proper Education Continuity Plan to continue the learning process during this pandemic. The infrastructural facilities should be availed to the education institutions which can regulate the digital learning process during future health emergencies. There is a need to ensure adequate funding for the improvement of the education system and to provide capacity development training to the stakeholders of higher education institutions. Interventions should be initiated through a targeted approach to create a positive space for study among the students from the vulnerable section of society. Finally, the vital multi-prolonged strategies are urgently needed to build a resilient education system in the state that will ensure to develop the skill for employability and the productivity of the young minds.

12. REFERENCES:

Agargun MY, Kara H, Solmaz M. 1997. Sleep disturbances and suicidal behaviour in patients with major depression. Journal of Clinical Psychiatry 58:245–251.

Agarwal V, Gupta L, Davalbhakta S, Misra D, Agarwal V, Goel AJ. 2020. Undergraduate medical students in India are underprepared to be the young taskforce against Covid-19 amid prevalent fears. MedRxiv DOI 10.1101/2020.04.11.20061333.

Ahamed, Showkat and Ahamed, Naseer. (2021), "Impact of Covid 19 on Education in India", Kala: The Journal of Indian Art History Congress" ISSN: 0975-79, Vol: 26, No: 2

Ahmed N, Khan A, Naveed HA, Moizuddin SM, Khan J. 2020b. Concerns of undergraduate medical students towards an outbreak of COVID-19. International Journal of Current Medical and Pharmaceutical Research 6(3):5055–5062.

Majumdar P, Biswas A, Sahu S. 2020. COVID-19 pandemic and lockdown: cause of sleep disruption, depression, somatic pain, and

increased screen exposure of office workers and students of India. Chronobiology International 13:1–10 DOI 10.1080/07420528.2020.1786107.

Rahul, Mukesh (2021), “An Analysis of Covid 19 Impacts on Indian Education System”, Educational Resurgence Journal, Vol-2, Issue-5(ISSN 2581-9001)

Tarkar, Preeti (2020), “Impact of Covid 19 on Education System”, International Journal of Advanced Science and Technology”, Vol: 29, No: 9S, pp. 3812-3814

A JOURNEY TOWARDS FINDING OWN LANGUAGE OF PROTEST : MICHAEL MADHUSUDAN DUTT

Prama Bhattacharjee
Assistant Professor, Department of English
Netaji Satabarshiki Mahavidyalaya

Abstract: The Bengal Renaissance of the Nineteenth century was largely an urban affair.It had a huge impact on the contemporary religious practices, social customs and literature in Bengal. A new sense of humanism, nationalism, individualism and a renewed approach to the traditional literature and culture was on the rise. While Raja Rammohan Roy brought in the first churning in the stagnant social scene of the Nineteenth century Bengal, the most visible influence of the Renaissance was on literature. But it remained within a small privileged minority, creating a new class hierarchy in the process.Michael Madhusudan Dutt (1824-1873), the bright young scholar of the Hindu College and an enthusiastic second-generation member of the Young Bengal, was a product of this Anglicist education who turned his attention eventually to Bengali. The language once renounced for the sake of materialistic benefit, fought back and claimed its proper place as the language of resistance.This essay attempts to sketch his journey toward finding out his own voice of protest against the colonial hegemony.
Keywords: Resistance, hegemony, colonialism, voice of protest, Meghnad Badh kavya.

Bengal renaissance: the Nineteenth century awakenings

The Bengal Renaissance of the Nineteenth century was largely an urban affair. Prof. Swapan Chakravorty had argued that it did not touch the subalterns and women in general.The occurrence, nevertheless,had a big impact on the contemporary religious practices, social customs and literature in Bengal.

There can be several possibilities of the outcome of a close encounter between two cultures in a context of colonial aggression. The

burden of colonial subservience may breed in some section of the colonized a kind of compensatory self-satisfaction by glorifying the powerful in all possible terms. On the other hand, the same sense of inferiority may result in an exaggerated and disproportionate glorification of their national heritage. At times these two trends are found side by side. There may also be a third condition too, when the two cultures are compared judiciously and an attempt is being made to take the best elements from both. We can detect all these trends in the history of the Nineteenth century Bengal, mostly in Calcutta and in its immediate neighbourhood.

Looking from a convenient distance in time, all these reactions to the British cultural aggression, in the least, show how preoccupied was the colonized country with the apparently advanced culture being thrust upon them. Bengal was not the same anymore. A new sense of humanism, nationalism, individualism and a renewed approach to the traditional literature and culture was on the rise. While Raja Rammohan Roy brought in the first churning in the stagnant social scene of the Nineteenth century Bengal, the most visible influence of the Renaissance was on literature. It could be noted that the new Anglicist education, which generated great enthusiasm, confined its reaches mostly within the facilities of the city. And it remained within a small privileged minority, creating a new class hierarchy in the process. Michael Madhusudan Dutt (1824-1873), the bright young scholar of the Hindu College and an enthusiastic second-generation member of the Young Bengal, was a product of this Anglicist education whoturned his attention eventually to Bengali.

The literary journey of an Anglophile

Dutt was born at a time when the urban elites of Bengal were gradually awakening to the fact that the new language of administration henceforth would be English, as Persian had lost its relevance with the switch of administrative power from the Muslim rulers to the British. Rajnarain Dutta, father of Madhusudan and a successful practitioner of law at the Calcutta courts took a prudent decision to bring his family permanently to Calcutta from a remote village in Jessore and get his son admitted in an English medium school. Madhusudan enrolled in the Hindu College in

1837, six years after Henry Louise Vivian Derozio had resigned from the institution, but his impact on the students, former as well as present, was still fresh. Two years earlier, in 1835, Thomas Babington Macaulay had issued his *Minute* on education. The question, whether English or one of the South Asian languages should become the sanctioned medium of instruction, was at the centre of that ongoing Orientalist-Anglicist controversy. Macaulay put an end to it by vehemently arguing for English in all the educational institutions as the primary medium of instruction. He had a clearly chalked out plan for the future of these young men being educated in these institutions. He promoted English higher education in India in order to "form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect".

Clinton B. Seely observed that "Michael Madhusudan Dutt epitomized the perfect Macaulayan product, acculturated to English tastes, notably in literature". It was only to be expected that Dutt began his literary career by writing in English. In the Hindu College he was a strikingly ardent student of English literature, and his primary interest lay with the works of the Romantic poets, especially Byron. Dutt began writing English poems from his early days in the college, and a few essays were also published. A few poems show the obvious impact of the Romantics, and a sense of loyalty to his own country is found in some of these poems.

Although Madhusudan was not explicitly patriotic in his writings, the impact of Derozio, coloured with his romantic imagination and a youthful spirit, gave his writings a flavour of national pride. In 1843 he published a longer poem, *King Porus,* illustrating the familiar tale of the bravery of an Indian king. He mourned the sad, vanquished state of the country in its lost glory in the poem and the lack of brave heroes—"the noble hearts that bled for freedom".

***The Captive Ladie* : a literary epic in English**

His next important literary work, *"The Captive Ladie*,"(1849) came in a very different context. In the intervening years, he had embraced Christianity which had resulted in an alienation from his family, Hindu communities of Calcutta, and his friends. On top of that he had been

thrown out of the Hindu college which brought his academic career to a halt. He enrolled into the Bishop's College and faced racist antagonism. He had suddenly relocated himself to Madras, a strange city for him with even more hostilities coming from the Christian communities. He had accepted jobs as teacher at Anglo-Indian schools and faced racial discriminations in spite of having a Christian name. He had married Rebecca McTavish, a woman of British origin against much antagonism from the British communities there, and was going through financial uncertainties. With all these experiences that left a bitter taste in his mouth, the only constant factor in his mind was an ardent pursuit of the European literature and an ambition to be ranked with the greatest British poets.

The subtitle of *"The Captive Ladie*"was "An Indian Tale in two cantos". Dutt took as its subject the elopement of Prithviraja, the king of the Delhi region, and the princess of Kanauj, who was the captive of the first canto. He had used Indian material before in his poetry. But the prominence given here to the South Asian thematic matter hinted at a comparative change of priorities taking place in Dutt himself, from aspiring to become a noted poet in English to that of devoting his creative energies to writing in his South Asian mother tongue. He was by no means turning his back on English literature, but he was looking more favourably toward Bengali at this point in his life. In February of 1849, prior to the publication of "*Captive*," Dutt wrote a letter to Gourdas Bysack, his most trusted friend for life, requesting copies of the Bengali retellings of both the *Ramayana* and the *Mahabharata.*

The poor reception of his ambitious project in Calcutta and abroad had a considerable impact on his decisions that followed. Quite contrary to his hope that this work would establish him as a major young poet writing in English, his well-wishers and friends were of the opinion that he should rather attempt to enrich his own mother tongue. J.E.D.Bethune advised him to give up writing in English and put his talents to work in Bengali literature:

"…he (Dutt) could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he

will employ his taste and talents, which he has cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of poems of his own language…" (159-60)

It was a big blow to the hopes of a budding poet who had dared to dream big. His state of a colonized subject was never so obvious at it was now. Perhaps it was a mixture of his reviewed career prospects and his rekindled interest in the Sanskrit literature that brought him back to Calcutta as abruptly as was his journey from it to Madras.

Homeward bound :Bengali compositions

After coming back to settle in Calcutta from Madras in 1856, Dutt's first literary work was a translation of the drama *Ratnabali* from Bengali into English. This was his first encounter with the Bengali drama prevalent at that time. Dutt was not satisfied with the standard of the Bengali theatre being staged at that time, which was unsophisticated, unrefined and to some extent, interspersed with vulgarity. Dutt himself was well versed in English, Greek, Latin as well as in Sanskrit, Bengali and Tamil. His exposure to this big range of language and literature prepared a platform for the refined taste that he brought into the Bengali stage. As if to show the audience a better model of drama in Bengali literature, Dutt's play *Sermista* (1858) combined the structure of the classical Greek tragedies with the rhetoric of the Sanskrit literature in Bengali. He took his experimentations further with his successive works and mixed Sanskrit rhetorics with the rhyme schemes inspired by the Greek heroic poetry. His *Tilottama Sambhab Kavya* (1860) became the first Bengali poem written in blank verse(Amitrakshar chhanda in Bengali) to great critical acclaim. Thus, it was the beginning of a new era: the Anglicised Bengali now concentrating upon using his own mother tongue to approach the ideas from the Indian mythology with a wider perspective, nourished with his extensive readings of Greek and European philosophy and literature.

***Meghnad Badh Kavya*: A Bengali epic in blank verse**

The consecutive success of all these Bengali works finally helped Dutt in concentrating his effort and talents into *Meghnad Badh Kavya*, an epic written in Bengali blank verse. *Meghnad Badh Kavya* reflected the sentiments and major trends of the renaissance nationalism in its adherence as well as in departures from the original Sanskrit text,

TheRamayana by Valmiki. He chose the particular episode from *Ramayana* which described the death of Meghnad in the hands of Lakshmana in an unethical combat. Dutt inverted the point of view of the narrator as seen in the original Sanskrit text, and told the tale from the side of the vanquished, *the Rakshashas*, rather than the victor, the Aryans. In the course of the events which roughly cover two days and a half, we experience a tale of valour, nationalistic sentiments, heroic ideals and humanism- qualities that we can hardly associate with a clan of aboriginals fighting the Aryans-a clan called Rakshashas by Balmiki which translates into base, man-eating demons full of subhuman instincts. In a letter to his friend, Rajnarayan Bose, Dutt said:

"I despise Ram and his rabble, but the idea of Ravan elevates and kindles my imagination; he was a grand fellow." (489)

This proud proclamation indicated how this text was going to be very different from a typical Aryan text like *The Ramayana* of Valmiki. The Rama in Valmiki is no less than the human incarnation of Vishnu himself, arriving in the mortal world to relieve the earth of its sins, while Ravana is the evil incarnate. But in *Meghnad Badh Kavya*, we find the traits of humanism more in the *Rakshasas* than in the humans represented by Rama and his army. Far from the idea of base, mean and dark- skinned cannibals, it is the *Rakshasas* who, in the course of the poem, display the humanist ethics more than their human adversaries. In the course of the entire poem, we hardly find anyone from the Rakshashas to be vile, violent or mean. Rather, we see a loving father, a dutiful husband and a noble king in the form of Ravana, who sheds tears of desperation at the demise of his dear sons and his soldiers.

In Meghnad, the son of Ravana, we see an epic hero with noble qualities who takes pride in his *Rakshasha* origin, loves his wife, trusts in the heroic codes of valour and has a striking sense of duty for his nation. In this context, we can remember how the Anglicist educationists were of the opinion that there was nothing worthy in the Indian civilization as a whole in comparison to those of Europe, as India was a country full of ignorance and superstitions.

***Meghnad Badh Kavya*: Anti-colonial trends**

Valmiki stopped at nothing to colour the Rakshashaswith demonic qualities, in keeping with what Ania Loombatells us, in relation to European colonization:

" 'cannibalism' is not simply the practice of human beings eating their own kind, not just another synonym for the older term anthropophagy. The latter term referred to savages eating their own kind, but cannibalism indicated the threat that these savages could turn against and devour Europeans." (73)

By signifying the aboriginals of the southern part of India,not yet explored by the Aryan invaders, as 'cannibals', Valmiki was voicing the typical colonizer's apprehension of a dark, unknown land and its hostile inhabitants.When Madhusudan endowed his *Rakshasas*with the noble, heroic qualities fit for a culturally progressive, well-structured nation, we could not miss his subtle but extended allegory of a civilized country fighting against the bigger power, and the latter's colonial hegemony.

Nirad C. Chaudhuri, however, finds in this glorification of Ravana and his clan against the cunning, sly, weak and devious Rama and his followers, a Homeric association:

"…When we were thinking of demons and of gods(for Rama wasa god, and incarnation of Vishnu himself), Dutt was thinking of the Trojans and the Achaeans. Ravana was to him another Priam, Ravana's Son Meghnad a second Hector, and Ravana's city, which to us was the Citadel of Evil, was to Dutt a second Holy Troy." (188)

Although this takes the association to a different territory altogether, this interpretation of the story also comprehensively establishes Dutt's preference to tell the tale from the angle of the smaller nation which may not necessarily be as uncivilized and evil as they are portrayed in the tales of the victor.

The language of resistance

Regarding his disillusionary stay at London to his dearest friend, Gour Bysack through a letter that stated, "If there be any one among us, anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother-tongue. That is his

legitimate sphere, his proper element.” This pain of disconnect with one’s own roots was a haunting feeling that gradually became apparent to Dutt. His short life and career had a tempestuous graph of recognition and ostracization by his own countrymen. A man of uncertain disposition, his acute love of an affluent lifestyle and excessive drinking habits had earned him ruthless criticism in his lifetime. His literary reputations were mostly eclipsed by the stories of his extravagance and arrogance. The literary career itself started suffering under his complete lack of discipline. But even though Bengal had turned its face from him, he was gradually embracing his mother tongue as his mode of expression. In sonnet after sonnet in Bengali that he wrote (*Chaturdashpadi Kabitaboli)* while living in a desolate state in England and France, in his pursuit to become a Barrister, he talked about his rekindled love for his mother tongue and his country of birth. He compared himself as a wretched beggar who had renounced the love and care of his mother to go and beg at the doors of foreign countries. In this metaphor, his mother tongue and its rich heritage became the treasure trove that he had previously failed to recognize. Like a prodigal son, he had returned to the home of his mother, and got rewarded.His own inherited language finally became his weapon to counter the Imperialistic power. The language once renounced for the sake of materialistic benefit, fought back and claimed its proper place as the language of resistance.

References

Bose, Yogindranath. *Michael Madhusudan Dattera jivana-carita* (The Life of Michael Madhusudan Dutt), 5th ed,; Calcutta: Chakravarti, Chatterjee, &Co., 1925.; letter of J.E.D. Bethune to Gour Dass Bysack dated 20 July 1849. Print.

Chakravorty, Swapan. “Rehearsing the Renaissance: Some Symptomatic Texts from Nineteenth-Century Bengal” in *Renaissance Reborn: In Search of a Historical Paradigm*, ed. Sukanta Chaudhuri, Chronicle Books, Kolkata, 2010. Print.

Chaudhuri, Nirad C. *The Autobiography of an Unknown Indian*, New York:Macmillan, 1951. Print.

Chaudhuri,Pramatha. “Sabuj Patrer Mukhopatra” in *Nana katha*.Calcutta:Author,1919.Print.
Das,Gyanendramohan. ed. *Meghnad Badh Kavya*, 1910, Allahabad, rpt. Ed. Ujjwalkumar Majumder, *Meghnad Badh Kavya Charcha,* Kolkata:Sonar Toree, 2004. Print.
Loomba, Ania, *Colonialism/Postcolonialism*: London: Routledge, 1998. Print.
Sarkar, Jadunath, “End of Muslim Rule”, *The History of Bengal*, vol 2, Dhaka: University of Dacca, 1958 rpt.1972. Print.
Seely, Clinton B. “The Raja’s New Clothes: Redressing Ravana in Meghnadavadha Kavya” in*Many Ramayanas*.Ed. P.Richman.Berkeley: University of California, 1991.Print.
Wolpert, Stanley.*A New History of India*, third ed. (New York: Oxford University Press, 1989). Print.

Kumārila Bhaṭṭa : A Hindu Philosopher

Sudipta Sau
Assistant Professor, Department of Bengali
Nagar College, Murshidabad , West Bengal

Abstract: Kumārila Bhaṭṭa, a prominent Hindu philosopher and scholar of the *Mimamsa school*of philosophy, played a pivotal role in shaping the intellectual landscape of early medieval India. This article explores his life, philosophical contributions, and enduring impact on *Mimamsa's* thought. The controversy surrounding his birthplace, his defense of Vedic ritualism, and his interactions with other philosophical traditions, particularly Buddhism, were also examined.
Key Words: Kumārila Bhaṭṭa, Hindu philosophy, Mimamsa School, PūrvaMīmāmsā, Mimamsaslokavarttika, Tantravartika, Tuptika, Buddhism.

Kumārila Bhaṭṭa, a luminary in the realm of Hindu philosophy, has left an indelible mark through his profound works, particularly his commentaries on *Jaimini's Purva Mimamsa Sutras*. This literature review provides a comprehensive analysis of the key works attributed to Kumārila Bhaṭṭa, unraveling the intricate philosophical tapestry woven by this eminent scholar.The birthplace of Kumārila Bhaṭṭa, an eminent Hindu philosopher and Mimamsa scholar, remains uncertain, giving rise to intriguing debates among scholars and historians. This academic article explores the various theories surrounding Kumārila Bhaṭṭa's birthplace, drawing on historical accounts, philosophical texts, and regional cultural influences to shed light on the enigmatic origins of this influential figure. The divergent accounts presented by historical sources contribute to the mystery surrounding Kumārila Bhaṭṭa's birthplace. Taranatha, a 16th-century Buddhist scholar, asserted that Kumārila hailed from South India and engaged in polemics against Buddhists and Jains in the southern regions. In stark contrast, Anandagiri's Shankara-Vijaya claims that Kumārila emerged from "the North," implicating a different geographical origin. Another compelling theory posits Kumārila's roots in eastern India, specifically Kamarupa, present-day Assam. Sesa's *Sarvasiddhanta-*

rahasya designates him with the eastern title "Bhattacharya," suggesting a connection to the cultural and economic milieu of Assam. References to Kumārila's familiarity with the production of silk, a prominent industry in Assam, add weight to this hypothesis.A third theory proposes Mithila, a region with cultural affinities to Bengal and Assam, as Kumārila Bhaṭṭa's birthplace. This hypothesis is supported by the existence of another renowned scholar associated with Mithila: Mandana Misra. The shared cultural elements between Mithila, Bengal, and Assam offer a plausible backdrop for Kumārila'searly life Kumārila's writings, hinting at familiarity with silk production and presenting a valuable clue to unravel his geographical origins. The prevalence of silk manufacturing in Assam aligns with the eastern India hypothesis, strengthening the argument for his association with this region. The specifics of Kumarila's familial background are not clearly documented in historical records. However, Tibetan accounts suggest that he was a family-oriented individual. It is claimed that he owned a substantial estate consisting of numerous rice fields and a retinue of 500 male and 500 female slaves, which further implies his status as a recipient of royal patronage. P.S. Sharma told 'Bhabhuti, who calls himself Kumarila's pupil, lived in the court of *Yasovarma* of Kanauj who flourished about 730A.D.'[1]

Analyzing the historical context surrounding Kumārila's life and the debates he engaged in against Buddhists and Jains provides additional layers of understanding. The regional dynamics and intellectual climate during his time offered insights into the complexities of his background. In conclusion, the quest to ascertain Kumārila Bhaṭṭa's birthplace involves navigating multiple theories and historical accounts. While Taranatha leans toward South India and Anandagiri hints at the north, the eastern India and Mithila hypotheses introduce new dimensions. The intersection of cultural influences, economic activities such as silk production, and historical debates enriches the exploration of Kumārila's enigmatic origins, challenging scholars to delve deeper into the geographical mystery surrounding this influential figure in Hindu philosophy. Further research and interdisciplinary investigations are warranted to unravel the truth behind Kumārila Bhaṭṭa's birthplace and its implications for understanding his philosophical contribution.

This review critically examines various scholarly perspectives on Kumārila Bhaṭṭa's work. It considers the debates surrounding his views on personal God, the apauruṣeyā concept, and his role in the broader landscape of Indian philosophy. Notably, it discusses alternative views, such as those presented by Taber (2010), providing a nuanced understanding of Kumārila's intellectual legacy, which synthesizes existing scholarship on the works of Kumārila Bhaṭṭa and offers a comprehensive overview of his contributions to *Mimamsa philosophy*. By unraveling the intricate philosophical tapestry woven through *Mimamsaslokavarttika, Tantravartika,* and*Tuptika*, it provides insights into Kumārila's nuanced perspectives on Vedic injunctions, ritualism, and his engagement with rival philosophical traditions. The enduring impact of Kumārila Bhaṭṭa on Hindu philosophy becomes evident through the richness and depth of his works, which continues to shape scholarly discourse and intellectual inquiry.

Slokavarttika, authored by Kumarila Bhatta, is a monumental treatise in the field of Mimamsa that provides a metrical and glossarial exposition that delves deep into the intricacies of the Mimamsa system of Hindu philosophy. The very nomenclature, derived from "shloka" (Sanskrit verse) and "varttika" (explanatory gloss), reflects its nature as a comprehensive commentary on the Sabara Bhasya. The significance of Slokavarttika is further underscored by its role as the inaugural segment of a tripartite commentary on the renowned *Sabara Bhasya*, which in turn is the sole surviving commentary on the 2,652 sutras authored by Jaimini around 200 BCE. These sutras form the foundational aphorisms of the Mimamsa system and contribute to the corpus of Hindu philosophical thought. Kumarila Bhatta's work exhibits a meticulous exploration of the Mimamsa doctrines, unraveling the complexities inherent in Jaimini's sutras through a lens of detailed metrical verses and illuminating glosses. The scholarly depth and rigor displayed in Slokavarttika underscores Kumarila Bhatta's intellectual prowess and his commitment to elucidating the nuances of Mimamsa. One notable aspect of *Slokavarttika* is its emphasis on the ritualistic and linguistic dimensions of Mimamsa, providing a comprehensive understanding of the philosophical underpinnings that govern Vedic rituals and the interpretation of Vedic

texts. This work engages in a critical analysis of competing philosophical perspectives, engaging in polemics, and intricate debates to establish the Mimamsa viewpoint. However, despite its scholarly merit, *Slokavarttika* is not without critique. Some scholars argue that the dense and highly technical nature of the text may pose a challenge to those unfamiliar with Mimamsa or lacking proficiency in Sanskrit. Intricate linguistic and ritualistic discussions may limit its accessibility to a broader audience, confining its readership primarily to scholars and experts in the field. In conclusion, Slokavarttika remains a foundational text in the study of Mimamsa philosophy, contributing significantly to the understanding of Jaimini's sutras through metrical verses and explanatory glosses. Although it has earned acclaim for its scholarly rigor, its dense and technical nature may pose challenges for a wider readership. Nonetheless, Kumarila Bhatta's work is a testament to the intellectual richness of the Mimamsa tradition, offering valuable insights into the intricacies of Vedic rituals and linguistic interpretations.

Another Notable Work of Kumarila Bhatta is *Truptika*. The *Tuptika* is a profound and comprehensive commentary on *Shabara's commentary* on *Jaimini's Mimamsa Sutras*, specifically addressing Books 4–9 of the Mimamsa Sutras. Mimamsa is a classical Indian philosophical school that focuses primarily on the interpretation of Vedic texts and rituals. Shabara's commentary, known as *Bhashya,* is a crucial text within the Mimamsa tradition, providing detailed explanations and insights into the intricate philosophical concepts presented in Jaimini's Sutras. The *Tuptika,* often referred to as the "Full Exposition," plays a vital role in further elucidating and expanding upon Shabara's commentary.The *Tuptika* is attributed to the renowned Mimamsa philosopher Kumarila Bhatta, who lived in ancient India, possibly during the 7th century CE. Kumarila Bhatta is celebrated for his significant contributions to the Mimamsa tradition and *Tuptika* stands as a testament to his scholarly prowess. The text reflects the intellectual climate of its time, engaging with the Mimamsa school's intricate debates on ritualistic practices, linguistic philosophy, and the nature of Vedic authority.The *Tuptika* is structured in accordance with the organization of Shabara's *Bhashya*, focusing specifically on Books 4–9 of Jaimini's Mimamsa Sutras. These

books delve into various aspects of ritualistic interpretations, sacrificial ceremonies, and the nature of Vedic injunctions. *Tuptika*, as its name suggests, provides a thorough and exhaustive examination of Shabara's commentary, offering detailed elucidations, clarifications, and logical analyses of Mimamsa doctrines. Ritualistic Hermeneutics the*Tuptika* extensively explores the principles of ritualistic hermeneutics, examining how Vedic texts should be interpreted and applied in the context of sacrificial rituals. Kumarila Bhatta critically engages with the nuances of linguistic philosophy to establish the authoritative nature of Vedic injunctions. The *Tuptika* delves into epistemological and ontological aspects, addressing questions related to the nature of knowledge, reality, and existence of entities posited in Vedic injunctions. Kumarila Bhatta's insights contribute to a broader understanding of the metaphysics of Mimamsa. Kumarila Bhatta engages in debates with rival philosophical schools, particularly Buddhist and *Nyaya-Vaisesika* traditions. These interactions illuminate the distinctive features of Mimamsa thought and its responses to challenges posed by other schools of Indian philosophy. The *Tuptika* also addresses ethical and moral dimensions inherent in Vedic rituals. Kumarila Bhatta explores the connection between ritualistic practices and ethical conduct, shedding light on the Mimamsa perspective on virtue and duty. The *Tuptika,* as a comprehensive commentary on *Shabara's Bhashya*, plays a pivotal role in advancing the Mimamsa tradition's understanding of Jaimini's Mimamsa Sutras. Kumarila Bhatta's scholarly acumen and rigorous analysis contribute significantly to the rich tapestry of classical Indian philosophical discourse, making it a valuable resource for scholars and practitioners interested in Mimamsa's philosophy and Vedic studies.

The Mimamsa School of Hindu philosophy, more accurately known as *PūrvaMīmāmsā,*occupies a distinctive place within the broader spectrum of Indian philosophical thought. This analytical and critical view aims to delve into the foundational aspects of Mimamsa, including its historical development, key contributors, and significant contributions to Hindu thought.Mimamsa, as the term suggests, focuses on "prior inquiry" (PūrvaMīmāmsā), directing its attention to the early portions of the Vedas, namely the Samhitas and Brāhmanas. This orientation

underscores its commitment to unravel the intricacies of Vedic rituals and interpretation of sacred texts. Jaimini, the earliest commentator on Mimamsa during the third to first centuries B.C.E., laid the groundwork for subsequent scholars, including Śābara (fifth century), Kumarila Bhatta, and Prabhākara (c. 700 C.E.). Mimamsa's contributions to Hindu thought are multifaceted. Its engagement with logic and epistemology has left an indelible mark, influencing the broader intellectual discourse within Hindu philosophical tradition. Furthermore, Mimamsa's close alignment with the Hindu legal system underscores its practical relevance, as it seeks to establish the nature of dharma (duty) through the meticulous hermeneutics of the Vedas. The distinguished Sanskrit Scholar Dhirendra Nath Pal explicitly said the different opinion. He said that 'TheMīmāmsāphilosophy is divided into two parts, namely the *PurbaMimansha* and the *Uttar Mimansha*, the latter being well known by the name of Vedanta.... *Purva Mimansh*a as a matter of fact is not a Philosophy; it is a rather defence of Vedic rites and rituals. Its purpose is to determine the sense of revelation.'[2] Purva Mimamsa, one of the six classical schools of Indian philosophy, is distinguished by its focus on ritualistic interpretation of the Vedas. At the core of Purva Mimamsa philosophy lies the authoritative text known as the "Sutras" authored by Jaimini. This academic note explores key aspects of Jaimini's Sutras, including their structure, divisions, and references to other ancient authorities, such as Atreya, Bandari, Badarayana, Labuky, and Aitisayana. Jaimini's Sutras are arranged systematically into twelve lectures, providing a structured framework for the exploration of Mimamsa philosophy. Each lecture was further divided into four chapters, with the exception of the 3rd, 6th, and 10th lectures, which contained twice as many chapters. This meticulous organization contributes to the coherence and accessibility of the philosophical discourse, and the entire collection of Jaimini's Sutras comprises 60 chapters. Each chapter is subdivided into sections, cases, and topics, reflecting a hierarchical organization. The total number of sutras in Jaimini's work is enumerated at 2652, forming the backbone of Mimamsa philosophical teachings. The Sutras are further grouped into Adhikarans, which are specific topics or discussions within a chapter. In total,

Jaimini's Sutras contained 915 Adhikarans, each addressing specific aspects of Vedic interpretation, ritualistic practices, and metaphysical inquiries. This subdivision facilitates a detailed examination of the various dimensions of Mimamsa philosophy.Jaimini's Sutras refer to several ancient authorities who are quoted as authoritative sources. These included Atreya, Bandari, Badarayana, Labuky, and Aitisayana. The inclusion of these references emphasizes tradition's commitment to a rich lineage of philosophical thought and highlights the interconnectedness of Mimamsa with broader intellectual currents in ancient India. Jaimini's Sutras form the cornerstone of Purva Mimamsa philosophy, offering a systematic and comprehensive exploration of Vedic rituals and their interpretations. The intricate organizational structure, with its lectures, chapters, sections, and Adhikarans, provides a roadmap for scholars and practitioners to navigate Mimamsa’s complexities. The inclusion of references to esteemed authorities further contextualizes Sutras within the broader intellectual landscape of ancient India, underscoring the depth and richness of the Purva Mimamsa tradition.

Kumārila Bhaṭṭa's philosophical legacy is deeply rooted in the Mimamsa school, emphasizing the supreme validity of Vedic injunctions and ritualistic practices. Kumārila Bhaṭṭa is renowned for his significant contributions to Mimamsa philosophy, particularly through his magnum opus, the Mimamsaslokavarttika. This commentary on Sabara's interpretation of Jaimini's Purva Mimamsa Sutras serves as a comprehensive exploration of Vedic rituals and their philosophical underpinnings. His adherence to the *Pūrva-Mīmāṃsā* tradition and his status as a confirmed ritualist were key aspects of his philosophical stance. Scholars categorize Kumārila's philosophy as existential realism, but there is divergence in his views on personal God. ManikkaVachakar posited that Bhaṭṭa advocated for a personal God, while other scholars present varying perspectives on this matter. This article critically examines these divergent views and seeks to clarify Kumārila's stance on the existence and nature of God within the Mimamsa framework.

Kumārila's defense of Vedic ritualism against medieval Buddhist idealism is the focal point of his philosophical contributions. The eminent scholar D.N. Jha said that ‘Outside the school of Nyaya, Brahmanical

thinkers like Kumarila Bhatta and Shankara attacked Buddhism and Jainism, according to the latter, the Buddha indulged in incoherent prattling… deliberately and hatefully leading mankind into confusion.'[3]The apauruṣeyā concept, asserting that the Vedas are unauthored, becomes a crucial element in Kumārila's argumentation. This article explores his rationale for this stance and its implications in the broader context of inter-philosophical debates during his time.While the Mimamsa School encompasses both atheistic and theistic tenets, it has demonstrated scant interest in the systematic exploration of existence or deities. Rather, it posits the soul as an eternal, omnipresent, and inherently active spiritual essence, directing its focus towards the epistemology and metaphysics of dharma. Within the Mimamsa framework, God exists only nominally; thus, dharma pertains to ritual and social duty, divorced from the considerations of devas or gods. The Mīmānsakas uphold the belief in the Vedas as "eternal, authorless, [and] infallible," regarding the Vedic vidhis—ritual injunctions or mantras—as normative kāriyas or acts, deeming them paramount and invaluable. Despite viewing the Upanishads and other texts on self-knowledge and spirituality as supplementary, the Mimamsa School diverges from this philosophical stance in Vedanta. Their thorough analysis of language and linguistics has left indelible marks on other Hindu schools, although their perspectives remain unshared. Mīmānsakas asserted that a language's purpose and power lie in clearly defining what is appropriate, right, and just. In contrast, Vedāntins broadened the scope and value of language, considering it as a tool for composition, development, and derivation. The Mimamsa School contends that an orderly, law-driven, and procedural life constitutes the central purpose and noblest necessity of dharma and society, with divine (theistic) means of maintenance serving that end rather than being viewed as ends in themselves. This concept positions the Mimamsa School as a form of philosophical realism. Jaimini's Mimamsa Sutra stands out as a significant text within this school of thought.

Legend has it that Kumārila went to Nalanda, a renowned 4th-Century University, to study Buddhism with the intention of refuting

Buddhist doctrines in favor of Vedic religion. This article investigates the circumstances surrounding his expulsion from Nalanda, notably his protest against his teacher Dharmakirti's ridicule of Vedic rituals. The legend of his survival, despite being thrown off the university tower, adds a mythical dimension to Kumārila's steadfast commitment to the Vedic principles. As per the scholarly work of Kumarila, multiple hypotheses could be proposed at this juncture. The distinguished Scholar Jhon Tabe said 'the apparent relation of *purvapaksa* of *sunyavada* and *pramanvarttikaKumarila*used in composing purvapaksa which we have seen seems to extended beyond the thought of *Diganaga* were also source for Dharmakirti. Another hypothesis -which I consider much less likely in light evidence the Dharmakirti sometimes seems to be reframing to Kumaril's view … which he learned second-hand from other Buddhists Teacher.' [4]

A critical examination of Mimamsa reveals its distinctive tenets, characterized by ritualism (orthopraxy), anti-asceticism, and anti-mysticism. Mimamsa places paramount importance on the correct performance of Vedic rituals, emphasizing the efficacy of prescribed duties as a means to achieve the desired outcomes. This emphasis on ritualism aligns with the school's commitment to orthopraxis, underscoring the practical application of religious duties in the pursuit of a righteous life. The anti-ascetic and anti-mystic stance of Mimamsa sets it apart from other philosophical traditions, particularly those advocating renunciation and mystical experience. Mimamsa's rejection of ascetic practices and its emphasis on the performance of rituals as the path to fulfilment and righteousness showcases its divergence from schools that prioritize otherworldly pursuits. One noteworthy aspect of Mimamsa's historical impact is its arguments against Buddhism. The critique offered by Mimamsa scholars may have played a role in the decline in Buddhism in India. The emphasis on Vedic ritualism, coupled with a robust defence of orthopraxy, positioned Mimamsa as a formidable intellectual force in the face of Buddhist challenges. In conclusion, *Mimamsa, or PūrvaMīmāmsā*, is a significant school in Hindu philosophy, contributing not only to the understanding of Vedic rituals but also to shaping the broader contours of Hindu thought. Its meticulous hermeneutics,

commitment to ritualism, and critical engagement with other philosophical traditions have left an enduring legacy, marking Mimamsa as a distinctive and influential strand of the rich tapestry of Indian philosophical discourse.

This article concludes by providing an overview of Kumārila Bhaṭṭa's notable works, including Mimamsaslokavarttika, Tantravartika, and Tuptika. These commentaries on Jaimini's Mimamsa Sutras serve as foundational texts for understanding Mimamsa philosophy and Kumārila's nuanced perspectives on Vedic injunctions. In summary, this academic article offers a comprehensive exploration of Kumārila Bhaṭṭa's life, philosophical contributions, and interactions with rival schools of thought, shedding light on his enduring influence on Mimamsa philosophy and the intellectual milieu of early medieval India.

End Note

1. Sharma P.S. *Anthology of Kumarila Bhatta's* Works, Motilal Banarasi Das, New Delhi, 1980, p. 15
2. Pal Dhirendra Nath, *The Hindu Philosophy*, Oriental Publishing Co., India, 1910,p. 144.
3. Jha D.N., Social Scientist, *Brahmanical intolerance in Early India*,May- July 2016, Vol.-44, pp.3-10.
4. Taber Jhon, *Kumarila's Buddhist*, Journal of Indian Philosophy, June-2010, vol. 38, Special issue on Buddhist Theories of awareness (Svasmvedana): Reception and Critique, published by- Springer, p. 294.

Work Cited

1. Bimal Krishna Matilal, *The Word and the world: India's contribution to the study of language*, Oxford University Press,1990.
2. Dhirendra Nath Pal, *The Hindu Philosophy*, Oriental Publishing Co., India, 1910
3. *Introduction to Purva-Mimamsa*, Trans. by G. Jha, Asiatic Society of Bengal, 1909.
4. Jhon Taber, trans., *A Hindu Critique Buddhists Philosophy*, Routledge, Landon, New York, 2005.
5. Kumaril Bhatta, Trans. By Ganganath Jha, *Solokvarttika*, The Asiatic Society of India, 1985.
6. P.S. Sharma, *Anthology of Kumarila Bhatta's Works,* Motilal Banarasi Das, New Delhi, 1980.

PEACE : MEANING AND CONCEPT

Santanu Ger
Assistant Professor, Department of Philosophy
Ranaghat College, Ranaghat, Nadia

Abstract: People always want peace in their daily life. We wake up and say we were sleeping peacefully. After eating good food we say we ate peacefully. Parents have peace of mind seeing their child's good exam result. If someone's dies after a long illness, it is said that the person died at peace. Above all we wish for the peace of someone's soul after death. That is, peace is constantly being sought. We want to live in peace and also die in peace.

So then, why seek peace? Then,peace does not exist itself in our life? Is peace a matter of achievement? Is there peace at all?

Key word: Peace, War, Harmony, Violence, Truth.

Meaning of Peace: What is in our body keeps the nervous system healthy and stable, that is, when our nervous system is not disturbed, then normal stability is maintained. So, in a word, peace is a balanced state of mind.

When a child asks his mother to bring the moon to his hand, mother then begins to explain to him that how will she bring the moon? The moon is not made of clay, that she will make it of, the moon does not live on the tree, from that tree she will give it, yet the child does not want to understand.

Only a mother knows the inner peace of hearing the sound of her baby's cry after birth. This peace is the calming state of the mother's disturbed nervous system. But this is not only the relief of the disturbed condition of her nervous system. This peace is peace of mind, peace of life, seeing that her child has seen the light of the world, the mother finds supreme peace. Behind this success lies long agony, sufferings, excruciating pain. And all this is past for her today. Hundreds of hardships are overcome. All her troubles are gone. Finally she got peace, peace and only peace.

In short, what people want, that is, when the needs of the people are fulfilled, they get peace. And if not, they do not find peace. When there is a gap between what people want and what they get, they do not find peace.

These needs are sometimes material, sometimes physical and sometimes psychological. Problems are closely related to life. The path of life is not paved with flowers, there are many obstacles in life. These problems are sometime individual, sometimes collective, sometimes moral and sometimes spiritual. So, there are different types of peace. Such as individual peace, collective or social peace, moral peace, spiritual peace, global peace etc.

There is a conflict as there is harmony between the various. Real - unreal, truth - untruth, light - darkness - we see their difference and also the lack of feeling of the difference. But when time stands still, when an existential crisis occurs, then the right way or means can reach our goal. Sri Ramakrishna says, "**YatoMat**, **totopath**", but the goal is one, those who forget the goal, quarrel over the difference in the path. Those who avoid these differences of opinion and path, reach their goal and find peace. Those who are able to know the difference between real achievement and apparent achievement, they are the ones who find peace in seeing the truth with a single glance and those who are able to see the truth at a glance, attain peace.

Concept of Peace: In our daily life we constantly see or hear something that troubles and disturbs our mind. Humans are social creatures. Human civilization has progressed through evolution since primitive times. However, some unsociable events are still happening to our society. Such as corruption, looting, casteism, provincialism, regionalism, greed for wealth, murder, violence, envy, fraud etc. All these things which are unethical and acts which the society does not approve are obstacle to peace.

War, strife and revenge do not allow people to live healthy. This unhealthy social condition disturbs the equilibrium both in the individual mind and the collective mind. So, in general, peace means a society without war, without hatred and a society devoid of immoral acts. A

society that will not be provoked terrorism and communalism, where the wind of good wisdom will blow, where people will be gifted with the spirit of good will, they will give birth to a new civilization. That civilization is full of comfort, peace and well being. Socrates, Plato, Budhha, Christ, Sri Ramakrishna, Rabindranath, Vivekananda, Gandhiji, Sri Aurobindo, each and every one of them have wanted to talk about such a society in deep tones throughout the ages.

The question is why the message of peace has been preached throughout the ages? So, is there no peace? Is peace be built up? Then what is needed to establish peace?

We know that the suppression of evil is the observance of creation. Actually our society is not heaven. There is turmoil in the society. That is, without the word 'turmoil' , it is not possible to determine the meaning of the word 'peace'. Although the word'war' is known as the opposite of the word 'peace' and the contradiction term of 'peace' is 'chaos'.

So, peace will be established only when unrest is removed. " Mother we are your peace beloved quiet boy/You are not afraid mother/We know how to protest ".--Yes, violence can be prevented through protest. But that peace is temporary. Again the society can become turbulent at any moment based on another issue. Therefore peacemaking is impossible until the true meaning of peace is known.

Peace is true. The truth is one and the realisation of this truth is peace. A nation's progress and prosperity depend on peace. Peace is being established in one's true self. But how is the sense of true self possible?

We see that when two sides face a win-lose situation, the side that wins feels a kind of peace. Again, it can be seen that when both sides face a lose-lose situation rather than thinking about winning, and as a result both sides lose their strength, yet they feel a kind of peace. Another is a win-win situation where both parties understand the outcome or value of competition or conflict and find peace based on mutual compromise or cooperation. This kind of peace is desirable. And for this we need patience, solidarity, harmony, awareness, proper education and understanding.

Conclusion: Understanding this win - win situation is the sense of truth that is the true self. This is an integral truth, this truth is not reason or intelligent, it is intuition. Realisation of peace is only when this intuitive truth is realised.

There is a sense of ego in win - loss and loss - loss situation. But there is no sense of ego in a win - win situation. Ego is driven by instinct. In a win - win situation, instinct dissipates. There is only one sense here, 'I am you, and you are me'.

Even if there are two sides in a win - win situation, in fact, the two sides are not two parts or divisions for the purpose of establishing truth or peace, but only two aspects or forms of the same truth. The two sides are not opposities. But are one in two. And which is one is truth and what is true is peace. Realisation of this truth is peace.

References:

1. Philosophical Perspectives of Peace – Howard P. Kainz
2. Peace, War and Defence – (ed.) Johan Galtung
3. The Moral and Political Writings of Mahatma Gandhi—(ed.) R. Iyer
4. Conflict Resolution and Gandhian Ethics --Thomas Weber, Gandhi Peace Foundation, New Delhi, 1991.
5. Gandhi, Gandhism and Gandhians – Thomas Weber, Roli Books, 2006.
6. Peace Education: The Concept, Principles and Practices around the World – (eds.) Gabriel Solomon and Baruch Nevo, .
7. Comprehensive Peace Education—Betty Reardon, Teachers College Press, 1988.
8. Peace, Culture and Society—(eds.) Elise Boulding, Clovis Brigagao, and Kevin Clements
9. ‘Perpetual Peace’ – Immanuel Kant, in Immanuel Kant, Political Writings of Kant, (ed.) Hans Reiss, Cambridge, Cambridge University Press, 1977.
10. Kant’s Political Writings –(ed.) Hans Reiss, 1977.

11. Three Decades of Peace Education Around the World – (ed.) Robin J. Burns and Robert Aspeslagh, New York and London, garland Publishing, 1996.
12. Conflict: Resolution and Prevention – J.W. Burton, New York, Martin's Press, 1990.
13. Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization –Johan Galtung, London, Sage, 1996.

Early Childhood Education : The Montessori Approach and the Reggio Emilia Theory

Subrata Acharyya
Assistant Professor, Department of Education,
Ramananda College, Bishnupur, Bankura
Nasiruddin Khan
Post Graduate, Department of Education,
Aliah University, Kolkata

Abstract: A new approach to improve the learning capability of young children Childhood Education: The Montessori Approach and the Reggio Emilia Theory. The purpose of early formative years schooling is to prepare a surroundings for a kid to expand highly freely without adult intervention. The Reggio Emilia principle is to get to know youngsters in a unique way. Compared to the unique statement, I reconsidered my function on children's autonomy and the teacher's function, and now I agree with that freshmen deserve much less supervision..In the correct surroundings and below a few guidance, they're able to considerable innovative endeavours without plenty intervention from adults. The undertaking method, which replaces a conventional curriculum, in addition helps their autonomy, and the reality that one subject matter can produce sudden effects complements engagement. Moreover, the method is well suited with the cause I presented, as a infant is nearly assured to enhance by some means whilst being concerned in innovative undertakings. I can't are expecting whether or not my up to date philosophy will stand the check of time, however I will try and put in force it in a neighbourhood putting whilst thinking about cultural differences.
Keywords: Childhood Education, Emilia Theory, Autonomy, Infant, Montessori Approach.

Introduction

After reading numerous techniques to early life schooling and reflecting on my preliminary statement, I can outline my perspectives extra clearly.

I resonated the maximum with the Montessori Theory, in particular concerning such factors because the motive and the teacher's role, despite the fact that the Reggio Emilia one additionally gives positive insights that praise my philosophy. It has now no longer modified much, however I did rethink my role on how concerned an educator need to be within side the whole process. I already valued a few diploma of autonomy for children, advocating for no incentives and prioritizing a younger learner's energetic role, and the referred to techniques emphasize its significance even extra. I will now no longer always consider the whole thing Montessori and Reggio Emilia theorists proposed at the same time as discussing my philosophy, thinking about their flaws and exclusive contexts, however I will deliver them credit score wherein it's miles due.

Purpose

The first class relating early formative years schooling I will give an explanation for is its reason. My information of it does now no longer derive lots from what Montessori suggested, so I will use her technique as a reference factor. I might describe the purpose within side the following words: to prepare a surroundings for a kid to expand highly freely, without lots intervention from adults. I will talk every detail of the reason to spotlight its significance and defining function in shaping different factors of early formative years schooling.

First of all, an educator organizes a sure surroundings this is cut loose a baby's family. While such factors as what constitutes the quality situations for mastering could be mentioned later, it's miles obtrusive that any instructional organization precise surroundings. While they may be much like home surroundings, a clean delineation among the 2 worlds is vital. One ought to know no longer always be advanced to the different; the domains (a schooling organization and home) exist for special reasons. Furthermore, a baby can stay without the former, so it ought to provide something that might compel mother and father to remember early formative years schooling as an option. Thus, setting up useful surroundings in which numerous youngsters are gift is critical to make the procedure possible. Moreover, such situations are prepared to assist one expand and gift a separate area from home, in which it won't be the number one purpose.

Another factor is what is supposed with the aid of using improvement within side the context of early formative years schooling. In a huge sense, it is able to cowl everything, from enhancing a baby's motor talents to coaching them a way to behave. Different institutions may also emphasize a specific sphere or goal they all in a holistic technique. While I might pick the latter, my imaginative and prescient is that it does now no longer be counted number what precisely an educator prioritizes. The maximum crucial final results are a baby enhancing in a few way, although an extrude is minor. For instance, mastering a brand new phrase or displaying a formerly unseen conduct might rely as such. Conversely, inflicting damage or negatively contributing to a present problem a learner may also have is towards the reason. Thus, early formative years schooling ought to enhance youngsters and assist them experience as though they accomplished something.

Lastly, the "highly free" issue of the reason announcement ought to know no longer be disregarded. The theorists may be radical at the same time as describing how impartial youngsters are, and I consider that such a technique borderlines neglect. While I aid Montessori's perception that improvement ought to be free, as households already limitation individuals, who deserve a few autonomy, an educator isn't passive; otherwise, the organization of early formative years schooling seems pointless. Overall, I view the reason as enhancing youngsters in unique surroundings at the same time as giving them the vital freedom.

Learning Theory

While expressing my unique concept of ways youngsters learn, I imagined surroundings this is in the direction of an standard college than to an early adolescence training organization. Thus, I estimated a extra formal method, cantered at the trainer's character and responsibilities, and cautioned such patterns that belong to a better stage, despite the fact that they're nevertheless applicable. After perusing statistics bearing on the Reggio Emilia principle, my know-how of the getting to know technique enriched, and I locate the constructivist foundation the perfect clarification of ways a younger learner must behave. Thus, I will observe the stated method whilst discussing the getting to know category.

As mentioned, the Reggio Emilia principle fashioned my know-how of ways youngsters learn. For instance, such factors as equality and negotiation are applicable to me, as a trainer additionally profits something from the technique and considers diverse views presented to them. Learners are recommended to speak due to the fact absolutely gazing any other individual is insufficient. As the getting to know technique is project-based, in an effort to be mentioned in element within side the curriculum section, youngsters regularly speak with others, representing the prevailing know-how and obtaining new statistics. Such standards as design, discourse, and documentation assist facilitate the method. For instance, the primary one display how youngsters plan and method projects; a shiny instance could be an animal drawing with a view to function a foundation for developing a dressing up or a sculpture. Discourse way that younger rookies derive sure meanings whilst speaking and confront every different with diverse ideas, protecting their position. Lastly, documentation refers to what instructors and dad and mom do – making significant notes of youngsters' sports. Learners can later use them to enhance project-associated discussions and products. Thus, after Reggio Emilia theorists, I fee negotiated getting to know and its standards.

While operating on projects, youngsters do now no longer simply speak, that's an critical clarification. They discover the surroundings the use of all their senses and explicit themselves through "the hundred languages." The latter calls for such sports as drawing, crafting, and acting, which continually play a significant function in advancing a project. However, they're now no longer executed in silence, because the discourse nevertheless takes place whilst acting them. It is primarily answerable for offering mundane hobbies with a sense, despite the fact that a trainer additionally frames the complete technique. The concept that youngsters are independent sufficient to deal with complex undertakings is what makes the getting to know principle well matched with my philosophy. They may be considerable innovative forces with the proper surroundings and tools, which must be prepared and organized with the aid of using a trainer. Another factor that can't be not noted is that the network as an entire is likewise concerned within side the

technique, so different youngsters aren't the most effective supply of statistics. Although I help their participation theoretically, I am uncertain of a way to enforce it in a nearby setting, thinking about its peculiarities. Generally, I sell a innovative method coupled with significant communiqué to finish a project.

Environment

I discover the Reggio Emilia method complete and percentage a number of its sentiments as a long way because the gaining knowledge of surroundings is concerned. I additionally trust that early life training is something wherein the network has to invest, beginning from the primary constructing and its whereabouts. The former have to be particularly designed for instructional motives and feature enough lighting fixtures, plants, and different vital centres. Ideal lecture rooms are spacious, with large home windows that may be opened without difficulty. Halls may be similarly extensive for exhibitions, significant breaks, and capacity activities. As for the construction's whereabouts, I absolutely guide the concept that it have to now no longer be relegated to a marginal spot however occupy a seen factor within side the network, with a view to replicate the mind-set in the direction of the establishment. The favoured environment is welcoming, completed through the mixture of great aesthetics and do-it-yourself. The furnishings, donated through the network in a pristine condition, have to be inviting, and the partitions may be blanketed through youngsters' artistic endeavours or different innovative products. They will functions a record to the network and an indication of private achievements. Overall, a whole lot interest has to take delivery of to the construction's whereabouts and interior.

The lecture room's association is likewise essential as youngsters will spend maximum in their time there. Following the Reggio Emilia method, I trust that newbie's have to shape smaller agencies that means that a room is in addition subdivided, despite the fact that such walls do now no longer should be in-built. They probably consist of decorations, furnishings items, and different bendy manner which can functions a border among smaller areas. Children from specific agencies have to nevertheless be capable of see each other and feature and know-how that they belong to a larger entity. The partitions also are adorned with their

innovative output, that is continuously updated, and no desire is given to a specific work. Besides the gallery, a lecture room can also additionally have a few photo aids, written reminders, and different beneficial information. The use of colours, which includes furnishings, additionally performs a function in improving the lighting fixtures and contributing to a welcoming environment. Generally, the lecture room's association has to facilitate organization formation and communication, create vivid and fantastic surroundings, and replicate youngsters' activities.

I could additionally spotlight different applicable rooms and centres that represent the general surroundings. The constructing have to have a library, which complies with the current guidelines and has computers, a workshop, an area for primary innovative ventures, and a massive eating room, in which the complete college can in shape for unique occasions. Large areas are important to sell the sensation of togetherness, which have to be found in everyone, which includes instructors and parents. Ideally, an early life training constructing is a miniature of the network that establishes it. Lastly, plants are vital outside and inside of the organization. Children have to have get entry to nature if you want to respect it, and fitness worries also are really well worth considering. In conclusion, different rooms within side the constructing are spacious and consist of an internal garden.

Curriculum

As a ways because the curriculum is concerned, my perspectives mirror the Reggio Emilia method as it prioritizes flexibility and avoids the pitfalls related to following a positive plan. The gaining knowledge of method is comparable to a non-linear journey. Rather than dividing the whole thing through subjects, the minimum coaching object is a task, which may be random. What topics is that a baby takes an hobby in something and desires to discover further, and the method is constructed round assisting them attain a non-public goal. The curriculum exists within side the feel that a trainer is usually organized for any state of affairs and has the essential substances and organizational means. For instance, an entire institution may be interested by doing the equal task, so it's miles crucial to convert the distance for his or her wishes. Some undertakings may be short, finished in a single day, relying on how

energetic and engaged youngsters are. Meanwhile, it's miles viable to have long-time period tasks which are much like conventional curricula, despite the fact that they may nonetheless be distinctive. Overall, a curriculum ought to be bendy, and a task-primarily based totally method may be appropriate for coaching goals.

An instance of a long-time period task is one dedicated to animals. An educator might also additionally have a few thoughts of what subtopics and gear are the maximum suitable to take a look at it. However, this type of task might be majorly fashioned through youngsters, and the final results are possibly to be unpredictable. They have distinctive ideas referring to animals, and every small institution or maybe a person will display a completely unique know-how of the subject. For instance, it is able to be stimulated through a baby's preferred toy, and whilst adults will provide steerage throughout a few stages, maximum activities, which include discussions, drawings, and information-gathering, might be decided through inexperienced persons. Moreover, instructors and mother and father might also additionally supervise the task through recording the whole thing youngsters do and make tips primarily based totally at the findings; nonetheless, their involvement ought to be diffused to facilitate the sensation of achievement. Throughout the task period, it's miles viable to shape new businesses, break up them, and reunite again, which displays the method's bendy nature. The very last product is unpredictable, various from a retelling of what one found out concerning the subject to an animal sculpture. Overall, the task approach may be a legitimate alternative for a curriculum.

Role of the Teacher

In my preliminary philosophy assertion, I defined an educator as a person who has values, organizes and manages the gaining knowledge of surroundings, guarantees youngsters' safety, and acts as a great function model. I emphasized that a trainer ought to have integrity, dignity, benevolence, and admire for equality. Simultaneously, I keep in mind intervention viable, from organizing inexperienced persons in businesses to chiding them for creating a mistake. Although the bulk of my perspectives expressed formerly continue to be true, I will emphasize

what has modified after gaining knowledge of greater approximately the Montessori Method, which made me rethink the educator’s function and the quantity of autonomy youngsters ought to have.

First of all, I recommend the perception that a trainer ought to be adventurous and open to new thoughts. Out of all professions, educators are preferably the maximum forward-thinking, that's pondered in lots of components in their work. What Montessori may want to imply is they ought to undertake her method, previous through today’s standards, despite the fact that the overall concept stays relevant. Following the accustomed methods to train youngsters is probably the surest, however every era is distinctive, and their specialty ought to be cultivated as opposed to uprooted. Consequently, I revise my authentic assertion concerning errors due to the fact now no longer the whole thing is really well worth correcting. I additionally recommended difficult inexperienced persons for misbehaving, which seemed greater humane and democratic than scolding them. However, now I agree with that different youngsters ought to be the judges of whether or not a person carried out themselves inappropriately. I become already in opposition to the concept that inexperienced persons’ fine motivation is hooked up to the trainer. Thus, the equal common sense ought to practice to its terrible aspect, thinking about that it is able to be taken in a greater touchy manner. Altogether, an educator is an open-minded and non-judgmental person, letting youngsters determine whether or not a person behaves inappropriately.

Following the Montessori Method, I agree with that a trainer ought to be a great observer and facilitator. I already alluded to that whilst discussing the significance of being aware about suitable gaining knowledge of patterns and handling the surroundings well. Only through commentary can a trainer decide whether or not a baby improves, and facilitation guarantees that the method occurs. Still, a few conditions require a greater energetic function, in particular if a learner’s lifestyles are threatened. I am additionally satisfied that trainer-learner communiqué ought to occur, despite the fact that each aspects are required to behave as equals. Generally, I agree with that much less intervention may be higher, now no longer helping the perception that an

educator is meant to be a function model, as youngsters are loose to their idols or effectively stay without them.

Guidance

As maximum of my philosophy is primarily based totally at the Reggio Emilia theory, it's miles logical that the steerage class additionally follows the pattern, thinking about its near courting with the gaining knowledge of class and the task approach. Some strategies were in brief mentioned, which include the usage of documentation to facilitate conversations and innovative activities. I will expound on them, explaining how they make a contribution to the gaining knowledge of aspect. I discover the Reggio Emilia steerage enormously uninstructive and purposeful, except its compatibility with different categories.

Within the constructivist method, steerage is supposed to facilitate autonomy in youngsters, making them self-disciplined and self-directed. For instance, a trainer might not at once inform their inexperienced persons what to do whilst operating on a task, however they may inspire a discussion. Consequently, youngsters will determine on something and experience a feel of private accomplishment, despite the fact that an educator initiated the complete conversation. The equal precept applies to innovative ventures – a learner might also additionally understand what to do with the furnished substances, despite the fact that one wishes an out of doors intervention to enhance their abilities. Therefore, a trainer will assist a baby through informing them of a higher manner to apply a device or a specific technique. A demonstration may also be useful, as inexperienced persons are alleged to own tremendous observational abilities in wonderfully prepared surroundings. Generally, tasks ought to be guided in a diffused manner, as instructors and different adults provide new tips concerning the subject due to the fact youngsters generally tend to lose focus. Still, such interventions are simplest a hit after they consist of positive concepts that inexperienced persons can comply with independently. Fundamentally, all steerage includes passing comments, despite the fact that they specially pressure the gaining knowledge of method.

Conclusion

In this statement, I expressed my perspectives at the considerable academic classes following the Montessori Method and the Reggio Emilia theory. While I typically trusted the latter, the cause and the teacher's function are formulated in line with the former. They do now no longer always contradict every other, and I highlighted the factors of war of words to make my philosophy extra or much less consistent. Compared to the unique statement, I reconsidered my function on children's autonomy and the teacher's function, and now I agree with those freshmen deserve much less supervision. In the correct surroundings and below a few guidance, they're able to considerable innovative endeavours without plenty intervention from adults. The undertaking method, which replaces a conventional curriculum, in addition helps their autonomy, and the reality that one subject matter can produce sudden effects complements engagement. Moreover, the method is well suited with the cause I presented, as a infant is nearly assured to enhance by some means whilst being concerned in innovative undertakings. I can't are expecting whether or not my up to date philosophy will stand the check of time, however I will try and put in force it in a neighbourhood putting whilst thinking about cultural differences.

Reference:

1. Barnett, W.S. (1993) Benefit-cost analysis of preschool education: Findings from a 25-year follow-up. American Journal of Orthopsychiatry, 63, 500-508.
2. Bredekamp, S. (Ed.). (1987). developmentally appropriate practice in early childhood programs serving children from birth through age 8. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.
3. Karweit, N.S., & Wasik, B.A. (1994). Extra-year kindergarten programs and transitional first grades. In R.E. Slavin, N.L. Karweit, & B.A. Wasik (Eds.), Preventing early school failure: Research, policy and practice (pp. 102-121). Boston: Allyn & Bacon.

4. Larner, M. (1992). Realistic expectations: Review of evaluation findings. In M. Larner, R. Halpern, & O. Harkavy (Eds.), Fair start for children (pp. 218-245). New Haven, CT: Yale University Press
5. Mitchell, A., Seligson, M., & Marx, F. (1989). Early childhood programs and the public schools: Between promise and practice. Dover, MA: Auburn House.
6. Snow, C.E., Burns, M.S., & Griffin, P. (1988). Preventing reading difficulties in young children. Washington, DC: National Academy Press.
7. NCERT (2006) Position Paper, National Focus Group on Early Childhood Education, NCERT, New Delhi. Retrieved from https://tinyurl.com/tdlbdhe
8. Swaminathan, M. 1992: ‘Training for Childcare Workers in India’, Coordinator's Notebook, No. 12, Motreal: The Consultative Group on ECCD.
9. Muralidharan R., Stimulation Activities for Young Children, NCERT.
10. Thakkar Aruna. Significance of Early Childhood Education ECE Instrumental Material Series. National Council of Educational Research and Training.

Locational Factors of Food Park, case study on Sankrail Food Park, Howrah

Sumana Das
Research Scholar, Department of Geography,
West Bengal State University

Abstract- One of the most important aspects of regional as well as economic geography is determining the location factors of industries. Many researchers have discussed the locational factors of different manufacturing industries, but they didn't discuss about Food Park. Among different manufacturing industries, food processing industry is most important and distinctive industries in West Bengal, and food park is an extended part of this industry.Like other industries its location depends on different physical and socio-economic factors. Our purpose in this paper is to discuss the different favourable factors for the location of Food Park with special reference to Sankrail Food Park. In this paper we used mixed method, which includes both qualitative and quantitative technique. It is observed that large demand, convenient supply of inputs, good transportation system and favourable raw materials linkage contributed to the formation of this food park in semi urban part of Sankrail.
Keywords- Agglomeration, External economies, Forward and Backward linkage, PPP Model.

Introduction-

India is one of the agriculturally based countries in the world with its wide variability of climate and soil, produces large range of horticultural crops such as fruits, vegetables, potatoes, and spices (GoI 2002). After the green revolution based on high-yielding seeds and chemical fertilizers, production increased many times. Based on these surplus food productions, Indian Government hence planned to expand a food processing industry on a large scale. In this early time, it faced many problems among them most important was the wastage of food products during transportation between the farm and the production center. To overcome this problem, Government of India in collaboration with the Ministry of Food Processing Industry planned to set up Food Parks. Food Park is a system that brings together producers, sellers, and retailers in one place and provides a direct linkage among them (MoFPI, 1994). In the late 20thcentury, many Food Parks were set up in different parts of

India, including West Bengal. Sankrail food park is one of the largest food park in West Bengal which successfully operating since 2005. In this paper, we want to discuss the locational factors of Food Parks with special reference to Sankrail Food Park.

Literature Review-

For this study we have studied some literature related with this topic, which helped us to get an idea. Also, some relevant literature that is much pertinent to the present study is reviewed thoroughly.

Rohin Malhotrain (2001) discussed the concept of food processing industry and Food Park and their locational factors, in his paper. According to him Food Park is an extended part of food processing industry, which brings producers, customers and retailer under an umbrella.

K. Laxminarayana Rao (2001) in his paper with title "Agro industrial park experienced in India" described the formation of Food Park with special reference to India.

E. Annevelink, A. Vink & A. Smith(2003) elaborated the idea of food parks in their paper with title **"**Food Park, a case study of an integrated sustainable agro production park system designed with agro innovation framework**"**. According to them food park deals with a design which integrated different production processes, such as arable production, food production, pig husbandry, slaughter houses and horticultural production.

Study Area-

There are 9 food parks in West Bengal among them one is Mega Food Park (Jangipur food park), which is operated by the Central Government and the others are maintained by the State Government (www.mofpi.gov.in). For this study, we have selected Sankrail food park because it is the largest state operational Food Park in West Bengal.Following figure represents the location of the study area with its three separate divisions at Kandua in Howrah.

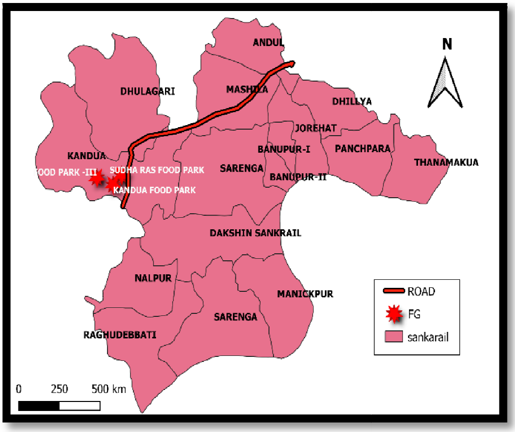

Objectives-

The main objectives of this paper are-

- To identify the different factors which affect the location of food parks in general.
- To analyze the favorable factors for the location of the food park in Sankrail, Howrah.

Methodology-

For this paper, data and information have been collected from primary as well as secondary sources. As a secondary source, the website of the Ministry of Food Processing Industry, WBIDC, the District Handbook, and other published news in newspapers were used. For this research, mixed research method is used, which include both qualitative and quantitative techniques. We have selected samples by stratified sampling method, where the first strata is the people inside the park and 2nd is the people outside the park. The primary information and data were collected by a semi-structured questionnaire survey with the managers and the local people who are directly or indirectly engaged with this park. The software QGIS 3.16 is used to show the location of this food park and along with location of the favorable factors.

Results and Findings-

Fig 2. Principal Factors Involved in Sankrail Food Park

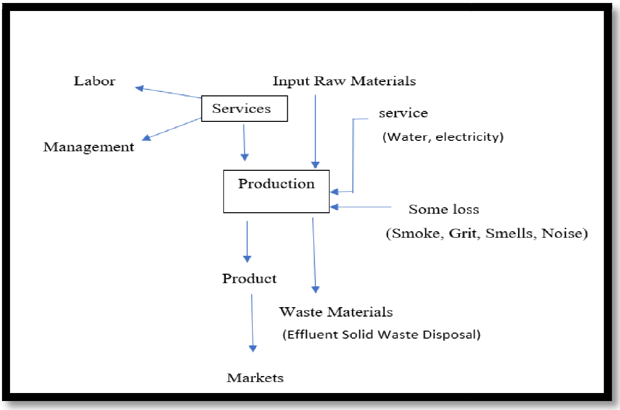

A region becomes a better location for the industry if the area has a bigger market, greater availability of raw materials, lower production cost, low transport cost, greater prospects, greater favours from management, and greater encouragement from the government (Smith, 1971). However, in practice, we do not find all factors in favour of a particular location. In the real world some factors make a place favourable while others make a particular place unfavourable. The figure shows the relationship between the manufacturing industry and its surroundings. *Source*- Chart prepared Based on Primary Survey, 2022

Least Transport Cost-

This food park is located in a nodal part of Sankrail, which is situated on 4-lane NH-6 (renumbered as NH-16 in 2010), the construction of its 6-

lane is in progress. This route of over 1949 km is from Surat to Kolkata and connects different states and cities of Gujrat, Maharashtra, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, Sambalpur, Raipur, Nagpur, and other districts in West Bengal i.e., East Medinipur, West Medinipur, and Kolkata. This highway also connects the other blocks of Howrah like Bagnan, Uluberia, Panchla, and Jagacha. It is also connected with the different cities of West Bengal by railways. Through the Southeastern Railway, this food park is connected to Medinipur, Kharagpur, Haldia, Amta, etc. It is comparatively nearer to the Kolkata port (28 km distance) and Haldia port (almost 104 km distance), It is also close to Netaji Subhas International Airport. This high accessibility of this zone reduced the transport cost, which has created favorable conditions for establishing Food Park in the region.

Availability of necessary technology-

The necessary technologies for the setup of any food park are a warehouse, cold storage, building for training of workers and a modern godown with all facilities. In the case of Sankrail Food Park, there are many warehouses, cold stores, and godowns available. Besides the own warehouses, the rental warehouses and godowns are also available here. The rent of these warehouses is comparatively lower than other parts of Howrah. The semi-furnished and unfurnished rental warehouses with low rent are available in Dhulagori, Sankrail, Jalalpur, Ramachandrapur, and Ranihati. There are two multipurpose cold storage with a capacity of 10,3412 quintals (Director of Agri Marketing, 2011).

Labour supply-

Due to industrial agglomeration, the labour cost is also cheaper than any part of Howrah. It attracts many skilled and semi-skilled workers from periphery regions, which creates intra-regional and inter-regional migration. The availability of workers is one of the important causes of the development of this park. Most of the workers come from Amta, Jayanagar, Panchla, Hooghly, Dankuni, and Kolkata. Mainly due to the seasonal un-employment most of the jariworkers (Jari workers means who are engaged with the art of decorating clothes by weaving golden and silver threads) and local farmers recently have been engaged in this food park.

Supply of raw materials-

In the case of Sankrail Food Park, the availability of raw materials is more significant than other factors. The main raw materials of this park

are tomatoes, potatoes, wheat, edible oil, spices, etc. Its weight-losing nature supports the location of this park near the raw material center (According to Weber, 1909). As Food Park is crop-based it is mostly located in a different agro-climatic zone based on a surplus of production. Howrah is located in the Gangetic alluvial zone with deep fertile soil, favorable climatic factors, and new alluvial soil which helps to produce surplus production. The main crops in this district are brinjal, cauliflower, tomato, jackfruits, and potatoes. The availability of raw materials from the local area and the surrounding districts, led to the development of the different phases of the food park here. There is a scope to get adequate raw materials from the neighboring states through the National Highway-6. Many raw materials like potatoes, gram flour, and oil are brought cheaply from Punjab, Gujrat, Rajasthan, Pune, and also from other parts of West Bengal.

Land availability-

It is an important attribute in the locational analysis of any industry or project. An open large place in a good location with all facilities is a basic factor in establishing a food park. As land is a limited natural resource, it is very difficult to get adequate land for any food park. A large open space is required for the setup of any food park with all modern infrastructure and facilities. In a food park, the land is required for the producing, sorting, grading, packaging unit, warehouses, godowns, and cold storage which is nearly 100 acres. This land is also needed for the storage of materials, and parking of cars, trucks, and internal vehicles (Smith, 1971). The total area of this food park is approximately 140 acres. Sankrail previously was totally a rural area with wet land that was less suitable for agriculture making it very easy to get a large open space for the formation of a food park.

An abundant supply of water and power-

The supply of labor and a good communication system is an important factor in developing any industry but nowadays anotherimportant factor in commercial success is a supply of unerupted electricity at an affordable cost (Elsie Yates, 1938). The uninterrupted power supply by WBSEB (substation of WBSEDCL) is one of the important factors in the development of this Food Park. In this Food Park, the power supply capacity by the WBSEDCL substation is 30 MVA or Mega Volt Amp (wbpower.gov.in). The east-west canal which flows at the back side of the food park also supplied the necessary amount of fresh water. Besides the natural water system, there are many overhead water tanks with a capacity to contain almost 5 liters of water. This comprehensive drainage

and sewerage system boosts to set up this food park in Sankrail (Primary survey).

Capital Investment-

The government, as well as private investment, is one of the important factors in the development of this food park. The state government has taken different steps to increase investment in this park. The sufficient capital investment helps to set up and extend this food park. In the year 2007, K K Birla had set up a food park in phase-I at Sankrail with a joint venture partner investing 100 crore rupees. Gopal Krishna, managing director of WBIDC said, this food park phase-II was set up on a potato processing unit by Fritto Ley and PepsiCo. with an investment of Rs 100 crores.

Government Initiatives-

Sankrail's is a large operated food park run by the State Government; the Government has encouraged the development of Growth centers through the West Bengal Industrial Infrastructure Development Corporation (WBIIDC). The infrastructure facilities provided in this Centre include developed land, an industrial shed, water supply, power supply, street lighting, internal drainage, and a sewerage system by the state government. Other facilities such as telephone, bank, fire stations, and police outposts are also being contemplated for the new growth Centre (nriwestbengal.gov.in).The government has taken several initiatives lately to improve the support facilities for the food processing sector to attract and retain investment (Times of India ,2014).

Conclusion-

Sankrail Food Park is one of the biggest operating food park in West Bengal with three different phases. From the above discussion, it is clear that the good internal infrastructure, transportation facilities, and huge investment and governmental support act as positive factors in achieving the full potential of this park. Besides different positive factors it has faced many problems like political conflict, lack of loan facilities and lack of investment.

References-

- D.H. Sharp and H.B. Chubb. Factors Affecting Industrial Location, Official Architecture and Planning. 28; (1965), pp.40-43.
- Government of West Bengal. (2011), Director of Agri Marketing, [online] Available at: https://wbagrimarketingboard.gov.in/(Accessed on 5th October,2022).

- Government of India. (1994), Ministry of food processing industries, [online] Available at: http://www.mofpi.gov.in/(Accessed on 20 July,2022).
- Government of India (2001): industrial policy -2001, (New Delhi: Ministry of Commerce and Industry). Available at: http://www.mofpi.gov.in/(Accessed on 10 August,2022)
- Government of India. (2008), Ministry of food processing industries, [online] Available at: http://www.mofpi.gov.in/(Accessed on 20 July,2022).
- Government of India. (2020), Ministry of food processing industries, [online] Available at: http://www.mofpi.gov.in/(Accessed on 10 August,2022).
- Government of India. (2021), Ministry of food processing industries, [online] Available at: http://www.mofpi.gov.in/(Accessed on 10 August,2022).
- M, Sidhu, (2005) Fruits and Vegetable Processing Industry in India, Economic and Political Weekly.40 (28); pp. 3056-3061.
- Office Memorandum. (2021): Setting Up Special Fund of Rs. 2000 Crore NABARD [ONLINE]. Available at: www.mofpi.gov.in (Accessed on 20 September,2021).
- Sen, Saibal. 'WB Govt Clears Investment Proposal for Food Park in Sankrail', The Times of India, Calcutta, 13 January 2014, p.09.
- Venables, J. (2008): New Economic Geography, [online] Available at https://www.researchgate.net/publication/229027563 (Accessed on 10th November,2022).
- West Bengal Industrial Development Corporation (2005): Number of food parks in West Bengal [online] Available at:www.wbidc.com (Accessed on 12th July,2022).
- Yates, E. (1938) Modern Factors of Industrial Location, Geographical Association. 23(2); pp.106-112.

CULTURAL ATTRIBUTES OF THE KURMI MAHATOS : REFLECTIONS FROM KARAM PUJA

Sanchita Bhattacharya
Research Scholar,
Centre for Adivasi Studies and Museum,
Vidyasagar University

Abstract: India is land of various cultures and traditions and also has a substantial indigenous population engaged in diverse livelihood-sustaining activities. The religious belief system of the various indigenous community, are entirely dependent on various natural resources, a major step towards biodiversity conservation. Karam tree was the first that came into prominence which earns huge medicinal importance. Cultural alienation of young people, modernization, along with several other factors paved the path of erosion of the various traditional values of tribes but still this community continue their age old custom of worshipping Karam tree in the form of Karam Puja.
Keywords: Biodiversity, Culture, Karam Puja, Modernization, Tribes.

Introduction

Since time immemorial the Tribal people in India as well as in other parts of the world have been known for their unique cultural identities owing to their close connection to nature and natural objects including trees and plants which have profound economic prominence as well as have immense cultural importance. These have religious as well as health importance among the whole tribal India. The Indian subcontinent is a vast repository of medicinal plants that have immense traditional medicine, which even forms a rich source of knowledge for the medical field (Brains, 2017). India is a land reflecting variety of physical and cultural attributes. Its rich biodiversity supports the health of ecosystems and the services they provide to the society. The nature-based traditional festivals celebrated by indigenous people are significant in terms of socio-economic and cultural stabilization that plays immense role in

biodiversity conservation as well as in the preservation of socio cultural heritage (Banerjee, 2014).

Objectives

The major objectives of the study are to reflect the cultural attributes of the Kurmi Mahatos focussing on the Karam Puja. This study further highlights the story associated with this Puja, various steps of celebration, the restrictions imposed on during celebration. The study concludes with the impact of this cultural attribute towards nature.

Review of Literature

The importance of biodiversity is identified globally. Several works focus on the inter relationship between man and environment. Totemism practiced among different tribes is a major step towards protection and conservation of many plant and animal species and this concept of totemism relates the interrelation of indigenous people with nature. (Alawa and Ray, 2018; Murugesan, 2014; Sarma and Barpujari, 2011; Timung and Singh, 2016). Different geographical places have their own totems based on flora, fauna and topographical features of that particular place (Bains, 2017). The tribal believe in the conservation of plant and animal species. The various cultural attributes ensures the protection and conservation of flora and fauna in, of which some are threatened or in the category of endangered species (Minz, 2017; Sarma and Mukherjee, 2019). Sacred groves are the replica of societal and cultural consciousness of the indigenous community. Cutting and felling of trees, lopping a branch or even plucking a leaf in the grove is strictly prohibited. This is a traditional way that facilitates the conservation of species in their own natural habitat (Ekka, 2018). The present status throughout the world is a matter of great concern owing to overexploitation, development, Governmental policies etc. which has paved the path of declination (Daye and Healey, 2015; Kandariet al., 2014). The role of religious and traditional belief systems in the conservation of natural resources by indigenous communities has been appreciated throughout the world (Bhagwat and Rutte, 2006; Niroula and Singh, 2015; Reimerson, 2013; Sinthumule and Mashau, 2020). Presently the conservation of biodiversity has been overlooked due to the advent of commercial interests in most parts of the world. Further, the weakening

of traditionally inherited bio cultural practices over time are the major reasons behind irregularities and concerns in the conservation and management of natural resources (Ekka, 2018; Manjula and Norman, 2017.).After reviewing the literature it is clear that very less work has been done focussing on the famous Karam Puja conducted by the Kurmi Mahatos along with its contribution towards nature.

Cultural attributes of the Kurmi Mahatos: Karam Puja

Kurmi Mahatos are the most important agriculturist community those dwell in eastern India mainly in Jharkhand, part of West Bengal and Orissa. Their religious belief is a major step towards biodiversity conservation. Karam Puja is a nature worship festival and is very sacred among the indigenous peoples residing in the Indian states of Jharkhand mainly prominent in Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha, West Bengal, and Assam. It is associated with the harvest, symbolized through a Karam tree, worshipped as Karam Devta. Nine type of seeds namely rice, wheat, corn etc which is called Jawa are planted in a basket. Girl generally takes care of these for seven to nine days. They fast throughout the day and go to the jungle accompanied by groups of drummers and cut one or more branches of the Karam tree after worshiping it. Unmarried, young girls carry the branches of the Karam tree which they have obtained from the jungle and sing in praise of the deity. Later these are planted in the centre of the ground surrounded with cow-dung and decorated with flowers. Pahan, a village priest offers germinated grains and liquor to the deity. After puja, in the next morning the Karam branch is immersed in the river water. The festival also has a close link to nature as the people worship trees during this festival and pray before Mother Nature to keep their farmlands green and ensure a rich harvest. Even the Govt has declared a sectional holiday on this particular day.

Story behind the festival:

There are multiple versions of the festival. The most common story is discussed as below. Two brothers were leaving peacefully. They used to perform this puja every year, but in a particular year, one of the brothers took hot rice, and it is a belief that Karam God was upset, and from that day, his life went under colossal problem. His entire agricultural land was wasted, and got engaged himself in his brother's home for a job. Their

food was finished before reaching his plate during distribution. He kept waiting for food and finally decided to waste his brother's crop. While he went to destroy the crops, somebody chanted that he had broken the laws of Karam God, so he should travel seven oceans to reach the Almighty; to overcome the situation. While travelling he felt thirsty and found a water body. He found it filled with bees, and the water body requested him to ask the Almighty why it is filled with insects. He felt hungry and found a Fiicus Carica tree to eat the fruit, but found it filled with insects. Then he reached a hut and found that the leg of an older woman was in fire, but it was not burnt. Then Kormu again started walking, where he found a crocodile in a water body it could not immerse himself in the water. After reaching the other shore, he met the Almighty, where he confessed all his wrong deeds along with whatever happened throughout his journey. Karam God told him to conduct his puja following all rules and regulations. While travelling on the crocodile's back, he said that the crocodile had eaten many people, including a female wearing ornament. If he could donate those, then only he would be able to immerse himself in water. He suddenly vomited all jewellery to distribute it among the needy people. He reached the old lady and stated that she once kicked somebody, so her leg was on fire, and requested for donating the needy. Then he reached the tree and kept the jewellery beneath the tree, to keep the fruits insects free. Then Kormu went to the water body and donated gold and returned back after drinking water from that river. Kormu, during the month of Bhadra, extracted branches of the Karam tree and celebrated the festival with considerable donations. In this way, his life changed, and the festival earned renowned prominence.

Karam Puja: The unmarried young girls of the villages follow this festival as below.

Day of "Sandesh": The date before the event's commencement is locally known as ***Sandesh***: Generally, on this particular day, everybody chants "**AAJ SANDESH, KAAL BAAR, PORSU PANNA".** Usually, various designs are made on the eastern wall of the houses where the tree is mainly planted.

Day of "Baar": Generally, every member carries out fasting on this particular day. In the afternoon, people generally go to nearby water

bodies for bathing and dedicate the same to God. The people chant **“KAAL GELO SANDESH, AAJ BAAR, KAAL PANNA”.** During the evening everybody enjoys singing and dancing. Karma Dance, one of the oldest dance forms in India is a way of welcoming the spring and forming a circle through their movements around a tree venerated as Karma. The dancers generally wear ethnic costumes and jewellery that cites an example of a ritual that identifies the tribal community.

Day of “Panna”: This day indicates the end of Karam Puja. The fast is broken by eating food mixed with several vegetables; ultimately, the leaf on which the food is taken is immersed in water. This dish is termed a “Panna”. Turmeric is entirely restricted in the preparation of this kind of food. Intake of sweet, bitter food items is strictly forbidden. It is a belief that during fasting, if anybody intakes water, it blinks during the lighting of the lamp. Salt should not touch one’s hand. Even roasted food is also strictly prohibited.

Major restrictions imposed:

The major restrictions followed during this festival are from the very beginning day of Jawa, the girls are not allowed to sleep on cot/ bedstead as this would facilitate the saplings to grow in a bending position. They are not allowed to take a bath bending heads backwardly as the Jawa could collapse to a landslip. Even are not allowed to eat any burnt and sweet things. If a Jawa participant requires salt while having a meal, she should not take the salt on her own hand as this would melt the Jawa. They do not defecate in a wet place because in that case, a kind of worm that is cow dung worm in the soil might fortify soil on that area. Urination in a standing position is strictly prohibited as they believe that it creates a hole in the earth. Eating curd is strictly prohibited during Karam Puja because they think that it produces fungus in their Jawa. Karam Puja is a step undertaken by the Kurmi Mahatos in utilisation of the natural resources to its fullest. This on the other hand facilitates the conservation of this species which is a step towards biodiversity conservation.

Conclusion

Karma festival symbolizes spiritual and religious festival closely associated with the harvest. This festival is symbolized through a Karam

tree, generally worshipped as Karam Devta and has earned prominence in recent times. Being a harvest festival it has a close link to nature. People worship trees during this festival as a source of livelihood, and they pray for a green and rich harvest. Biodiversity and culture are interrelated. Cultural diversity helps in the promotion of conservation of the natural resources (Posey, 1999). Biological diversity and natural ecosystems are interrelated to the economy, identity, cultural and spiritual values, as well as the social organization of indigenous people (Stoll-Kleemann, 2001; Miller, 2005; Lindström et al., 2006; Marshall et al., 2007). Several 'indigenous' groups around the world have protected several species and habitats through their cultural beliefs which on the other hand facilitates in the conservation of biodiversity. Forest ecosystem and protection of species and habitats are important aspects which reflect cultural beliefs and helps in biodiversity conservation. Some studies even revealed that many indigenous communities depend directly on natural ecological systems for their sustenance (Halim et al., 2012). Lack of support at the local level has been linked to the inadequate knowledge of the general public about biodiversity (Hunter and Brehm, 2003). Thus traditional knowledge, practices and beliefs helps in the establishment of biodiversity conservation and environmental obligations.

Bibliography.

Alawa, K. S., and S. Ray. (2018). “Some Plant Associated of Tribal Clans of Dhar District, Madhya Pradesh, India and Their Role in Conservation.” *Bioscience Discovery* 9 (2): 260–263.

Bains, W. (2017). “Conservation of Environment through Traditional Knowledge and Wisdom with Special Reference to Beliefs and Practices in Tribal India: An Overview.” *Journal of Multidisciplinary Studies in Archaeology* 5: 224–243.

Banerjee, A. (2014). “Traditional Nature-Based Culture and Forest Festivals of Chhotanagpur Plateau Areas, India.” In Proceedings of the National Seminar On Traditional Knowledge and Social Practices: Promoting Biodiversity Conservation, 69–177. New Delhi: Zoological Survey of India.

Bhagwat, S.A., and C. Rutte. (2006). "Sacred Groves: Potential for Biodiversity Management." *Frontiers in Ecology and the Environment.* 4 (10): 519–524.

Daye, D.D., and J.R. Healey. (2015). "Healey Impacts of Land-Use Change on Sacred Forests at the Landscape Scale." *Global Ecology and Conservation* 3: 349–358. doi:10.1016/j.gecco. 2014.12.009.

Ekka, R. (2018). "Sacred Groves: Tradition of Biodiversity Conservation in Northern Chhattisgarh." ARIPEX - *Indian Journal of Research* 7 (2): 159–160.

Hunter LM, Brehm JM. (2003). Brief Comment: Qualitative insight into public knowledge of, and concern with, biodiversity. *Human Ecology* 31 (2): 309-320.

Kandari, L. S., V.K. Bisht, M. Bhardwaj, and A.K. Thakur. (2014). "Conservation and Management of Sacred Groves, Myths and Beliefs of Tribal Communities: A Case Study from North-India." *Environmental Systems Research* 3 (1): 2–10.

Manjula, V., and T. Selvin Jebaraj Norman. (2017). "Sacred Grooves: the Drug Store of Herbal Medicine." *The Pharma Innovation Journal* 6 (9): 462–464.

Minz, D. (2017). The Religious History of Munda and Oraon Tribes. New Delhi: Kalpaz Publications.

Narasimham, S., and D.V. Subbarao. (2018). "Impact of Mining on Tribal Socio-Economic and Environmental Risks in India." *Economic Affair* 63 (1): 191–202.

Niroula, G., and N.B. Singh. (2015). "Religion and Conservation: A Review of Use and Protection of Sacred Plants and Animals in Nepal." *Journal of Institute of Science and Technology* 20 (2): 61–66.

Reimerson, E. (2013). "Between Nature and Culture: Exploring Space for Indigenous Agency in the Convention on Biological Diversity." *Environmental Politics* 22 (6): 992–1009.

Sarma, U.K., and I. Barpujari. (2011). "Eco-Cosmologies and Biodiversity Conservation: Continuity and Change among the Karbis of Assam." *International Indigenous Policy Journal* 2 (4): 1–10.

Sinthumule, N.I., and M.L. Mashau. (2020). "Traditional Ecological Knowledge and Practices for Forest Conservation in Thathe Vondo in Limpopo Province, South Africa." *Global Ecology and Conservation* 22 e00910: 1–11. doi:10.1016/j.gecco.2020.e00910.

Timung, L., and Kh. N. Singh. (2016). "Totemic Beliefs and Biodiversity Conservation among the Karbis of Assam, India." *Research on Humanities and Social Sciences* 6 (11): 26–30.

Raja Ram Mohan Roy : The pioneer of scientific religious reformer to the Indian Society

Somnath Roy
Assistant Professor, Department of Chemistry
Maharajadhiraj Uday Chand Women's College

Abstract: Raja Ram Mohan Roy was a leading figure in the Renaissance and one of the most well-known Indian and Bengali thinkers of all time. When Bengali and Indian society as a whole were ruled by superstition, poverty, women's harassment, neglect, and tyranny, as well as other societal evils, Ram Mohan Roy came to prominence in the eighteenth century. The long history of Muslim domination in India has had a negative impact on women's rights, education, and social standing. Although some education was established by the colonial rulers to support their trade and rule, there were still a lot of issues under the East India Company's administration. There was an aura of untouchability surrounding the caste system, and the social structure was divided among many races, religions, and castes. Both the high and low caste systems had an impact on women's life and access to education. The purpose of this essay is to show how significant Ram Mohan Roy was at the time, contributing to the creation of a modern society and dismantling discrimination in the old one. Conversely, he managed to bring about a revolutionary change in the Indian educational system and safeguard the rights and lives of women. The goal of the research is to outline and assess Raja Ram Mohan Roy's contributions to Indian culture. To reach a conclusion, the study employed a documentary and analytical methodology.

Keywords: Social Reform, Political reform, Educational reform, Religion and Women's Rights.

Introduction:

The untiring social reformer Raja Ram Mohan Roy heralded in the era of enlightenment and liberal reformist modernization in India, earning him the title "father of Modern India's Renaissance." Bengal was the

birthplace of Raja Ram Mohan Roy, who was born on May 22, 1772. His early education included studying Persian and Arabic in Patna, where he read the Quran, works of Sufi mystic poets, and Arabic translations of Plato's works and Aristotle. In Banaras, he learned Sanskrit and read the Vedas and Upnishads. From 1803 to 1814 he worked for the East India Company as personal ‘diwan’, first at Woodforde, then at Digby. In 1814, he resigned and moved to Calcutta to devote his life to religious, social and political reforms. In November 1830, he sailed for England to be there to prevent the possible repeal of the law banning ‘Sati’. Ram Mohan Roy was given the title 'Raja' by the official Mughal emperor of Delhi, Akbar II, the first of them to present their grievances before the British king. In his speech titled 'Inauguration of the modern era in India', Tagore called Ram Mohan 'a shining star in the firmament of Indian history'.

Ram Mohan Roy was greatly influenced by modern Western thought and emphasized rationalism and a modern scientific approach. Ram Mohan Roy's immediate problem was the religious and social decline in his native Bengal. He believes that fundamentalist religions have become a cause of harm and disadvantage to social life, and a source of instability and confusion for the people, instead of aiming at improving the situation society. Raja Ram Mohan Roy concluded that religious reform was both social reform and political modernization. Ram Mohan believes that every sinner must atone for his sins and this must be done through self-purification and repentance and not through sacrifices and rituals. He believed in the social equality of all humanity and was therefore a strong opponent of the caste system. Ram Mohan was attracted to Islamic monotheism. He says that monotheism is also the basic message of Vedanta. His idea of a single, unitary God was a corrective to the polytheism of mainstream Hinduism and the trinitarianism of Christianity. He believes that monotheism advocates a universal model for humanity.

Raja Ram Mohan Roy believed that unless women were liberated from inhuman forms of oppression such as illiteracy, child marriage, sati, purdah, Hindu society could not progress. He described sati as a violation of all human and social sensibilities and a symptom of the moral

decline of a race. He established women's rights or East-West educational integration, helping contemporary Bengal or India to prosper. He worked hard to protect the freedom of Indians. He is known as the "father of the Bengal Renaissance". So, another important turning point in world history, known as the Renaissance in modern Asia, may have significantly changed Indian thought, intellectualism and worldview around the world from the mid-19th century onwards. Contemporary Hindustan is marked by the intellectual revolution of this particular period.

Ideologies of Raja Ram Mohan Roy:

Ram Mohan Roy, who was influenced by contemporary western philosophy, placed a strong emphasis on reason and modern science. He thought that religious dogmas have turned into sources of harm, conflict, disruption to social life, and confusion for the populace rather than working to improve the state of society. He held that self-purification and repentance are the only ways to atone for one's sins; rituals and sacrifices cannot. Additionally, he thought that political modernization and social reform are synonymous with religious reform. The deteriorating social and religious landscape of his native Bengal was his immediate concern. He firmly believed that all people are socially equal and opposed the caste system.

His concept of a single, unitarian god served as a rebuttal to both Christian trinitarianism and the polytheism of orthodox Hinduism. He emphasized that women must be freed from inhumane forms of oppression such as child marriage, Sati, illiteracy, purdah, and so on for Hindu society to advance. According to him, sati is a sign of a race's moral degradation and a violation of all humanitarian and social sentiments.

In addition to fighting the missionaries' harsh criticism of Hinduism, he worked to rid Hinduism of the abuses that had seeped into it. In a nutshell, that was Raja Rammohan Roy. He enthusiastically supported the inclusion of western science and technology in India's curricula, pioneered English education, and advanced enlightened journalism there because he understood that society could not be improved by horrible traditions that oppressed women without education.

Social reforms: Raja Ram Mohan Roy contribution

Rammohan Roy visited the UK in 1830 to make sure that Lord William Bentinck's Sati Regulation Act of 1829, which outlawed the practice of Sati, was upheld. He also started cultural exchanges while he was in England, meeting with parliamentarians and writing books on Indian law and economics.

Consider the brutal social atrocity known as Sati, in which young widows as young as 12 were made to jump onto the pyre of their deceased husbands in order to perform Sati. As a child, Raja Rammohan Roy saw this horrible scene when his own sister-in-law was forcibly burned at the stake of his own brother. He promised to put an end to these crimes against women. He made it known that if the Sati Abolishing Reform Bill was not passed by the Parliament, he would leave the British Empire. A woman who was "true on her ideals" was called a Sati. A woman who was virtuous and pious would be called Sati. The word "Sati" comes from the ancient Indian language, and it means "truth." Originally meaning "virtuous woman," sati has come to represent both the act of a widow and the victim self-immolation. According to Hindu mythology, Sati was Lord Shiva's wife who burned herself alive on the sacred pyre. In response to her father's rejection of Shiva's invitation to the Gods' assembly, she took this action. She was reduced to ashes after invoking a yogic fire out of sheer mortification. Like the original sati, self-sacrifice is transformed into a "Divine example of wifely devotion." It was Raja Ram Mohan Roy who was the first Indian man to object to this tradition.

One of the first Indian edited newspapers, the Samvad Kaumudi, was a Bengali journal that he founded and edited. Raja Rammohan Roy, who spearheaded the Brahmo Samaj and Bengal Renaissance movements, effectively introduced contemporary ideas to Bengali society, which continue to have a significant impact on women's empowerment to this day.

He was a highly educated man who was essentially a democrat and a humanist. In addition to mastering European languages like English, French, Latin, Greek, and Hebrew, he studied oriental languages like Arabic, Persian, and Sanskrit. He was greatly influenced by the liberal

and rationalist doctrines of the West, the deism of Sufism, the ethical teachings of Christianity, and the monotheism and anti-idolatry of Islam in his religio-philosophical social outlook. He outlined his theory of monotheism in a Persian treatise titled Tuhfat-ul-Muwahidin, also known as "A Gift to Monotheists," which was published in 1803. He had a strong desire to see social evils like polygamy, child marriage, and sati eradicated. As a result, he enthusiastically backed Governor-General Lord William Bentick when the letter establishing laws and doing away with Sati was passed in 1829.

Rammohan Roy is a champion of women's rights in our eyes. He opposed the prevalent belief that women were morally or intellectually inferior to men and denounced the enslavement of women. He criticized child marriage, rigid caste systems, and polygamy. He was one of the first to advocate for modern education, which he saw as a key tool for advancing modern ideas throughout the nation, and he pushed for women to have the right to inherit and own property in order to improve their status.

Political and Economic reformer:

The British System of Constitutional Government bestowed upon its citizens a host of civil liberties that impressed and delighted Raja Ram Mohan Roy. He wished to provide the Indian people with the advantages of that form of governance. He denounced the repressive methods employed by Bengali zamindars. He insisted that the minimum rent be fixed. He demanded that taxes on lands that are exempt from taxes be removed and that export duties on Indian goods be lowered. He spoke out against the trading rights held by the East India Company.

He criticised the British government's unfair policies, particularly the limitations on press freedom. He backed the Indian free press movement with his writings and actions. Ram Mohan discovered three journals after Lord Hastings lifted press censorship in 1819: The Brahmanical Magazine (1821); Samvad Kaumudi (1821), a Bengali weekly; and Mirat-ul-Akbar, a Persian weekly.

He insisted on equal treatment for Europeans and Indians. He favored the decoupling of the judiciary and the executive branches, as well as the Indianization of superior services.

Educational Contribution:
He established numerous schools to provide Indians with an English-language education in Western science. He thought that the conventional Indian educational system was inferior to education in the English language. In 1817, he helped David Hare to find the Hindu College, and at Roy's English school, Voltaire's philosophy and mechanics were taught. He established a school with an English curriculum in 1822. He founded Vedanta College in 1825, offering classes in Western social and physical sciences as well as Indian knowledge.
Raja Ram Mohan Roy – Literary Work:

- Year 1804 – Tuhfat-ul-Muwahhidin
- Year 1815 – Vedanta Gantha
- Year 1816 – Kenopanishads, Translation of an abridgment of the Vedanta Sara, Ishopanishad
- Year 1817 – Kathopanishad
- Year 1818 – A Conference between the Advocate for, and an Opponent of Practice of Burning Widows Alive (Bengali and English)
- Year 1819 – Mundaka Upanishad
- Year 1820 – The Precepts of Jesus- The Guide to Peace and Happiness, A Defence of Hindu Theism
- Year 1826 – Bengali Grammar
- Year 1829 – History of Indian Philosophy, The Universal Religion
- Year 1833 – Gaudiya Vyakaran

Brahmo Samaj:
Raja Ram Mohan Roy established the Brahmo Sabha in 1828. Brahmo Sabha is also referred to as Brahmo Samaj. Worshiping the everlasting god was the main goal of Brahmo Samaj. It was opposed to sacrifices, rituals, and the priesthood. It was centered on scripture reading, meditation, and prayer. Brahmo Samaj was essentially founded to expose religious hypocrisies.

In contemporary India, it was the first intellectual reform movement in which social evils were denounced and efforts were

undertaken to eradicate them from society. It caused rationalism and enlightenment to flourish in India, which aided the nationalist movement inadvertently.

All religions are one, according to the Brahmo Samaj. Rabindranath Tagore, Pt. Sivnath Shastri, Keshub Chandra Sen, and Debendranath Tagore—the father of Rabindranath Tagore—were prominent members of Brahmo Samaj. The Brahma Sabha was divided into two groups later in 1866: Adi Brahmo Samaj, headed by Debendranath Tagore, and Brahmo Samaj of India, led by Keshub Chandra Sen. Indian society was largely unaware of the urgent problems that were afflicting it at the time until Raja Ram Mohan Roy and his Brahmo Samaj became involved. All social, religious, and political movements in contemporary India originated from it.

Conclusion:

Raja Ram Mohan Roy was one of the few people in his day to get the true meaning of the modern era. He realized that independence isolation is not the goal of human civilization; rather, it is a brotherhood of interdependence between individuals and nations. His mission was to fully awaken Indians to their distinct cultural identities and to assist them in comprehending the realities specific to their respective civilizations in the spirit of cooperative understanding. Roy was a living example of a revolutionary and a freedom fighter. Although he never publicly advocated for India's independence, he did fight for Indians' civil rights and disapproved of the notion that Europeans were a superior race. After Roy's death, Brahmo Samaj was supervised for a while by Dwaraka Nath Tagore. Indians still treasure and recall Roy's motivational words.

Raja Ram Mohan Roy was a robust and rational thinker who brought fresh perspectives and original ideas to illuminate the gloomy Indian civilization of the nineteenth century. Bengal is therefore regarded as one of the forefathers of the Renaissance. For being a trailblazer in Indian society, culture, and education, he continues to be revered. Rabindranath thus claimed that Ram Mohan Roy "inaugurated the modern period in India." One foreign biographer who has written about Ram Mohan claims that he is the prophet of the new India.

His contribution to the advancement of society as a whole will always be valued. His goal was to establish a prosperous and well-off India. There is now a new understanding of Bengali society, culture, and religious transformation as a result of her beliefs regarding women's rights and education. He is India's representative in the eyes of enlightened future generations. Rabindranath Tagore called Raja Ram Mohan Roy a "Bharatpathik" because of his extraordinary achievements. Thus, despite all that has been written about him, Ram Mohan Roy's contributions to Indian society and society around the world remain highly relevant today. It's important to remember Mrs. Cole's statement regarding Raja Ram Mohan Roy, "His role was that of an Enlightener."

References:

[1] De, A., & Banerjee, m. (2015). Nineteenth century Bengal renaissance and raja ram Mohan Roy: present perspective. Volume iv march 2015, 2277, 184-192

[2] Kumar, S. (2016). Contribution of socio-religious reform movement to attain the social justice in Indian society. International journal of advances in social sciences, 4(2), 107- 110 [3] Mallick, P. D. Contribution of raja ram Mohan Roy in the field of journalism and literature: a critical analysis.

[4] Mandal, M., & Behera, s. K. (2015). Rajas ram Mohan Roy as an educational reformer: an evaluation. International journal of humanities & social science studies.

[5] Nazir, P. (2011). Raja Ram Mohan Roy: social reform and empowerment of women.

[6] Roy, R. R. M. (2007). Rajas ram Mohan Roy (p. 285). Dk print world.

[7] Shahare, U. P., & sheikh, v. T. (2018). Raja rams Mohan Roy as great reformer towards making of modern India. Research inspiration: an international multidisciplinary ejournal, 3(iii), 01-06.

[8] Shairgojri, A. A. (2022). The pragmatic role and heights of women in nation building. Journal of women empowerment and studies (JWES) ISSN: 2799-1253, 2(03), 31-37.

[9] Shastri, A. (2018). Raja rams Mohan Roy: the great emperor of modern India. Amish kumar Verma, 53.

[10] Siddhartha, M. (2018). A study on raja rams Mohan Roy and abolition of sati system in India. International journal of social science and economic research, 3(12).

[11] Sircar, J. (2020). Ram Mohan Roy: his contribution to the making of India. Studies in people's history, 7(1), 53-64.

[12] Sohan Lal, D. A. V. A comparative study of educational thoughts of raja rams Mohan Roy and Swami Dayanand Saraswat with special reference to education of women. Educational research volume–xv, 26.

[13] Vimala, M. S. (2018). Raja Ram Mohan Roy–father of modern India.

[14] Vivekananda, s. The Indian renaissance-raja Ram Mohan Roy. Modern Indian political thought, 1.

[15] Waghmare, N. (2017). Raja Ram Mohan Roy and Brahma Samaj.

[16] Yousuf, M. (2020). Rajas ram Mohan Roy and Bengal press in the early nineteenth century: A critical study. International journal of multidisciplinary educational research, 10(1), 4.

Migration – an Overview on Terminology and Historical discourse

Sudipta Sardar
Vice Principal,
Rabindra Bharati Mahavidyalaya

Abstract : Migration is a worldwide debated issue; it is of great importance to have a well-defined and clear representation of what this phenomenon means for the individuals, for state-nations and for society as a whole. There are more international migrants today than ever before, and their number is certain to increase for the foreseeable future. Migration is inextricably linked with other important global issues, including development, poverty, and human rights. Migration is present key concerns for global health progress. Despite this, a transparent method for identifying and understanding the relationship between migration and other contextual factors remains a knowledge gap. Beside economic, social inequalities and political conflicts a significant new trend is the increasing number of female migrants, but these women are especially vulnerable to hardship, discrimination, and abuse. Large-scale movements of voluntary and forced migrants have uprooted millions of people worldwide. Many thinkers considering the age we live in as the "age of migrations". Correspondingly, there has been an increased amount of attention given in both scholarship as well as pedagogy to the complexities of these movements of people, caused by varied reasons ranging from economic opportunity, ethnic violence, to social and political persecution.

Introduction

Migration has been a constant and persistent feature in the history of humankind, being among the most important and pressing global issues of our time. Due to the fact that global warming cannot be stopped and the average world temperature increases and melts the glaciers in the polar region, a stronger disaster and natural causes title has been added to these factors. Moreover, the individuals who migrate are not easy to

classify due to the fact that they come under different circumstances, from different environments and with different individual characteristics. Accordingly, understanding the causes and consequences of migration, as well as acquiring theoretical and practical skills are essential for both tackling the challenges that arise and developing effective policies to protect migrants.

We live in a constantly changing world, where migrants have a significant impact on the economic, political and social agendas of sovereign states, intergovernmental agencies and civil society groups Simultaneously migration, means a transnational human mobility, which is an important aspect of globalization[i] . In recent decades, globalization is usually taken to mean the "latest wave" of globalization rather than a longue dare process spanning centuries. In the former meaning, globalization is defined as the acceleration of global economic, political, cultural, and environmental interconnectedness and interdependency over the past several decades, with different authors placing different starting times to it.[ii] The aims of this paper are to provide a critical review of existing migration literature; from this, we also suggest modifications to existing conceptualisation of migration by providing a new conceptual model of the system of migration determinants.[iii] The relationship between climate change and migration has been researched for over three decades, and yet remains fragmented and fraught with the attribution, is migrants forcibly displaced because of climate change or other factors?

Keywords : Climate Migration, Gender and Migration, Migration and income inequality, Violence and Migration.

A Critical Review of Climate Migration Literature

There is hardly any dispute among scientists that the climate change has emerged as one of the most devastating threats to the mankind. In particular, it is sometimes difficult to differentiate between refugees that are driven by environmental factors and those that are impelled by economic problems'. In the study on migration, the classic conceptualization of push and pull factors provided the initial but the most potent basis of explanations about why people migrate[iv]. Historically viewed, the environmental change and natural disaster have

always been a push factor of migration. Climate change is likely to affect migration through a number of socio-economic and political drivers and its direct effect is confounded by the overlapping nature of climate change and socio-economic conditions. However, it must be emphasized that it would be wrong to attribute migration as a monocausal phenomenon rather it would be appropriate to attribute migration resulting from a multi-causality of the interwoven and embedded nature of socio-economic, political and environmental factors expressed through a livelihood strategy[v].

Migration could be a possible adaptive mechanism but several studies also show that migration is socio-economically selective; this means that not everybody affected by climate change would be privileged to migrate and escape its wrath. However, the potential role of migration and remittances sent by migrants may play a very important role in mitigating human distress arising in the event of climate change. It helps transfer surplus Labour from agriculture to non-agriculture sector, increasing the efficiency of Labour use and enhancing productivity and reduction in poverty. The adaptive capacity of migration and consequent remittances need to be leveraged with other ongoing Programmes at the place of origin to increase migration efficiency and its development, while there should be exclusive policies for the protection against the vulnerability of migrants at the place of destination which are mostly the urban areas. The migrants are one of the most vulnerable groups that need to be protected through suitable urban policy and planning.

Therefore, it seems unlikely that proposals on population movement arising from climate change will gain the necessary political support in the near future with regard to drafting, amending, endorsing or adopting an entirely new legal framework. As a result, injustice, adaptation and mitigation strategies, as well as reallocation decisions have evolved to become concerns across the globe. Nevertheless, climate change and human rights are strongly interlinked and the concept of climate justice may offer a way to conceptualize these links. Some authors argue that there is also some limitation in theoretical development and so in recent years there has been a push to promote a more

sophisticated theoretical understanding of how climate change may interact with other drivers of migration.[vi]

Gender and Migration

The gender relations and migration, they have established themselves independently of each other. The area of migration studies, like gender studies, is not characterized by a singular discipline-specific perspective but rather by multidisciplinary and interdisciplinary approaches. Paradoxically, however, gender relations are in fact indispensable when it comes to describing the relationship between a majority society and migrant communities[vii]. The difficult relationship between migration studies and gender studies also involves the dominance of a bipolar differential theoretical paradigm in both these fields that considers the migrant, and in particular the female migrant, as the respective Other, as a deviation, and as someone lower in the hierarchy. Migration is neither a modern nor a postmodern phenomenon; in fact, migration movements across the boundaries of countries, states, and ethnicities have always been a driver in human history. However, the conclusion that feminization has become one of the major trends in migration movements that used to be predominantly male implies that female migration among these movements is a new phenomenon when actually it has always been an aspect of population migrations. The policymakers have come to acknowledge that a large proportion of migrants are women, although even today there are migration studies and statistics that use exclusively male samples or do not consider the migrants' gender at all.

Stephen Castles and Marc J. Miller's book "The Age of Migration" was probably the first study to increase awareness of gender-specific aspects of migration. In it, the two authors show that this new age is characterized by a feminization of migration by providing statistics that show that worldwide, women outnumber men in transnational migration processes—an observation that has since been confirmed by several international large-scale studies. First, the work relationships into which women migrate include feminized occupational fields such as domestic work and care, the entertainment industry, and sex work, as well as feminized occupations in agriculture or catering. Second, one would expect that the spouses or partners of women who are migrating on their

own and are earning most of the income of their families back in their country of origin would take over these women's traditional domestic work responsibilities. Third, the increase in the proportion of female migrants is also related to changes in the gender orders, the organization of the welfare state and the economic conditions in the countries of arrival.

Women Migration in South Asia

South Asia, including Bangladesh, India, Nepal, Pakistan and Sri Lanka, encompasses source, transit and destination areas for women who migrate for employment. An increasing number of female migrants from South Asian countries are getting jobs in the newly emerging manufacturing sector, and as domestic workers in Gulf countries[viii] . However, the ban on female workers is thought to promote the illegal migration of women through informal channels Sri Lanka is the only country in South Asia which promotes female labor migration.[ix] Women with disabilities reported facing heightened difficulties in migrating from affected areas and seeking employment to rebuild, their lives. However, a growing number of women in South Asia are migrating in search of better livelihood opportunities to support their families. But Women who migrate for employment may face contradictory responses from their families and communities ranging from increased dependency to stigmatization. The impact of stigmatization upon women's ability to protect their rights can be profound.

Migration and income inequality a case study from rural Uttar Pradesh

Migration has become an integral feature of rural households in developing economies. Although few attempts have been made to understand the linkages between migration and inequality in developing countries, the studies on the relationship between the two are negligible in rural Uttar Pradesh. In rural areas of developing economies in the presence of imperfect capital markets, migration via remittances is an understood contract between the migrant and the household. Literature also shows that income is one of the major determinants of undertaking migration decisions by households in rural areas. Migration is associated with the financial cost of moving out and thus is not undertaken by the

poorest households. It can be observed that migration has reduced income inequality in all social groups. From descriptive analysis as well, it was found that the rate of migration is highest in OBC households, and the Gini coefficient also shows that the highest income inequality is in OBC households. Migration doesn't reduce income inequality in all villages whereas when Gini coefficient of income with and without remittances across social groups is considered, the relationship is positive. Moreover, more non-farm opportunities shall be encouraged to reduce huge inequalities among various social groups and thus enhancing equal access to resources, be it land, education or income.[x]

Violence and Migration: a case study of Partition in Bengal

One can never be sure of the meaning of violence, of what constitutes it. Violence might seem to be a fixed referral, riots being its practice. But reading riots is not a straightforward exercise. It involves simplifications of sorts, ascribed to spaces where the riots occurred and of the actors involved. The fear of violence and atrocities in all garbs amount to violence. Violence is one whole. The fear and the trauma that made men and women leave their hearth and home were what Chhabi Das, in her narrative, in Jagori Bandyopadhyay's essay, 'Meyeli Jibon', calls 'hutash'[xi] . The kind of violence that the years around the Partition experienced was not what the modern mind would like to associate with the birth of a modern state. The fear of violence, therefore, became, in official parlance, a category different from actual violence, a lesser category, to be precise. The notion of betrayal and the sense of being let down was hemmed into the plan of the Partition. [xii] On 15 December 1949, a train from Dhaka to Comilla was stopped at Khalilabad, between Bhairab and Narsinghdi and all the Hindu passengers were ordered out. They were then lined up by a paddy field and the women were separated.[xiii] The migrants felt that what was going on against them was not simply the work of the hooligans and murderers; the official circle was also involved in it. However, even though faith in the government authorities was lost, surprisingly, faith in private individuals remained even in times of the greatest crises. It has been the case with the migration pattern in Bengal, that whenever there were talks of the final roll call, a fresh wave of migration would topple the plans.

However, in the specific case of literature about migration in our country, it is vital to acknowledge that there is a strong ideological and rhetorical component that often, and unfortunately, tends to divide and therefore restore a strong concept of border, at least on a metaphorical and symbolic level. In this context, the narration of the figure of the migrant is still mainly structured according to conventional binary patterns, on the model of the fundamental identity dichotomy, even though the evaluation, whether implicit or not, develops in different levels, ranging from the acceptance and the enhancement of differences as a source of value and, as a consequence, of human, cultural, linguistic enrichment of a new collective heritage or opportunities, which would be otherwise neither recognizable nor accessible, to the denial of anyone different, labeled as invaders, usurpers or even apostates wanting to erase the customs and traditions of the country of destination to impose their own. [xiv] Historically, the economic prosperity and political stability of the developed regions has been the context that has been an attraction factor for migrants. On the other hand, nations that send migrants often benefit from the remittances that result from higher wages in the countries of destination, but tend to experience the "brain drain" of skilled and educated professionals, thus generating a negative impact on their population, as well as on the economic development of the state.

Conclusion

Stories, defined as narration, through various means and codes, related to different contents, intertwine with the daily life of individuals, groups and societies in such a recurring and pervasive way so as to often turn, in this routine, into a production and reception process that is so ordinary and apparently banal so as to remain at the border of awareness. However, the awareness and the direct experimentation of different models of culture and values provokes culture shock that affects both the individual and the group at different levels, modifying their perception, representation and, as a consequence, narration. At the same time, the migrants that decide to share themselves, their identity and experience must take into account their love for their country and perhaps their feeling of homesickness, as well as their roots and therefore their own language, which, in this sense, may be the favoured means of expression.

<u>END NOTES</u>:

---

[i] Castles S, De Haas H, Miller M (2013) The age of migration: international population movements in the modern world, 5^{th} edn. Palgrave Macmillan, London PP 16-20.

[ii] Steger M (2009) Globalization: a very short introduction. Oxford University Press,pp 28-30.

[iii]Warner, K. Hamza, M; Oliver-Smith, A.; Renaud, F.Julca, "A Climate change, environmental degradation and migration" 2009, PP: 55, 689–715.

[iv]Heberle, R. (1938) "The causes of rural-urban migration: A survey of German theories", American Journal of Sociology, Vol. 43, No. 6, pp. 932–950.

[v] (Mazumdar, I., N. Neetha and I. Agnihotri (2013) "Migration and gender in India", Economic and Political Weekly , Vol. 48, No. 10, pp. 54–64.)

[vi](Neumann, K.; Hilderink, H. Opportunities and challenges for investigating the environment-migration nexus. Hum. Ecol. 2015, 43, 309–322.)

[vii] Lutz and Huth-Hildebrandt 1998: "Gender and Migration: Transnational and Intersectional prospects Routledge Publication, PP: 10-13

[viii] (Siddiqui, T, Migration and Gender in Asia, Paper No. 6, published by United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Bangkok, 2008. PP: 1-6)

[ix](Wickramasekara, Piyasiri, International Migration and Employment in the Post-Reforms Economy of Sri Lanka, International Migration Papers No. 107, published by International Labour Organization, Geneva, 2010, PP 16-18)

[x]S. Irudaya Rajan "India Migration Report 2019", Published by Routledge, (2019)PP: 345-360.)

[xi]Jagari Bandyopadhyay, Meyeli Jibon, Bhagabagir Porer Jug, in Semanti Ghosh, ed., Deshbhag: Smriti ar Stabdhata, Kolkata: Gangchil, 2008, p. 95

[xii] Tista Das, 'The Partition, the Refugees and the Narrative of Violence', The Calcutta Historical Journal, Vol. XXIX, No. 1–2, January–December, 2009, pp. 121–132

[xiii] Maloy Krishna Dhar, Train to India: Memories of Another Bengal, New Delhi: Penguin Books, 2009, p. 200

[xiv] Bhagat, R.B, Assessing the measurement of internal migration in India. Asia Pacific Migration Journal, 17(1), 91–102.), 2008

Reference:

Bardsley, D. K. and G. J. Hugo (2010) “Migration and climate change: “Examining thresholds of change to guide effective adaptation decision-making”, Population and Environment” Published by Routledge (2010) , Vol. 32, No. 2–3, pp. 238–262.

Warner,K. (2011) “Environmental change and migration: Methodological considerations from ground-breaking global survey”, published by Population and Environment (2013), Vol. 33, No. 1, pp. 3–27.

Khalid Koser “International migration a Very Short Introduction” Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York 2007. PP – 16-26

Dimitra Manou, Andrew Baldwin, Dug Cubie, Anja Mihr and Teresa Thorp “ Climate Change, Migration and Human Rights Law and Policy Perspectives” Published by Rautledge (2017) PP- 3-9

Anna Rita Calabrò, “Borders, Migration and Globalization: An Interdisciplinary Perspective” published 2022 by Routledge PP: 237-250.

Migration – an Overview on Terminology, Causes and Effects Article , January 2020 Georgiana Florentina Tataru, published by Trinity College Dublin pp-2-18.

Rebecca Parrish “A Critical Analysis of the Drivers of Human Migration Patterns in the Presence of Climate Change: “A New Conceptual Model” Published by International Journal of Environmental Research and Public Health” Published: 19 August 2020.

“Climate Change, Vulnerability and Migration” Edited by S. Irudaya Rajan and R. B. Bhagat Published by Rautledge 2018, PP 1-14

Ghosh, Partha S., Migrants, Refugees and the Stateless in South Asia, SAGE Publications, New Delhi, 2016, p. 2

“Unattached Women, Able-Bodied Men Partition, Migration and Resettlement in Bengal” edited by Tista Das Published by Rautledge 2023, PP 21-32.

Rise And Growth of The Middle Class and Socio – Economic Hegemony in the 19th And 20th Century Cooch Behar

Gour Kishore Dey
Research Scholar, Department of History
University of North Bengal

Abstract: The socio-economic history of the colonial India has been emphasized by the historians, over the years. The emergence of the middle class in India was the direct consequence of the British rule, establishment of a new social economy, spread of Western education, new job opportunities etc. This educated new class played a crucial role in the field of education, society, economy, politics and movement in colonial India and gradually they became the mouthpiece of the society. In this article mainly I focused,how to rise and growth of the middle class and socio-economic changes in the Cooch Behar. Before Cooch Behar was a tribal state and they maintained their indigenous style but after the penetrations of colonial culture in Cooch Behar state, created lots of job opportunity.The highly educated middle class people came to Cooch Behar mainly from the Eastern and Western part of Bengal for their jobs and better life. Gradually this educated people permanently settled here, established their hegemony on the society and economy of the Cooch Behar by their intelligence, skill and culture.
Key Words: Middle class, Cooch Behar, Education, Culture, Economy, Movement.

Introduction: The middle class appearedeverywhere in the world. In Europe after the break down of feudalism and industrialization created a new class which played a pivotal role in European society.[xiv]But in India the middle class has been appeared after the advent of British rule. The part of the country, which was control by the British earlier, where the new class appeared in first, in this matter Bengal became the first because of the first capital of British India.[xiv]The Western education system in 19th

century played a crucial role to the emergence of the middle class in Bengal, mainly the upper caste Hindus accepted the Western education. The new emerging English educated Bengali bhadrolok was hardly intelligence, they averse to physical labours. Lord Dufferin took a different view and contemptuously called them “babu” politicians, representing only “microscopic minority”.[xiv] The social scientists give different opinion on the middle class, Cambridge historian Anil sheal and Jhon Broom field termed the English educated as ‘Elite’.Another approach developed by Italian scholar Antonio Gramsci, his famous concept of ‘Hegemony.’ Gramsci writes that, “The methodological criterion on which our own study must be based is that the supremacy of a social group manifestsitself in two ways, as a ‘domination’ and as a ‘intellectual and moral leadership.’[xiv]SimilarlyIn the social structure of Cooch Behar, the indigenous people of the Cooch Behar are the subject to the hegemony of themiddle-class people; they created hegemony by their intelligentsia, education, skill and culture and they also taken the responsibility of social leadership in Cooch Behar.

Historical Background of Cooch Behar: Cooch Behar had a great history it inherited the legacies ofPragjyotishpur, Kamrupa and Kamta Koch Kingdom. According to Khan Amanatulla Ahmed, Koch Kingdom founded by the Viswa Singha in 1496.[xiv]The treaty with East India Company on 5th April 1773, Koch Kingdom became a princely state, from this time the British administration dominated in Cooch Behar indirectly.[xiv] To bring out the fruits of developments the imperialist power and the Maharaja of Cooch Behar had taken some major steps. They renovate the administration system, education, land revenue policy of the state. The new administration system demanded lots of high educated, skill full man but which was absence in Cooch Behar. The British resident of the statefilled all the high official post by the upper caste Hindu’s who were mostly came from Rangpur, Ducca, Mymensingh, Assam and southern part of Bengal. The out-sider people began to live permanently in Cooch Behar, even they buy Jote’s, dominant all the high official post, lead the society and economy of the Cooch Behar and created a hegemony on the indigenous people of the state.[xiv]

Spread of Modern Education: The British Govt. of India spread modern education system in colonial India as a part of their hegemony, as well as large number of school and colleges also established by the Christian missionaries and enlightened Indian's.[xiv]But in Cooch Behar the modern education began to late, the people of Cooch Behar go to patshala, tolls or muktab. The Maharaja of Cooch Behar brought native Brahmans into the country from Knoj, Mithila, Assam. They settled in Cooch Behar and contributed to the field of education.[xiv] The people of Cooch Behar had thanks full to the queen mother Maharani Brindeswari Devi for the establishment of the first vernacular school in Cooch Behar town in 1857, this was the first step to introduced modern education in Cooch Behar. An English school established in 1861, Maharani Suniti Devi wife of Maharaja Nripendra Narayan was anenthusiastic, pious and kindhearted lady to female education,she established Suniti academy school in 1890 for girls. In the field of higher education, the first step was establishment of Victoria College in 1888 by Maharaj Nripendra Narayan, this step also changed the fundamental pattern of education system of Cooch Behar state.[xiv] Lots of education administrator and teacher recruited from British Bengal, and they played an important role to spread of modern education in Cooch Behar. It is true that after the growth and development of modern education in Cooch Behar, created a new class among the Rajbanshi community.

Spread of culture: The new emerging middle class in colonial India set a new paradigm inthe society by their lifestyle, culture and education. Partha Chatterjee in his article 'The Subalternity of national elite' showed the colonial middle class, in Calcutta no less than in other centres of colonial power, was simultaneously placed in a position of sub ordination in one relation and a position of dominance in another. For the middle-class people of the Calcutta 19th century, economic and political dominance was fact but side by side they started cultural leadership of the indigenous colonised people.[xiv]The marriage between Maharaja Nripendra Narayan and Suniti Devi, daughter of Keshab Chandra Sen was an important landmark in the cultural history of Cooch Behar, because of the marriage conducted by the Brahmo law. Gradually the

Brahmo law take the place in Royal family of Cooch Behar. The Brahmo movement spread in Cooch Behar, lots of activities organised by the member of this group.[xiv]The population of the Cooch Behar rapidly changed mainly after the post partition and during the 1971 Bangladesh war, lots of refugees took shelter in Cooch Behar. The chief minister of West Bengal complained that "The upper and middle class Hindu families came here hungry and starved, having lost all including their hope of finding subsistence in this new place." In Cooch Behar the situation was horrible, the number of East Bengali migrant was 227827 among only 7709 refuges got govt. sponsored refugee camps and most of them permanently settled here.[xiv] The large number of migrated people played an important role to change the cultural formation in Cooch Behar and gradually they taken cultural leadership in the social structure. The contact with upper caste Hindu gentry, the Rajbanshi people slowly changed themselves, the educated Rajbanshi people adopted their culture, change their lifestyle, language, food habit etc. [xiv]

Control OF Economy: The economic system of India mainly based on agriculture and land. During thecolonial period, the English traders invest their capital in India, created new communication system, introducing commercial crops, renovate land revenue policy etc. Boost the economic system of India. Prof. Sugata Bose argued that in Northern part of Bengal their rich farmer and share-cropper system continued. In Cooch Behar Jotedari – Adhiari system was the main element in the agrarian system.[xiv]The new land revenue policy paved the way for the rich farmer or wealthy person of the society to reach as a dominant class and economically highest social status among the common masses. In The land man relationship of the state the Jotedar became the dominant class and created their hegemony on the peasants, the Adhiar only taken half of the produced and their economic condition going to very bad.[xiv]. After the First World War, the Great Depression in 1929 and the famine of Bengal affected the economic condition of the state and change the ownership of land. The small Jotedar who are mostly affected by this situation, they sold their land to the upper caste Hindu gentry.Gradually the land control of the state goes to out sider of the state from the

Rajbanshi community.[xiv] The introduction of Railway system, construction of new roads, farming new commercial crops like- tea, tobacco, jute etc. Attracted the capitalist in Cooch Behar. The Marwari, Gujrati and Bengali businessman invest their capital in the commercial sector of Cooch Behar. The impact of neo colonial economy, emerged a new business class who are mostly came from outside of Cooch Behar still dominant in the economy of Cooch Behar.[xiv]

Movements: The important side of the middle class in colonial India was to participate in politics, political movement and they also give leadership in the freedom struggle movement. But in the Cooch Behar, the political movement or freedom struggle movement was mostly absence during the rules of maharaja.[xiv]The nineteen century Indiahad been witnessed caste movement, lots of people who are suppressed by the upper castes and belongs to low in social hierarchy try to find out their social rights and uplift their position in the social strata by the Sanskritization. Gail Omvet in her study of the Maharashtra non-Brahman movement, as distorted but important expression of class tensions which might at times go radically beyond the Sanskritization model of mere 'positional mobility.'[xiv] The wave of caste movement's sake the mind of Rajbanshi educated people. The Rajbanshi leadership try to change their lower caste stigma and they appealed to the authority for their kshatriya status. They started Kshatriya Movement led by Thakur Panchanan Burma, Harikishore Adhikari, Madhusudhan Roy and many other people. In the year 1910 they founded an organisation in Rangpur, finally in the census report of 1911 Rajbanshi people are entitled as a Rajbanshi Kshatriya. Thakur Panchanan Burma not only confined at this movement, but his concern also spread to the development of the Rajbanshi community.But it is fact that the Royal did not support his movement, even he refused from the Royal of Cooch Behar for a job, finally he left Cooch Behar and settled in Rangpur.[xiv] But in the second half of the twentieth century, the political scenario began to change, socio economic deprivation and class consciousness among the Rajbanshi people, created lots of new organisation like-Hitasadhani Sabha,

G.C.P.A, K.P.P. etc. The main aim of this organisation was to defend the interest of the son of the soil.

Conclusion: From the above discussion it can be said that the new colonial administration system demanded a higher educated, intelligence class, who are assisted the work of British. But the higher educated, skill full people are mostly absence among the Rajbanshi people of Cooch Behar, because of their lack of interest in education and whitecollar jobs. Theabsence of educated and intelligentsia, the maharaja of Cooch Behar filled all the high official post by the higher educated upper castes Hindus from the Eastern and Western Bengal. The upper caste people played an important role to the spread of education, and they became a dominant class in the land revenue system. In the field of culture, the upper caste people created hegemony on the Rajbanshi people, even the new emerging Rajbanshi middle class also followed the lifestyle and cultural activities of the upper caste gentry. The socio- economic deprivation, large number of refuges, out of land control createdpolitical tension in the Cooch Behar.

Notes and Reference:

1 Kamal Chandra Pathak, *peasant unrest and uprising in the Brahmaputra valley of Assam: A case study of erstwhile Kamrup, Darang and Nowgong (1858-1894),* Ph.D. Dissertation, University of North Bengal, 2010, p.153.

2 A.R. Desai, *Social Background of Indian nationalism,* Oxford University Press, Bombay, 1948, p.157.

3 Sekhar Bandyopadhyay, *From Plassey to Partition and after: A History of Modern India*, Orient BlackSwan Private Limited, Hyderabad, 2020, p.217.

4 Dylan J riley, *Hegemony, Democracy, and passive Revolution in Grammsci's Prison Noteboos,* California Italian Studies, Italian Studies Multicampus Research Group, UC office of the President, California Italian Studies, 2(2), 2011, p.4, https://sociology.berkeley.edu/sites/default/files/faculty/Riley/hegemonydemocracy.pdf, accessed on 03-01-2024.

5 Khan Chowdhury Amanatulla Ahmed, *A History of Cooch Behar*, 1936 (in Bengali Version), 1985, Pustak Bipanani, Calcutta, p.420.

6 Sarat Chandra Ghosal, *A History of Cooch Behar*, Cooch Behar State Press, 1937, Cooch Behar, p.390.

7 Prajna paramita Sarkar, *An Historical re-reading of evolving land-man relationship in the Princely State Cooch Behar (1772-1949): Contextualizing Political economy of regional history in perspective*, Ph.D. Thesis, University of North Bengal, 2013, P. 179.

8 Alka Sharma, *Social Issues in Colonial India*, Globus Press, Delhi, 2015, p.9.

9 Harendra Narayan Chowdhury, The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement, The Cooch Behar State Press, Cooch Behar, 1879, p.122.

10 *Ibid*., pp.324-325.

11 Partha Chatterjee, *The Subalternity of a Nationalist Elite*, this Book c hapter found in Sanjay Joshi (ed.), The Middle Class in Colonial India, Oxford University Press, New Delhi, 2010, P. 95, https://jan.ucc.nau.edu/~sj6/Middle%20Class%20Course/Joshi%20Volume/Sanjay%20Joshi%20Chapter%209.pdf, accessed on 02-01-2024.

12 Suniti Devee, *The Autobiography of An Indian Princess*, London, 1921, pp. 54-67.

13 Rup Kumar Barman, *Partition of India and its impact on Schedules Castes of Bengal*, Abhijeet Publication, New Delhi, 2012, pp.145-146.

14 P. Sarkar, *op.cit*., p.188.

15 Sugata Bose, *Agrarian Bengal, Economy, Social Structure and Politics*, 1919-1947, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, p. 12.

16 Prajna Parmita Sarkar, *Marginalization of the Rajbanshi Community of the princely State of Cooch Behar: Exploring Contours and Complexities*, this Book chapter found in Anil kumar Sarkar (ed.), Historians and Historiography of Bengal and North East India

Dimensions and Perspectives, Abhijeet Publications, New Delhi, 2015, p.57.

17 Sujit Ghosh, Industries, *Trade and Trading Communities of North Bengal 1833-1933: A Study of Economic History,* Ph.D. Dissertation, University OF North Bengal, 2010, p.57.

18 Bhagbati Charan Bandyopadhyay, *Cooch Beharer Itihas*, Cooch Behar, 1882, p.160.

19 Sumit Sarkar, *'Popular' Movements and 'Middle Class' Leadership in Late Colonial India:* Perspective and problems of a 'History from Below', Aakar Books, Delhi, Republished in 2015, p.43.

20 Madhab Chandra Adhikari, *Rajbanshi Samaj o Manishi Panchanan Burma* (Pratham Khanda), Reader Service, Kolkata, 2014, pp.91-96.

Development of Electricity in Colonial Darjeeling : 1895-1947

Nimai Mandal
Research Scholar, Department of History,
University of North Bengal

Abstract:In the development of contemporary India, the nineteenth century was a crucial era. The timing and location of European conquests were influenced by technological advancements, which also influenced colonialism's economic relationships.From the 1880s till the present, electrical power has been a useful tool for ushering in an urban industrial era over the world. The availability of electricity was influenced by economic factors, technological advancements, and a variety of local community and regional variables, including geography, flora, fauna, demographics, politics, and culture. The colonialism of India played a huge role in Western techno-scientific discourse. Electricity, with its elaborate infrastructure of lines, generating stations, and poles, emerged as Bengal's most notable industrial age symbol of progress by the middle of the 20th century. The Calcutta Electric Supply Corporation Limited (CESC) played an important role to provide electricity in Calcutta and its surrounding areas; it also developed many thermal power plants in various places.

Keywords: Electricity, CESC, Colonialism,Hydro Electricity, Sidrapong.

Introduction

Energy is one of the crucial inputs for the economic development of a country. In the case of a developing country like India, the energy sector plays critical role because of the increasing needs, requiring huge investment and planning to meet sustainability. Practically every aspect of economic and human development depends on having access to reliable and inexpensive power. This has prompted several developing countries to experiment with liberalizing the power sector in order to improve the functionality of their underperforming power sectors. Since

the late nineteenth century, electricity has been the “foundational apparatus” that has made modern existence possible. The foundational infrastructure that supports numerous other types of infrastructure is electricity[1]. In India, basically Bengal electricity emerged by the middle of the 20th century as the most recognizable sign of progress during the industrial age thanks to its sophisticated infrastructure of wires, generation-stations, and poles. Here, Calcutta Electric Supply Corporation played a crucial role. It ran generation facilities and supplied electricity to businesses and households. According to Srinivas Rao and John Lourdusamy, the colonial authority solely employed electrification to retain colonial rule and give colonists a more affluent lifestyle than their colonial subjects[2]. Even Suvobrata Sarkar asserts that the colonial government employed electricity primarily for administrative, military, and industrial purposes in his study of electrification and the "development of industry, utilities, and research in colonial Calcutta”[3]. The present article in this backdrop of colonial India wants to study the development of electricity inDarjeeling and highlight the scientific role of the electricity in the life of Bengal.

Electricity Implementation in Bengal during the Colonial Periods :

For an economy to grow, the supply of electricity must be enough. In the highly industrialized Western countries, electrification wasn’t a “thing” that came in from the outside and had a “effect”; rather, it was an internal process impacted by its social setting. But when it got to India, it still carried colonial baggage. Here, the electrification process consists of two steps. The colonial government was the first to implement this technology since it benefited the British Empire. Second, this technology’s inherent characteristics had a profound impact on society and the economy. Despite being a part of our society, not all social classes have the same impact on the development of electricity. Indian society engaged in a discussion on electricity between 1880 and 1940, society where some opinions prevailed over others.Politics, spectacle, transportation, a driving force, and financial gain all played a role in electrification[4]. Thomas P. Hughes created the four-stage process for system creation and growth, which comprises invention and development, technology transfer, system growth, and system momentum, in his groundbreaking

work on the development of the electricity system in the three highly industrialized cities[5]. Calcutta was the capital of British India until 1911, so the British first started using electricity in Calcutta in the second half of nineteenth century "The model for the development of electricity in Calcutta was basically designed keeping in mind the interests of the colonial government. But the local context played an equally significant role in determining the development of electricity". Colonel Crompton received an invitation from the creation of a "appropriate" Electric Lighting Act with the assistance of the Indian government. Rookes, one of the pioneers who laid the groundwork for the British electrical industry was Evelyn Bell Crompton. He was not only an inventor, but also a businessman, engineer, and soldier. He helped the Indian government draught the first electricity act, experimented with building the first hydroelectric generating unit in Darjeeling, and began the production of thermal power in Calcutta. The Electricity Act of 1887 can only be referred to as a "General Act" because all it did was grant the Governor General in Council the power to issue regulations for the protection of people and property as well as the prevention of harm to telegraph lines from devices or equipment used in the production or supply of electricity[6].

Western Technology

There are two methods to create the history of electricity in a colonized nation. Considering the various facets of the history of electricity from the colonial establishment's point of view would be one approach, given it was the implanter and significant contributor. Second, all technology, whether native or foreign, is highly susceptible to the influence of the context in which it is used. The Britishgovernment received income from electricity in two ways: first, through the production and distribution of energy, which was a significant source of income; and second, through the importation of electrical technology and the accompanying business by British corporations. Modern technology systems were introduced to the colonies during the nineteenth and twentieth centuries, and each one was accompanied by an agenda that pointed in some manner to Daniel Headrick's "tools of empire" thesis[7]. The various technological systems performed obvious roles as tools of the colonial enterprise, from ships

that were the first point of contact with colonies abroad like India to large hydroelectricity projects that improved revenue generation. As a source of revenue for British companies, electricity assisted in the expansion of business. As a result, from the latter two decades of the nineteenth century until India's independence, electricity had been crucial to the maintenance of British power in India.The colonial authority established a "technology grid" incorporating technologies including roads, trains, telegraph, and telephone links, as well as irrigation and hydroelectric projects, as noted by Gyan Prakash[8]. This grid aided the colonial government in consolidating its hold on authority, taking advantage of available resources, and transporting money. Electricity plays a unique function in this system because it has the "power" to run numerous other technologies. In addition to being a component of the "grid," it also provided the "technology grid" with power[9].

Electricity in Darjeeling

Due to Colonel Crompton's vast understanding of India, especially in official circles, he was able to overcome a number of obstacles, including local superstitions and prejudices against the use of electricity. He performed a number of perilous expeditions to investigate remote sections of the city in order to create feasibility studies for industrial growth and electrification. In order to avoid the severe summer heat of Calcutta, the Britons used to relocate to the "salubrious environment" of the hill station Darjeeling, which is situated at a height of around 2000 meters. Crompton worked to give Darjeeling the honor of having India's first water-turbine-driven hydroelectric producing station. John Willoughby Meares, then the engineer in charge of the Sidrapong Hydroelectric Project in Darjeeling and, later in his career, the electrical adviser to the Government of India, stressed how increased use of electricity was advantageous to both consumers and electricity suppliers during a lecture at the Civil Engineering College in Sibpur in March 1900[10]. Shidrapong was the first hydro- electricity project in Bengal as well as in India, later many hydro powers plant developed in many rivers in North Bengal. Two turbo-dynamos with 100 HP each were situated between the hospital and Kotwalla Jhoras in the Centre of the power plant, which was erected at Sidrapong in 1897 and was three miles and

3500 feet lower than the town[11]. Although the Electricity Act of 1887 was the first law to regulate topics relating to electricity, this was only a "General Act" without any guidelines for the issuance of permits to private business owners for the production and distribution of electricity. The Bengal Legislative Council didn't pass the Calcutta Electric Lighting Act 1895 until after four more years of negotiations with the Indian government. Through the Calcutta Electric Lighting Act of 1895, the market was made more competitive. At first, numerous businesses requested energy supply licenses. Messrs Kilburn & Company, the Indian Electric Company Limited's agents, presented the Bengal Government with their plan in March 1896 "for the delivery of electric light and power to Calcutta, including the functioning of the Calcutta Tramways by electricity"[12]. Following the Act's passage, the Bengal Government requested bids for the "direct supply" and "accumulated" systems to feed the Belvedere at Alipore with electricity. The Act originally only applied to Calcutta, but it may have been expanded to cover other cities, as it was in the situations of Howrah, Dacca, and Darjeeling[13].

The Darjeeling Municipality built a hydroelectric power station at Sidrapong in 1897 at a time when modern China and Japan were unaware that power could be generated from water. For supplying electricity to Darjeeling town and its surroundings, the Sidrabong Hydro-Electric Power Station, the first of its sort in Asia, featured eight sub-stations. The money made from the sale of electricity was used to pay the salaries of the employees of the municipality, but after the Sidrabong power plant was taken over by the West Bengal State Electricity Board in 1979, it started to suffer as a victim of the political and administrative power[14]. This station, which was built in 1897 by Messrs. Kilburn & Company of Calcutta and is the first of its sort in India, was taken over by the municipality and significantly expanded on occasion. At the moment, there are 4 alternators with a combined 400 kilowat capacity that produce electricity at 2,330 volts, single-phase, and 83.3 periods. This is sent to eight sub-stations in the Darjeeling and Ghum towns, where it is changed to 230 volts using static transformers. In the huge slips that occurred in September 1899, the original plant, which cost Rs. 1,20,000, was buried. For the two-month period that repairs were being made, the town was

completely in the dark[15]. Phaji Hydel Power Station, the first private power project launched by Narabhup Rai and Padma Sunder Malla, which began three-phase power generation in 1935, experienced a similar fate[16]. With all this power produced, it was discovered that the Sidrapong plant, which earned a net profit of rupees 70,000 in 1913–14, was unable to satisfy the expanding needs of the town and the two cantonments.As a result, on July 24th, 1914, Lord Carmichael was invited to the Power Station to see the new plan for the supply of current to the Lebong and Jalapahar Cantonments, which is estimated to cost Rs. 1,70,000,000 when established at Phulbazar in the valley, one of the high-roads to Sikkim[17].The above plan, however, was put on hold while a much larger plan that will fully address the needs of the tea gardens throughout the district, right down to Dam Dim (Jalpaiguri, Duars) on the east and Nuxalbari (Siliguri district) on the west, including the town of Siliguri, was fully considered.

With this goal in mind, Mr. Stonebridge, whose services were specifically retained, spent the entire winter of 1914–1915 touring the Tista Valley. Recently, he submitted proposals and plans for the first of the four proposed stations, namely the construction of one at the confluence of the Little and Great Rangneet rivers close to the Tukvar Tea Estate at an estimated cost of Rs. 3,50, 000/- Because the entire plan is so broad, it follows that it will take some time before it can be completed in its entirety. But once it's finished, tea gardens, which currently rely on the forest for their fuel supply, will have a clean and affordable motive power at their disposal, which should significantly lower the working costs and subsequent cost of production[1]. More than 150 kilometers away from the source of generation, in the plains of North Bengal, is where the power generated in this way in Darjeeling's hilly region is transported uninterruptedly[18]. Several tea factories have been constructed in locations where it is possible to fully utilize the water power present in the estates' mountain streams. In many estates, there is no water power available at any location where a factory could have been built securely. In such cases, it is inevitable that eventually electricity will be used to transmit power from the turbine to the factory. Already, one or two estates have invested in the system, and the only thing stopping the

rest is a lack of technical expertise in electric machinery. When the factories saw that their costs were reduce by two third due to the use of electric water power machine, they began to use electric machinery more widely in their factories[20].

Conclusion

Electricity is an essential input among the fundamental infrastructure services for developmental demands. Both economic and social needs are met by the use of electricity. A prerequisite is having access to sufficient and reasonably priced power services with a view to a society's socioeconomic progress. Power supply, especially in rural regions, plays a significant role in quickening growth in a nation like India where agriculture is the main economic activity. After all, the society gradually entered the world of light from the dark world due to electric lights.. Electricity plays a crucial rule for the overall development of any nation. But the Colonial government use electricity as a tool of imperialism. Their primary motive was to absorb the Indian economy by any way. Thus, they think about power sector as it is the main energy source of agriculture, irrigation, industry, transport and communication system, including telegraph, railway. Even they spread the electricity system irrespectively to both urban industrial centers and rural agriculturalbelts inBengal to enhance the production. However, there is a dichotomy between the opinions of several researchers regarding the impact of electrification in Bengal. Chatterjee[21](2018) opined that the colonial government applied colonial strategy by implementing western idea of modern technology to upgrade Indian socio-economic status but actually it was a political mechanism which harm the sentiment of middle-class people of rural Bengal. However, electricity has its own importance in terms of the socio-economic and livelihood development of a region and the people by increasing the ease of industrial growth, transport development, employment generation, and development of quality of life.

Notes and References

1. Chatterjee,Elizabeth. 2018"Insulated wires: The precarious rise of West Bengal's power sector. In Mapping Power: The Political

Economy of Electricity in India's States", Oxford University Press, pp.2-3.

2. Rao, Srinivas and Lourdusamy, John. 20101. "Colonialism and the Development of Electricity: The Case of Madras Presidency, 1900-47", Science Technology & Society, pp.28-40.
3. Sarkar, Suvobrata. 2015. "Domesticating electric power: Growth of industry, utilities and research in colonial Calcutta" , The Indian Economic & Social History Review, p.356
4. Sarkar, Suvobrata. 2017. "The Electrification of Colonial Calcutta: Role of the Innovators, Bureaucrats and Foreign Business Organization, 1880-1940", Studies in History, pp.2-8
5. Sarkar, Suvobrata.2020. Let there be Light: Engineering, Entrepreneurship and Electricity in Colonial Bengal, 1880-1945 (New Delhi, Thomson Press India Ltd.
6. Ibid., p.12
7. Ibid., p.29
8. Prakash, Gyan. 1999. "Another Reason: Science and the Imagination of Modern India", Princeton University Press, p.3
9. Ibid., p. 30
10. Ibid., p.4
11. Ibid., p.121
12. Ibid., p.8
13. Ibid., p.7
14. Bomjan. D.S. 2008. "Dooars Place under Bengali's Neo- Colonial Rule" Darjeeling, Bikash Jana Sahitya Kendra, p.40
15. Dozey. E.C. A Concise History of Drjeeling District Since 1835, Calcutta, p.97
16. Ibid., p.40
17. Ibid., p.18
18. Ibid., p.19
19. Ibid., p. 41
20. O'Malley, L.S.S. Darjeeling District Gazetteers, p.83
21. Ibid., p.5

Values and Ethics

Paramita Datta
Assistant Professor, Dept. of Philosophy
J.K College, Purulia

ABSTRACT: Society is a group of individuals involved in active and persistent social interaction . The members of the society shares a common social or spatial territory in a ordered community. Ethics and values are two pillars of society which build credibility , leadership skills in the member of society . They also improves the power of making decision and provide a long time gains.

Now, value is the degree of importance of something on action . The goal of values is determining the best way to live a meaningful life . It also taught about meaningful action for an individual . Moral values includes acceptance ,charity , compassion , rights , fidelity , forgiveness , generosity , gratitude , self discipline etc. Some kinds of values are essential to develop an individual in society . They are – Social , Cultural, Ethical , Global and Spiritual Values.

On the otherhand Ethics is a system of moral principles which defines what is right and wrong for the individuals and society. Ethical conceptions derived from many kinds of beliefs for exam . God and Religion , human conscience , example of good human being , political power etc. Ethical values like honesty, trustworthiness and responsibility helps in ethical dilemmas. Ethics includes human values. It gives the direction for socially and spiritually enriched human life. It denotes our rights in civil society and also our responsibility. People make right decisions and leads their lives through moral principles.

Both Ethics and Values played a vital role in society through establish social harmony, eradicate communal violence and ego clash between nation. Thus a peaceful world established.
KEYWORDS: Values, Social, Culture, Institution, Political, Morality, Education.

INTRODUCTION:

The social and political system based upon the ethics and morality of the people of the society . Society is a group of individuals involved in active and persistent social interaction . The members of the society shares a common social territory in a ordered community. Ethics and Values are two pillars of society . They build credibility leadership skills in the members of the society . Value is the degree of importance of something on action. The goal of values is to determine the best way to live a meaningful life. It also taught about meaningful action for an individual.

Morality of a person reflected in ethics. Ethical person knows the difference between right and wrong action. Being a branch of philosophy ethics concerned with human conduct. It deals with the behaviour of individuals in society. It reflects on human behaviour like – freedom , justice and responsibility. It is a code of conduct that helps a man to be a good citizen.

In Santana Dharma values reflects in Purusarthas. There are four kinds of purusarthas in Vedic age. They are Dharma, Artha, Kama and Moksha. These are the inherent values of the universe. Dharma stands for righteousness which refers moral values. Artha for economic values. Kama for pleasure, love and psychological values. Moksha for liberation and spiritual values. Hence, purusarthas ensure the duty of the people in a balanced society. There are some kind of values which are essential to develop an individual in society. They are: -

A. **Social values:-** Communication is the most important thing in society. Love, affection, friendship hospitality, justice, tolerance etc. are very important values for a healthy society.

B. **Cultural values:-** Cultural values are concerned with right and wrong, good and bad, customs and behaviour. These values are reflected in language, ethics, aesthetics, education, law economics and all kind of social organization.

C. **Ethical values:-** It is the backbone of a society. Respect for others and themselves, avoid unnecessary problems with others, avoid cheating etc. are included in ethical values.

D. **Global values:-** It is the universal values that specify the sense of the human condition. It can be experienced as life, joy, brotherhood, sympathy, truth and eternity.

E. **Spiritual values:-** This is the ultimate moral value. It is called 'Moksha' in Vedic Dharma. The values of truth, righteousness, peace, love and non-violence are found In this value. Purity, meditation, yoga, discipline, self-control is the kind of spiritual values. We should try to achieve these values to become eternal happy individual.

The above-mentioned values inspired human being to live a better life. Moral and Ethical values play an essential role in the society. They help to build an individual with respect, kindness and compassion.

Role of Ethics and Values in Society:-

Human being includes in a social order. This begins from family and extend to human race. A good human life requires exertion good judgements, temper and similar things. This requires a good society. The aim of a good society is to develop its people with inner excellence. Value oriented thoughts can make our society more precious. Honesty, truthfulness, good conduct, kindness etc. are necessary attributes that reflects in the nature of the individual of a good society.

Values and ethics play a vital role in the society through ages. After crime, oppressions and political violence it helps to repair the relations of the society. Thus, it established social harmony. Ethical values are important for avoiding communal violence among the different religion in the society. They stopped ego clash between nations. Moreover, it establishes social justice. Social justice requires that all people should have equal access to wealth, health, justice privileges and opportunities regardless of their legal, political, economic or other circumstances. Gender equality, women empowerment is also possible through these principles.

So, society cannot survive without ethical conduct. Ethics are not enforceable by themselves. Hence, ethical standards are incorporated as laws. For example, an individual can evaluate his own morality by looking his own life critically. A peaceful, harmonious society is possible only through ethics, as it guides and act as a self-governing system.

Books and References:

1. Singer, Peter (1979), 'Practical Ethics'.
2. Abraham, M. (2017), 'Value Education and Women's Empowerment'.
3. Chakrabarty, S.K. (2006), 'Human Values and Ethics'.
4. Scanton, T.M. (1998), 'What we owe Each other'.
5. Martine, Glenn (2007), 'Human Values and Ethics in the workplace'.
6. Barahate, Y (2014) 'Role of a teacher in imparting Value Education'.
7. Moore, G.E. , 'Principia Ethica' (1960).

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice aYear

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে
www.ebongprantik.in

Ebong Prantik
2582 3841

Ebong Prantik
2348 487X

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102
Ph : 9804923182, 8250595647
Email : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

₹ 850/-